পরিচয়

শারদীয় ১৩৮১

উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক

রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন,

'একদা মহাত্মা গোখেল যখন সার্বজনীন অবশ্য শিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন সবচেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে।' রবীন্দ্রনাথও বাধা পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি, মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্যভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না ; ইংরেজীর অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলি সাবধানে সেলাই করে কাঁথা বুনতে হয় না।'

'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ। জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম, আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজী শিক্ষায় মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজ যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।'

একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, ১৯৬৬ সালে 'কোঠারী কমিশন'। একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক সিলেবাস কমিটি। এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য সরকার।

বামফ্রন্ট সরকার তাই সিদ্ধান্ত করেছেন, প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রথমভাষা হবে মাতৃভাষা। ষষ্ঠশ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রয়োজনের ভাষা হিসেবে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দেশের কল্যাণে
ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া

আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক—
এই আমাদের ——— ...
ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
কাজ করে যাচ্ছে
স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় চাহিদা
মেটানোই আমাদের ব্রত।
এরই জন্যে উঁচুমানের
নানাধরনের ওষুধ তৈরি করা।
এই প্রয়াস এগিয়ে চলেছে—
প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে।
ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়ার্কস লিমিটেড
৬, লিটল রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭১
ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়ার্কস—
নামটিকে ঘিরে রয়েছে
নির্ভরতা, চার দশক পেরিয়ে।
EIPW/CAS-2/80 BEN

কিন্তু শেষ কথা তো জনগণই বলবেন

পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের চার বছর পূর্ণ হলো।

অতিক্রান্ত এই চার বছর এই রাজ্যের গণতন্ত্রকে দৃঢ়মূল করার নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। এই পশ্চিমবাংলার মাটিতেই এক হিংস্র সন্ত্রাসের অভিযান গণতন্ত্রকে পদদলিত, রক্তাক্ত করতে চেয়েছিল। জনসাধারণের কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছিল। চেয়েছিল জনগণের জীবন-জীবিকা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করতে। এ রাজ্যের মানুষ তা মাথা পেতে মেনে নেননি। তাই সৃষ্টি হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের। সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার—সভা, সমিতি, মিছিল, ধর্মঘট, ভোটের অধিকার ও সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে সংকল্পবদ্ধ। সারাদেশে যখন স্বৈরতন্ত্রের কালোমেঘ আবার জমা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা এ রাজ্যের আপামর জনসাধারণের হাতে গণতন্ত্রের পতাকা তুলে দিতে বদ্ধপরিকর।

স্বাধীনতার তেত্রিশটি বছর পেরিয়ে এসেও এক কুটিল বিচ্ছিন্নতাবোধ ও সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র আস্ফালনে দেশের জাতীয় সংহতি যখন বিপদোন্মুখ, যখন অনৈক্যের চোরাবালি ও পরস্পরের অযথা সন্দেহে অনেকে হতবুদ্ধি তখন পশ্চিমবাংলার বহু ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়ের ঐক্যকে চোখের মণির মত রক্ষা করেই আমরা এগিয়েছি। এই গৌরব পশ্চিমবাংলার মেহনতী জনগণের গৌরব এই গৌরব অর্জিত হয়েছে শ্রেণী সংগ্রামের ময়দানে, ঘাম-রক্তের বিনিময়ে শত্রু মিত্রকে চিনতে চিনতে। আমরা চাই পশ্চিমবাংলায় এই সম্প্রীতি ওসৌভ্রাতৃত্বকে আরও দৃঢ়বদ্ধ করতে, বিভেদের সমস্ত শক্তিকে নির্মূল করতে।

চার বছর আমরা অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি। গ্রামের মানুষ—ক্ষেতমজুর বর্গাদার, কৃষক আজ নতুন অধিকার বোধে উজ্জীবিত। মুমূর্ষু কৃষি অর্থনীতিতে নতুন রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়েছে। শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক মধ্যবিত্তমানুষ তাদের জীবন জীবিকার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ। তারাও পেয়েছেন অনেক দাবী-দাওয়ার স্বীকৃতি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে নতুন মূল্যবোধের জন্ম হয়েছে। তার লক্ষ্যও জনসাধারণ। আমরা চাই শিক্ষার দ্বার, সংস্কৃতির দ্বার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে। গণতন্ত্র প্রসারিত হয়েছে পঞ্চায়েতে, পৌরসভায়। সমাজের পেছিয়ে পড়া, দুস্থ, অক্ষম এবং নিঃসহায়দেরও আমরা যথাসম্ভব রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি। রাজ্যের অধিকারকে আমরা করেছি দুর্নীতিমুক্ত। আমরা সবসময়ই সচেষ্ট কাজের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে। তাই আমাদের এখনও চলতে হবে অনেক অনেক পথ। তাই চাই সমস্ত জনসাধারণের সংগঠিত সহযোগিতা।

কিন্তু আমাদের শত্রুরাও সক্রিয়। জনসাধারণের রায় নিতে তারা আতংকিত। তারা চলতে চায় এক অগণতান্ত্রিক হিংস্রতার পথে। কিন্তু শেষ কথা তো জনগণই বলবেন।

২২৩৪০/৮১ তথ্য

সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার বিজয়ী

লেনিন

রচনা ঃ শম্ভু বাগ

সুর ঃ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, প্রশান্ত ভট্টাচার্য

যাত্রা জগতে সর্বাধিক প্রদর্শিত পালা

আমি সুভাষ

রচনা ঃ অমর ঘোষ

সুর ঃ অজিত বসু (বাদুবাবু)

নির্দেশনা ও অভিনয়ে

শান্তিগোপাল
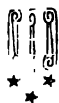
মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

শারদীয় উৎসব ও ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে রাজ্যের জনগণের কাছে আমার আবেদন, সংযম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে উৎসব পালন করুন। কোনো রকম আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেবেন না। উৎসবের সময় চাঁদা আদায়ের নামে কোনো ধরণের জুলুম যাতে কেউ করতে না পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা সকল শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের বিশেষ দায়িত্ব।

পথের ওপর উৎসবের এলাকাকে সম্প্রসারিত করবেন না—কারণ এর ফলে পথচারী ও যানবাহন চলাচলের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাইক্রোফোনের অত্যাচার থেকে জনজীবনকে মুক্ত রাখুন।

উৎসবের সময় বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন।

উৎসবের দিনগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখুন ও তা আরো সম্প্রসারিত করুন। কোনো অবস্থাতেই পারস্পারিক সম্প্রীতি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে রাজ্যের জনগণের সকল অংশের সতর্ক ও দায়িত্বশীল আচরণ একান্তই প্রয়োজন।

জ্যোতি বসু

২২৩৪১/৮৯

পরিচয়

৫১ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা অগাস্ট-অক্টোবর ১৯৮১

□

চিত্রনাট্য

□

চিত্ত ঘোষ, হীরেন ভট্টাচার্য, সুনীলকুমার নন্দী, তরুণ সান্যাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ ঘোষ হাজরা, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শুভ বসু, অরুণাভ দাশগুপ্ত, বরীন সুর, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভ মুখোপাধ্যায়, হাফিজুর রহমান

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, মৃণাল বসুচৌধুরী, বাসুদেব দেব, রত্নেশ্বর হাজরা, শংকর দে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রাম বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শিবশম্ভু পাল, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, অনন্ত দাশ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস্ গোস্বামী, নবারুণ ভট্টাচার্য

কৃষ্ণ ধর, জিয়া হায়দার, রণজিৎ সিংহ, দিলীপ সেন, কিরণশঙ্কর মৈত্র, মিহির ঘোষদস্তিদার, আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, অজিত পান্ডে, বিতোষ আচার্য সত্য গুহ, অমিতাভ গুপ্ত

□

চিত্রসূচী

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

দেবেশ রায়

পরিচয় এর-পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

চিত্তপ্রসাদের চিঠি

চিত্তপ্রসাদের এই চিঠিগুলি আমাদের এনে দেন একদিন সন্ধ্যায় 'পরিচয়'-এ, মুরারি গুপ্ত, লখনৌবাসী, সরকারি চাকরি থেকে সবে অবসর নিয়েছেন। মূল চিঠিগুলিই তাঁর সঙ্গে ছিল। আর ছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের দুটি চিঠি।

তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো চেনাজানা ছিল না। কিন্তু তিনি 'পরিচয়'-এর প্রাচীন গ্রাহক-পাঠক। কলকাতায় ছিলেন যে-ক দিন, প্রায়ই 'পরিচয়'-এ এসে বসে থাকতেন পুরনো আড্ডার নতুন স্বাদ নিতে।

এর ভিতর কপি করে নিয়ে মূল চিঠিগুলো তাঁকে আমরা ফেরত দেই। কথা ছিল, তিনি লখনৌ থেকে চিঠি ও চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে কিছু কথা লিখে পাঠাবেন, এই চিঠিগুলির ভূমিকা হিসেবে সেটুকুই ছাপা হবে। লেখা বিষয়ে তাঁর কিছু আপত্তি ছিল। আমাদের অনুরোধে রাজি হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সেই ভূমিকাটুকু পাঠান নি।

তাতে বোধহয় ক্ষতি হল না। বরং যেন লাভই হতে পারে মনে হচ্ছে—চিঠিগুলি এতই মুখর। ১৯৫৩ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে একজন শিল্পীর ছবি-আঁকা ও বেঁচে থাকার আত্মকাহিনী এই চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে লেখা হয়েছে। পড়তে-পড়তে বোঝা যায়, চিত্তপ্রসাদ' এক জায়গায় লিখেওছেন, চিটি লেখাটাকে তিনি আত্মপ্রকাশেরই একটা মাধ্যম মনে করতেন। মুরারিবাবু বলেছিলেন, এ-রকম আরো বহু চিঠি তাঁর কাছে আছে, তিনি মাত্র কিছু বেছে এনেছেন। অনুমান হয়, এমন আরো-কারো কাছে চিত্তপ্রসাদ লিখতেন। সেই চিঠিগুলি যদি পাওয়া যেত, সব না হলেও অন্তত বেশ কিছু, তাহলে একজন শিল্পীর জীবনের এমন ভিতরের কথা জানা যেত, যেমনটি খুব বেশি মেলে না।

এই চিঠিগুলিতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ কিছু আছে। পত্রপ্রাপককে কখনো 'মুরারিদা', কখনো 'ভাই মুরারিদা' বলে সম্বোধন করেছেন। চিঠির শেষে 'চিত্তপ্রসাদ' 'চিত্ত' হয়ে গেছে। এ ছাড়াও এমন অনেকের কথা আছে যাঁরা সুপরিচিত। চিত্তপ্রসাদের পারিবারিক জীবনের কথাও কিছু আছে।

কিন্তু সে-সব তুচ্ছ হয়ে যায় যখন এই চিঠিগুলোর ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠেন ১৯৫৩-র এক দৃপ্ত কমিউনিস্ট শিল্পী দুর্ভিক্ষের মহারাষ্ট্রে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁকে কেউ বুঝতে পারছে না—এমন যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন, প্রেমে পড়েছেন—যার কোনো সমাধান নেই, গোপাল ভাঁড়ের চরিত্র নিয়ে পুতুল-খেলা শুরু করেছেন, 'খেলাঘর' বানিয়েছেন, একের পর এক চেষ্টায় বিফল হয়েছেন আর সাহিত্য আর বইয়ের ভিতরে ডুবে আছেন।

চিত্তপ্রসাদ আমাদের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গৌরব ও লজ্জা, সাফল্য ও ব্যর্থতা। তাঁর চরিত্রের ঝোঁক আর একরোখা স্বভাবও হয়তো তাঁকে এত অদ্ভুত করেছিল। মুরারিবাবুর এই চিঠির গুচ্ছেই আর-একজন চিত্তপ্রসাদ-গুণগ্রাহীর একটি চিঠি ছিল। তাতে তিনি লিখছেন,

'কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত একরূপ নিঃসঙ্গ। Creative mind সাধারণতঃ যে কোন লোকের সঙ্গলাভ করে তৃপ্ত হ'তে পারেনা—চিত্তও পারেনি—তাই চাটগাঁয়ে যদ্দূর দেখিছি মাত্র কয়েকজন ছাড়া সে কারো সঙ্গে মিশতনা। লেখা-পড়াটা ছেড়ে দিল—মানে কলেজ যাওয়া বন্ধ করলো—কিন্তু ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬।১৭ ঘন্টা বই এবং সঙ্গীত অনুশীলনে ডুবে থাকৃত।

১৯৩১ ইংরেজিতে চিত্তর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। কেবল দেখে

দেখে এবং বই পড়ে সে ছবি অঁাকা আরম্ভ করলো। অতি কাঁচা হাতের সাবলীল সৃষ্টি আমার বেশ লাগত—আমি খুব উৎসাহ দিতাম। ১৯৩২ সালে মাত্র ১৫ দিন আগে আমার ছোট ভাইএর কাছে গরমের ছুটিতে আমার দেশে যাওয়ার খবর পেয়ে সে ১২টি পটের টেক্‌নিকে ছবি অঁাকে যাতে আমি চাটগাঁ পৌছলে আমাকে দেখাতে পারে—কি নতুন কাজ সে করেছে। চাটগাঁ পৌছে সেগুলি দেখে আমি ত 'থ'—একেবারে 'থ'। অশিক্ষিত অপটু হাতে অঁাকা এই যদি তার কাজ হয় তবে আর্ট স্কুলে পড়লে এই ছেলে কি করতো ভাবা যায়না। তা থেকে কয়েকখানি ছবি আমি বম্বে ফেরার সময় নিয়ে এসেছিলাম, রমেনবাবুকে ও অতুলবাবুকে দেখাব বলে। তাঁদের দেখিয়েও ছিলাম। ওঁরা ত অবাক। রমেনবাবু বলেছিলেন যে—"এই standard-এর পট বাঙলাদেশে এখনও এক নন্দবাবু ছাড়া কেউ অঁাকতে পারবেনা। রমেনবাবু তাঁর গুরু নন্দলালকে—চিত্তকে introduce করে একটা চিঠি দিয়েছিলেন যা নিয়ে চিত্ত শান্তিনিকেতনে গিয়ে নন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করে। নন্দবাবু এছাড়াও চিত্তের অন্যান্য কাজগুলি দেখে বলেছিলেন—"তোমার ত শেখা হয়ে গেছে—নতুন করে আর শিখ্‌বে কি?" এই কথায় সে নন্দবাবুকে ভুল বুঝে এত বিক্ষুব্ধ হয়েছিল যে তক্ষুনি শান্তি-নিকেতন ত্যাগ করে আসে। This is what Chitta was.

তারপর বহুবৎসর পর—সোমনাথ হোর প্রভৃতি কয়েকজন শিল্পী চিত্তের অনেকগুলি Linocut নন্দবাবুকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তা দেখে নন্দবাবু তাকে একখানি উচ্ছ্বসিত চিঠি লিখেও উৎসাহ দেন। তবেই তার অভিমান ক্ষুব্ধ মন শান্ত হয়। এই হল চিত্ত···।'

কিন্তু চিত্তপ্রসাদের এই স্বভাবের ব্যাখ্যাও ত সম্পূর্ণ হবে না যদি আমাদের বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলনের স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ের ইতিহাসে তাঁকে না দেখি। কারণ এই বিশিষ্ট স্বভাবের স্বতন্ত্র মানুষ, শিল্পের দিক থেকে ছিলেন এমনই সমাজ ও ইতিহাস-সন্নদ্ধ যে শিল্পের অন্য-কোনো প্রেরণা যেন তাঁর বেলায় সক্রিয়ই ছিল না। এই চিঠিগুলোতে সেই শিল্পী-মানুষটির ব্যক্তি আর শিল্পী চেহারা দুইই গভীরে দেখা যায়, তাঁর নিজেরই ভাষায়।

১

Andheri- 27 Jun '5

তোমার চিঠি আশা করছিলাম। আমার উপর রাগ কোরো না রাজা, আমি সদা-বিপদ-গ্রস্ত ভগ্ন-স্নায়ু জীব—আত্ম-করুণা-বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও। তোমার ছুটিটা আমার কল্যাণে বধ হচ্ছে জানি, তাতে গোহত্যাপাপের সমতুল অনুতাপ হচ্ছে আমার, বিশ্বাস করো। অথচ আমার স্থানে তুমি যদি হতে কি করিতে পারিতে বলো।

শোনো, কাল সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা নাগাদ আমার স্কন্ধের দানিশ দানবটি স-সারা অকস্মাৎ বিদায় হয়েছেন। সসম্মানে নয় কারণ ফাটবো-না, ফাটবো-না করেও না-ফেটে পারিনি। মোটামুটি ঘটনা এই রকম: আজ তিন চারদিন সর্দি বেজায়, বেদম কাশি আর জ্বর নিয়ে বেজায় কাবু আছি। পরশু বাধ্য হয়ে সারাদিন শয্যা নিতে হয়েছিল। কাল সকালে অত্যন্ত দুর্বল শরীরে উঠে কফি-ব্রেকফাস্ট তৈরি করে নবাবপুত্তুরকে ঘুম থেকে তুলেছি তখন একবাটি চর্বির মতো হেসে জানালেন—আজ সারা আসবে। শুনে ঠিক করলাম ঘরে থাকবো না, কারেন্টে গিয়ে ড্রাফটের খোঁজ করব বই ঘাঁটবো। বললাম আমি বেরুবো, আর ফিরব ৩।৪টে নাগাদ।—শ্রান্ত হয়ে ৫টার সময় ঘরে ঢুকেই দেখি বিছানায় প্রেমময়ী এলোচুলে এলিয়ে আছেন। ঘরে ঢুকতেই শুয়ে-শুয়ে বললেন—There is some cold coffee still left, chitta, it you don't mind you can have it!—এর বাহ্য অর্থাৎ stinking হওয়া সত্ত্বেও পাশ কাটিয়ে গেলাম। দুপুরে রান্না-খাওয়া হয়েছে, ঘরে স্তূপিকৃত বাসনপত্র জমানো দেখে বুঝলাম। তারপর এরিক একটি ছোট্টো প্যাকেট—1/4 lb. Coffee এগিয়ে ধরলেন আর সখী

গেয়ে উঠলেন, "a little gift for you Chitta!" তবুও মনকে বললাম 'সংবরো আর্যপুত্র। নিজের জন্যে কফি তৈরি করে উঠা অবধি এত রকমের নাটুকে nagging বর্ষণ হতে লাগলো ডাইনে বাঁয়ে, আর পারলাম না—মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে গেল, "I am tired of the way you people are taking advantage of my goodness and friendship!" তারপর আধ কলক তক—যৎপরোনাস্তি ভদ্রভাষায় অনেক মাথমুণ্ডু ঝাড়লাম। বিস্তারিত বসে গপ্প করব। এখন বলো, তুমি কেন আবার একবারটি আসবে না। আমায় এ হপ্তাটা অবধি থাকতে হবে—Harold-এর draft-এর কল্যাণে বা কাদ্রীর bank-এর কল্যাণে—২৫ ডলারে মাত্র সাড়ে তেত্রিশ টাকা জমা করে বসে আছে। কাদ্রী বলেছে শুক্রবার আবার যেতে। ইতিমধ্যে ক্লিমাশিনের হদিশ পাওয়া যায় ভালো, না যায় মন্দ, আগামী হপ্তায় তোমার হাত ধরে কারলা-ভাজা করে তোমার ডেরায় যাবো।—হঠাৎ দিন তিনেক আগে কলকাতার প্রভাস সেন এসে হাজির, সেদিনই রাতের গাড়িতে ফিরছে কলকাতায়, flying visit যাকে বলে। টু পাইস করছে ছোকরা—চাপতে গিয়েও চাপতে পারেনি। সব পরে হবে—পড়ে পড়ে। ভালোবাসা নাও তাড়াতাড়ি চিঠি দাও।
আজ সকাল থেকে দেখছি আমার ঘরটিকে খুব স্নিগ্ধ আর খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

২১ মে '৫৩

আজ হপ্তা দেড়েক ধরে তোমায় লিখতে বসব ভাবছি, সমরদাও মনে করিয়ে দিয়েছেন বার কতক, শেষ পর্যন্ত দেখছি তুমি নিজেই টেনে বসালে। এই মাত্তর মিনিট দশেক হলো ডাক-পিওন তোমার চিঠি দিয়ে গেল। সাড়ে তিনটে বেলা, সবে খেয়ে উঠেছি। যে সময় সবাই আপিস-কাছারি যায় আজকাল আমি সে সময়টা ঘুম যাই। আজ মঙ্গল এসেছিল সকালে, বেলা ১১৷৷০ অবধি ছিল আজ রাত্তিরের গাড়িতে এলাহাবাদ ফিরছে। হপ্তাখানেক আগে এসেছিল, পি-পি-এইচ ওকে দিয়ে হিন্দিতে বই লেখাচ্ছে, তারই কারবারে ওরা ডেকে আনিয়েছিল ওকে। এর আগে একরাত্তির আমার এখানে কাটিয়ে গেছে, আর আজ ঘন্টা তিনেক।...

আমি গেছিলাম মহারাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত একটি মাত্র অঞ্চলে দশ দিনেও প্রায় একরকম দিশেহারা হয়ে ফিরে এসেছি। তার আগে IPTA

Conference গেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শুধু এই যে আমার প্রচুর সময় আর অর্থ অপচয় হয়েছে। বাকিটা literally ভূতের নেত্য। IPTA-এর সাবেকি prestige ভাঙিয়ে এমন এক স্টেজ তৈরি হয়েছিল যে বম্বেতে আজো কেউ দেখেনি—স্বয়ং উদয়শঙ্কর উদ্বোধন করলেন। কিন্তু তারপরই skeleton in the cupboad-এর খেল—গভীর দরদীরাও কাগজে লিখতে বাধ্য হয়েছিল—আজ দাঁড়িয়েছে peoples theatre minus the people। show-এর দিক থেকে নাক মুণ্ডু কাটানো মুড়োনো হয়েছে। আলোচনার দিক থেকে আজো form বড়ো না করে content এই নিয়ে যতো রাজ্যের রগাটে উড়ুনচুড়েদের গলাবাজি। —culture-এর সীমা কুঁচকি চুলকোনো আর সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে সলিল চৌধুরীর সুর ভাঁজা। বটুকদা-শম্ভু-বিজন-জর্জ সব বাদ। Provincial report গুলোয় শুধু "করা সম্ভব হয়নি", "উল্লেখযোগ্য নয়" এই সবে ভরা। তবু ... শেষ মন্তব্য: Historic conference! আমারো বরাৎ এমনি যে ঐ নিরঞ্জনই যাবার আগে আমায় চিঠি লিখে গেছে যে ভাড়ার টাকা ধার করে গাড়িতে চড়ছে।

গেছিলাম শোলাপুর জেলার কারসালা নামের মাঝারি রকমের এলেকায়। অঞ্চলটি চরম দুস্থ অঞ্চলের একটি। তিন বছর একটানা অনাবৃষ্টি। এখন গরম হচ্ছে ১১০।১১৪ ডিগ্রি অবধি। ৭০।৮০ ফুট গভীর সব ইন্দারা শুকিয়ে আছে গাঁয়ে গাঁয়ে। নদী-নালা নামমাত্র, তাও শুকনো। মরুভূমি বলাই ভালো। একটি ছোটো নদীর কঙ্কালের বুকের ওপর বাঁধ তৈরি হচ্ছে, ভবিষ্যতে বর্ষার জল বেঁধে খাল কেটে গাঁয়ে-গাঁয়ে জল নিয়ে যাবার জন্যে। মাঙ্গী নাম বাঁধের। পি-ডব্লু-ডি-র কাজ। এটাকেই সরকারি Relief Centre করা হয়েছে, বলে চার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু রোজই নতুন মানুষ আসছে। তিন বছর চাষী চাষ করতে পারেনি জলের অভাবে। ব্যাপারটার স্বরূপ এক কথায় বলা অসম্ভব, কারণ স্বরূপটি বহুমুখী। গ্রাম্যজীবন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ক-টা গাঁয়ে গেছিলাম—দেখতে ঠিক বোমা বিধ্বস্ত কোরিয়ার গ্রামের ছবির মতো। গাঁ-ছেড়ে পালিয়েছে গ্রামবাসী, ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়েছে। গরু-বাছুর-মোষ মরেছে এক ফোঁটা জলের অভাবে, একদানা খড়ের অভাবে—হাজার হাজার। মানুষ পালিয়ে বেঁচেছে—। পালানোটাও escape বলা যায় না বোধহয়। যখন যেখানে কাজ মিলবার গুজব পাওয়া যায় সেখানেই ছোটে দল বেঁধে। গিয়ে না

পেলে কাজ আবার ছোটে অন্যত্র। Relief Centre যথেষ্ট নেই। রিলিফের অর্ধেক টাকা চুরি। সত্যি বলছি আমি এখনো হদিস পাইনি ছেলে বুড়ো কচি-কাচা অন্তঃসত্ত্বা রুগী সব নিয়ে মানুষগুলো কিসের জোরে বেঁচে আছে! এসব অঞ্চল chronic famine-এর এলেকা। প্রতি দু-চার বছর অন্তর ক্রমাগত তিন-চার বছর অনাবৃষ্টি এদের বরাদ্দ। অথচ এরই মধ্যে সদ্য-ফোটা ফুলের মতো শিশু ছেলে-মেয়ে, রাণীর মতো রূপসী বৌ-ঝি। পুরুষগুলোই শুধু কাঁটা গাছের মতো রুক্ষ রুদ্র।

এতদিন দুর্ভিক্ষটা ছিল অস্পৃশ্য মাহার মাঙ্গ ধাং গরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবারের ধাক্কায় একেবারে পাটিল-পূজারী-বানিয়া অবধি নেমে এসেছে relief Centre.

relief-এর মূর্তি, খান চার করে দর্মা আর খানকতক বাঁশ—এই দিয়ে তৈরি সারি সারি "ঝোপড়া" খাঁ খাঁ মাঠের মধ্যে। উদায়াস্ত মাটিকাটা পাথর বওয়া, হপ্তার শেষে ৩ টাকা থেকে ৫ টাকা অবধি নরনারী নির্বিশেষে। এর মধ্যে সহর থেকে ট্রাকঅলারা এসেছে "Contract" নিয়ে, তাদের রোজগার দিনে ১০।১৫ টাকা অবধি!!! PWD-র "সায়েব"দের রোজগারের মাপজোক নেই, রূপকথার রাজ্য সেটা চাষীদের চোখে। —খাদ্য, জোয়ারের ভাক্‌রি—আর যা কিছু তা বেস্পতিবারে কারসালার হাট, থেকে কিনে নিয়ে এসো। নুন লঙ্কার বেশি কেনার রোজগার হয় না জোয়ান মেয়ে মরদ কারোরই। এর ওপর অল্প কয়েকজন অবস্থাপন্ন চাষীর, বলদ আছে—গাড়ি আছে—বলদের খোরাক জোগাতে নিজের আর শিশুদের খোরাকে বখরা বসাতে হয়। বুড়োদের ব্যবস্থা আরো চমৎকার। তাদের "Disabled gang" নাম দেওয়া হয়েছে। সারাদিন খাটতে হয় ঠিকই, তবে পারিশ্রমিকটা দিন সাত আনা হিসাবে—তারও "ফাঁকি" দেওয়ার অপরাধের দাম হিসেবে কিছুটা দণ্ড দিতে হয় সবাইকেই এক আধ দিন।

১লা মে সন্ধ্যেবেলা পুড়ে ঝলসে আধমরা হয়ে ফিরেছি। সেদিনই সকালে নেহরু গেছিল মাঙ্গি। ঠিক ৭ থেকে ১০ মিনিট। চাষীদের self-help-এর উৎসাহ দেখে খুশি হয়েছেন। পাঁচশালা প্যাঁচের পর কোনো শালাই ভুখা থাকবে না এদেশে—এই বলেই কর্তব্য সেরে গেলেন। তাঁর মহাগমনের জন্যে হাজার টাকা খরচ করে বাঁধানো পথ তৈরি হলো ১০ দিন ধরে। আরো হাজার টাকা খরচ করে বেদি বাঁধানো হলো। তিনি প্রায় নাচের ভঙ্গিতে ক্যামেরামুখী হয়ে এসে পুনা বম্বে থেকে আনা ফুলের

মালা, তোড়া, চাষীবৌ-ঝিদের ছুঁড়ে দিয়ে জয় হিন্দ বলে জিপে উঠে বসলেন। সকাল থেকে ১১টা অবধি লাউড স্পিকারে স্থানীয় খাদিধারীর দল জনতাকে 'পণ্ডিত নেহরু জিন্দাবাদ' পাখিপড়া করিয়ে রেখেছিলেন। পণ্ডিতের জীপ চলে গেল, জনতার মুখে রা নেই। অবশ্যি তার পরদিন খবরের কাগজে কাগজে রৈ রৈ।

কিন্তু পণ্ডিতকে বলবার আগে নিজেদের কথাই ফণিমনসা হয়ে ঘিরে ধরে অন্তরাত্মায়। বললে বিশ্বাস করবে কি যে আমিই প্রথম কম্যুনিষ্ট শোলাপুরের এই অঞ্চলে পা বাড়িয়েছি আর কাজ করেছি...আসবার দিন সন্ধ্যেবেলা দৈবাৎ কারসালা তালুক কংগ্রেস অফিসে উঠেছি—দেখি সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট দুজনেই কংগ্রেস রাজের বিরুদ্ধে ফুঁসছে—মনে রেখো এরাই সকালে নেহ্রু পণ্ডিতকে মালা পরিয়েছে, সাতদিন ধরে ঢোল-ঢেঁড়া মিটিং করে লোক জড়ো করেছে, সহর সাজিয়েছে!—আলোচনা করে দেখি কংগ্রেস অফিস নীতির দিক থেকে লাল-ঝাণ্ডার অফিস বনে আছে,—কংগ্রেসকে তাড়াবার জন্যে বিরোধীদলের ঐক্য চাই, দেশের বহু সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পত্তি হওয়া চাই। চাষীদের নিজস্ব সংঘ চাই ইত্যাদি।...বর্ষা আসছে। চাষীর হাল-বলদ নেই, বীজ নেই, খেয়ে খাটবার ভাকরি নেই, মাথা গোঁজবার ঘর নেই। ওদিকে সরকার "তাগাই"—কৃষিঋণ আর দেবে না পণ করেছে—বকেয়া আদায় হয় নি। ১৫০।২০০ একর জমির মালিক অবধি মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে বর্ষা নামলে কোথায় ভাসতে হবে এবার।

একজিবিশ্যন—মানে ৭০ খানা স্কেচ আর ৬৫০ ফটো এনেছি তার—তাই নিয়েও চলেছে ল্যাজে গোবরে। গ্যাডগিল কমিটি আমায় পাঠানোর ব্যাপারে খুবই নেচেছিল। তখন বম্বে সরকারের সঙ্গে গ্যাডগিলের মল্লযুদ্ধ চলেছিল, ফেমিন আছে কি নেই তাই নিয়ে। আমি যাওয়ার পর হাওয়া ঘুরে গেছে হীরে-মোরারজী নেহরুকে এনে গ্যাডগিলকে মোক্ষম প্যাঁচ মেরেছে। গ্যাডগিলের কোমরের জোর নেই, রিলিফের ব্যাপারে ঐ কমিটির "অবদান" কিছু সর্দার পৃথ্বিসিং জাতের পুরোণো হাবড়া কর্মী আর কিছু চ্যাংড়া। তাই মোরারজীর প্যাঁচে তিনি কাৎ। তার সঙ্গে বোধহয় বেচারাকে কম্যুনিষ্ট-সংশ্রবের জন্যেও কিছু চাঁটি খেতে হয়েছে। মোদ্দা কথা ওঁরা এখন পেছু হটছেন exhibition-এর ব্যাপারে—মানে প্রয়োজনীয় খরচের পথ বন্ধ। এখন "বিল্লি" মানে পার্টির বম্বে কমিটির

দুচারজন খুব দৌড়ঝাঁপ করছেন কোনো TU-কে দিয়ে খেল নামানো যায় কি না। কিন্তু নামালেও উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা বেশ সন্দ আছে, কারণ এটা নেহরুকে অবধি challange করার ব্যাপার। পেছনে কিষাণ সভার জোর থাকলে তবেই ফল হতো। এখন যে কি হবে কিছুই হদিস পাচ্ছি না।

ফিরে এসেই শয্যাশায়ী হতে হয়েছিল হপ্তা খানেকের জন্যে। আজো পনর মিনিট রোদে বেরুলে মাথা ঘোরে জ্বর এসে যায়। কাসি সারছে না। রোদ আর ভাকরি কোনোটাই ধাতস্থ হয় নি। দশদিনে ছ পাউণ্ড ওজন কমেছে, রোগে আরো পাউণ্ড ৪-এক। বিশ্রী ব্যাপার।

চিঠি এবার ছোটোখাটো কেতাবের আকার নিল। থামতে হয়। সঙ্গলের সঙ্গে যা কথা হলো তার মধ্যে নতুন কিছু গুজব জাতীয় বস্তু ছাড়া সবই জানা কথা। short-cut নেই। spoon-feeding-এ রোগ সারবে না। সবাই অভিজ্ঞতার ঘা খেয়ে খেয়ে শিখবে তবেই উদ্ধার। ভালোর মধ্যে, অধোগতির বেগ থেমেছে নতুন প্রোগ্রামের দৌলতে, নেতারা ধীরে ধীরে সৎ কাজ করছেন যদিও সদবুদ্ধি থেকে নয়, বরং নিজেদের জারিজুরি বজায় রাখার চাপে পড়ে। তবু সৎ কাজ সৎ কাজই। সমস্যা সব চেয়ে কঠিন এই যে অভ্রান্ত নীতির পথ ঘুরে চলেছে অকর্মণ্য ক্ষুদ্রমতি নেতার দল, এই হলো সঙ্গলের মত।

আরো অনেক কথাই বাকি রইল তোমার চিঠির উত্তরে। টাকা পয়সার মর্মান্তিক টানাটানি যাচ্ছে। বিমল রায় পুরো না হলেও আধখানা কদলী দেখাবার তালে আছে। C.R. বন্ধ। ওদিকে মাকে দেখতে যাওয়া নিতান্তই দরকার। শয্যা নিয়েছেন আজ ছ মাস হতে চলল—স্রেফ মনের জোরে শ্বাস নিচ্ছেন আজো। একটা কিছু বড়ো রকমের miracle না ঘটলে আর চলছে না।

ভালোবাসা নিয়ো। চিঠি দিও তাড়াতাড়ি।

২৩ জুন '৫৩
আন্ধেরি

আজও আমার চিঠির উত্তর দিচ্ছ না কেন? পেয়েছ তো আমার চিঠি? মাসখানেক প্রায় হতে চলল, কি বেশি, লিখেছিলাম তোমায় চিঠি পেয়ে।

ভালো আছ তো? নাকি এখনো গরমে ভুগছ? বৃষ্টি নামলো কি তোমাদের পাড়ায়? এখানে তো হপ্তা দেড়েক হতে চলল যেমন ঝোড়ো হাওয়া তেমনি বর্ষণ। আজ দুদিন শুধু বর্ষণ কম। তোমাদের ওখানে. কি এখনো গ্রীষ্মের পালা শেষ হলো না?

এ চিঠি, তোমার চিঠি পাওয়ার আগেই লিখতে বসেছি তার কারণ হপ্তা খানেকের মধ্যেই কলকাতায় যাচ্ছি তা তোমায় জানাতে। মনে পড়ছে না আগের চিঠিতে তোমায় লিখেছিলাম কি না যে, RPD-র India To-day-র শিশু সংস্করণের ছবি করতে আমায় বলা হয়েছে। দেবী চট্টোপাধ্যায় লিখেছে মূল খসড়া, RPD revise করেছেন। PPH প্রকাশক। কলকাতায় দেবীর সঙ্গে আলোচনা করে-করে আমায় ছবি করতে হবে, তাছাড়া কলকাতায় ছবির জন্যে references পাওয়া সহজ হবে দেবীর সাহায্যে। PPH আমায় যাতায়াতের ভাড়া ২০০৲+ আঁকার মাল-পত্তর ২০০৲+ চার মাসে মাসোহারা ১৫০৲—৬০০৲ এই এক হাজার দেবেন। হিসেবটা দেখলেই বুঝবে, এ ঠিক whole timerই-র হিসেব বা 'টেম্পোহারি' নোকরিও বলতে পারে। বইটার প্রকাশকী monopoly PPH-এর, মানে সারা পৃথিবীতে হাজার-হাজার বিকবে। +ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তর্জমা হবে। এক কথায় royalty হিসেবে আমার প্রাপ্য পেট-ভাতার ঢের বেশি হওয়ার কথা। নেহাৎ RPD-র আগ্রহ আমায় দিয়ে কাজটা করানো, নইলে খরচটাও পেতাম না।

খুব ভগ্ন-হৃদয় অবস্থায় দিন কাটছে আমার। গোবিন্দ আছে এখনো, যাই-যাই করেও। ওর মত হতে পারলে মন্দ হতো না, বসুধৈব পেয়ার, খাচ্ছে না খাচ্ছে, ক্যামেরায় ডুগডুগি বাজিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে সহরময়। না সত্যিকারের সুখবোধ, না সাঁচ্চা দুঃখ-বেদনা-বোধ। ছিল সন্ন্যাসী, হয়েছে ভারতীয় কম্যুনিস্ট, চামড়া দুনো মোটা হয়ে গেছে, চোখেরও, বুকেরও। পেট আর পায়ের তলার কথা নাই ধরলাম হিসেবে। আমারই বরাৎ এমন যে আমার ওপর যত বিষ ফোড়ার ভর। বোধহয় নিজেই এক vagabond আমি, তাই জোটেও আমারই যোগ্য দোসর সব। তবু নিজের কথা ভুলে যাই এদের মতো; "সৎ" আর "tough" PM-দের দিকে চেয়ে চেয়ে আর পার্টির কথা ভেবে।

Famine Exhibition কেঁচে গেছে আমায় ফাঁসিয়ে। লজ্জার কথা বলি শোনো। CR-র সিনা মেয়েটার বন্ধু এক ইংরেজ ছোকরা, এখানে

কোডাক-এর boss, দৈবাৎ আমার ঘরে এক অপরাহ্নে এসে হাজির। Famine sketches আর ফলো তার খুব ভালো লেগেছিল। তার চেয়েও বড়ো ব্যাপার দুর্ভিক্ষের যা বর্ণনা শুনেছিল তা তার বুকে লেগেছিল। জানতাম না তখন যে কোডাকের boss, পরে জেনেছি, জানোই তো, পরস্পরকে ভদ্রভাবে পরিচিত করে দেওয়া রেওয়াজ এদেশে কম, পার্টিতে তো একেবারেই নেই ; যাক্ ছোকরা ছলছল চোখে হাত ধরে যাবার সময় বললে ফটোর নেগেটিভ তো চমৎকার দেখলাম, এখন এনলার্জমেন্টের ব্যাপারে হয়তো আমার দ্বারা কিছু সাহায্য করা সম্ভব হবে।...ইত্যাদি। পরে ৫০ শীট্ ১৫"×১২" কাগজ donate করেছে। গোবিন্দের কথা enlargement-গুলো করবার, কিন্তু গোবিন্দ এমনই এক বস্তু, যে তাকে দিয়ে ঠিক যেটি দরকার, তা ছাড়া আর সবই করানো যায়। লজ্জায় মরছি আমি সেই বিদেশী বন্ধুটির কাছে। শুধু তার সাহায্যের প্রতি অবহেলা হলো বলে নয়, এদেশের প্রতি তার বুকে যে-দরদ, আমাদের তার শতাংশ সরম অবধি নেই। অথচ সারাদিন গোবিন্দের পাত্তা পাবে না। কারো বৌ-এর ছবি তুলছে, কারো ছেলের, কারো বাজার করে দিচ্ছে কারো pleasure trip-এ সঙ্গ দান করে বেড়াচ্ছে। প্রায় মাঝরাতে আধমরা হয়ে এসে ঢোকে আমার গর্তে, খিচুড়ি খায়, লম্বা তারপর! এ কাহিনী কাকে কোন মুখে শোনাব বলো। মাঝ থেকে আমি চোর।

নিজেও বড়ো কিছু একটা করছি ইদানিং তা নয়। শরীর খারাপ একটা বিশ্বাসযোগ্য দোহাই। কিন্তু মনে এমন একটা sense of futility চেপে বসেছে যে শরীর থেকেও নেই হয়ে আছে। বোধহয় যে শ্রেণীতে মানুষ হয়েছি তারই একটা লক্ষণ আমার মধ্যেও কাজ করবার সুযোগ পাচ্ছে বাইরের জীবন থেকে আন্দোলনের উত্তাপের অভাবে। বাইরে কোথা থেকেও কারো যেন আজ আর আমার প্রয়োজন নেই। দু-চারটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে জীবনের সৃষ্টি-কর্ম-ক্ষেত্রের চেয়ে ঋণের সম্পর্কই বড়ো হয়ে উঠেছে। নিজে থেকে যে এগিয়ে গিয়ে নিজের দেহমন সমর্পণ করব—তা হয় নেবার কেউ নেই—Famine Exhibition-এর ব্যাপারে কতো বড়ো ঘা খেয়েছি আর জ্ঞান লাভ করেছি তা বলার নয়—। নয়তো artist-এর সঙ্গে দেশের যোগাযোগের পথ এদেশে আর বর্তমান কালে এতোই সুদূর আর ঘোরালো যে আমার চোখ আর দম আর বুদ্ধি-সামর্থ্য কোনোটাতেই আর কুলোচ্ছেনা একা পাল্লা দেবার। ভ্যান গঘের একটা শক্তিকেন্দ্র ছিল নিজের মধ্যে

যে সে শুধু art-কেই ভালোবেসে ছিল দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে। শুধু ঐ একটাই কেন্দ্র ছিল তার, তাই শেষ অবধি সেটা রোগ হয়ে সর্বনাশ কবল অতবড়ো মানুষটাকে। কিন্তু সেটা আরেক কথা। এ যুগের আর্টিস্টের পক্ষে সমাজকে ভালো না বাসতে পারাটাই আশ্চর্য্য ব্যাপার এবং রোগের লক্ষণ। কিন্তু আমি বিপদে পড়েছি সেইখানেই। শুধু এঁকে যাওয়া ছবির পর ছবি—অকারণে গান গাওয়ার হৃদয়মন কোনোটাই আমার নেই। অথচ কারণ-গুলো আমার পাড়া দিয়েই আসা যাওয়া করছে না আর। আর আমিও জানি না কোন যুগে কোথায় গিয়ে তাদের ধরা-ছোঁয়া পাব। গোবিন্দের আগামরির মুখ চেয়ে আর যাই পাই না কেন ছবি আঁকার উদ্দীপনা বা হেতু কোনোটাই পাইনা। অথচ গোবিন্দ হলো আমাদের পার্টির, দেশের ও সমাজের the best-দের একজন এ যুগে, মানে এ অরণ্যে। সমরদারও মুখ চেয়ে আর উৎসাহ পাই না; artist হিসেবে সৃষ্টির জন্যে যে-সংগ্রাম, সমাজের ভাঙাগড়ার কাজে তাঁকে যেখানে পাওয়া দরকার সেখানে তাঁর সময় নেই। আমার জীবনে আজ আমার সঙ্গী সাথী নেই, শুধু দরদীরা, তাঁরা নমস্য কিন্তু তাঁরা শুধু আমার ঋণ-বোধকেই বাড়িয়ে তুলতে পারেন কারণ তাঁদের যোগ্য কিছুই আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু লিনোকাটে Children's album-টা নিয়ে যা দেখলাম তাতে সমগ্র দেশ সম্বন্ধেই ভয় ভাবনা বাড়ে। আমার কদর বুঝলো না ওরা বলে নয়। ভালোকাজকে দরকারি জরুরি কাজকে কাজে লাগাতে ভুলে গেছে ওরা, এর নাম বর্বরতা। এটাই আতঙ্কের কথা। আমার একার মনের ও শরীরে জোরে যদি কিছু হবার হতো আমি হতাশ হতাম না। কারণ হতাশাটা রোগ বলে জানি। কিন্তু এ অবস্থার তুলনা হলো অনাবৃষ্টি, রোগে মরছিনা, মরছি তৃষ্ণায়, যেমন করে ফলগাছ মরে আগ্নেয় আবহাওয়ায়।

অথচ দেখো, গোবিন্দর মতো আর-সবাই ছোটাছুটি করছে, মারাত্মক রকমের ব্যস্ত আছে—অল্প জলে অনেক পুঁটির মতো। আমি মরছি খাবি খেয়ে, বোঝাতে পারছি না কাউকে, কলজেটা ফেটে যাচ্ছে, সাঁতরাতে পাচ্ছিনা বলে। নিজের কথা সাত কাহন করছি সত্যি কিন্তু ভুলেও ভেবো না যে নিজেকে কেউকেটা ভেবে বসে আছি। ঠিক বিপরীত। ভ্যানগঘের মতো জিনিয়সূনই একথা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। আর, তা নই বলেই দেশের আন্দোলনেই আমার প্রাণের জীবনমরণ। মরছি আমাকে

কারো প্রয়োজন নেই বলে। নাট্-বল্টু জীবন্ত হয়ে ওঠে যদি গোটা যন্ত্রটা চালু থাকে এবং নাট্-বল্টুকে যথাস্থানে স্থান দেওয়া হয়, কাজ দেওয়া হয়। হাতিয়ারে আজ মরচে ধরচে, চোখের ওপর দেখছি, সইতেও পারছি না, চোখ বুজতেও পারছি না।

এটাও এদেশের ইতিহাসের একটা পর্যায়, জানি, কিন্তু বোধ হচ্ছে ধৈর্যটাও এক-জাতের privilege, বিলাসিতা বলতে পারে। খোর-পোষ না থাকলে পোষায় না। বিশেষ করে জাতব্যাপী চঞ্চলতার যুগে। ইতিহাসের এই দোহাইটা এখনকার দিনে অনেক সময় আত্মপ্রবঞ্চনা বলে ঠেকে। নিজের অযোগ্যতা ঢাকবার দোহাই মনে হয়। আমার মধ্যে adaptability আর leadership নেই, এটাই আমার অযোগ্যতা, দুর্বলতা, আর এই জন্যেই আমি mediore। আর এটাই এদেশের একালের প্রায় সব intellectual-দেরই দুর্বলতা। এটা মনে হয়েছে বিদেশীদের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের। পৃথিবীতে সব এই দেখি আমার জাতভাইরা পার্টিকে আর সমাজকে দিয়ে যাচ্ছে নিজেদের দান, মুখ চেয়ে কেউ নেই কারো কবে বর্ষাবে তবে ফসল ফুল দোবো বোলে। মানি, এদেশের বাইরে সব দেশেরই ইতিহাস আজ যতোগুলো ধাপ পেরিয়ে এসেছে বিশেষ করে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক স্তর, তা এদেশে ঘটেনি আজও, তাই আর্ট সাহিত্যের মূলও যেমন নিরস নিরাশায় ধুঁকচে, শাখা প্রশাখার আকাশও তেমনি বিষাক্ত আর সংকীর্ণ, শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর আর [?] মূলত ফিউডাল "সভ্যতার" দেশে। তবু এই নির্জীব অবস্থার বিরুদ্ধে গভীর বিদ্রোহ নেই কেন বুদ্ধিমানদের দলে? বরং দেখি উল্টোটাই, ইতিহাসের দোহাই দিয়ে লুম্পেনবৃত্তি, এনার্কি-ব্যাভিচার, বিশ্বনিন্দা, সুবিধাবাদী যতো রকমের কদর্য আত্মঅপচয় আত্মঅবমাননা হতে পারে সবই। এটা বৃটিশের খয়রাতি আইডিয়ালিস্টিক "শিক্ষা"র পরিণাম কি? নিজের দেশ থেকে নিজের মানুষ থেকে ছিন্নমূল সহরে "সভ্যতার" মড়কের পর্যায় এটা এদেশের ইতিহাসের। না ভারতবাসী হিসেবে, না মানুষ হিসেবে, না শিল্পী-সাহিত্যিক হিসেবে দুর্দশা পরাধীনতা বর্বর সভ্যতা নোংরামি ক্ষুদ্রতা—এক কথায় Sub-human জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে সত্যিকারের বজ্রদৃঢ় পুরুষোচিত বিরুদ্ধতা দেখবে এদেশের "শিক্ষিত" শ্রেণীর মধ্যে। ···কাজে escapist anarchist, বুর্জোয়া এডিশ্যান নয়, fuedal edition, মানে হদ্দ coard আর filthy; বুর্জোয়া হলে criminals হ'তো মশিয়ে ভাদুর্ জাতের,

অন্যদিকে সন্ন্যাসীও নই—
যাকে ভালোবাসি, মানুষজাতের অনন্ত মহিমাকে ভালোবাসি,
দেশকে ভালোবাসি, এ দেশের একটি মেয়েকে ভালোবাসি,
এ দেশের অনেক বন্ধুকে ভালোবাসি, ছবি আঁকতে ছবি দেখতে
ভালোবাসি, আমার অনেক ভালোবাসা এ পৃথিবীতে অতিসাধারণ
অগণ্য নরনারীর মতোই। কাজেই কাজ করতে না পারাটা মর্মান্তিক
যাতনা, নিজেকে দিয়ে যেতে না পারার যাতনা। আর পার্টিতে
এসে এইটুকু বুঝতে শিখেছি যে, কাকে দেব কেন দেব
না জানলে কি দেব কি করে দেব জানা যায় না।

মানে ক্ষুদ্র হলেও স্বার্থপর হতো, আত্মরক্ষাটা বুঝত অন্তত। এখানে দেখবে morally escapisps।

এ তো বাজে বকছি এই জন্যে নিজে কাজ করতে পারছি না, আর এ-কথাটা ভুলবার উপায়ও আমার জানা নেই। নাম করে অপরকে গাল দিচ্ছি বটে কিন্তু আসলে নিজেকে খোঁচাচ্ছি সবার আগে, তাতিয়ে তোলার জন্যে নিজের মনের হাত-পা গুলোকে। অন্যদিকে সন্ন্যেসীও নই—যাকে ভালোবাসি, মানুষ জাতের অনন্ত মহিমাকে ভালোবাসি, দেশকে ভালোবাসি, এ দেশের একটি মেয়েকে ভালোবাসি, এ দেশের অনেক বন্ধুকে ভালোবাসি, ছবি আঁকতে ছবি দেখতে ভালোবাসি, আমার অনেক ভালোবাসা এ পৃথিবীতে অতি সাধারণ অগণ্য নরনারীর মতোই। কাজেই কাজ করতে না পারাটা মর্মান্তিক যাতনা, নিজেকে দিয়ে যেতে না পারার যাতনা। আর পার্টিতে এসে এইটুকু বুঝতে শিখেছি যে, কাকে দেব কেন দেব না জানলে কি দেব কি করে' দেব জানা যায় না।

তোমায় লিখেছিলাম কিনা মনে নেই, লিনোকাট্ অবলম্বন করে একটা কিছু খাড়া করবার বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। কারণ লিনোকাট দিয়ে কম খরচে কম সময়ে সারা দেশময় মায় পৃথিবীময় ছবি—অর্থাৎ এদেশের কাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া যায়। যা নাকি exhibition-patron মুখাপেক্ষী দিয়ে বা পত্রিকা-মুখাপেক্ষী black & white দিয়ে সম্ভব নয়। কিন্তু লিনোকাটেও সহায়তা দরকার—mass organisation-এর, progressive ছাপাখানার, মানে প্রধানত পার্টিতে art-consiousness না থাকলে ঐ children-series-এর মতোই বিফল হবে আমার সব শ্রম আত্মক্ষয়। এখানেই আজ বড়ো বুক-ভাঙা নিরাশায় এসে ঠেকেছি।

জানি বিদেশে গুণগ্রাহী অনেক আছেন, কাজ পৌঁছলে ধন্য হব। কিন্তু মূল তো আমায় এদেশেই রাখতে হবে, আকাশ তো অবারিত, হাত বাড়িয়ে আছে।

চিঠি বড়ো হয়ে গেল অনেক, অবশ্যি তোমার কাছে আমার ভয় নেই। শুধু লিখলাম অজস্র boring subjective বকুনি, দুঃখ হতাশার নেশার ঘোরে। ইচ্ছে ছিল যে বইটি এখন পড়ছি আর মুগ্ধ হচ্ছি সে বইয়ের কথা লিখব এবারের চিঠিতে। নাম Yo Banfa, লেখক গোটা একটা মানুষ, Rewi Alley। পড়েছ? পড়ে না থাকো, জোগাড় করে পড়ে দেখো। ২৫ বছর চীনে কাটিয়েছেন, নিউজিল্যাণ্ডের মানুষ। কয়েক বছরের ডায়রির পাতা বেছে নিয়ে বইটি লেখা। যন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পডড়ি, পড়ছি না তো, চীনের পথে ঘাটে, ইতিহাসের স্তরে-স্তরে লেখকের হাত ধরে ঘুরছি, বুকের তৃষ্ণা মিটে যায়, নতুন সাহস শক্তি ফিরে আসে মানুষ জাতের অমন এক বীর ইতিহাস-স্রষ্টা সৃষ্টিশীল বন্ধুর মুখে মানুষের ইতিহাস শুনলে। সাধারণ গদ্যে factual realistic লেখা কিন্তু এমন significant আর rich যে কবিতার মতো চঞ্চল করে তোলে অন্তরাত্মা। বাঁচতে ইচ্ছে হয়, বাঁচার অর্থ, কারণগুলো, এতো স্পষ্ট বোধ-অনুভূতি দিয়ে দেখা আর লেখা বলে। নিশ্চয় পড়ে দেখো।

আজ এই অবধি থাক। চিঠি পেরেই যদি চিঠি দাও, পাব। নইলে কলকাতায় পৌঁছে ঠিকানা দিয়ে লিখব। ভালোবাসা নিয়ো।

সেপ্টেম্বর '৫৩
মেদিনীপুর

কি খবর তোমার? আমার চিঠি কি পাওনি? কেমন আছো? আমার গত চিঠির উত্তর দিচ্ছ না কেন? মা-ও খুব ভাবছেন তোমার জন্যে। এ'চিঠি পেয়েই উত্তর দিয়ো। গত রববার কলকাতায় গেছিলাম, কাল ফিরেছি, আবার কাল কলকাতায় যাব। বিমল রায় এই ঠিকানায় ২০০, পাঠিয়েছেন। আরো দুশো পাওনা রইল। মনিআর্ডারটি নিতে এসেছি। আশা করেছিলাম তোমার চিঠিও এসে থাকবে, কিন্তু না। ছবির কাজটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, PPH-এর টাকার মেয়াদ october অবধি।

ছবি অনেকগুলি তৈরি হয়েছে। দেবী-প্রভাস-খালেদ সবারই খুব পছন্দ হয়েছে। দেখা যাক দত্ত-মশাই কি বলেন। অবশ্যি তাঁকে পাঠাবো বম্বে ফিরে গিয়ে। দেবী বলছিল প্রশান্তকে PPH-এর অন্যান্যেরা আমার কাজের ব্যাপারে খুব হেনস্তা করছে—মাসে মাসে বহু পয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছে। কাজের দেখা নেই, আরো কতো কি। ওদিকে কিন্তু দত্তমশাই আজো বইয়ের ছুটো অধ্যায় লিখে পাঠান নি। যাই হোক, নিজের মুখে বলতে নেই, কাজ যা দাঁড়াচ্ছে তা নিয়ে PPH-এ যখন দাঁড়াব তখন সে-দৃশ্যটা জমবে ভালো। দেবী বলছিল, ওর লেখার চেয়ে ছবি বহুগুণ ভালো হয়ে যাচ্ছে। সুভাষ গীতারাও ছিল সেদিন—সবাই মহা উল্লসিত। প্রভাস ও-সব ছবি থেকে sculpture-এ relief করতে চায়। খালেদ চায় mural করতে ইত্যাদি ইত্যাদি। বম্বে ফেরবার পথে তোমায় দেখাতে পারব ভেবে খুব ভালো লাগছে।

কিন্তু ছবির পেছনে খুব খরচ হয়ে যাচ্ছে। করছি Scraper board-এ। একরকম খোদাই বা etching-এর ব্যাপার। বিশেষ এক ধরণের board-এ করতে হয়। সে board, ১৮″×২০″ চারটাকা বারো আনা একখানা, দরকার হবে প্রায় দু-ডজন বোর্ড, মানে একশটাকার ওপর শুধু বোর্ডেই, তারপর আরো বহু সাজ সরঞ্জাম আছে। অবস্থি matcrials-এর জন্যে PPH ২০০ টাকা দিয়ে ছিল। তার প্রায় ৭০/৮০ লিনো ইত্যাদিতে চলে গেছে অনেক আগে। বিমল রায়ের টাকাটা এসে বাঁচিয়েছে। সেন মশাই আজো কিছু দেন নি। হিল্লী দিল্লী করে বেড়াচ্ছেন। যাই হোক কাজ শেষ অবধি উৎরে যাবে, তা যে ভাবেই হোক।

এইমাত্র ডাকপিওন চলে গেল, তোমার কোনো চিঠি নেই মুরারিদা। মা বলছেন খুব ভাবনা হচ্ছে, তাঁরও তোমার জন্যে। আলি কাল হপ্তাখানেকের জন্যে কলকাতা যাচ্ছি আবার, তুমি এ চিঠি পেয়েই উত্তর দিও প্রভাসের ঠিকানায় (4/2 Meher Ali Rd, Park Circus.)। এই মেদিনীপুরের পাত্তাতে দিলেও মা redirect করে দেবেন।

কাল যখন এখানে পৌঁছলাম ঝাঁঝাঁ রোদ। বিকেল থেকে মেঘ ঘনালো, সারারাত বর্ষেছে আর সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, এখন বেলা প্রায় এগারোটা, এখনো ঝাপটার পর ঝাপটা বৃষ্টি, আর এলোমেলো হাওয়া চলেছে। ভাসমান বারান্দায় উড্ডীয়মান কাপড়-চোপড়-পর্দা-কবাট আর বিক্ষুব্ধ গাছপালার শব্দের মাঝখানে বসে এ চিঠি লিখছি। সামনেই

উনোনে মা খিচুড়ি বসিয়েছেন। তুমি থাকলে এক ছাতায় দুজনে ভিজতে ভিজতে গিয়ে বাজার থেকে রূপনারানের ইলিশ কিনে আনতাম। তুমি নেই, তাই আলু-প্যাঁজ ভাজা দিয়ে কাজ সারব। দারুণ নিঃসঙ্গ লাগছে পৃথিবীটা।

প্রভাস বললে আমি-তুমি দুজনেই কলকাতা ছাড়ার পর বটুকদা নামের ডুমুর ফুল জাতীয় ব্যক্তিটি আমাদের খোঁজে প্রভাসের বাড়ি গেছিল। এবার গিয়ে পাকড়াব।

আজ এই অবধি থাক। তোমার চিঠি পেলে পর জানাব. কবে নাগাদ বম্বে রওনা হব, অবশ্যি via Muratida। ভালোবাসা নিয়ো।

২৭ অক্টোবর '৫৩
মেদিনীপুর

তোমার দুখানি চিঠিরই উত্তর দিতে অসম্ভব দেরি করে ফেললাম, অপরাধী বোধ করছি নিজেকে। ভুলেও ভেবো না যে চিত্ত ছবি আঁকায় ডুবে আছে। যা নিয়ে আছি, তার কোথা থেকে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না। প্রথমত কলকাতা-মেদিনীপুর করেছি এ মাসে বার পাঁচ। কিছু উপরি রোজগারের বিফল চেষ্টায় সময় গেছে অনেক, শক্তি তো খোদার দান, কাজেই ওর গুণাগারি উল্লেখ না করাই রেওয়াজ।

ইতিমধ্যে তারা তার খোকা সিধু (সিদ্ধার্থ)-কে নিয়ে এসে পড়েছে—খবরটা এখনও গোপনীয়—এসপার ওসপারের ফয়সলা করতে। ওদের এনে তুলেছি মায়ের কাছে। মাকে সব বলেছি, গৌরীকেও। ওঁরা ওদের বুকে তুলে নিয়েছেন। বাবা আর ···কে বলেছি : বম্বেতে একসঙ্গে কাজ করি পার্টিতে—বাংলা মুলুক বেড়াতে এসেছে। ওঁরা তাতেই খুশি আছেন। গৌরীও এসেছে সঙ্গে, খুব হৈ হৈ করছে মা, গৌরী, তারা, সিধু মিলে। সন্ন্যাসিনীর সঙ্গেও তারার ভাব জমেছে যদিও ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে, ধর্মতত্ত্ব এড়িয়ে। আমার খুব খুশি হবার কথা, কিন্তু India To-dayর কাজ হচ্ছে না, আর প্রচণ্ড অর্থাভাব কাঁটার চেয়েও বড় যাতনা হয়ে বিঁধে আছে মনে সব সময়। দু-একদিনের মধ্যে কাজে বসতে পারব—সব গুছিয়ে এনেছি। অন্যদিকেও সুখবর আছে।

প্রশান্ত আরো এক মাস সময় বাড়িয়ে দিয়ে, আর-এক মাসের ১৫০৲

টাকা বাড়িয়ে দিয়ে চিঠি দিয়েছেন সেদিন। এতে অকূলে কূল পেয়েছি একদিকে—কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেছে তো না বললেও বুঝতে পারো, কিন্তু ঐ ১৫০৲-তে কিছুই হবে না। উপরি রোজগারের দিকে সময় মন দিতেই হবে। আর-সব ঠেলে কাজ সমাধা করতে হবে—এই worryতে আছি। বাড়তি টাকার হিল্লে হবে আশা আছে এ মাসে সেন মশায়ের টাকাটা আদায় হবে। আর সুনীলের ভগ্নীও ছবি কিনবে। ছবি দিয়ে এসেছি। কিন্তু ছোটাছুটি—কলকাতা মেদিনীপুর করতে যে সময় শক্তি যাচ্ছে আর যাবে, তাতেই গেলাম।

ওদিকে হঠাৎ নেমি আর রেখা কলকাতায় হাজির—নেমি এসেছে ওর বইয়ের ব্যবসার ব্যাপারে, এ হপ্তাটা থাকবে। আমার দম নেই সে কথা ওদের বললে ওদের অসীম স্নেহের প্রতি নিতান্তই রূঢ় অবিচার করা হবে। কলকাতায় যেতেই হবে পরশু—। সেন মশায়ের টাকাটার জন্যেও বটে।

ছবি যা-কিছু তৈরি হয়েছে তার কিছু ফটো বৃদ্ধকে পাঠাব দেবীকে দিয়ে। সুনীল ফটো করে দিচ্ছে। এইটুকুই আমার বিবেকের কাছে সাময়িক সান্ত্বনা।...

তারপর, গৌরীকে নিয়ে এক চোট গেল। ১৫ দিন ১৫ রাত মেয়ে দু-চোখের পাতা এক করেনি। যেদিন টের পেলাম তার পরদিন ভোরে তারা আর সিধু এলো, এসেই সিধুর বেজায় জ্বর, দাঁত ওঠার সঙ্গে ফ্লু। এর আগে এক হোমিওপ্যাথের সঙ্গে ভাব হয়েছিল তাঁকে নিয়ে এলাম। খোঁজপত্তর করে বার হল গৌরীকে গায়নেকোলজিস্ট দেখানো দরকার। সে ব্যবস্থা করা গেল। সিধুর অসুখ সারাতে সারতেও চার দিন কাটলো। গৌরীর পরীক্ষা এবছর দেওয়া সম্ভব হবে না—মা-বাবার কাছে সেকথা বলবার সাহস ওর ছিল না—সে ধাক্কা সামলালাম একা এসে মা'র কাছে।—ভাইটা ছুটিতে আসি আসি করেও ছুটি না পেয়ে আসতে পারল না। এলে সে আমার একটু আড়াল হতো।

এর মধ্যে Chinese Republic Dayতে নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম, গেছিলাম, খুব প্রাণ খুলে চীনি হুইস্কি আর পর্ক সসেজ্ খেলাম।

এই হলো আমার নাগর-দোলা-দিনগুলোর কিছু নমুনা। পূজোর আগে একদিন তোমাদের ওখানে গেঁছিলাম ছুটতে-ছুটতে গেছি ছুটতে-ছুটতে এসেছি। বেচারী আরতি তোমার হুকুম মতো এক গেলাস চা স-সিঙাড়া এনে দিয়ে গল্পজমাবার আশায় এসে বসল—আমি আধ গেলাস খেয়েই

দৌড়—অবশ্যি সিঙাড়াও খেয়েছিলাম। ন-টার মধ্যে ডাক্তারকে ধরবার কথা দিলে ওল্ড বালিগঞ্জে। আরতি নিশ্চয় আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়ে গেছে। গৌরী ওর পড়ার ভার নিয়েছিল হঠাৎ চলে এসেছে। আমিই টেনে এনে মা'র হাতে ছেড়ে দিলাম—শরীর ওর বেশ বিগড়েছে। এবার কলকাতায় গেলে আরতির সঙ্গে দেখা করে' সব বলবো।

মা'কে কলকাতায় নিয়ে যাব আগামী মাসের মাঝামাঝি হাতে পয়সা থাকতে-থাকতে। এখানকার প্যাথোলজিস্টের যদ্দূর দৌড় তদূর করা গেছে। তোমার বন্ধুটির কাছে যাব ভেবে রেখেছি নয়তো সেই হোমিওপ্যাথ —অমল সেনের কাছে।

আমার বম্বে ফেরার দিন যে কবে তার কোনো হদিস পাচ্ছি না।

শরীর আমার যে কে সেই, উপরন্তু অবিশ্রাম সর্দি লেগে আছে বেশ কদিন থেকে। সময় নেই অসময় নেই হঠাৎ হঠাৎ দারুণ ঘুমে শরীর ভেঙে আসে। ভালোর মধ্যে পেট অনভ্যস্ত রকমের সাফ হচ্ছে, খাচ্ছিও রাক্ষসের মতো।

এর মধ্যে একদিন প্রভাসের ওখানে বটুকদা এসে হাজির—(যেদিন দেবী ··· এসেছিলেন আর তারা এসে পৌঁছল—বটুকদা তারাকে দেখেন নি, লুকিয়েছিল—) অনেক গান—চণ্ডালিকার প্রায় সব কটি গান শোনালেন।

মুরারিদা তুমি যে আমায় কি চোখে দেখেছ জানি না, ভাই চোখে জল আসে সুখে আবেগে তোমার চিঠি পড়তে-পড়তে। তুমি ভালোবাসো আমায়, এইটেই আমার কাছে পরম গর্ব পরম সুখ পরম ঐশ্বর্য, কেন ভালোবাসো তার হিসেব করবে কার সাধ্যি আছে। আমার কাজের কথা লিখেছ—বিশ্বাস করো মুরারিদা ভাই, কাজটা আমার কাছেও সর্বস্ব নয়। তোমার মতো নির্মল যাঁরা তাঁদের ভালোবাসা পাব এইটেই আমার পরম কামনার। কাজের মধ্যে দিয়ে, নিজের সততার মধ্যে দিয়ে আমি তোমাদের ভালোবাসার যোগ্য বলে নিজের পরিচয় দিতে পারি, তাই কাজ আমার কাছে প্রিয়।

চিঠি লিখবো কি তারার বাচ্চা এয়সা হল্লা করচে কাছে আসবার জন্যে, কখন খাট থেকে পড়ে যায় সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি।

তুমি গৌরীকে এখানের ঠিকানায় চিঠি দিয়ো মুরারিদা, ও তোমার

কথা খুব গল্প করে। আমার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ো। মা তোমায় তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি চিঠি দিও।

২৮ এপ্রিল '৫৭
আন্ধেরি

তোমার পৌঁছোনর খবরের চিঠি পেয়েছি হপ্তা দুয়েকের বেশি হতে চলল, আর সেই থেকে তোমায় লিখি লিখি করছি, বিশ্বাস করো। কিন্তু কি লিখি বলো। তোমার কার্কি ত্যাগ ঘটনাটাই আজ অবধি আমার একমাত্র খবর। এ পাড়ায় কি অসভ্য রকমের গরম পড়ে তা তোমার জানা খবর। সারাদিন মেঝেয় গড়াগড়ি দিচ্ছি আর দুর্দান্ত সব ভ্রমণ কাহিনী পড়ছি। আফ্রিকা, সেণ্ট্রাল আমেরিকা এইসব।

কাজের মধ্যে সেই টিস্‌লার গিন্নির কর্ম সেরেছি গত হপ্তায়। আর ঘরে একটা দোলনা খাটিয়েছি গুজরাটিদের মতো। এটা সিধুর সখ। কিন্তু enjoy করছি আমি কম নয়। দোলায় চড়ে ভয়ানক অরণ্যে বিচরণ করে বেড়ানো যে কি আনন্দ কি বলবো। বইগুলি এত ভালো যে তোমায় কিনে পড়তে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। খুব সস্তা ১।০—১॥০ টাকার মধ্যে। Pan-Series-এর ১) Journey without Map—by Graham Green, ২) Children of the Jungle—by Per Host, ৩) Danger my Ally—Mitchell Hedges, Pelican Series-এর ৪) Elephant Bill—by J. H. Williams, ৫) Africa Dances—by Geofrey Gorer। এ সব কখানাতেই চমৎকার সব photos আছে, আর অত্যন্ত সুখপাঠ্য লেখা। বিস্তারিত ব্যাখ্যা দরকার নেই, পড়ে তুমি আশীর্বাদ করবে আমায় তা জানি।

রক্তকরবীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমার ধারণা এত ঘোলা যে তা চেপে যাওয়াই আমার পক্ষে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া। আরেক [বার] দেখে কি বুঝলে লিখো। এককালে মনে হয়েছিল আমার বেশ বুঝতে পারলাম, আজকাল রবিঠাকুরের হেঁয়ালীতে কেন জানি না ধৈর্য রাখতে পারি না।

এই সঙ্গে আদিবের 'অপরাজিত'-র আলোচনা পাঠালাম। গত হপ্তার আগের হপ্তায় হঠাৎ লিখে বসেছে। ভদ্দরলোক এর আগে আমায় যা বলেছিলেন এ তার একেবারে উল্টো বক্তব্য। ছবিটি কবে যে দেখতে পাব এবং কোথায় তা ঈশ্বর জানেন।

আমার দিন যে কি dull কাটছে তা চিঠি থেকে নিশ্চয় আঁচ করতে পারবে। একেবারে জনশূন্য তো বটেই। তারা এখন ১০।১৫ দিনে একবার আসে কি না আসে। এই গরমে বাচ্চাদের নিয়ে অসম্ভব কষ্ট হয়। গত হপ্তায় এসেছিল তোমার দেয়া শাড়িটি পরে, সত্যি খুব মানিয়েছে ওকে ও শাড়িতে। নিজেই বলছিল—white peacock। ওর ছোট্ট চিঠি তোমায় এই সঙ্গে দিলাম।

তোমার মালপত্তর বাকি সব পৌঁছেচে তো? চাকুরির কি সংবাদ? গরমে daily পাসিন্দরী করছ কি সুখে তা আঁচ করছি, এখান থেকেই দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে beer খেয়ো।

আজ এই অবধি থাক। চিঠি দিয়ো জলদি। তোমার বাবাকে আমার নমস্কার দিয়ো। আমার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ো।

৭

আন্ধেরি

৩১ জুলাই, ৫৭

আজ সকালে তোমার চিঠি পেলাম। অবাক কাণ্ড যে তুমি আমার এর আগের চিঠি পাওনি। যদ্দূর মনে আছে তোমার এ চিঠির আগের চিঠি পেয়ে বড় জোর হপ্তাখানেক দেরিতে সে চিঠি দিয়েছিলাম—বোধহয় মে'র মাঝামাঝি, তোমার বাড়ির ঠিকানাতেই দিয়েছিলাম। সেই থেকে তোমার চিঠির পথ চাইছি—আর গোপাল ভাঁড়ের। কারণ সে চিঠিতে তোমায় লিখেছিলাম এক কপি গোপাল ভাঁড় পাঠাতে—ও ব্যাটা আমাদের—মানে বাংলার—কয়েক জেনারেশনের পপুলার হিরো, ওকে নিয়ে puppet নাটক—প্রহসন করবার খুব ইচ্ছে চেপে বসেছে। তাই। প্রায় দুমাসের ওপর তোমার চুপচাপ দেখছিলাম চুপ করে। কি করে জানব পোস্টাল স্ট্রাইক আমার চিঠির ওপর দিয়েই দু-আড়াই মাস আগেই শুরু হয়ে গেছে। আশা করি এ চিঠি পাবে।—যদি এ চিঠি পাও তবে এক রবিবার ম্যাকবেথ দেখতে যাবার পথে আমার জন্যে এক কপি গোপাল ভাঁড় কিনে ফেলো—বটতলা প্রকাশক। তারপর বুক পোস্ট। যদ্দূর কল্পনা করতে পারছি—রাজা কেষ্ট চন্দর আর গোপালকে দিয়ে puppet নাটক জমবে ভালো। অবশ্যি হাগা-পাদার রসিকতাগুলোকে যথাস্থানে পরিত্যাগ করব।

—আগের চিঠির জের টেনে গোপাল ভাঁড় এনে ফেলেচি। কিন্তু ইতিমধ্যে বাবা মারা গেছেন। গত ১৯-এ বিকেলে, থ্রম্বোসিস। গৌরীর

টেলিগ্রাম পেয়েছি ২০-এ দুপুরে, যদিও ১৯-এই গৌরী ৫টায় টেলিগ্রাম করেছিল। তখনি হাতে টাকা থাকলে এতদিনে আমি মেদিনীপুরে কি কলকাতায়। পরে মা'র চিঠি পেয়েছি—যেতে বারণ করে লিখেছেন। টুনটুন আর ভগ্নীপতি—সম্ভবত মামাও, মা'র কাছে গিয়েছিলেন, বোধহয় এখনো আছেন। মা বা গৌরীর চিঠিতে বিস্তারিত কিছু নেই।

পিতৃ-সঙ্গ-সুখে আমি বহুদিনই বঞ্চিত তা তো জানোই। তবু এতদিন ঠিক বুঝিনি ঠিক কি থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। এখনো, শুধু মাঝে মাঝে অবর্ণনীয় কিছু একটা গলার কাছে ঠেলে-ঠেলে ওঠে। এই পর্যন্ত আমার কথা। মা'র কথা ভাবনা হয়। কিন্তু তিনিও লিখেছেন—'আমি একা চিরদিনই জানো তো।"—মা বড় শক্ত মেয়ে তা জানি—তবু ভাবনা হয়। একবার দেখে আসবার জন্যে মন খুব টানছে। দুর্ভাবনা কুমকুমকে নিয়ে। বাবা ছাড়া আর কারো সঙ্গে বনত না।—ভাবছি অগস্টের শেষ দিকে হপ্তা দুয়েকের জন্যে ঘুরে আসব। ভন্টুকেও আসতে বারণ করে লিখেছেন মা, লিখেছেন আমায়। তবু ভন্টু নিশ্চয় আসবে। তুমি যদি এসময়ে মেদিনীপুর যাও বোধহয় খুবই ভালো হবে। অন্তত আমি বিস্তারিত জানতে পারব তোমার চিঠি থেকে। অগস্টের ৭ কি ১০।১১ ছুটি আছে দেখছি ক্যালেণ্ডারে। যদি পারো এক বেলা মা'র সঙ্গে দেখা করে এসো। নিজে ভেবে-চিন্তে সংসারের ব্যবস্থা করা আমার তো ভাই যোগ্যতার বাইরে। তবু দরকার হলে কিছু করতে না পারি তাও নয়। মা লিখেছেন 'এসে কাজ নেই, ব্যস্ত হয়ে পথে বেরিও না।'—এর বেশি আমার নিজের বুদ্ধিতে কিছু আসছে না। শুধু মার জন্যে মন টানছে সব সময়।

টাকা পয়সার ব্যবস্থা শিগগীর হবে। দিল্লী চিঠি দিয়েছে হপ্তা দুয়েকের মধ্যে folio-র টাকা পাঠাচ্ছে। এছাড়া puppet-এর কাজের জন্যে Salaba যাবার আগে ব্যবস্থা করে গেছে, মাসে ১০০৲ টাকা পাব, ছমাস। আগামী হপ্তায় সে টাকা পাব। তবু আমার গিয়ে যদি এখন কারো কিছু কাজ না হয় তবে যেতে চাই না। বরং মাকে যদি একবার আনাতে পারি ঢের ভালো হয়। সেই কথা মাকেও লিখেছি আজ।

Salaba গত মাসের ২৭-এ চলে গেছে। যাবার আগে ২৩-এ puppet stage-টি আমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেছে। সেই থেকে নেশা ধরে গেছে puppet নিয়ে। ইতিমধ্যে নাটক লিখে ফেলেছি দুটো। এক নম্বর—শকুন্তলা। সম্পূর্ণ ঢেলে তিন দৃশ্যে সম্পূর্ণ, সওয়া ঘণ্টার ব্যাপার। শেষ দৃশ্য

সম্পূর্ণ আমার, প্রথম দু দৃশ্যে কালিদাসের সামান্য কিছু। দু নম্বর—এক অঙ্কের পনর মিনিটের প্রহসন।—শকুন্তলা এখন সম্ভব হবে না, বহু লোকজনের দরকার আর বহু পরিশ্রমের। আপাতত ছোট ছোট ১০।১৫ মিনিটের আর ৪।৬ চরিত্রের খেল নিয়ে তুষ্ট থাকতে হবে। পরন্তু বাক্‌সর্বস্ব রাখতে হবে, tricks বা action-বহুল সামলানো সম্ভব হবে না। দেখতে মন-মজানো puppets আর তেমনি dialogues—এ হিসেবে রাজা কেষ্ট চন্দর আর গোপাল ভাঁড় জমবে আমার ধারণা।—বিস্তারিত লিখে শেষ করা যাবে না। বহু কিছু নতুন শিখেচি-শিখচি।

সবচেয়ে অভাব লোকের। একার কম্ম নয়—team-এর দরকার, ছেলে-মেয়ে উভয়ই। লালারা committee গড়ে দিয়ে গেছে। আমার থিয়েটারের নাম রেখেছি 'খেলাঘর'। কমিটিতে সেই উট সরদ ছোকরা secretary। আর দুজন—দক্ষিণী—একজন ট্রেজারার—দ্বিতীয়জন ইঞ্জিনীয়র। ইনি কারখানা থেকে czech technic-এর পাপেটের শুধু ধড়, trunks with legs তৈরি করছেন, আমি মুণ্ডু জোগাব। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি গোটা পাঁচেক পুরো ছেলেমেয়ে পয়দা করে বসেছি! দেখলে খুশ হয়ে যাবে। পরে photo পাঠাব। এখনো ওদেশী প্রভাবে naturalistic puppets নিয়ে আছি। কিন্তু মাথায় নয়া চিজ গিজ গিজ করছে। দিশী কাঠের আর মাটির পুতুলকে puppetized করব। যায় শকুন্তলা অবধি। committee-র সঙ্গে লাঠালাঠি বাধবে প্রথমটা—তবু আইনত বা অন্যথা আমি dictator-এর আসনে কায়েম। আমি যাচ্ছেতাই করব মরবার আগে।

এখন যদি ঘরে আসো তবে স্রেফ অবাক হয়ে যাবে। পাপেট স্টেজটি ঘর আলো করে আছে, সেই RIN painting-টির ঠিক নীচেই। আমার সন্তান-সন্ততিরা বড় বড চোখ মেলে চেয়ে আছে যেদিকে চাও। তাছাড়া ঘরের ব্যবস্থাও বদলেছি অনেক। এখন আমি আমার kitchen বাক্সর ওপর স্টোভ বসিয়ে রাঁধি। ৬ ফুট × ৩ ফুট—স্টেজ আছে তবু ঘরে space-এর অভাব বুঝবে না।

তারপর মাঝে মাঝে বিকেলে পাড়া ঝাঁটানো বাচ্চাকাচ্চার পঙ্গপালের আক্রমণ। সিধু আনু যখন আসে তাদের তো কথাই নেই। নতুন রাজ্যে পৌঁছলাম বলে।

তারা দশ-পনর দিনে একবার আসে সিধু-আনুকে নিয়ে। বম্বের বর্ষা তো জানোই। তাছাড়া সিধু ইস্কুল যাচ্ছে। তারার প্রচণ্ড ইচ্ছে

puppet থিয়েটারে কাজ করে। বরাৎ ছাড়া কি বলব। ওদের শরীরের জন্যে ভাবনায় থাকি। তাছাড়া সিধু যা দামাল হয়েছে কি বলব। আনুও তৈরি হচ্ছে। হাঁটতে শিখেচে মানে পালাতে শিখেছে। তারা তোমার খবর জিগ্‌গেস করে। চিঠি পাই কিনা জানতে চায় এলেই।

সুখবরে মধ্যে, লিখেছিলাম কি, সর্দারগুষ্টি বিদের হয়েছে অন্তত বছর খানেকের জন্যে। নয়া সর্দার—সর্দারের চ্যালা সেই ষণ্ড, গোপাল ষাঁড়। পাড়া ফাটিয়ে রেডিও সিলোন চালায় সকাল থেকে রাত ১১টা ঠিক পাশের ঘরেই। আশ্চর্য এই যে puppet ষ্টেজে আসা অবধি একবার উঁকি মারেনি কত্তাগিন্নি কেউ।

মাঝে মাঝে মাছের বাজার ঘুরে আসি, কখনো কালবোস ওঠে, দেখি আর তোমার কথা ভাবি। কাবাব আনি নি একযুগ হয়ে গেল। সারা দুপুর হাতুড়ি করাৎ চালাই, পুতুলের হাত পা গড়ি আর তোমার চিঠি না পেয়ে দারুণ চটি। সন্ধ্যেবেলা সুঁচসুতো কাঁচি নিয়ে বসি, পুতুলের পোষাক করি আর তারার ওপর চটি। শেষ অবধি রাত ১।১॥০টায় শ্রান্ত হয়ে কিছু একটা রাঁধি, খাই, বাসন ধুই, মশারি খাটাই। টলতে-টলতে আলো নেবাই। ব্যাস। কিন্তু আজকাল শেষরাতে ৩টে নাগাদ ঘুম ভেঙে যায় আর ঘুম আসে না। কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

আজ এই অবধি রইল। তাড়াতাড়ি চিঠি দিয়ো। বুকভর ভালোবাসা নিয়ো। তোমার বাবাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার দিয়ো।

আন্ধেরি
৩ অক্টোবর ৫৭

তোমার চিঠি পেয়েছি আজ কদিন হতে চলল। এবার বাপু চিঠি দিতে বড় অস্বস্তিকর রকমের দেরি কৈরেছো। তা বেশ কৈরেছো। আজ তো যারে কয়—দশহরা, অর্থাৎ কিনা বিজয়া দশমী। তুমি আমার আলিঙ্গন ভালোবাসা নাও। তোমার বাবাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার দিয়ো। আরতি ভগ্নীকে আমার সস্নেহ আশীর্বাদ জানিয়ো—হঠাৎ মন বলছে আরতি বাপের বাড়ি এসেছে পূজোয়, সত্যি কি?

আজ সকালা প্যাস্‌টেল নিয়ে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকতে বেরুব ভেবে ভোর উঠে চ্যানট্যান করে ফিটফাট। কিন্তু আকাশের মুখ হাঁড়ি—সারাদিন।

তাই পড়শীর বাগান থেকে ঝুমকো জবার ফুল শুদ্ধু ডাল এনে চেককাট. গ্লাসের ফুলদানি সাজিয়ে একটা চলনসই প্যাস্‌টেল আরেকটা অতি বিশ্রী অয়েল করেছি এই রাত নটা অবধি। তারপর খাঁট পাকিয়ে হাত ধুয়ে তোমায় লিখতে বসেছি। একদিন খালি মনে হয়েছে, আহা মুরারি যদি এখানে থাকত, কিম্বা আহা আমি যদি মুরারির ওখানে থাকতাম।

তা বলে ভেবো না মনটা পূজো-পূজো উসখুশ করছে। বিশ্বাস করো, এ-বছর এ-যাবৎ শরৎকাল মালুম হচ্ছে না আমার চৌদিকে। মাঝে মাঝে আকাশ আষাঢ়-শ্রাবণ মূর্তি ধরছে, তবু ঝকঝকে দিনের দিকে চেয়েও অন্যান্য বছরের মতো এ-বছর মনটা চাঙ্গা হচ্ছে না। গত রবিবার এ পাড়ারই বুনো তল্লাটে গিয়ে সবুজ পাহাড়ের ওপর বন্য তালগাছের মিছিল এঁকেছি—নীল আকাশে সাদা মেঘের আর ধারালো রোদের নীচে। তার আগের রববার কুর্লারোডের ধারে বিহার লেকের দিকের নীল পাহাড় আর সবুজ ধানের দরিয়া এঁকেছি। কিন্তু অন্যান্য বছর পূজো-আসচে—পূজো-আসচে এমনি একটা অস্বস্তি মনে আসে এসময়টা। এ-বছর মনের মোক্ষ লাভ হয়েছে বোধ হচ্ছে। ধরো, শিউলি ফুলের গন্ধ। বাজার যাবার পথের ধারের মন্দিরের একপাশে অতি স্তিমিত গোছের একটি গাছে এক চিমটে শিউলি ফোটে সন্ধ্যেবেলা এসময়ে। গত বছরও মনটা ও জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছে। এবছর প্রকাশ ষ্টুডোয়োর ভাঙ্গা ছালের ধারে বটের অন্ধকারে সেদিন বেশ এক ঝলক শিউলি-সুরভির সঙ্গে নাক হোঁচট খেলো, কিন্তু অন্যদিনের মতো এবার আর মনটার ঘন্টায় বাংলা-বাংলা টান ঠনঠন করল না। হয় জাত গেছে আমার, নয় বুড়ো হয়েছি। ঐ দেখো বলতে ভুলছি—আমারি ঐ জানলার ওপারে কলা-নারকোল ঝাড়ের অন্ধকারেও কোথায় শিউলি ফুটছে এবছর। জানলার ধারে দাঁড়ালেই গন্ধ পেয়েছি একটু আগেও—এখন বোধহয় হাওয়া ঘুরে গেছে। কিন্তু ও শিউলি না কে তো কে। ব্যাপার ভালো নয়, নাকের আরেক প্রান্তে সাবেকি মনটার নিশ্চয় গেঁটে বাত। কোমরের জন্যে ক্রুশেন সল্ট খাচ্ছি, ফলও পাচ্ছি। মনের জন্যে কি করি কে বলবে?

অতঃপর শোনো। গতকাল সকালা দাদরের এক ওঁছা হৌসে 'অপরাজিত' দেখে এলাম। অতি সৌভাগ্যে টিকিট পেয়েছিলাম। তার চেয়েও সৌভাগ্যে তারা আর সিধুকে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। অন্তরের শত হস্ত তুলে সত্যজিৎ রায়কে আশীর্বাদ করতে করতে, আর সিধুর ডাক

ছেড়ে কান্না থামাতে থামাতে ফিরেছি। অপুর মা মরে গেছে শুনেই সিধু ডুকরে কান্না শুরু তারপর একেবারে howling আধঘন্টার ওপর। আমা হেন পাষণ্ডের চোখেও জল বেরিয়েছে তা শিশুর মন। কিন্তু হরিহরের মৃত্যুর পর অপু যখন জমিদারের পাকা চুল তুলছে তখন সিধু বলছে—অপু একবাবা মরি গেয়ো, আর এই বুঝি অপুর নতুন বাবা? !!! শিশু মনের কি হিসেব কে করবে? হলে বসে প্রতি মুহূর্তে আমি মুরারির কথা ভেবেছি, বিশেষ করে বারানসী অধ্যায়ে। আগামী সোমবার কিসের ছুটি। সেদিন সকালে আবার দেখাবে, অ্যাডভান্স টিকিট এনেছি একখানা বেশি। তারা আর আসতে পারবে না। তুমি আসবে তো এসো। হ্যাঁ,—আমার ভাগ্নেকে দেখলাম—বড় অপুর ভূমিকায়, বেশ করেছে, কি বলো? ছোট জন পথের পাঁচালীর অপু যে করেছিল তাকে কেন নিল না? এ ছেলেটি আড়ষ্ট। আর, ইন্দির ঠাকরুণকে খুব miss করেছি এ ছবিতে। আর—এ ছবিতে রবিশঙ্করের অবদানে বোম্বায়ের গন্ধ মাঝে মাঝে। যাই হোক এমন ছবি দেখে মনে হয় গঙ্গা চান করে ফিরছি সারাদিনের শ্রান্তি গ্লানির পর। তুমি লিখেছিলে পূজোর কদিন লাউডস্পীকার পীড়ার ভয়ে ইছাপুরের অফিসে ঘুমোবে। আমার দশা জানো? সর্দারগুষ্টি যাবার পর গোপাল ষাঁড়ের গিন্নি পাশের ঘরে রেডিও ছাড়েন ভোর থেকে আর তা আপনি বন্ধ হয় মাঝ রাতে! স্টেশন-রেডিও সিলোন, এ্যাসপ্রো লিজিয়ে—কা—হে ঘাবরাও—লাংঘারাম—আফঘান স্নো—লাল লাল গাল। প্রত্যহ একই চিৎকার বার বার। আর লাউড স্পীকারের চরমতম পর্দায়। মনে পূজোর আকাশ বাতাস আলো পৌঁছবে সাধ্য কি? অথচ বলতে গেলে মারামারি বাধাবে লিটেরালি।—আমার খবর এই অবধি থাক আজ। তুমি কি করে ছুটি কাটালে বলো। তুমি যদি কদিনের জন্যে এ সময়টা আসতে, রঙের বাক্স-পত্তর নিয়ে দুজনে লোনাওয়ালা খাণ্ডালায় কাটাতাম ছবি এঁকে। বহুদিনের পিপাসা এটি আমার। নিঃসঙ্গ যেতে মন হয় না আজো, যেন স্রেফ কাজের তাগাদায় যাওয়া। দুজন হলে সৌন্দর্য তথা তকলিফ ভোগ করা যায়।

এবার চিঠি দিতে দেরি কোরো না।

আমার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ো।

২৫ এপ্রিল '৫০
আস্কেরি

তোমার চিঠির পথ দেখছিলাম, আর আমার রাজপুত্তুরের নাটকটি বোধহয় ৬ বারের বার পুনর্লিখিতং করছিলাম। হপ্তা দুয়েক প্রায় রাত-দিন খেটেখুটে আজ দিন দুই আগে যবনিকা পতন করেছি। আগের চেয়েও অনেক স্পষ্ট হয়েছে মনে হচ্ছে। যাই হোক আর ওতে হাত দিচ্ছি না।

ইতিমধ্যে আমার নিজের টাইপ রাইটার হয়েছে, অবশ্যি second-hand, একটু নড়বড়ে তবু এখন একান্তভাবে আমারি। আহা শুধু আমারি। রবসন্-জন্মোৎসবের জন্যে ছবি এঁকে ২৫০৲ টাকা পেয়েছিলাম আব্বাস-বালরাজ & Co. এর কাছ থেকে, তারই দেড়শো পণ দিয়ে উটিকে ঘরে এনেছি। এনে অবধি ভূতের খাটুনি খাটাচ্ছি পরমানন্দে। কখন বেঁকে বসবে জানি না। বয়েস আঁচ করা যায় না, আওয়াজে অভিজ্ঞতার পরিচয় একটু বেহায়া রকমের, মানে রাত-বিরেতে প্রতিবেশীদের ঘুমের ব্যাঘাত করে। শুধু ঘন্টার শব্দটা যৌবনের শেষ দীর্ঘশ্বাসের মতো ক্ষীণ। বোধহয়, আমেরিকান বলেই আরো কিছু কাল টিঁকবে। তোমার চিঠিতেই প্রথম জানলাম বাংলার নববর্ষ গেল। নাম 'কোরোনা' (বিগত যৌবনা,—কিছু মনে কোরো না),—করুণা উদ্রেক করে তা ঠিক।

পল রবসনের জন্মোৎসব এখানে খুব ঘটা করে হপ্তা ব্যাপী হয়ে গেছে। হয়তো কাগজে পড়েছ, কলকাতাতেও কিছু হয়েছিল শুনেছি। এখনো এখানের কাগজে রবসন নিয়ে ঝগড়া চলেছে, anti-communist পুরোনো কাসুন্দি।

জন্মোৎসব কমিটি আমায় পল রবসনের ছবি করতে দিয়েছিলেন। ৭ ফুট উঁচু আর ১২ ফুট লম্বা এক ম্যুরাল ধরনের অয়েল করেছিলাম তিন দিন তিন রাত খেটে। প্রথম দিনের মিটিং-এ গেছিলাম—মন্দ দেখাচ্ছিল না জাহাঙ্গীর হলে।

তোমায় লিখেছিলাম কি, নতুন নাটক ফিঙে পাখীর গপ্পয় হাত দিয়েছি? এতে প্রায় ১৭টি কাঠপুতুলীর দরকার। দশটি আজ অবধি তৈরি হয়েছে। চোখমুখ রঙচঙও হয়েছে—পোষাক বাকি। খুব মজার হয়েছে, সব কটি সত্যি খুব মজার। আর একেবারে নতুন জাতের কাঠপুতলি। এমন কি চেক-বাবাজীদেরও তাক লাগাবার মতো। তেমনি simple। এখন

নাটক লেখা জুতসই হলেই বাজি মাৎ। খানিকটা লিখেছি বাংলায়, মূল নাটক বাংলায় লিখব, পরে হিন্দী ইংরেজি ভাবব। ঠিক করেছি। এতে বাজনা-টাজনার খুব দরকার হবে। বিখ্যাত তবলার ওস্তাদ নিখিল ঘোষ (পান্না ঘোষের ভাই) এসেছিলেন। খুব আগ্রহ তাঁর আমার কাঠপুতলীর বাজনা করে দেবার। এখন একটি খুব ভালো জাতের tape-recorder হলেই আমায় পায় কে।

ক্রমশ, খুব দ্রুত দেখচি পুতুল নাচের কল্যাণে এক নতুন ধরনের জীবন গড়ে উঠচে আমার জন্যে নতুন নতুন লোকজন ছেলেপুলের ভিড় জমচে। সরকার পক্ষ থেকেও খোঁজ খবর আসচে। এ সব খবর যদি বিস্তারিত লিখতে হয় তো মহাভারত লিখতে হবে। নিরীহ কাঠপুতলি এখন আমায় ভূতের মতো খাটাচ্ছে, দিবারাত্র বলা চলে। খুব exciting, তবু বাইরের সঙ্গে জড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে চাই না। আমার কাজের আনন্দ বাজার হাটের বাইরে নইলে জমে না। সঙ্গীর জন্যে সাথীর জন্যে বুক খাঁ খাঁ করে দিন রাত। ভিড় হৈ হল্লার জন্যে নয়। অথচ কাজের তাগাদা আসে নিজের রক্তের থেকে আর কাজ মানেই হাটের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া। এ এক অবর্ণনীয় অবস্থা।

ছবির ব্যাপারে আজ অবধি আমার বরাৎ সম্পূর্ণ আমারই বরাৎ থেকে এসেছে। মানে ভিড় নয়, দু চার দশজন বড় জোর, কেউ কাছ থেকে কেউ দূর থেকে আপন করে নিয়েছে, আমার শান্তিতে আমি থাকতে পেরেছি। কাঠপুতলির কারবার অন্য, ভিড় জমানোই এর পেশা। শুরু যখন করেছি, তখন ছাড়ব না তা ঠিক। তবু নিজেকেও বিকিয়ে দেব না তা নিশ্চয়। একটা সীমা রাখতেই হবে। তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি এখন।

অনেক কিছু লিখব ভেবে বসেছিলাম কিন্তু শ্রান্তি এসে পড়চে। কাল matinee show-এ 'The Bridge on the River Kwai' দেখে এলাম, —দেখেচো? খুব সুন্দর।

তারা প্রায় হপ্তা তিনেক হ'লো বাচ্চাদের নিয়ে ভাবনগর গেছে। জুনের মাঝামাঝি ফিরবে।

বুকভরা ভালোবাসা নিয়ো।

১০

২২ সেপ্টেম্বর ৫৮

গত হপ্তা দুই থেকে তোমায় আবার লিখি-লিখি করছিলাম। চিঠি পেয়ে তবিয়ৎ খুশ হল। আঁচ করছিলাম হয়তো চাকুরির চক্রে দিল্লী কি কলম্বো চর্কি পাক খাচ্ছ, দেখছি ইছেপুরেই নাকানি চোবানি গেল তোমার। বাবা কি তোমার কাছে থাকচেন, না কলকাতায়?

তোমার ছুটির Late News পেয়ে হুর্‌রা বলে চেঁচাতে ইচ্ছে হয়েছিল—কিন্তু চব্বিশ অক্টোবর অবধি অপেক্ষা করলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে তাই অপেক্ষা করে রইলাম। ইতিমধ্যে আমিও তোমায় লোভ দেখিয়ে রাখি—আজ সালাবা লিখচে—নভেম্বরে বম্বেতে প্রাগের এক বিখ্যাত কাঠপুতলি-দল-'রাদোস্ত'—পদার্পণ করবেন এবং আন্ধেরিতে খেলাঘরের খেল দেখতেও আসবেন। যদি রাদোস্তের বরাতে থাকে তবে তোমায় দিয়ে খেলাঘরের যবনিকা উত্থান-পতনের দড়ি টানাবো, এমন কি তোমার কণ্ঠস্বর ধার করবার আশাও রাখি।

আমার শরীর এখন ভালোই যাচ্ছে। দাঁতের ব্যথা অনেক আগেই সেরে গেছে। ডেন্টিস্ট-এর কাছে গেছিলাম,—বললে গোটা দুই ওপড়াতে হবে বলে সিবাজল দিলে, তাইতে দাঁত এমন ঘাবড়ে গেল যে তিন বড়ির পরই ঠাণ্ডা। ওপড়াতে হয় নি এখনো। আরেকবার ব্যথা হয়েছিল, এক মারাঠী ছোকরা আসে, সে বললে আকন্দর দুধ লাগাও। সত্যি যেন আগুনে জল পড়ার মতো ভীষণ যন্ত্রণা আধঘন্টার মধ্যে সেরে গেল। এখন এমন যেন কখনো কিছু হয়নি।

চিঠি দিতে বেশি দেরি কোরো না। তোমার চিঠি পেতে দেরি হলে—'আর কতো হাগ্‌ব, বাবা!' বলে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করে।

আজ দুপুরে বড় মজা হয়েছে। বেলা আড়াইটে নাগাৎ হঠাৎ সিধু একা এসে হাজির। ইস্কুল থেকে পালিয়ে ভিলেপার্লা থেকে ট্রেনে আন্ধেরি স্টেশনে, তারপর বাকি পথ হেঁটে। মজা বলছি বটে কিন্তু কি সাংঘাতিক ব্যাপার বোঝো। ওকে সঙ্গে নিয়ে তারার কাছে রেখে এলাম, কিন্তু আজ থেকে এক নয়া দুর্ভাবনায় পড়া গেল, ওর যা বয়েস তাতে ও না বোঝে আন্ধেরি না বোঝে পথ ঘাট, স্রেফ যেন নেশার ঘোরে বেরিয়ে পড়েছে। তারার মুখ তো চুণ। কি আছে ও ছেলের কপাল ভগবান জানেন।

তারাকে তোমার আসার আশার কথা বললাম আর বললাম, কলকাতা

থেকে কি চাও? বললে মুরারি যদি মুরারিকে নিয়ে আসে তাই প্রচুর ব্যাপার হবে। আমারো প্রায় সেই কথাই মনে হয়। আমি কিন্তু তোমায় যা আনতে বলতে পারতাম তা পুনা থেকে পাচার করাও স্বপ্নবৎ ছিল। আজ সে কথা চেপে যাওয়াই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।

হপ্তা তিনেক হতে চলল, তারা এবং খেলাঘরের দলবল নিয়ে প্যারেলের এক অতি মডেস্ট হাউসে 'পরশ পাথর' দেখে এলাম। প্রহসন হিসেবে বেশ ভালো লেগেছে। বিশেষ করে এদেশের ছবির রসিকতার অত্যাচারের তুলনায়। তবে 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত'র সত্যজিৎ রায়ের পরিচয় এতে ছিটে-ফোঁটার বেশি নেই, মাঝে-মাঝে খুবই ভারি আর বিবর্ণ। শেষ দিকে পুলিশ স্টেশনে ধন্মো কথার ভাঁড়ামি পরশুরামের বুড়ো কালের ভীমরতি হিসেবে ইন্টারেস্টিং, সত্যজিতের পরাজয়। সত্যজিৎ বলেই চার্লির মশিয়ে ভার্দু আর মার্ক টোয়েনের মিলিয়ন ডলার নোটের কথা মনে পড়ে, বিশেষ করে, চার্লি আর সত্যজিৎ পরস্পরের আঁতের বন্ধু শুনেছি। সত্যজিৎ এই গল্পকে আরো অনেক উঁচুতে টেনে তুলতে পারলেন না কেন জানি না। যা করেছেন তার তুলনা এদেশের ছবিতে, যদ্দুর জানি, নেই। কিন্তু সত্যজিৎ তো,—থাক। 'পরশ পাথর' মনে রাখার মতো কিছু নয়, এই আমার মনে হল। তোমার কেমন লেগেছিল?

কদিন হতে চলল গৌরীর চিঠি পেয়েছি। মা দাঁত আর কানের যন্ত্রণায় ভুগছেন। ইঞ্জেকশ্যনাদি হয়েছে, ফল হয় নি লিখেছে।

চিকু আবার সর্দি জ্বরে ভুগে উঠল। কিন্তু চিকু যে কি মিষ্টি কি হাসিখুশি আমুদে আর কি সুবোধ কি বলব। অবশ্যি দাদাভক্ত আর দাদার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠচে।

আমার খবর নতুন কিছু নেই। শুধু খেলাঘরের আকর্ষণে মাঝে মাঝে নতুন লোকজন আসে যায়। এ বছর শো দেওয়া শুরু করবার খুব সাধ হয় কিন্তু একদিকে সঙ্গী-সঙ্গিনীরা অতি মন্থর গতিতে এগোচ্ছেন। অন্য দিকে দরকার মতো খরচের টাকার টিকিটিরও কোনো দিকে দেখা নেই।

সালিবা ছোকরার সঙ্গে মাঝখানে খুব খিটিমিটি গেল খেলাঘরের ব্যবস্থাদি প্রসঙ্গে। শেষ অবধি রফা হয়েছে। কিন্তু পরিষ্কার জানিয়েছে যে প্রাগ থেকে আমার ছবির বাবৎ টাকা পাঠানো অসম্ভব—সরকারি কায়দায় (ওদেশের) বিদেশে টাকা চালান বেআইনি। যদি প্রাগে কখনো যাই ব্যাঙ্কে জমা আছে আমার টাকা প্রাগে খরচ করে আসতে পারব।

—অন্যদিকে হ্যারল্ডও ফোলিও বিক্রি করতে পারছে না, মাঝে মাঝে ফোলিও পাঠাচ্ছে ১০।২০ কপি করে। খেলাঘরের শো শুরু করতে পারলে দিন গুজরানের মতো টাকা উঠবে আশা করতে পারি—অন্তত বছর খানেক তো বটেই। —মোদ্দা কথা খোদার হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে দিব্বি আছি আর যা প্রাণ চায় করছি। আজ এই অবধি থাক। তাড়াতাড়ি চিঠি দিও। ভালবাসা নিয়ো। ইতি

গত হপ্তায় সিধুর জীবনের প্রথম ইস্কুলের পরীক্ষা হয়েছে হপ্তাব্যাপী। অনেক বিষয়ে সিধু ৮০।৯০ অবধি নম্বর পেয়েছে! নিজে অবশ্যি তার কিছুই বোঝে না, যেমন দামাল তেমনি দামাল।

১১

আন্ধেরি
৩০ নভেম্বর, '৫৮

তোমার চিঠির পথ দেখছিলাম, চিঠি পেয়েছি দিন চারেক হয়ে গেল। এখন আর বিশ্বাস হয় না তুমি এসেছিলে, ছিলে আমার কাছে, আর চ'লে গেছ। আজকের মতো দিনে বলতে পারি জীবন্ত জীবনে আর স্বপ্নে বড় বেশি ফারাক নেই।

গাড়িতে যে তুমি mass-contact-এ ভুগবে তা তোমার পাশে বসে গাড়িতেই বুঝেছিলাম। তাই সে সময় মেজাজ পুলিশ ইন্সপেক্টরের শ্রেণীর বর্বর রকমে বিগড়ে গেছিল। তারপর, বাইরের ক-মিনিটও আত্মস্থ হতে পারিনি, মানে, তুমি স্বর্গীয় রকমের ক'টা দিন এসেছিলে, আর সংসারের নিষ্ঠুর নিয়মে চলে যাচ্ছ—তা বুক ভরে জেনেও প্রাণভরে ভোগ করবার মতো করে স্বাধীন হতে পারিনি। সত্যিকারের নাইভ্ (অবস্থা বিশেষে বুড়বগ) মিশ্রজী আমার বাঁ-কানের কাছে অনবরত কি বগ্‌বগ্ করছিল মনে নেই, ওকে আহত না করার প্রাণপণ চেষ্টার সঙ্গে তোমায় বুক ভরে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। তুমি অসহায় ভাবে বড়ো বড়ো দুচোখ মেলে একদৃষ্টে আমার হতভাগ্য মুখের দিকে চেয়ে ছিলে।—

থাক—তুমিও মেয়েলোক (মানে, এদেশের) নও, আমিও নই।

ভিটি থেকে বেরিয়েই A3 limited bus পেয়েছিলাম মনে আছে। আর মনে আছে ঘরে এসে (খোদার অসীম কৃপায়) বেশ কিছুটা 'পিউর' পেয়েছিলাম। দশ দিন হয়ে গেল, তবু, বেশ মনে পড়ছে, তোমায় মনে মনে চিঠি লিখচি,—'স্বপ্নের মতো হপ্তা চারেক—দুপুর বেলা স্পষ্ট দিনের

আলোয়—নভেম্বরে—খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা ক্লান্ত মুখে শিশুর প্রসন্ন হাসি নিয়ে দাদরের স্টেশনে এসেছিলে, আবার হঠাৎ এক সন্ধ্যের ঝোঁকে ড্যাবড্যাবে চোখে আমার literally পোড়া মুখ দেখতে দেখতে করুণ মুখে চলে গেলে।—' সত্যি স্বপ্নের মতো কেটেছে দিন রাত তুমি এসেছিলে তাই, এত পরিচ্ছন্ন সুখ আর ব্যথা দুইই ভোগ করিনি, কারো সঙ্গে, বহু বহু দিন। আমি যে কত নিঃসঙ্গ তা আজ গত দুতিন সন্ধ্যোতে আবার বুঝতে শুরু করেছি।

তুমি যাওয়ার দিন দুয়েক পরেই খেলাঘরের খেল বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। রায়কে তো তাড়াতাম নিজেই, তার আগেই দুলাইন চিঠি দিয়ে নিজেই বিদেয় নিয়েছে। আর আসেনি—ভাগ্যিস। রায়ের ওপর অবিচারের গোঁ ধরে তর্পা দেবী আবার ন্যাকামি শুরু করেছিল। কথা গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত তিনি মনের কথা জানালেন—My individuality has no scope here'—!!! I always hated the role of that Champavati—!!! আরো সব যত রাজ্যের আবোল-তাবোল—aenemic frustrated spoilt child-এর প্রলাপ। তারপর ছলছল নয়নে 'Good bye'। আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। সার্পাকে ছুটি দিয়েছি indefinitely। তবু যতটা সহজে আজ এসব তোমায় লিখছি, ততটা সহজ হয়নি আমার খেলাঘরের ঝাঁপ বন্ধ করা। মাত্র দু চার দিন তবু কি জলেছি তা তোমায় না লিখলেও বুঝবে। আমার বুক ঢালা বন্ধুত্বের অপমান করল ওরা, আমার সব আশা সব পরিশ্রম, বহু আত্মত্যাগের অপচয় করল। অথচ মুখ বুজে সব সহ্য করা ভিন্ন আর উপায় কই আমার। এখনো জানি না এর পর কি করব খেলাঘর নিয়ে। আপাতত ভাবছি ছবি আঁকায় মন দেব। কিন্তু ছবি আমার যদি এরপর ভাঙাচোরা, অন্ধকারে ঘেরা, বিষণ্ণ আর ক্ষুব্ধ হয় অবাক হয়ো না। এ যুগে সরলতার, প্রেমের, সত্যিকারের মানবোচিত ঐশ্বর্যের, মানবোচিত আনন্দের আর বেদনার যে অপচয় অপমান—এমন কি ক্ষেত্র-বিশেষে নৃশংস অত্যাচার আর হত্যা—তা এ যুগের চরিত্রেরা বারবার যদি আমায় জানতে আর মানতে বাধ্য করে তবে তা আমার আত্মপ্রকাশে এড়াব কি করে? যা পেয়েছি তা সম্পূর্ণ স্বীকার করাই তো আর্টের justification।

কাল তারা এসেছিল সিধু চিকুকে নিয়ে। চিকু এসে মিনিট পাঁচেক তাচি তাচির পর জিগ্যেস করলো 'কাকা কাঁ গ্যো?' মানে তোমার কথা।

মিশ্রজী তোমার চেকের টাকা পেয়ে গেছেন বললেন। এখনো খুব কুণ্ঠিত চেক নিয়ে—বন্ধুর কাছ থেকে আগে ভাগে চেক নিয়ে টাকা দেয়া—মনের কথাটা তাঁর এই। মিশ্রজী আজ দিন চারেক হল puppet practice করছেন—কিন্তু আমি জানি তাঁকে দিয়ে বেশি কিছু হবার নয়।

তুমি যাবার দিন তিনেক পরে ঘর 'properise' করতে-করতে Kothari-র book-list পেলাম ঘরের কোণে। আর টেবিল গোছাতে গিয়ে পেলাম তোমার রেখে যাওয়া ৫০৲ টাকা দক্ষিণা !!! যা বর চাও তা দিতে রাজি। কিন্তু দুজনেই ভুলেছি তোমার বাবার জন্য সুতোর বোতাম। বাবাকে বোলো—আমার কপালে নেই আমার খেলাঘরের খেল তাঁকে দেখানো। তবে একদিন—যত শিগগির স্বচেষ্টায় পারি কলকাতায় যাব তাঁর সঙ্গে দেখা করা আর অনেক গল্প করার লোভে। তিনি আজকাল ডাক্তারখানায় বসছেন জেনে খুব ভালো লাগল। ওঁদের generation-এর physical আর moral vitality-কে আমি ঈর্ষা করি—সত্যি। ওঁরা যেন এদেশের খাঁটি সোনার শেষ reserve। আর আমরা এযুগের inflated বাজারের কাগুজে currency—প্রচুর প্রাণ দিয়ে যা কিনি তা নুন-তেল-কাঠের চেয়েও হাঁড়ি-হেঁসেল শ্রেণীর। তাই বোধহয় এযুগে tons আর kilowatts-এর পাল্লায় সভ্যতা মাপা আমাদের স্বর্গ-লাভের ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। তোমার-আমার-তারার কথা একটু আলাদা তাই the so-called Dr. Fryd-এর statistics গিলতে পারোনি। আর তাই তোমার বাবাকে আমার ঈর্ষা হয়। এখনো তোমার আমার তারার জাত যায় নি দেহে-মনে—যুগ-যুগান্তের মনুষ্যত্বের বিচারে যে-জাতের সহজ প্রকাশ মানব জীবনে।

আজ এই অবধি থাক। রাত হয়েছে কত বুঝতে পারছি না। বাস বন্ধ হয়েছে বহুক্ষণ। রাস্তার ওপারে সব্জির মাঠের ধারের গাছের অন্ধকারে লক্ষ্মীপ্যাঁচারা যা করছে তাকে সঙ্গীত বলা যায় না। তবু ছেলেবেলার কত কি যেন আবছা মনে পড়ছে। ঘুম পাচ্ছে না আদৌ।

লিখতে ভুলেছি—তুমি যাওয়ার দিন-তিনেক পরে একটি নয়া টেবল-ল্যাম্প কিনেছি—এঁ্যাকা-বঁ্যাকা করা যায় যেদিকে খুশি—দেশী—সস্তা, মাত্র স ছটাকা দাম তবু খুব সুন্দর। তারই আলোয় লিখছি, নরম আলো, সুস্বাদু ড্রিঙ্ক-এর মতো, নেশা লাগে লেখাপড়ায়। একা একা পিউর বিচ্ছিরি—এরই মধ্যে বার তিনেক স্রেফ ছেড়ে দিয়েছি—তবু নেড়িকুত্তার মতো ল্যাজ

নেড়ে ফিরে আসে সন্ধোর ঝোঁকে। খেতে না পেলে—মানে টাকা না থাকলেই—মরে পড়বে আপনি। যাক গে। এবার উঠে স্টোভ ধরাই।

ভালোবাসা নিয়ো। বাবাকে প্রণাম দিয়ো। তাড়াতাড়ি চিঠি দিয়ো।

১২ আল্জেরি,
১২ ডিসেম্বর ৫৮

কাল তোমার চিঠি পেয়েই, বটুকদার নয়া ঠিকানা দিয়ে তোমায় এক সংক্ষিপ্ত ইয়ার-লেটর ছেড়েছি। আজ এখন সকাল সাড়ে-সাত কি আট হবে। স্টোভে চায়ের জল বসিয়েছি, আর দুধের ওপর পুরু সর দেখে আজও তোমার জন্যে রেখে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কালকের পিউর আর সালাবার বন্ধুর চিঠির জবাব সব মিলে মাথার মধ্যেটা এখনো ঘোলাটে হয়ে আছে। জবাব এখনো শেষ করতে পারিনি—আজ দিন চারেক অনেক রাত অবধি কসরৎ করে যাচ্ছি। যত সহজ আর সংক্ষেপে—অবশ্যি ফাঁকি না দিয়ে,—শেষ করতে চেষ্টা করছি, তত সময় নিচ্ছে।

Q 1. What is your opinion about the situation of the present art in India ?

Q 2. How is the osganisation of the Indian artists ?

Q 3. What influences mainly the present art besides traditional influence of religion ?

Q 4. How is the place of used grafic art in building of your new society.— (হাতের লেখা আমার, কিন্তু ইংরেজি সালাবার।)

প্রশ্নের বহর দেখো। কাজেই আমার জবাবের বহর এই সাইজের কাগজের দুপিঠে single space type-এ ছ-পাতায় পৌঁচেছে, আরো কোনো না পাতা তিনেক টানবে।

আমার জবাবের মোদ্দা কথা এই রকম: (১) আমাদের আধুনিক আর্টের আর আর্টিস্টদের বর্তমান পরিস্থিতি খুব আশাপ্রদ, বিশেষ করে সম্প্রতি ভারত সরকারের নজর এদিকে পড়েছে। ইত্যাদি। (২) অনেক অর্গানাইজেশ্যন্ এদেশে আছে, তারা অনেক কিছু করছে কিন্তু তার খোঁজ-খবর রাখি না। আমার বিশ্বাস কোনো কালে কোথাও কোনো অর্গানাইজেশন্ গণ্য এবং মান্য আর্টিস্ট সৃষ্টি করে নি বা করতে পারবে না।

আর্টিস্ট হতে হলে ছবি আঁকাই এক মাত্র পথ। ইত্যাদি। (৩) যে-হেতু এযুগে দেশে দেশে যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ এবং বহুমুখী, কাজেই আমাদের দেশের আর্টিস্টদের ওপর জগতের নানান চিন্তাধারার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী এবং অতি বাঞ্ছনীয় হিসেবেই দেখতে পাচ্ছি,—সেই অবনঠাকুরের উগ্র ন্যাশনালিজমের কাল থেকে আজকের হুসেন, হেব্বার গুজরাল-দের ফরাসী আধুনিকতার সঙ্গে আঁতাত অবধি এ যুগের বিশিষ্ট আর বহুবিচিত্র ফসলেরই প্রতিশ্রুতিতে উদ্বেল। ইত্যাদি। (৪) এদেশে আজো গ্রাফিক আর্টস্ স্তিমিত দুর্বল, তার কারণ বোধহয় এদেশের আর্টিস্টরা প্রপাগ্যাণ্ডা ব্যাপারকে আমল দিতে চায় না। ইত্যাদি।

এই সব বক্তব্যকে যথাসম্ভব facts দিয়ে, amplify করে বলতে বসে গলদঘর্ম হচ্ছি। তবু মগজের ব্যায়াম হচ্ছে—মন্দ লাগছে না। এখন এ পরিশ্রম আমার বিদেশী বঁধুয়াদের মন পেলেই খুশি হব।···

···তোমার চিঠি আবার পড়লাম এখন। আবার চোখ ছাপিয়ে আসে —তার বেশি ভাষা জোগায় না। আজ এই অবধি থাক। বুকভরা ভালোবাসা নিয়ো।

আন্ধেরি ২৯ ডিসেম্বর ৫৮

তোমার চিঠি পেলাম। পাশের ঘরের রেডিওতে কিছুক্ষণ হল বারোটা বাজল। তারা, সিধু, চিকু আজ আসবে শেষ বারের জন্যে—পথ দেখছি। মাছ আর আলু ভাজচি (তার বেশি পয়সা নেই)—আর তোমার চিঠি পড়ে কাঁদছি। জানি না কেন, তোমার ইদানিংকার চিঠি পড়ে বুক এত মুচড়ে আসে। চোখের জল সামলাতে পারি না। বুদ্ধি দিয়ে কথা দিয়ে তো এর হদিশ পাইনে। আমার বুক তো সহজে মোচড়ায় না—চোখে জল বোধহয় তারাও দেখে নি—তুমিও বোধহয় দেখ নি। ঐ ওরা আসচে।

এখন রাত বোধহয় নটা কি দশটা জানি না, রাস্তা জনবিরল। মাঝে মাঝে শুধু এক-আধটা বাস—আর উন্মাদ বেগে ফিলিম ইস্টারের গাড়ি, আর অবশ্যি প্রতিবেশীর রেডিওতে জঘন্য কামার্তনাদ আর প্রতিবেশিনী ডাইনি বুড়ির লাউডস্পিকার নাতি-প্রেম চলেছে। আজ যদি আবার

পিউর এনে থাকি তবে খ্রিষ্টের নামে, 'বচ্ছরকার দিনে' ঈশ্বর নিশ্চয় আমার উপর প্রেম করিবেন ক্ষমা ভি করিবেন।

দুপুরে সিধু-চিকু পাগলাদের নিয়ে আর এক বোঝা চপাটি নিয়ে তারা এসেছিল—অন্তত কিছুকালের মতো শেষবারের জন্যে। আমার বরাতে কি আছে সেই দুশ্চিন্তায় বেচারীর চোখের জল অবধি শুকিয়ে যাচ্ছিল দেখছিলাম। শুধু তুমি এ জগতে বুঝবে ওর দুশ্চিন্তার কারণ আছে। একে তো টেকো বুড়ো পরকুপাইন। দুঝে, 'বোকা তুমি—টাকা earn করতে শিখলে না"—তারার ভাষায়। অথচ এই দুই মহাগুণের জন্যেই তোমায় আর তারাকে পেয়েছি এই নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জীবনে। তারা নিজের নানান দুঃখের অভিজ্ঞতার কথা বলতে-বলতে শেষ অবধি অসীম বিস্ময়ে বলে—প্রায়ই বলে—'যত সরলভাবে মিশতে যাই ততই ওরা অপমান করে, যতই মহত্ত আশা করে কাছে যাই ততই নীচতা দিয়ে ওরা বিচার করে, আশ্চর্য! বেশ জানি লাথি মেরে যদি চলি ওরা মাথায় তুলে নেবে তবু তা পারি না তো।' আজ ওর সেই সরলতার আর মহত্ত্বের দাম দিতে ও চলল এ পৃথিবীতে ওর যেটুকু আনন্দ তার থেকে নির্বাসনে। এ ঠিক তোমার চাকরিতে ফিরে যাওয়ারই হুবহু দ্বিতীয় সংস্করণ। এবং আমি ভুষণ্ডীর কাগ বিজ্ঞের মতো একা ঘাড় নেড়ে নিজেকে বোঝাচ্ছি—'এর কোনো চারা নেই, মশয়। এরই নাম দুই আর দুয়ে চার।'—থাক, বিজ্ঞতার বৃথা চেষ্টা। সিধু আর চিকুর চোখ-মুখ ভুলতে পারছি না। আমার মনে হয় সিধু পৃথিবীতে দুজনকে ভালোবাসে অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়ে—তারাকে নিজের সঙ্গী হিসেবে—তাচিকে আদর্শ বন্ধু হিসেবে। আমার মুখ গম্ভীর দেখলে—কিছু ছেলেমানুষি অন্যায় করার পর—সিধুর মুখ শুকিয়ে যায়। তারা যখন ওর নামে নালিশ করে আমার কাছে তখন সিধু কুণ্ঠায় লজ্জায় লাল হয়ে আড়ষ্ট হয়ে অসহায়ের মতো মাথা নোয়ায়—সত্যি আমার বুক ব্যথা করে তখন। আমার কাছ থেকে একটুখানি প্রশংসায় ওর ছাতি উঁচু হয়ে ওঠে। ছেলেমানুষ—হায়দ্রাবাদে হয়তো ভুলে থাকবে আমায়, কিন্তু তাচিকে ওর কত দরকার শুধু তাচিই আজ তা জানে। চিকুর শুধু শরীরের জন্যে ভাবনা আমার—তা তো বোম্বায়েও, যেমন হায়দ্রাবাদেও তেমনি। চিকুর বয়েসে তারা—'বা' (মানে মা) আর 'সুদু-ভাই'-এর সান্নিধ্যই প্রচুর, যদিও তুমি কাকা আর তাচি ওর ছোট জীবনের উচ্ছ্বাসের তীব্র প্রয়োজন—ওর নিজের মনের মতো খোরাক। সে দিক থেকে চিকু-

যা হারাবে তার ব্যথা তো আমার জন্যেই আজ। সারা হপ্তায় কয়েক ঘন্টার জন্যে চিকুর তাচি-তাচি-তাচি-র মধ্যে চিকুর যে সুখ তা চিকু কোথায় কার কাছে তা পাবে? অবশ্যি চিকু বয়েসের আশীর্বাদে এই ক্ষতি জানবে না। সিধু জানবে। আর আমি জানি তারা কাঁদবে। সিধুর দিকে চেয়ে কাঁদবে চিকুর দিকে চেয়ে কাঁদবে। এমন দিন ছিল যখন তারা আপনার দরকারে—গভীরতম দরকারে—চিত্তকে ভালোবাসত। আজ তারা সিধু আর চিকুর দরকারে—সন্তান দুটির গভীরতম দরকারে চিত্তকে ভালোবাসে। আজ বলছিল তারা—'যেতে আজ আর ইচ্ছে করছে না। তবু কেন যাচ্ছি জানি না।' চিকু সিধু কেউই ফিরে যেতে চাইছিল না। চিকু শুধু বলতে শিখেছে—'না যাবো না।' সিধু নানান্ অছিলার দোহাই দিয়ে শেষ অবধি তারাকে বলেছিল—'আমি তাচির সঙ্গে থাকব। তুমি চিকুকে নিয়ে যাও গে।' আর তারার কথা লিখতে যদি পারতাম তবে বাল্মীকির চেয়ে বড় মহাকবি হতে পারতাম।

আর নিজের কথা এর পর কি লিখব ভাই,—সবার চেয়ে বড় সাজা—চিঠি লিখতে পারব না তারাকে। এ সাজা আমার চেয়েও তারাকেই পেতে হবে বেশি করে—তা তুমি বুঝবে। ওরা চলে গেল, চিকুর শেষ হাতছানি, সিধুর বাই-বাই তাচি—তারার ম্লান হাসি বাসের ভিড়ের মাঝ থেকে—সব চোখে-মুখে মাখিয়ে ঘরে ফিরে এসে কি এক জলন্ত ক্ষোভে স্থির পিদিমের শিখার মতো জ্বলছে। কিন্তু কার ওপর ক্ষোভ করব? যাজ্ঞিক-এর কোনো অপরাধ নেই আমার কাছে। আমি মমতাময়ী তারার ওপর? আমার অসাধ্য। নিজের ওপর? কোনো কারণ কোনো সদ্-যুক্তি নেই। সমাজ? আজ অবধি বিশেষ করে তারা প্রসঙ্গে সমাজের মাথায় দুই চরণ রেখে আকাশ-সূর্যির সঙ্গে কোলাকুলি করে চলেছি। তবে ক্ষোভ কার ওপর? জানি না ভাই, শুধু দেখছি, পুড়ছি। বহু ঐশ্বর্যের আশীর্বাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একা নিঃস্বের মতো পুড়ছি। কোনো যুক্তি কোনো সান্ত্বনা নেই—এ এক পাশবিক মর্মপীড়া—কারো বিরুদ্ধে কোনো নালিশ তুলে নিজেকে বিশ্রাম দিতে পারছি না। এত কথা লিখছি শুধু এই বলবার জন্যে যে আজ আরেকবার আমি সত্যি সত্যি বোবা। তোমার সত্যিকারের আত্মার আত্মীয়। তোমার শোক যে বজ্রের চেয়েও নিষ্ঠুর আর অপ্রত্যাশিত তার তীক্ষ্ণ আভাস আজকের মতো দিনে সব চেয়ে স্পষ্ট আর রক্তাক্ত বুকে বুঝতে পারছি ভাই। আর বিশ্বাস কর আমি বোধহয়

তোমার চেয়েও দুর্বল, তাই তোমার আশ্রয়ে আমার বুক খুলে দাঁড়াতে পারছি।

তোমার কাছে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে খুবই—আর তা আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক, কারণ তুমি তো জানো তারার পাশাপাশি তুমি ছাড়া আর আমার বলতে আমার কেউ নেই এ দুনিয়ায়। আমার গোঁয়ার আর সত্যিরুগ্ন চরিত্রের গুণে আঘাত করেও দুঃখ দিয়েও যাদের ভালোবাসাকে নিবিয়ে দিতে পারি নি এ দুনিয়ায় সে শুধু দুটি মানুষ—তুমি আর তারা। আরো জানি কি ব্যাকুল আগ্রহে তুমি আমায় তোমার কাছে যাবার জন্যে আশা করে লিখেছিলে এর আগের চিঠিতে। তবু ক্ষমা করো ভাই, আমার আজ আর শক্তি নেই,—অসীম লোভ মানে—পিপাসা সত্ত্বেও—এখান থেকে বাইরে বেরোবার mental energy নেই। দিনের পর দিন কাটছে, খুঁটিনাটি যা কিছু জানি করে যাচ্ছি, নিজেকে ব্যস্ত রাখার দরকারে—তাই যথেষ্ট, তার বেশি ভাববার শক্তি আমার আর নেই। এ আমার আত্মকরুণার ছেঁদো কাব্যি নয়। সত্যি বড় শ্রান্ত আমি, মুরারি ভাই আমার, নিজের মনের কাছ থেকে ছুটি আজ একমাত্র তৃষ্ণা আমার। শুধু তারা সিধু চিকু আজ চলে যাচ্ছে তারই জন্যে নয়। জীবনকে ভালোবাসার দাম দিতে নিজেকে বড় বেশি ক্ষয় করতে হয়েছে তাই নিজেকে বাঁচাবার উৎসাহ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। অপাত্রে নিজেকে প্রায় নিঃস্ব করে ঢেলে দিয়েছি বারবার—মা এ নিয়ে প্রচণ্ড নালিশ করেছেন অনেকবার। আজ সুপাত্রে দেবার যতই থাকুক physical energy-তে ভাঁটা পড়ে এসেছে—অবশ্যি তোমার আর তারাকে চিঠি লেখা ছাড়া। শুধু শেষ চেষ্টা করতে চাই, যদি পারি, ছবির একজিবিশ্যন করতে এ বছর। বোধহয় ছবি আঁকতে পারব—বুক ভরে সুখ-দুখ-এর ঐশ্বর্য যা পেয়েছি তার কণা মাত্রও যদিও আঁকতে পারি যথেষ্ট। কিন্তু সহুরে হিসেবে সার্থক একজিবিশ্যন করার বিদ্যে অন্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে সালাবা-হেন দোস্তের দরকার বা হ্যারল্ড। কিন্তু থাক সে ভাবনা। তাগদ যা অঙ্গে আর মনে আছে—বাকি তা দিয়ে ছবি আঁকি যতদিন পারি এই আশীর্বাদ করো ভাই, আর যদি পারো আবার এসো এসো এসো—তাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, বুকভরা পুরস্কার, মানব জগতের কাছ থেকে। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমার নগ্নতাকে সইতে পারে তারা আর পারো তুমি, এ দুনিয়ায়। আর, আমি পারি না, জানি না মুখোস পরে চলতে। তাই তোমার আর তারাকে বারবার কাছে পাওয়ার

মধ্যে আমার এত তৃপ্তি যে কথায় তা বোঝাতে পারব না।

তোমার এ চিঠি আমার greeting কার্ডের সঙ্গে পথে পাশ কাটাকাটি করেছে। আজ তুমিও নিশ্চয় আমার সে চিঠি, তারার চিঠি সমেত, পাবে। তোমার শরীর খারাপ যাচ্ছে জেনে ভালো লাগছে না—ছুটো দিন—ঠিক চিকুর মতো তুমিও ভালো থাকো না, একটা কিছু বিহিত করা কি সম্ভব নয়? এ্যাণ্টি হিস্টামিন—বা অন্য কিছু, আজকাল তো নিত্য নতুন ভালো ওষুধ বেরোচ্ছে। শরীরের যত্ন নিয়ো ভাই—এবিষয়ে তোমার আলসেমি আছে জানি।

ইতিমধ্যে আমার সেই নড়বড়ে দন্তটি খসেছেন—ফাঁকা জায়গাটায় মাঝে-মাঝে দার্শনিক ভাব এসে ঘুরে যাচ্ছে। সে-ভাবের ঘোরে টাকে হাত বুলোই।

বাবাকে রাদোস্ত দেখালে কি? কাইনারোভাদের সঙ্গে দেখা করেছিলে কি? C L T-তে ব্যবস্থা হয়ে খুবই ভালো হয়েছিল নিশ্চয়, আশাকরি ওরা ওদের 'তুড়ুনেক' প্লে দেখিয়েছিল—এখানে সে প্লে ওরা করে কি—ও প্লেটি ছোটদের জন্যে আর রাদোস্তের খ্যাতি ছোটদের প্লের জন্যে।

সালাবার বন্ধুকে চিঠি দিয়েছি—আজ তোমার চিঠির সঙ্গে সালাবার greeting card পেলাম, চিঠি পাই নি। তোমায় লিখেছি কি—হ্যারল্ড লিখেছে ওরা আমেরিকায় ঘটা করে রবিঠাকুরের শতবার্ষিকী করছে। এ খবর দিয়ে বটুকদাকে greetings পাঠিয়েছি।

আজ এই থাক। আমার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ো।

১৪

আন্ধেরি, মে ৩০, ১৯৫৯
বিকেল ৪-৩০

পরশু তোমার পোস্টকার্ড, আর আজ সকালে তোমার ৫০\ M.O., আর ঘন্টাখানেক আগে তোমার কণ্ঠস্বর-ভরা চিঠি পেলাম। আজ আমার ফুর্তির অন্ত নেই।

তবু প্রথমেই তোমার কাছে ক্ষমা না চেয়ে আর-কোনো কথা শুরু করতে মন সরছে না। অবস্থা বিশেষে আমি বোধহয় বহু গর্দভের চেয়েও বুদ্ধবগ বনে যাই,—তাই তোমায় নিজের অজ্ঞাতেই তোমার দুঃখ দেওয়ার মতো কিছু লিখে বসেছি। আসলে, আমার বহুবার মনে হয় যেন এ পৃথিবীতে এসে সবার কাছে যত প্রেম যত ঐশ্বর্য পেয়ে গেলাম তার কণা

মাত্রও কারোকে দিয়ে যেতে পারলাম না, শুধু কথার বোঝা দিয়ে আমার অন্তরের সরল স্বীকৃতিটুকু ছাড়া। আর কী বা দিতে পেরেছি কাকে?—আসলে এই ধরনের depression এর মুখে বোধহয় তোমায় তেমনি কিছু লিখেছিলাম। তবু এ কোনো কাজের excuse নয় তাও জানি। তাই তোমায় বুকে জড়িয়ে ধরে তোমার ক্ষমা চাইছি। তুমি যা কিছু পেয়েছ আমার কাছে তা তোমারই আপন হৃদয়-মনের আপন আবিষ্কার আমার মধ্যে, তাতে তুমি যত তৃপ্তি পেয়েছ আমিও ততোই তৃপ্ত হয়েচি।—কথায় এসব কথা কি বলা যায়? তোমায় দুঃখ যতবার দিযেচি, ততবার নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি তা তো তুমি জানো। তুমি যদি সত্যি cactus হতে তবে আমার বাবার বাবার বাবার সাধ্যি ছিল কি তোমার বুকে ফুল ফোটাতে? তোমার কোমলতার ওপর বুক রেখেই তো ভাই আমার কর্কশতাকে শান্তি করতে পাই, তাই তো তোমাকে বুকে আঁকড়ে আছি। সব সময়ে। তুমি আর আমি এ জীবনে যত প্রেম মাধুর্য্য পবিত্রতা পেয়েছি তা মরুযাত্রাপথেও দুজনের আস্বাদ শুকিয়ে যায় নি বলেই, দুজনে মিলে এ বিশ্বের সব বিষাদ সুখ-দুঃখের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহচর বলে চিনে নিতে পেরেছি। এই আত্মীয়তা, কথার সীমার বাইরে, অনির্বচনীয় সুখ-দুঃখ-শোক-শান্তি দিয়ে গড়ে ওঠা, ফুটে ওঠা দুই আত্মার আত্মীয়তা। তাই যেদিন তুমি আমায় হারাবে, জেনো আমি তোমার যোগ্য নই। আমি নিজেকে যদি না হারাই, তবে কখনো তুমি আমায় হারাবে কেমন করে?

তোমার হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, হরিদ্বার আর সব জ্বালা-জুড়োনো স্নান-পুণ্য-কথা পড়ে তোমার পায়ে পেন্নাম ঠুকতে ইচ্ছে হচ্ছে দাদা। একা-একা পুণ্যি করে এলে, বর দাও দিকিনি, এই অঁাধেরির অঁাধার কুঠরির মায়া কাটিযে একবার যেন কিছু কালের, mind you, 'কিছুকালের' জন্যে ঘুরে আসতে পারি। কিন্তু তোমার ঐ দেড মাসব্যাপী godowns আর stores-এর অন্ধকূপে তপস্যা থেকে ফাঁকি দিলে কি শ্রীহরি আমায় দয়ামায়া করবেন? —সত্যি, ইয়ার্কি থাক,—আমার এখন এখানে অসহ্য অসহ্য অসহ্য লাগছে। তবু নিজেকে amused রাখতে পারি না তা নয়। বেরুবার জন্যে প্রাণপাখি পাঁজরায় মাথা কুটে রক্তাক্ত হচ্ছে দিবারাত্র।—না, কলকাতা নয়। অরণ্য পর্বত, অচেনা সহর গ্রাম, জনশূন্য প্রান্তর, কি করে বোঝাবো বলো। ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম,—রবি বুড়োর ভাষায, উধাও হতে চাই। তবু 'জড়ায়ে আছে বাধা'—রোজ আরো পাকে-পাকে জড়াচ্ছে, প্রিউর

টেনেও দম বন্ধ হয়ে আসে। ছবি অঁাকতে গেলে নিজের সীমাকে আরো বেশি করে দেখতে পাই, নিজেকে হারানোর বদলে, নিজের ছায়ার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেই হাঁপিয়ে পড়ি যেন। থাক।

শোনো, আমারি ভুল হয়েছে বোধ হচ্ছে। এলাহাবাদে খুব সম্ভবত তোমায় লিখিনি, কানপুর আর জবলপুরে আর শেষ চিঠি ইশাপুরে তোমায় লিখেছি, আর তুমি তিনটি চিঠিই পেয়েছ। যাই হোক, ভুলে যাও।

আর শোনো, Corbet যদি আমার Elephant Bill তোমার চিঠির পরও না পাঠান তবে তাঁর Burkwhite-এর বইটি সোজা আমায় পাঠিয়ে দিয়ো। That will be quite reasonable in every sense। তাঁর নিজের বই সম্বন্ধেও যদি তাঁর প্রেম হিজড়ে-জাতীয় হয় তবে তিনি অপরের 'সস্তা' pocket edition সম্পর্কে নিশ্চয়ই ইয়ে। চিঠি দিয়ে হপ্তা খানেক সময় নিয়ো, তারপর Burkwhite আমায় পাঠিয়ে দিয়ো, আমি বত্তে যাবো। Elephant Bill জোগাড় হয়ে যাবে।

তুমি যে Dr. Zhivago পড়ে মুগ্ধ হবে তা জানতাম। Pasternak-এর latest—'The Last Summer' এনে ফেলেচি সেদিন। তার আগের বই—'Essays on Autobiography'-র দাম দিয়ে book করে এসেছি—বোধহয় আগের হপ্তায় পাব।—Hurrrrrrah! Hurrrrah! Hurrah! অর্থাৎ প্রাগ থেকে এ হপ্তায় ৮৫০৲ এসেছিল। তা থেকে কাদ্রিকে ৫০০৲ দিয়েছি। বিমলের ছোট ভাই মুকুল ২৩০৲ নিয়েছে দেশে যাবে বলে। বাকি খেলা-ঘরের খেলার উন্নতির জন্যে গেছে। আমার ফৌত হবার দশা, এমন সময় তোমার পাঠানো ৫০৲ এলো। তার কত যে পিউরে খাবে তা বলা শক্ত।

ফণি মজুমদার কেটে পড়েছেন। কারণ, সলিল আর বিমল আর সবাই বিমল রায়ের পক্ষে আর মজুমদার ঠাকুর বিমল রায়ের বিপক্ষে। আরো কয়েকজন যারা বিমল রায়ের বিপক্ষে, তারা এখন ফণিবাবুর স্বপক্ষে। ফণিবাবুর ভয় যে, তিনি খেলাঘরের জন্যে টাকা ঢালবেন আর বিমল রায় ফয়দা ওঠাবেন। কথাটা সরাসরি আমায় বললে, আমি নেমকহারাম নই তা বোঝাতে পারতাম। কিন্তু নানা সূত্রে ব্যাপারটা গত দুদিনে জানতে পেরেছি।—অন্যদিকে বিমল রায় সত্যিসত্যি যে খেলাঘরের জন্যে কিছু করবেন তা আমার আজো বিশ্বাস নেই। আর বিমল রায়কে না পেলে সলিলও সম্ভবত কিছুই করবে না। শুধু personal help time to time—

ছাড়া। আমি এখনো ভাবছি। কিছু ঠিক করি নি। খুব সম্ভবত এ বছর খেলাঘরের show সম্ভব হবে না। আসল কথা, সত্যিকারের patron ছাড়া, film people দের কারোকে দিয়ে সত্যিকারের artistic কিছু গড়ে তোলা এ দেশে আজো সম্ভব নয়। speculators দিয়ে art হবে না। তোমার বাবা লিখেছেন—রুই কাতলা। কিন্তু এরা আসলে হাঙর কুমির cum পাঁকাল-চ্যাং। অর্থাৎ ছেঁদোস্য ছেঁদো।—যাক গে—যাক গে—যাক গে। শুধু সত্যজিৎ বেঁচে থাক—আমাদের জীবনে যথেষ্টরও বেশি সে।

ধবিকে বই যদি পাঠাও ও যে কী খুশি হবে তা জানো না। আজ সন্ধ্যেবেলা আসবে। তোমার চিঠির কথা বলব। রোজ জিগ্যেস করে। অমন অনাবিল পবিত্র তেমনি তীক্ষ্ণধী ছেলে এখানে তো আজো পাই নি ভাই। আর যাদের দেখছি আজ-কাল তারা প্রায় more or less দো আঁসলা। মনে মুখে অজস্র গরমিল।

সুসংবাদ—তারা এসেছে! এসেছিল একদিন—বসুকে নিয়ে। ভায়ের বিয়ে নিয়ে মহা ঝামেলায় আছে। তবু এসেছিল !!!!!! বোম্বায়ে আর দিন সাতেক থাকবে—কর্তা সঙ্গে আছেন—। আসবে অন্তত একদিন সিধু চিকুকে নিয়ে বলে গেছে। The real story of life is, simultaneously, a great joy yet a great sorrow, yes brother, it is just like that some how.

বিকেলে চিঠি লেখা থামাতে হয়েছিল। মুকুলেরা সিনেমার টিকিট নিয়ে এসেছিল, Walt Disney-র 'Perry'—কাঠবেড়ালি নিয়ে semi-documentary—অপূর্ব ছবি।—এখন রাত ঠিক একটা। চান করে এলাম তবু ঘুমের দেখা নেই। হাওয়া বইছে, নারকেল পাতার গুঞ্জন শুনছি, জানলার পর্দা নৌকোর পালের মতো tense, খুব ভালো লাগচে আর খুব একা লাগছে। তুমি কাছে থাকলে সারা রাত গল্প করতাম। চিঠি লেখা কিন্তু তোমারো যেমন আমারো তেমনি,—বাধা পড়লে খেই হারিয়ে যায়। অতএব বোধহয় শুয়ে পড়াই এখন শ্রেয়, অন্তত আমার কটিদেশ আর বাম-পদটিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে।

আজ রবিবার। এইমাত্র স্নানাদি সেরে, একটু চরণামৃত চেখে দেহে-মনে পবিত্র হয়ে বসেছি। প্রথমেই দেহতত্ত্ব দিয়ে শুরু করি। আজ অবধি নানান ডাক্তার নিয়ে আমরা সবাই আলোচনা আর বহু রেজল্যুশন পাস করেছি,

কিন্তু আমি স্বস্থানেই সশরীরে বর্তমান আছো। ইতিমধ্যে নিজেরই নেতৃত্বে নিজের দাওয়াই বার করেছি—তার নাম ক্রুশেন সল্ট। রোজ খাচ্চি, ব্যথা পনরদিনে বেশ কমে গেছে, পা প্রায় সোজা করে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে পারি। যা বাকি আছে তা গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিছুকালের মধ্যে সেরে যাওয়া অসম্ভব নয়।

আজকের কাগজে পড়লাম,—সোভিয়েত রাইটার্স কনফারেন্স ঘনিয়ে আসছে। নোভিমির-এ সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে তুবড়িবাজি চলছে। কিমাশ্চর্যম্, —এরেনবার্গ বলছেন—'Chekhov was a boundlessly free artist who firmly rejected the yoke of ideology'. আবারো—' Chekhov attained his greatness and still holds generations of Soviet and Western readers spell bound because, as an artist, he recognised no master but his own heart,' and so on। অবশ্যি Pasternak প্রসঙ্গ আছো যে তিমিরে সেই তিমিরে। এরেন-বার্গের Self defence তার Thaw নভেল নিয়ে।—যাই হোক বিস্তারিত জানি না, শ্যামলালের কাছে যেতে পারিনি এবছর এখনো।—তবু সহজ লক্ষণ মনে হচ্ছে। সেদিন কাদ্রির কাছ থেকে W.G. Archer-এর নতুন বই 'India and Modern Art'—এনেছি। ভদ্রলোক এদেশে বহুকাল ছিলেন রবিঠাকুরের কালে। এদেশের art সম্বন্ধে তাঁর দরদ আর সাধনা Verrier 'Elwin-এর Indian tribal civilisation-এর সমতুল্য, মানে অন্তর্দৃষ্টিতে, নিপুণ বিচারে। লেখা প্রায় মুল্‌কের মতো too much talk, তবু জাত হিসেবে তোমার-আমার মানুষ। অবনঠাকুর, রবিঠাকুর, অমৃত শের গিল, যামিনী রায় আর জর্জ কীট—এ-কজনের চিত্রচর্চা নিয়ে উচ্ছ্বসিত অথচ চুলচেরা আলোচনা এ-বয়ে। মাপকাঠি হচ্ছে, এদেশের নয়া আর্টিস্টরা এদেশের আধুনিক জীবনকে (ব্যক্তিজীবন—রবিঠাকুরের ক্ষেত্রে)—আর সমাজ-জীবনকে—(অন্য সবার ক্ষেত্রে), modernised traditional idioms-এর মাধ্যমে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের রঙে-রসে সিদ্ধ করে চিত্ররূপে রূপ দেওয়ার চেষ্টায় এ-কজন অগ্রদূত, আর এঁরা যে কতদূর সার্থক কতদূর ব্যর্থ হয়েছেন। অবনঠাকুরের সার কথা,—'Art and Revivalism', রবিঠাকুর—'Art and the Unconscious', অমৃত শেরগিল—'Art and Village', যামিনী রায়—'Art and Primitive', জর্জ কীট—'Art and Romanticism'.

অমৃত শেরগিল অবধি এসেছি। এ ধরনের বিচার বা লেখা এদেশের পুরো art জগত সম্বন্ধে আর আগে পড়িনি। বহু কথা আমার বহুদিনের অাঁতের কথা। Archer-এর নাম শুনে এসেছি বহুকাল থেকে, ওর কিছুই পড়িনি আগে। আফশোষ। লেখক যেমন factual, scrupulously factual, তেমনি poetic, শুধু একই কথা বারবার বলার mannerism হয়তো নিজের মত সম্বন্ধে Self-conscious defensive situation-এর অভিব্যক্তি। তবে Charming and most inspiring and convincing। পড়তে চাও তো বলো, আমার পড়া হলে পাঠিয়ে দেব। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন, অবনঠাকুর থেকে শেরগিল অবধি নিজেরই অজ্ঞাতে আমিও সব phases পার হয়ে এসেছি ছবি অাঁকার মূল দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান পতনের দিক থেকে। সত্যি বলছি। অবশ্যি অমন গোছানো তত্ত্বকথা বা direct and clear cut intellectual formulations ইত্যাদি আমায় দিয়ে কখনো সম্ভব হয়নি, হবেও না তা জানি। আয়না ছাড়া নিজের চেহারা দেখা যায় না। art critics তো artists-এর আয়না। তারই মতো Archer-এর এ বয়ে আমার কাজের রূপ যা; তার পুরো —স্পষ্ট বা কোথাও অস্পষ্ট—back ground দেখতে পেলাম বোধ হচ্ছে। —এক কথা, এদেশের তথা সব দেশের আধুনিক আর্ট সমঝদারির পথে বইটি is a must !—

থাক আজ এই অবধি। মিশিরজী এসেছেন। অন্যমনস্ক হতে হচ্ছে। বুকভরা ভালোবাসা নিয়ো। তাড়াতাড়ি চিঠি দিয়ো কিন্তু। তোমার স্কুটারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। আহা—এমন দিন সত্যি হবে কি ?

১৫

আল্কেরি, জুন ২৬, ১৯৫৯

রোজ তোমার চিঠির পথ চেয়ে বাইরে বারান্দায় বসে থাকি। ডাক পিয়ন চলে যায়। কেন চুপ করে আছো ? কি নিয়ে এত ব্যস্ত ? আমার গত চিঠি দিয়েছি প্রায় মাস খানেক হতে চলল না কি ? পেয়েছ তো সে চিঠি ? চিঠি লিখছ না কেন ?

পথ চেয়ে থাকাই এখন আমার একমাত্র কাজ দাঁড়িয়েছে ভাই। তোমার চিঠির পথ চেয়ে থাকি। ফণিবাবুর পথ চেয়ে থাকি। সলিলের পথ চেয়ে থাকি। তারার চিঠির পথ চেয়ে থাকি।—কত লিখব। যারা সাগ্রহে

'খেলাঘরের' কাজ শুরু করেছিল, যারা আমার ছবির একজিবিশ্যন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল স্বেচ্ছায়—তাদের সবারই পথ চেয়ে আছি।

সবার চেয়ে ফণিবাবু আর সলিলই বড়—বড় আশা ভরসা দিয়েছিল নিজের থেকে। তুমি যদি কাছে থাকতে তবে বিস্তারিত বলতে পারতাম। আজ ওসব নিয়ে ভেবে-ভেবে এত শ্রান্তি যে, যেসব কথা লিখবার ধৈর্য আর আমার নেই। অন্যদিকে ওদের কাছে আমার যে কি অপরাধ ঘটেচে—যে-কারণে ওরা আমায় আমার জীবনের অন্যতম নিষ্ঠুর crises-এর মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে কেটে পড়ল তা এখনো আবিষ্কার করতে পারিনে। বিমল দত্ত সেদিন চড়া গলায় "স্পষ্ট কথা" বললে যে,—"আপনি তো কারো কাছে যান না, কি করে আশা করেন যে, কেউ যেচে এসে আপনার কল্যাণ করবে।' আমি ভাই হাঁ করে ওর কথা শুনলাম, দুদিন পরে অবশ্য জবাব দিয়েছি,—"ওঁরাই তো যেচে এসেছিলেন—ওঁরা নিজেদের চিত্তপ্রসাদ-প্রেমের মর্যাদা রাখলেন না কেন, শুধু সেইটেই আমায় বলো ভাই বিমল।" জবাবে ছেঁদো উত্তর, "ওরা কে কি করলো না-করলো তাতে আপনার কি এসে যায়।" —আরো সব এঁড়ে ছেঁদো উপদেশ-বর্ষণ। —ইতিমধ্যে, কালচারের বড়কর্তাদের নানান প্রতিশ্রুতির ভাঁওতায় পড়ে রুগ্নশরীর নিয়েও কি খেটেচি। "খেলাঘরের" কাজে আর তার কর্মীদের (including বিমলের আর তার ছোটো ভাই মুকুল আরো কজনদের) নগদ টাকা দিয়ে নিজেই ধন্য হয়ে বেশ ভালো রকমে ফেঁসেচি। শ-তিনেক নগদ খরচ করার পরও আরো শ-তিনেক দেনা দাঁড়িয়ে গেছে মহাত্মাদের প্রতিশ্রুতির দৌলতে, আর ফাউ—পাওনাদারদের নিত্য তাগাদার অপমান, plus বিমলের ডেঁপো উপদেশ।

এ মাসে ফণিবাবু ফিলিম নেবেন পাপেটের, কথা দিয়ে গেছিলেন গত মাসের আগে আর কয়েক হাজার টাকা দেবেন নগদ। তিন-তিনটে চিঠি দিয়ে তিন-তিনবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি তাঁর আসবার। ইতিমধ্যে আমার সাধ্য মতো আর্টিস্টদের টাকা দিয়েচি, ছুতোর দিয়ে কাজ করিয়েচি—যাতে এ-মাসে ফিলিমের জন্যে সব প্রস্তুত থাকতে পারে। কিন্তু ফণি মজুমদারের funny আচরণে হাঁসব না কাঁদব? বুড়বগ ঔদ্ধত্য আর উশৃঙ্খল দায়িত্বহীনতা—এই হল একালের আর এদেশের culture আজ! বিদেশীরা আমায় মর্যাদা দিয়েছে তাই নকল প্রেম দেখাতে আর আসলে স্বার্থ-সন্ধানে আসে এরা কাছে। যেই বুঝতে পারে এখানে সোজা

মেরুদণ্ডের আর পবিত্রতার জগৎ, অমনি কেটে পড়ে।— আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা আজ, আমার ভবিষ্যত কী? সিধু-চিকুর কপালে কী আছে? আর আমার প্রাণপাত করা ছবি আর বইয়ের স্তূপ কোথায়—কেমন করে, কার হাতে দিয়ে যাব, ভাই মুরারি? দেনার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, পথে নাবা শেষ কদিনের জন্যে, তুচ্ছ অতিতুচ্ছ, আমি আজই তৈরি আছি। কিন্তু আমার গড়া এই ছোট্ট জগত কি নর্দমাদের হাতে, গাধা-শুয়োরদের চেয়েও অধমদের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে যেতে হবে? —এই আমার নিদ্রাহারানো অশান্তি ভাবনা, ভাই মুরারি।

তুমি দূরে চলে গেছো। তারা দূরে চলে গেছে সিধু-চিকুদের নিয়ে। তোমরা কাঁদো আমার জন্যে, আমিও কাঁদি তোমাদের জন্যে। সালাবা চিঠি লেখে—আপনি অহঙ্কারে ভাবে আমায় উদ্ধার করবে। কিন্তু জীবন রাখা দায় হয়ে ওঠে ইতিমধ্যে আমার। কাজ নিয়ে সব ভুলে ডুবে থাকব তাও সম্ভব হয় না। পিউর টানবারও পয়সা নেই। কী অপমান আর যন্ত্রনায় দিনরাত নিজের ক্ষয়-অপব্যয় দেখছি কী করে জানাই তোমায় ভাই মুরারি? অথচ আমি বিনা অহঙ্কারেই বলছি বহু ঐশ্বর্য আমি দিয়ে যেতে পারতাম, এখনো পারি এদেশের চরণে—শ্রীচরণে। এরা নিতে জানে না, কারণ দিতে জানে না। এদের ক্ষুদ্রচিত্ত যদি আমায় বড় বড় উদার বাণী আর প্রতিশ্রুতি না দিতে আসত আমি অত বিচলিত হতাম না, তুমি তা বিশ্বাস করবে। বলতে পারো আমারি হৃদয় বুদ্ধির ভুল। মানব। তুমিও মানবে আমিও সামান্য মানুষ ছাড়া আরতো কিছু নই। —থাক। —চিঠি দিয়ো। তোমার চিঠি আর তারার চিঠি আজ আমার সব দুঃখ ভোলানো আনন্দ,—জীবনকে আমার ভালোবাসার মধুতম পুরস্কার ভাই। এ কথা যদি কবিত্বের মতো শোনায় তবু জেনো এ আমার বুক-ছেঁচা কবিত্ব। এর চেয়ে বড়ো কবিত্ব পড়েছি, পড়ছি—পড়ব, কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে আবিষ্কার করতে তো আজো পারিনি ভাই। আহা, যদি তুমি আর তারা কাছে থাকতে।

তারা দিন তিনেক এসেছিল। আকুলি-বিকুলি করে কেঁদে কেটে সেকেন্দ্রাবাদে ফিরে গেল। সিধু-চিকু যেতে চায় না। বাপের সঙ্গে তো ঝগড়া করেই—মায়ের সঙ্গেও। ভিলে-পাড়ায় থাকতে চায়—ওদের দোস্ত তাচির কাছে আসতে পারবে ভাই। তবু ওরা চলে গেল। তারা এবার দেখে বুঝে গেছে, আমার বেঁচে থাকা বড়ো শক্ত হয়ে উঠেচে

দিনদিন। শুধু টাকা নয়—দারিদ্র্য নয়, আমি সত্যি নিঃসঙ্গী। —নিজের ওপর ব্যাঙ্গ করে বলছি নে, তা তুমি বুঝবে।

১৬

জুন ২৭, ৫৯

কাল চিঠি শেষ করতে পারিনি। প্রথমে খবি তারপর ছটু এসেছিল। খবি একটা মস্ত ব্রঞ্জের মূর্তির কাজ পেয়েছে কল্যাণে, assist করার কাজ, কিন্তু নামেই assist করা—আগাগোড়া সব ভারই ওর ওপর দিয়ে আসল আর্টিস্ট আরো ব্যবসা জোগাড়ে ঘুরে বেড়ান হিল্লি-দিল্লী। সত্যি, খবি দেবশিশু চরিত্রের ছেলে। একদিকে যেমন তীক্ষ্ণধী, অন্যদিকে তেমনি নির্মল। অসামান্য পরিশ্রমী আর সব সময় হাসিমুখ, বহু অবিচার অভাব দুঃখের মধ্যেও ওর চোখ দুটি হাসিতে নাচে যেন। বড ভালো লাগে ওর সঙ্গ। কিন্তু খবিও এখন ঐ নতুন কাজ নিয়ে কল্যাণেই কাটায় বেশির ভাগ দিন। এক-আধ বেলার ফাঁক পেলেই সবার আগে ছুটে আসে আমার কাছে। তোমার আর তারার চিঠি পেয়েছি কিনা এসেই তা প্রথমেই জিজ্ঞেস করে। জানে আমার অস্তিত্বের শান্তি সুখের উৎস কোথায়। চিঠি পাইনি শুনলে ওরও মুখ কালো হয়ে যায়। তারপরই জোর করে হেসে-হেসে নিজের দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত জীবনের 'মজার' গল্প পাড়ে। আশ্চর্য ছেলে খবি, সত্যি। ওর নতুন-নতুন কাজ করার, মূর্তি গড়ার, স্বপ্নের অন্ত নেই। ফাউণ্ড্রি করবে, সেরামিক্স-এর কিল্‌ন গড়বে, সিমেন্টের স্ট্যাচু করবে। অথচ না আছে পয়সা, না মাথা গোঁজার ঠাঁই। বর্ষা নেমেচে। দেখে এসেচি বর্ষায় ওদের একখানি মাত্র ঘরে বন্যা ঢোকে। তবু ওর সেইটুকু ঘরে অনাথ-আতুরের অভাব নেই। কেউ আত্মীয়, কেউ বন্ধু, রুগ্ন হয়ে সহরে চিকিৎসার জন্যে এসে আশ্রয় নেয়। ওর দাদা ফ্যাক্টরিতে চাকরিতে চলে যায়, বৌদিকে যেতে হয় ওর দিদির বা আর-কারো প্রসবের পর পরিচর্যা করতে। খবিকে রাঁধতে হয় রুগ্ন আশ্রিতদের জন্যে। বলতে বলতে জীবনের শ্রান্তিকর কর্তব্য-পালনের বিরক্তিতে রেগে ওঠে, কদাচিত, তারপরেই আপনিই যেন ওর হাসি আর সরল সুসভ্য মস্করা ফুলের আলোর মতো ওর মনে আর মুখে ফুটে ওঠে। এত পবিত্র চরিত্র আমার কাছে বড় একটা পাইনি বম্বেতে এসে অবধি। তুমি এসব বুঝবে, কারণ তুমিও, আর আমার তারাও, ঠিক এই আমার আত্মীয়। একটুও বাড়িয়ে বলছি না ভাই, তোমরা আমার মনগড়া কেউ

নও, অনেক দুঃখের আর সুখের অনেক বিচিত্র পথ ঘুরে তোমাদের আমি পেয়েছি জীবনে, তোমরা আশ্চর্য, মানুষের এই অসত্যে সংকীর্ণ পৃথিবীতে, অন্তত আমার জীবনে। তোমাদের ভালোবাসার সংস্পর্শে এসে আমার জীবনের কতখানি সোনা হয়ে গেছে তা যদি বোঝাতে পারতাম।

শোন মজার ঘটনা। ভারতের ডিফেন্স মিনিস্টর মেনন এসেছিল আমাদেরই উঠোনে, ইলেকসন ক্যাম্পেন করতে। গুজরাতি ছোকরাদের কিংক মণ্ডল আছে ডুনম্বর রুবি টেরেসে, তারাই ওকে ডেকে এনেছিল, সঙ্গে ছিল শান্তিলাল শা—বম্বের ফিনান্স মিনিস্টার। কলাগাছ, আম পাতার ঝালর আর মাইক গদি সতরঞ্জির হল্লা চলছিল সকাল থেকে সারা উঠোনে। প্রথমে গা করি নি, তারিখও মনে নেই আজ। মেনন এলো প্রায় বেলা বারোটায়। পেল্লায় দুটো গাড়ি ঠিক আমার জানলার ওপারে। ছেলেরা ডেকেছিল, তাই পাশের ব্লকের শিশু বাবলাকে কোলে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়ে ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মেননের তকরা শুনতে শুনতে মেজাজ বিগড়ে গেছিল। বলছিল sacrifice করো, ঝগড়া ভুলে যাও, এমনকি নেহরুর foreign policy আর সব "বড় বড়" কথা ভুলে যাও, দেশের জন্যে কাজ করো। আরো বিরক্তিকর, deliberate, calculated মতলব নিয়ে full speed-এ ইংরেজিতে বকছিল মেনন, নিজের চোখে দেখছিলাম কেউ একবর্ণও বুঝছে না। শুধু স্পষ্ট বারবার এক কথা—কংগ্রেসকে ভোট দাও।—ইত্যাদি। শুনে শুনে শেষ অবধি ধৈর্য্য রইলো না। বললাম, "মিস্টর মেনন, excuse me, please, you ask us to work for our country. That's fine, but will you please advise us how may we work in the present condition ?" প্রথমটা খেপে গিয়ে বললে, "Do you want to speak ?" (মানে on the mike—মাইক এগিয়ে দিলে)। বললাম, "No, মিস্টর মেনন, I dont know how to speak. I only work and I want to know from you how can I and all the young folks may work in our country today ?"

আড় চোখে বারবার আমার মুখ দেখতে দেখতে আরো মিনিট কতক বক্তিমা ঝেড়ে, শেষকালে বললে "I will answer your question personally, please wait—May I know your name." নাম বললাম, বললাম, আমি তোমার শত্রু নই, গত ইলেকশনে তোমাকেই ভোট দিয়েছিলাম।

আমি সামান্য আর্টিস্ট, অনেক কিছু করবার স্বপ্ন দেখি, এ-পাড়ার শিশু যুবা বৃদ্ধ সবাই ভালোবাসে আমায়। উচ্চোক্তাদের বুড়োরা যেবড়ে আমায় থামিয়ে দিলে। মেনন বার বার তিনবার বললে—I will talk to you personally, please wait. শেষটায় এক পুলিশ অফিসার loud whisper-এ বললে শুনলাম—He is a communist, sir. অমনি মেনন সবার চোখের ওপর ভড়কে গেলেন। ...পরে, সভা ভাঙতেই সোজা গাড়িতে চড়ে ভাগলবা !!! এই stupidity-র কি দরকার ছিল জানি না।

পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ সবাই অবাক, ঘিরে ধরল আমায়—প্রথমে, মেনন বক্তৃতায় কি বললে, আমি কি জিগ্যেস করেছিলাম তা জানতে চাইল। পরে বলল আমরা সবাই শুনলাম তোমার সঙ্গে মেনন personally কথা কইবে, তার কি হোল ?—জবাব তো আমার দেবার কথা নয়।

অনেক পরে বিমল এলো, তখনো ছেলের দল আমার ঘরে ভিড় করে আছে। সব বেত্তান্ত শুনে বিমল পরামর্শ দিলে, আমেরিকান folio মেননকে উপহার দাও। বিকেলে মেনন ভিলে পার্লায় সভা জমাবে। ছেলের দল সানন্দে সাগ্রহে folio নিয়ে গেল। তাদের মেনন বলেছেন নাকি, He is not an artist ! (আজো বুঝি নি এ মন্তব্যের মর্ম !)—But I will answer his question in writing as soon as I can—অবশ্যি আজো সে answer পাই নি। কিছুই এসে যায় না। কিন্তু সেদিন মেনন পালানোর পর যা হাসি হেসেছি, কি বলব তোমায়। পরের দিন তারা এসেছিল, সব বললাম, ওর হাসি যদি শুনতে।

কিন্তু হাসি থামলেই কান্না পায় নাকি ? এই রাজ্যে আর্ট আর কালচার করা মানে জীবনকে ভস্মে ঢালা, সব স্বপ্নকে দেনার অপমানে চুকিয়ে দেয়া, নয় কি ? শুধু যদি সিনেমার সাম্রাজ্যে বেশ্যা হতে পারতাম ! কিন্তু ঘেন্না করে যে। তবু যাক গে, আমি বিচার করবার কে ? ছবি আঁকি তাইতেই সব হৃদয় বুদ্ধির যোগ্যতা অধিকার আমার বার্তায় ? হয়তো মেনন সত্যিই বহু মহৎ কাজ করছেন, যা নাকি আমার বুদ্ধির জ্ঞানের বাইরে। কে জানে। ...পোস্টম্যান চলে গেল। তোমার চিঠি এল না আজো। কিন্তু তারার চিঠি এসেচে—কান্না আর অসীম শুভেচ্ছা মাখানো। চিকু বম্বেতে ফিরে আসতে চায়, লিখেচে তারা আর তারাও বম্বেতে আসতে চায়, তাই কর্তা ওকে অধর্মিনী গাল দিয়েছেন, তিনি শ্রীগীতা পড়েন এদানিং !!!—ওর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়চে, বিস্তারিত লিখেচে। ভাই মুরারি, বলো না, যদি জানো, কী

করে আমার মাত্র কজন প্রিয়জনদের দুঃখ-কষ্ট কিছুটা লাঘব করার কাজে কী করে আমি কি করতে পারি আজো? দেশোদ্ধার বিশ্বত্রাণের ঔদ্ধত্য আজ আর আমার নেই, বিশ্বাস করো ছিল না কোনোদিনই। আনন্দে দুঃখ-বেদনায় ছবি এঁকে গেছি, এই শুধু। ছবি, দুনিয়ার নানান আর্টিস্টের আঁকা ছবি, রং রেখা আমায় চিরকাল মাতাল করেছে এই শুধু। কিন্তু আমার প্রিয়জনদের জীবনের তীব্রতম ব্যথা বেদনায় তো কিছুমাত্র নিবারণ করতে পারলাম না। তোমাদেরি সঙ্গসুখের আনন্দে, তোমাদেরি আত্মার স্পর্শে আমার যা ধনরত্ন আমার জীবনের ভাণ্ডারে জমেছে, আর তাই তোমাদের তুলে দিয়ে আমার গর্বের সীমা নেই। তোমরা না থাকলে কবে ধুলো হয়ে উড়ে যেতাম, বা কোন নালা-নর্দমায় আকণ্ঠ ডুবে যেতাম। বিনয় করছি না। যে প্রচণ্ড সৃষ্টি-শক্তি বহু মানুষকে মহামানব করেছে, আবার আত্মঘাতী উল্লাসের নরক ডুগিয়ে নিবিয়ে দিয়েছে চিরকলঙ্কের দাগ দিয়ে,—সেই শক্তিই বারবার নিজের রক্তের গানে শুনতে পেয়েছি। না, বিনয় বা গর্ব করছি না। সত্যি কথা, তোমরা মাত্র, কটি মাত্র মানুষ আজো আমায় মানুষ রেখেছ। কিন্তু চতুর্দিক থেকে এত বাধা আমার কাজের পথে, আশৈশব, যে, যা কিছু করে যেতে পারতাম তা পেরে উঠলাম না। এখন শুধু ক্লান্তি, শুধু ঘুমোতে দেহ মন এলিয়ে আসচে। তবু বিশ্বাস করো, পরাজিত হতে চাই না, শুধু জানি না, কোন পথে—কোন নতুন পথে, কোন উপায়ে আমার জয়—নিজের পক্ষেও, তোমাদের ভালোবাসার পক্ষেও জয়। কিছু ভালো ভালো বই, আর কিছু ছবি, আর ঐ সামান্য-সমাপ্ত পাপেট থিয়েটার, এই সবের দাবিতে নিশ্চয় এদেশের cultural barons-দের কাছ থেকে আমার বেঁচে থাকার বাস্তব (মানে টাকার) প্রয়োজনের অধিকার দাবি করতে পারি না। আজো এদেশে sacrifice-এর (!) দরকার তাঁদের মতে (তাঁরা কিন্তু sacrifice ছেড়ে দিয়েছেন বেশ কিছুকাল থেকে)। ওদিকে কিন্তু Harbert Marshall এদেশের শিশু থিয়েটারের boss আর বছরে হাজার কয়েক গ্রহণ করেই ওদের ধন্য করে দিয়ে যাচ্ছেন। সে থিয়েটারের নাটক আজো কেউ দেখে নি। সঙ্গে আব্বাসও আছেন। আরো অনেক cultural barons-ও। তুমি জানো, আমার ঈর্ষা হিংসে নেই, অসীম দুঃখ-ব্যর্থতা-বোধই আছে শুধু।

Funny 'Mazhumdar' (!) আর তাঁর সগোত্রদের লম্বা চওড়া গাড়ি দোরে দাঁড়াতে দেখে পিউরঅলা অবধি সেধে এসে ধারে পিউর সেধে

দিয়ে গেছে। বন্ধ করে দিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন। এখন দেখছি আমার লোভ প্রবল, আমার শান্তিপ্রিয়তার চেয়েও। লোকটার কাছে শ-খানেক টাকা দেনা সন্ধেতেই জমে উঠেছে। না টানলে বই পড়তে পারি না, ঘুমোতেও পারি না—কেন জানি না। ক্ষমা করো ভাই, সুনীতির পথ আমার আজ শেষ সীমায় এসেচে, আমার এবার তলিয়ে যাবার সময় এসেছে মনে হচ্ছে। জীবনেরই যখন মানে হোল না তখন মরণে বা দুর্নামের বা লাঞ্ছনারই বা কি মানে থাকে? জানি না আজ এসব তোমায় কি লিখছি। কিন্তু প্রাণ খুলে মরিয়া হয়ে লিখছি। তবু মনে হচ্ছে যেন কিছুই যেন লিখতে পারছি না। কেন তুমি আর তারা কাছ থেকে চলে গেলে? চিঠিতে কি সব লেখা যায়, সব কিছু দিতে আর নিতে পারা যায়? এই পিউর—তাও তুমি কাছে এলে অমৃত সুধা হয়ে ওঠে, এই ঘরটুকু—তাও তারা সিধু-চিকু এলে স্বর্গ হয়ে ওঠে, তুমি তো জানো, এ কথা আমার জীবনে কত সত্য কত সুন্দর। তাই কত প্রয়োজন। আজকের শূন্যতা আমার তুমি বুঝবে।

আমার শূন্যতায় চাঁদসূর্য নিভে যাবে না, বাইরের ঐ ঝড় বর্ষা আর রেডিও বা ট্রাক থেমে যাবে না জানি। তবু জানি না কেন সর্বরকমের শোকে ক্লান্তিতে আজ নিজের বিরুদ্ধে নিজের চোখের ওপর নিজে ভেঙে পড়চি।

এ চিঠি পড়ে কি ভাববে কি করবে তা জানি না। হয়তো কাল সকালে নিজেকে সামলে নিতে পারবো। হয়তো বিধাতা কাল সকালে সাম্প্রতিক জীবনের পথ অন্য পথে—আমার যোগ্যতার পথে মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে যাবেন। জানি না। আজ যা কিছু বুক থেকে উঠে এলো তাই লিখলাম তোমায়। তুমি আমার বহু সুখ-দুঃখের সাথী, তারা যেমন। রাগ করো না। বুকে তোমায় জড়িয়ে ধরে থাকি তারার পাশাপাশি, বিশ্বাস করো।

১৬

আন্ধেরি
২০ নভেম্বর, '৬০

তোমার চিঠির পথ চেয়ে আছি। তুমি আমার হপ্তা দুয়েক আগের চিঠি (তোমার পাঠানো টাকা পেয়ে লেখা) পেয়েছ আশা করি। সে চিঠিতে আমার আন্ধেরি পাট তুলে দেবার অনিচ্ছা দেখে রাগ করোনি তো? তখনকার মনের অবস্থায় সে চিঠিতে আবোল-তাবোল অনেক কিছু লিখেছিলাম—এখন কিছুই তার মনে নেই প্রায়—শুধু ঐ অনিচ্ছার কথাটা মোদ্দা কথা হিসেবে মনে আছে। আর মার খাবার কথা।

তারপর এই দিন দশ-পনর শুধু ভাবছি ভবিষ্যৎ ইতি-কর্তব্য নিয়ে। তার সার কথা এক কথায় এই যে—আজ না হোক কাল—অচিরে না হোক অদূর ভবিষ্যতে আমায় আন্ধেরি তথা বম্বের মায়া-মোহ কাটিয়ে গৌড়েই ফিরতে হবে। শুধু রুজি-রোজগারটাই যদি আমার বম্বায়ে থাকার মূল কথা হত—এতকাল—তবে ভালো ভাবেই তা সম্ভব হত। আমার কাজ না জোটার মোটা কারণ, বাজারে কাজ সম্বন্ধে আমার রক্তগত নিস্পৃহা। অথবা বাণিজ্যবিদ্যায় অজ্ঞতা। তা যাই হোক, মোদ্দা কথা এখানে টাকা হয় নি হবেও না, তার ওপর কাজও আর হচ্ছে না নতুন কিছু। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতটা একবার যথাযথ ভাবে ঘুরে দেখে যেতে পারতাম—অনেক কাজের মশলা সঞ্চয় হত। থাক সে কথাও। এখন আমার একান্ত ইচ্ছা যে, প্রথম—আমার সেই story of India ছবির বয়ের সব ছবি শেষ করে বই হিসেবে প্রকাশের জন্যে খাড়া করা,—আর বাংলাতেই প্রথম প্রকাশ করা। বাংলা প্রকাশক পয়সা নাম মাত্র দেবে, তাও ঠকাবার তালে থাকবে। তবু প্রকাশ হোক বাংলাতেই প্রথম,—তারপর অন্য ভাষায় শোধ তুলব। মানে, গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল, খোয়াব দেখছি।

তারপর আমার আশৈশবের ইচ্ছা—বাংলার ইতিহাসের ছবির বই করবো। একবার শুরু করেছিলাম দিনেশ সেনের বাংলার ইতিহাস সম্বল করে—সে প্রায় ২৫ বছর আগে—সে নেহাতই ছেলেমানুষি হয়েছিল। এখন বাংলায় প্রচুর রসদ পাবো—অশোক মিত্রের বাংলার সেন্সস রিপোর্ট তার মধ্যে প্রধান। কিন্তু আমি কেতাবি ইতিহাস আঁকবো না পারতপক্ষে। বাংলাদেশ প্রথম যথাসম্ভব পয়দল ঘুরবো—বছর দুবছর ধরে। আগে টুর প্রোগ্রাম করব কেতাবাদি ঘুঁটেঘুঁটে। তারপর ইতিহাসের ছবি তুলে

আনব সহর গ্রাম প্রান্তর ঘুরে,—অতীতকেও আমার এই সাম্প্রতিক দুচোখে যা দেখি আধুনিক মনে যেমন অনুভব করি তেমনিটিই আঁকব লিখবো আমার রচিত কেতাবে। আমি ভেবে দেখেছি—এমন কেতাবের দরকার শুধু আজ বঙ্গেই নয়—প্রত্যেক অঞ্চলে ভারতের নয়া দৃষ্টিতে দেখা নয়া ভারতের ইতিহাস দরকার আজ। স্থানীয় আর্টিস্ট লেখকদের দ্বারাই তা সম্ভব।

এমন কাজে ছবিকে ইতিহাসের বাহন হিসেবে ব্যবহারের কোনো দরকার নেই। আমি অন্তত তা করব না,—যাকে বলে ছবিকে বয়ের সাহিত্যের সাপ্লিমেণ্ট, তা করবো না। আমার ফেমিন স্কেচের সঙ্গে যদি রিপোর্টার নাও থাকত ছবি নিজেই কথা বলত। কিন্তু ইতিহাসের ধারার সঙ্গে ছবির প্রাণবস্তুর যোগাযোগ রাখতেই হবে, আর তাই আমাকেও পয়দলে বাংলাদেশ ঘুরতেই হবে।

কিন্তু আগের কথা আগে কহি। বম্বে ছেড়ে বেরুনো আমার পক্ষে চাড্ডিখানি কথা নয়, ১৫ বছরের জমানো একটি ইস্ত্রিহীন সংসার উৎপাটন শুধু এই দুইহাতে করতে সময় লাগবে—শক্তি, নিছক দৈহিক শক্তির অনুপাতে। তাই স্থির করেছি প্রথম ধীরে ধীরে বইগুলো ছোট ছোট রেল পার্শেল করে তোমায় পাঠাতে থাকব। ইতিমধ্যে দুটো বাক্স কিনে এনে সোলিস্নাম মাখিয়ে শুকতে রেখেছি। মূল্যবান বইগুলো প্রথম পার হয়ে গেলে—মাস দুয়েকের আগেই যদি পারি—থবির জিম্মায় ঘর রেখে তোমার কাছে যাব মাস দুয়েকের জন্যে। থবির কাজের বোঝা ততদিনে হাল্কা হবে আশা আছে। তোমার কাছে থেকে ভবিষ্যতের প্ল্যান ও ব্যবস্থা ঠিক করব। যদ্দুর ভেবেছি—কলকাতার ওপর আমায় ঘর নিতে হবে বম্বে ছেড়ে গিয়েই। কলকাতায় না থাকলে আমার কাজ জুটবে না! প্রথম বইটি না বেরোনো পর্যন্ত ঘুরতে বেরুনোর সুযোগ হবে না, বরং বলা ভালো বই বেরুলে তবেই সুযোগের আশা করা যেতে পারে,—মানে, প্যাট্রন বা হবু প্রকাশকের দেখা মিলতে পারে প্রথম বইটি বেরুলেই তবে। তদ্দিন অন্য যা জোটে তাই করে চলতে হবে—বাংলার ইতিহাসের পঠন কর্মটি করার সঙ্গে সঙ্গে। অতএব কলকাতায় ঘর নিতে হবে। তোমার ছুটির দিনে, কখনো বা তা ছাড়াও, তোমার কাছে কাটাবো, তুমি আসবে আমার আস্তানায়। কখনো বা মেদিনীপুর যাব—দুজনে মিলে। তৎপূর্বে বম্বের পাট গোটাবার জন্যে আবার আমায় আসতে হবে। থবি আমার চিরদিনের

জন্যে বম্বে ছাড়ার ঘোরতর বিরুদ্ধে। ওর মতে দীর্ঘ দিনের জন্যে মুলুক যাও ঠিক হ্যায়, কিন্তু আবার ফিরে এসো এই ঘরেই। খবি খুব চেষ্টা করছে ওর নিজের ফাউণ্ড্রি পাতবার,—শিবাজী মূর্তি (২০।২২ ফুট উঁচু) ঢালাই ইত্যাদি করে একদিকে যেমন ওর বাজারে নাম ডাক হয়েছে এখনি, তেমনি ওর নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস আর নানান ideas ওকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। আমারো ধ্রুব বিশ্বাস, ও-ছেলে মস্ত কিছু করবার সর্বাঙ্গ ক্ষমতা রাখে এবং অচিরেই ও নিজের জীবনের এক মস্ত অধ্যায় শুরু করবেই। আর ওর একান্ত ইচ্ছা, ওর ফাউণ্ড্রিকে ব্যবসার দিকে লাগালে সেদিকের ভার অন্যকে দিয়েই প্রধানত চালাবে, আর নিজে sculpturing—এর দিকে জোর দেবে—আর এই দিক থেকে ওর মনের মতো স্যাঙাত আমি ছাড়া আর কাউকে ও মানে না। আমি চলে যেতে চাই উল্লেখ করলেই ওর কালো-কিন্তু-তাপে ঝলসানো ফ্যাকাসে মুখ আরো কালো আরো ফ্যাকাসে হয়ে যায়,—যেন ফাউণ্ড্রিটা আমার জন্যেই গড়বে! অবশ্য ওর সঙ্গে ঢালাই স্কাল্পচার গড়ার লোভ আমার দুর্দমনীয়,—স্কাল্পচার আমার রক্তে আছে আমি জানি। মানে খবির কাছে আমায় ফিরে ফিরে আসতে হবে—মরবার আগে কিছু স্কাল্পচার রেখে যেতে পারব এ আশে।

এখন, আমার এই গতিবিধির মধ্যে তারা-সিধু-চিকুর সঙ্গে যতটুকু যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়, তাই লাভ, তার বেশি আশা করার কারণ নেই। ওরা বম্বে ফিরে আসার বহু আগেই তোমার কাছে যাবার আশা রাখি, ওরা এখানে এলে কিন্তু আমি ফিরে আসব, এখানকার তল্পি সব গোটানো না হওয়া অবধি এখানে থাকবো। আর যদি খবি ইতিমধ্যে ফাউণ্ড্রি চালু করে ফেলতে পারে তবে এখানকার অন্তত একটা কেল্লা ফতে করে যাবার তৃপ্তি নিয়ে বঙ্গের সোনা বঙ্গে ফিরতে পারব।

তারা প্রত্যেক চিঠিতেই তোমায় regards আর best wishes পাঠাতে লেখে। বেচারি। ওর একাকিত্ব আমি শুধু জানি—কী ক্ষুদ্র এদেশের সমাজের মন আমি জানি, তার মাঝখানে তারা সম্পূর্ণ নতুন চরিত্রের মানুষ। মেয়ে মানুষ, তায় এ-দেশের, তাই আর সবার কথা আগে ভাবে নিজেকে ফেলে। কিন্তু ওর কথা ওর প্রয়োজন মতো ভাববার কেউ নেই ওর কোনো তরফে। ওর জিনিয়স নেই তা ঠিক (ভাগ্যিস নেই বলা ভালো) কিন্তু ট্যালেন্ট আছে বুদ্ধি আছে (হায় হায়!) তাই ওর নিজের মতো সমাজ দরকার, যেখানে ও আপনাকে সত্যি করে সম্পূর্ণ করে দিতে পারে—এটা

মেয়েদের বিশেষ করে এদেশের মেয়েদের নারীত্বের আত্মাগত দুর্বলতা। তথাকথিত আধুনিকা মেয়ে নয় তারা। শোভার মধ্যেও এই 'দুর্বলতা'—যদিও যে বেকার সমাজে ওকে খাপ খাইয়ে চলতে দেখা যায় তাতে শোভাকে অন্য কিছু মনে হতে পারে। কিন্তু আমি ওকে কাছ থেকে ওর সমবয়েসি সহকর্মী বা সহপাঠী-পাঠিনীদের সঙ্গে ওকে দেখেছি—ওর সত্যিকারের আধুনিক চরিত্র—জ্ঞান-বুদ্ধিতে দীপ্ত গভীর আধুনিকতা,—তার সেই সমাজে ওকে সবচেয়ে উৎফুল্ল আর স্বপ্রকৃতিতে আত্মস্থ মনে হয়। তারা যখন পার্টি করত তখন তারার সেই চরিত্রচেহারা দেখছি। আজ যদি ওকে শিক্ষাজগতে কেউ টেনে নেয় নানান কাজের ভার দেয়—তারার নিজের মূল্য নিজেও পাবে, সমাজও পাবে। কিন্তু ওর কেউ নেই ওকে টেনে নেবার। একার চেষ্টায় ও নিজেকে সিধু-চিকুর বাঁধনে একটু ঢিলে দিতেও পারে না। আমাকে তারাও বম্বে ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে লিখচে আজকাল বেশি করে (ওকে আমার মার খাওয়ার কথা লিখি নি—প্রথম লজ্জায়, তারপর দুশ্চিন্তা করবে) কিন্তু জানি কোন প্রাণে লিখচে। মাসান্তে একবার ঘণ্টা দুই প্রাণখুলে আড্ডা দেবারও ওর কেউ থাকবে না আমার কাছে এসে লুকিয়ে মাছ মাংস খায়—ভালোবাসে খেতে তাই। আমি চলে গেলে একেবারে নিবে যাবে—ধ্রুব জানি। তবু যেতে হবে, বন্ধু, আমি নিরুপায়। কিছু কাজ বাকি আছে—শেষ করবার অন্তত চেষ্টা করে যেতে হবে। আমি পুরুষ মানুষ আমার নিজের ইচ্ছামতো চলা বা কাজ করার অশেষ সুযোগ জন্মগত অধিকার আমার। এ অধিকারের সুযোগ না নিলে আমার পৌরুষেরই অপচয়—লোকে মরদ বলবে না, বা নিষ্কর্মার বোঝা বইবে না। অতএব আমি নিরুপায়। থাক, এ ব্যাপারে কথা বাড়িয়ে কার কি লাভ। যা পাওয়া অসাধ্য বলে পেলাম না তা ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে আত্মত্যাগের প্রশ্নই আসে না। তাকে ব্যর্থতা বলে মেনে নেওয়ার মধ্যেও সান্ত্বনার কিছু নেই। আমার কাজ আছে এই আমার সুবিধে। তারার তা নেই এক শিশুদের মানুষ করা ছাড়া। তাই হোক।

আমার এ-চিঠি পড়ে খুশিও হবে দুঃখিতও হবে তুমি, তা আঁচ করতে পারি। তবু চিঠিতে পরামর্শ আলোচনাদি মনের মতো চলে না—অন্তত লেখার পর তাই আমার মনে হয়। তুমি কি চাক্রির চক্রে চড়ে একবার বোঁ করে কয়েক দিন আমার কাছে ঘুরে যেতে পার না—অদূর ভবিষ্যতে ?

কেমন আছ তুমি এখন ? কি করছ কি ভাবছ ? বোধহয় তোমার

চিঠি আর আমার এ-চিঠি পথে পাশ কাটাকাটি করবে,—এ হপ্তায় তোমার চিঠি পাব মন বলছে। সকাল হলেই বাইরের রোদ ঝলমল দেখে তীব্রভাবে মনে পড়ে গত বছর এ-সময়ের কথা—আর ভাবি কী তুমুল অন্ধ নিষ্ঠুর বেগে সময় চলে যায়। সন্ধে হলে তীব্রভাবেই বুঝি আর একটা দিন জীবন থেকে চিরতরে খালি—দম বন্ধ হয়ে আসে, ভাবি আর একবার জীবন গোড়া থেকে শুরু করা যায় না?

থামি এবার। রাত প্রায় দশটা, থবি এসেছে, বাড়ি থেকে প্রচুর এবং গরমাগরম চপাটি ভাজি নিয়ে। উৎসাহের প্রতিমূর্তি এই ছোকরা। —ভালোবাসা নিয়ো।

১৭

বৃহস্পতিবার, ১৯।১।৬১, দ্বিপ্রহর
আন্ধেরি

তুমূচা পোস্টোকার (১৭ই) গতকাল (১৮ই) পেয়েছি—এটা পোস্টাল বিভাগের মির‍্যাকুলাস কীর্তি বলে স্মরণীয় হওয়া উচিত। ইছাপুর থেকে তেরাত্তির দুদিন লাগে—এই ছিল চিরকালের অভ্যস্ত জ্ঞান। আর এই কার্ড মঙ্গলবার ১১৷৷০ টায় ইছাপুর ছেড়ে আন্ধেরিতে বুধবার গোটা ২৷৷০ নাগাদ একেবারে আমার হাতে! একেই বুঝি বলে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রগ্রেস! **Any how,** সাবাস, ভারতীয় পোস্টাপিস! কিম্বা সাবাস কার্ড?

শুক্রবার ২০শে সকাল সাড়ে দশটা। পিওন চলে গেল, তোমার বড় চিঠি এল না। কিন্তু তারা আর রিটার চিঠি এল এক সঙ্গে!

তোমার বড় চিঠির অপেক্ষা করছি, তোমায় এবার বেশ প্যাঁচে ফেলেছি ভেবে বেজায় ফুর্তি হচ্ছে এখানে বসে আমার। তোমার এ্যার লেটার আর পোস্টকার্ডের নিকুচি করি, লেখ এবার মন খুলে দিস্তে দিস্তে পাতা ভরে। চিঠিগুলো যে **human product** তা সার্থক করো। আমার তো মনে হয় চিঠিপত্রের মধ্যে আমাদের মন প্রাণ আত্মাপুরুষ অবধি সব কিছু এত রকমে এত প্রচুর ভাবে খুলতে পারি জানতে পারি বুঝতে পারি, ধরে ছুঁয়ে নাড়তে পারি মন দিয়ে, তত আজীবন পাশাপাশি কাটিয়েও তা সম্ভব হয় না। কিন্তু সত্যিকারের চিঠিপত্র হওয়া চাই—এবং আমি বিশ্বাস করি, শত ব্যস্ততার মধ্যেও সত্যিকারের চিঠি প্রতি দ্বিতীয় চিঠিতেই লেখা সম্ভব। শুধু চিঠিতে বকবক করবার তাগিদটা চাই মনে। বলা বাহুল্য,

বকবক করবে যার কাছে সে মানুষটি তোমার চিঠির যোগ্য হওয়া চাই। কিন্তু অবাক কথা, প্রায় সব্বাই চিঠির মতো চিঠি—পাতার পর পাতা বকবক পেতে ভালোবাসেন কিন্তু, লেখা? 'অবসর পাই না' কেউই! কারণ নিশ্চয়ই আছে, তবু এও সত্য যে অবসর, সব কিছু করবার জন্যেই অবসর আমরা করে নিই দরকার পড়লে। বলা বাহুল্য, দরকার আর দায় এক নয়। মাফ করো, কত্তা, পোস্টোকার্ড আর এ্যার লেটার দায় সারার vehicles স্বরূপ সরকার পক্ষ থেকে আমাদের চিঠি লেখার প্রয়োজনের চরম exploitation ছাড়া আর কিছু নয়। দায়গুলো serious বা business like অর্থাৎ sincere হতে পারে আলবাৎ। কাজেই exploitation কথাটা অন্য কথার অভাবে আর অতি limited অর্থে প্রযোজ্য। মোদ্দা কথা, চিঠি—বড় চিঠি পুরো personality to পুরো personality-র communication, আর, দু-চার কলম ছাড়াটা বড় জোর symbolically human expression। প্রজাপতির মতো লঘু ও ক্ষণিক ব্যাপার।—যথেষ্ট।

যা লিখতে বসেছি, তা চিঠি-তত্ত্ব নয়। তা একটি বই পঠিতেছি কাল থেকে, তার আনন্দ একা সামলাতে পারছি না তাই জানাতে তোমায়। তার তার আগে বলে নিই খবর হিসেবে, কাল সকালের দিকে কলকাতার বুড়োর ছোট ভাই হাবুল আর ছোকরা ভাগ্নে হঠাৎ এসে হাজির! সারা দুপুর গপসপে কেটেচে। বুড়োর চেয়ে ধীর এবং আলাপে পাকা হাবুল খাঁটি বাঙালি ছেলে। বুড়ো খাঁটি বাঙাল ছেলে। খুব মজা লাগল। শুধু পিটরার অভাবটা চা দিয়ে আরো তীব্রভাবে বোধ করছিলাম আমি, সে বটে অন্য কথা। বুড়ো ছোট্ট চিঠি দিয়েছে ভায়ের সঙ্গে—কলকাতায় যাবার নেমন্তন্ন করেছে হাবুলের সঙ্গে।

এবার বইয়ের কথা। বইটির নাম-ধম্ম ইত্যাদি সব দিলাম, মনে হয় তুমি must read it। এরিক বইটা এনেছিল এক মাস আগে, রেখে দিয়েছিলাম পাতা উল্টে, কাল সন্ধ্যে বেলা casually শুরু করে আমি charmed। অন্তত এটুকু বলতে পারি, এ-বয়ে এ দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে যা হুবহু অক্ষরে অক্ষরে আমার মনের কথা। মূল বইটি ফ্রেঞ্চে। ইংরেজি অনুবাদ বিশ্রী, যদিও এংরেজের কিংবা হয়তো ফরাসীর এবং হল্যাণ্ডে ছাপা—ছাপাঅলার শয়তান শ্রেণীর ভূত পাতায় পাতায়। তথাপি হৃদয় মন তৃপ্ত করা বই। "INDIA : by Madelcine Biardeau, translated by F.

Carter ; Vista Books, London 1960। মূল্য টাকা সাতেক (ছ শিলিং-এ কত টাকা ?)। পেপার ব্যাক পকেট বুক শ্রেণীর। অর্থাৎ রেল স্টলে বা কলকাতার ফুটপাথেও পেতে পার। সংগ্রহে রাখার মতো বই, সচিত্রও বটে, উপহার দেবার যোগ্য নিশ্চয়ই।

'লেখিকার নির্ভিক মতামত অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য'—এই বলে ছাপ ফত্রিকা মার্কা 'সমালোচনা' শুরু করা যেতে পারে, কিন্তু তা আমার উদ্দেশ্য নয়। সমালোচনাই আমার উদ্দেশ্য নয়। কোন জিনিসই আমাদের কেন মন্দ লাগলো তা বলা যত সহজ কাজ, কেন ভালো লাগল তা বলা তেমন সহজ ব্যাপার নয়। আর, বইটি আমার নানারকমে ভালো লেগেছে। প্রথমত, পড়তে পড়তে ভুলে গেছি আর কারো লেখা পড়ছি এবং মনে হয়েছে আমি নিজের চোখে সব দেখছি আর মনে মনে নিজের মতামতই বলে যাচ্ছি। অর্থাৎ, লেখিকা যে বিদেশিনী কেউ, তা (দু-একবার যখন ফ্রান্সের সঙ্গে এদেশের এক-আধটু কিছুর তুলনা করেছেন সেটুকু ছাড়া) মনে হয় না, মনে হয় আমাদেরই এ-দেশেরই কেউ এবং তোমার আমার দলের কেউ। দ্বিতীয়ত, অত্যন্ত সজাগ মনের লেখা এবং ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা— শুধু emotional 'দরদ দিয়ে লেখা' নয়, আত্মীয়তা দিয়ে লেখা। লেখিকার নিজেরই বহু বিশ্বাস বা প্রয়োজন at stake, যেন এদেশের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়ানো—এবং তা শুধু political বা racial ideology জাতীয় কিছু experimental curiosity নয়। মানুষ জন্মের সম্পূর্ণ তাৎপর্য ভারতবর্ষে খুঁজে মেলে—এই বোধ বা শ্রদ্ধা নিয়ে লেখিকা এ-দেশকে দেখেছেন এবং যা খুঁজে পেয়েছেন তাই লিখেছেন। মূল্যবান লেখা নিঃসন্দেহে। মডার্ন মার্কোপোলো বা হুয়েন সাং-এর লেখা বলতে পারো। মনে হয় আমার richer and deeper than her ancient predecessors in travelogue না, ঠিক ভ্রমণ কাহিনী নয়—critique বলতে পারো।

লেখিকা এদেশে একাধিকবার এসেছেন এবং প্রতিবার একটানা বহুদিন থেকেছেন ঘুরেছেন গত যুদ্ধের পর থেকে। কেরেলার কমিউনিস্ট রাজের সময়ে ঐ অঞ্চলে ছিলেন এবং খুঁটিনাটি বহুকিছু জেনেছেন। তেমনি মাদ্রাজও দিল্লীরও। নেহরুকে হাড় অবধি চিনতে আমি যতো বিদেশীকে দেখেচি, দিশী কারোকেই দেখি নি সেই তুলনায়, বলা চলে,—হয় পূজো নয় অভিসম্পাত এ-দেশের চরিত্রেই। এই ফরাসী মহিলার চোখে নেহরুর oxford-সিদ্ধ চরিত্র এবং সে চরিত্রের ভালোমন্দ উভয় রকমের প্রভাব ও

অভাবও লেখিকার নজরে স্পষ্ট ঠেকেছে। কম্যুনিস্টদের সম্পর্কেও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও উচ্ছ্বাসও নেই বা ক্রোধও নেই। সোজা কথায় লেখিকার মূল আগ্রহ—বহু যুগের এই ভারতীয় মানব গোষ্ঠির যে স্পষ্ট একটি সত্তা আছে তাকে জানা এবং আধুনিক ইতিহাসে সেই সত্তার কি দশা বা কোথায় স্থান, তথা, কি ভবিষ্যত—এই নিয়ে। অন্য কথায়, বেঁচে থাকার তাগিদের সঙ্গে, অভ্যস্ত ভারতীয় জীবনযাত্রা এবং পরিচিত চরিত্রের আজ যে সংঘাত স্বাধীন ভারতে চলেছে, সমাজে এর অন্তর্জীবনে সেই সংঘাতেই ভারতের ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচিত হচ্ছে—তুমি আমি আমরা ভারতীয়রা সেই সংঘাতে জড়িত। আমাদের মধ্যেই আধুনিকতার সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার বোঝাপড়া ঘটে চলেছে। কাজেই আমাদের পক্ষে পক্ষ নেওয়া সহজ স্বাভাবিক,—অন্যদিকে বিদেশীর চোখ (যদি আগে থেকেই কোয়েস্টলারের মতো ছানি পড়া না হয়) অপক্ষপাত দৃষ্টিতে দেখতে পারে। এবং, তেমন বিদেশী আমরা গত অন্তত একশ বছরে বেশ কয়েক জনকে পেয়েছি। আজ বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অমানুষিক অভিজ্ঞতার প্রথম আঘাতের পর থেকে ইয়োরোপের বুদ্ধিমানদের মহলে এশিয়া এমনকি 'বন্য' আফ্রিকা ও দ্বীপবাসীদের প্রতি সশ্রদ্ধ আগ্রহ নেওয়া শুরু হয়েচে। এদেশে ভেরিয়ার এলুইনকে আমরা চিনি, যেমন চীনে রেওয়ে আলি ও ডক্টর যোসেফ নীডহ্যামকে চেনে। এঁরা ইয়োরোপকে দুই মহাযুদ্ধ আর হিটলারি নরকাগ্নিতে দগ্ধ হতে দেখে এবং আধুনিক ইয়োরোপ ও আমেরিকার আনবিক শক্তিপূজা দেখে শুনে মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইয়োরোপ আমেরিকা cannot deliver the goods. আসলে মিলিটারিভুক্ত বৈজ্ঞানিক স্বর্গ গজভুক্ত কপিথের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য —spiritually bankrupt, এবং তাঁদের কাছে আরো বড় আতঙ্ক, সেই আত্মাহীন আত্মম্ভর ইয়োরোপ-আমেরিকা আজ এই বিরাট ও প্রাচীন এশিয়ার ঘাড়ে তাদের 'সভ্যতার' জগদ্দল চাপিয়ে দিয়েছে। আমাদের সভ্যতাকে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে sky scraper cum tractor 'সভ্যতা'য় কায়া পালটে দিতে চলেছে। তাঁরা ইয়োরোপ গুলে খেয়ে এশিয়ায় এসে মানুষ জীবটাকেই যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছেন—মানুষের সুস্থ সুন্দর সজীব স্নিগ্ধ রূপটাকে মাটির পৃথিবীতে হেঁটে চলে বেড়াতে দেখেছেন। আমাদের অকথ্য দারিদ্র্য দুর্দশা অন্ধের চোখেও পড়ে। তবু সেটা বাইরে থেকে—ইয়োরোপ থেকে আমাদের ওপর চাপানো জবরদস্তি করে। এটা তাঁদের কাছে মস্ত সত্য—আমাদের কাছে যত মস্ত তাঁদের কাছেও ততই।

তা সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের ইতিহাস ঘেঁটে ঘুঁটে আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করে আমাদের এমন একটি রূপ বা স্বরূপ আবিষ্কার করেন, যা সমগ্র মানব জাতের, বিশেষ করে আধুনিক দুঃস্বপ্নপীড়িত হতাশাক্ষুব্ধ জীবনে সত্যিকারের শান্তি আর আশার পথ দেখাতে পারে। এই সব মনীষীরা এক 'নতুন' tradition-এর অগ্রদূত বলা চলে—প্রাচীনের সঙ্গে নতুনের মানবোচিত মিলনের tradition—নতুন বই কি। কম্যুনিজম-এর পথ প্রাচীনকে ধূলিসাৎ করে, বড় জোর modernised করে, নতুনের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত—literally ব্যস্ত।

এই সূত্রে Dr. Needham-এর এশিয়া বনাম ইয়োরোপ নিয়ে একটি প্রবন্ধ থেকে quote করবার লোভ হচ্ছে, বারান্তরের জন্যে তোলা থাক। কিন্তু শলাপরামর্শ হিসেবে বলি, হংকং থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত মাসিকপত্র, ইংরেজি, Eastern Harizon পড়। রামানন্দ চট্টো-র যুগের 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভ্যু'-র সঙ্গে E H-এর তুলনা বেশ চলে—যেমন শাঁসালো সারময় তেমনি মুখরোচক আর পুষ্টিকর—অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এমন জর্নালিজম কদাচিৎ চোখে পড়েছে বা আমার মনে ধরেছে। কোথায় পাবে EH? বলা শক্ত। প্রথম সংখ্যা থেকে পঞ্চম অবধি কি মাসে কে বা কাহারা আমাকে পাঠান তা জানি না, অনুমান জন্ ব্লোফেল্ড—শ্যামের অধ্যাপক, বৌদ্ধ পণ্ডিত, সুনীলের বাড়িতে গত বছর এমনি দিনেই সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল। তিনি বা আর কেউ, জানি না। বোধ হয় সুনীল EH-এর প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে তোমায় আলোকদান করতে পারে—জিগ্যেস করো। আমি ওদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে লিখবো ভাবছি। কিন্তু এমন কি লিখতে পারি যাতে অতি বিনয় বা ডেঁপোমি প্রকাশ করা না হয়—তাই ভাবতেই দিন যাচ্ছে। ইয়োরোপীয় কায়দায় New year's greetings পাঠাতে গিয়ে সামলে গেছি—অথচ পাঠাচ্ছেন যখন আর ভালো লাগছে যখন, তখন নীরব থাকাও নেহাৎ অভদ্রতা, ভারতীয় হয়েও Thank you না বলাটা গায়ে বিঁধছে নিজেরই। বিশেষ করে বিনামূল্যে, বিনা কোনো contribution-এ পাচ্ছি যখন, তখন আমার কৃতজ্ঞতাটা যাকে বলা যায় most materialistic। কে আমার অমন হৃদয়বান বন্ধু হংকং-এ তাও জানি না। পত্রিকায় এশিয়া সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় ও এশিয়াজাত উভয় 'জাতের' অনেক বড় বড় ধীমান পণ্ডিতের সমাবেশ—চমৎকার ব্যাপার। শুধু অখাদ্য মুলুক আব্বাস, সর্বঘটে যেমন এখানে তেমনি আছেন—কিন্তু

ওরা যে ছোট গল্পের বেশি স্থান পায় নি তাতে সম্পাদকদের বিজ্ঞ দৃষ্টিরই পরিচয়। এদেশে আজ আর রবি ঠাকুর নেই তা ওঁরা কি করবেন? আশা করে আছি ভেরিয়ার কখনো ও পত্রিকায় কিছু লিখবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ভয়ে ভয়ে আছি হংকং-এর নাম না জানা দোস্ত যদি পত্রিকা পাঠানো বন্ধ করে দেন—তখন উপায়? অবশ্যি পড়ার ব্যাপারে উপোস করতে হবে তা নয়। বই, অপঠিত আমার কাছে, সংগ্রহে এখনো অনেক আছে। তবু পত্রিকাটি আমার দিল্ জুড়ে বসেছে এই কয়েক মাসেই—বিশেষ করে অতি সম্প্রতি সংখ্যাগুলি মন দিয়ে পড়তে পড়তে, almost যেন পায়ের নীচে মাটি পাচ্ছি মনে হয় আজকের তুনিয়ার ঘুর্ণি ঝড়ে। নীডহ্যাম এক মস্ত গ্রন্থ লিখে দিগ্‌বিজয়ী সুনাম অর্জন করেছেন—'Science and culture in China'. আজ অবধি তিন ভল্যুম বেরিয়েছে আরো প্রকাশ্য। মূল্য নিশ্চয় অকথ্য রকমে নির্দয়, কাজেই স্বপ্নেও হাত বাড়াতে পারব না ওদিকে। তবু একদা পড়ব এই স্বপ্ন দেখছি।

এই প্রসঙ্গে আমার বই সংগ্রহের 'ব্যাধির' স্বপক্ষে কিছু কথা মনে এল, তোমায় বলি। ব্যাধি বলেই শুরু করছি, কারণ ওটা সত্যি গরিবের ঘোড়া রোগ শ্রেণীর এবং আমি গরিব সে বিষয়ে আমার নিজেরই কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রোগটা পেয়েছিলাম অতি শৈশবে—মায়ের কিছুটা ছিল, যদিও রোগের পর্যায়ে নয়। তার চেয়েও বেশি করে বোধ হয় ছোঁয়াচ লেগেছিল বাংলার সেরা পণ্ডিতদের একজন, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির কাছ থেকে। অতি বাল্যকালে বাঁকুড়ায় নতুনচটি পাড়ায় তাঁর সুন্দর বাগানে ঘেরা সুন্দর বাড়িতে তিনি আমায় তাঁর কাছে রেখেছিলেন। মায়ের সই ছিলেন তাঁর ছেলের বউ, সেই হিসেবে তিনি আমায় তাঁর নাতি করে নিয়ে কাছে রেখেছিলেন মাস ছয়েক। সারাদিন আমি তাঁর লাইব্রেরির বইয়ের ধুলো ঝাড়তাম আর পত্রিকার ছবি দেখতাম। 'প্রবাসী'র অনেক ছবি আর তখনকার 'ভারতবর্ষে'র মলাটের 'খ্যাতনামাদের' portraits সব কেটে আমায় দিয়েছিলেন—ধুলোঝাড়া আর পত্রিকা গোছানোর বকশিস হিসেবে। আর এক বাক্স water colours-ও একদিন। তারপর ছাত্র বয়েসের শেষাশেষি সুরেশবাবু। বলতে পারো আমার এ-রোগ হাড় শেষ করে আমার অন্তরাত্মা অবধি প্রবেশ করেছিল, তা সে ঘোড়া রোগই বল আর যাই বল। অর্থাভাব তখনই তীব্রভাবে পীড়া দেয় আমায়, যখন ঘরভাড়া দিতে পারি না, আর যখন মনের মতো বই কিনতে পারি না।

বই যে পড়ি তা আজ শত্তুরেও মানে। কাজেই সে কথা তুলব না। কিন্তু বই সংগ্রহ আরেক আনন্দ আমার—যার কৈফিয়ত দেওয়া বেকার। যদিও এখানে কৈফিয়তই দিলাম। কি জানো,—আমার পক্ষে বইয়ের সঙ্গে দোস্তি যত সোজা, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সঙ্গে দোস্তি ততই কঠিন ব্যাপার। সব বই সম্বন্ধে তা সত্যি নয় অবশ্যি, তা আমার বই বাছার ব্যাপারে সংযমের খবর যদি রাখো তবেই বুঝবে। কিন্তু বইয়ের ব্যাপারে সাধারণত আমার নীতি, বইয়ের সাতখুন মাফ, যদি সত্যি কথা থাকে বইয়ে। মানুষ অনেক সময় সত্যি কথা শোনালেও ব্যবহারে আমার অসহিষ্ণুতাকে খোঁচায়—মানুষের সঙ্গে ভাব জমাতে পারি না —অন্তত একদিনে বা সহজে। কাজেই বই ঘেরা জীবন আমার বড় প্রিয়। তার ওপর, ঐ সব বিরাট intellectuals-দের বই ছাড়া ছুঁতে পারি সে হিম্মতও তো আমার নেই—শুধু নাম শুনেই ধন্য হই। বই পড়ে তাঁদের সাহচর্যসুখ ভোগ করি। তবে গ্রন্থকীট আমি ঠিক নই—বই এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে পড়ে ফেলে দেওয়া আমার স্বভাবে নেই। বইকে দৌলত বলে জানি মানি, তাই বই সংগ্রহ আমার সাম্রাজ্য গড়ে তোলারই সমান, বিলাসেরও বেশি ব্যাপার আমার কাছে। আর বেশি তোমায় না বললেও চলে। চিঠি-তত্ত্ব দিয়ে শুরু করেছি এ চিঠি, বই-তত্ত্ব দিয়ে শেষ করি আজকের মতো। রাত হল অর্থাৎ আজও তোমার বড় চিঠি এলো না। হয়তো কাল আসবে। আজ আরেকটা দিন ভালো বই ভালো চিঠি দুয়ের অভাবেই দিন কাটলো—মানে আরেকটা দিন, যা আর নাকি ফিরে আসবে না—হাতে রইল পরম সত্য—আমি এ ধরায় শুধু গরিবই নই, বেশ একাও বটে। 'ওটা বাইরের সত্য মাত্র' এই বলে প্রবোধ যদি দাও বলব, ওটা তর্কের প্রবোধ; ওতে মুখ বন্ধ হয়—পেটে খিদে থেকেই যায়। যদি বলো, 'বঙ্গে ফিরে এসো', তবে আবার বলব, ওটা উপদেশ, মধুর উপদেশ সন্দেহ নেই। কিন্তু সব উপদেশেই মুখ বন্ধ হয়, পেটে খিদে থেকেই যায়। তবে লাচার বাবা? তবে আমিও চুপ।

শোনো, তারা প্রতি চিঠিতেই তোমায় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাতে লেখে আমায়—গত হপ্তায়ও লিখেছে। ওরা ভালো আছে, মানে সুস্থ আছে, বাচ্চারা সুখে আছে।

একটু আগে বিমল দত্ত এসেছিল, এখনো সে রবীন্দ্র উৎসবের কেচ্ছা নিয়ে গাঁজাচ্ছে, উৎসবটা যদি কেচ্ছা না হয়ে সত্যি ইতিহাস হত তবে

এ যুগের রত্ন সন্তান, বিশেষ করে intellectual যুবকেরা বিপদে পড়ে যেত। জলের চেয়ে কাদাই এদের বিচরণের পক্ষে সহজ ক্ষেত্র। ওর মুখে মুলুক উল্লুকের latest কেচ্ছা শুনলাম। মুলুক নাকি কোন এক বিদেশী এবং বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকায়, অনুরোধে, বৌদ্ধধর্ম নিয়ে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখে সম্প্রতি। সে প্রবন্ধ পড়ে এক বৃটিশ বৌদ্ধ পণ্ডিত যা বিস্তারিত প্রমাণ প্রতিবাদ করে সেই পত্রিকাটিতেই দেখিয়েছেন যে মুলুকের লেখা আদ্যোপান্ত এক পুরোনো পণ্ডিতের লেখার হুবহু চুরি—word to word চুরি para by para চুরি! এই হলো অক্সফোর্ড ফেরৎ (পাঁইয়ার) culture—এবং এঁরাই এদেশের আধুনিক culture-এর দুই কর্ণ—আর্থিক পারমার্থিক—দুমুঠোয় ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এদেশে ইতিহাসের যুগ আজ আর নেই, আছে কেচ্ছার। কিছুদিন আগে আব্বাস ধরা পড়ে ছিল ফিল্মের গল্প চুরি করে!—থাক কেচ্ছা। ভালোবাসা নিয়ো।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

চিত্তপ্রসাদের চিঠিগুলি লেখার দিক থেকে প্রায়-নির্ভুলই। বোঝা যায় লেখার অভ্যাস তাঁর বেশ ছিল। আমরা মূল চিঠি হুবহু অনুসরণ করেছি। বানানের সামান্য কিছু সামঞ্জস্যবিধান করা হয়েছে। আর, মাত্র কিছু জায়গায় যতিচিহ্নাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্পাদনার ব্যাপারে, নেহাত অনিবার্য কারণে দুটি-একটি অংশ বাদ দিতে হয়েছে। তাতে মূল চিঠির কোনো ক্ষতি হয় নি। রীতির দিক থেকে হয়ত উল্লেখিত জীবিত ব্যক্তিদের নামও বাদ দেওয়াই সঙ্গত হত। কিন্তু, চিত্তপ্রসাদের কর্ম, চরিত্র ও জীবনের প্রধান ঝোঁক ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবনই এই চিঠিগুলি প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে। ব্যক্তিনামবর্জনে সেই অনুধাবনের ক্ষতি হত। আশা করি তাঁরা আমাদের মার্জনা করবেন।

সম্পাদক

গোপাল হালদার

'পরিচয়'-এর রূপান্তরের হেরফের

'পরিচয়ের সম্পাদক' নামে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের—অবশ্য তা শেষ হয়েছে যে তাও কম দিন নয়, সম্পর্কটা যদিও লুপ্ত হতে পায় নি। পঞ্চাশ বৎসরে পৌঁছে 'পরিচয়ে'র প্রাজ্ঞতা-প্রবুদ্ধ ভবিষ্যতের কামনায় তাই উৎফুল্লবোধ করি। সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি পিছনের কয়েক বৎসর—'আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে। এ আমার পরম বিস্ময়।'

আহ্বান এসেছিল, কারণ পরিচয়ে তখন হচ্ছিল রূপান্তরের আয়োজন কালান্তরের প্রয়োজনে। ১৯৩২-এ যখন সুধীন্দ্রনাথ 'পরিচয়' প্রকাশিত করেন তখন তার পটভূমিতে একদিকে ছিল ১৯২৯-এর অর্থনৈতিক মন্দায় বিপর্যস্ত বুর্জোয়া জগৎ, অন্যদিকে 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক সংকল্পে' উদ্দীপিত সোভিয়েত কর্মযজ্ঞ। মাঝখানে, আমাদের অব্যবহিত পরিবেশে, ছিল সাম্রাজ্যবাদে বিক্ষুব্ধ ও 'রাশিয়ার চিঠি'তে উচ্চকিত জীবনজিজ্ঞাসা। 'পরিচয়ে'র প্রথম সংখ্যাতে নীরেন্দ্রনাথ রচিত ঘোষণাপত্রে 'পরিচয়'-এর তৎকালীন সচেতনতা জ্ঞাপিত হয় যথেষ্ট উদার কণ্ঠে ও সুস্থ বিশ্বাসে—মানব-সংস্কৃতির পরিচয় মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া যেমন তার প্রয়াস, আপন পরিচয়কে তেমনি বিশ্বের সম্মুখে উপস্থাপিত করা তার লক্ষ্য। দেখি—মানব-প্রগতিতে যেমন তার শ্রদ্ধা, আপন শক্তিতেও তেমনি তার প্রত্যয়। ত্রৈমাসিক 'পরিচয়'-এ এই দুই ধারা যে রূপে প্রবহমান তা সর্বরকমেই পরিচালকদের শ্লাঘার বিষয়; বাংলা কেন, অনেক অগ্রগামী পাশ্চাত্য সাহিত্য-পত্রের পক্ষেও তা শ্লাঘ্য হত। ত্রৈমাসিকের আসরের বিলম্বিত চাল যথেষ্ট হল না, ফ্যাসিজমের উদ্দাম তাণ্ডবে পৃথিবীর শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার মানবীয় কৃতিই চারদিকে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সে-দিনের উদ্দীপ্ত প্রতিবাদ আমরা জানি। 'পরিচয়ে'রও প্রতিবাদ-মুখর

হওয়া স্বাভাবিক। সভ্যতার সংকটে 'পরিচয়'-এর দিগ্‌ভ্রান্তি ঘটে নি। কিন্তু তার বৈদগ্ধ্যে ছিল সংকল্পের অস্পষ্টতা। 'রূপ-বিরূপের নৃত্য চিরকাল চলে'—এও কি সত্য নয়? তাই সংশয় আসে প্রগতির অস্তিত্বে। 'কম মন্দ ও বেশি মন্দের দ্বন্দ্বে' কী-ই বা আছে বাণীবিদগ্ধ মানুষের প্রার্থনীয়? অনিশ্চিতবোধে উদ্যোগ শিথিল হয়, 'পরিচয়' গতানুগতিকতায় নিশ্চল হয়ে আসে। দিন-বদলের প্রতি অরুচিতে কর্তৃপক্ষ অব্যাহতি খোঁজেন। হাত বদলে পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি 'পরিচয়'-এর সুহৃদ-সহায়কদের মধ্যস্থতায় পত্রের সত্ত্বাধিকার ক্রয় করে সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করে—সভ্যতার নবজন্মের আয়োজন সকল মানুষেরই দায়িত্ব—'পরিচয়ে'রও সে-উদ্যোগে নেওয়া উচিত বিশেষ স্থান। সুহৃদ লেখকদের সহায়তায় চাই—'পরিচয়'-এর মূল আদর্শের কালোচিত বিবর্তন, ইতিহাসের নিয়মে তার প্রয়োজনীয় রূপায়ন—প্রয়োজন মানুষের মুক্তির আয়োজনে আক্ষুদ্র সকল মানুষের মননশীলতায় জাগ্রত ও সৃজনশীলতায় প্রবুদ্ধ করা—সর্বজনীন সংস্কৃতির উজ্জীবন।

'পরিচয়'-এর সেই রূপান্তরের আয়োজনে আমাদের তাই ডাক পড়ে—পূর্বগামীদের সঙ্গে প্রগতির পথে সহগামী হবার, পা মেলাবার নতুন যাত্রায়, হাত মেলাবার ভাবী কালের পথ-প্রস্তুতিতে। সে প্রয়াসের হিসাব 'পরিচয়ে'ই লিপিবদ্ধ, এখানে তার উল্লেখ আমার পক্ষে বাহুল্য। সলজ্জ খেদে স্বীকার্য আমাদের নিজেদের পুনঃপৌনিক ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি, অন্তত (ব্যক্তিগতভাবে) আমার অকৃতার্থতা। অগ্রজ সুহৃদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ধন্য হয়েছি আমরা, 'পরিচয়'-এর বাহকরা, তথাপি সকৃতজ্ঞচিত্তে পূর্বাপর তা স্বীকার্য। আর সেই সঙ্গে স্মরণীয় 'পরিচয়'-এর পাঠক-সমাজের সহিষ্ণুতা, পরিচালকদের অপরাধ-মার্জনা, 'পরিচয়'-এর জন্য অপরিসীম মমতা।

তখন যুদ্ধকালীন দুর্ভোগের দিন—'পরিচয়'-এর কাগজের বরাদ্দ নামমাত্র, তাতে রূপের বিলুপ্তি রোধ করা গেলেও রূপান্তরের দাবি মেটানো তো অসম্ভবই, তার আভাস বহনও দুঃসাধ্য ছিল। তথাপি নবপর্যায়ের 'পরিচয়'-এর তখনকার শীর্ণ দেহের মধ্যে প্রাণের সুস্থ প্রবাহ আবিষ্কার করা গেল, তাই আশ্চর্য! যাঁদের রক্তদানে প্রাণ রক্ষা হয়েছে তাঁদের অনেকেরই কথা এখন আর জানা যাবে না—মাত্র কিছু নাম 'পরিচয়'-এ ছাপার অক্ষরে রক্ষিত হয়েছে—সম্পাদক, লেখক ও পরিচালকের সূত্রে। নীরেন্দ্রনাথ রায়,

হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে আমার নামও আছে যুক্ত। সহকারী রূপে আমরা যাকে প্রথমেই লাভ করেছিলাম, তাঁর নাম কিন্তু নীরেনবাবু-হিরণবাবু আজ বেঁচে থাকলে সকল নামের পূর্বেই উল্লেখ করতেন—আমিও তা-ই করতে চাই—তিনি রবীন্দ্র মজুমদার। বৎসর দুই পরিচালনার পরেকমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃপক্ষ একবার 'পরিচয়'-কে তাঁদের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করেছিলেন—'রক্তপতাকা'। আমাদের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করেছিলেন নীরেন রায়; আর নীরেনবাবু আমাদের 'পরিচয়'-এর পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে তা সস্নেহে রবীন্দ্র মজুমদারের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, 'এটি তোমারই প্রাপ্য তোমার কর্তব্যবোধের জন্য।'

নীরেনবাবু ছিলেন ঐকান্তিকভাবেই 'পরিচয়'-এর সম্পাদক—ক্লাশে তাঁর ছাত্ররা দেখত অধ্যাপনায় তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা; 'পরিচয়'-এর কাজেও আমরা দেখতাম তদ্রূপই ঐকান্তিকতা। সেই ছাত্রদের মতো 'পরিচয়'-এর কর্মীদেরও শ্রদ্ধায় সতর্ক থাকতে হত। রসবোধ তাঁর সামান্য ছিল না, সাহিত্য পাঠে ও সুহৃদ সমাজে। কিন্তু যেখানেই কর্তব্যের দায়িত্ব, সেখানেই তিনি অন্য মানুষ—কোনোখানে নেই একটু ফাঁক বা ফাঁকি। সকলের তিনি সম্মানিত, কিন্তু সকলেই তখনকার মতো একটু থাকতাম অস্বচ্ছন্দ। লেখায়, তাঁর সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধির বিশুদ্ধতার অতিরিকে বেশ-একটু মাত্রায় অনমনীয় ও কঠিন। তাঁর বন্ধু হিরণ সান্যাল ছিলেন অনেকটা তাঁর বিপরীত দিকের মানুষ, তাঁর সঙ্গ যেমন উপভোগ্য, তাঁর লেখাও তেমনি উজ্জ্বল স্বচ্ছতায় ও সরসতায়। হিরণবাবুর লিখিত 'পরিচয়'-এর 'কুড়ি বছর' লেখায় ও লেখার বাইরেকার 'পরিচয়'-কে পরিচিত করেছে। কিন্তু আমাদের নালিশ, সম্পূর্ণ না করে পাঠকদের তিনি ফাঁকি দিয়েছেন। এই দুই 'পরিচয়'-এর আদি সুহৃদদের সঙ্গে 'অধিকন্তু' ছিলাম আমি।

সম্পাদকের কাজে আমার যা সামান্য জ্ঞান তা 'পরিচয়'-এর উপযোগী ছিল না, যা ধারণা তাও 'পরিচয়'-চালনায় প্রযোজ্য হত না। ইতিপূর্বে ইংরেজি-বাংলায় কলম চালিয়েছি এক রকম করে—ভালো, না মন্দ, কে রেখেছে তার হিসাব? কিন্তু সম্পাদকের কাজ তো লেখা ততটা নয়, নিজে লেখা থেকে পরের লেখা দেখাই তার কাজ। আমার পক্ষে তা উপাদেয় হত না। নিজের লেখার ত্রুটি নিজের চোখে পড়ে না। অপরের লেখার ত্রুটি যদি বা বুঝতে পারি, কিছুতেই তা তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারি না—বিচার অপেক্ষা

সহযোগীর দৃষ্টি নিয়ে আলাপ-আলোচনায় হয়তো কিছুটা তা সম্ভব হয়, কিন্তু সে অবকাশ কোথায়? অনেক দিকে যে সম্পাদকের দৃষ্টি রাখা চাই—যে কাগজের প্রধান, হয়তো বা একমাত্র দ্রষ্টব্য পাঠক-তোষণ, 'পরিচয়' তেমন কাগজ নয়। 'পরিচয়' সাহিত্যপত্র—অথবা সংস্কৃতিপত্র—আবার নিছক তাও নয়। তার প্রধান কাজ নূতন সংস্কৃতির চেতনা সৃষ্টি, চেতনা বৃদ্ধি, যুদ্ধকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরীক্ষার মধ্য থেকে ভাবীকালীন সৃষ্টির সম্ভাবনাকে চেনা, জানা, পাঠকের চৈতন্যকে প্রসারিত করা। মূল নীতি সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ আমাদের কারো ছিল না। কিন্তু নীতি অপেক্ষা রাখে পদ্ধতির, পরিবর্তমান জগতের পরিস্থিতির সঙ্গে পদ্ধতির মিল না ঘটলে নীতির কোনো অর্থই থাকে না। মাসে মাসে পত্রিকা পরিচালনায় তার প্রয়োগ সঠিক রাখা সহজ কথা নয়—তার মাত্রা ক্ষণে ক্ষণে বেঁকে যাওয়া আশ্চর্য নয়। বিশেষত, আমাদের দায়িত্ব 'পরিচয়'-এর মালিকদের কাছে, সেই সংগ্রামী রাজনৈতিক পার্টির সদস্য আমরা সকলে নই, যাঁরা সদস্য তাঁরাও যে সকল প্রশ্ন একইভাবে দেখি বা বুঝি তাও নয়। তাই সেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর পরিচালকদের কার্যক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটাও অসম্ভব নয়। আজ এত বৎসর পরে বলা বোধহয় অন্যায় নয়—এই প্রথম সমস্যাটা কিন্তু মোটেই কার্যত বিশেষ সমস্যা হয়ে উঠতে পারে নি। এমন কি, যখন হওয়া উচিত হত, তখনও নয়।

কমিউনিস্ট পার্টি (বাংলার) 'পরিচয়'কে নিজেদের 'পলিসি' প্রচারের জন্য হাতে নেয় নি। তাদের যুদ্ধকালীন মতামত সুবিদিত, সুস্পষ্টভাবে তা প্রচারের জন্য দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্র ও নানা প্রচারপত্র ছিল—যতই প্রচার সংখ্যা প্রচুর না হোক, তার লেখার গুণ সামান্য ছিল না, সমালোচকরাও তা মানতেন। সে সবে নিজেদের মতবাদ দৃঢ় স্থির কণ্ঠে তাঁরা বলতে জানতেন, এবং বলতেন; সে জন্য 'পরিচয়ে'র প্রয়োজন ছিল না। 'পরিচয়ে'র পাঠক সুশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। জিজ্ঞাসায়, মননশীলতায় ও রূপ-রসের সৃষ্টিতে ও আলোচনায় তাঁদের রুচি। একটু 'উন্নাসিক' বলেও তার খ্যাতি। তার বুদ্ধিজীবী ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে তাকে ব্যাপকতর বুদ্ধিজীবী সমাজের মুখপত্র করা প্রয়োজন; নতুন জীবননিষ্ঠ ভাবাদর্শে (ইডিয়োলজিতে) প্রবুদ্ধ করা, প্রগতির পথে সক্রিয় করা, অন্য প্রয়োজন। ঐতিহাসিক গতিধারা মনে রেখে বাস্তব-বুদ্ধিতে—স্তর থেকে স্তরান্তরে—কালান্তরের অভিমুখে—এ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে এগিয়ে

নিয়ে চলা—কমিউনিজম নয়, প্রগতি—এই তখনকার মত যথেষ্ট—এটাই ছিল পার্টি-কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ও নির্দেশ।

পার্টি সম্পাদক ভবানী সেন, নের্তৃপক্ষীয় মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ ও সোমনাথ লাহিড়ী ছিলেন 'পরিচয়' পরিচালনা ব্যাপারে সমুৎসুক। আর, সর্বোপরি প্রধান, পম্পাদক পি সি যোশী। তাঁদের সঙ্গে আলাপ, কথাবার্তাও প্রায়ই হত। মনে পড়ে, ভবানীবাবুর সঙ্গে আলোচনায় এ সূত্রটাই অনুমোদিত হয়—'পরিচয়ে'র 'মত আছে, মতবাদ নেই'—'পয়েন্ট অব ভিয়্যু' আছে, কিন্তু 'ডগ্‌ম্যাটিজম্' নেই—'এ-যুগের দৃষ্টি ও এ-যুগের সৃষ্টির বাহন হতে চায় 'পরিচয়'। সম্ভবত যোশীর অনুমোদনও পেয়েছিল সূত্রটা। কিন্তু 'পরিচয়' কতদূর তাতে যেতে পারে? ভবানীবাবু একটা ব্যবহারিক মাত্রা স্থির করেন—যা 'পার্টির পলিসি' তার বিরুদ্ধাচরণ না করা, কোনো আলোচনা যদি সে 'মাত্রা' পেরিয়ে যায়, তা অন্যদিকে প্রকাশযোগ্য হলে প্রকাশ করা, (সম্পাদকীয়) বিচারে মত-পার্থক্য পরিষ্কার করা দিলেই হবে। পাঠক সমাজকে গণ্ডীতে পোরা নয়—তাকে এগিয়ে দেওয়া। মোটামুটি এই ছিল পার্টি নেতৃত্বের অভিমত—অন্তত তখনো—এখনো,—এই ছিল আমার ধারণা (এ ধারণা ঠিক কিনা সোমনাথ লাহিড়ী বলতে পারবেন)। আমাকে আরেকটা কথাও বলা হয়েছিল—পূর্বকার 'পরিচয়'-সুহৃদদের পরামর্শ মান্য করা, বিশেষ করে, সম্পাদকীয় অগ্রজ সুহৃদদের সঙ্গে সহযোগিতা ঘনিষ্ঠ করা। এ কর্তব্যে আমারও অভিরুচি ছিল, আর পালনেও বেগ পেতে হয় নি—আমারও না তাঁদেরও না। নীরেন্দ্রনাথের দৃঢ়তা ও আমার নমনীয়তা মানিয়ে যেত, হিরণকুমার সান্যালের এই সরসতায় মিশিয়ে যেত সব। তাঁদের পরে আমার যাঁদের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে—মাঝে-মাঝে কাজে ছেদ গিয়েছে—সে অন্য কথা,—কিন্তু ননী ভৌমিক, সুভাষ-মঙ্গলাচরণ থেকে দীপেন্দ্রনাথ পর্যন্ত, যখন যাকে সহযোগী পেয়েছি সকলের সঙ্গেই মনে ও মতে মিল ছিল অনায়াস। এঁরা ছাড়া 'পরিচয়'এর উপদেষ্টা ও পরিচয়-গোষ্ঠীর সঙ্গে দৃষ্টির তফাৎ এক আধটুকু ঘটলে, তা মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয় নি। একটা কথা উল্লেখযোগ্য—এতক্ষণ যাঁদের নাম করা হয় নি তাঁদের মধ্যে পূর্ব থেকেই অধ্যাপক সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন আমার প্রায় সর্বরকমে শ্রদ্ধাভাজন লেখক। আমাদের সময়ে 'পরিচয়' বলতে এঁদের যদি না বোঝাত তবে বোঝাত কাকে? আমাদের? আর একজন এঁদের সঙ্গে

যিনি উল্লেখযোগ্য,—এবং কার্যত দৈনন্দিন কাজেও যিনি ছিলেন নিশ্চয়ই সহজলভ্য পরামর্শদাতা, এবং সর্বদা আমাদের সহকর্মী ও সহমর্মী, তিনি অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। কী সাহিত্যের বিচারে কী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধে-আলোচনায়, কী তত্ত্ব ও কর্তব্য বিশ্লেষণে, লেখার যোগ্যতা পরীক্ষায়—তাঁর মতো সুপণ্ডিত ও সুলেখক বিরল। দুঃখ এই—এমন মানুষের ধারাল বুদ্ধির, সূক্ষ্মবোধের ও নাতিতীব্র বিদ্রূপ-দক্ষ লেখকের গ্রন্থাকারে স্থায়ী পরিচয় বাঙালি পাঠক পেল না। সম্পাদনা বা পরিচালনায় যাঁদের প্রত্যক্ষ দেখা গিয়েছে তাঁদের নামই বললাম—লেখকদের কথা বলেছি পরিচয়েই পাওয়া যাবে। এরূপই দু-একটা নাম হয়তো এ সঙ্গে বলা উচিত ছিল—যেমন, চিন্মোহন সেহানবীশ, 'পরিচয়'-এর অনেক বোঝাই যাকে বইতে হত, লেখা ও প্রকাশনার মতোই অর্থচিন্তা-ও।

'পরিচয়'-এর চিরকালই মাথাব্যথা অর্থাভাব। এজন্য লেখকদের (একজন ছাড়া) কাউকে 'পরিচয়ে'র দক্ষিণা দেবার সামর্থ্য হয়নি। এমন কি তারা শঙ্করবাবুকে একবার দিতে চাইলে, তিনি সে টাকা দিয়ে 'পরিচয়'কে ভালোভাবে চালাতে বলেন। অর্থাভাবের কারণের মধ্যে প্রধান এক কারণ ছিল—যার জন্য পূর্বপর্বের 'পরিচয়ে'র 'পুস্তক পরিচয়ে'র ঐতিহ্য আর অক্ষুণ্ণ রাখা যায় নি—অবশ্য সুযোগ্য নতুন সমালোচকও আর ওদিকে সহজলভ্য হয় নি—তা আমারও অকৃতিত্ব—আকৃষ্ট করতে পারি নি। আপাতত বলতে চাই—পার্টি, পার্টির প্রগতিপন্থী বন্ধুরা, ইণ্টারন্যাশনাল পাব্‌লিশার্স ছাড়া এবং 'পরিচয়'-এর মমতাবান্ পাঠকদের কতজনের যে মাথা সময়ে-অসময়ে 'ভেঙেছি', তার সাক্ষ্য 'পরিচয়ে'ও আইন-আদালতে কিছু কিছু আছে, কিন্তু ডাঃ মণি বিশ্বাসের মতো আরও অনেক সুহৃদদের কথা একমাত্র চিন্মোহনবাবুই জানেন, অন্যেরা বিশেষ নয়।

এ প্রসঙ্গেই কি বলব—অর্থানুপযোগের একটা কারণ 'পরিচয়'-এর বিজ্ঞাপন-ভাগ্য—অর্থাৎ বিজ্ঞাপনা দুর্ভাগ্য। চেষ্টা করেও সে ভাগ্য ফেরানো যায় নি—অনেক সময়ে যে বন্ধুরা ঝুঁকি নিয়ে দু-একটি বড় কোম্পানির বিজ্ঞাপন বজায় রাখছিলেন তাঁরাও হতাশা হয়েছিলেন। দু-একটা কারণ নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করি—'পরিচয় কমিউনিস্ট'—এ অখ্যাতিই প্রধান কারণ। যাদের তা সত্ত্বেও বিজ্ঞাপন ছিল তাদেরও মনে করিয়ে নিরস্ত করার মতো চেষ্টা অনেকে না করতেন তা নয়। অন্তত দু-একটি ক্ষেত্রে জানি স্বাধীনতার পরে পঃ বঃ

কংগ্রেসের নেতৃত্বও এ চেষ্টা করেছিলেন—সার্থকভাবেই। আরও কারণ আছে—আমরা পুস্তক সমালোচনায় নির্ভেজাল প্রশংসা করি না, এ কারণ স্পষ্টই বলেছেন প্রকাশক-বিজ্ঞাপনদাতারা। একটি বিরূপ সমালোচনার জন্য আমরা হারাই (আমাদের বহু সম্মানিত) এক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। মন্তব্যটি ছিল আমার—দোষটা সম্পূর্ণই আমার। বিজ্ঞাপন নয়, একটি গল্পের জন্য তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে 'পরিচয়'-এর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়—আমরা হারাই শ-পাঁচেকের বেশি গ্রাহক। পাঠকেরা লক্ষ্য করেছেন বাংলা অন্যান্য দৈনিক-মাসিক পাতা ভরে পেয়েছে যখন সোভিয়েত প্রচার বিভাগের বিজ্ঞাপন—ও লেখা—'পরিচয়'-এর তা লভ্য হয় নি। একটা কারণ, আমরা (অর্থাৎ আমি) তা চাই নি। এমন ছোট-বড় কারণ অনেক আছে—থাক তা মনে রাখতে চাই না। বরং যাঁরা তথাপি 'পরিচয়'কে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন তাঁদের কথাই মনে রাখতে চাই।

বলি লেখা ও লেখকদের কথা—অবশ্য স্থানাভাব, আর আমারও এ মুহূর্তে দৈহিক ক্ষমতার অভাব। অনেক মজার কথা মনে পড়ে, বলে উঠতে পারি না, হয়তো তা পারতেন হিরণকুমার সান্যাল। আমি নতুন লেখককে—ব্যক্তিগত বন্ধুস্থানীয় লেখকদেরও 'পরিচয়'-এ লেখাতে বিশেষ পারি নি—সে দোষ আমার, এগুণ খানিকটা ছিল নীরেন রায়ের, (পরে) দীপেনের। দু-একটা কথা মনে খচ্-খচ্ করে। পূর্বাবধি যাঁরা 'পরিচয়'-এর লেখক সুহৃদ তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি বিষ্ণু দে। স্বীকার করি তখন আমি তাঁর কবিতা 'দুর্বোধ্য' মনে করতাম—পরে করি নি তাও সত্য, কিন্তু ঐ যুক্তিতে(?) তাঁর লেখার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট বন্ধুদের নানা সমালোচনায় আমার আপত্তি ছিল। 'জনগণে'র সহজ বোধগম্য করে কবিতা থেকে আরম্ভ করে সাহিত্য তত্ত্ব সব কিছু লিখতে হবে—এ কথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা ভুলে যান এই নিরক্ষরতার দেশে তা হলে 'কথামালা'ই লেখা চলে। যাঁরা দাবি করতেন, স্বল্প-শিক্ষিত সাধারণ শ্রমিকদের জন্যই 'পরিচয়'-এর লেখা, তাঁরা কি সেই 'সাধারণ শ্রমিক'কে এগিয়ে নিতে চান, না নাবালক রাখতে চান? আমার মতে মানুষের বোধশক্তি সম্বন্ধেও তাঁদের জ্ঞান নেই—শ্রমিক কৃষকের প্রতিও তাঁদের আস্থা নেই। অন্তত তাঁদের কথাও আমার নিকট অশ্রদ্ধেয়। তবু কিছুটা মানতে হয়েছে এসব। 'কমিউনিস্ট' কর্মীরা মাননীয়। আজ শেষদিন সমাগত, পারলে ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ করে ও জাতীয় 'কমিউনিস্ট যুক্তির' জন্য অনেক লেখকের নিকট ক্ষমা চাইতাম—বিষ্ণুবাবুর কাছে,

মানিকবাবুর কাছে—এবং আমার শ্রদ্ধেয় অনেক লেখক বন্ধুর কাছে যাঁদের লেখা চেয়ে আমি তাঁদের এভাবে বিড়ম্বিত করতে চাই নি। পার্টির কর্মীদের দোষ দিই না—উদ্দেশ্যসিদ্ধির দৈনন্দিন গরজে তাঁরা চাইতেন 'পরিচয়' যখন পার্টির কাগজ, 'পরিচয়'-কে পলিটিক্সের নগদ-বিদায় দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ তাঁদের বোঝান নি—'পরিচয়' সে জন্য নয়, তা 'জনযুদ্ধ' নয়, 'স্বাধীনতা' নয়। দৈনিকের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ নিশ্চয়ই অমূল্য কিন্তু লেনিন ও গোর্কি প্রভৃতির কাছ থেকে চাইতেন না, তাঁরা গল্প উপন্যাসে প্রাভ্‌দার সম্পাদকীয় লিখবেন। তাছাড়া, সোভিয়েত লেখক সংঘে মতামত যতই যখন প্রবল হোক, তা অনেক সময়েই নির্ভুল নয়, আর তা পরিবর্তিতও হয়। 'ক্রিয়েটিভ্‌ কমিউনিজম্‌' কথাটা তখন প্রচলিত হলে এ সত্যও মানতে বাধা হত না। তবু পার্টির খোদ নেতৃত্বের থেকে বাধা বিশেষ পাই নি। কেবল একবার মনে পড়ে তাঁদের নির্দেশে দার্শনিক একটা প্রবন্ধের বিতর্ক বন্ধ করতে হয়—একজন তার্কিক লেখক তাঁর কৌশলে প্রথম আমাদের নিরুপায় করেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার কৌশলও তার জানা,—কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সে আলোচনাও বন্ধ করবার সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন। এরূপ উপলক্ষ্য আর বিশেষ ঘটে নি। স্বীকার করতে হবে, যখন 'পার্টির' নীতি গুরুতরভাবে উল্টে গেল—১৯৪৮-এ 'পরিচয়'-এর আমরা—এবং আমিও—তাতে আপত্তি করি নি। পরে ১৯৪৮-এর প্রারম্ভ থেকে যা ঘটল তার অনেক কর্মপদ্ধতি ও কর্মকাণ্ড ছিল আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক দুই বোধেরও বিনষ্টিসূচক। সংশয় বোধ করেছি বারবার। কার্যত বাধা দিই নি ; নিজকে বোঝাতে চেয়েছি সমবেত জ্ঞানের অপেক্ষা একজনার ব্যক্তিগত মতামত বেশি নির্ভুল নয়। সে মূঢ়তাকে বাধা দিতে না পারা, আমি মনে করি, 'পরিচয়' সম্পাদক হিসাবে আমার প্রথম ব্যর্থতা। অবশ্য বাধা দিলেও ব্যর্থ হতাম। তবু বাধা দিই নি সেই আসল কথা। বাধা না দিলেও কিন্তু যথেষ্ট বিরূপতা অর্জন করতে বাধা হয় নি। সে সময়টা 'পরিচয়ের'-ও রাহুগ্রাসের কাল—আমার তো 'পরিচয়' থেকে পূর্ণ গ্রাসই ঘটেছিল। তবু প্রীতি ও মমতা বোধ করি সেই পরিচালকদের প্রতি, ভুলত্রুটি সত্ত্বেও যাঁরা 'পরিচয়'কে তখনো আঁকড়ে ছিলেন, কারণ মতানুগত্যেরও মূল্য আছে। সেই ব্যাহত রূপান্তরের অধ্যায় অবশ্য শেষ হল—সেই অন্ধকার অভিজ্ঞতা 'পরিচয়'কে আবার কিছুটা সুস্থ করতে চেষ্টা করেছে ; কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন তার স্বাস্থ্য কি তার পরে ফিরে পেয়েছে ? অবশ্য শ্রমিক-কৃষক

আজ অনেক বেশি সচেতন—রাজনীতির স্বার্থে কি? আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন পার্টির নেতৃত্বে এখনো তাঁরা স্থান পেয়েছেন? প্রগতি আন্দোলনের মধ্যে নিবারণ পণ্ডিত, রমেশ শীল, শেখ গোমানিরা একদিন পূরণ চাঁদ যোশীর সাংস্কৃতিক দৃষ্টি ও নীতির দ্বারাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার বেশি কি পরে সরকারি-বেসরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে জন-শিল্পীদের সত্যই স্থান হয়েছে? বাংলায়, আর ভারতবর্ষের কোথাও?

'পরিচয়'-এর পক্ষে আক্ষরিক অর্থে 'জনসাহিত্য' সৃষ্টি সহজ ছিল না—যখন শতকরা ৭০ জনই সাক্ষরও নয়। বাধ্য হয়েই প্রগতিমুখী সাহিত্য সৃষ্টিই ছিল 'পরিচয়'-এর প্রয়াস—তার সাহিত্য of the people, for the people হতে পারত, by the people হয় নি। রূপান্তরের কিছুটা সার্থক চেষ্টা হয়েছে—প্রগতি আন্দোলনের সহযোগে সাহিত্যে বাস্তবতার কতকটা প্রবর্তন, জনসাধারণের জীবন সাহিত্যের বিষয়ীভূত করায়, সংস্কৃতিকে জনমুখী করায়, সর্বজনীন করা যায় নি। এ ব্যর্থতা 'পরিচয়'-এর পক্ষে ছিল অনিবার্য, কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পার্টিগুলির পক্ষেও তা হল কেন? তা এখনও দূরীকৃত হয়েছে, জানি না।

'পরিচয়'-এর আমাদের কালের প্রধান ব্যর্থতা এখানে—আমাদের পরে দীপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি একটা অসাধ্য সাধন করেছেন—'পরিচয়'-এর লেখা উন্নত করেছেন, লেখার মান এখন উন্নত, 'পরিচয়' অধিকতর মর্যাদার অধিকারী—তবে অর্থভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে কিনা, প্রকাশনার এই দুর্দিনে তা বলা অসম্ভব।

আমার ব্যক্তিগত ত্রুটি সম্বন্ধে আমি এত সচেতন, তাই আমার হাত ধরে 'পরিচয়' সত্যই তার কর্তব্য প্রতিপালন করতে পেরেছিল কিনা বুঝি না; কথাটা এখনকার শিক্ষিত সাধারণের রূপ দেখেই কী বুঝতে পারি? যদি কিছুমাত্র পেরে থাকে যে-নীতি আমরা গ্রহণ করেছিলাম তাকে রূপায়িত করতে তবে সে কৃতিত্ব যাঁদের প্রাপ্য তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমার নয়, বরং উল্লেখ করব—কৃতিত্ব 'পরিচয়'-এর কর্মী বন্ধুদের, মাসের পর মাস তাঁরা বিনা বেতনে (একজন কর্মী পেতেন নামমাত্র দক্ষিণা বা ভাতা) কর্মী বন্ধুরা যে-সব কাজ চালিয়ে গিয়েছেন যা লোকচক্ষুতে পড়ে নি, 'যবনিকা সরাবার কাজ' যা আমার করবার, তাও অনেকাংশেই তাঁরা করেছেন।

অবশ্য এ কথাও স্মরণীয়—'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় নিজ-নিজ সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে লেখা শুরু করেন এমন কিছু লেখক এখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

তারাশঙ্কর, বিষ্ণু দে, সুভাষ প্রভৃতি যেমন আমাদের অসামান্য কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন. 'পরিচয়'ও স্মরণ করতে পারে সে কারো-কারো প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত করতে পেরে কিছুটা কৃতার্থ হয়েছে। সুকান্ত প্রভৃতি কবিদের, (দীপেন-দেবেশ, অরুণ সেন, প্রভৃতি এখনকার কর্মীগোষ্ঠীকে বাদ দিয়েও) অসীম রায়, অকালমৃতা সুলেখা, কৃতিত্বময়ী মহাশ্বেতা দেবী, মতি নন্দী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—আমার এ নামগুলি সহজেই মনে পড়ছে—নাম শেষ হবে না। সমরেশ বসুর নাম করতে সাহসী হলাম না। কারণ তাঁর একটি গল্প-সংগ্রহে নিজের সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভকালীন সহায়কদের মধ্য 'পরিচয়'-কে তিনি গণ্য করেন নি। তবু 'পরিচয়' তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। 'পরিচয়'-এ তিনি অনেক লিখেছেন—আর শুধু অর্থের জন্য নয়। অন্য দুঃখও আমার আছে ননী ভৌমিকের মতো—কেউ কেউ লেখায় উদাসীন হয়ে গেলেন, মতি নন্দীর মতো আরও দু-একজন লিখলেন না। 'পরিচয়'-এর প্রবন্ধকারদের কথা আমি:উল্লেখ করলাম না—কারণ আমি তাঁদের সগোত্র সংখ্যায় তারা সবল এবং কৃতিত্বে তারা সামান্য নন—'পরিচয়'-এ তাঁদের দানই বাংলা সাহিত্যে প্রথম গণনীয়। একবার ভাগ্যের বিড়ম্বনায় 'পরিচয়' কয় মাস বন্ধ ছিল—আমার এক সুশিক্ষিত কংগ্রেসী বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা হতেই নালিশ করলেন, 'করছেন কী? পড়বার মতো একটা কাগজও কি দেশে থাকবে না?' তিনি বিশেষ করে প্রবন্ধের কথা তুলে বলেছিলেন। আরেকটা কথাও এ কথারই পরোক্ষ প্রমাণ—হিরণ সান্যাল মহাশয়ের কাছে শোনা। শান্তিনিকেতনের 'বিশ্বভারতী'-র সমাবর্তনোৎসবে সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর যথাযোগ্য অভিভাষণ দেবার পরে অদূরস্থ হিরণবাবুর কথা, হিরণবাবুর পার্শ্বস্থ একজন 'বিশ্বভারতী'-র কর্তাকে বলেন, 'উনি হিরণ সান্যাল আমার অভিভাষণ পসন্দ' করবার কথা নয়, তিনি বাংলা কমিউনিস্ট সাময়িক পত্রের সম্পাদক।'—হিরণ বাবুর এই বিশেষ 'পরিচয়' এবং 'পরিচয়'-এর কথা বাংলা-না-জানা ভারতের প্রধান মন্ত্রীর কানে পূর্বেই দিল্লীতে পৌঁছেছিল। কে বলে দিল্লী অনেক দুর 'দুরনস্ত'। 'পরিচয়'-এর ভাগ্য বটে।

'পরিচয়' সম্পাদক হিসাবে দু-চারটি ঢিল ('ব্রিকব্যাটস্) পেয়েছি তা ঠিক। আমি কিন্তু জানি—'ফুলের তোড়া' ('বোকে') ভাগ্যে কম জোটে নি। তবু শেষ কথাটা বলতে গিয়ে আবার বলি—কেন আমার উদ্যোগের

অভাবের মূল একটা কারণ আমার ভিতরে প্রথম থেকেই ছিল—সম্পাদকের কর্মে আমার সংকোচ। আমি কি এরূপ পত্রের সম্পাদনার যোগ্য। প্রথম যখন 'পরিচয়' ভূমিষ্ঠ হয় সম্ভবত আমি তখন জেলে। জেলে 'পরিচয়' নিষিদ্ধ ছিল না। অনতিবিলম্বে তা পাঠ করে আমি চমৎকৃত হই। এখনো বিশেষ করে মনে আছে শ্রীযুক্ত সুশোভন সরকার ও ধূর্জটিপ্রসাদের প্রবন্ধ ও পুস্তক-সমালোচনা। তাঁদের কাছে রাজবন্দীদের ছিল অশেষ কৃতজ্ঞতা। নতুন দিনে নিশ্চয়ই এরূপ পত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সৌভাগ্য, সম্পাদনা কর্মে আহূত হয়ে তা বারে বারে অনুভব করেছি। কিন্তু এ পত্র আমি মনের মতো করে সম্পাদন করতে পারব না, তাও বুঝতাম—রূপান্তরে সহায়ক হতে পারলেও। কর্তৃপক্ষের থেকে বাধা আমি ১৯৪৮-এ ছাড়া বিশেষ পাই নি ; সহযোগীদের থেকে তো কখনো না। তবু বাধা ছিল আমার নিজের মনে—এঁদের অনেক মতামত ও নীতিপদ্ধতিকে মেনেই আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর, বাইরে দেশে থাকছে কমিউনিস্ট, ওই মার্কার জন্য, 'পরিচয়'-এর প্রতি বিরোধিতা। মন-মতো চরিত্র 'পরিচয়কে' দেওয়া আমার অসাধ্য। ১৯৪৮-এ এসে আরও অভিজ্ঞতা সে দিকে জুটেছিল—কোনো পার্টির পত্রিকা যত সার্থক হোক, পার্টির দশজনের চাপেই চলবে, সংস্কৃতি, সাহিত্য, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ব্যক্তির ধারানুযায়ী চলতে পারে না—অন্তত আমার বিশেষ ধারানুযায়ী নিশ্চয়ই নয়। মনের দৃঢ়তা প্রার্থনীয়, কিন্তু মতের গোঁড়ামিতে আমার অরুচি। আমি 'প্রবাসী' 'মডার্নরিভিয়্যু'র আওতায় বড় হয়েছি। Criterion, Adelphi পাঠ্য হলেও একান্ত সংস্কৃতি-শিল্পবাদ আমার কাম্য নয়—কিছুটা Current History, Living Age ধরনের পত্রে আমার রুচি—কিছুটা, সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেশ-বিদেশের কমিউনিস্ট কাগজও আমাকে দেয় নি। (রজনী পামদত্তের Labour Review তা দিত কিন্তু লেবর রিভিয়্যু তো সাহিত্য-পত্র নয়) বরং Foreign Affairs, International Affairs বেশি আকর্ষণীয়—যাদের উদ্দেশ্য, মতবাদ, আমার অগ্রাহ্য, competence স্বীকার্য। আসলে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু'তেই আমার শ্রদ্ধা ছিল—ক্রমশ কিন্তু তা হিন্দু জাতীয়তায় বাঁধা পড়ে যায়, আর 'সর্বংসহ' ('ওমনিবাস') পত্র হতে গিয়ে বেশি 'পাঁচমিশালি' হয়ে যায়। কিন্তু সে পত্রদ্বয়ের সম্পাদকীয় নিষ্ঠা ছিল, এবং ছিল, আমার শ্রদ্ধার কারণ—সে পত্রিকাদ্বয়ই রবীন্দ্রনাথের ভাবনা সর্বাধিক আত্মসাৎ করতে পেরেছিল। ভাবতাম—সেই ভাবনার মূল

সত্যকে গ্রহণ করে, আমাদের দেশের আমাদের কালের মতো করে, কমিউনিজমের মানবতাবাদী আদর্শকে কি প্রকাশ করা যায় না? কী হত তা? সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-সমাজনীতি মেশানো একটা 'সোনার' পাথর বাটি'? যাই হোক, এ পরীক্ষা 'পরিচয়' দিয়ে করা যায় না—আমারও তাই উদ্যোগের অভাব থেকেই গেছল।

'পরিচয়' সম্পাদনার ব্যক্তিগত ব্যর্থতার কারণ হয়তো এই বরাবরকার দ্বিধা। রূপান্তরের যে ভার আমি গ্রহণ করেছি তা-ও তাই পূর্ণ উদ্যমে করে উঠতে পারি নি। ঐকান্তিকতা সম্ভবত ছিল না; প্রগতি আন্দোলনের আরও অনেক দিকেই ছিল আমার ডাক।

তথাপি, আমাকে ছেড়ে, আমাকে নিয়ে, সবশুদ্ধ 'পরিচয়' যা হচ্ছিল, হয়েছে, তাও সামান্য নয়। 'পঞ্চাশ বৎসর' বেঁচে থাকাই বাংলা সংস্কৃতি পত্রের পক্ষে একটা বিস্ময়। তার আগামী পঞ্চাশ বৎসরের সার্থকতার কামনাতেই এই শেষদিককার কথাগুলি কতকটা লেখাও দরকার মনে করলাম। নিছক এ আত্মগত (subjective) উক্তি মাত্র নয়। না হলে নিজের ওসব অভিজ্ঞতায় এখন আমি মজা পাই, নিজেকেও প্রসন্ন মনে পরিহাস করি। ভাবতেও হাসি পায়—কেন এই কণ্ডূয়ন? অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে ভবিষ্যতের কি প্রয়োজন? অতীত এখন অতীত, নিশ্চয়ই তার অভিজ্ঞতাও অচল। ভাবি একালের দৃষ্টি ও একালের সৃষ্টির বাহন হয়েই চলুক 'পরিচয়' তার নিজের ছন্দে—তারপর আসুক কালান্তর।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : আবার কলকাতা নিয়ে

বেশ কয়েকটা ধাকায় জখম অবস্থায় রয়েছি বলে লিখতে মন সরছে না কিন্তু কথা দিয়ে রেখেছি পরিচয়-এর শারদীয় সংখ্যায় লিখব। সম্পাদক, মোলায়েম অথচ কেমন যেন কড়া, তাড়া দিলেন দেখে ভাবছি মেজাজটাকে মেরামত করে নিয়ে একটা কিছু তৈরি করে দিই। এমন অবস্থায় সরেশ কিছু লিখে উঠতে পারব ভরসা নেই। তবু যাকে নিরেশ মনে করছি তা হয়তো বা উতরে যেতে পারে। বিশেষ করে যখন সম্পাদক মশাই নিজেই একাধিকবার লিখতে বলেছেন কলকাতা নিয়ে—হ্যাঁ, আমাদের এই কলকাতা শহরকে নিয়ে, যাকে খুব একটা সরেশ বিষয় ভাবা কঠিন বৈকি।

আমাদের অনেকেরই অতি প্রিয় অথচ অধুনা অত্যধিক জরাজীর্ণ এই শহরের আজ জগৎজোড়া দুর্নাম। বিদেশী সবাই যে গালমন্দ করে তা নয়; যাদের একটু তলিয়ে দেখার চোখ আর বোঝার মতো মন আছে তারা মাঝে-মাঝে বাসিন্দাদের চেয়ে ঢের বেশি দামি কথা কলকাতা সম্বন্ধে বলে থাকে। হঠাৎ Fodor-এর মতো 'গাইড'-বইয়েও একটু যেন অপ্রত্যাশিত অন্তর্দৃষ্টিও খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের রাজত্ব যখন চলছিল তখন অনেক ইংরেজ কলকাতার টানে বাঁধা পড়তে সংকোচ বোধ করে নি; এর জের কিছু পরিমাণে চলেছে। ঠিক আগের যুগের হ্যারি হব্স্-সাহেবের মতো কলকাতাপ্রেমী আজ না থাকলেও কচিৎ-কদাচিৎ দেখা যাবে এমন ইংরেজ যে কলকাতার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারে নি। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত দুনিয়ার নানা শহরের তুলনায় কলকাতা খানিকটা তার অর্ধ-গ্রাম্য চরিত্র সত্ত্বেও একেবারেই নগণ্য ছিল না—বেশ মনে আছে বছর পাঁচেক বিদেশে কাটিয়ে এসে (১৯৩৪) দেখলাম, কলকাতার তৎকালীন ইংরেজ দৈনিক 'ইংলিশম্যান'-এর প্রবন্ধে, যে, পকেটে অনেক টাকা থাকলে 'বড়দিন' উপভোগ করার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট জায়গা হল কলকাতা। আজও পার্কস্ট্রিট-অঞ্চলে বড়দিন আর নববর্ষ-এর রোশনাই এই ধারণার ছিটেফোঁটা বয়ে

চলেছে। কিন্তু শুধু বিদেশী পর্যটক কেন। বেশ কিছু ওপর তলার নাক তোলা ভারতবাসীর মুখেও যেন আজ শোনা যায় নামকরা পশ্চিম-জার্মান লেখক Gunter Grass-এর নোংরা প্রলাপ, 'কলকাতা হল এমন এক জঘন্য পায়খানা যা ভগবান আর কোথাও কস্মিনকালে বানাতে পারেন নি!'

কলকাতাকে নিয়ে এমনি ধরনের অকথা-কুকথা বেশ কিছুকাল ধরে অবলীলাক্রমে নানাস্থানে উচ্চারিত হয়ে চলেছে। এই বিকট অপবাদকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না, কারণ এর স্বপক্ষে তথ্যের অভাব নেই আর নিন্দুকের পক্ষে সহজ, এমন বাস্তব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য হাজির করা, যার গভীরে যেতে না পারলে খণ্ডন নেই। লাভ নেই অস্বীকার করে যে বাহ্য রূপের দিক থেকে সবচেয়ে নিন্দিত শহরের মধ্যে কলকাতার স্থান প্রায় সর্বোচ্চে। অবশ্যই বলা যায় যে গোটা দেশের অধিকাংশ মানুষের যে সর্বগ্রাসী দৈন্যদশা তার ওপর কোনো চতুর চাকচিক্যের আচ্ছাদন চাপিয়ে রাখা কলকাতায় সম্ভব নয়—ভারতবর্ষের কালজর্জর জীবনের সর্ববিধ যন্ত্রণা আর বঞ্চনা সতত এখানে প্রশ্ন তুলছে: 'আমার অস্তিত্বকে অগোচর রাখবে কে?' স্বীকার করতে হবে যে এ নিয়ে তেমন চাঞ্চল্য নেই। শুধু কলকাতা কেন। সারা দেশের সম্পন্ন মানুষের বিবেকে এর দংশনেরও তেমন লক্ষণ নেই। যে-লজ্জা পরিমাণে ও গুণগত বিচারে সত্তাকে দীর্ণ করার মতো নিদারুণ, তাকেও অনেকটা গা-সওয়া আমরা করে নিয়েছি। বহু যুগ ধরে নিয়তিকে অকাট্য ভাবতে অভ্যস্ত বলেই বোধ হয়! আমরা এতটা অসাড় হওয়ার ক্ষমতা রাখি আর ধর্মবিশ্বাসের বিবিধ সান্ত্বনা প্রলেপে অন্তরের ক্ষতস্থলেও উপশম ঘটাতে পারি। নবজীবনের স্বপ্ন ভারতবর্ষকে একটুও নাড়া দেয় নি কেউ বলতে পারে না। কিন্তু দেশের প্রায় সকল অঞ্চলের তুলনায় সমাজচেতনা ব্যাপারে অগ্রণী হয়েও কলকাতার মানসিকতায় আজও পরিব্যাপ্ত এই স্থবিরতার চেয়ে অভিশাপ কি হতে পারে? অথচ এ নিয়ে বিচলিত ও বিপন্ন হওয়ার লক্ষণও তেমন দেখা যায় না, নিরাকরণ ব্যবস্থা নিয়ে উদ্যম তো বহু দূরের কথা!

এভাবে লিখতে খটকা লাগছে মাঝে মাঝে। কারণ পুজো আসছে। অন্তত ক-টা দিনের জন্য শহর ঝলমল করে উঠবে। আকাশের রং আর বাতাসের স্পর্শ বদলাবে। মন যেন নতুন করে বুঝবে প্রাচীন গ্রীক আপ্ত-বাক্যের মর্ম:, 'ঘুমন্ত আমরা সবাই একা, কিন্তু যখন জেগে, তখন আছি সবাই-মিলে-গড়া এই মানুষের ভিড়ে'। বড্ড গুরুগম্ভীর শোনালো কথাটা,

আর মনে পড়ে যাচ্ছে ক-বছর আগে আমার এক বন্ধু সার্বজনীন পুজোর ঠেলায় কটা দিন কাটাতে গেলেন বর্তমানে একরকম উধাও, প্রাক্তন 'সাহেব-পাড়ায়' আত্মীয়গৃহে। আর একটু হিংসাও হল আমাদের। কারণ ঢাকের বাদ্যি (যা বক্তৃতার মতো থামলেই মিষ্টি লাগে) চারদিকে তখন চড়া থেকে আরও-চড়া গ্রামে উঠছিল। শাস্ত্রেই অবশ্য বলে থাকে যে সর্ব অবস্থাতেই বিড়ম্বনা। সুতরাং পুজোর কলকাতা যতই মেতে উঠুক তার সঙ্গে পাল্লা যে সবাই দিতে পারব তা সম্ভব নয়। যাই হোক। সন্দেহ তো নেই যে 'শুধু দিন যাপনে'-র গ্লানি অতিক্রম করে পুজোর কটা দিন কলকাতার জীবনে একটা দীপ্তি আসে। বিদেশীরা অবাক হয় দেখে যে বহু যত্নে আর আয়াসে গড়া মনোহর প্রতিমাকে স্বচ্ছন্দে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। আসক্তি আর নিরাসক্তিকে যেন এক বিচিত্র পদ্ধতিতে বাঁধা হচ্ছে এক সূত্রে। সাধে কি শুনি অনেকের মুখে বাঙালি-গর্ব যে কলকাতার দুর্দশা যতই বিকট হোক না কেন, কোথায় আছে এমন বই-মেলা আর গানের জলসা আর নাটক অভিনয় নিয়ে মাতামাতি, কোথায় এত কবি আর কবিতার ছড়াছড়ি, কোথায় এত শারদীয়-সংখ্যার মতো সাময়িকী, কোথায় ইন্দিরা গান্ধীর মুখে নেহরু-পরিবারের দেশপ্রেম সম্বন্ধে বাহবার জবাবে মানুষ বলতে পারে যে এ-শহরে প্রতি গলিতে আছে একাধিক পরিবার যারা আত্মত্যাগে কারও চেয়ে কম যায় নি কখনও, কিন্তু তা নিয়ে বড়াই করার কথা ভাবে না?

আবার ফিরতে হয় কলকাতার কঠিন কঠোর অবস্থিতির চিন্তায়, যা আমরা এড়িয়ে চলেছি ক্রমাগত অথচ বাধ্য হয়েছি এমন কতকগুলো প্রয়াসে নামতে যা (পাতাল রেলের মতো) হল সর্ব অর্থে গভীর ব্যাপার, যাকে সফল করতে হলে গতানুগতিকতা বর্জন না করে উপায় নেই। স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে প্রায় এক অগ্নিপরীক্ষায় না নেমে পারি নি আমরা। অথচ কেমন যেন অনুক্ত আশা যে মোটামুটি অক্লেশে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব— এরই অপর দিক হল বিচিত্র এক উদ্‌ভ্রান্তি, সর্ববিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে বিদ্রূপপরায়ণতা ও নৈরাশ্য। কর্তৃপক্ষীয় যারা তাদের মধ্যে কচিৎ-কদাচিৎ কিছু উৎসাহীর দেখা মেলে (সন্দেহ নেই যে বর্তমানে পুরমন্ত্রী প্রশান্ত সুর কর্মশক্তি ও শুভবুদ্ধির অধিকারী) কিন্তু গোটা শাসনযন্ত্র এমন কায়দায় চলে যে অতি-প্রকট মানবিক প্রয়োজনও তার শৈথিল্যকে বিচলিত করে না। যদি না দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জনতাকে সচেতন ও সতর্ক করে এবং কথঞ্চিৎ কৃচ্ছ্র সাধনার কথা অসংকোচে জানিয়ে

জনতারই সমর্থন ও সহায়তা সংগ্রহ করে কাজে অগ্রসর হতে পারে। কলকাতাকে তার বহু গুণাবলি সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ভূগোলে এক দুষ্টব্রণ-রূপে দেখতে যখন কেউই চাইতে পারি না তখন এই দুরূহ পদক্ষেপের জন্য তৈরি হবার চেষ্টা করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

হয়তো পরাধীনতার যুগে ফরাসীদের হাতে পড়লে কলকাতা শহরের বাহ্যিক চেহারা কিছুটা মনোরম হতে পারত। নগর-সৌন্দর্য বিষয়ে ইংরেজ-মন একটু যেন ভোঁতা, তবুও জব চার্ণক যে-কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা তা কিছুকাল 'প্রাসাদ-নগরী' বলে খ্যাতি পেয়েছিল। আর সেদিন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রথম সারির শহর বলে পরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তুলনীয় না হলেও লণ্ডনের পাশে। এমন কিছু ম্লান তাকে দেখাত না—বোম্বাই অনেক বেশি সুদৃশ্য কিন্তু বছর চল্লিশ আগে পর্যন্ত কলকাতাই ছিল তুলনায় সরেশ। এমন যে নিরুপমা গঙ্গা-কূলে কলকাতা তার মর্যাদা এ-শহর কখনও ঠিক রাখে নি। যাই হোক। নিসর্গ মহিমার দিক থেকে কলকাতার সম্ভাবনা স্বল্প বলেই এখানে মানুষের পরিকল্পনার গুরুত্ব ছিল বেশি। কিন্তু শহর গড়ে উঠেছে এলোমেলোভাবে—'chance erected, chance directed' —'palace, byre,hovel,/poverty and pride,/side by side' কিপলিং-এর কথা অনেকের মনে পড়বে। কলকাতার চৌহদ্দি আর চেহারার দিকে বাস্তবিকই নজর দেওয়া হয়েছে মাঝেসাঝে, খামখেয়ালি কায়দায়। আর ফলে একদা আধা-শহর আধা-গ্রাম এই বিরাট বসতি বেড়ে চলেছে আগাছার মতো, কিম্ভূতকিমাকার এক সৃষ্টি দাঁড়িয়ে গেছে —শিউরে উঠতে হয় এমন ভাবনা মনে আসে; 'বিশ্বযুদ্ধে তো কত নগর আর জনপদ ধ্বংস হওয়ার পর পুনর্জন্ম পেয়েছে, সকল সমাদৃত সৌধ অবিকল সেই আদি সৌন্দর্যে পুনর্নির্মিত হয়েছে, অনুরূপ ধ্বংস (আর আনুষঙ্গিক সর্বনাশ) বিনা কলকাতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব?' জ্ঞানবিজ্ঞান আজ যে স্তরে, তাতে নিশ্চয়ই বলা যায়, সম্ভব। কিন্তু সেই সম্ভাবনার বাস্তবায়ন বিষয়ে আগ্রহ দূরে থাক, ঔৎসুক্যেরও আজ অভাব একান্ত, বললে কি অন্যায় হবে? শুনেছি নাট্য-প্রতিভায় অসামান্য শ্রীযুত বাদল সরকার নগরপরিকল্পনা বিষয়ে বিশেষরূপে কলকাতায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু থাকতে পারেন নি সেকাজে। নিশ্চয়ই নাটকের টান ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ছিল নাকি নিজের অধীত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অনপনেয় অনীহা? নগর পরিকল্পনা দূরে থাক্। 'নগর স্থপতি' (city architect) নামধেয় বিশেষজ্ঞ কলকাতা পৌরসভায়

আবহমান কাল থেকে থাকা সত্ত্বেও এলোপাথারি কায়দায় ইমারৎ বানানো এখানকার রেওয়াজ। শহরের বুকের ওপর যে সুবোধ মল্লিক (পূর্বে ওয়েং-ওয়েলিংটন বলে পরিচিত) স্কোয়ার, যেখানে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন বসেছে ১৯১৭ আর ১৯২০ সালে আর কত যে ঐতিহাসিক সমাবেশ ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। তার উত্তরে দেখা যাবে ন-তলা এক টং যার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের লেশমাত্র সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি নেই, আর খাস পার্কের মধ্যে সম্প্রতি ধূমধাম করে স্থাপিত হয়েছে এক শহীদ-স্মারক ভাস্কর্য যাকে কেউ বুদ্ধি করে এমন অবস্থিতি দেন যাতে তা পথচারীর দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে। শুধু যে ভাঙাচোরা এস্প্ল্যানেড এলাকায় স্থানাভাবে লেনিনমূর্তিকে অদ্ভুত অবহেলার মধ্যে থাকতে হচ্ছে তা নয়। একই স্থপতির গড়া লেনিনমূর্তি উজ্‌বেকিস্তানের তাসখন্দ শহরে অপরূপ দেখায় আর তারই প্রতিরূপ এখানে ম্লান। দুঃখ হয় ভেবে যে বিদেশী শাসকরাও বর্তমান স্বদেশী কর্তৃপক্ষের তুলনায় এসব ব্যাপারে কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান রাখত।

১৯২৪ সালে সুরেন বাঁডুজ্জে মশায়ের কলকাতা পৌরশাসন আইন অনুযায়ী নির্বাচনের ফলে কংগ্রেস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর নেতৃত্বে কর্পোরেশনে ক্ষমতা দখল করার পর কিছু বাস্তবিক ভালো কাজের সূচনা ঘটে। দেশবন্ধু স্বয়ং হলেন 'মেয়র,' 'ডেপুটি মেয়র' হলেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি, প্রধান কর্মকর্তাপদে বসলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। কেবল 'সাহেব'-পাড়ার দিকে নজর আর বাকি 'নেটিভ' এলাকাকে উপেক্ষা করার ধারা তখন বন্ধ হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত প্রসার হয়েছিল ; প্রতি পল্লীতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি তখনকার ঘটনা। ডক্টর বীরেন দে-র মতো ইঞ্জিনিয়র, পৌরসভার সঙ্গতিকে গোটা দেশের শিল্পোন্নয়নের সহায়তায় ব্যবহারের পরিকল্পনায় তখন নেমেছিলেন। কর্পোরেশন অবশ্য কংগ্রেস দলের ক্রমাবনতির ফলে 'চোরপোরেশন' বলে অভিহিত হতে লাগল কিছুকাল পরেই। যাক সে কথা। আন্তরিক সদুদ্দেশ্য কিছু পরিমাণে থাকলে যে জনহিতকর কাজ সম্ভব তার পরিচয় দেবার পরই ঘটতে লাগল বহুবিধ বিড়ম্বনা। কলকাতার পৌরশাসন ক্রমাগত তার পর থেকে এমন আঘাত পেয়ে এসেছে যে আজ সবাই প্রায় ভাবে তার নাম করলে পাপ হয়। দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিক বামপন্থী শাসন সত্ত্বেও আমাদের শ্রেষ্ঠ পৌর-প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম দূর হওয়া দূরে থাক, তার লাঘবও হয় নি।

কলকাতা শহরের বুকে অনেক প্রচণ্ড আঘাত অবশ্য পড়েছে। বিশেষ

করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। প্রাচ্যভূখণ্ডে লড়াইয়ের সরবরাহ ও যোগাযোগকেন্দ্র তখন ছিল এই কলকাতা। প্রায় অনন্ত যার দৈর্ঘ্য সেই মিলিটারি 'কনভয়' ভীম রবে কলকাতার রাস্তা গুঁড়িয়ে দিয়ে তখন ছুটে বেড়াত—যুদ্ধকালের বহুবিধ উপদ্রব কলকাতাকেই তখন সইতে হয়েছিল। তারপর এল বাংলার গ্রাম-জীবনকে ভেঙে ফেলার মতো সাম্রাজ্যবাদী গতিবিধি, যার ফলে ঘটল ১৯৪৩ সালের বিকট দুর্ভিক্ষ, যার কথা ভাবতেও আতঙ্ক হয়—আর কলকাতাকে সইতে হল অনেক কিছু আনুষঙ্গিক যন্ত্রণা। অসংখ্য মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে রইল এই শহর ; নিঃস্ব ছিন্নমূল হতাশ্বাস অভাগাদের যত্র তত্র অবস্থান আর আবালবৃদ্ধবণিতা মিলে মর্মভেদী বঞ্চনার মধ্যে কালাতিপাত তখন থেকেই কলকাতার জীবনকে ব্যঙ্গ করে চলেছে, অভিশাপ দিচ্ছে। যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন এল মুক্তিসংগ্রামের নতুন প্লাবন, তেমনই এল অর্থনীতির সংকট আর আমাদেরই লুকোনো অপরাধের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অন্বিষ্ট সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, যার মারাত্মক রূপ কলকাতা দেখল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট আর তার পরবর্তী কিছুকাল ধরে। কলঙ্কময় এক অধ্যায়েরই ফলস্বরূপ দেখা গেল দেশের ক্লান্ত, সংকোচ-বিহ্বল নেতৃত্ব দেশবিভাগের মূল্য দিয়ে 'ক্ষমতার হস্তান্তর' কিনতে রাজি ইংরেজের হাত থেকে। দুটো আলাদা রাষ্ট্র হল এই ভারতবর্ষে, বাংলার বৃহদংশ গেল পাকিস্তানে। আর আরম্ভ হল পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তুর অবিরাম আগমন—যেন আদি-অন্তহীন এক জনযাত্রা, আশঙ্কা আর নৈরাশ্যে যার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত প্রায়—এরই এক অধ্যায় হল ১৯৭১ সালে কলকাতার উপকণ্ঠে লবণহ্রদ এলাকায় প্রায় এক কোটি শরণার্থীর মর্মন্তুদ উপস্থিতি। গোটা দেশের সকল বিপদের বোঝা কলকাতাকে সঙ্গে সঙ্গে বইতে হয়েছে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে কলকাতাকে বিশেষ করে বহুকাল সহ্য করতে হয়েছে এমন পৌনঃপুনিক আঘাত যাতে এই শহর তার 'প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত' অনুভব করছে।

অষ্টাদশ শতকের এক ফরাসী মনীষী বলে গেছেন যে 'সবকিছু বুঝলে সবকিছুই ক্ষমা করা যায়।' কথাটা পুরো মানা হয়তো যায় না। কিন্তু কলকাতার আধুনিক ইতিহাস একটু ঘাঁটলেই অন্তত কলকাতার দুর্দশার হেতু কিছুটা বোঝা যায় এবং ঘটনাটিকে হয়তো বা মার্জনাও করা যায়। কিন্তু এ তো নৈর্ব্যক্তিক কোনো ব্যাপার নয়, যাতে কারও মার্জনার তেমন মূল্য থাকতে পারে। নিশ্চয়ই কলকাতার অধোগতির বিবরণে কার্য-কারণ

সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু মূল প্রয়োজন হল সেই অধোগতিকে সামলে নিয়ে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া, শহরের জীবনে আবার আলো ফিরিয়ে আনা।

হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো দুরবস্থা যে কলকাতার নয় এটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার। বহুকাল আগে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন: 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ। তবু রঙ্গে ভরা!' কলকাতা দেশের সবচেয়ে ক্লিষ্ট শহর সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনও এ-শহর 'জীবন-ধন-দীন' একেবারেই নয়, এখনও সর্ববিধ অগ্রসর চিন্তা ও কর্মে কলকাতা অগ্রণী, সমাজ-রূপান্তরের আগুন জ্বালাবার স্ফুলিঙ্গ যদি খুঁজতে হয় দেশে তো কলকাতার বাইরে চাইবার দরকার নেই। কলকাতাকে তিলোত্তমার মনোহারী রূপে স্বপ্ন দেখার আলস্য ছেড়ে একটু যদি কাজের রাস্তায় নামার মেজাজ দেখা যেত তো আজকের কেলেঙ্কারিকে চিরস্থায়ী আশঙ্কা করার কারণ থাকত না।

সেদিন পর্যন্ত কলকাতা তো এগিয়েই থাকতে পেরেছিল শহর হিসাবে। এস্‌প্ল্যানেড-এর কাছে মহম্মদ আলি ওস্তাগরের ন-তলা বাড়ি একসময় দেশে সবচেয়ে উঁচু বলে পরিচিত ছিল। ডাক্তার বিধান রায়-এর আমলে তেরো তলা ইমারৎ বানিয়ে সেখানে সরকারের দফতর প্রতিষ্ঠা যখন হয় তখন 'স্ক্রাইস্ক্রেপর'-এর রেওয়াজ হয় নি—বোম্বাইতেও এত উঁচু বাড়ি হয় নি, যদিও আজ সেখানে ত্রিশ থেকে চল্লিশ তলার বাড়ির ছড়াছড়ি। অবশ্য উঁচু ইমারতের জঙ্গল কোনো শহরের স্বাস্থ্যের বা সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় নিরিখ নয়। বিধানবাবু অন্তত ভেবেছিলেন কল্যাণীর মতো উপনগর গড়ার কথা। গড়েও ছিলেন কতকটা—দুর্গাপুরে দেখা গিয়েছিল অপার সম্ভাবনা, যা আবার আমাদের ঔদাস্যের জঞ্জালে চাপা পড়তে চলেছে। পশ্চিমবাংলায় এখনও পর্যন্ত কলকাতার বাইরে কোথাও রাত কাটাতে হলে শহরবাসীর হৃৎকম্প হয়—বর্ধমানের মতো জায়গায় নগর-ব্যবস্থা প্রায় 'নাস্তি', গঙ্গার দু'ধারে চমকের না হলেও চলনসই বাসস্থান সাবেক বাসিন্দা ছাড়া আর কারও নেই। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গুজরাট এসব দিক দিয়ে পশ্চিমবাংলার চেয়ে অগ্রসর। এমন যে কলকাতার গঙ্গাতীর, তাকেও যে কী উদ্ভট উপেক্ষার মধ্যে আমরা রেখেছি তা বলবার নয়।

কলকাতারই "তটশালিনী সুন্দরী" ভাগীরথী-গঙ্গার নাব্যতা নিয়ে দুশ্চিন্তা শহর ও গোটা পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎকে সংশয়াকুল করে রেখেছে। সুদক্ষ ও চিন্তাশীল কপিল ভট্টাচার্য মহাশয়ের বহু সাবধানবাণী ইতিপূর্বে

ক্রমান্বয়ে অবহেলিত হয়ে এসেছে। ফরাক্কার বাঁধ খুবই দামি সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে কম জরুরি নয় অথচ তুলনায় সহজসাধ্য অনেক কাজে আমরা হাত দিই নি, দামোদর আর রূপনারায়ণ-এর কথা ভাবি নি, মাঝারি আর ছোটখাটো পূর্তকর্মে নজর দিই নি—যেখানে মাটি খুঁড়লেই জলের সন্ধান মেলে, সেখানে জলের অভাব আর আতিশয্য—দুই ব্যাপার নিয়ে ভোগান্তির মধ্যে পড়েছি। সরকারি বিশেষজ্ঞেরা প্রায়ই নিজেদের চাকরি আর উন্নতির কথা ছেড়ে সারা দেশের মানুষের উপকার নিয়ে মাথা ঘামান নি বলে অপদার্থ কর্তৃপক্ষীয়দের নির্বোধ কার্যক্রমে সকলের ক্ষতি হয়েছে। কলকাতার মতো শহরে পানীয় জল সরবরাহ আর বন্দর বাঁচিয়ে রাখা দুই-ই বিপন্ন হয়ে থেকেছে।

কলকাতায় গঙ্গার উপর দিয়ে দ্বিতীয় একটি পুল বানানো হচ্ছে আজ প্রায় আট বৎসরেরও বেশিকাল ধরে। সোমনাথ লাহিড়ী যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি চেয়েছিলেন নিচু একটি পুল, যার খরচ পড়ত ঢের কম আর যা বানাতে সময় বেশি লাগত না। বন্দর-কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানান যে খিদিরপুর ডকে জাহাজ ঢোকার আগে গঙ্গার উপরই বাঁক নেওয়া দরকার আর তাই পুলকে খুব উঁচু করে না বানালে চলবে না। অন্তত আর্মানি ঘাট পর্যন্ত গঙ্গার উপর ব্রিজ করতে হলে তাকে একেবারে আকাশচুম্বী করতেই হবে—এই হল যুক্তি। তখন বিরাট পরিকল্পনা হল, ঠিক হল ব্রিজ হবে দেখবার মতো, আকাশ বেয়ে উঠবে, কলকাতা আর হাওড়া থেকে সেই ব্রিজে চড়ার রাস্তা তেমনি চড়াই-উৎরাইয়ের মতো করে বানাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে মস্ত মুশকিল হল আবিষ্কার করে যে ঐ-ধরনের একটা ব্রিজ ক্যানাডা না কোথায় বুঝি ভেঙে পড়েছে—তাই অনেক চিন্তার পর ব্রিজের কাঠামোকে নিরাপদ করার ব্যবস্থা নির্ণীত হল, খরচের পরিমাণ হু-হু করে বাড়ল, আর কাজ যেমন চলে অর্থাৎ ঢিমে-তেতালায় চলতে থাকল। বছর পাঁচেক আগে পার্লামেন্টারি কমিটির পক্ষ থেকে অকুস্থলে গিয়ে দেখেছি, তরুণ ইঞ্জিনিয়ররা কাজ করছেন। একটু তলিয়ে প্রশ্ন করলে খুশি হয়ে জবাব দেন, বেশ বোঝেন সরকারি ব্যবস্থায় গলদ কোথায় আর কেমন অনড়ভাবে জমে রয়েছে, ভরসা রাখেন যে কারুকৌশলের সুন্দর নিদর্শন হবে এই ব্রিজ, কিন্তু জানেন যে বিবিধ বোধ্য এবং অবোধ্য কারণে সব কিছু হবে বিলম্বিত, হয়তো বা বিঘ্নিত (অথচ সরকারি কর্মচারী হিসাবে তারা নিরুপায়)। যতদূর জানি, দ্বিতীয় ব্রিজের কাজ চলেছে, দুদিকে

রাস্তা কিছুটা তৈরি হতে শুরু হয়েছে, কিন্তু শহরবাসীর কাছে এ-বস্তু (যার নির্মাণ নিয়ে উল্লসিত হতে মন চায়, যার মধ্য দিয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা সার্থকতার কিঞ্চিৎ আস্বাদন পেতে পারেন) একটা যেন দূরাবস্থিত প্রক্রিয়া যা নিয়ে ঔৎসুক্য নেই, আগ্রহ নেই, প্রশ্ন পর্যন্ত নেই।

এই মারাত্মক অনীহা আমাদের মধ্যে সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকবে কেন? দমদম বিমানবন্দরে যাওয়ার রাস্তা হল, চমৎকার আলো বসল (এবং লোপাট হয়ে গেল), দু-ধারে নিম্নবঙ্গের নিসর্গ সৌন্দর্য ক্রমশ অসাড় আমলাতন্ত্রের কৃপায় শুকিয়ে গেল, কৃষ্ণপুরের খাল মজে মজে মিলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল—কারও মাথাব্যথা নেই। বেলেঘাটা, মানিকতলা ইত্যাদি অঞ্চলের খাল অল্প একটু প্রয়াসে সংস্কার করে নেওয়া যেত। শহরের চেহারা একটু প্রসন্ন হত, নৌকাবিহার ধনীজনের জন্য শুধু নয় নৌকাযোগে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার স্বল্পসমুন্নতি সহায়তা পেত। শহরের দূষিত হাওয়া একটু অন্তত কলুষমুক্ত হতে পারত—কিন্তু না, কারও মাথাব্যথা নেই। 'সর্কুলার' রেল বানাবার কথা উঠেছিল, কিন্তু পরিত্যক্ত হল এজন্য যে ফল হত :অল্প আরম্ভ উত্তর থেকে হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত নদীকূলে যেসব গুদামঘর ইত্যাদি আছে তার মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে সরকার ফতুর হতে বসবে, সুতরাং ফলের দিক থেকে সুদূরপ্রসারী বলে পাতাল-রেল বানাবার কথা হল। বেশ কয়েক বছর ধরে হাজার আলোচনার পর স্থির হল যে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম এই সবচেয়ে জনবহুল কলকাতায় মাটির গর্ভ বেয়ে রেল চলবে—আমাদের এই আদৎ মান্ধাতাগন্ধী দেশে প্রবর্তন হবে এক আজব ব্যবস্থা যা অবশ্য দুনিয়ার বহু দেশেই সুপরিচিত। নানাদেশের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলার পর সিদ্ধান্ত হল যে সোভিয়েট দেশ থেকে পরামর্শ ও সাহায্য নিয়ে এই পাতাল রেল পাতা হবে। সবাই মোটামুটি খুশি হল বলা যায়, কারণ সোভিয়েটের পরম শত্রুর মুখে শোনা যায় সে-দেশের পাতাল-রেলের নিখুঁত সাফল্য শুধু নয় তার অপরূপ সৌন্দর্যেরও কথা।

বেশ মনে আছে পার্লামেন্টের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সভাপতিরূপে ১৯৭৫-৭৬ সালে তদানীন্তন রেলওয়ে বোর্ড-এর সঙ্গে এ নিয়ে অনেক আলোচনা। আর বোর্ডের সভাপতির আশ্বাস (যা আমায় একাধিকবার তিনি দিয়েছিলেন) যে দক্ষিণ কলকাতা থেকে ময়দান পর্যন্ত পাতাল-রেল ১৯৮১ সাল নাগাদ পাতা হয়ে যাবে, আর ১৯৮৬-৮৭ সাল নাগাদ উত্তর থেকে লাইন এসে ময়দানে মিলবে—পরিকল্পনায় অবশ্য আছে আরও অনেক কিছু,

যেমন পূর্ব থেকে পশ্চিম, গঙ্গাবক্ষের নীচে দিয়ে কলকাতা-হাওড়াকে পাতাল-রেল মিলিয়ে দেবে, তবে সেটা আরও সময়সাপেক্ষ। এসব ব্যাপারে দিন-তারিখ সম্বন্ধে সরকারি প্রতিশ্রুতি প্রায় মূল্যহীন, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে রেলওয়ে বোর্ড-এর চেয়ারম্যান বলেছিলেন যে দমদম থেকে বেলগাছিয়া-শ্যামবাজার হয়ে এগিয়ে আসার কাজ অনেকটা হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ থেকে পাতাল-রেল বানানো আগে দরকার, কারণ ইতিমধ্যে কলকাতার মানুষ অনেক সহ্য করেছে আর আশায় থেকেছে, সুতরাং দক্ষিণ থেকে (উত্তরের তুলনায়) কাজ বেশ চট্‌পট্‌ এগোতে পারে বলে তারা ঐদিকে প্রথমে হাত দিতে চান। হাত অবশ্য দিয়েছেন, কিন্তু কাজ কতটা এবং কিভাবে আর সাফল্যের সম্ভাবনার আভাস দিয়ে এ পর্যন্ত হয়েছে, তা আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। আরও জানি খোঁড়াখুঁড়ি আর আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ডের চাপে কালিঘাট-ভবানীপুর এলাকা কতটা বিপর্যস্ত, সঙ্গে সঙ্গে জানি বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিরবচ্ছিন্ন ও নিদারুণ অকর্মন্যতা পাতাল-রেল চালু রাখবে যে বিদ্যুৎ তার সরবরাহ সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি করে সমগ্র পরিকল্পনা বিষয়েই সাধারণ মানুষের মনে পূর্ণ অনাস্থা এনে দিয়েছে। পাতাল-রেল আজ যেন একটা নিছক কৌতুকের বিষয়—অথচ কী মারাত্মক আর কী ব্যয়বহুল এ কৌতুক!

যে যাই ভাবুন, আমি হলপ করে বলতে পারি (সরকারি ধরনধারণ সম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোরে) যে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উভয়েই কলকাতার পাতাল-রেল বিষয়ে প্রকৃত আগ্রহ রাখে না। 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'—সুতরাং চিন্তা নেই বর্তমান কর্তৃপক্ষের, অন্তত আপাতত তেমন নেই, ভবিষ্যতের যত্ন নেবে ভবিষ্যৎ! যে হারে কাজ চলেছে (এবং যে হারে চিন্তারহিত তুরীয়ানন্দে সরকার এবং জনসাধারণ বিরাজ করছেন) তাতে কবে যে কি হবে কারও বলা সম্ভব নয়। আমি জানি যে পূর্বতন কংগ্রেসী রাজ্যসরকার এ ব্যাপারে (যেমন হলদিয়ার ব্যাপারেও) বিন্দুমাত্র উদ্যোগিতার জন্য প্রস্তুত ছিল না—চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু ভেঙে পাতাল রেল পাতা হবে আর কলকাতায় এখন ইলেকশন লড়ে জেতা যাবে এটা ভাবতেই ছিল আতঙ্ক। তাই 'যাক শত্রু পরে পরে' নীতি অনুযায়ী সবকিছু মুলতুবি রাখার ব্যাপারে কারও আপত্তি ছিল না। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে বর্তমান বামপন্থী সরকারও নানাভাবে পিষ্ট-ক্লিষ্ট কলকাতার মেজাজ দেখে পাতাল-রেল গড়া ব্যাপারটাকে ত্বরান্বিত করতে যাওয়ার বিপদ সম্বন্ধে সজাগ

—আর এই পাতাল-রেল কাণ্ডটার দায়িত্ব যখন কেন্দ্রের ঘাড়ে, তখন এটা নিয়ে সর্ববিধ বিপত্তি তারই ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে মোটামুটি তুষ্ট—পাতাল-রেল হোক বা না হোক, সাময়িক রাজনৈতিক মুনাফা উঠিয়ে নেওয়া যাবে অন্যভাবে, দেশের লোককে এই পাতাল রেল নিয়ে উৎসাহিত করার কোনো দায়িত্ব তাদের নেই! মাঝে পড়ে কলকাতার বিপন্ন মানুষ কলকাতা উন্নয়ন আর পাতাল রেল ইত্যাদি নিয়ে বিদ্রূপ আর অভিশাপ বর্ষণ করবে না তো কি?

কয়েকবছর আগে পাতাল-রেলের প্রথম শিলান্যাসের সময় কলকাতার এক শ্রুতকীর্তি সংগঠন 'স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ্ হোম-এর পক্ষ থেকে দলমতনির্বিশেষে এক মস্ত মিছিল বেরিয়েছিল। নগরজীবনে এক নব উন্মেষের প্রয়াসকে সম্বর্ধনা জানিয়ে, প্রযত্নে সকল নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করে। এমন বৃহৎ ও অজ্ঞাতপূর্ব পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে নাগরিকবৃন্দের সচেতন সাহচর্য যে অপরিহার্য তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। বহুজনের বাসগৃহ নির্মূল না করে, শহরের অতি-কন্টকিত যোগাযোগব্যবস্থাকে আরও কষ্টকর না করে, গতানুগতিকতার গায়ে নির্দয় আঘাত না করে যে এ-ধরনের প্রয়াস সফল হতে পারে না, তা অজানা থাকার কথা নয়। হাঙ্গেরিতে তৈরি সিনেমা এখানে দেখেছি, বুদাপেস্তে পাতাল-রেল (যা অনেকটা নির্মিত হয়ে গেছে) শহরের জীবনকে কিভাবে বদলাতে চলেছে আর ভবিষ্যতের কল্যাণে বর্তমানে কিছু বেশি কৃচ্ছ্রসাধন যে সবাইকে করতে হবে তাই নিয়ে। আমাদের এখানে মেরে-কেটে হয়তো 'নিউজ-রিল'-এ দেখানো হয়েছে খোঁড়াখুঁড়ি কিংবা লাইন পোঁতা-পুঁতির খণ্ড দৃশ্য, যা নিশ্চয়ই আকর্ষণ করছে প্রেক্ষাগৃহের বিদ্রূপবিকৃত অট্টহাস্য! তাও সম্ভবত হয় নি, কারণ কারও শিরঃপীড়া নেই পাতাল-রেল বিষয়ে জনমতকে প্রস্তুত করতে।

মস্কো, লেনিনগ্রাদ, তাশখন্দ-এ সেখানকার পাতাল-রেলে চড়েছি। অদ্ভুত সুন্দর স্টেশন আর পরিচ্ছন্নতা আর সুব্যবস্থা চাক্ষুষ করেছি। ১৯৩৬ সালে বোধহয় মস্কোতে প্রথম পাতাল রেলের কাজ আরম্ভ হয়, সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় বিনাপারিশ্রমিকে নির্মাণকার্যে যোগ দিয়েছে বলে জেনেছি; স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের ছটায় সে দেশের 'মেট্রো' স্টেশনগুলির সজ্জা অপরূপ লেগেছে। আশ্চর্য নয়, কারণ বিপ্লব হল 'জনতার উৎসব' আর বিপ্লব ঘটেছিল বলেই জনতা সর্বজনকে সুখী করার কাজে প্রাণ দিয়ে নামতে

পেরেছে। আমরা এদেশে বিপ্লব সংঘঠনে অপারগ হয়েছি; তাই বিপ্লবোত্তর মানসিকতা আমাদের অনায়ত্ত। কিন্তু সাধারণ কর্মকৌশলে আমরা তো পিছিয়ে নেই অন্য দেশের তুলনায়—পাতাল-রেল নির্মাণ করতে হলে ময়দানবের অন্বেষণে যেতে হবে না, আমরাই পারি। বন্ধুদেশ সোভিয়েটের সহযোগিতা সহজে পাচ্ছি। প্রয়োজন মতো যন্ত্রপাতি আনিয়ে নিতে বাধা নেই। অর্থ এবং আগ্রহ থাকলে প্রতিবন্ধক কিছু নেই। কিন্তু সবই ব্যর্থ হবে যদি দেশবাসীর এ ব্যাপারে বিরক্তি উৎপাদিত হয়ে থাকে—যা হয়েছে কলকাতার মেট্রো সম্বন্ধে। এর প্রত্যেকটি গলদকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মারাত্মক করে দেখার ঝোঁক তাই আজ প্রবল, এর অনাবশ্যকতা নিয়েও তাই কথা ওঠবার মতো অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি তাই রয়েছে, এর অনিবার্য ব্যর্থতা দিয়ে ঈষৎ পুলকিত অথচ ক্ষতিকর বাক্যবিলাস আজ বিস্তৃত।

কলকাতার কথা ভাবতে গিয়ে সবচেয়ে দুঃখ এই যে আমাদের মতো দেশে অধিকাংশ মানুষের জীবনে স্বস্তি আর সুখের সম্ভাবনা টেনে আনার কাজ কত বিপুল ও জটিল তা বুঝে উঠতে আমরা পারি নি। সমাজের মৌলিক রূপান্তর বিনা প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয় জেনে একেবারে প্রাথমিক স্তরের বহু কর্তব্য পালনে আমরা পরাঙ্মুখ থাকতে অভ্যস্ত হয়ে রয়েছি। কলকাতার যে সমস্ত হাসপাতালে সবচেয়ে বেশি জনসমাগম ঘটে, তার আশেপাশে জঞ্জালে জমে থাকার যে জঘন্য রেওয়াজ কলকাতাবাসীর গা-সওয়া, তাকে কর্তৃপক্ষের উপেক্ষা আর সংশ্লিষ্ট সর্বশ্রেণীর কর্মরতদের অবহেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে রেখেছে। যুবজনকে নিয়ে আন্দোলনের কথা ওঠে, চেষ্টা হয়, মাঝেমাঝে মিছিল বেরোয়, কিন্তু পল্লীতে পল্লীতে তাদেরই নিয়ে জনতার জীবন থেকে এখনই দূর করা যায় এমন অভাব-অভিযোগ নিয়ে সংগঠন, তথ্যসংগ্রহ, পৌরসভা বা অপর সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছ থেকে দাবি আদায় ইত্যাদি কাজ একেবারে প্রত্যক্ষ, চাঞ্চল্যকর রাজনীতির অঙ্গীভূত নয় বলে বামপন্থীমহলেও উপহসিত, অনাদৃত, অবহেলিত। হাতের কাছে 'ফায়ার ব্রিগেড' না থাকলে তো হাতে হাতে বালতির জল দিয়েই আগুন নেভাবার কাজ না করলে চলে না। আর বিপ্লব বলে একটা অবয়ব তো নেই যা যেন ব্রহ্মার মানসসন্তানের মতো তৎক্ষণাৎ উদ্ভব লাভ করবে। কলকাতা শহর তার নিজের পাপের ভারেই যেন ভেঙে পড়বে, পাতাল-রেল বানাচ্ছে রসাতলের রাস্তা—এমন চিন্তা নিয়ে তুষ্ট থাকার মতো বিকার অনেকের মনে ছড়িয়ে পড়েছে ভাবতে পারি না। তাই হয়তো বা কিছু ভুল

বোঝাবুঝির ঝুঁকি নিয়ে লিখলাম কয়েকটা কথা, কারণ আশা তো ছাড়তে পারি না যে কলকাতাকে 'ভয়ঙ্কর ভালোবাসি' বলার মতো আছেন অনেকেই, যারা গভীরভাবে ভাববেন কেমন করে আমাদের এই অতি-প্রিয় অথচ বহুনিপীড়িত শহরের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে আবার দেশ আমোদিত হতে পারবে।

সুরজিৎ সিংহ উপজাতি ও ভারত-সভ্যতা

ভারতের ওপর তাদের আধিপত্য ধীরে-ধীরে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে ব্রিটিশরা আবিষ্কার করল যে এই উপমহাদেশের মানুষজন প্রধানত বসবাস করে, স্বয়ংশাসিত অসংখ্য গ্রামে। আর, সেখানে নানা জাতির (caste) গোষ্ঠী আছে। তাদের বিবাহাদি ঘটে নিজেদের মধ্যেই। পেশা পৈতৃক। ব্রিটিশরা আরো দেখল, এই জাতিগুলি জন্মসূত্রে নির্ধারিত এক অনড় ব্যবস্থায় বিন্যস্ত। আচার-অনুষ্ঠানের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল এক আদর্শ বর্ণপ্রথার ওপরই এ জাতিপ্রথা গড়ে উঠেছে। আদিযুগের যে-সব ব্রিটিশ শাসক, পণ্ডিতও ছিলেন, তাঁরা এ-ও আবিষ্কার করেছিলেন, এই ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-জাতি ব্যবস্থার বাইরেও ভারতের কোনো-কোনো মানব-গোষ্ঠী আছে। তারা জাতিভিত্তিতে সংগঠিত কৃষি-গ্রামগুলির বাইরে, পাহাড়ে অরণ্যে বা অরণ্যসন্নিহিত সমতলে, অবিন্যস্ত অন্তর্বিবাহগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করত। হাল দিয়ে জমি চাষ করার সঙ্গে-সঙ্গে তারা কিছু-কিছু শিকারও করত, বনের বুনো ফল জাতীয় জিনিসও সংগ্রহ করত। তাদের অনেকেই মাটি পুড়িয়ে একেবারে আদিম পদ্ধতিতে চাষ করত। এদের ভিতর বেশ কিছু সংখ্যক শিকার ও ফলসংগ্রহের ওপরই নির্ভরশীল। আমেরিকা, আফ্রিকা ও ওসানিয়ায় এই ধরনের ছোট-ছোট আদিম গোষ্ঠীর (aboriginal) সঙ্গে মিলিয়ে, ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার স্তরবিন্যাসের আপাত-অন্তেবাসী ভারতের এই সব প্রাক্-অক্ষরজ্ঞান সামাজিক গোষ্ঠীকে উপজাতি বলা হতো।

কালক্রমে সেনসাস এবং রাজ্যশাসনের নানা প্রয়োজনে 'আদিবাসী'-সংজ্ঞাটা সামাজিক ভাগ হিসেবেই স্বীকৃতি পেল। স্বাধীনতার পরে ভারত সরকারও 'তপশিলি উপজাতি' (সিডিউলড্ ট্রাইব) এই ভাগ মেনে নিলেন। ১৯৭১-এর সেনসাস অনুযায়ী, ভারতে ৪২৭টি গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে আছে ৩ কোটি ৮০ লক্ষেরও কিছু বেশি তপশিলি উপজাতি।

'উপজাতি' বোঝানোর জন্যে কোনো নির্দিষ্ট শব্দ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নেই। সমকালীন গ্রামসমাজেও নেই। গ্রামে এই তথাকথিত উপজাতি বা জাতি (caste) বোঝাতে 'জাতি' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন সাহিত্যে 'জন' শব্দটি পাওয়া যায়, এতে বোঝাত সম-জাতীয় গোষ্ঠী (Ethnic group)। তা থেকে 'জনপদ'—সমজাতীয় গোষ্ঠীর বসবাসের জায়গা। প্রান্তিক কিছু 'জনপদ'-কে বলা হত 'অটবীক রাজ্য' বা 'প্রত্যন্ত দেশ'। কিরাত, শবর, ভীল, নিষাদ, আভীর—এই সব 'জন', 'আটবীক রাজ্য' বা 'প্রত্যন্ত দেশ'-এ থাকত।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় পণ্ডিতরা এই কিরাত ও ভীলদের, ভারতবর্ষের জনসংখ্যার অন্যান্য সমজাতীয়-গোষ্ঠীর মতোই এক 'জন' মনে করতেন। সরকারি ভাষায় যারা 'তপশিলি উপজাতি', তাদের এখনও হিন্দু কৃষকরা বলে থাকে 'জাতি' (কখনও বলে 'জংলি জাতি'—যে-সব 'জাতি' জঙ্গলে বাস করে)। এই উপজাতীয়েরাও নিজেদের লোকজনকে 'মানুষ' আর অন্যদের 'মানুষ-না', বিদেশী, মনে করে। সাঁওতালদের মধ্যে নিজেদের লোককে বলে, 'হোর'. অন্যদের বলে, 'দিকু'। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রত্যন্তদেশে ক্রমবেষ্টিত এই প্রাক্-অক্ষরজ্ঞান উপজাতিগুলি কোন দৃষ্টিতে উপজাতি আর ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করত না স্থির করা দুরূহ।

সাধারণভাবে স্বীকার করে নেয়া হয় যে লাঙল-চাষ নির্ভ ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-জাতি'-সভ্যতা ক্রমেই এগিয়ে আসছিল ও গ্রাস করছিল, হাজার-বছর পরে এই 'অটবীক জনগুলি' এই সভ্যতার কাছাকাছি আসছিল, এবং তখন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন স্বয়ংশাসিত এই সব অসংখ্য গোষ্ঠী ঐ হিন্দুসভ্যতার সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। আদি যুগের ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকরা লক্ষ করেছিলেন, যে-সব গোষ্ঠীকে তাঁরা 'উপজাতি' বলতেন তারা ছড়িয়ে ছিল বনজঙ্গলের বিচ্ছিন্নতায় চরম স্বয়ংশাসিত অবস্থা থেকে শুরু করে জাতি ব্যবস্থার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ সংশ্লেষের স্তর পর্যন্ত নানা পর্যায়ে। ১৮৭২-এর পর থেকে বিভিন্ন সেনসাস কমিশনার বার বার এই প্রবল অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছেন যে কী করে তারা ঠিক করবেন, সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে কোথায় 'উপজাতি' শেষ এবং 'জাতি' শুরু।

যখন আমরা জাতিভিত্তিক কৃষক-নির্ভর ভারতীয় সভ্যতার নিরিখে এই উপজাতিদের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করি তখন আমাদের দুটি পরস্পর

বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। একদিকে, ভারতীয় কৃষক সমাজের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের অংশ হিসেবে 'বর্ণ-জাতি'র মধ্যে এই উপজাতিরা ঢুকে পড়ছে। অন্যদিকে, আবার অনেক উপজাতি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব জাতীয় সামাজিক সংস্কার দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকছে।

এই নিবন্ধটিতে আমি বিশ্লেষনের চেষ্টা করব এখনও পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন উপ-জাতিদের সভ্যতার অন্তর্ভুক্তি ও উপজাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা—এই দুই প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত কারণগুলি কি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কই বা কি।

দুই

এখন কয়েকটা সংজ্ঞা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। সংস্কৃতি ও সংগঠন এই দুইদিক থেকে সভ্যতার সংজ্ঞা নির্ণয়ে আমি মোটামুটিভাবে রেডফিল্ড-এর (১৯৬২ : ২৮২-৯৪, ৩৬৪-৭৫) ধারণা অনুসরণ করব। সভ্যতার ধারণা করতে গেলেই ধরে নিতে হয় যে, অবিন্যস্ত স্থানীয় মৌখিক ঐতিহ্যের স্তরের ওপরে শিক্ষিত-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্ধারিত ও বিন্যস্ত মনন ক্রিয়ার সক্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল বস্তুসম্পদ ও ভাবসম্পদ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন স্তরের নাগরিক কেন্দ্রের উদ্ভব। এই কেন্দ্রগুলি আবার সংস্কৃতির যোগসূত্রে অন্যান্য সমতুল্য কেন্দ্রের সঙ্গে এবং গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে গ্রথিত (ম্যারিয়ট ও কোনে, ১৯৫৮)।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'কৃষক সমাজ' বলতে বোঝায় এমন স্থায়ী কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ গোষ্ঠী যার সদস্যরা প্রধানত মৌখিক ঐতিহ্যের দ্বারা চালিত হলেও, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ও সভ্যতার কেন্দ্রগুলির সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত। সভ্যতার প্রভাবের ভিতর অসংখ্য গ্রামে উৎপাদিত অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্তের ওপরই নির্ভর করে প্রাক্‌-শিল্পযুগীয় সভ্যতার কেন্দ্রগুলি ও তার বিরাট বিস্তার। ভারতবর্ষে কৃষি-সমাজগুলির অবশ্য আরো এক প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত 'বর্ণ জাতি' ব্যবস্থার দ্বারা ও বংশানুক্রমিক শ্রম-বিভাগ দ্বারা ভারতীয় কৃষক-সমাজ চিহ্নিত।

আমাদের পক্ষে তাই, এই কৃষি-সমাজগুলির বিপরীতে, এই উপজাতি গুলিকে পরিষ্কার ভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব। সভ্যতার কেন্দ্রগুলির সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ থেকে উপজাতিরা অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। সেই বিচ্ছিন্নতায় ঝুম চাষ, শিকার ফল-সংগ্রহ ইত্যাদি আদিম ও

ন্যূনতম কৃৎ-কৌশলের ওপর তারা নির্ভরশীল এবং সম্পূর্ণতই অলিখিত মৌখিক ঐতিহ্যের দ্বারা চালিত।

ওপরের এই সংজ্ঞা থেকে এটা পরিষ্কার যে, উপজাতি-জাতি / কৃষক এই দুই কোটির ভিতরকার কেন্দ্রীয় অক্ষ ধরেই ভারতীয় সভ্যতায় উপজাতিদের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি বিচার করতে হবে।

তিন

সংজ্ঞায় প্রয়োজনে উপজাতি-সমাজকে আমি চিহ্নিত করেছি বিচ্ছিন্নতার নিরিখে। ভারতের পরিস্থিতিতেই বোঝা যায় যে এই বিচ্ছিন্নতার চরিত্রও নির্ধারিত হয় অগ্রসরমাণ সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যের সূত্রে। ভারতের উপজাতি-সমাজ ও সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র আদিম-সংগঠনের প্রত্নরূপ বা উন্নত কৃষক-সমাজের সাংস্কৃতিক কাঁচা মালের ভাণ্ডার ও সেই প্রয়োজনে সভ্যতার প্রচণ্ড চাপে নিম্নতম স্তরের আদিমতায় খাটকে রাখা কোনো গোষ্ঠী বা প্রক্রিয়া হিসেবে দেখলে ভুল করা হবে। ক্রোয়েবারের বিখ্যাত হাক্সলে স্মারক বক্তৃতায় এ বিষয়ে নতুন নির্দেশ পাওয়া যায়।

> ......the primitives in the area, or adjoining it, derive their cultures mainly from the civilizations characteristics of the *Oikumene* as a whole through reductive selection. They preserve old elements largely discarded elsewhere, and they do without elements which their retardation makes them unable or unwilling to accept. Basically, however, these retarded or primitive cultures in or adjacent to Oikumene are fully intelligible only in terms of 'oecumenical' civilization. They usually add to what they share some lesser measure of their own proper peculiarities and originations, and they have often developed a distinctive style of their own. But in the main these backward cultures depend and derive from the greater ones whose nexus we have been considering. (Kroeber 1952).

১৯৪৬-এ ক্রোয়েবার-এর অর্থগর্ভ নিবন্ধ 'Oikumene-Primitive relationship' খুব একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। খুব সম্প্রতিকালে উপজাতি এলাকা ও সীমান্তগুলিকে সভ্যতা বা সভ্যতাসমূহের ওপর নির্ভরশীল সংগঠন হিসেবে বিচার করা আবার শুরু হয়েছে। ১৯৬৭-তে আমেরিকান এথনোলজিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত Essays on the problem of tribe (হেল্‌ম, ১৮৬৮)-এ এই পরিপ্রেক্ষিতটি তুলে ধরা হয়েছে। মর্টন ফ্রায়েড লেখেন,

> while being bold, I shall go on to say that most tribes seem to be secondary phenomena in a specific sense: they will be the product of processes stimulated by the appearance of relatively highly organized societies amidst other societies which are organised much more simply. If this can be demonstrated, tribalism can be viewed as a reaction to the formation of complex political structure rather than a necessary preliminary stage in evolution. (Fried 1968: 15).

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সভ্যতা ও উপজাতি সম্পর্ক নিয়ে মোরম্যান লেখেন,

> ......a Southeast Asian society's membership in the set called 'tribal' can be described, defined and analysed only in terms of the society's contrast to civilized society which it may fight, serve mimic or even become—but which it can never ignore...In Southeast Asia, the categories 'tribal' and 'civilized', each implies and defines the other. This suggests it would be foolish to discuss regional history in terms of evolution from tribe to state, since tribes exist only in the context of a state system of social relations which includes them; states exist by coming in terms with tribes (as social types). (Moerman 1968: 164)

সভ্যতার ওপর নির্ভরশীল সংগঠন হিসেবে উপজাতি ও সভ্যতার ভিতরের সম্পর্কের বিচারে রায়বর্মন কয়েকটি অনুমান করেছেন। তাঁর নজরে পড়েছে

ভারতে উপজাতি সন্নিবেশ ঘটেছে হয় আন্তর্জাতিক সীমান্তে না-হয় দেশের ভিতরের নানা ভাষায় ও সংস্কৃতির সীমান্তে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতিদের সম্পর্কে তিনি বলেন, যে, কোনো কোনো উপজাতি গোষ্ঠী 'বাফার' বা 'ব্রিজ' হিসেবে কাজ করছে—বিভিন্ন সংলগ্ন নেশন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিতরে। মিরি উপজাতি যেমন ব্রিজের কাজ করছে অরুণাচলের আবর উপজাতি ও অহোম রাজাদের ভিতর। মণিপুরের মেইতেই উপজাতি ও জঙ্গি নাগা উপজাতিগুলির মধ্যে কুকিরা 'বাফার'-এর কাজ করেছে। আরো বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে রায়বর্মন গুজরাট থেকে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে ফিলিপাইনস পর্যন্ত সম্প্রসারিত প্রায় একটানা উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকার অবস্থা বিবেচনা করেছেন। এই পুরো জায়গা জুড়ে উপজাতিগুলি 'করিডরের' কাজ করেছে—চারপাশের সভ্যতার চাপ সয়েছে এবং নিজদের ভিতর ও পরস্পরের মধ্যেকার সংযোগসূত্রটি রক্ষা করে গেছে।

উপজাতিকে সভ্যতারই ওপর নির্ভরশীল সংগঠন (Dependent structure) ধরে নিয়ে আমি ভারতীয় সভ্যতার উপজাতিদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ভিতরে আলোচনা করছি।

চার

১৮৭২ থেকে ব্রিটিশ সেনসাস কমিশনাররা লিখে যাচ্ছেন যে সারা ভারতেই উপজাতিরা জাতি হয়ে যাচ্ছে। রিসলে বলেছেন,

'বর্তমানে সারা ভারতেই উপজাতিরা ধীরে ধীরে এবং নিজেদের অজ্ঞাতে জাতিতে বদলে যাচ্ছে। এই বদলের বিভিন্ন পর্যায় নির্ধারণ করা দুরূহ। তবে এই বদলের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে 'কাহিনী'। এইসব 'কাহিনী' দিয়ে বলা হয় যে আজ যা কিছু দেখা যাচ্ছে তা গতকাল শুরু হয় নি, শুরু হয়েছে সৃষ্টির আদিতে।' (রিসলে ১১৫ : ৭২।)

রিসলে উপজাতীয় পরিবর্তনের প্রধান অবলম্বন হিসেবে নির্দিষ্ট করেছিলেন 'কাহিনী'-কে। নির্মলকুমার বসু (১৯৪১) তাঁর বিখ্যাত The Hindu method of tribal absorption নিবন্ধে জোর দিয়ে বলেছিলেন, হিন্দু কৃষকের লাঙল-ভিত্তিক উন্নততর অর্থনীতির সাপেক্ষতায় পশ্চাদপদ উপজাতীয় অর্থনীতির আত্মরক্ষার ঘটনাটাই প্রধান উপাদান। ওড়িশার বদলি-কৃষক (shifting cultivator) জুয়াং-এর উদাহরণ দিয়ে নির্মলকুমার এই উপজাতি ও কৃষকদের সম্পর্কের ঘটনা পরম্পরা দেখিয়েছেন।

লাঙল-চাষী হিন্দু কৃষকরা মূল জুয়াং-এলাকায় প্রবেশ করে এবং জঙ্গল হাসিল করে। তখন জুয়াংরা আরো ভিতরের উঁচু পাহাড়ে ও গভীর উপত্যকায় চলে যায়। কিন্তু সেই পাহাড় উপত্যকায় আদিম উৎপাদন-পদ্ধতিতে জীবন ধারণ করা সম্ভব ছিল না। তারা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি। এই পরিস্থিতিতে জুয়াংদের একটি অংশ পার্বত্য উপত্যকাগুলিতে জলে-চাষ (wet cultivation) শুরু করে ও বাঁশের ঝুড়ি বানানো শিখে নেয়। এই ভাবে তারা লাঙল চাষের উন্নততর উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বারা লালিত হিন্দু সমাজের সংলগ্ন হয়ে যায়। নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত করেন, অগ্রসরমাণ কৃষি-সভ্যতার সঙ্গে এরকম অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ গোষ্ঠী সংলগ্ন হতে থাকল; ফলে, উচ্চতর অর্থনীতি থেকে ও হিন্দু জাতি-সমাজের স্বকীয় ক্ষমতা থেকে নানা সাংস্কৃতিক উপাদান আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল—যতদিন না এই গোষ্ঠীগুলি জাতিগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। কোনো একটি হাতের কাজে একচেটিয়া অধিকার পেলে, নিজেদের গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারলে, এবং নিজস্ব সাম্প্রদায়িক রীতি-নীতিগুলি অনুসরণ করে নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য কোনো-একভাবে রক্ষার সুযোগ পেলে উপজাতীয়দের পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়।

State formation and Rajput myth in tribal central India নামে একটি নিবন্ধে, আমি একটু বিশদভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছি, প্রধানত বরাহভূমের ভূমিজ উপজাতিদের প্রসঙ্গে, কী ভাবে রাষ্ট্র-সংগঠন এবং রাজপুত বংশ পরিচয়ের পুরাণ-কাহিনী, একই সঙ্গে, ভারতীয় সভ্যতার সামাজিক সংগঠনের ভিতরে উপজাতীয়দের গ্রথিত করার-এক পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। বরাহভূমের সমাজ-প্রধানের পদটির বিবর্তনে এই সাক্ষ্য মেলে যে উপজাতীয় ভূমিজদের এই গোত্র-বাসস্থান (clan-territory) বদলে গেল তরফ সর্দার, সদিয়াল, ঘাটোয়াল ইত্যাদি নিম্নতর প্রধানদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত রাজপুত-ক্ষত্রিয় মর্যাদার দাবিদার সম্পূর্ণ পরগনার রাজার অধীনে এক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সংগঠনে। এই সামন্ততান্ত্রিক সংগঠনের সংলগ্ন ছিল নানা অন্তর্বিবাহ গোষ্ঠীর নানা স্তর—যেমন নমহল পর্যায়ের রাজপুত-ক্ষত্রিয়, দশমহল পর্যায়ের রাজপুত-ক্ষত্রিয়, অতৈযে ভূমিজ, নাগাদি ভূমিজ। সেই নিবন্ধে একথা বলা হয়েছে যে, ভূমিজদের ক্ষেত্রে লাঙল ব্যবহার ও পুকুরের জলে কৃষিতে সেচের ব্যবহার রাষ্ট্রগঠনে সাহায্য করেছে। প্রচুর ব্রহ্মত্র ভূমিদানে বোঝা যায় যে বহিরাগত ব্রাহ্মণেরা এই উপজাতীয় সর্দারদের

রাজপুত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নানা পুরাণ কাহিনী ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের বিধান জুগিয়েছে।

তামারের মুণ্ডা ও মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড উপজাতীয়দের সঙ্গে ভূমিজদের তুলনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোই যে, ভারতের মধ্য-অঞ্চলের সম্পূর্ণ উপজাতি এলাকায় আঞ্চলিক রাষ্ট্র-সংগঠনগুলিকে অবলম্বন করেই বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী ভারতীয় সভ্যতার সামাজিক সংগঠন ও তার মহাকাব্য-পুরাণের কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বরাহভূমে আমরা আরো লক্ষ্য করেছিলাম যে রাষ্ট্রগঠনের মধ্য দিয়ে সমাজ-রাজনীতির বিবর্তন আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সংস্কৃতির সংশ্লেষ ঘটিয়েছিল। তাতে, একদিকে যেমন স্থানীয় সাম্প্রদায়িক আচার-অনুষ্ঠান জায়গা পেয়েছিল তেমনি আবার স্থানীয় 'থানের' দেবতাও হিন্দু দেবতাদের বংশলতিকায় ঢুকে পড়েছিল।

আদিম স্তরের বদলি-চাষের সঙ্গে শিকার ও বনজদ্রব্য সংগ্রহে অভ্যস্ত বিচ্ছিন্ন উপজাতিরা কোন কোন পদ্ধতিতে জাতি-কৃষক ভিত্তিক ভারত সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছিল, তাই আমি এতক্ষণ আলোচনা করেছি। রিস্‌লে, নির্মলকুমার ও আমার এই আলোচনা থেকে এ-রকম একটি ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যেন সভ্যতার সঙ্গে মিশে যাওয়ার এই পদ্ধতিটি অনতিক্রম্য ও একমুখী। নৃতত্ত্বে আমার শিক্ষক অধ্যাপক তারকচন্দ্র দাস হিন্দু-সভ্যতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন, 'হিন্দু-সভ্যতা হল শ্লথগতি এক বিরাট পাইথন—যার বিরাট হাঁয়ের মধ্যে উপজাতি গোষ্ঠীগুলি ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ে; তারা জানতেও পারে না কী ভাবে বিলীন হয়ে যাবে।'

সভ্যতার সঙ্গে মিশে যাওয়ার ছবিটি যদি শুধু এইভাবেই আঁকা যায়, তাহলে উপজাতিদের উপর বহিরাগতদের নানা ধরনের শোষণের কথা ধরা পড়ে না অথচ আসলে তো এই শোষণই এই পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করেছে। সাম্প্রতিক-কালে লক্ষ্য করা গেছে যে বহিরাগত অ-উপজাতিরা সবচেয়ে আগে চেষ্টা করেছে ভালো চাষযোগ্য জমিগুলি দখল করতে। উপজাতীয়দের সস্তা কৃষি-শ্রমকেও তারা ব্যবহার করেছে। বহিরাগত হিন্দু জাতিদের এই স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই প্রয়োজন হয়েছিল উপজাতিদের নিচু জাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে উপজাতীয় সর্দাররা জমির উপর তাদের দখল কায়েম রাখতে পেরেছিল সেখানে হিন্দু উচ্চ বর্ণের লোকেরা এই সর্দারদের সামনে হিন্দু সমাজেরই উচ্চ সামাজিক মর্যাদা দেয়ার লোভ দেখিয়েছে ও

ব্রহ্মত্র জমির বিনিময়ে তাদের সেই মর্যাদা দিয়েওছে।

হাজার বছর ধরে এই জাতি-কৃষক সমাজ যে নানা রকম বিচিত্র উপায়ে এই উপজাতীয়দের টেনে দিয়েছে তার পাশাপাশি আমরা এও লক্ষ্য করি যে অসংখ্য উপজাতি-গোষ্ঠী তাদের নির্দিষ্ট উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য আজও রক্ষা করে চলেছে। এমন-কি সাঁওতালদের মতো যারা বহুদিন ধরেই স্থায়ী কৃষিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তাদের বেলাও একথা সত্য। যে-যে পদ্ধতিতে উপজাতীয়েরা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে, তার কিছু পদ্ধতি আমি এবার ব্যাখ্যা করব।

পাঁচ

১৯৫৬ থেকে ৫৮-তে কৃষক ও শ্রমিক সাঁওতালদের মধ্যে সমীক্ষা করতে গিয়ে মার্টিন ওরান্স লক্ষ্য করেন যে যদিও সাঁওতালরা বহু পুরুষ ধরেই হিন্দু জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ও নিজেদের সংস্কৃতিতে অনেক হিন্দু-বৈশিষ্ট্যই গ্রহণ করেছে, তবু এই রূপান্তরিত সংস্কৃতির উপজাতীয় নেতারা উপজাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার সমর্থনে এক সামাজিক আন্দোলন তৈরি করেছে। সেই স্বাতন্ত্র্যের সমর্থনে এক বিস্তারিত পুরাণ কাহিনীও সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৮৫৫-র সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বে এই সামাজিক পরিবর্তনের পদ্ধতি সন্ধান করতে গিয়ে ওরান্স লক্ষ্য করেন যে সাঁওতাল সমাজে, একবার হিন্দু সংস্কৃতির অনুকরণের পক্ষে আর তার পরই নিজেদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে, আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বার বার ঘটেছে। এই দুই প্রক্রিয়াতেই বহিরাগত হিন্দু কৃষকদের সম্প্রসারণের সামনে সাঁওতালরা নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। সাঁওতালদের সম্পর্কে তাঁর এই সমীক্ষায় ওরান্স, হিন্দু সমাজের অবরোধের সম্মুখীন হয়ে উপজাতীয়রা নিজেদের কিভাবে বদলে নিচ্ছিল, সে বিষয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছন। ওরান্স দেখেছেন, বহিরাগত হিন্দুদের অবরোধের সামনে যখনই কোনো উপজাতি বুঝতে পারে যে, হিন্দুরা তাদের সামাজিকভাবে নীচ মনে করে, তখনই তারা নিজেদের মর্যাদা বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। এই পরিবর্তনের প্রধান উপায় দুইটি—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। যদি অর্থ-নৈতিক উপায়টিই প্রধান হয়ে ওঠে তা হলে উপজাতি ধীরে-ধীরে প্রধান অ-উপজাতি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অর্থনৈতিক উপায় যদি বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে অবরুদ্ধ উপজাতি চেষ্টা করে সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক

স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক ধরনের মর্যাদা পেতে। এই সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনের সাংস্কৃতিক আনুষঙ্গিক হিসেবে উপজাতিগুলি নিজেদের সাংস্কৃতিক-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটাই দৃঢ় করে তুলতে চায়। ওরান্স মনে করেন, সারা ভারত জুড়ে শুধু উপজাতিদের মধ্যেই নয়, এমন কি জাতি, ও আরো ছোট সব গোষ্ঠীর ভিতরও, সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা শুধু হিন্দুধর্মের সহনশীলতা দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। সাম্প্রদায়িক নিজস্বতা রক্ষার আন্দোলনের সাংস্কৃতিক উপাদান থেকেই বোঝা যায় এই নিজস্বতার অভিমান সম্প্রদায়ের কত গভীরে প্রোথিত। তাই, এই ধরনের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ভারতের ইতিহাসের এক স্থায়ী ঘটনা, মাঝে মাঝেই ফিরে ফিরে আসে (ওরান্স, ১৯৬৫)।

আমার মনে হয়, সাম্প্রদায়িক সংহতি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মর্যাদা লাভের এই প্রয়াস ছাড়াও আরো কিছু কারণে ভারতের উপজাতিদের জীবনযাত্রার নিজস্বতা রক্ষিত হয়ে এসেছে।

আমি তো প্রায় এমনই একটা ছবি এঁকে ফেললাম, যেন বেশির ভাগ সময়ই উপজাতিদের হিপনোটাইজ করে টেনে এনে জাতি-কৃষক সমাজের নিচু স্তরে ফেলা হত। আর প্রধান কৃষক শ্রেণী তাদের শোষণ করে চলত। এই যেন ছিল তাদের নিয়তি।

কিন্তু এও সত্য মনে হয় যে কোনো-কোনো উপজাতি গোষ্ঠী, খানিকটা অনির্দিষ্ট ভাবেই, ভিতরে-ভিতরে বুঝে ফেলে, বৃহত্তর একটি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত তারা হচ্ছে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হারাচ্ছে নিজস্ব সংস্কৃতি-লালিত এক জীবনবোধ। এই জীবনবোধটিকে রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা থেকে কখনও কখনও জাতি-কৃষক সমাজের আকর্ষণ, প্রতিরোধও করা হয়েছে। অসীম অধিকারী (১৯৭৮) লক্ষ্য করেছিলেন যে ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার বীরহোর উপজাতি বহুদিন ধরে সন্নিহিত সংগঠিত কৃষকদের সঙ্গে ধানে ও নগদে বনজ দ্রব্যের বিনিময় চালালেও বারবার তাদের অরণ্য অঞ্চলেই ফিরে আসতে চেয়েছে। সেখানে তারা এমন এক সংস্কৃতিতে নিজেদের জীবনকে বাঁধতে পারে, যা তাদের কাছে গভীর অর্থবহ। অথচ সে নিয়ে অন্যদের হাসিঠাট্টার সুযোগ নেই।

কোনো কোনো বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো কোনো উপজাতি গোষ্ঠী উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক জীবনবোধকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে যা তাদের চারপাশের জাতি/কৃষক সমাজের পক্ষে

সম্ভব ছিল না। আবুঝমার পাহাড়ে মারিয়াদের পোড়ানি চাষ (Slash and burn cultivation) অরুণাচল প্রদেশের আপাতানি কৃষকদের ও কোরাপুট জিলার সাওরাদের সিঁড়ি চাষ (terrace cultivation) এরকম কয়েকটি উদাহরণ। এর ফলেই তারা তাদের স্বতন্ত্র জীবনধারা রক্ষা করতে পেরেছে।

নবলাথ (১৯৬১) দেখিয়েছেন বাঁশ-ওয়ারার সম্প্রসারণশীল রাজপুতদের গ্রাম থেকে সরে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত রুক্ষ মরু এলাকায় বসতি স্থাপন করে এবং সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজনে দুর্দমনীয় এক অ-সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। মানভূম ও ধলভূমের খরিয়াদের মধ্যেএবং মেদিনীপুরের তথাকথিত 'অপরাধী' লোধাদের ভিতরেও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই লড়াকু-ভাব দেখা যায়।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি রায়বর্মণ লক্ষ্য করেছেন যে কোন কোন সভ্যতা ও নেশন্ তাদের সংলগ্ন-উপজাতিদের উপজাতি স্তরেই সংরক্ষণের প্রয়োজন বোধ করেছে—এই উপজাতিগুলো তাদের 'বাফার' এবং 'ব্রিজ' হিসেবে কাজ করে। একইরকম ভাবে অনুমান করা চলে, কোন কোন উপজাতিদের বাধ্যই করা হয়েছে বনের ভিতর থাকতে, যাতে সন্নিহিত রাজ্যে তারা বনজ সম্পদ পৌঁছে দিতে পারে। মৈমনসিংহের জমিদাররা গারো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অসংখ্য হাজং পরিবার বসাত যাতে সস্তায় হাতি ধরা যায়। মহীশূরের হেড্ডিগোডেন কোটা ফরেস্টের জেনু কুরুবাদের বাধ্য করা হয়েছে শিকারী ও অরণ্যচর হয়ে থাকতে, যাতে মহীশূরের মহারাজা হাতি ধরে পোষ মানাতে পারেন (মিত্র ১৯৭৭)।

পরিশেষে বিভিন্ন এথ্‌নোগ্রাফিক রিপোর্টে যা করা হয় তার চাইতে অনেক গভীরে দেখতে হবে উপজাতিদের ভিতরে ও উপজাতিদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ও সংযোগ রক্ষার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ধরনটিকে। প্রায় তিরিশ লক্ষ সাঁওতাল এক বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে আছে। তাদের এই বসতি-এলাকা এক লপ্তে নয়, ছাড়া-ছাড়া। তবুও তাদের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক ঐক্য কী ভাবে রক্ষিত হয় তা দেখতে গেলে সাঁওতালদের ভিতরকার সংযোগ-ব্যবস্থার ধরন ও প্রকৃতি গভীরভাবে পরীক্ষা করতে হবে। আমরা জানি সাঁওতালদের মধ্যে দিসুম্ সেন্দ্রা বলে এক বাৎসরিক সামাজিক শিকার অনুষ্ঠান আছে। তাদের সৃষ্টিতত্ত্বও অতি বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট। এবং তাদের মধ্যে এমন অনেক বিশেষজ্ঞ আছে যারা এই মৌখিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডারী। আমরা এও জানি যে ১৮৫৫-তে সাঁওতাল

বিদ্রোহের বার্তা নিজস্ব পদ্ধতিতে দিক দিগন্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হত। উপজাতিদের মধ্যে আরো বিস্তৃত সংযোগ সাধন পদ্ধতির সম্ভাবনা, এমন-কি নেশন্ ও সভ্যতার সীমাও অতিক্রম করে গেছে। এ-সম্পর্কে রায়-বর্মণের ধ্যান ধারণার কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

এতক্ষণ দেখা গেল উপজাতিদের নিজস্বতা রক্ষার চেষ্টাগুলো ছয় ধরনের—রাজনৈতিক-সংহতির আন্দোলনের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য, জীবন-বোধের প্রয়োজন, অগ্রসরমান সভ্যতার গ্রাসের বাইরে জলবায়ু-প্রকৃতির ভিতরে সাম্য-সাধন, পরিবেশ-বিষয়ে একটা লড়াকু-ভাব ও উপজাতিদের অন্তর্সংযোগ ও আন্তর্সংযোগ। আমি শুধু প্রধান-প্রধান সংযোগগুলির কথাই বলেছি। এতেই অন্যান্য সব সম্ভাবনা কথাই বলা হল তা ও নয়। একটি উপজাতির অবলম্বিত কয়েকটি পদ্ধতির ও প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গটি আমি এই নিবন্ধে আনছি না।

পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই। অস্ট্রিক-মুণ্ডা উপভাষাগুলির অন্তর্ভুক্ত উপজাতিগুলির প্রকৃতি ও স্তর বিচার করলে আমাদের মনে হয়, এই উপজাতিগুলির 'সামাজিক সংস্কৃতির সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলি' তখনই রক্ষিত হয়েছে, যখন উৎপাদন ক্রিয়া ও অর্থনীতির এবং ভূমি ও মানুষের একটা বিশেষ অনুপাত কার্যকর থেকেছে। এমনই এক প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর প্রভুত্বে মুণ্ডারি-ধরনে সবচেয়ে ভালো নিদর্শন মেলে যেখানে শিকার, শুখা চাষ (Dry cultivation) ফল কুড়নো, ও পোড়ানি-চাষের ভিতর সামঞ্জস্য ঘটানো এক উৎপাদন-অর্থনীতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। পুরুলিয়া ও সিংভূমের খড়িয়ারা পোড়ানি-চাষ শিকার ও ফলকুড়ানোর জন্য বনের ওপর যে-অধিকার দরকার, তাই হারিয়ে ফেলেছিল এর ফলে স্থানীয় সামাজিক সংগঠনের সম্মিলিত জীবন, গোষ্ঠী ও গোত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা, নাচ-গান-উৎসব সব কিছুরই ক্ষয় ঘটে গেল। এর বিপরীতে, বরাহভূমের ভূমিজ উপজাতির মধ্যে রাজপূত-বনে-যাওয়া কিছু অভিজাতের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে সেচ-এলাকায় জল-চাষের মাধ্যমে উৎপন্ন উদ্বৃত্তের ফলে এমন অবস্থা হয়েছে যে উপজাতিদের নিজস্ব অর্থনীতিক সংগঠনের সক্রিয়তা হারিয়ে গেছে। ফলে, সমাজে স্তরবিন্যাস ও সমারোহ কিছু এসেছে বটে কিন্তু এক বলিষ্ঠ, সমবায়িক, কল্যাণমুখী সামাজিক আদর্শ ও সংস্কৃতির মূল্যে।

যাই হোক, এ-কথাও বলা দরকার, বরাহভূম পরগণার বহু-সাম্প্রদায়িক বর্ণ-জাতিভিত্তিক সাংস্কৃতিক যে কাঠামো তৈরি হয়ে উঠছে, তাতে উপজাতি-

গুলি এক বলিষ্ঠ আদিম সাংস্কৃতিক পেশলতা সঞ্চার করে দিয়েছে। এমন একটা অনুমানও করা যায় যে ভারত-সভ্যতার মূল আধার সমতলভূমি অরণ্য অবরোধে বা প্রত্যন্ত সীমায় 'অটবীক জন' গুলিকে রক্ষা করে এসেছে কিছু মানুষকে শুধু অরণ্য-অভ্যন্ত রাখার প্রয়োজনেই নয় বা 'রাজনৈতিক বাফার-এলাকা' সৃষ্টির মতলবেই কেবল নয়। সভ্যতার এই কেন্দ্রগুলি মাঝে-মাঝেই উপজাতিদের আদিম জীবনবোধের সংস্পর্শে এসে নিজেদের পুষ্টি সংগ্রহ করত। আমরা তো জানি ওড়িশার পর্বতে, ছোট নাগপুরের উপত্যকায় ও ছত্তিশগড়ে বৈষ্ণব, শাক্ত ও তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা নতুন-নতুন শক্তি সংগ্রহ করেছে।

ভারত সভ্যতায় উপজাতি এলাকা ও সীমান্ত কী ভাবে জাতি-কৃষক স্তরের সভ্যতার অন্তর্গত হয়ে গেছে সে বিষয়ে কিছু অনুমান মাত্র আমি এই আলোচনায় উপস্থিত করেছি। কী কী উপায়ে ভারতে উপজাতিগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতা রক্ষা করে আসে তারও ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছি। আমি আশা করি দলিল দস্তাবেজ ও পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অতীত ইতিহাসের কার্য-কারণ আবিষ্কারে ঐতিহাসিকগণ এই আলোচনা থেকে ভারত-ইতিহাসে উপজাতি-সভ্যতার সম্পর্ক নির্ণয়ের কিছু সঙ্কেত হয়তো পেতে পারেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিসেম্বর ১৯৭৩ এ পঞ্চম দেবরাজ চানমা স্মারক বক্তৃতার সংশোধিত পাঠের অনুবাদ। অনুবাদের দায়িত্ব আমাদের। স. প.

ক বি তা গু চ্ছ

চেনাজানার মধ্যে

অরুণ মিত্র

চেনাজানার মধ্যে আমার বাস :
এক সকালের কথা আমি অন্য সকালেও শুনি
একদিনের রোদ আমাকে আরেক দিনেও পোড়ায়,
তারপর আকাশকে কাছে পেয়ে
তারাদের আমি সাধি 'শোনাও না ঝুমঝুমি',
চাঁদ যদি ওঠে তো পূর্ণিমাকে টানি,
আঙারে যখন পা পড়ে (প্রায়ই পড়ে)
নিজেকে বলি 'সূর্য যে তোমার সাথী',
বছর বছর একই অনুষ্ঠানে বসি
বন্যাত্রাণ রাজাউজীর বিজয়োৎসব দেখি
আর আমার বয়েস বাড়ে।
সময় কোন্ খাতে বয় আমার হাড়মাংস জানে,
আমি অভ্যেস দিয়ে ছ'কে রাখি
আকাল গোপন ফুর্তি দৈববাণী।
এর মধ্যেই কেউ ব'লে ওঠে
'ওই ছাখো সঙ্কেত, কখন থেকেই উঠে আছে'
তখন আমার সর্বজনীন রক্তে হঠাৎ
এক লহমার ড্রিমিড্রিমি ;
বছর একটু থম্‌কায়, আবার চলে,
আমার বয়েস বাড়ে।

আনন্দের সহযাত্রী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১.

আনন্দ নিঃসঙ্গ আত্মপ্রসাদে
সহজ পদক্ষেপে
চলতে পারে না।
তাকে চলতে হয়
অসংখ্য কাঁটা আর জঞ্জাল মাড়িয়ে।
জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত
চেনা আর অচেনা
রকমারি বিপত্তি নিষ্পত্তির
সংমিশ্রণ।

প্রত্যাশিত অভীষ্টসিদ্ধির আনন্দ বুকে নিয়ে
গন্তব্য পথে চলতে চলতে
পড়ন্ত রোদ লেগে,
মাথা ধরে যায়
অসহ্য যন্ত্রণা এসে
আনন্দ হরণ করে।

টুকটুকে লাল ফুলটিকে
গাছ থেকে তোলার জন্য হাত বাড়াতেই
কোথা থেকে একটা
হলদে বোলতা এসে
হুল ফোটায়
তীব্র যন্ত্রণায় হাত গুটিয়ে নিতে হয়
ফুল তোলা হয় না।
আনন্দের সহযাত্রী নিরানন্দ
নেই-আঁকুড়ের মতো
শ্মশানযাত্রা পর্যন্ত সঙ্গ ছাড়ে না।

২.

খণ্ড খণ্ড ঝড় এখানে ওখানে
গুঁড়ি মেরে
ওৎ পেতে
বিচ্ছিন্ন আবেগে
সঞ্চরমান।

ক্ষণশাশ্বতবাদী ক্ষপণক
প্রেরণা দিলে গর্জায়,
গর্জাতে গর্জাতে জ্বালা ধরায়
মেঘেদের বুকে
বিদ্যুৎ চমকানোই
সার হয়—
বৃষ্টি নামে না।

সমুদ্র খুঁজে না পেয়ে নদী
বুক ভর্তি বালি জমিয়ে
ন্যাবা রঙের চড়ায়
মুখ ঘষে।
স্রোত ঢেউ হারালে
দু'কূলের মড়াকান্না
ছন্নছাড়া ঝড়গুলোর বুকে
জাগাতে পারে না
শাঁ শাঁ শব্দ।

গান

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১.

ফিরে ফিরে আসে সেই ভৌতিক বাতাস
মানুষের দীর্ঘশ্বাস যার খাদ্য

অবিশ্বাস তখন দাঁড়ায় বুক ফুলিয়ে

বন্ধুর ছায়াকে দেখে ভয় পায় সবিতা-ব্রত
চোখ ঢাকে বালিকার প্রেম

খুলে যায় পাতালপুরীর দরজা

'ভয়ঙ্কর অপরাধী' তিনটি শিশুকে
তিন ডজন শিকারী গরিলা
ঘিরে ফ্যালে জ্যামিতিক রক্তের ভিতর।

২.

হঠাৎ কখন শুরু হয় গান :
'ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না…'

এ কোন অবাধ্য হাওয়া? কোথা থেকে আসে?—
ত্রাসে কাঁপে কবন্ধ ভূতের ভয়; যমদুয়ারে কাঁটা লাগে

কপালের ঘাম মুছে মানুষ তাকায়

ছাখে পূর্বাকাশে একটি শীর্ণ তারা প্রাণপণে অন্ধকার ঠেলে
খুলে দিচ্ছে আলোর দুয়ার।

অতন্দ্রিলা জেগে আছে

মণীন্দ্র রায়

অতন্দ্রিলা জেগে আছ ?
অমিয় চক্রবর্তী প্রশ্ন করেছেন।…
কী করে ঘুমোবে এই জংশান স্টেশনে
যেখানে ইঞ্জিন ছোটে শান্টিঙের ইয়ার্ডে সতত,
সারারাত আসে যায় ট্রেন !

পৃথিবী অচেনা নয়,
যেমন প্রস্তর কিংবা ব্রোঞ্জের আমলে দাঁতে নখে
যুদ্ধে রক্তে একদা হয়েছে চিনে নিতে।
এখন জটিল দিন. কেবলি ঝাঁঝর-ড্রাম বাজে,
বাদ্য-সমবায় থেকে উৎক্ষিপ্ত হাজার স্বরলিপি
ছিটকে পড়ে ঈশানে-নৈঋর্তে।

এখন অতন্দ্রিলা জেগে আছে,
আরো ভালো করে কবে ভয়াবহ জেগে উঠবে
তারই প্রতীক্ষাতে।
সময়ের মণিবন্ধ ছিঁড়ে গিয়ে উল্কা ঝরে যায়।
অতন্দ্রিলা জাগে অন্ধরাতে॥

অরুণ সেন

সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা : অজ্ঞাতবাস থেকে যাত্রা

সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডটি বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক কবিতার বাংলায় একটি দীর্ঘলালিত কিংবদন্তির অবসান ঘটল। এই কিংবদন্তি যে-কবিকে ঘিরে তিনি বন্ধুমহলে সুপরিচিত তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত, কুণ্ঠিত, অনিশ্চিত, সদাবিব্রত ও অতিবিনীত স্বভাবের জন্য—অথচ তিনিই আবার ভরপুর কবিত্বের নিশ্চয়তায় ও সাহসিকতায়। যিনি সাময়িকপত্রে কবিতা পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন না, শেষ-প্রুফের পরেও একটি 'কমা' বা 'ড্যাশ' অদল-বদলের জন্য প্রথমে নিরুপায় সম্পাদক বা প্রুফ-রিডারকে, পরে প্রেসের হতবাক্ কর্মীকে কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন। পরে পত্রিকাটি ছাপা হয়ে গেলে কিন্তু উধাও—মনে হয়, নিজের বা যে-কোনো কারো লেখা সম্পর্কেই যেন আর কোনো বিকার নেই। অথচ কবিত্বের তাড়না কখনই শিথিল হয় না, নিরন্তর লিখে চলেন সময়ের দায় মেটাতে, শব্দের দায় মেটাতে। বিভিন্ন পথের ও কর্মের কবি বা কাব্যপ্রেমিকরা সমবেতভাবেই একমত হতে পারেন যাঁর কবিতার ভালোত্ব সম্পর্কে, কারণ কোনো ঝুঁকিই নেই, তিনি কারোরই প্রতিদ্বন্দ্বী নন। তাই তো চারদশকব্যাপী অজস্র কবিতা লিখেও, দু-আড়াই বছর আগে প্রকাশিত একটি ছোট পুস্তিকা ছাড়া, তাঁর কোনো পুরোদস্তুর কবিতার বই-ই বেরোয় না। আর কবি নিজেই তাতে ইন্ধন জোগান। অথচ এই প্রবল আত্মসঙ্কুচিত ব্যক্তিটিরই কবিতায় বাংলা দেশের গত চার দশকেরও বেশি সময়ের তাপ বিকীর্ণ হতে থাকে। শুধু পরোক্ষে নয়, কখনো কখনো অতিপ্রত্যক্ষে। সৃজনকর্ম ও সময়ের প্রতি দায়বোধে যিনি অতন্দ্র,সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে শিল্পসাহিত্যের নানা উদ্যোগ নানা প্রয়াস নানা প্রগতিমূলক কাজেকর্মে যিনি সর্বদা সজাগ, তিনিই কিন্তু নিজের কবিত্বের প্রচারে বা সাধুবাদে প্রায় ভয়ার্ত। সময় যাঁর কবিতায় প্রতিনিয়ত স্পন্দিত, তিনিই আবার কবিতার একটি শব্দ বা একটি 'কমা' বা এক-'এম্' স্পেসের কাব্যিক যৌক্তিকতার ভাবনায় ঘণ্টার পর

ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারেন, ক্রমশই তাঁর পাণ্ডুলিপি হয়ে উঠতে পারে রেখা-কণ্টকিত—অথচ ততই বিষয়ের সঙ্গে, কবিতারও বাইরে যে-জীবনবোধ তার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যায় কবিতার এই শরীর।

১৯৮১-র ফেব্রুয়ারিতে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল এই স্বকল্পিত অজ্ঞাতবাস থেকে যাত্রা। বহুপোষিত কিংবদন্তি ভেদ করে বাস্তব হয়ে উঠল প্রকাশ্য। বাংলা কবিতার জগতে এ ঘটনা তো রীতিমতো একটা উৎসব।

ইতিমধ্যেই অবশ্য, সামনে কোনো বই না থাকাতে, অনেক গুজবই ডানা মেলেছে। কেউ হঠাৎ বলে বসেন, 'দীর্ঘদিন পরে সিদ্ধেশ্বর সেন আবার কবিতা লিখছেন'—যদিও কবির রচনা প্রায় ছেদহীন। চল্লিশের শেষ পর্বের এই কবিকে কোনো কোনো আত্মপ্রত্যয়শীল অনুজ সমসাময়িকজ্ঞানে সামান্য পিঠ-চাপড়েও দেন। কিংবা কেউ রায় দেন, তাঁর কাব্যধারায় বৈচিত্র্য কিংবা প্রগতির কোনো লক্ষণ নাকি নেই। আশা করা যায়, এবারে এই কাব্য-সংগ্রহের প্রকাশ হয়তো তাঁদের স্তব্ধ করে দিতে পারবে। সামান্য পাতা ওলটাতে-ওলটাতেই টের পাওয়া যাবে, কিভাবে আবেগের সঞ্চারে শব্দ উপচে পড়ে কবিতার সীমারেখা ভেঙে ('জননীজন্মভূমিশ্চ' কিংবা 'আমার মা-কে'), আবার কখনো শব্দের পরিমিতিতে সংহতি আসে চার-পাঁচ লাইনের সীমায় ('ধ্বনি নেই' কিংবা 'সনাতন')। কোথাও-কোথাও দেখা যায়, ঘরোয়া ভঙ্গির মধ্যেই একটু সুরেলা উচ্চারণ ('হাজার ঝাঁক, পাথায়'), আবার কোথাও কাব্যিক আবহের মধ্যে কথাবার্তার ব্যস্ত সহজ টান ('নিঃসঙ্গ-তার রাজ্যে' কিংবা 'প্রলয়ে আগে পরে')। কখনো কথায়-কথায়, যেন কথারই নেশায়, অনিবার্য নাটকীয় আড়ম্বর ('মোরগ ফুল' কিংবা 'পৃথিবীর প্রতিরূপে')। কখনো-বা একটি বা দুটি বাক্প্রতিমাতেই সময়কে ধরে দিতে চাওয়া ('মাঝরাতে পেটা-ঘণ্টা')। প্রেমের শুদ্ধ রূপ প্রকাশ করতে 'দ্বৈত' কবিতায় যেন হাওয়ায় দোল দেন, আর 'প্রকৃতি-পুরুষ'-এ গম্ভীর উচ্চারণে তাকে বিস্তারিত করেন মহাজাগতিক পটে। সংলাপের অধরা ব্যঞ্জনায় গূঢ় নাটককে আভাসিত করেন ('কোনো শিরোনামা নেই')। সামাজিক পরিবেশের বিরূপতাকে মূর্ত করেন ব্যথাহত আত্মকথনে ('আমার পরিখা', 'এক বান্ধবসভায় গিয়ে'), কখনো হয়তো কলকাতার জীবন থেকে আহৃত একটি প্রা -মায় ('এস্প্লানেডে, অবেলা') কিংবা কখনো রাজনৈতিক বিক্ষোভের বিস্তারে ('তুমি কোনো যুদ্ধ শুরু কর নি')। আর তার তালে-

তালে লাইন কখনো সমানে-সমানে সংহত চৌকো রূপ পায়, কখনো তা ভেঙে পড়ে আবেগের তীব্রতায়। কখনো গাঢ় অনুভূতি শব্দের অন্তর্লীন স্পেসকে বাঙ্‌ময় করে তোলে। লাইন-শব্দ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় কাব্যার্থের তাড়নায়। কবি ক্রমশই শাণিত করে নিতে চান একটি শব্দকে। একটি শব্দেরই শুদ্ধতা ও আধুনিকতায় সমস্ত কবিতার পৌরাণিক সাবেকি আবহাওয়ার মাত্রা পালটে যায়। প্রকাশ্য নাটকীয়তা ছেড়ে কিভাবে অন্তর্নিহিত নাটকীয়তায় লাইন, লাইনের বিন্যাস, শব্দ, এমনকি ছোট একটি ছেদচিহ্নও গঠিত হতে থাকে, সেই নির্মাণ লক্ষ্য করাও একটা পরম নান্দনিক অভিজ্ঞতা। গ্রন্থের প্রকাশ সে-সুযোগই আমাদের করে দিল।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, বিষয়ের বহুচারিতায় বা প্রকরণের নানা কৌশলে ও উপার্জনে কোনোরকম পল্লবগ্রাহিতার প্রশ্রয় এই কবির ক্ষেত্রে মিলবে। সে-রকম বৈচিত্র্যের সন্ধানী যাঁরা, তাঁরা নিশ্চয়ই হতাশ হতেই থাকবেন। প্রকরণ তাঁর কাছে জামা নয়, বিষয়ও নয় হরেকরকমবা। কাব্যস্বরূপের সন্ধানে ও আবিষ্কারে প্রকরণের ঐক্য ও পুনরাবৃত্তি তো অবশ্যম্ভাবী যে-কোনো সিরিয়স কবির ক্ষেত্রে। বিষয় নির্বাচনের ও প্রয়োগের পেছনে সব সময়ই থাকতে বাধ্য তাঁর নান্দনিক লক্ষ্যের ধ্রুব নিশ্চয়তা।

২

প্রথম খণ্ডে ১৯৪৫ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত তাঁর সব কবিতা না হলেও অধিকাংশ কবিতাই ৬টি শিরোনামে বিন্যস্ত হয়েছে। এত দীর্ঘদিন পরে এত জমে-যাওয়া কবিতাকে সাজাবার ব্যাপারে নিশ্চয়ই খুব মুশকিলে পড়তে হয়েছিল কবিকে। কালানুক্রমকে কিছুটা মানতেই হয় তাঁর। কিন্তু আধুনিক প্রাসঙ্গিকতাকে বাদ দিয়ে নিছক কাব্য-ইতিহাসের সূত্রে সাজানোতেও মনের দিক থেকে সায় পান না। ফলে, কবির অনুভূতিদীপ্ত সম্পাদনাও তাঁর তীব্র আত্মসচেতনতারই সাক্ষ্য হয়ে থাকে। কালানুক্রম ও বিষয়ানুক্রম এ-দুয়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত সমঝওতা হয়ে যায়। বারবার সময়ের আগুপিছু মেনে তিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যান—তারই মধ্যে প্রকাশ পায় তাঁর প্রকরণের বৈচিত্র্য, ঐক্য কিংবা প্রগতি।

ফলে আমাদের শুরু করতে হয় না তাঁর বিখ্যাত 'আমার মা-কে' কবিতা থেকে। তারও আগে চল্লিশের শেষের দিকের কবিতা থেকেই, সিদ্ধেশ্বর

সেনের আরম্ভ। ঈষৎ পরিমার্জনা করে, অংশবিশেষ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে তিনি তা মেলে ধরেছেন 'পাথরের চোখ' অংশে। চল্লিশের কবিতারই মেজাজে তা তীব্রভাবে পরিবেশ-সচেতন—দেশব্যাপী আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনী যুগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদিতে চিহ্নিত পরিবেশ। আর সেই সঙ্গে শানানো আবেগ। কিন্তু সেখানেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবির স্বাতন্ত্র্য ও মহৎ কবিত্বের প্রস্তুতি। পরিচ্ছন্ন ও সংহত প্রতিমা বা শব্দব্যবহারের নৈপুণ্যে। সে-যুগের বহু কবিতায় আবেগোচ্ছ্বাস ও নাটুকে-পনার যে বাড়াবাড়ি দেখা যেত, তার বদলে আত্মসচেতনতার দৃঢ়তা যেন তখনই স্পষ্ট হচ্ছে।

'কৃষ্ণচূড়ারও ডালে ধরে থোকা যৌবন নির্ভয়।' ('যৌবন')

'অগুন্তি হাতের মুঠোয় লুকোনো বজ্র
অনন্যবিক্রমে ঠিকরে পড়বে।
দধীচি, তোমার আগেই আমার অস্থি দিলাম।' ('অদ্বিতীয়')

'ভারি বুটের আড়ালে আর্তস্বর।
দগ্ধ দগ্ধ ক্ষেত, ভ্রষ্টস্বর গর্ভিণী নারীর
অশ্রু-শেষ রাত;
আহত প্রান্তর।' ('পাথরের চোখ')

'আমার মা-কে' কবিতাটিও অবশ্য এই সূত্র ধরেই এসেছে। ১৯৪৯-এ লেখা শুরু, শেষ ১৯৫০-এ। চল্লিশ দশকের ছাপ এতেও। কিন্তু একটু যেন সুর পালটে গেল। ব্যক্তিগত শোক থেকেই এই আবেগের বিস্ফার। বোনের মৃত্যু, মা-র বিলাপ—কবিকে সারা জীবন যা প্রায় তাড়িত করেছে—তা থেকেই উঠে এসেছে এই দীর্ঘকবিতাটি। কিন্তু কবি যেন অনায়াসেই চলে গেলেন ব্যক্তিগত শোকানুভূতি থেকে সামাজিক অভিজ্ঞতার বড় জগতে। অবশ্য চলে-যাওয়া ঠিক নয়, বারবার ফিরে আসা-ও, মা-র ঐ বিলাপে। ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার জগতে এই নিরন্তর যাতায়াত, দুই জগতের মধ্যে সংযোগ ও পরিপুষ্টি, এখানে তো বটেই, এর পর থেকে বরাবর সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতার একটা ধরন। এটা আবার ঠিক সমধর্মী অন্য কবির মতোও নয়।

শুরু হয় মা-র দীর্ঘায়িত হাহাকার দিয়েই—

'দমবন্ধ আমাকে
দাও
পাষাণী আমাকে   দাও
                    ফিরিয়ে
প্রাণ'

তারপর কবির বাক্‌রুদ্ধ বেদনা ও সহমর্মিতা—

'মা, তোমার কান্নার মাঝরাতে
আমি সান্ত্বনা
মা, তোমার আকণ্ঠ তৃষ্ণায়
আমি জল
মা আমার'

ধীরে ধীরে কখনো যেন প্রায় শেক্‌সপিয়রীয় নাট্য-অনুষঙ্গে ('পুঞ্জীভূত আমার সমস্ত অভিযোগ…')। কখনো ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ ঘোষণায় সেই ব্যক্তিগত বেদনা থেকে তিনি উৎরে যান সামাজিক ট্র্যাজিডির শীর্ষে। স্বরের বদল হয়, চরণ-বিন্যাসেরও বদল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনুষঙ্গে ছেয়ে যায় *কবিতা—উত্তেজনার যুক্তিতে শ্লোগান আসে, গদ্য আসে, কখনও স্তোত্র উচ্চারণের গাম্ভীর্য—কিন্তু কোথায় যেন বারবার ঐ মায়ের বেদনাটাকে* ছাড়াতে পারেন না। বোঝা যায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সামাজিক অভিজ্ঞতায় উত্তরণের ছকই তিনি শুধু অনুসরণ করছেন না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষাদ অনিবার্যভাবেই যেন লেপে দিচ্ছে সামাজিক বিক্ষোভের চতুষ্পার্শ্বকেও। এখানেই হয়তো সমকালীন কবিতার ধরন থেকেও তিনি একটু আলাদা। হয়তো চরণ বিন্যাসের ঐ সূত্রপাতেই তিনি সামাজিক-নৈর্ব্যক্তিক ঘোষণাতেও আনতে পারেন ব্যক্তিগত টান।

'ধরণীর গভীর থেকে উথলে-ওঠা ঘূর্ণিঝঞ্ঝা
হৃদয়
কালবৈশাখের   ডানায়   ঝাপটায়
হৃদয়
সমুদ্র-মন্থন-বেগে
          নক্ষত্র খসিয়ে   জাগো'

'আমার মা-কে' কবিতাটি যে সে-সময়ে সকলকে ছুঁতে পেরেছিল, সেই জনপ্রিয়তার কারণ এখানেই যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আবেগকে বিস্তৃত

করে দিতে পেরেছিলেন ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিকের এই বিন্যাস-কর্তৃত্বে। দস্তুরমতো তীব্র নাটকীয়, যে নাটকীয়তাকে পরে তিনি বর্জন করেছেন। কিন্তু তখনই শব্দের জোয়ারে সংযমের লীলাতেও তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর কবিতার পাঠকের আর বুঝতে বাকি থাকে না, মা-র বিলাপ সভ্যতার যন্ত্রণারই রূপক, এই মা হয়ে ওঠেন তাঁর সমগ্র কবিতার আর্কেটাইপ বা মৌল প্রতিমা। বণিক সভ্যতার দুঃসহ যন্ত্রণা যে অস্তিত্বে, সেই যন্ত্রণামোচনের চাবিও ঐ হাতে।

> 'আমি জানি সভ্যতার শিকড়মূলে তুমি আবার
> জলসিঞ্চন করলে, জননী…'
>
> ('এশিয়া')

৩

ব্যক্তিগত থেকে নৈর্ব্যক্তিকে যাওয়ার এই কাঠামোটাও নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অভিনব নয় আধুনিক কবিতায়। ব্যক্তিগতের নিরাকরণের যুগ পার হয়ে চল্লিশের দশকে অনেক কবির কবিতাতেই তো এই বিন্যাস দানা বেঁধেছিল। পরে এমনকি কোনো কবির ক্ষেত্রে একটি শব্দ বা একটি প্রতিমাই ধারণ করতে পেরেছিল ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিকের দ্বৈত ব্যঞ্জনা। কিন্তু, প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই যেন ঐ সংগঠনে একটু যান্ত্রিক ছক এসেই যায়। এমনকি একালের যুগন্ধর মহত্তম কবিরও যেন পরিত্রাণ নেই তা থেকে। সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় কিন্তু প্রায়শই এই ছক নিরুদ্দেশ। তাঁর প্রতিমার জোড়গুলি বিস্ময়কর ও মধ্যপদলোপী। ঘরোয়া এবং বিশ্বজোড়া, এমনকি মহাবিশ্বজোড়া অনুষঙ্গের ও অভিজ্ঞতার যাওয়া-আসা স্বাধীন, এমনকি কখনো মনে হয় আপাতভাবে স্বেচ্ছাচারী। কখনো-কখনো যে-কোনো ছকের পক্ষেই হয়তো অস্বস্তিকর।

> 'ঘুমে নয়, চেতনে-অচেতনে নয়, অস্ফুট জাগরণে নয়, জাগ্রত হিংসার দিনে আমরা এসেছি ফিরে ফের, আমি বলি। কালরাত্রির নক্ষত্র-চারী আমি, পৃথিবীর কম্পনে উচ্চকিত তুমি, আজ নেই।…কাল রাতে আমরা আমাদের ভাগ্যকে ফিরেছি খুঁজে অতলান্ত বাষ্প-সমুদ্রের বুকে দিকহীন বায়ু জাহাজের মতো, প্রমত্ত অন্ধকারে উল্কা-নক্ষত্রকণা-নীহারিকা ঝড়ে।…আর কোনো ছায়াপথ নেই, নেই আর। আর কোনো আবিষ্কার নেই, নেই আর। ওই

৮

আবিষ্কৃত পথ রয়েছে পড়ে। হায় আবিষ্কার, আবিষ্কৃত! চলো নগর, অরণ্য, জনপদ, বন্দর, লেজার, ডেস্ক, ক্লাস, কাছারি প্রতীক্ষা করে আছে আমাদের, শবরীর মতো। হায় আবিষ্কার, আবিষ্কৃত! আত্ম-আবিষ্কার আর নেই, নেই আর! চলো স্বেচ্ছা-নির্বাসনে, উপলব্ধির জগৎ ফেলে রেখে বিলুপ্তিতে, চলো যাই। চলো যাই, চলো বিলুপ্তিতে—যে যার অজ্ঞাতবাসে, চলো যাই। চলো যাই। চলো-ও-ও, যা-ই-ই-ই,—হায় আবিষ্কার, আবিষ্কৃত!'

('যে যার অজ্ঞাতবাসে')

আলাদা করে এই দৃষ্টান্ত হয়তো পুরোপুরি সঠিক হল না—এর যুক্তি-বিন্যাস হয়তো ততটা অস্বচ্ছও নয়—হয়তো কোনো কবিতার অভিনিবেশেই তা নয়। কিন্তু, তবু, কবিতার পর কবিতায় প্রতিমার ও শব্দের সমাবেশ অনেক সময়ই পাঠককে একটু অপ্রস্তুত বোধহয় করে। অবশ্য অচিরেই ঐ বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে পাঠক আবিষ্কার করেন, কতকগুলো ব্যক্তিগত পিছুটান—হয়তো সবটা তা 'ব্যক্তিগত'-ও নয়, 'পিছুটান'-ও নয়—কবির কল্পনার উৎসে মৌরসিপাট্টা করে বসে আছে। স্বধর্মের স্বতঃস্ফূর্ত ও ভাস্বর সমুদ্রযাত্রাতেই কতকগুলো নোঙর আর ওঠানো যায় নি, ওঠানো যায় না। চিনেও নিতে পারেন পাঠক সেই পিছুটানকে—কখনো অতীতের প্রতি তীব্র, প্রায় মর্বিড আকর্ষণে, কখনে পরাক্রান্ত নশ্বরতার বোধে বা মৃত্যুচেতনায় সেই কল্পনা মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রগতির রূপকল্প থেকে কবি এসবকে বাদ দিতে পারেন না, বাদ দিতে চানও না। সৌন্দর্যের মাঠ ভেঙে ঘুরে এসে ধ্বংসের ঘোর-লাগা সময়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে, কবির রক্তে যে আলোড়ন তুমুল ঢেউ তোলে, তাতে কবির চোখের সামনে ভেসে ওঠে 'নষ্ট নক্ষত্রের আলো'।

'আমার কাছে লুপ্ত হয়ে যাবার নয়
এই উদ্বেল রাত্রিলোক, নক্ষত্রছায়া,
উদ্ভিদের শিকড়ের টান
অনন্তমূলের জটায় শতপাক বাঁধনের লতা
আমার অস্তিত্বে তাদের স্মৃতি উজার করে
দিতে চাইলে'

('ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা')

গভীর নিশুতিতে একাকীত্ব 'সারা দেহের কোমল জোয়ার' শুষে নেয়, আর তারপর কেবল 'আলগা হয়ে ঝুরঝুর তলিয়ে যাওয়ার নিরুপায় আওয়াজ'।

এরই বশে তাঁর শব্দ ও প্রতিমাগুলি স্বাধিকার পায়, অভ্যস্ত ছকের বাইরে একটু আঁকাবাঁকা পথে যেতে চায়। কবিতার নানা অনুষঙ্গ ও উপকরণ গড়ে তোলে বিরোধাভাস। অবচেতনের তাড়নায় এমন কি ঈষৎ সুররিয়েলিস্টিক আমেজও তৈরি হয়।

'নক্ষত্রেরা শুধু আহত হয়ে জাগে…'

'দিনরাত্রি একই বৃত্তে ফুঁপিয়ে কাঁদে…'

'প্রথম আলোকে তোমার হিরন্ময় মুখচ্ছবি দেখি
দ্বিতীয় তরঙ্গে তার কাঁপা রেখা দূরে ভেঙে যায়
তৃতীয় আঘাতে স্মৃতিঅঙ্গার হু হু করে জ্বলে…'

'স্রোতের উপর ইতস্তত নৌকা, ইতস্তত নৌকা ··

'বছর ঘুরে গেলে স্রোতের উপর
জলের করতালি শব্দ করে…'

'স্রোতের মুখ ঘোরের টানে আচমকা বদলে গেলে
তর্‌তর্‌ তর্‌তর্‌
কোন্ পৃথিবীর দিকে সে বয়ে চলল, কে জানে।'

'শেষ প্রভাময় যাত্রার উৎসবে অন্তর্বাহিত হয়ে যেতে চেয়েছি'

'তীব্র গ্রহণ আমাকে গ্রাস করেছে
পৃথিবীর ছায়া এ-মুখ থেকে ও-মুখ পর্যন্ত'

আবার, এ যে কোনো চেতনার নৈরাজ্য নয়, তাও বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। কবির পক্ষপাতিত্বের শৃঙ্খলাতে ধরা পড়ে, এর মধ্যেই কবির নিজস্ব একটা স্থাপত্যও নিহিত আছে। যে দ্বান্দ্বিক চেতনায় 'মৃত্যু ও উন্মোচনের পৃথিবী'-তে শেষ পর্যন্ত জীবনের পূর্ণতাতেই আস্থা থাকে, কবি তো নিঃসন্দেহে তারই শরিক। কিন্তু তারই মধ্যে তাঁর কবিতায় যে অন্ধকার মাঝে মাঝে হানা দেয়, সে তো 'দিব্য অন্ধকার' নয়। 'হানা'-ই বলি কি করে? কবি যেন তার চেয়েও একটু বেশি 'নষ্ট'। এ কি

তবে কবির আত্মসমর্পণ, তাঁর স্ববিরোধ ? না কি জীবনানন্দ যেমন বলেছেন তাঁর নিজের 'লাসকাটা ঘরের কবিতা'টি প্রসঙ্গে, 'কবিতাটি subjective নয়, একটা dramatic representation মাত্র......Hamlet বা Lear বা Macbeth-এর "আত্মঘাতী ক্লান্তি"-র সঙ্গে শেক্‌সপিয়রের যে সম্পর্ক ও-কবিতার ক্লান্তির সঙ্গে লেখকের সম্পর্কটুকুও সেই রকম'—সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতাও কি তবে কখনো-কখনো বর্তমান সমাজের ও কালের বিপর্যস্ত অনুভূতিরই নাট্যচিত্র ? না কি প্রগতির সহজ-অসহজ এতাবৎ সব পরিকল্পনারই বিরুদ্ধে এ তাঁর উদ্যত সমালোচনা ? তিনি আরো পুনর্গঠন চান ? সরল সমীকরণে মানবজীবনের আলো-অঁাধারকে বর্জন নয় ? উত্তরণের বর্তমান ছককে তাঁর মনে হয় নির্মম, তাতে কল্পনার বা হৃদয়ের উদ্ধার নেই ?

এ সবই অবশ্য আভাসের কথা। তাঁর নন্দন-চেতনার সীমারেখার বাইরে উপচে-পড়া কিছু বৈকল্যের কথা। যতই সে-চেতনার কেন্দ্রে যাওয়া যায়, দ্বন্দ্বের অবিকল সৌন্দর্যপ্রতিমা উপর্যুপরি আমাদের মুগ্ধ করে।

'আমার কাছে শেষ হয়ে যায় না
প্রখর উদয় এই প্রখর অস্ত, দিনরাত্রির বদল
সমস্ত আমি নিজের মধ্যে ধরি
ঋতুর উৎসব, ঋতুর হাহাকার আমার কানে
আবহমানের মন্ত্র আনে
বলে, কালের তৃতীয়তম গতির কথা
আমি যখন পা বাড়াই তখন সামনের আর
পিছনের চলাকে সঙ্গে নিয়ে...'

('ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা')

আর তখন মনে হয়, এই দ্বান্দ্বিক বোধ ও কল্পনার অবয়ব এত নিখুঁত যে বৈপরীত্যের অতিরেক বলে যাকে মনে হয়েছিল, তারও যেন একটা সহজ ও অনিবার্য স্থান আছে এখানে। তিনি বুঝেছেন, নিরন্তর দ্বন্দ্বময়তাকে টিকিয়ে রাখাই নৈর্ব্যক্তিক সততার শর্ত। দ্বন্দ্বের লীলাকে নিজের সত্তায় অবিরল অনুভব করেন বলেই রুদ্র দৌড় বা খর নির্বাচনে তাঁর ভয়। তাই তো কবিতার লাইন তাঁর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়, আবেগের ব্যস্ততায় নয়, উচ্চারণের মন্থরতায়। সমাজ ও রাজনীতির আশা-নিরাশার স্তর থেকে ব্যক্তিগত আনন্দ-বিষাদের ভুবনে অবিরল যাওয়া-আসা, কখনো মুগ্ধতায় কখনো

বিহ্বলতায়, তাঁর সমস্ত কবিতার ওপর আলোছায়ার একটা জাল ছড়িয়ে দেয়। সেই যে বলেছেন 'রাত্রিদিন ছায়ায় আলোতে ছিনিমিনি' তা থেকেই কুড়িয়ে নিতে হয় কবিতার সূক্তি।

তবে কি বাংলা কবিতার আধুনিকতায় জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে-কে মেলাবার একটা সম্ভাবনা ঘটে গিয়েছিল সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায়, কোনো এক সময়ে? বিষ্ণু দে-র জগৎ তো তাঁরও জগৎ। হয়তো তাঁরই জগৎ। দেশ ও কালের প্রতিমায় সেই দ্বান্দ্বিক চেতনার মহাকাব্যিক বিস্তার—অনুকরণে নয়, কালোচিত সমৃদ্ধিতে, পুনর্নির্মাণে। কিন্তু সেই জগৎ থেকে, পূর্বসূরী ও সমধর্মাদের সকল রকম অনিশ্চয়তা কাটিয়ে, তিনি কি জীবনানন্দের উত্তরাধিকারও অনুভব করেন রক্তে?

৪

সিদ্ধেশ্বর সেন বারবার এ-কথাই বলতে চেয়েছেন,

'আমি ভালোবাসতে চেয়েছি, শুধু
জাফরির আলোয়।'

তাঁর অনেক কবিতাই তো ঘুরে-ফিরে প্রেমেরই কবিতা। বিচ্ছেদেরও। বোধহয় বিচ্ছেদের আগের মুহূর্তের। আর সেই মিলন-বিচ্ছেদের ওপর আমাদের বিরূপ পরিবেশের, বিভ্রান্ত ও জটিল সময়ের ছায়া। আর সময়-সচেতন কবি তো জানেন, সময়ের ভ্রান্তিমোচন ও পরিবেশের রূপান্তর যেহেতু ইতিহাসের ধারায় অনিবার্য, তাই বিচ্ছেদের ভাবনা যতটা উদ্বেল করে ততটা নিরাশ করে না। বরং যেন বিচ্ছেদটাও মিলনেরই একটি সোপান। তাই কি বিচ্ছেদের বিষণ্ণতাতেও উৎসাহের দীপ্তি একটুও ম্লান হয় না?

'প্রকৃতি-পুরুষ' সে-রকমই একটি মিলন ও বিচ্ছেদের কবিতাই। কিন্তু অসাধারণ এই দীর্ঘ কবিতার বিস্তারে প্রায় মহাকাব্যিক উচ্চাশা। কিংবা উত্থান-পতন পূর্ণাঙ্গ নাটকের। দুই নর-নারীর ভালোবাসার, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ ছড়ানো থাকে—প্রায় রক্তমাংসের অভিজ্ঞতারও ছোঁয়া—আর বারবার তাতে প্রক্ষেপ ঘটে মহাকাল ও মহাবিশ্বের। কবি কোনো-টাকেই ছাড়াতে পারেন না—এমনকি যেন ব্যক্তিগত কল্পনায় গড়ে-ওঠা যৌন প্রতীকগুলিও। 'বিচ্ছেদের আগে ভোর'-এ ওরা বালির উপর দিয়ে হেঁটে যায়, 'হেঁট হ'য়ে কুড়ায় ঝিনুক, / ঢেউয়ে ছুঁড়ে-ফেলা ভগ্নশাঁখ, / মাঝে মাঝে জীবন্ত শামুক ফেনা বিজবিজ জলে শ্লথ হ'য়ে / দূরে যায় চলে।' ঠিক

মুহূর্তকে চিরন্তন করা নয়, বর্তমানকে অতীতের পটে দেখা নয়, এমনকি দৈনন্দিনে মহিমা আরোপও শুধু নয়—কবি যেন ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিকের জটকে ছাড়তে চান না, ছাড়তে পারেন না। তাই শুধু 'সামনের আর পিছনের চলাকে সঙ্গে নিয়ে' পা বাড়ানো।

যাকে বলে প্রেমের রক্তিম সংরাগ, তা তাঁর কবিতার প্রতিমাতে থাকে। কিন্তু সে-কবিতাতে অনিবার্যভাবে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার সম্পাত ঘটে। ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাও বটে, সঙ্গে-সঙ্গে সে তো সত্তার নতুন উপলব্ধিও, যার সঙ্গে যোগ আমাদের সকলেরই—পুরাণ ও মৌল প্রতিমার সঙ্গে মিশে সেই অভিজ্ঞতা আমাদের শঙ্কা ও আশ্রয়েরই প্রতীক হয়ে উঠেছে। হয়তো কবি কখনো-কখনো সচেতনভাবেই ছুঁয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথকে, বিষ্ণু দে-কে তো বটেই, 'দ্বৈত' কবিতাটিই আমাদের সামনে, কিন্তু সেখানেও ঐ দুই ভুবনকেই আরো নানা অগ্রসর সময়প্রতিমায়, ভাষার আরো স্পর্শাতুর নিরীক্ষায় নতুন ও একালীন করে তোলেন।

'আমি চলে যাই অস্ত্যচেনায়
তুমি রয়ে যাবে চেনায়জানায় বাহিরমিলে
আমি দিই স্মৃতি ভেঙো নাকো তার নিভৃতি

তোমার আমার মিলন হবে ব'লে' ('দ্বৈত')

'আমি তার দিকে চেয়ে থাকি
নৈঃশব্দ্যফেনায় হাত রেখে
তারি দিকে অপলক নিরবধিকাল

একটি অতীত ভরা চোখে চেয়ে থাকে

আমি তার দিকে রিক্ত হয়ে ফিরে যাই
পূর্ণতা ফিরিয়ে আনব বলে
আপন সত্তার জাগরণে আমি তার সুপ্তিকে মিলাই'
('একটি অতীত')

বলা বাহুল্য, এগুলো নিছক প্রেমের কবিতা হয়ে আর থাকে না। কবি যেমন বলেন, 'মিলাই অতীত এই *দৃশ্য* বর্তমানে', তেমনি তাঁর কবিতায়

প্রেমিক বা প্রেমিকার চোখে ত্রিকাল ঘনায়। তাই তো আন্দোলনের মাঝখানে, 'গোলাগুলির আওয়াজে যখন কানপাতা দায়', তখন 'না'-মানার উচ্চারিত শপথকে তিনি নাম দেন 'একটি প্রেমের কবিতা'। স্তালিন-বিষয়ক কবিতার নাম 'অনাদি প্রেমিক'।

আস্তে আস্তে দেখি প্রেমের এই ভুবনেই চিরন্তনতার স্বপ্ন আর সমাজ-ভাবনার ইশারা কেমন সমন্বিত হয়ে যাচ্ছে। 'ভালোবাসার বিশাল আবেগ অনন্য প্রদেশ গ্রাস করে চলেছে'। মুখরতা ও নৈঃশব্দ্য মিশে যাচ্ছে, শিকড়-সন্ধান আর ডালপালার বিস্তার এই দ্বৈতেই জন্ম হচ্ছে অনন্ত সম্ভাবনার।

সুতরাং প্রেম ও সামাজিক ভাবনা এ-দুয়ের যাওয়া-আসা কখনই বন্ধ নয়। সিদ্ধেশ্বর সেন যখন 'মুদ্রিতপদ্মদেহ ভাস্বরপ্রতিমা' নারীর ধ্যানে ডুব দেন, তখনই কিন্তু অনায়াসে অবিরোধে চলে যেতে পারেন দুস্থ পরিবেশের চিত্রণে, সামাজিক-রাজনৈতিক অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ ঘোষণায়, সমাজ-পরিকল্পনার স্বপ্নে।

কলকাতা শহর, তাঁর কর্মের ও জীবনযাপনের এই শহর, অবশ্যই কবিতায় বারবার নিয়ে আসে নানা সামাজিক অনুষঙ্গ। 'নগরীর চাবি' অংশের দুটি অধ্যায়েই এই সামাজিক নাট্য আরো বেশি করে এসেছে। প্রেমের একান্ত জগৎ থেকে সামাজিক সম্মিলিত জীবনে যেমন, তেমনি অতীতের স্বপ্ন থেকে এই 'আত্মভুক নগরী'তে এসে পড়াটাও তাঁর কাছে অনায়াস।

'ম্যুজিয়মে কিছুক্ষণ কয়েকশতক হেঁটে এসে
কলকাতায় পৌঁছলাম।' ('কয়েক শতক তবু')

অবশ্য কলকাতা শুধুমাত্র পটভূমি হয়েই থাকে না। একটু আগে, যেমন খানিকটা অতিশয়োক্তি করেই বলা গিয়েছিল, সিদ্ধেশ্বর সেন যেন প্রেমেরই কবি—হয়তো এখন সেরকমই আরো বলা যায়, তিনি আমাদের এই কলকাতা শহরেরই কবি। এই শহর, তার নানা চরিত্র নিয়ে অজস্র বাক্-প্রতিমায় শুধু ছুঁয়ে-ছুঁয়েই যায় নি—একটা পরিমণ্ডলও তৈরি করেছে।

'এস্‌প্ল্যানেড উর্ধ্বশ্বাস, চারপাশে কিউয়ের
অরণ্য, ট্রাফিকে,
নিয়ন্ত্রিত চলা…
এস্‌প্ল্যানেড—সেইখানে, সেই চারপাশে, নিজেকেই
খোঁজা, খুঁজে না-পাওয়া
ও পাওয়া—এই অবেলায়।' ('এস্‌প্ল্যানেডে, অবেলা')

অবেলায় এই বর্তমানে, নাগরিক জীবনের চতুরঙ্গ ব্যূহে শুধু ঘুরে-মরা, নিজেকে খুঁজে না-পাওয়া—আত্মপরিচয় হারানোর এই বিহ্বলতা তো অস্তিত্বেরই গ্লানি—হতে পারত তা প্রেমেরও অনুষঙ্গ। আসলে প্রেম, সামাজিক ভাবনা সবেরই মধ্যে আজ অস্তিত্বের প্রশ্ন খুবই জরুরি—হাল্‌কাভাবে কিছুই আর নেওয়া যায় না।

তাই মনে হয়, কলকাতার ব্যস্ততা ভিড় কোলাহলের পর, 'অমোঘ, নির্মম, নির্মোহ সমরপতনের পর' যে নিথরতা অবারিত হয় তার প্রতীক্ষায় বসে আছেন কবি। কলকাতার রাস্তায় লোভ-হাতছানি, যেন ম্যাকবেথ নাটকের সেই প্রেতিনীরা চারপাশে এবং 'নিদ্রানিহত' আমরা দিবানিশা কী ভীষণ উচ্চাশা নিয়ে সন্ত্রস্ত ঘুরে ফিরি।

'ম্যানহোলের মধ্যে, ম্যানহোলে
কবে থেকে
পড়ে আছে নগরীর চাবি' ('নগরীর চাবি')

শহরের নাগরিক চতুরালির মধ্যে বিপন্ন কবি, যেন অনাহত সত্তা, ব্যঙ্গকৌতুক-মিথ্যাচারের মধ্যে অসহায়—তার সামাজিক ছবি পেয়ে যাই 'আমার পরিখা' কিংবা 'এক বান্ধবসভায় গিয়ে'-র মতো কবিতায়।

এস্‌প্ল্যানেডে, অবেলায়, নিজেকে খুঁজে না পেতে-পেতে শেষপর্যন্ত কিন্তু খুঁজে পাওয়ার কথাও উঠেছিল। এ অন্য কলকাতা। 'নগরীর চাবি'তে সে কলকাতা তো ভেসে উঠবেই। এ কলকাতা নিষেধে মাথা নাড়ে, আগুন জ্বলে ওঠে 'কৃষ্ণচূড়ার স্পর্ধিত অস্তিত্বে'—আন্দোলনে মিছিলে সজাগ সবাক্ সেই কলকাতা। ময়দানে জমায়েতে মাঠে কলকাতার পথের মানুষকে দেখে মনে হয় কবির, 'রূপকথার বীর যেন হাঁটে'। কোনো রাজনৈতিক সাফল্যের তুঙ্গ মুহূর্তে উদ্দীপনা আসে: 'মুক্ত কলকাতা, আজ হাটি/দশদিক মানুষেরই মুখ।'

৫

সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতার জগৎ তাই পূর্ণগর্ভ পঞ্চাঙ্ক নাটকের। তাঁর দ্বান্দ্বিক উপলব্ধির সঞ্চার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি প্রতিমায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতিটি পদক্ষেপ—সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণা, সমাজতন্ত্রে আস্থা, কোরিয়া-ভিয়েতনামের যুদ্ধে উদ্বেগ-প্রত্যাশা তাঁর অনুভূতিকে উদগ্র করে রাখে—প্রত্যক্ষভাবে কোনো কোনো কবিতায়, পরোক্ষোভাবে যেন সর্বত্র। দেশের

সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রাম, প্রতিদিনের বাঁচার সংগ্রাম তাঁর প্রতিটি শব্দনির্মাণের পেছনে সজাগ। অথচ তারই মধ্যে প্রেমের-বন্ধুত্বের-সহমর্মিতার, ক্ষোভ ও ঘৃণারও, অন্তরঙ্গ জগৎ গড়ে তোলেন। কলকাতা, সহযাত্রী-সহকর্মী, প্রেমিকা, কর্মময় মুহূর্ত, নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতা এর মধ্যে তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন কত ওঠে-নামে। আর বারবারই সহজ উত্তরণ ঘটে যায় সূর্য-নক্ষত্র-নীহারিকা-ছায়াপথ-খচিত মহাজাগতিক বিশ্বে। অতীত বিশ্বে ডুব না দিয়ে পারেন না বারবার—এত তার টান। উপনিষদের মন্ত্র, রাবীন্দ্রিক গানের কলি, নেরুদা-এলুয়ারের ছিন্ন চরণ, বিষ্ণু দে-র বহুবর্ণ ভাষা-আবিষ্কার সবই তাঁর রক্তে সঞ্চরণ করে। যৌথ-অবচেতনের ঢেউ তোলে মাতৃকা আর্কে-টাইপের ব্যবহারে, ব্যক্তিগত অনুষঙ্গে। এত উপকরণ নিয়ে গড়ে ওঠে যাঁর সংকল্পনা, বিরোধ ও সমন্বয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে প্রতিটি পদপাত, তার মধ্যে কী বিপুল নাটকীয়তা জমা হয়ে আছে, তা তো সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতার উচ্চারণে—তাঁর কবিতার ভাষা-প্রকরণে সম্পূর্ণ বিপরীত একটা অভিযান ঘটে গেছে। যত বেশি তিনি নিজেকে উন্মোচিত করেছেন, গ্রহণ করেছেন অভিজ্ঞতার নতুন নতুন উপকরণ, যত বেশি সঞ্চারিত হয়েছে দ্বান্দ্বিক উপলব্ধির বিন্যাস, চোখের সামনে প্রকাশ্য হয়েছে একটার পর একটা পট—ততই যেন তিনি বর্জন করেছেন কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা, সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে নাটকীয় সংঘাত থেকে।

'পাথরের চোখ' বা 'আমার মা-কে', এমনকি 'ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা' শিরোনামে গ্রথিত কবিতাগুলিতে—১৯৫০-৫১ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই সেগুলো লেখা—তবু নাটকীয়তা খুব তীব্র। কিন্তু সেই নাটকীয়তার ধরন, বোঝা যায়, ক্রমশই বদলে বদলে যাচ্ছে—ক্রমশই নাটকের উত্তেজনাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন শব্দের বা বাক্যের স্রোত থেকে। আবেগের জোয়ালো ওঠানামায়, ক্ষিপ্র সংকেতময় প্রাকৃতিক প্রতিমায় যে 'ছবির সমুদ্রে ঢেউ', তার ফাঁকে ফাঁকে ঘরোয়া প্রতিমা যে ঘূর্ণি সৃষ্টি করছে, তা আমরা 'আমার মা-কে' থেকেই দেখেছি। এই ঘূর্ণি যেন থামিয়ে দিতে চায় স্রোতের ক্ষিপ্র নাটকীয়তাকে। কিন্তু তখনও কবিতার স্থাপত্যে চল্লিশের ঐ নাটকীয়তাই সত্য ছিল।

১৯৫৪-৫৫-তে লেখা 'ভ্রমণ কাহিনী' বা 'জল পড়ে পাতা নড়ে' কিংবা 'নিরালোক হ'তে' কবিতাগুলিতে একে একে বোঝা যায় সেই নাটকীয়তার ধাঁচ সরে সরে যাচ্ছে। কবিতার স্থাপত্যে শুধু নয়, ভাস্কর্যেও। আগে যে

নাটকীয়তা আভাসিত হত স্বর্গমর্ত্যপ্রেমী ঝড়ঝঞ্ঝার প্রতীকে—এবার তার জায়গায় এল শিশুর ধূলিপঙ্ক সাজ কিংবা আকাশে ঘুড়ি-ওড়ানোয় ব্যস্ত শিশুর দিনযাপনের রূপক। দ্বিতীয় কবিতাটির শুরু এইভাবে :

'আহা, এই এরা ধুলার দুলাল মেলবার ডানা পায়নিকো
আকাশে ওদের ইচ্ছাময় ঘুড়িগুলি ওড়ে...'

('ভ্রমণ কাহিনী')

তারপর সেই মমতাময় বিবরণ : কিভাবে 'আকাঙ্ক্ষার সব সুতো ছেড়ে দিয়ে' ঐ ধুলার দুলালেরা ময়ূরপঙ্খী-চাঁদিয়াল উড়িয়ে 'মেঘের ভিতরে স্বপ্নচালিত, স্বপ্ন খোঁজে'—'ছুটোছুটি করে যেন শরীরী এ আশা'। তারপর রাত্রি আসে, 'আল্‌তো সুতো কেটে দেয়, মুখর ঘুড়িরা বোবা হ'য়ে নেমে পড়ে'। নিঃস্ব হয়ে, রিক্ত হয়ে তারা ফিরে আসে, ঘুমোট ঘরে ঘুমোয়, ঘুমে কাত্‌রিয়ে ওঠে। তারপর

'পাশে শোওয়া মার গায়ে কখন অজান্তে হাত রেখে,
ফের শান্ত হ'লে
আবার যাতনাহীন ঘুড়িগুলি ছেড়ে দেয় স্বপ্নের ভিতরে'

কবিতাটির নাম 'ভ্রমণ কাহিনী'।

ঐ একই সময়ে বন্যা এবং তার সর্বনাশা পরিণাম নিয়ে লেখা পর পর তিনটি কবিতার একটি 'ও-বছর খরা, এবার বান'। ১৫ লাইনের এই কবিতায় পুরুষানুক্রমিক দুঃখের বঞ্চনার ইতিহাসকে যেন গেঁথে দেওয়া হল।

কিন্তু তবু এর মধ্যেও যেটুকু নাটকীয়তার রেশ এখনও আছে, কবি তাকেও ছাড়িয়ে নিলেন। 'নিচু কথাকে গম গম করে ছড়িয়ে দিতে' চেয়েছিলেন তিনি। এবার সেই বাক্যকে, চরণকে বিশ্লিষ্ট করে অন্তর্নিহিত প্রকাশ্য নাটকীয়তার সামান্য সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দিতে চাইলেন। ফলে নাটকীয়তা বর্জনের এই সাধনা কবির এই বিশেষ ভাষা-সাধনার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেল।

অবশ্য এটা, মরমীয়ারা যে-কথা বলতেন, সেই উল্টো-সাধনা। বিষয়-অভিজ্ঞতার মধ্যে নাটকীয় সংঘাত যত উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছে, কবি ততই তাকে নিমীলিত করে দিতে চাইছেন উচ্চারণের অ-নাটকীয় ঔদাস্যে। আসক্তি যতই প্রবল হচ্ছে, ততই প্রকরণে বৈরাগ্যের ভান। ভাষার এই দ্বিচারিতাই যেন কবির দ্বান্দ্বিক উপলব্ধির সবচেয়ে আধুনিক ও অনিবার্য অবয়ব।

কবির সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও চিনি এই সাধনার সৌন্দর্য—'অবিন্যস্ত আলুগা

স্বর এতো অপরূপ— / কানে বাজে'। সমস্ত নাটুকে অলঙ্কার ছাড়িয়ে নেন তিনি ভাষা থেকে—বলেন, 'আমার সমস্ত ভূষা বাহুল্য, বর্জিত...'।

কিন্তু ভাষার উপর, শব্দের উপর যাঁর এত নির্ভরতা দাঁড়িয়ে যায়, তাঁকে তো খুঁজতেই হয় তার প্রবল, শক্তিশালী কোনো উৎস। গ্রাম ও শহরের কর্মময় জীবন ও প্রকৃতির কথা উল্লেখ করে বিষ্ণু দে বলেছিলেন, 'এখানেই খুঁজে পাবে ভাষা'। সিদ্ধেশ্বর সেনও ব্যাপ্ত জীবন থেকেই ভাষাকে খুঁজে নেন। হয়তো মানুষের কথনের কোনো পরিশীলিত রূপই তিনি ছেঁকে নেন তাঁর ছন্দলিপিতে। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধান সেখানেও যেন থামে না। তিনি শব্দকে, উচ্চারণকে কথনের ঐ আলগা চালের মধ্যেই আরো অমোঘ, আরো শুদ্ধ, আরো পূর্ণগর্ভ করে নিতে চান। শুধু জীবনের ভাসা-ভাসা চলন থেকে নয়, চলনের উৎসমূলে যাচাই করার কথা বলেন তাদের।

'আমার চুপিসাড় কথাকে আমি
নামিয়ে দিই
বিনষ্টির তাপ থেকে আগলে রেখে
নামিয়ে দিই
ততদূর, যেখানে মাটির আঢুল গর্ভাধানে
বীজমন্ত্র স্তব হচ্ছে।' ('অবিচ্ছিন্নতায়')

কবিতায় সমাজ-সচেতনতার দায় মানে নাটুকে অতিকথন নয়। শিল্পের শুদ্ধতাও সমাজের দিক থেকে পিঠ ফিরিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ নয়। সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা থেকেই বরং ক্রমশ উত্তর পেয়ে যাই: সমাজমনস্ক কবিতার আধুনিকতার কী রূপ, কবিতার শুদ্ধতার কী অর্থ।

দুটি কবিতা
সিদ্ধেশ্বর সেন

উদ্ধার

১:

আমাকে থাকতে দাও, দাঁড়িয়ে
তোমার রাস্তার ধারে—

বাস-স্টপে
মোড়ে

জন্ম-জন্মান্তর, যেন
ওই ত্বরিত দেখায়, কেটে যায়

মাটিতেও পড়েনি
পা

হরণ করেছে কোন্
দুরন্ত ফুটবোর্ডে

কেন তুমি দেখাতে যে গিয়েছিলে-
রূপা

আমার তিনকাল গেছে
পড়ে আছি স্থবির পাথায়

ক্ষয়ে গেছে
চক্ষু

ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে পারিনিকো, অন্ধ,
তার ঘা'য়

রক্তে লেগে
ভেজে
আমার-ই শিরাতন্তু

তুমিই যে ফেলে গেছ
কাছে—দূরে—দূরে

তোমার কিঙ্কিণী, সিঁথি
কঙ্কণ, কেয়ূর

আমি কেন স্মৃতিভারে
পড়ে আছি
এমন সংসারে

আমাকেই সাক্ষী মেনে
চলে গেছে
বন্দিনীর ওই রথচূড়

২.

তুমিই কি ফিরে এলে
আবার ও-রক্তপথ
ধ'রে

পাথর-কুচিতে লাগল
দ্বিধা

ম্যাকাডামে, জেব্রার সাবধানের ওপারে
গণ্ডী—
পেরোলে কেনবা

তোমার অলক্তকে
লেখা

রক্ত, বুঝি লেগে আছে

তোমারও আঁচলে

কতবার দিতে হ'বে তোমাকেই
চিত্রার্পিত স্থির

সৌন্দর্যপ্রতিমা এই দুঃখের প্রতিমা
কেন শুদ্ধির-ই
অগ্নিপরীক্ষা

৩.

এত রক্ত, রণ, তুমি
এনে দিলে—
আমাকেই দিলে

তোমার মুখের বিভা

প্রান্তর, পাহাড়, নদী, জনপদ, বনস্থলী
ভেঙে
সাগরেও সেতু গড়ে, অভিযানে, ভাসায়-ও সপ্তডিঙা

তোমার সুষমা
স্বর্ণরেণুতে কেন অলোকপরাগে-ও কেন
নিষ্পাপ ওড়ে

ও-কার ধনুতে তাই টেনে দিলে
আজন্মের ছিলা

তোমার ঝন্‌ঝনা
বাজে
আমার-ও এ শস্ত্রের প্রহরে

একদিন এলে, হলমুখে

আর-একদিন ফিরে গেলে

মাটি ফুঁড়ে
প্রাণের যৌতুকে

আরও একদিন তবে তুমিই কী, উর্বীপৃথিবীর
নবোঢ়া মায়ার অঙ্কুর

আমি কেন স্মৃতিভারে
আর আছি পড়ে,
ধ্বজাদণ্ড ফেলেছি কাঁকরে

আমাকেও নিয়ে যাও, নন্দিনী, তোমার হাত ধ'রে
যতদূরে, ছুটে যায়—তোমার জয়ের
ওই রথচূড় ॥

হিমগিরি ফেলে

তপস্বিনী যে ঝোরায় নেমেছ
নীচে
পাথরে ধুয়েছ পা।

পাথরও গিয়েছে
ভিজে

কত কল্পের শ্যাওলা
জমেছে
ও-পাদপীঠে

এখনই কী পেলে
ভরা যৌবনে মুক্তি

রহস্যশীতলতা

বাড়ায় মন্ত্রগুপ্তি

মানবীস্বরূপা
দেবীরই তপস্যা

মদনভস্মে অকালবসন্তে
যদিবা ফিরলে
আনতা, সংকুচিতা

তবু একদিন তোমারই তো
হাত ধ'রে
অর্ধনারীশ্বর
ও-বরাঙ্গে

কৈলাসে ফিরে
শুনেছিলে বৈখরী

ধ্রুবতারা ওই—
দেখালে চন্দ্রচূড়-ই
......
মুখোস-পরা তালবেতাল
নৃত্যে

হঠাৎ জাগে বর-সভার স্ফূর্তি

ডম্বরুপাণি তোমারই যে
ইঙ্গিতে
পঞ্চ-সন্ধি নাট্যে ফোটায় বৃত্তি

এই কী,—তবে প্রাণ-উচাটন
চিত্তে
মহাকাল-ই, দেয় দুরন্ত তাল

ভুবনজোড়া জাগেও কৌতুকী

... .

তাই বুঝি ফের ব্রীড়াও ভাঙে
হাস্যে—
পরমেশের দিকে দৃক্‌পাত উমার

ত্রিকাল জানে, কেন সংবিতই
লাস্যে,

ত্রিলোক কেন টলেও যায়,
এ ভাষ্যে—

তোমার কোলে চাইলে দিব্যকুমার ॥

সিদ্ধার্থ রায় শঙ্খ ঘোষের কবিতা ঃ 'খনির ভিতরে দাবদাহ'

শঙ্খ ঘোষের ব্যক্তিত্ব ও কবিত্বের প্রধান গুণগুলি কি তাঁর কবিতা বোঝার সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়? বা, যে যার মতো করে পারে ধরে নেয় তাঁর কবিতা? তাতে পরস্পর বৈপরীত্য এমনই প্রকট হয়ে ওঠে যে একটি কোনো মূল সূত্রে সেই সব বোঝাকে গেঁথে নেওয়া যায় না? সময়ের ভেতরে এতই প্রোথিত তিনি, শহরের দৈনন্দিন এমনই উঠে আসে তাঁর কবিতায়, নাগরিক বাচন তাঁর কবিতার পংক্তি হয়ে ওঠে এমনই অনায়াসে যে কারও কারও মনে হতে পারে সময়েই তিনি বাঁধা পড়ে যাচ্ছেন? আবার শব্দের এমন সমবায় তিনি গড়ে তোলেন যাতে কারও মনে হতে পারে সময় ধরাই পড়ছে না তাঁর কবিতায়, বারে বারে বিমূর্ততায় লীন হয়ে যাচ্ছে? রবীন্দ্রনাথের উক্তি বা এমন-কি ধ্যান ধারণা তাঁর কবিতায় এত বেশি খুঁজে পাওয়া যায় যে, কারও কারও ভয় হতে পারে, রবীন্দ্রনাথেই বুঝি আটকা পড়ে গেলেন তিনি? ছন্দ, শব্দ ও কাব্যবচনের নির্মাণে তাঁর চরম দক্ষতা এমন অনায়াস যে কেউ মুগ্ধ হয়ে যেতে পারে শুধু সেই কারুকর্মেই? আত্ম-সচেতন কাব্যচিন্তায় তাঁর এমনই মগ্নতা যে, কেউ কেউ তাঁর নানা প্রবন্ধে উত্থাপিত কাব্যতত্ত্বেই বুঝে নিতে চান তাঁর কবিতাকে?

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় তিনি যে জনপ্রিয়তম কবিদেরই একজন তা নিয়ে সন্দেহেরও তো কোনো সুযোগ নেই। সেই জনপ্রিয়তা কি তৈরি হয়েছে তাঁর কাব্যের সামগ্রিক অনুধাবন থেকে? নাকি, তাতে সমর্থন যুগিয়েছে তাঁর অজাতশত্রু ব্যক্তিত্বের নম্রতা, সকলের প্রতিই বন্ধুত্বের আন্তরিকতা?

হয়তো এর কিছু কারণ নিহিত আছে তাঁর কবি-জীবনের বাইরের ইতিহাসে। চল্লিশের দশকের রাজনীতিচেতন কবিতার আশ্রয়ে তাঁর

কাব্যরচনার শুরু। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি বাংলা কবিতায় আধুনিকতার যে-চর্চা 'কৃত্তিবাস' কাগজের কবিদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তার সঙ্গেও তাঁর আত্মীয়তা। অলোকরঞ্জনের রহস্যময়তার সঙ্গেও তাঁর হয়তো কিছুদিন সহযাত্রা। পরবর্তী 'হাংরি' নামধেয় কবিরাও তাঁকে খুব বেশি দূরবর্তী ভাবতেন না। আবার সাম্প্রতিক 'এ্যান্টি পোয়েট্রি'-র কবিরাও তাঁকে অনেক সময়েই হয়তো ভেবে নেন সমর্থক।

খুব সামনে থেকে দেখলে এতে একটু বিহ্বল হয়ে পড়ারই কথা। কিন্তু কবিতার ভিতর থেকে দেখলে তাঁর কবিত্বের ইতিহাসের পথরেখাটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চল্লিশের দশকের রাজনীতি চেতনা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই নিরক্ত হয়ে আসতে আসতে এখন প্রায় বাঁধা বুলিতে পরিণত হয়েছে। শঙ্খ ঘোষ কিন্তু তাঁর নিজের ভাষায় এখনও রাজনীতি-চেতন কবিতাও লিখে যাচ্ছেন। বাংলা কবিতার সহজিয়া রহস্যময়তার সেই খর্ব চেষ্টাও ব্যঞ্জনাহীন, প্রাণহীন গতানুগতিকতায় শেষ হয়ে গেছে। শঙ্খ ঘোষ এখনও তাঁর নিজের ভাষাতে ব্যক্তির সেই রহস্যমেদুর অস্তিত্বের কথা বলে যাচ্ছেন। 'কৃত্তিবাসী' আধুনিকতার নাটুকেপনা এখন ভঙ্গিমাত্রেই অবশিষ্ট আছে। শঙ্খ ঘোষ তাঁর নিজের ভাষাতেই এখনও পরাক্রান্ত আধুনিক। 'হাংরি' কবিতা এখন লুপ্ত চিহ্নমাত্র। প্রত্যক্ষবাচনে শঙ্খ ঘোষ এখনও বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো আধুনিকতার পক্ষেই ভয়ের বিষয়, যেন তাঁকে ছুঁলেই অনাধুনিক হয়ে যেতে হয়। শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথে নিষ্ণাত।

এ সম্ভব হয়েছে নিজের কবিত্বের নিশ্চিত উৎসটিকে নিঃসন্দিগ্ধ আবিষ্কারের সততায়। ও সেই সততায় কবিতার টেকনিকের নিষ্কম্প ধ্যানে। তাঁর 'কবিতা-সংগ্রহ' সুযোগ করে দিল ১৯৪৯ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত রচিত তাঁর কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে এই কবিত্বকে বুঝে নেয়ার।

দুই

বিশুদ্ধতার আত্মলেহনে শঙ্খ ঘোষ বিশ্বাস করেন না বলেই তাঁকে লিখতে হয়—সম্প্রতি,

> বুক থেকে হাতে খুলে নিয়েছি পাঁজর
> আর তালে তালে নাচে সেই হাত

আত্মস্খলনের এই তীব্র অনুভূতি তিনিই বোধ করেন, যিনি শব্দের 'রহস্যে'

নয়, শব্দের অভ্যস্ত সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে তার ভেতরে 'সত্যের প্রবাহ' আনতে চান এবং আনতে পারেন। কিন্তু সত্যটা কোন ধরনের ?

এই ধরনটাকে বুঝতে গেলে শঙ্খ ঘোষের কবিত্বের সংকট ও সেই সংকট উত্তরণে শঙ্খ ঘোষের প্রয়াসকে জানতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সভ্যতার সংকট, ফাসিস্ট দর্শনের নৃশংস প্রকাশ, আনবিক যুদ্ধের বলি সেই দুটি শহরের কয়েকলক্ষ মানুষ, যেমন একদিকে মানুষকেই করে তুলেছিল অনিশ্চিত, অন্যদিকে তেমনি সোভিয়েতের মহান বিজয়, চীনদেশের বিপ্লবে নতুন দিগন্তের আভাস, 'অসম্ভব তৃতীয় ভুবনের' 'জেগে ওঠা' মানুষকেই করে তুলছিল মহাপরাক্রান্ত। আবার তার মাত্র এক দশকেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্ঘ ভেঙে যায়। একজন সংবেদনশীল মানুষের প্রধান সংকট হয়ে দাঁড়ায় অবলম্বনের। কোন তত্ত্ববিশ্বে পাওয়া যাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার আশ্রয়, নিজের সৃষ্টির সামাজিক ভূমিকাকে অর্থময় করে তোলবার সূত্র—এসব প্রশ্নই তখন প্রধান হয়ে ওঠে।

এবং এইসব সংকটমোচনের প্রধান পথ হয়ে দাঁড়ায়, অনেক ক্ষেত্রে, এক ধরণের ট্র্যাজিক ব্যক্তিমানসের প্রক্ষেপণ। কিন্তু শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে, তাঁর সংকটমোচনে কবিসত্তার সামাজিক দায় এত প্রবল ছিল, তাঁকে একদিকে যেমন আশ্রয় করতে হয় সত্যকথনের ভূমিকা, সত্যের বিমূর্ততাতেও, তেমনি অন্য একটি আশ্রয় খুঁজে নিতে হয় রবীন্দ্রনাথে। তখন একদিকে সত্যের প্রকাশ, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, যেন তাঁর কাছে হয়ে থাকে আর্কিটাইপেরই মতো, যেখানে রবীন্দ্রনাথই তাঁর সত্যের প্রত্ননির্মাণ। আর সত্যও বহুলাংশেই রাবীন্দ্রিক পৌরাণিকতায় বিধৃত।

তাই নিজের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র ভূমিকাতে তাঁকে লিখতে হয়, 'সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার। কিন্তু জীবিকাবশে শ্রেণীবশে এতই আমরা মিথ্যায় জড়িয়ে আছি দিনরাত যে একটি কবিতার জন্যেও কখনো-কখনো অনেকদিন থেমে থাকতে হয়'। তিনি প্রায় অসহায়ভাবেই 'তরুণদের' নির্মমভাবে রবীন্দ্রনাথকে 'অগ্রাহ্য' করবার ঘটনায় শঙ্কিত হয়ে লেখেন, 'কিন্তু আমারও হাত যদি ছেড়ে দেন রবীন্দ্রনাথ তবে সেই মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে যাবে আমার সমস্ত অস্তিত্বের বোধ' (নিঃশব্দের তর্জনী, পৃ ৯৫)।

রবীন্দ্রনাথ, আর সত্যপ্রকাশের দায়িত্ব তাঁকে কোন অস্তিত্বের বোধে নিয়ে যায় ? নিয়ে যায় এক গভীর ঋণবোধে—যেখানে যা কিছু ব্যত্যয় ঘটে যায়, কবি তার জন্যেই নিজেকে অপরাধী ভেবে নেন। যেখানে যা কিছু দায়

নেয়ার থাকে কবি তাকেই মেনে নেন। এই ঋণবোধ আর ঋণশোধের দায় কবিকে তাঁর নতুন অস্তিজ্ঞানে স্থির রাখে, যে অস্তি ছাড়া কবিতা লেখা নিরর্থক।

আমার মেয়েকে ওরা চুরি করে নিয়েছিল
জবার পোশাকে !
কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে ? (বাস্তু পৃ ৭৫)

এমন বৃষ্টির দিন মনে পড়ে
আমার জন্মের কোনো শেষ নেই। (বৃষ্টি, পৃ ৮০)

এই মুখ ঠিক মুখ নয়
মিথ্যে লেগে আছে
এখন তোমার কাছে যাওয়া
ভালো না আমার। (মিথ্যে, পৃ ১১৫)

আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে ? (বাবরের প্রার্থনা, পৃ ২২৮)

তোমাদের মুখে আমি হাত রেখে বলি নি কখনো
'এখন কেমন আছো ? বেঁচে আছো নিজের নিয়মে ?'
শীতের পাহাড়তলি আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল
তোমাদের মুখে আজ ছুঁতে চাই সমস্ত মানুষ।
(পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ, পৃ ২৬২)

বেশি উদ্ধৃতি দেয়ার কারণ একটিই—ঋণবোধ আর ঋণশোধের অস্তিজ্ঞানকে কোনো অনড় চেহারায় ভাবছি না, সেটা বোঝানো। কিন্তু সব সৎ কবিকেই ত তাঁর নিজের অস্তিবোধ খুঁজে নিতেই হয়। তাঁর কবিতাগুলির একটিতেই শঙ্খ ঘোষ সেই অস্তিবোধের নাম দিয়েছেন—'অস্তিময়ী চেতন।' তাঁর এই 'অস্তিময়ী চেতন'-এর ভিতরেই কখনও তিনি শ্লেষে তীব্র, কখনও বা আক্রমণে হিংস্র, কখনও প্রত্যক্ষতায় পাথর।

তিন

'যাকে বাইরে থেকে দেখি প্রহার বা ক্রোধ, তারই অন্য পিঠে আছে গহন কান্না। এ ছাড়া কোনো বড় শিল্প নেই। কিন্তু জীবনের মধ্যে কোথায় আছে তার অস্তিত্ব?…চলতি জীবনের আত্মার সঙ্গে এই গোপন সম্পর্কই

কবিতা, এই খানেই ধরা দিতে থাকে ভয়াবহ এক পরিণামহীন মীমাংসাহীন সত্য।'

(নিঃশব্দের তর্জনী, পৃ ১০)

এমন একটি সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন শঙ্খ ঘোষ ১৯৭৪-এ, কবিতায় শব্দ-ব্যবহারের আধুনিক নন্দনের জিজ্ঞাসায়।

কিন্তু তাঁর কবিতায় এ আবিষ্কার ঘটে গেছে বহু-বহুকাল আগে, বোধহয় তাঁর কবিতালেখার শুরুর সময়েই। শঙ্খ ঘোষের 'যমুনাবতী' কবিতাটি লেখা হয়েছিল কুচবিহারে এক ভুখ মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত কয়েকটি মেয়েকে মনে রেখে। সেদিন যখন তাঁর বয়স বোধহয় সবে বিশে পৌঁছেছে তিনি এই নিষ্ঠুর বাস্তবকে কবিতার নির্বিশেষে মেলাতে লিখেছিলেন,

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।

আবার, সত্তরের দশকে ময়দানের এক মিছিলের ভিতরেই গুপ্তহত্যায় নিহত 'তিনির বিষয়ে···'

ময়দান ভারি হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুট মার্চ
তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ওকি কৃষ্ণচূড়া?
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্নশির, তিমির।

আবার ১৯৮০-তে যখন কবির বয়স পঞ্চাশের কাছে, সেই গহন কান্নাই তিনি খোঁজেন, হয়ত কিছু ব্যক্তিগত শোককেও কবি যুক্ত করতে চান সমষ্টিতেই,

আজও কেন নিয়ে এলে ভ্রষ্ট এই অন্ধমৃত্যু জপ
দুরূহ যুবারা যাকে ভালোবেসে প্রসিদ্ধ করেছে
ধমনী শিথিল জলে ভরে দেয় ঘূর্ণমান তারা
হাজার স্লিপিং পিল মাথার ভিতরে আত্মহারা।

সমসময়ের সংকটের দায় আর ভিতরে কবিতা নির্মাণের প্রক্রিয়া শঙ্খ ঘোষ এমনই একাকার। নিজেকে এত বেশি লগ্ন করে রাখেন প্রত্যহের প্রতিঘাতে, যে সেই অভিজ্ঞতা-নিঃসৃত বোধ তাঁর অনুভবের জমিতে একবার শিকড় চারিয়ে দিলে প্রতীকে, প্রতিমায়, উপমায়, চিত্রকল্পে, পুরাণে, মীথে, তাকে তাঁর কবিতায় মূর্তি দিয়ে যেতেই হয় তাঁকে। এই সময়ের ভিতরেই নিহিত

আছে যে-কবিতা, তাকেই ত তিনি মূর্তি দেন। এই মূর্তিদানের প্রক্রিয়ায় ঘটে যায় নানা ঘটনা। তার কিছু লক্ষ্য করা যেতে পারে 'জলস্রোত' কবিতাগুচ্ছ ও 'আরুণি-উদ্দালক' কবিতাটি থেকে।

৬৮ সালে উত্তরবাংলার বন্যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লগ্ন হয়ে যায় আরুণির আবহে। প্রাত্যহিক আর পুরাণের উপলব্ধি ও বোধ দুই প্রান্ত রচনা করে। একদিকে তাই উচ্ছ্রিত তথ্যের মতো পাই,
'হাঁটুজল বুকজল গলাজল / শান্তিজল হয়ে ওঠে নীলজল পীতজল গলাজল।' 'তোমাদের হাতেগড়া একাল-ওকাল-জোড়া ব্রিজগুলি ঝলকে মিলায়।' 'পাশের বাড়ির বৌ শেষরাতে অন্ধকার ডানা ঝাপটায় খোলা স্রোতে।' 'যে-কোনো যমুনা থেকে পায়ে বাজে বিপরীত চৌকাঠে জড়ানো তিন বোন।' 'তেমনই দূরের জলে দিয়ে আসি মৃত গাভী গলিত শূকর আর তোমাকেও মা / মুখে যে আগুন রাখি তত পুণ্য রটে না আমার।' অন্যদিকে, এইসব চরণের প্রায় গা-ঘেঁষে ছড়িয়ে থাকে খুব সচেতন নির্দিষ্টতায় পুরাণ ও রবীন্দ্রনাথকে মেলানো প্রতিমা ও অনুষঙ্গের ভুবন—'যে বলেছে আজও এই প্লাবনে সংক্ষোভে মেঘে আমার সমস্ত জ্ঞান চাই / সে বড়ো প্রত্যক্ষ চোখে আপন শরীর নিয়ে বাঁধ দিতে গিয়েছিল জলে', 'কেবল অম্বার কণ্ঠ এখনো নদীর জলে 'সুমন, সুমন' / আর আমি বলে উঠি এসো এসো উঠে এসো উদ্দালক হও', 'শুধু মূর্খ অভিমানে বসে থেকে জলস্রোতে কখন যে আরুণি সুমন / তৃষ্ণাদেবতার মূলে একাকার হয়ে যায় তা আমার বোধেও ছিল না।' জলস্রোত আর মানবসম্পর্কের একটা পৌরাণিক-রাবীন্দ্রিক ইতিবৃত্ত উত্তর-বাংলার বন্যার সঙ্গে অনায়াসে মিলে গিয়ে তথ্য ও বোধ, প্রত্যক্ষ ও ইতিহাস, আবেগ ও নিরাসক্তি, সংহতি আর উন্মূল অস্তিত্বের টানাপোড়েন এমন এক টেনশন তৈরি করে, যখন 'পাশের বাড়ির বৌ শেষরাতে অন্ধকার ডানা ঝাপটায় খোলা স্রোতে'-র মতো উচ্ছ্রিত ভীষণ বাস্তবতা 'এদিকে সকাল আসে প্রায় পরিহাসময় কাঞ্চনজঙ্ঘার যোগ্য রুপালী ঠমকে'-র কাব্যময়তাকে অস্পষ্ট বিমূর্ততায় সরে যেতে দেয় না। আবার, 'তোমার রাত্রির গায়ে তার চেয়ে বেশি ফুলঝুরি'-র কাব্যময়তা 'মহিষের ধ্বস্ত দেহে যত লক্ষ রক্তবিন্দু জ্বালায় শকুন'-এর পাশে তীব্র আয়রণি হয়ে ওঠে।

সময়ের এই দায়বহনে কবি বোধহয় নিজেকেও ছাড়িয়ে গেছেন। কখনও-কখনও সংকট এত তীব্র আর কঠিন যে তাঁর কবিতাতেও সঞ্চারিত হয়ে যায় অব্যবহিতের সেই চাপ, অলঙ্কারহীন নিষ্ঠুর চাপ। 'এমার্জেন্সি'-জারির আগে

থেকেই তাঁর কবিতা সেই চাপে অন্য চেহারা নিয়েছিল, 'এমার্জেন্সি'-র ভিতরে হয়ে ওঠে আরো প্রত্যক্ষ, আরো স্পষ্ট। যে-ছন্দ আর উপমায় তাঁর দক্ষতা প্রায় প্রবাদতুল্য তাকেই তিনি ব্যবহার করেন বিপরীত রীতিতে। যা ছিল একসময় টেকনিকের নতুন আবিষ্কার, ব্যবহারে তাই হয়ে ওঠে আবিষ্কারের নতুন ব্যবহার। তাঁকে লিখতে হয়, 'কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই'—এর প্রায় সরকারি সমস্ত প্রচারযন্ত্রের ব্যবহৃত দেশব্যাপী এই অনুশাসনকে ব্যঙ্গ করে, 'কঠোর বিকল্পের পরিশ্রম নেই' (পৃ ২৫০)। তাঁকেই লিখতে হয়, 'এটা নতুন ধরন / যত নপুংসকের / নিরবীর্যীকরণ!' (পৃ ১৯২)।

পেটিবুর্জোয়া মূল্যবোধকে ঠাট্টা করে এমন চরণ, হেঁটে দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায় / আরেকটা কলকাতায় সাহেব আরেকটা কলকাতায় / সাহেব বাবুমশায়' (পৃ ১৯৭)।

রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ডের অধিকার পুলিস আদায় করে নিলে, ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ যখন,

কিছু না থেকে কিছু ছেলে
তোমারই সেন্ট্রাল জেলে,
তোমারই কার্জন পার্কে!

'হাসপাতালে বলির বাজনা'—রবীন্দ্রনাথ এসে মিশে যান সমকালীনে,

আমার ভাই ছিল ফেরার, আমার মাসিমা
যখন মারা যান।
তালে তালে জাগছিল হিক্কা,
শেষ সময়ের নিঃশ্বাস।
হয়ত এবার শুনতে পাবো : রঞ্জন রঞ্জন।

মৃত্যুর সম্মুখীনে সত্যের এই আবিষ্কারের পরই থাকে সত্যের রাষ্ট্রীয় অপলাপ,

নিচু গলায় কথা বলার অপরাধে তার
যাবজ্জীবন
কারাদণ্ড হল

এই নতুন বিধানের নতুন 'মার্চিং সং'

নেই কোনো সন্ত্রাস
ত্রাস যদি কেউ বলিস তাদের
ঘটবে সর্বনাশ।

সমকালীনকে আমাদের অনেক কবিই তাঁদের কবিতার বিকাশভূমি হিসেবে বেছে নেন। কিন্তু এমন ঘটনা বোধহয় বিরল যেখানে একজন মাত্র কবি বাস্তবের সামনে নিজের কবিতাকে এতটাই সক্রিয় করে তুলতে পারেন। কিছু এমন ঘটেছিল চল্লিশের দশকের শুরুতে। কিন্তু এখানে তো শঙ্খ ঘোষের সক্রিয়তা ছিল একক, নিঃসঙ্গ একক। কবিত্বের এমন দুঃসাহসী সামাজিক ব্যবহারের এমন ব্যক্তিগত নিদর্শন আমাদের শিল্পের ইতিহাসে বিরল।

চার

এমন মুখর যার প্রতিবাদ ও সামাজিক ভাবে সক্রিয় যাঁর ভাষা তিনি, এর বিপরীতে, খুঁজতে চান এমনই ভঙ্গি যে-কোনো উচ্চারণই যেখানে অবান্তর। তেমন অনেক উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও রূপক ছড়িয়ে রেখেছেন তিনি, যা কখনও কখনও প্রবাদ-তুল্য হয়ে গেছে। আত্মসচেতন কবিকে তাঁর স্বকীয় নন্দনতত্ত্বে আশ্রয় নিতে হয়। সেই তত্ত্বটিকে বুঝে নিয়েই পাঠকও তাঁর কাছে পৌঁছুতে চায়? শঙ্খ ঘোষের কবিতার সঙ্গে 'নিঃশব্দ' ও 'শুদ্ধতা' এমনই ভাবেই মিশে আছে।

তাঁর কবিতার ভিতরেও এই অন্তর্লীন নিঃশব্দকে আভাসিত করতে চেয়েছেন তিনি। এই আভাস অনেকটাই 'শরীরের দেহহীন উত্থানে জাগরণের মতোই, 'শূন্যতার ভেতরের ঢেউ'এর মতো স্পর্শ-গ্রাহ্যতার সীমার বাইরে' যেন টেনে নিয়ে যেতে চায়। বা ভুল ভাবে হলেও পাঠকের এমন বোঝার প্রশ্রয় কবিতার ভেতরই নিহিত থাকে।

যেমন, এই বিখ্যাত কবিতাটিই—'শূন্যের ভেতরে ঢেউ', কবিতার ভাষার আড়ালে তত্ত্বের যুক্তি-বিন্যাস—'নারীর শরীর', 'শরীর দেহহীন' 'দীর্ঘ চরাচর' -এর 'দীর্ঘতর যবনিকা' এবং শেষে 'শূন্যতার ভেতর এত ঢেউ'।

বাক্যের নাটকীয়তা এখানে খুব নিহিত থাকেনা, বেরিয়ে আসে বিরোধাভাসে। এই অলঙ্কারের যে-সহজ টান আছে তাতে কবিতাটি থেকে খসে যায় তার অন্তর্লীন হিংসা।

শঙ্খ ঘোষের যে কবিতাগুলি সাধারণত 'নিঃশব্দের' কবিতা বলে পরিচিত তার ভিতর থাকে এই প্রবল আক্রমণের তীব্রতা। বাইরের ঘটনায়, সে সামাজিকই হোক আর ব্যক্তিগতই হোক, এই প্রবল, প্রায়-হিংস্র সক্রিয়তাই তাঁর কবিতাগুলোকে ভাগ হয়ে যেতে দেয় না। যে ঋণ বোধ ও ঋণ শোধের অস্তিময়ী চেতন তাঁর কাব্যের প্রধান ধারক তা যে এমন হিংস্র হয়ে উঠতে

পারে তাতেই থাকে তাঁর কবিতার স্পর্শগ্রাহ্যতার কারণ।

হয়তো এখানেই আছে শিল্পসৃষ্টির সেই যাদু—ব্যক্তিগত স্বভাবে এমন বিনীত নম্র নীরব মানুষটি কবিতায় হয়ে উঠতে চান, বাইরের সমস্ত ক্ষতি পূরণে, তীব্র, আক্রমণমুখী, পরাক্রান্ত।

'আদিম লতাগুল্মময়' কাব্য গ্রন্থের সেই তীব্র আসঙ্গের কবিতাগুলিতে সেই হিংস্রতাই ছড়িয়ে—সেখানে নারী 'আনন্দ শুষে খায়', সেখানে দ্বারী কোনো কোষাগারের দ্বার খুলে দিলে 'আমার দুপাশে দুই নারী'। 'মাথা ঘাড় বুক পিঠ উরু, একে একে খোলা হয়', 'বিষ বিষ বিষ'-এর ওপরে সমস্ত অগুরু ঢেলে দেওয়া হয়, 'স্মৃতিতে জমে অন্য ব্যভিচার', 'শুধু সুখে ধমনী ছিল না', 'চারিদিকে বিপরীত জল'। উদাহরণের পক্ষে এই কটিই যথেষ্ট।

একি শুধু কাকতালীয় যে 'আদিম লতাগুল্মময়'-এর কবিতাগুলিকে কবি 'পাথর', 'দল', 'চিতা', এই তিনভাগে ভাগ করে যতই সাজান তার পুরোটা জুড়েই আক্রমণ আর আক্রান্তের এক ভূমিকার অদল বদল ঘটে যেতে থাকে মৃত্যু, হত্যা, রক্ত, এমন সব অনুষঙ্গে। 'শব্দ যেন শব্দের সন্ন্যাসিনী' এমন উক্তির নাটকীয়তা অনেক সময় ভুলিয়ে দেয় তার অব্যবহিত আগের উচ্চারণ, 'শব্দ দিয়ে আগুন দিয়ে' ঘেরা এই অসীম সংসারকে।

পাঁচ

এই অংশে, অনেক আলোচনায় পাওয়া এ ধরনের কবিতার ভুল পাঠ বিষয়ে একটু সচেতন ভাবেই জোর দেওয়া হল। এই ভুলের বীজ হয়তো কবির নিজেরই বোনা। আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনা, কেন তাঁর কবিতা-গ্রন্থে কবি কবিতাগুলোকে সময়ে চিহ্নিত না করে, গুচ্ছে-গুচ্ছে ভাগ করে দেন এবং সে-গুচ্ছেরও দেন আলাদা আলাদা নাম। তিনি কি চান তাঁর কবিতার অর্থের সংকেত দিতে, এবং কবিতা থেকে সময়ের অতি-নির্দিষ্টতা মুছে দিতে? কারণ শঙ্খ ঘোষ আধুনিক কবিতার প্রধানতম কর্মী যেমন, তেমনি প্রায় একমাত্র তাত্ত্বিক।

কবিতা আর তত্ত্বের অবস্থান পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীতে। নিশ্ছিদ্র যুক্তি-শৃঙ্খলার ধাপ বেয়ে-বেয়ে আমরা তত্ত্বের কাছে পৌঁছই। কবিতার কাছে পৌঁছনোর কোনো ধাপ থাকে না—হয় সেখানে একবারে পৌঁছে যাই অথবা কোনো দিনই পৌঁছই না। একবার পৌঁছে গেলে তত্ত্ব হয় তো আমাদের সেখানে থেকে-যেতে সাহায্য করে মাত্র!

একজন সক্রিয় কবি যখন সমকালীন কবিতার তাত্ত্বিকভিত্তি রচনাকে নিজের একটি প্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে বেছে নেন, তখন সেটা তাঁর কবিতা রচনা প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ হিসেবেই বিচার্য, তাঁর স্বরচিত কবিতার ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।

'নিঃশব্দের তর্জনী'-তে শঙ্খ ঘোষ শব্দের শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও কবিতার বাচন নিয়ে এমন কিছু বলেন যার তাত্ত্বিকতায় তাঁর তৎকালীন অভিজ্ঞতাকে একটু সাজিয়ে নেয়ার চেষ্টা আছে। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা তৎকালীন বাংলা কবিতার সামগ্রিকতা থেকে আসে নি, এসেছিল প্রধানত যাঁদের 'কৃত্তিবাস' কবিগোষ্ঠী বলা হয় তাঁদের কাব্য-সংসর্গ থেকে। তাই তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্বের পক্ষেও প্রযোজ্য যোগ্যতর এমন কোনো উদাহরণ সেখানে সংগৃহীত হয় না, যা তাঁর আলোচ্য কবিগোষ্ঠীর বহির্ভূত কোনো কবির রচনা।

এর পরই 'ছন্দের বারান্দা'-য় শঙ্খ ঘোষ তাঁর অভিজ্ঞতার অব্যবহিত চাপ থেকে সরে দাঁড়িয়ে বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক আধুনিকতাকেও যাচাই করে নিতে চান। এটা যতটা না ছন্দের আলোচনা, তার চাইতে অনেক বেশি কবিতার আলোচনা।

এই ভাবে, শঙ্খ ঘোষ তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রবল ধারাবাহিকতায় তত্ত্বেও নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে যেতে চান, ছাড়িয়ে যান। অথচ যাঁদের নিয়ে তাঁর সেই 'নিঃশব্দের' তত্ত্ব তৈরি হয়েছিল—তাঁরা কিন্তু আঁকড়ে থাকেন সেই তত্ত্বটিকেই। কারণ, তাঁদের সৃষ্টিশীলতা আটকে আছে গত প্রায় দুই দশক ধরে ঐ একই জায়গায়। আর এখন তাঁদের কবিত্বের সেই বন্ধ্যা-চর্চায় শঙ্খ ঘোষের মতো এমন প্রবল সৃষ্টিমান কবির এককালীন সমর্থন খানিকটা আশ্রয়ের মতো ঠেকে।

কবিতার শুদ্ধতা-বিশুদ্ধতার তত্ত্বের ইতিহাসও তো একটা আছে।

আসলে বিশুদ্ধ কবিতার নামে যে হাওয়া তোলা হচ্ছে শঙ্খ ঘোষের মতো শক্তিশালী কবির সৃষ্টিকে সামনে রেখে, সে হাওয়া তো এই শতাব্দীর গোড়ায় ফরাসী একাডেমির সামনে হেনরি ব্রেম-র বিখ্যাত 'বিশুদ্ধ কবিতা' বক্তৃতা-মালার প্রতিধ্বনি মাত্র। 'কানট্রিস অব দ্য মাইণ্ড'-এর দ্বিতীয় সিরিজে, ১৯৩১, সালেই মিডলটন মারে 'বিশুদ্ধ কবিতা'-র ওপর লিখতে গিয়ে বলেই দিচ্ছেন, যে, এসব শুদ্ধাচারের দর্শনে আর বিচলিত হয় না মন।

শব্দের রহস্য-কথাটার ভেতর যেমন ব্রেম কথিত সেই মিস্টিক অনুভূতির ইঙ্গিত আছে, তেমনি শব্দের বহুদ্যুতি কথাটার ভেতর আছে মালার্মের বিশুদ্ধ

কবিতার দর্শন, যে-মতে 'pure poetry is simply verbal music'.

শঙ্খ ঘোষের কবিতাকে এইভাবে একদিকে মিস্টিক ও অন্যদিকে নিছক শব্দের দ্যুতি দিয়ে বোঝার ও ব্যাখ্যার ভিতরে আছে তাঁর সময়চেতনার গুরুত্বকে অপ্রধান করে দেয়ার এক ছোট ইচ্ছা; তাঁর কবিতার অতুলন পৌরুষকে শুধু কারুশিল্পের প্রসাধন বলে দেখার এক স্বার্থপর বাসনা।

সমাজের বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় কারো-কারো কাছে ইতিহাসই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ তাঁদের কাছে নিজের মুখের চাইতে 'জরুরি' মুখ আর কোথাও নেই। ইতিহাসের স্রোতের প্রবলতা এই আত্মপ্রতিবিম্ব দেখার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এঁদের কথা মনে রেখেই মার্ক্স বলেছিলেন,

> If one chose to be an ox, one could of
> course turn one's back on the agonies of
> mankind and look after one's own skin.

একটু কষ্টকল্পনায় মার্কস-এর এই ষাঁড়কেই যেন 'মহিষ' বলে ভেবে নিতে ইচ্ছে করে, শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতার স্তবকে, আর সেই স্তবকটিই বলতে ইচ্ছে করে তাঁর এই সব 'শুদ্ধতাবাদী', 'পবিত্রতাবাদী', উৎসাহী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে

> লোকে লোকে অন্ধকার পথে নীল পিচ্ছিল মিছিল
> শরীরে ওজন বড়ো, শরীরে ওজন
> চলা যায় না থামা যায় না থামানো যায় না
> শরীরে ওজন

কিন্তু শঙ্খ ঘোষ ও তাঁর কবিতার মতোই ছিপছিপে, হালকা। তাঁকে গাছতলাতে থামিয়ে নেয়ার জন্যে এত টানাটানি কেন?

ছয়

এই আলোচনায় শঙ্খ ঘোষ-এর কবিতাকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় দেখা হল না—দেখা হল মাত্র তাকে একটা 'সমগ্র' ধরে নিয়ে। বা দেখার চেষ্টা মাত্র হল।

বলা ত হল না অনেক কিছু, প্রায় কোনো কিছু। তাঁর কবিতায়, প্রথম দিকে, ৬৯-৭০-এর আগে পর্যন্ত বাংলা দেশের এক মীথ-নির্মিত আকার তাঁর কল্পনাভূমি হয়ে ছিল। তার পর থেকেই কলকাতার দৈনন্দিন বাস্তবতা দখল নিল—সেই কল্পনাভূমিকে সরিয়ে দিয়ে। এই সময়টি আমাদের

সমকালীন রাজনীতিতে রক্তাক্ত আত্মহননের পর্ব। শঙ্খ ঘোষ 'আদিম লতা গুল্ম ময়'-এর একটি কবিতায় প্রায় ঘোষণাই করে দিয়েছিলেন তাঁর ভাষা-বদলের কর্মসূচি

> আমার চলা ছিল আমার নিজস্ব, তাই কেউ কখনো
> নেয় নি আমায় কিনে

এই সব মিলিয়ে তাঁর যে এমন গভীর ও প্রচুর সৃষ্টিময়তা সে-সব কিছুই বলা হল না। তাঁর আঙ্গিক প্রসিদ্ধি নিয়েও কিছু বলা হল না—কোথায় তা কলমে হয়ে ওঠে অব্যর্থ, কোথায়-বা একটু যেন বাধাও ঠেকে মাঝে-মাঝে।

কিন্তু এই বলার চাইতে এত না বলা যে বড় ঠেকছে তা তো তাঁর মৌলিক রূপভাবনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা প্রায় অশেষ বলেই। তার চাইতে এ-সব আলোচনা বাদ দিয়ে আমরা প্রতীক্ষায় থাকি সেই সব কবিতার যা তিনি লিখবেন আরো, আর, সেই লেখার প্রস্তুতিতেই এখন ম্যানিফেস্টো জানিয়েছেন,

> মাটি খুব শান্ত, শুধু খনির ভিতরে দাবদাহ
> হঠাৎ বিস্ফারে তার ফেটে গেছে পাথরের চাড়।
> নিঃসাড় ধুলায় দাও উড়িয়ে সে লেখার অক্ষর
> যে লেখায় জর নেই, লাভা নেই, অভিশাপও নেই।

ক-টি কবিতা

শঙ্খ ঘোষ

দাবি

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে মনে রেখো পিছনে কী ছিল।
দায়িত্ব সুন্দর, প্রতি মুহূর্ত বাড়িয়ে দেয় হাত
সম্পর্কে আনন্দে দূর্বাজলে।
হয়তো সে নিজেই দেয় না, নিজে তুলে নিতে হয় তাকে
আধেক গড়নে কোনো অভিমানী প্রতিমাবলয়।
অবসাদে ভরে আসে চোখ?
হোক, তবু তুমি তো সমস্তখানি নও
ততটা নিজস্ব পাবে যতখানি ছেড়ে দিতে পারো।
কেউ এসে বসেছিল, কেউ উঠে চলে গেল, কেউ কথা বলেনি কখনো
মন তার চিহ্ন রাখে সবই।
কুঠুরিতে কুঠুরিতে আর্ত স্বরে ভয় পেয়ে উড়ে যায় কবতুরদল
গলায় শিকলচিহ্ন লাল হয়ে জ্বলে থাকে দুরূহ রশ্মির চাপা টানে
মন তার চিহ্ন রেখে দেয়।
তবু তুমি ভুলে যেতে পারো না কখনো এরই দায়ে
জীবন তোমার কাছে দাবি করেছিল যেন প্রত্যেক মুহূর্তে তুমি কবি।

পাংশু

আমাকে ফিরিয়ে দেয় শ্মশান বা রাজদ্বার থেকে
যেন আর যোগ্য নই পথের পাথেয় বইবার
পতনে উন্মুখ কোনো পিছল পাথর ঝুঁকে আছি
অভিভূত করে আছি ছড়ানো কাজল পরিবেশ
স্তূপ দিয়ে, খণ্ড দিয়ে, শারীরিকতার জাল দিয়ে।
কোন্ কাজে লাগি তবে? কার কাজে? কতটুকু কাজে?
খসে যাওয়া পাংশু ইট দুয়ারবিহীন মন্দিরের
কাঁটাগুল্মে পড়ে থাকে, আর যারা দুর্ভিক্ষে ব্যসনে
রৌদ্রাহত নির্মমতা তুলে নেয় মুখের কিনারে
তাদের সবার থেকে দূরে এই ছায়াতলগত
গহ্বরের কানে এসে প্রহর প্রহর প্রশ্ন করে
ঠোঁটের আঘাত নিয়ে পুরোনো খাঁচার পোষা তোতা:
মূঢ়, আজ সবাইকে ধ্বংসের অতলে নিতে চাও
তুমি কি অন্যের কথা ভাবো, না কি ভাবো না কখনো?

শহর

অলিন্দের থেকে ভাঙা থামের উপরে বসে দেখি
চত্বরের মাঝখানে স্থগিত শবের চারপাশে
শরিকেরা অন্ধকারে অসাড় মুদিত হয়ে আসে
ধ্বনিগুলি জেলে নিয়ে তৃতীয় চোখের দিব্যতায়।
পরতে পরতে খোলে ভারহীন মরীচিকা, আর
গলায় লাফিয়ে ওঠা অলীক ধ্বনির পিণ্ডগুলি
মাটি থেকে উঠে গিয়ে শূন্যে ঝুলে থাকে বোধহারা
যুবতী লুটিয়ে থাকে বাঁকানো সিঁড়িতে মুখে ফেনা—
ইড়াপিঙ্গলার স্রোতে নিবিড় সুড়ঙ্গরেখা বেয়ে
শহর সুষুম্না ভরে নিয়েছে হাশিশ মারুয়ানা।

ছন্দ

কোথায় সে পদক্ষেপ ? হারিয়ে গিয়েছে পর্বগুলি—
পাথরের গায়ে কোনো জলের ঝাপট্ নেই আর
নিশ্বাস রেখেছে বেঁধে নিশুতরাতের প্লাটফর্ম
প্রান্তর পেরিয়ে ক্ষীণ খোলের কাকুতি শুধু ভাসে
আর সব চুপ যেন আরো কিছু ঘটবার নেই
আর সবই মেনে নেওয়া আর সবই সহাবস্থান
খোলা আকাশের নিচে অপেক্ষামলিন রাত জেগে
মন্থর ভোরের হাতে আড়ষ্ট চোখের শান্তি পাওয়া।
এই শান্তি ভালো ? তবে অযাচিত শান্তি বলে কাকে ?
ঘূর্ণি হাওয়া ভুলে গেলে পথের ধ্বনির বৃত্তগুলি
মাঝে মাঝে দেখি শুধু পর্বগুলি দীর্ঘ করে নিয়ে
সে যখন শোয় তার ছন্দও পয়ারে শুয়ে থাকে

তার পদক্ষেপ আর সঙ্গী করে ডাকে না আমাকে !

মুহূর্ত

মেঘ ঘোরাফেরা করে চেতনার অন্ধিসন্ধি ঘিরে
মাথা থেকে পা অবধি ধীর হয়ে আছে ঘনজল
হাঁসের ডানার ভারে চোখের পাতায় কোমলাভা
দিকচক্রবাল থেকে ধূসরতা কেন্দ্রে নিয়ে আসে
শিরায় ফোয়ারা হয়ে উঠে আসে বায়বীয় স্রোত
ঈথারে মিলিয়ে দেয় বেঁচে থাকবার আলো, ছটা—
তারপরে নুয়ে পড়ে মাটির উপরে, নুয়ে পড়ে
চিকণ ঘাসের মূলে বহমান চারণের পায়ে
এবং সমস্ত সত্তা ধারণে ধরিত্রী হয়ে ওঠে
—কবিতা মুহূর্ত চায়, শিকড়ে সর্পিল স্বাধীনতা।

রাজ্যেশ্বর মিত্র পল্লীগীতির স্মৃতি

মানুষ হয়েছি পূর্ববঙ্গের পূর্বতম প্রান্তে আসাম-সংলগ্ন স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। সে আগরতলা আর আজকের আগরতলায় অনেক তফাৎ। সেটা ছিল নেহাৎ ছোটখাটো গ্রাম্যশহর; রেলস্টেশন আখাউড়া থেকে যার দূরত্ব ছিল পাঁচ মাইল কাঁচা কর্দমাক্ত রাস্তা। তিনদিকেই ছিল রমণীয় পাহাড়; দক্ষিণ দিক থেকে পর্বতশ্রেণী চলে গিয়েছিল চট্টগ্রামের দিকে; উত্তর এবং পূর্ব প্রান্তের অরণ্যবেষ্টিত পর্বত মিশেছিল আসামের বৃহত্তর পর্বতশ্রেণীর মধ্যে। উত্তর দিকের পাহাড়ের নাম কুঞ্জবন। সত্যিই নামটি ছিল যথার্থ; রাজন্যবর্গের প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা রমণীয় অরণ্য-উদ্যান, যার মধ্যবর্তী প্রাসাদে অতিথি হতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ক্ষুদ্র নেটিভ স্টেটের অধিপতি ত্রিপুরার রাজারা অত্যাচারী ছিলেন না, বরঞ্চ ছিলেন অতিমাত্রায় অতিথিপরায়ণ এবং উদার। হিন্দুমুসলমানের বিরোধ এখানে কখনও ঘটে নি, যদিচ রাজ্য ছিল উগ্রভাবে হিন্দুভাবাপন্ন। ইস্কুলের পারিতোষিক উৎসবে আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের সদ্যরচিত গান, আবার মৌলভী সাহেবের শেখানো হফিজের গজলও গাওয়া হয়েছে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে। আজও সে সব সুর মনে আছে। সংস্কৃত এবং ফার্সি উভয় সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় এই ক্ষুদ্র শহরের ক্ষুদ্র হাই-ইস্কুলটিতে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হবার সময় আমরা স্কুলের ছাত্র। শোনা যেত নেতৃস্থানীয় কিছু বিপ্লবী ত্রিপুরার অরণ্যঅঞ্চলে আত্মরক্ষা করছেন। সেটা যে রাজ্যশাসকদের অজানা ছিল তাও না, কিন্তু তাঁদের ধরিয়ে দেওয়া হয় নি, বরঞ্চ প্রকারান্তরে তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া হত যাতে চট্টগ্রামের এত কাছাকাছি এলাকায় থেকে তাঁরা বিপদ ডেকে না আনেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব তখন এমনি যে তাঁরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে প্রয়োজনবোধে রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে আসতেও কুণ্ঠিত হতেন না। তার অবশ্য প্রয়োজন হয় নি; কারণ বিপ্লবীরা নিজেরাই বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে আগরতলা ছিল তখন নিশ্চিন্ত শান্তির এলাকা। এই এলাকাতে তখন একের পর এক আসতেন সুফী, সন্ত, বাউল, দরবেশ, সমগ্র ত্রিপুরা জেলার বহু পল্লীগায়ন সম্প্রদায়, যাঁদের মধ্যে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরাই ছিলেন প্রধান। আগরতলার অল্প দূরে অবস্থিত দুদিকের দুটি শহরে তখন প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিক্ষোভ; কুমিল্লার জনজীবন পুলিশের অত্যাচারে জর্জরিত, একই অবস্থা মহকুমা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার। নিরুপায় হয়ে অনেককেই তখন আশ্রয় নিতে হত আমাদের আগরতলার অঞ্চলে। আসামের সুনামগঞ্জ অঞ্চল থেকে পদ্মা তীরবর্তী চাঁদপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদ বোধ করি তৎকালে পূর্ববঙ্গের পল্লীসঙ্গীত চর্চার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ স্থান বলে গণ্য হতে পারত। এই সমগ্র অঞ্চলের বহু অসামান্য লোকসঙ্গীত শিল্পী বসবাস করে গেছেন আগরতলায়; তাঁদের কণ্ঠে শুনেছি নানান ধরনের গান, যা সংগ্রহ করে রাখলে আজ বোধ হয় লোকসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য হওয়া যেত। তাঁরা সাধারণত বের হতেন সকালে; ভিখারী সম্বোধনে তাঁরা অসন্তুষ্ট হতেন, কারণ তাঁরা ভিক্ষার্থী হলেও সেটা অভাবের জন্য নয়; সেটা ছিল তাঁদের সম্প্রদায়ের নির্দেশ। ওইভাবে ভীক্ষালব্ধ অন্নে তাঁরা নিজেদের প্রতিপালন করতেন—সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিটাই ছিল তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এঁদের অনেকে আমাদের পরিচিত ছিলেন। চাল, ডাল, তরিতরকারি আমরা তাঁদের ঝুড়িতে ফেলতুম হাসিমুখে; মা, মাসীরা সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, ঠাকুর, তোমার অমুক গানটা একবার শুনিয়ে যাও। অমনি ঝঙ্কার উঠত দোতারায়। এঁরা দোতারা বাজিয়েই গাইতেন। সেই দোতারার ঝঙ্কার এই বার্ধক্যেও আমার মনটাকে উদাস করে দেয়। তখনকার দোতারা আজকালকার তরফদার সরোদের আকৃতি বিশিষ্ট দোতারা নয়, নিতান্তই মামুলি গ্রাম্য দোতারা; তাতেই তাঁরা মাঝে মাঝে যেসব সুর তুলতেন তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যেত না। একজন মোহন্ত আসতেন; কালো কষ্টি পাথরের মত মসৃণ শরীর ছিল তাঁর, মাথায় চূড়ো করে চুল বাঁধা, অপূর্ব মুখশ্রী; তাঁর প্রিয় ছিল বারমাসি গান। বিষয়টা ছিল, রাধা শ্যামের জন্য প্রতীক্ষা করে চলেছেন বারো মাস ধরে এবং প্রত্যেকটি মাসে বা ঋতুতে তিনি প্রিয়সঙ্গমের স্মৃতিচারণ করতে করতে আক্ষেপ জানাচ্ছেন। অন্য ধরনের বারমাসিও তিনি গাইতেন, যাতে মা যশোদার বাৎসল্য এবং সখাসখিদের শ্যামবিচ্ছেদের ব্যথা ফুটে উঠত। এইসব গানের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া ভাব ছিল,—যা প্রত্যেকটি বয়স্ক শ্রোতাকে অভিভূত করে ফেলত। কোনো

গৃহবধূ তাঁর প্রবাসী স্বামীর কথা ভেবে চোখের জল ফেলতেন ; কোনো মাতা তাঁর প্রবাসী পুত্রের কথা স্মরণ করে আকুল হয়ে উঠতেন। আমরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও কেমন উদাস হয়ে যেতুম। পল্লীসঙ্গীতের এই মানবিকতা বোধ হয় আর কোনও সঙ্গীতে এমন মর্মস্পর্শী ভাবে ফুটে ওঠেনি। পূজোর সময় কেউ কেউ আগমনী শোনাত ; সে আগমনী কবিওলাদের সফিস্টিকেটেড আগমনী নয়, নিতান্তই পল্লীকবির গাথা, যাতে বার বার 'উমা'র উল্লেখ থাকত। সেই গান শুনতে শুনতেও আমাদের অনুরূপ অনুভূতি হত। কিন্তু, শাক্তভাবাপন্ন গান যথার্থ পল্লীসঙ্গীতে আমি কমই শুনেছি। বোধ করি রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহ নিয়ে যে ইউনিভার্সাল আবেদন সৃষ্টি করা যেত, শাক্তসঙ্গীতে সেটা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া পল্লীর গায়ন সমাজে বৈষ্ণব ভাবধারাটিই অধিকতর প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। যাঁরা নিজেদের বাউল বলতেন তাঁরা আসলে ছিলেন বৈষ্ণব, কেননা তাঁরা গৌরভজন এবং রাধাকৃষ্ণের গানেই তাঁদের যা কিছু তত্ত্ব তা প্রকাশ করতেন। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু গুহ্য সাধন প্রণালী প্রচলিত ছিল বলে শুনেছি, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তার অনুসন্ধান আমরা করি নি। মুসলমান ফকির কেউ কেউ আসতেন, কিন্তু তাঁদের বোধ হয় কোনও সম্প্রদায় নিজস্ব বলে দাবি করতে পারতেন না, কারণ তাঁদের ধর্মটা ছিল মানবধর্ম। তাঁরাও বৈষ্ণব সঙ্গীত গাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতেন না। একজন মুসলমান গাইতেন 'মনদুখে মরিরে মুঘল সখা ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে।' পরে এই গানটি শচীনদেব বর্মন রেকর্ড করেছিলেন প্রায় যথার্থভাবে সেই সেন্টিমেন্টকে বজায় রেখে।

কোনো ভাটিয়ালী গায়ককে শহরে এসে গান শোনাতে আমি দেখি নি, তাঁরা বোধ হয় নদীর অঞ্চলেই থাকতেন। তখনও বিস্তীর্ণ ভৈরব নদীর ওপরে মনোরম সেতুটি তৈরি হয় নি। উক্ত অঞ্চলে ভালো ভালো ভাটিয়ালী গায়ক ছিলেন। গিরীন চক্রবর্তী মহাশয় বার বার এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করে বহু গান সংগ্রহ করেছিলেন। একটা জিনিস লক্ষ করেছি—পদ্মা বা তার শাখানদীগুলি যেখানে অপেক্ষাকৃত শীর্ণ এবং জল যেখানে প্রশান্ত সেখানেই গায়কেরা এই শ্রেণীর গান গাইতে ভালোবাসতেন। অর্থাৎ, একটা অবসরের ভাব না এলে তাঁদের মধ্যে গান গাইবার ইচ্ছা তেমন ভাবে জাগ্রত হত না। পদ্মার বিশালতম পথে অর্থাৎ চাঁদপুর থেকে গোয়ালান্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ নদীবক্ষে আমি অগুন্তিবার যাতায়াত করেছি, কিন্তু কখনও কোনো নৌকো

থেকে ভাটিয়ালীর আওয়াজ আমার কানে আসে নি। অথচ, ভৈরববাজার, তিতাস অথবা ব্রাহ্মণবেড়িয়ার জনবহুল এলাকায় বহুপ্রকার নদীর গান শোনা যেত। চাঁদপুরের তীরবর্তী অঞ্চলে মেঘনা যেখানে অপেক্ষাকৃত শান্ত সেখানেও এসব গান শোনা যেত, কিন্তু বহিরাঞ্চলে যেখানে মেঘনা প্রশস্ত এবং উত্তাল হয়ে উঠেছে সেখানে গানের আসর আদৌ হত কিনা সন্দেহ।

বাউল জাতীয় কতিপয় গায়কের মুখে বিভিন্ন প্রকার গান শুনে আমার ধারণা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু গানও যেন ওই সুদূর অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল। এর কারণ, যে ভাষা এসব গানে ছিল তা অন্তত ত্রিপুরা জেলার ভাষা নয়। দু-একজনের ভণিতা দেখে তাঁদের পরিচয় জানতে চেয়েছি কিন্তু অনুসন্ধান করেও খোঁজ পাই নি। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, একটা গানের প্রথম লাইন ছিল—আগে দেহের স্বভাব ছাড়। ষড়রিপুর জংলা কেটে ভাবের নতুন দেহ ধর॥ এই ছত্রে 'কেটে' শব্দটি গায়কের কণ্ঠে অক্ষুণ্ণ ছিল। ওই অঞ্চলের লোকেরা অব্যর্থভাবেই একে 'কাইটা' বা 'কাইট্টা' বলবেন; কিন্তু গায়ক তা বলতেন না। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল এই রকম কিছু কিছু গান তাঁদের সংগ্রহের মধ্যে আছে, যেগুলির ভাষা তাঁদের অঞ্চলের নয়, কিন্তু সেগুলির উচ্চারণ যেমন ছিল তেমনই রাখা হয়েছে। এটি দেহতত্ত্বের গান। এই ধরনের গান এদিকেও প্রচলিত আছে। আসলে এই ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় নানান জনপদে নানান মেলায় ঘোরাঘুরি করতেন। বোলপুর থেকে আসাম পর্যন্ত সর্বত্র তাঁদের গতিবিধি ছিল। এইভাবে এক সম্প্রদায়ের গান আর এক সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এটি বাউল জাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যেত, অপরদের মধ্যে এরকম ব্যাপকভাবে ভ্রমণের প্রথা ছিল না এবং তাঁরা আঞ্চলিক গান ছাড়া অন্য গান গাইতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

আগরতলায় বসে বসে নানা পল্লী-গায়কের মুখে বিভিন্ন রকমের গান শুনতুম বটে কিন্তু তাতে কেবলমাত্র এক-একটা নমুনার পরিচয় পাওয়া যেত, সামগ্রিকভাবে এ-অঞ্চলের পল্লীসঙ্গীত সম্বন্ধে ধারণা করবার অবকাশ ঘটে নি। সেটা ঘটল পরবর্তীকালে, যখন কলেজের পাঠ শেষ করেছি। আমাদের একটি গৃহভৃত্য ছিল; তাদের বাড়ি ছিল কুমিল্লা থেকে বেশ খানিকটা দূরে পট্টিকেরা (ওরা বলত 'ফাটিকেরা') অঞ্চলে। তার গলা ভালো ছিল, পুকুরে বাসন মাজতে মাজতে অনেক রকম গান গাইত আপন মনে। তার ভাষাটা ছিল কিন্তু নোয়াখালি অঞ্চলের। একদিন তার

গানের খাতা থেকে নানা রকমের গান সে দেখাল সলজ্জভাবে আমার অনুরোধে। তার কাছে শুনলুম, এরকম বিভিন্ন লোকের মুখে গান শুনলে এসব অঞ্চলের গানের পারম্পর্যটা আমি অনুধাবন করতে পারব না; সে সম্বন্ধে ধারণা করতে হলে আমাকে যেতে হবে বেশ খানিকটা দূরে পল্লী এলাকায় এবং অন্তত একটা রাত কাটাতে হবে। অতঃপর আমরা কুমিল্লাকে কেন্দ্র করে এইসব আসর সম্বন্ধে ধারণা করবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সত্যিই এইভাবে অনুসন্ধান না করলে আমি একটি যথার্থ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতুম।

এ-অঞ্চলে গ্রামীণ গীতির আসর বসবার সময় ছিল শীতকাল। ধানকাটা হয়ে গেলে কঠিন শুষ্ক জমির ওপর এইসব আসর বসত. গঞ্জিকা চলত অবিরাম। শীত অসহ্য হলে কোনো ফাঁকা চালা ঘরে বা দাওয়াতে আসর বসতেও দেখা গেছে। আসরের প্রথম উদ্বোধন হত গুরুভজন দিয়ে। এসব গানের প্রথমে থাকত 'গুরু আমায় পারে নিয়া চল', 'গুরু আমায় কৃপা কর' —এই ধরনের 'গুরু' শব্দটির উল্লেখযুক্ত পদ। গানের সঙ্গে বাজত একতারা (সাধারণত লাউ-এর একতারাই ব্যবহৃত হত); খমক, খঞ্জনি—এসবও থাকত; দোতারার কথা তো আগেই বলেছি। গুরুভজন হয়ে গেলে আরম্ভ হত দেহতত্ত্বের গান। দেহের অসারতা নিয়ে রচিত হত এইসব গান। এই ধরনের গানে কিন্তু অনেক সময় রূপক প্রয়োগ করা হত। যেমন—'জোর করি নামিও জলে কুম্ভীরে নি ধরেও' ইত্যাদি; এখানে কুম্ভীর হচ্ছে রিপুসমূহের প্রতীক এবং জলে যিনি নামছেন তিনি একজন সাধক। দেহতত্ত্ব বা গুরুভজন আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও প্রচলিত; একসময় বটতলা থেকে প্রচুর বই বেরিয়েছে এইসব গানের সঙ্কলন হিসাবে, এখনও সেগুলি গ্রামাঞ্চলের হাট-বাজারে বিক্রি হতে দেখা যায়। দেহতত্ত্বের গান শেষ হয়ে গেলে এক ধরনের গান করা হত যাকে বলা হত মনশিক্ষা। এই জাতীয় গানে মনকে সম্বোধন করে নানারূপ আক্ষেপ জানানো হত, নিজেদের জীবনের অকৃতকার্যতা বা অসার্থকতা নিয়ে। রামপ্রসাদের 'মন তুমি কৃষিকাজ জান না' গানটিকে মনশিক্ষার পর্যায়ে ফেলা যায়। মন কখনই নিজের বশবর্তী নয়, সে মানুষকে নানা ভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়, কুপ্রবৃত্তির পথে পরিচালিত করে, তাই তাকে গানের মাধ্যমে শাসন করা হয়; অর্থাৎ এক কথায় নিজের বিবেকের কাছে আবেদনই হচ্ছে এসব গানের মুখ্য বিষয়বস্তু। এই পর্যায়ের গান শেষ হতে হতেই শীতের রাত

বেশ ঘনিয়ে আসত। এর মধ্যে অনেকেই আহারাদি সেরে নিতেন, গনগনে আগুনের আঁচ করা হত। তারপরে গভীর রাতে আরম্ভ হত রাধাকৃষ্ণের মিলন গাথা। এইটিই ছিল এই অঞ্চলের আসরের মধুরতম অংশ। পদগুলি অতি সুললিত, বহুপদের মধ্যে পরিচিত মহাজন পদাবলীর অনুকৃতি ছিল, কিন্তু ওরিজিনাল রচনাই বেশি থাকত। এঁদের গলা যে সাধা এমন কথা বলা যাবে না, ঠিক পর্দায় গলা যে লাগত তাও নয়, এমন কি উৎসাহের আতিশয্যে যখন অতি উচ্চগ্রামে গলাকে চড়ানো হত তখন কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ বিদ্রোহ যে না করত এমন নয়, তথাপি এমন একটা 'মেলডি' আন্তরিকভাবে তাঁদের কণ্ঠে ফুটে উঠত যা শ্রোতাকে অভিভূত করে ফেলত।

সব শেষে বিরহের গান দিয়ে আসর শেষ হত, এদিকে রাতও শেষ হয়ে ঘন কুয়াশার মাঝখানে আলোর আভাসকে ডেকে আনত। একবার একটি গান শুনেছিলুম শেষরাতে, সে গানটি আমায় এখনও মনে আছে; নমুনা স্বরূপ এটি এখানে উদ্ধৃত করছি:

ফিরিয়া অবলার পানে চাইও
দুখিনীর বন্ধু ধীরে ধীরে তুমি যাইও।
বন্ধু,—ত্রাস না হইয়া যাও
নূপুর না দিও পাও
কুসুম ফুলের কাঁটায় করব মানা,
নূপুরের শব্দ শুনি
জাগিয়া ননদিনী
চোর বলিয়া দিবে থানা।
দারুন দেওয়ারির ডাকে
ওই পাড়াপড়োশি জাগে
গায়ে শোভে নেতপিত ধারা
ধৈর্য না ধারতে পারি
দুঃখেতে দুখিনী মরি
তুমি কেমনে যাইলে গোয়ালপাড়া।
রজনী ফুরায়ে যায়
কোকিলে পঞ্চমে গায়
পূর্বদিকে উদয় হইল ভানু
ধরিয়া রাধার হাতে

বিদায় মাগে ব্রজনাথে
বিদায় মাগে রাধার কাছে কানু ॥

এই গানটির ধরনের সঙ্গে পুরুলিয়ার বৈঠকী ঝুমুর গানের অসামান্য সাদৃশ্য আছে। বৈঠকী ঝুমুর গান বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে রচিত হয়ে আসছে এবং এ-গানের বৈশিষ্ট্য এই যে, শুরুতে খুব উর্ধ্বগতিতে পরিভ্রমণ করে প্রতিটি পদ ধীরে ধীরে ক্রমিক অবরোহণে স্থিতি লাভ করে। উদ্ধৃত গানটিতেও পদাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট এবং ওইরকম অবরোহণের ধারায় এর প্রত্যেকটি পদ সমাপ্ত হয়েছে। তথাপি, একে ঝুমুরের পর্যায়ে ফেলা যাবে না, কারণ এতে এমন কতকগুলি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান যা এটিকে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে।

এইভাবে ত্রিপুরা অঞ্চলের পল্লীসঙ্গীতের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি আমার গোচর হয়েছিল, যদিও আমি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে গভীরভাবে এইসব গানের অনুশীলন করি নি। একটি জিনিস কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, এখানকার পল্লীসঙ্গীতে পল্লীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ঘাত-প্রতিঘাত, বিক্ষোভ প্রভৃতি কোনটিই প্রকাশ পায় নি। এঁরা যেন সযত্নে নিজেদের দুঃখের অনুভূতিকে এড়িয়ে গিয়ে সাধনভজন এবং কৃষ্ণলীলার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চেয়েছেন। এটি হয়ত পলায়নপর মনোবৃত্তির পরিচায়ক, হয়ত রূঢ় বাস্তব থেকে অব্যাহতি লাভের একটি উপায়। আমি যে সময়ের কথা বলছি সেটা গত মহাযুদ্ধেরও পূর্বেকার কথা; তখন প্রজাদের উপর উৎপীড়ন কঠোর ছিল, মহাজনদের ঋণ থেকেও অব্যাহতি ছিল না; কিন্তু এমন গান কদাচিৎ শোনা গেছে যেখানে এই সমস্ত নালিশ নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে অথবা তার আভাস ইঙ্গিত আছে। সাময়িক প্রসঙ্গের গান যে ছিল না তা নয়। এ-অঞ্চলে একরকম গান শোনা যেত যাকে বলা হত ঢাকীর গান। গান-গুলির একটি পদ এমনভাবে শেষ হত যে তার রেশটা যেন ঢাকের বাজনায় ফুটে উঠত। বড় বড় ঢাকে খুব নাটকীয় ভাবে সেসব গান চলত দীর্ঘ সময় নিয়ে। গানগুলি সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত হত। করাল বন্যায় ঘর বাড়ি ভেসে গেছে, লোকজন পথে এসে দাঁড়িয়েছে;—তাঁদের কাতর অবস্থা নিয়ে হয়তো একটি গান রচিত হল; কিংবা কোনো করুণ ঘটনাকে উপলক্ষ করেও গান রচিত হত। ত্রিপুরার মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের মৃত্যুকে অবলম্বন করেও গান রচনা করে আগরতলায় এসে সে গান বহু বৎসর ধরে শুনিয়ে গেছেন ঢাকীরা। কিন্তু, সবই যেন একটা চিত্তের প্রকাশ, তার

মধ্যে করুণা আছে, আবেদন আছে, নেই কোনো বিদ্রোহের আভাস। দুঃখকে স্বীকার করে নিতে নিতে এঁরা বৈরাগ্যের মধ্যেই শান্তিকে পেতে চেয়েছেন ;—ভাবটা এই যে অভাব অভিযোগ তো আছেই, চিরকাল ধরেই ছিল এবং থাকবেও ভবিষ্যতে ; তবে আর অভিযোগ জানিয়ে লাভ কি ? তার চেয়ে সংসারের মায়াকে কাটাতে চেষ্টা কর, সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ কর। ফলে তাই হয়েছে। অত্যাচার উৎপীড়ন কমে নি, আভাষ, অভিযোগ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায় নি—আধ্যাত্মিক প্রেরণা তাঁদের কতখানি 'শান্তি দিয়েছে তাও অনুমানের বিষয়। তবে এটা ঠিক যে, তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী গানের একটা আর্ট তাঁরা সত্যই সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আর্টের বিচারে এই পল্লীসঙ্গীত সার্থকভাবে উত্তীর্ণ, কিন্তু বাস্তবের বিচারে তা পলায়নপর মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

চিত্রভানু সেন মহাভারত : ধর্ম, যুক্তি ও সম্পত্তি

কোনো এক সুপ্রাচীন কালে সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে বিবাদ এবং তার পরিণতিতে জ্ঞাতিযুদ্ধ হয়েছিল। কাহিনী অনুসারে এই জ্ঞাতিযুদ্ধ রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল।

জ্যেষ্ঠের সম্পত্তিতে অগ্রাধিকার এবং এটাই ধর্ম, মহাভারতের এই উক্তি বহুবার পালিত হয় নি (আদি ৮০. ১৫.)। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার অবাধ্য হওয়ায় যযাতি সর্বকনিষ্ঠ পূরুকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। অন্ধ বলে ধৃতরাষ্ট্র আর নিম্নবর্ণ করণ (শূদ্র দাসী ও ব্রাহ্মণ ব্যাসের ঔরসজাত) বলে বিদুর বঞ্চিত হয়েছেন। রাজত্ব লাভ করলেন পাণ্ডু। তাই হয়ত ভীষ্মের মতে পৈতৃক সম্পত্তি বলে দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের দাবি সমান। তবে পাণ্ডবরা রাজ্যলাভ করেছেন আগেই। অন্তত পক্ষে অর্ধাংশ পাণ্ডবদের দেবার অনুমোদন করেছেন ভীষ্ম (আদি ১০২. ২৩; ১৯৫. ৪-৮)।

১৮ দিনের যুদ্ধের কাহিনী মহাভারতের মূল বিষয় বলে পরিচিত হলেও, মহাভারতে স্থান পেয়েছে অসংখ্য উপকাহিনী, অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা, পুনরুক্তি, বিশুদ্ধ নীতিবাদ, রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়। পুনার ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা সংশোধন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের বিবেচিত সংস্করণে (critical edition) শ্লোক সংখ্যা ৭৩,৮১৫। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্বে, যেখানে যুদ্ধের কাহিনী আছে, সমগ্র শ্লোক সংখ্যা ২০,৭৪৪, অর্থাৎ সম্পূর্ণ গ্রন্থের মাত্র ২৮%।

মহাভারতের লেখক হিসাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বা ব্যাস পরিচিত। তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন মহাভারতের প্রথম প্রবক্তা (narrator)। মহাভারতের মুখবন্ধে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলছেন যে, এক লক্ষ শ্লোকের এই 'ইতিহাস' মাত্র তিন বছরে রচনা করেছিলেন ব্যাস। তিনি সগর্বে ঘোষণা করছেন যে, এই গ্রন্থে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা অন্যত্রও আছে, কিন্তু এখানে যা নেই তা অন্য কোথাও নেই (আদি ৫৫. ২১-২৪; ৫৬. ১৩, ১৯;

৩৩)। মহাভারতের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি কি তার ইঙ্গিত বৈশম্পায়নের এই উক্তিতে আছে এবং মহাভারতের এই বিপুল আকারের কারণও তাই।

মহাভারতের দ্বিতীয় প্রবক্তা লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা, যিনি বর্ণে সূত এবং যাঁকে পৌরাণিক (পুরাণবিদ্) বলা হয়েছে। সরস্বতী আর দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী কোন এক অঞ্চলে নৈমিষ অরণ্যে শৌনক ঋষির যজ্ঞে সমবেত ব্রহ্মর্ষিদের মনোরঞ্জনের জন্য উগ্রশ্রবা দ্বিতীয়বার মহাভারত আবৃত্তি করলেন। উগ্রশ্রবা দাবি করেছেন যে, এটা জনমেজয়কে কথিত বৈশম্পায়নের সংস্করণ, যা তিনি একবার শুনেই অবিকল মনে রেখেছেন। দাবি যাই হোক বৈশম্পায়ন ও উগ্রশ্রবার সংস্করণ এক নয়। কারণ উগ্রশ্রবা মহাভারতের কথা কিছুটা এলোমেলোভাবে বলার পর ভৃগু বংশীয় ঋষিদের গুণকীর্তন সুরু করলেন (আদি ৪-৫৩)। প্রসঙ্গত ভৃগু বংশীয় ব্রাহ্মণেরা মহাভারতে সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে পরে আরও আলোচনা করা হবে।

অতি প্রাচীন কালেই মহাভারতের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বৈশম্পায়ন বলছেন যে, ব্যাস তাঁর পুত্র শুক ও চারজন শিষ্য সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়নকে (তিনি নিজে) এই পঞ্চম বেদ পড়িয়েছিলেন এবং এঁরা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক সংস্করণ প্রকাশিত করেছিলেন (আদি ৫৭. ৭৪-৭৫)। এই সংস্করণগুলির প্রকৃতি কি বা কলেবর কতটা তা আজ জানা সম্ভব নয়।

বৈশম্পায়নের মতোই উগ্রশ্রবা জানাচ্ছেন যে, মহাভারত রচনার সময়ে ব্যাসদেব সব প্রাণীর উৎপত্তি, বিভিন্ন রহস্য, বেদ, যোগ, বিজ্ঞান, ধর্মার্থ কাম, কামশাস্ত্র, বহুবিধ স্মৃতিগ্রন্থ, সব্যাখ্যা ইতিহাস এবং মানুষের জীবনযাত্রার বিধি-সমূহ বিচার করেছিলেন। এর সবই মহাভারতে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটাই মহাভারতের লক্ষণ (আদি ১. ৪৬-৪৮)। উগ্রশ্রবার মতে সমস্ত উপাখ্যান বাদে মহাভরতের শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০ যার নাম দিয়েছেন ভারত। ২৪,০০০ শ্লোকাত্মক ভারতের রূপ কি ছিল আজ তা অজ্ঞাত।

সহজেই বোঝা যায় যে, শত শত বছর ধরে ব্যাসদেবের নামের অন্তরালে বসে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মতাদর্শের লেখকেরা মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। তাঁরা শুধু কাহিনীই রচনা করেন নি, যেখানেই সামান্যতম সুযোগ পেয়েছেন একটা তত্ত্ব, একটা আদর্শের আভরণ দিয়েছেন। কখনও শুধু তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কাহিনী, সংলাপ রচনা করেছেন। বা অনেক সময়ে

ঘটনা মনোমত না হলে তাকে পরিবর্তন করে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ভাবে যেটা ছিল মূলত ক্ষত্রিয় বীরগাথা তা পরিণত হল বহু পথ ও বহু মতের মহাভারত।

বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সত্ত্বেও মহাভারত একটি সুপ্রাচীন সামাজিক রীতির কথা বিস্মৃত হয় নি। নারীর বহুপতিত্ব। যে-কালে বহুপতিত্ব সামাজিকভাবে স্বীকৃত হত সেটা মহাভারত রচনার কাল নয়। মহাভারত রচনার কালে নারী সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত। পিতৃতন্ত্র কঠোর ভাবে প্রতিষ্ঠিত। বহুপত্নীকতা সামাজিক ভাবে স্বীকৃত।

দ্রৌপদীর বহুপতিত্ব মহাভারতে একটি মাত্র নিদর্শন এবং বোধহয় সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যেও। সৌভাগ্যের কথা যে, প্রাচীন এই রীতির লিখিত প্রমাণ অবলুপ্ত হয় নি।

খুব স্বাভাবিক কারণেই বহুপতিত্বের এই ঘটনা মহাভারতের লেখকদের কাছে শুধু বিসদৃশ নয়, ঘোরতর অনাচার।

বহুপতিত্ব কতটা বিসদৃশ তার প্রমাণ মেলে মহাভারতে এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাতে। প্রথমে দেখান হল যে, পঞ্চপাণ্ডব এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন মায়ের আদেশের ফলে। কুন্তি না জেনেই বলেছিলেন : 'ভিক্ষা তোমরা সকলে মিলে ভাগ করে নাও।' কুন্তীর পক্ষে উভয় সঙ্কট : দ্রৌপদীর বহুপতি না হলে তাঁর উক্তি মিথ্যা হবে, আর বিবাহ হলে তা 'অভূতপূর্ব অধর্ম' হবে। 'অধর্মের' ভয়ে কুন্তী যুধিষ্ঠিরের কাছে স্বীকার করছেন যে, প্রমাদবশতই তিনি সকলে মিলে ভোগ করার আদেশ দিয়েছিলেন (আদি ১৮২)।

যুধিষ্ঠির এই বিবাহে সম্মত হলেন, কিন্তু তা কোন ধর্মের তাত্ত্বিক বিচারের ফলে নয়। তিনি লক্ষ করলেন যে, তাঁর চার ভাই দ্রৌপদীর অনন্য সাধারণ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়েছেন। একটি নারীকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃবিরোধ সম্ভব (আদি ১৮২. ১১-১৫)। স্পষ্টত ধর্মভঙ্গের আশঙ্কার চেয়ে ভ্রাতৃবিরোধ প্রবলতর বিপদ, এই বাস্তব রাজনৈতিক বুদ্ধির ফলে এই 'অভূতপূর্ব অধর্ম'কে যুধিষ্ঠির মেনে নিলেন।

মাতৃআজ্ঞা পালনের জন্য যৌথ বিবাহ অবশ্য করণীয়, যুধিষ্ঠিরের এই যুক্তি দ্রুপদ মানতে পারছেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন যে, তাঁর মত পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তি কি করে এই রকম লোক ও বেদ বিরুদ্ধ অধর্ম অনুমোদন করতে পারেন? এক পুরুষের বহু স্ত্রীর বিধান আছে, কিন্তু

একজন নারীর বহু পুরুষ কখনও বিধেয় নয়। উত্তরে যুধিষ্ঠির দ্রুপদের এই 'লোক ও বেদ বিরুদ্ধ অধর্মের' কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। তিনি বলছেন যে, ধর্ম অতি সূক্ষ্ম এবং তার গতি অজ্ঞাত। তবে পূর্বপুরুষের পরম্পরাগত পথই তাঁরা অনুসরণ করেন ইত্যাদি। এইসব যুক্তিতে যুধিষ্ঠির আসল সমস্যাই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন (আদি ১৮৭. ২২-৩০)।

বলা বাহুল্য যে, বহুপতিত্বের তাত্ত্বিক সমাধান যুধিষ্ঠিরের কথাতে হল না। দ্রুপদের সভায় বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে টেনে আনা হল। এই বিষয়ে সকলের মত জানতে চেয়ে ব্যাস যা মন্তব্য করলেন তা চমকপ্রদ। তাঁর মতে এই ধর্ম (বহুপতিত্ব) লোক ও বেদ বিরুদ্ধ এবং ছলনাময় (বিপ্রলব্ধ) (আদি ১৮৬ ৬)। কিন্তু এর পরই ব্যাস যা বললেন তা ঠিক এর বিপরীত। আসলে মহাভারতের কোন একজন লেখক নিজের মনোভাব গোপন রাখতে পারেন নি।

দ্রুপদ তাঁর অভিমত ব্যাসকে জানালেন। এরকম ধর্ম আগে কোনও মহাত্মা আচরণ করেন নি। উপরন্তু সনাতন ধর্মও বহুবার আচরিত না হলে (অপ্রতিষ্ঠ) পালনীয় নয় (ন চ ধর্মো' পি অনেকস্থশ্চরিতব্যঃ সনাতনঃ আদি ১৮৮. ৮)। লৌকিক আচার সম্বন্ধে একটি অতিসত্য কথা বলেছেন দ্রুপদ। লোকাচার বা বিধিবদ্ধ ধর্ম প্রচলিত না থাকলে তার সামাজিক মূল্য থাকে না। বৈদিক বহু অনুষ্ঠান আজ অপ্রচলিত, অজ্ঞাত ও অসিদ্ধ। বহুপতিত্ব সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত, সুতরাং সেই আচার (ধর্ম) পুরাতন হলেও যেহেতু আচরিত হয় না সেহেতু তা বর্জনীয়।

পাঁচ ভাইয়ের একই স্ত্রী হলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবেন। এটা অশিষ্টতা এবং গর্হিত। তাই শিষ্টতার প্রশ্ন তুলেছেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। এই বিবাহে অশিষ্টতার সম্ভাবনা (আদি ১৮৮. ১০)।

বহুপতিত্বের প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে যুধিষ্ঠির উল্লেখ করলেন জটিলা নামে এক গৌতম বংশীয়া মহিলার কথা, যিনি সাতজন ঋষিকে পতিরূপে বরণ করেছিলেন। এই কাহিনী পুরাণে আছে (কোন্ পুরাণে ?) (আদি ১৮৮. ১৪)।

ব্যাস সব কথা শুনলেন। নিজের অভিমত হিসাবে এবার যা বললেন তা আগের বিপরীত। বহুপতিত্ব আর বিপ্রলব্ধ, লোক ও বেদবিরুদ্ধ ধর্ম নয়, এটাই সনাতন ধর্ম। যে পদ্ধতিতে এই ধর্ম বিহিত এবং যে সূত্রে এটা সনাতন ধর্মরূপে স্বীকৃত হয়েছে ব্যাস তা দ্রুপদকে বলতে রাজি। তবে কারও

সাক্ষাতে নয়, নির্জনে বলবেন।

বহুপতিত্ব সনাতন ধর্ম ব্যাসের এই উক্তি বোধহয় মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মনোমত হয় নি। মূল পাঠে আছে : ন তু বক্ষ্যামি সর্বেষাম...(আদি ১৮৮. ১৮)—এ কথা সকলের সাক্ষাতে বলব না। মহামহোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন : 'তবে তাহা (বহুপতিত্ব, চি. সে.) সকলের পক্ষে নহে' (সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, আদি ১৮৯. ১৯, পৃ ১৮৭৩)।

যুক্তি যখন অজ্ঞাত, ধারণা ক্ষীণ, তখন বোধহয় একটু রহস্যময় গোপনীয়তা কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। বিশেষত, বক্তা যখন স্বয়ং ব্যাস। গীতায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ অর্জুনকে মুগ্ধ করেছিল। ব্যাস এক অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করলেন যার সারাংশ এই : কোনও এক কালে ইন্দ্র এক নারীর সঙ্গী হয়ে হিমালয়ে অক্ষক্রীড়ারত এক যুবককে দেখলেন। যুবকটি মহাদেব। আত্মপরিচয় প্রকাশে ইন্দ্র ঔদ্ধত্য দেখালে রুষ্ট মহাদেব ইন্দ্রকে কারাগারে বন্দী করলেন। সেখানে আরও চারজন পূর্বেন্দ্র ছিলেন। পরে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে মহাদেব সেই পঞ্চ পূর্বেন্দ্রকে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার আদেশ দিলেন। ইন্দ্রের সঙ্গিনী হবেন পৃথিবীতে তাঁদের যৌথ স্ত্রী। বলা বাহুল্য এঁরাই পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী। এই অলৌকিক কাহিনী বলার পর ব্যাস দ্রুপদকে দিব্যচক্ষু দান করলেন, যার ফলে দ্রুপদ পাণ্ডবদের ইন্দ্ররূপে দেখলেন। বিধাতা যা পূর্বেই স্থির করে রেখেছেন তা অবশ্যম্ভাবী। ব্যাসের মুখে এই গল্পে বহুপতিত্বের সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তবুও দেখি, অধিকন্তু ন দোষায়, এই নীতিতে মহাভারতে ব্যাসের মুখে আর একটি ভিন্ন গল্প তৈরি করা হয়েছে। এক রূপবতী ঋষিকন্যা পতিলাভের আশায় উগ্র তপস্যায় মহাদেবকে প্রীত করলেন। সেই কন্যা সর্বগুণসমন্বিত পতি কামনা করলেন এবং মহাদেবের কাছে পাঁচবার একই প্রার্থনা করার ফলে কন্যাটি পঞ্চপতির বর পেলেন। এই কন্যাই দ্রুপদের তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই একই গল্প বোধহয় পাঠকদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য ব্যাস এর আগেই বলেছেন (আদি ১৫৭. ৬-১৪ ; ১৮৯. ১৪-৪৯)।

নারীর পঞ্চপতি যতই বিসদৃশ ঘটনা হোক, তার ব্যাখ্যার জন্য দুটি ভিন্ন গল্প এবং তাও একই লোকের মুখে এবং পরপর, খুবই হাস্যকর প্রচেষ্টা।

ব্যাসের সব কথা শুনেও দ্রুপদ বলছেন, মহাদেব যদি এইরকমই বিহিত

করে থাকেন তাহলে ধর্মই হোক আর অধর্মই হোক তাতে তাঁর কোন অপরাধ নেই (আদি ১৯০. ৪)।

বৈদিক গৃহসূত্রে শুধুমাত্র কন্যারই বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধি আছে, বিবাহিতার পুনর্বিবাহের কোন উল্লেখ নেই। থাকবার কথাও নয়, কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর বহুবিবাহ স্বীকৃত নয়। এই শাস্ত্রীয় বিধির বাধা অতিক্রম করা হয়েছে অভিনব উপায়ে। বিবাহ সম্পন্ন করালেন ধৌম্য, পাণ্ডব পক্ষের পুরোহিত, কন্যাপক্ষের কোনো পুরোহিত উপস্থিত থাকলেও তার উল্লেখ নেই। ধৌম্য প্রতিদিন একজন পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ সম্পন্ন করলেন এবং প্রতিদিনই ধৌম্যের ঘোষণা অনুযায়ী দ্রৌপদী 'কন্যা' হলেন। বিবাহ অনুষ্ঠান মাত্র চারটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে (আদি ১৯০. ১১-১৪)।

পুরুষের বহুপত্নীকতা সমাজগ্রাহ্য, অতএব সেটা ধর্ম। নারীর পক্ষে স্বামী লঙ্ঘন, স্বামী ত্যাগ ও পুনর্বিবাহ গর্হিত কাজ, অতএব তা অধর্ম। এই ধর্ম ও অধর্মের কারণ নৈতিকতা নয়, এর কারণ অর্থনৈতিক। এর ইঙ্গিত বোধহয় বকরাক্ষসের গল্পে আমরা পাই। বকরাক্ষসের কাছে কে ভক্ষ্য রূপে উপস্থিত হবেন এ-বিষয়ে বাদানুবাদের সময়ে ব্রাহ্মণী নিজেই মৃত্যুমুখে যেতে চাইছেন। ব্রাহ্মণীর যুক্তি এই যে, স্বামীর মৃত্যু হলে বৈধব্যে রক্ষকহীন অবস্থায় ব্রাহ্মণীর পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব এবং বিধবার পক্ষে পুত্রকন্যার ভরণপোষণ করাও সম্ভব নয় (আদি ১৪৬. ৮-১০)।

যে সমাজে নারী জীবিকার অভাবে সন্তান প্রতিপালনে অক্ষম, সে সমাজে নারীর অধিকার থাকা সম্ভব নয়। তাই স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ অধর্ম, বহুপতিত্ব অকল্পনীয়। কর্ণের মতে বহুপুরুষের সহচরী বলে দ্রৌপদী বারবণিতা, এবং সেহেতু বিবস্ত্রা বা রজস্বলা অবস্থায় দ্রৌপদীকে সভায় টেনে আনা হলে আশ্চর্যের কি আছে ? (সভা ৬১. ৩৪-৩৬)।

স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি—এ তত্ত্ব মহাভারতে বহুবার বলা হয়েছে। দেবযানীর দাসী হয়েছেন শর্মিষ্ঠা, অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর স্বামী যযাতিকে বলছেন যে, স্ত্রী, দাস এবং পুত্র এই তিন শ্রেণীর লোক সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন না ? এঁরা যাই উপার্জন করুন তা তাঁদের মালিকের সম্পত্তি। দাসী হিসাবে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর সম্পত্তি এবং সেই কারণে দেবযানীর মালিক যযাতিরও সম্পত্তি। শর্মিষ্ঠা নিজেই দাবি করছেন যে, তিনি যযাতির ভোগ্যা (আদি ৭৭.২২-২৩)।

শর্মিষ্ঠা, যিনি যৌন সম্ভোগের বিষয়ে নিঃসঙ্কোচ, নিরর্গল, তিনি নিজেকে

পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করেন। মহাভারতে নারীর যৌন স্বাধীনতা নিঃশর্তে স্বীকৃত। সত্যবতী অকপটে স্বীকার করছেন ভীষ্মের কাছে যে, ব্যাস তাঁর কানীন পুত্র। কুন্তী ব্যতিক্রম, কর্ণের কথা প্রথমে গোপন রেখেছিলেন। একদিকে এই অবাধ যৌন স্বাধীনতা অন্যদিকে পুরুষের পরিপূর্ণ অধীনতা—এই পরস্পরবিরোধী অবস্থা আশ্চর্যজনক মনে হয়। একই সমাজে এই দুই বিপরীত অবস্থার সহাবস্থান সম্ভব নয়। মনে হয় নারীর এই আর্থিক নির্ভরতা উত্তরকালের তথ্য যা স্মৃতিকারদের প্রভাবে লিখিত হয়েছে।

মহাভারতে সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নও ধর্ম। সম্পত্তিবিষয়ক ধর্মের প্রকৃতি কি অথবা তার স্বীকৃতি কোনখান থেকে এল? এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ উত্তর মহাভারতে আশা করা অন্যায়। তবে অনেক সামাজিক জটিল প্রশ্নের সমাধান সূত্র এমন প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লিখিত আছে যে, অনেক দুরূহ সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় নিজে পরাজিত হয়ে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হেরেছেন। এখানেও সম্পত্তি অধিকারের প্রশ্ন। স্ত্রী হিসাবে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের অধীন। কিন্তু যুধিষ্ঠির নিজেই আগে পরাজিত হয়ে কী করে আর এক জনকে পণ রাখেন? কোনো ন্যায় বা অন্যায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি দ্রৌপদী। দ্রৌপদী নিজেও প্রকারান্তরে স্বীকার করছেন যে, যুধিষ্ঠিরের কর্তৃত্ব তাঁর উপরে আছে, তবে পরাজিত হওয়ার ফলে যুধিষ্ঠির স্বত্বহীন হয়ে পড়েছেন। এই প্রশ্ন ভীষ্ম প্রথমে ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ভীষ্ম বললেন যে, যথাযথ সমাধান করতে তিনি অক্ষম। কারণ একদিকে যেমন স্বত্বহীন ব্যক্তি পরের সম্পত্তি পণ করতে পারেন না এটা সত্য, অপর দিকে এটাও ঠিক যে, স্ত্রী স্বামীর অধীন (সভা ৬০. ৪০-৪২)। এই ধর্মের স্বরূপ কি? দ্রৌপদীর পীড়াপীড়িতে ভীষ্ম অকপটে স্বীকার করলেন যে, পৃথিবীতে বলবান্ ব্যক্তি যে ভাবে ধর্মকে দেখেন লোকে ধর্মবিচারের সময়ে সেটাই ধর্ম বলে মেনে নেয় (সভা ৬২. ১৪-১৫)। এইরকম সরল সত্যের অভিব্যক্তি দুর্লভ। বলবান্ বলতে ভীষ্ম এখানে দৈহিক বলের কথা বলেন নি। তিনি অর্থবলের কথা বলেছেন। কারণ আরও পরে ভীষ্ম অসহায় ভাবে নিজের অক্ষমতার কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয় (ভীষ্ম ৪১. ৩৬)।

কৌরব আর পাণ্ডব কোন পক্ষই নিজ নিজ সম্পত্তির দাবি পরিত্যাগ

করেন নি, বরং নির্মম ভাবে সম্পত্তি অধিকার বা উদ্ধারের চেষ্টায় যত রকম কূট কৌশল আছে তা ব্যবহার করেছেন নিরলস অধ্যবসায় সহকারে। যে কোন কারণেই হোক দুর্যোধন কোন নৈতিক কারণ দেখান নি তাঁর কর্ম কৌশলের স্বপক্ষে। ধর্ম বা অধর্ম কোন নীতি তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষার স্বপক্ষে। কিন্তু পাণ্ডবদের তরফে নীতি, ধর্ম ও অধর্মের উপর আলোচনার বিরাম নেই।

বনবাসে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন যুধিষ্ঠির। তখন শৌনক নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরকে এক দীর্ঘ উপদেশ দিলেন। তার সারমর্ম এই যে, ধর্মই যদি যুধিষ্ঠিরের কাম্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাঁকে অর্থস্পৃহা ত্যাগ করতে হবে। প্রত্যুত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন যে, তাঁর অর্থস্পৃহা অর্থভোগ বা লিপ্সার জন্য নয়। তিনি অর্থ কামনা করেন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রতিপালনের জন্য (আরণ্যক ২)। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির ও তাঁর মিত্র পক্ষ কৌরবপক্ষকে সপরিবারে ধ্বংস করলেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া অর্থ কামনাহীন ক্ষত্রিয় সম্ভব নয়। এখানে যা বলা হয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থে নিস্পৃহতাই পরম ধর্ম ও মহান আদর্শ এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত করা এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রাধান্য দেখান।

যুধিষ্ঠিরের কাছে বনবাসের চুক্তি অলঙ্ঘনীয়। এই চুক্তি ভঙ্গের অনিচ্ছা কি শুধু নৈতিক কারণে, না কৌশলগত কারণও আছে? বনবাস লঙ্ঘন করে বাহুবলে দুর্যোধনের কবল থেকে রাজ্য পুনরুদ্ধার করলে কি অধর্ম হবে?

এই সব প্রশ্ন নিয়ে দ্বৈত বনে এক সায়াহ্নে দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির ও ভীম তীব্র বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই বাদানুবাদে শুধু যে তত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে তা নয়, এক বিশেষ মানসিকতাও পরিস্ফুট হয়েছে। তত্ত্বে সম্পত্তিস্পৃহা অধর্ম, কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবের পরিচয় আছে।

গীতায় বর্ণিত দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত এবং সুখে বিগতস্পৃহ এই চরিত্রের বিপরীত আচরণ করছেন দ্রৌপদী (গীতা ২য়, ৫৬)।

বিত্তহীনতায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করছেন দ্রৌপদী। রত্ন আসন, কৌশিক বস্ত্র (silk), চন্দনানুলেপ ও স্বর্ণ পাত্রে ভোজন এই সব রাজকীয় স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে কুশের আসন, বল্কল বস্ত্র ও বন্য ভোজনের কৃচ্ছ্রতায় গভীরভাবে পীড়িত দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলছেন যে, ক্রোধহীন ক্ষত্রিয় কখনও হয় না, ব্যতিক্রম শুধু যুধিষ্ঠির। তিনি বিস্মিত হচ্ছেন এই দেখে যে, এই চরম দুঃস্থ

অবস্থাতেও যুধিষ্ঠিরের কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। অথচ উপযুক্তকালে তেজ প্রকাশ না করলে ক্ষত্রিয় পর্যুদস্ত হন। যুধিষ্ঠিরের উচিত নয় শত্রুকে ক্ষমা করা। প্রহ্লাদ তাঁর পৌত্র বলিকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করছেন দ্রৌপদী। সব সময়ে ক্ষমা বা বিক্রম প্রকাশ কোনটাই শ্রেয় নয়। নিত্য ক্ষমাকারীকে ভৃত্যরাও অবজ্ঞা করে, আর অবজ্ঞা মৃত্যুর অধিক। অপরপক্ষে, যিনি স্থানে ও অস্থানে তেজ প্রকাশ করে লোককে সতত দণ্ডিত করেন তিনি সকলের শত্রুতে পরিণত হন (আরণ্যক ২৮-২৯)।

যুধিষ্ঠিরের মতে বিনাশের মূল ক্রোধ, অতএব ক্রোধ সংযত করলেই সব উন্নতি সম্ভব। পরমুহূর্তেই বিশুদ্ধ নীতির প্রবক্তা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বাস্তব বুদ্ধির কথা বললেন। তিনি বললেন, শক্তিহীন ব্যক্তির পক্ষে বলবানের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা মূঢ়তা। সেই কারণে দুর্বলের বেলাতেই ক্রোধ সংহারের বিধান। এখানেই যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মহাভারতের লেখকেরা পরস্পর বিরোধী মত উপস্থাপিত করতে মোটেই দ্বিধা করেন না। তারপর শুরু হল এক দীর্ঘ বক্তৃতা যার প্রতিপাদ্য হল যে, ক্রোধ সর্বদাই অনিষ্টের ও সর্বনাশের মূল। ক্ষমা শুধু কালাশ্রয়ী কৌশলমাত্র নয়, ক্ষমা ধর্ম, যজ্ঞ, বেদ, শ্রুতি ও আরও অনেক কিছু (আরণ্যক ৩০)। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে যুধিষ্ঠির কৌরবদের ক্ষমা করেন নি।

যুধিষ্ঠিরের নীতিবাদ শুনে দ্রৌপদী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, এই জগতে কেউ কখনও ধর্ম, মৃদুতা, ক্ষমা, সরলতা বা দয়ার সাহায্যে সম্পদ অর্জন করে নি। ধর্ম তাঁর কাছে এতই প্রিয় যে তিনি ভাইদের এবং স্ত্রীকেও বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করতে পারেন না। শোনা যায় যে, রাজার দ্বারা পরিপুষ্ট ধর্ম ধর্মরক্ষক রাজাকে রক্ষা করেন। যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রে কিন্তু তা সত্য নয়। কারণ তাহলে এত দেবপূজা, ব্রাহ্মণ ও অতিথি সেবা এবং এত সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান সত্ত্বেও কি করে অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের দুর্মতি হল ?

দ্রৌপদী প্রশ্ন তুলেছেন : ঈশ্বর কি মঙ্গলময়, মানুষ ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ, না স্বাধীন ? দ্রৌপদী বলছেন যে, প্রাচীন ইতিহাসে (প্রবাদে ?) বলা হয় যে, মানুষ স্বাধীন নয়, ঈশ্বরের অধীন। বিধাতাই মানুষের সুখ, দুঃখ, প্রিয়, অপ্রিয় সবই বিহিত করেন। মঙ্গল ও পাপ তাঁরই দান। দ্রৌপদীর মন্তব্য এই যে, ঈশ্বর প্রাণীদের নিয়ে ভাঙা-জোড়ার খেলা খেলেন, শিশু যেমন পুতুল নিয়ে খেলে. সেহেতু বলতে হয় যে, ঈশ্বর প্রাণীদের প্রতি পিতামাতার

মতো ব্যবহার করেন না। ক্রোধে বশীভূত অতি সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করেন। যিনি যুধিষ্ঠিরকে দুর্দশা আর দুর্যোধনকে সমৃদ্ধিদান করেছেন সেই ঈশ্বরকে বিষমদর্শী বলে নিন্দা করছেন দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর বক্তব্য এই যে, কৃতকর্ম যদি কর্তাকেই অনুসরণ করে, অন্য কাউকে নয়, তাহলে বলতে হয় যে, ঈশ্বরও পাপকর্মে লিপ্ত। অপরপক্ষে যদি বলা হয় যে, কৃত পাপকর্ম কর্তাকে আক্রান্ত করে না, তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, জগতে শক্তিই একমাত্র কারণ। এবং তাহলে দুর্বল জনসাধারণের অবস্থা অতীব শোচনীয় (আরণ্যক ৩১)।

ব্যবহারিক জীবনে, বিশেষ করে সম্পত্তি অর্জনের ব্যাপারে, ধর্ম নিতান্ত তুচ্ছ। ঈশ্বর মঙ্গলময় না অমঙ্গলময় তা নির্ভর করবে ঈশ্বরের কৃতকর্ম বিচার করে। এইসব যুক্তি দুঃসাহসিক। এরকম স্পষ্ট ভাষণ ও বাস্তব বক্তব্য বোধহয় সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ।

অতি স্বাভাবিক কারণেই যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর বক্তব্যকে নাস্তিক্যবাদ বলছেন (আরণ্যক ৩২.১)। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে দ্রৌপদীকে যথাযথ উত্তর দিতে পারছেন না। যুধিষ্ঠির বলছেন যে, তিনি ধর্মফলের অন্বেষী নন, দান করতে হবে তাই দান করেন, যজ্ঞ করা উচিত তাই যজ্ঞ করেন (প্রসঙ্গত, এমন কোন বৈদিক যজ্ঞ নেই যা নিষ্কাম, কিছু না কিছুর প্রাপ্তি যজ্ঞানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। গীতা বলেছে যে, যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের সমৃদ্ধি হয় এবং তার প্রতিদানে দেবতারাও মানুষের সমৃদ্ধি সাধন করেন। পরস্পরের উন্নতি বিধানের ফলে পরম শ্রেয় অর্জন করা যায়—(গীতা ৩.১১)। যুধিষ্ঠিরের মতে ধর্মকে যিনি দোহন করতে চান বা ধর্ম আচরণ করে নাস্তিক্যবাদের ফলে সন্দিগ্ধ হন, তিনি ধর্মফল পান না। বেদ থেকে শূদ্র যেমন বহিষ্কৃত তেমন ধর্ম ও ঋষি-প্রদর্শিত পথে সন্দেহ করলে অমরলোক থেকে বহিষ্কার অনিবার্য। আর যদি তপ, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান প্রভৃতি নিষ্ফল হত তাহলে পূর্ব পূর্বপুরুষেরা ধর্ম আচরণ করতেন না। যদি ধর্মক্রিয়া নিষ্ফল হয় তাহলে এটা অত্যন্ত প্রবঞ্চনা বলে গণ্য হবে।

গভীর নিষ্ঠা সহকারে ধর্মানুষ্ঠান সত্ত্বেও চরম দুর্দশার গ্রাস থেকে যুধিষ্ঠির মুক্তি পান নি। সে কারণে ধর্মের প্রত্যক্ষ ফল প্রমাণিত করা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে কঠিন। বোধহয় সেই কারণে যুধিষ্ঠির বলছেন যে, ধর্মক্রিয়ার ফল নিশ্চয় আছে, তবে ধীর ব্যক্তি অল্প পরিমাণ ফলেই তুষ্ট হন। আর নির্বোধেরা বহু ফলেও তুষ্ট নন। পাপ বা পুণ্য কর্মের ফলের উদয়, উৎপত্তি

বা বিনাশ এ-সবই দেবতাদের গোপন রহস্য। যে কেউ এই রহস্য জানতে পারেন না। দেবতারা গূঢ় মায়াবী। তাই যুধিষ্ঠির বলছেন যে, ফল না দেখা গেলেও ধর্ম ও দেবতায় সন্দেহ প্রকাশ করা অনুচিত (আরণ্যক ৩২)।

ঈশ্বর ও ধর্মের সার্থকতায় সন্দেহ প্রকাশ দুঃসাহসের পরিচয়। অতএব দ্রৌপদীকে বলতেই হল যে, তিনি ঈশ্বর ও ধর্মের অবমাননা করতে চান নি। তাঁর এই সব উক্তি কাতরতাজনিত প্রলাপ (!) বলে মনে করতে পারেন যুধিষ্ঠির।

কিন্তু দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ করছেন। তিনি বলছেন যে, শুধুমাত্র স্থাবর বস্তু নিষ্ক্রিয় হয়েও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। আর যে কোন প্রাণীকে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে হয়। জীবিকা অর্জনের জন্য প্রাণীদের আমৃত্যু কাজ করতে হয়। উদ্যোগ কি তা তারা জানে এবং লোকসমক্ষেই কর্মের প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করে তারা। প্রাণীর মতো ঈশ্বরকেও উদ্যোগের মাধ্যমে জীবনধারণ করতে হয়। একটা বকও জলের ধারে বসে আহার সংগ্রহের চেষ্টা করে। কর্তব্যসচেতন ব্যক্তি হয়তো সহস্রে একজন আছেন। তাঁর উচিত সম্পত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি করা। নিষ্ক্রিয় থাকলে প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে। বীজবপন না করে বসে খেলে হিমালয়ের মতো সঞ্চয় নিঃশেষ হবে যাবে। লোকে নিষ্ফল কাজও করে। কারণ জীবিকা অর্জন ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এই পৃথিবীতে। দ্রৌপদীর মতে ভাগ্যবাদী ও হঠবাদী এই উভয় শ্রেণীর লোকেরা অধম। শুধু কর্মবুদ্ধি প্রশংসনীয়। যে লোক নিশ্চেষ্ট হয়ে ভাগ্যের আরাধনায় সুখে নিদ্রা যান, জলে কাঁচা মাটির কলশির মতো তিনি বিধ্বস্ত হন। সেইভাবে কর্মক্ষম ব্যক্তি হঠবাদে বিশ্বাসী হয়ে নিষ্ক্রিয় হলে জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দ্রৌপদী বলছেন যে, মানুষ বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। মনে মনে নিজ উদ্দেশ্য নির্ণয় করে মানুষ পরে নিজ কর্মের দ্বারা তা অর্জন করে। মানুষ নিজেই নিজের কারণ। গৃহ, নগর তৈরি করে মানুষই। নিজ বুদ্ধির বলে মানুষ জানেন তিলে তেল, দুধে ক্ষীর ও কাঠে আগুনের অস্তিত্ব এবং তা আহরণের উপায়ও জানেন। তারপর কর্মসিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র আহরণ করে। এইভাবে কর্মসিদ্ধির দ্বারাই প্রাণীরা জগতে প্রাণধারণ করে। কর্মদ্বারা অর্জিত ফলের কারণ যদি মানুষ না হত তাহলে জগতে লোকহিতকর কাজের কোন মূল্য থাকত না (আরণ্যক ৩৩)। আমরা অবশ্য কিছু আগে দেখেছি যে জগতে মানুষের সব ক্রিয়াই বিধাতার দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত এ-কথাও দ্রৌপদী বলেছেন (আরণ্যক ৩১.২০-৩৫)। অবশ্য পাপ কর্মের জন্য ঈশ্বরকেও সেই পাপকর্মের ভাগী করেছেন দ্রৌপদী।

কর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দ্রৌপদীর তাত্ত্বিক সমাধান এই যে, হঠ, দৈব ও স্বকর্মের দ্বারা কিছু ফল পাওয়া যায়। তবে অলস ব্যক্তি জীবনে ব্যর্থ। কাজ করে অসফল হলে হতাশার কিছু নেই। কারণ, সাফল্য ও ব্যর্থতা কাজের দুই দিক। একথা সত্য যে, বহু কিছুর সংযোগেই কর্মের সাফল্য হয় এবং গুণের অভাবে কর্মের ফল তুচ্ছ বা ব্যর্থ হয়, কিন্তু কর্মের অনারম্ভে ফল বা গুণ কিছুরই সম্ভাবনা নেই (আরণ্যক ৩৩)।

বিতর্কে অংশগ্রহণ করে ভীম বলছেন যে, সরলপথে বা ধর্মের সাহায্যে দুর্যোধন পাণ্ডবদের রাজত্ব হরণ করেন নি। জীর্ণ ধর্মের অন্তরালে বসে যুধিষ্ঠির এই দুর্গম দেশে কষ্ট সহ্য করছেন। ধর্ম ও কামের উৎস অর্থ আর যুধিষ্ঠির সেই অর্থই বর্জন করছেন। ধর্ম ধর্ম বলে ব্রতধারণ করে আর আত্মনিগ্রহ করে যুধিষ্ঠির হয়তো হতাশার ক্লীবের জীবিকা গ্রহণ করছেন।

ভীমের কথায় পুরুষতা কিছুটা আছে, কিন্তু ভীম অযৌক্তিক নন। সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষণ সম্বন্ধে নিজের নৈতিকতাই শ্রেয় বলে যুধিষ্ঠির যে অভিমত প্রকাশ করছেন তার বিরোধিতা করে ভীম বলছেন যে, রাজ্য অপহৃত হলে নিজ স্বার্থে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করলে তা প্রশংসার যোগ্য, নিন্দাহ নয়। প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা ও কীর্তি অর্জনের ইচ্ছাই স্বধর্ম। স্বপক্ষ ও মিত্রপক্ষের কষ্ট সৃষ্টি করে যে ধর্ম তা অশুভ প্রবৃত্তি। সে ধর্ম কুধর্ম।

ভীমের মতে অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা ধর্ম। দুঃখক্লিষ্ট জীবন ধর্মের উদ্দেশ্য নয়। যিনি নিত্য ধর্মপরায়ণ তাঁর ধর্ম দুর্বল। সুখ ও দুঃখ যেমন মৃতদেহ বর্জন করে তেমনই ধর্ম ও অর্থ এই সব লোককে পরিত্যাগ করে। যে-ব্যক্তির ধর্ম ধর্মের জন্যই পীড়িত হয় তিনি বুদ্ধিমান নন। তবে অতি-মাত্রায় অর্থ ও কামপরায়ণ হলে বিনাশ সুনিশ্চিত। মেঘ ও বৃষ্টির মতো ধর্ম ও অর্থ পরস্পরের উৎস। ধর্ম অর্থনির্ভর, অর্থও ধর্মনির্ভর। স্মরণীয় ভীমের এই উক্তি যে, অর্থসঞ্চয় (অর্থ পরিগ্রহ) ও দ্রব্যসংগ্রহ ধর্ম (আরণ্যক ৩৪. ২৯, ৩৫)। বার্ধক্যজনিত কারণে বা মরণবশত অর্থহানি হলে তা মহাবিপর্যয় রূপে গণ্য হবে। ধর্মার্থকাম এই তিনটি বিষয়ে সমান দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ভীম বলছেন যে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে জীবনের প্রথম ভাগে কাম, মধ্যভাগে ধন ও শেষভাগে ধর্মে নজর দেওয়া উচিত। ধর্ম, অর্থ ও কাম এখানে, স্পষ্টত তিনটি বিভিন্ন প্রবৃত্তি এবং এগুলি পালনে

সংঘাত আশঙ্কা করেই তা জীবনের বিভিন্ন অংশে পালনের জন্য বিধি করা হচ্ছে। এখানে অর্থ ও ধর্ম এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। ধর্ম এখানে নৈতিকতা।

সম্পদের সঞ্চয় ধর্ম, যুধিষ্ঠিরের 'জীর্ণ' ধর্ম, আবার ধর্মের দ্বারা সম্পদ অর্জন সম্ভব নয় এই সব উক্তি বিভ্রান্তিকর মনে হয়। একবার ধর্ম হচ্ছে আচরণ বিধি আর একবার নৈতিকতা। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম নৈতিকতা। ধর্ম কি ? ভীমের ব্যাখ্যা এই যে, দান, যজ্ঞ, সৎব্যক্তির পূজা, বেদধারণ ও সরলতা এই ধর্ম। কিন্তু অনন্তগুণসম্পন্ন ব্যক্তিও কপর্দকশূন্য হলে এই ধর্ম পালন করতে পারেন না। কারণ অতি স্পষ্ট। ভীমের মতে এই জগৎ ধর্মনির্ভর, ধর্মের উর্ধ্বে কিছুই নেই। তাহলেও এটা সত্য যে, ধর্মপালনের জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। শুধুমাত্র ধর্মবুদ্ধি সহায় করে কোনো লোক ভিক্ষা বা ক্লৈব্যের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারেন না। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভিক্ষা নিষিদ্ধ। বল প্রকাশই ধর্ম। ভীম বলছেন যে, এই সব তথ্য বিবেচনা করে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে—মোক্ষের পথ গ্রহণ করা বা সুখ অর্জনের উদ্দেশ্যে কৌশল বার করা। মুমুক্ষা আর সুখের মাঝামাঝি জীবনটা ব্যধিগ্রস্ত জীবনের মতো দুঃখকর (আরণ্যক ৩৪ ৪২-৫০)।

সামাজিক জীবনে সম্পত্তি একটি প্রবল শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা না হলে ভীম এখানে যা বলেছেন তা মহাভারতে স্থান পেত না। মহাভারতের রচনাকালে অন্ততপক্ষে সম্পত্তি অন্যতম প্রধান শক্তি। জীবনে জাগতিক সুখের প্রতি পরাঙ্‌মুখতা, নিরুদ্বিগ্নচিত্তে শান্ত সমাহিত তপোবনে অতিজাগতিক চিন্তায় জীবনযাপন, মানব জীবনের এই রকম একটা আদর্শের কথা প্রায়শই কল্পনা করা হয়ে থাকে। জীবনে অর্থের প্রয়োজন অতি তুচ্ছ, মোক্ষলাভের চিন্তায় সবাই সতত বিরত এই রকম আদর্শ জীবন-প্রকৃতি (model) প্রচারে যতটা পরম সত্য বলে মনে হয় বাস্তবে তা একেবারেই নয়।

ভীম বলছেন যে, কোন বিশুদ্ধ ধর্মাত্মা রাজা কখনও ঐশ্বর্য, সম্পদ বা রাজত্ব জয় করতে পারেন নি। শঠতার সাহায্যে দেবতারাও তাঁদের অগ্রজ অসুরদের পরাজিত করেছিলেন। পৃথিবী বলবানের। বপনের সময়ে যেমন শস্যের আশায় বীজ ত্যাগ করা হয় তেমনই উৎকৃষ্ট সম্পত্তির জন্য অর্থত্যাগ করা যেতে পারে। অর্থের বিনিয়োগের ফলে যদি সমহারে ক্ষতি হয়, লাভ না হয়, তাহলে অর্থবিনিয়োগ অনুচিত। এটাকে কু-

বিনিয়োগ বলা হয়েছে (মহাভারতের ভাষায়—থরকণ্ডুয়িত, চুলকে ঘা করা : (আরণ্যক ৩৪.৬৪)।

অল্প বিনিয়োগে অধিকতর লাভ এই শাশ্বত বাণিজ্যিক নীতির আদর্শে ভীম বলছেন যে, ঠিক এই ভাবেই অল্প কিছু ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ ধর্ম অর্জন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভীম যা বলতে চেয়েছেন তা এই যে অল্প কিছু নীতি বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ সম্পত্তি অর্জন করাই শ্রেয়।

ভীম বলছেন যে, জমি দখল করতে গিয়ে রাজা যতটুকু পাপ করেন তা সবই বহু দক্ষিণা-দান করে যজ্ঞ করলেই খণ্ডন করা যায়। অন্ধকার থেকে চন্দ্র যেমন মুক্তিলাভ করেন তেমনই ব্রাহ্মণদের গ্রাম আর সহস্র সহস্র গরুদান করে পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় (আরণ্যক ৩৪)। সম্পত্তিলাভের ব্যাপারে পাপের আশঙ্কা অতি তুচ্ছ এবং সম্পত্তি সঞ্চয়ের পাপ যজ্ঞে অর্থের বিনিময়ে দূর করা যায়। এই মনোভাবের একটিই কারণ থাকতে পারে। পাপ-পুণ্য, যাগ-যজ্ঞ সম্পত্তির কাছে গৌণ। একথা সত্য যে আনুষ্ঠানিক বৈদিক যজ্ঞ মহাভারতের কালে প্রায় অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। যজ্ঞের বিষয়ে অসীম অজ্ঞতার পরিচয় মহাভারতে বহু জায়গায় আছে (দ্র. **Winternitz : History of Indian Literature, Vol 1. p. 319)**। তবুও যজ্ঞ, পাপ প্রভৃতি ধারণার প্রতি অবজ্ঞা যতটা ভীম এখানে প্রকাশ করেছেন ততটা আর কোথাও নেই। এই অবজ্ঞার কারণ এই নয় যে ভীম নাস্তিক বা যজ্ঞবিরোধী ছিলেন। সম্পত্তির সামাজিক প্রাধান্যের ফলে একদিকে যেমন পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে নতুন সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে প্রাচীন আনুষ্ঠানিক ধর্মের (যজ্ঞ) মূল্যহানি হয়েছে। তত্ত্বে যজ্ঞ যত মহানই হোক সম্পত্তি অর্জনের বেলায় তাকে কোনভাবেই বাধা সৃষ্টি করতে দেওয়া চলতে পারে না।

ভীম আরও বলছেন যে, সম্পত্তি উদ্ধারে সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করা অসমীচীন। ফেনের মতো ক্ষণস্থায়ী জীবন। তাই দীর্ঘ তের বছর প্রতীক্ষা করা অর্থহীন। ভীম বলছেন যে, বনবাসের এক-একটা মাস এক-একটা বছরের প্রতিনিধিত্ব করুক, যেমন সোমলতার পরিবর্তে যাজ্ঞিকেরা পূতিক লতায় যজ্ঞে কাজ চালান। এই চুক্তি ভঙ্গের ফলে যদি কোন পাপ হয় তাহলে কোন গুরুভারবাহী ভদ্রগোছের একটা ষাঁড়কে ভাল করে খাইয়ে পাপমোচন করা যেতে পারে (আরণ্যক ৩৬)।

এবার সম্পত্তি সম্বন্ধে 'চিরনিস্পৃহ' যুধিষ্ঠির অকপটে স্বীকার করলেন যে, দুর্যোধনের কাছ থেকে তিনি রাজ্য ও সার্বভৌমত্ব হরণ করার উদ্দেশ্যেই অক্ষক্রীড়ায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ধূর্ত, শঠ শকুনি তাঁকে পরাস্ত করেছেন। তবে রাজ্যের জন্য তিনি চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবেন না, সুদিনের প্রতীক্ষা করাই কর্তব্য। কোন ধর্মযুক্তির বা বিশুদ্ধ আদর্শের আশ্রয় গ্রহণ না করে যুধিষ্ঠির আরও যা বলছেন তা বিচক্ষণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিকের মতো কথা। যুধিষ্ঠির বলেন যে, কেবলমাত্র দুঃসাহসের বশে পাপকর্ম করলে কষ্ট পেতে হবে। মন্ত্রণা করে সুবিচারের সঙ্গে সুষ্ঠু কাজ করলে স্বার্থসিদ্ধি হয়। চাপল্য ও নিজ বলদর্পে ভীম যা কর্তব্য বলে মনে করছেন তা যথাযোগ্য নয়। কৌরবপক্ষে আছেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধনের ভাইদের মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা। তাঁদের সঙ্গে আছেন পাণ্ডব কর্তৃক পূর্বে নিগৃহীত হয়েছেন এমন সব রাজারা। এই সব রাজারা তাঁদের পূর্ণ অর্থভাণ্ডার রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। যদিও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষকে সমানভাবে দেখেন, তবুও তাঁরা রাজার অন্নে প্রতিপালিত হয়েছেন বলেই সেই রাজঅন্নের পরিশোধ করতে বাধ্য হবেন (স্মরণীয় ভীষ্মের স্বীকারোক্তি : মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়)। এই সব যোদ্ধাদের পরাস্ত না করে দুর্যোধনকে বধ করা অসম্ভব (আরণ্যক ৩৫ ; ৩৭)।

আধুনিক চিন্তায় অতি বিস্ময়কর মনে হয় যে, সম্পত্তিহানি ও পুনরুদ্ধারের অতি বাস্তব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও নীতিতত্ত্বের এত কোলাহল কেন? মহাভারতে দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়রা কি যুদ্ধবিদ্যা পরিত্যাগ করে আধুনিক কালের বেকার তাত্ত্বিকদের মতো বাক্সর্বস্ব হয়ে পড়েছিলেন। বলপ্রয়োগে যাঁরা নিজেদের ভূসম্পত্তি বজায় রাখতেন তাঁদের ধর্ম ও নীতির তত্ত্বে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কথা নয়। ছিলেনও না সম্ভবত।

এককালে এই জনপ্রিয় ক্ষত্রিয় কাহিনী অন্য আর এক শ্রেণীর লেখকদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। মহাভারতের সমস্ত ঘটনা এবং অসম্পর্কিত ঘটনা যা মহাভারতে স্থান পেয়েছে তা এক বিশেষ তত্ত্বের আলোকে দেখার চেষ্টা হয়েছে। পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের সহাবস্থান আছে মহাভারতে। তত্ত্বের অসংযত স্রোতে অনেক সময়ে বহু সামাজিক তথ্য, জীবনযাত্রার কাহিনী—বিশেষ করে সমাজের নিম্নস্তরের লোকেদের—ভেসে গেছে চিরকালের মতো। তবুও প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গভাবে এমন অনেক উক্তি, ঘটনা

মহাভারতে রয়ে গেছে যার ফলে আমরা সেই অতীতকালকে আরও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পাই।

মহাভারতে যাঁরা আচরণবিধি এবং নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, নিজেদের মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরাই মহাভারতের শেষ লেখক। এই লেখকেরা কে, কিই বা তাঁদের পরিচয়? এর সম্যক্ উত্তর দেওয়া আজ সম্ভব নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভৃগুবংশ নিজ পারিবারিক মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে মহাভারতে ভৃগু-প্রশস্তি নিবদ্ধ করেছেন (দ্র. Sukthankar: Epic Studies VI, Critical Studies in the Mahabharata, Poona 278-307)। ভৃগু বংশ ছাড়া আরও বহু অজ্ঞাত-পরিচয় ব্রাহ্মণ লেখকেরা শ্রেণী হিসাবে ব্রাহ্মণদের কেতাবি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এটা কেতাবি প্রাধান্য এই জন্য যে, মহাভারতের পরিবর্তনশীল ও পরিবর্তিত যুগেও সম্পত্তির মালিকানা ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে। মহাভারতেও তাই বলা হয়েছে, সব ক্ষমতার উৎস সম্পত্তি (স্মরণীয় ভীমের বক্তব্য: ধর্ম অর্থনির্ভর) আর সম্পত্তির মালিক ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়। তাই দেখা যায় যে, শুধু মাত্র অর্থনৈতিক কারণেই নয়, রাজনৈতিক কারণেও বাস্তবে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের উপর নির্ভরশীল। জীবিকার জন্য তাঁদের নির্ভরতার কথা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা আকুলভাবে কামনা করেছেন সম্পত্তির মালিকদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ। শুধুমাত্র শাস্ত্রে পারদর্শিতার ফলেই ব্রাহ্মণেরা শ্রেণী হিসাবে সমাজে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য পান নি। যজনযাজনে বৃত্তি নির্বাহ হয় না। প্রয়োজন নতুন পেশাদারি জ্ঞান: যুদ্ধবিগ্রহ তত্ত্বে, দৌত্যে ও কূটনীতিতে পারদর্শিতা। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের অধীনে পুরোহিতের পদ প্রার্থনা করছেন। এই পদের সঙ্গে যজনযাজনের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। পদটি প্রায় পুরোপুরি রাজনৈতিক।

বক দাল্‌ভ্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিচ্ছেন: বায়ু ও অগ্নি যেমন অরণ্যদাহ করে তেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর মিলিতভাবে শত্রুকুল দগ্ধ করতে পারেন। পৃথিবী ও পরলোক জয় করার বাসনা থাকলে ব্রাহ্মণের সঙ্গ অপরিহার্য। ধর্ম ও অর্থে নিপুণ, মোহশূন্য কোন ব্রাহ্মণ সঙ্গী হলে রাজা শত্রুকুল নির্মূল করতে পারেন। ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে অসুররাজ বলি অক্ষয় সম্পদ ও অনন্ত সুখ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কুব্যবহারের ফলে বলি সবই হারিয়েছিলেন।

ঐশ্বর্যময়ী এই পৃথিবী ব্রাহ্মণসঙ্গহীন ক্ষত্রিয়কে দীর্ঘদিন সেবা করে না। মাহুতের অঙ্কুশ প্রহার ছাড়া যেমন যুদ্ধহস্তী বিহ্বল হয়ে পড়ে ব্রাহ্মণ-সঙ্গহীন ক্ষত্রিয়ও তেমন। অলব্ধ সম্পদ অর্জন এবং লব্ধ সম্পদের বৃদ্ধির জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত ব্রাহ্মণের পরামর্শ গ্রহণ করা। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের উচিত কোন যশস্বী, বেদবিদ্, পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে সঙ্গী করা (আরণ্যক ২৭.১০-২০)। গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ অর্জুনকে একই উপদেশ দিচ্ছেন (আদি ১৫৯)। ব্রাহ্মণদের বিদ্যাবত্তা ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার উপর ক্ষত্রিয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এখানে।

ক্ষত্রিয় রাজাকে ব্রাহ্মণ শাস্তি দিতে পারেন কি ? কাহিনীতে আছে শৃঙ্গী নামে এক রুষ্টস্বভাব ব্রাহ্মণ যুবক তাঁর পিতার গলায় সাপ ঝুলিয়ে দেওয়ার অপরাধে রাজা পরিক্ষিৎকে মৃত্যু অভিশাপ দেন। শৃঙ্গীর পিতা শমীক যা বলেছেন তা স্মরণীয়। শমীক শৃঙ্গীকে বলেছেন : 'তুমি আমার প্রিয় কাজ করো নি। এটা ধর্ম নয়। রাজার এলাকায় আমরা বাস করি, ন্যায়ত তিনি আমাদের রক্ষা করেন। রাজার শাস্তি পাওয়া মোটেই কাম্য নয়। রাজা যদি আমাদের রক্ষা না করেন তাহলে আমরা ঘোর বিপদে পড়ব ; আমরা ধর্ম আচরণ করতে পারব না। রাজা শাস্ত্রানুসারে রক্ষা করেন বলেই আমরা যথাসুখে বিরাট ধর্ম আচরণ করি। এই ধর্মে, ধর্মত, রাজারও অংশ আছে' (আদি ৩৬.২০-২৭)।

এইভাবে মহাভারতে কাহিনীর পর কাহিনী ধীরে ধীরে সংযোজিত হয়েছে। আর সেই কাহিনীর সঙ্গে কখনও প্রচ্ছন্নভাবে কখনও প্রকাশ্যে নিজেদের চিন্তাধারাও প্রকাশ করা হয়েছে। একথা বললে বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে, মহাভারতের সম্পাদক-লেখকরা সবাই ব্রাহ্মণ, যাঁরা স্বকীয় ধারণা, নীতি অন্যদের ধারণা ও নীতির উপর আরোপ করেছেন। এইজন্যই বোধ হয় মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলা হয়েছে, যাতে মহাভারতের বক্তব্য বেদের মতো স্বীকৃত ও পূজিত হয়।

এই লেখকেরা নিজেদের মতবাদ কী ভাবে জুড়ে দেন সুযোগ বুঝে তার একটা উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ এখানে শেষ করছি।

পাণ্ডু কুন্তীকে বলেছেন যে, ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী যে ছ-রকম পুত্র সম্পত্তির অংশীদার (বন্ধু দায়াদ) বলে স্বীকৃত, তার মধ্যে কানীন পুত্র অন্যতম (আদি ১১১.২৭-২৮)। কর্ণকে কৃষ্ণ এই কথাই বলছেন : কুমারীর পুত্র বিবাহের পূর্বে (কানীন) বা পরে (সহোঢ়) জন্মগ্রহণ করলেও সে মায়ের বিবাহিত

নন, আজকের দিনে দুর্লভ, নিরভিমান একনিষ্ঠ-শিল্পীও বটে।

জন্ম ১৯১৭ সালে দেশের পূর্বপ্রান্তে এবং শিক্ষা কলকাতার সরকারি শিল্পবিদ্যায়তনে, কিন্তু কর্মসূত্রে এবং স্থায়ীভাবেই শিল্পী দিল্লীর বাসিন্দা। একদা বিজ্ঞাপনকর্ম এবং পরে শিল্পশিক্ষাদানে তিনি রত হন। সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ক-বছর সফলতার সঙ্গে কাজ করার পর সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কি গোড়াকার পর্বে, কি অবসরান্তে, ছবি আঁকায়, অর্থাৎ সৃষ্টিধর্মি কলাকুশলতায় কখনও তাঁর ছেদ পড়ে নি। মন তাঁর নিত্যই কর্মমুখর—অবসর জানে না।

বিমল দাশগুপ্ত রসিকমহলে প্রথম পরিচিত হন তাঁর জলরঙে করা কাজের মারফৎ। সে পর্বে মুখ্যত তিনি এঁকেছেন নিসর্গদৃশ্য। বনভূমি-প্রান্তর-পর্বত আঁকার পর আকৃষ্ট হন সমুদ্র ও সৈকতের প্রতি। সেসব ছবিতে কখনও বা বিরাট নীলাম্বুরাশি, কখনও নৌকা, বালুবেলা ও জনমানব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমুদ্রদৃশ্যের এক ছবিতেই (দ্য ব্লু ইনফিনিটি) লাভ করেন তিনি ললিতকলা আকাদমীপ্রদত্ত সর্বভারতীয় সম্মান। এ ১৯৫৬ সালের ঘটনা।

এরই কাছাকাছি সময়ে শিল্পীকে টেম্পেরা-গোয়াস পদ্ধতিতেও কাজে রত দেখা গেল। মাধ্যম ভিন্ন, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তু পরিচিত। এক্ষেত্রেও নদীনালা, গাছপালা, বিশেষত সুদূর দক্ষিণের নারিকেলবন, ব্যাকওয়াটার ইত্যাদি নানাদৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। কিছুটা বা মাধ্যমগত কারণে এবং মুখ্যত নবলব্ধ আত্মবিশ্বাসের দরুন ছবিতে রূপবন্ধ বা কম্পোজিসন আরও দৃঢ়বদ্ধ চেহারায় ফুটে উঠল। এর পর তেল রঙের প্রতি তাঁর দৃষ্টি গেল। হয়তো বা কখনও-কখনও ফিরেছেন পূর্বতন মাধ্যমে, কিন্তু মোটামুটি বলা যায় এই পরিবর্তন শিল্পীজীবনের একটা দিকচিহ্ন হয়ে রইল। আর, জলরঙে যখন শিল্পী পূর্ণপরিণত, তখনই যেন মনে হল তিনি দৃষ্টি ফেরালেন তেলরঙের প্রতি।

এই তেলরঙ মাধ্যমে শুধু বক্তব্যের নয়, কাজের চেহারায়ও শুরু হল রূপান্তর। নিসর্গদৃশ্য থাকলেও তা নেহাৎ ফটোগ্রাফিক চেহারায় উপস্থিত হল না। আরম্ভ হল ভাঙচুর। সরলীকরণের চেহারা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠল। এ-যেন চেনা থেকে অচেনার দিকে পদক্ষেপ। মূর্ত ছেড়ে বিমূর্ততা অভিমুখে যাত্রা। শিল্পী ষাটের দশকের গোড়ায় য়ুরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ এবং ছবির প্রদর্শনী করার সুযোগ পান। তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বোধহয় তাঁর নানা গ্যালারি এবং পশ্চিমী দেশের নতুন ধরনের নানা কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বা বিমূর্ত

শিল্পধারা বা সেভাবেই প্রভাবিত করেছিল শিল্পীকে। সে সময়কার কোনো কোনো কাজে খণ্ড বা স্তরবিভাজন এবং খানিকটা জ্যামিতিক ছাপ মেলে। কিন্তু নিতান্তই সাময়িক ছিল মনে হয় এ-পর্ব। কারণ এ-ধরনের কাজ পরে তাঁকে আর করতে দেখা যায় নি।

তেলরঙের কাজে মজা পেলেন শিল্পী, যেন নতুন খেলা। এই মাধ্যমের সঙ্গে সুদীর্ঘ যোগ তা-ই প্রতিপন্ন করে। প্রকাশে-বক্তব্যেও সুপরিণত ছাপ। সরলীকরণ তথা বিমূর্ততার প্রতি ঝোঁকের সঙ্গে তার আরেক কুশলতার পরিচয় পাওয়া গেল। সেটা বর্ণাবলেপের। রৈখিক ব্যঞ্জনার ক্ষমতা ততদিনে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ক্রমে ক্যানভাসে পরিলক্ষিত হল বর্ণিকা-ভঙ্গের সুসমঞ্জস প্রতিভাস, রঙের সিম্ফনি বা সুরছন্দ। আবার কেবল রঙ নয়, ছবিতে এল প্রতীকি আভাষ—কখনও ফুলের কোরক, কখনও তন্ত্র-অনুগামী কোনো চিহ্ন।

ছবি শিল্পীর অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির বাইরের কিছু নয়; তা হওয়া কঠিন। তাঁর মনের অবচেতনের অন্তস্তল থেকে বহু কিছুই বেরিয়ে আসে রেখায়-রঙে। খুবই নিবিড় যোগ তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে। মনের গভীরে লুকানো ফুল, ফল, গাছপালা, ভূপৃষ্ঠ থেকে সমুদ্রতলের অনেক কিছু সুস্পষ্ট না হলেও আবছা চেহারায় এসে ধরা দেয়। শিল্পীর সাম্প্রতিক সিরিজে এ-সত্য পুরোপুরি প্রতিফলিত। তাঁরই কথায়: 'প্রকৃতির দিকে উন্মুখ নয়নে তাকায় মানুষ। আমার স্মৃতিতে-গাঁথা নানা দৃশ্য রঙের হালকা পোঁচ গায়ে মেখে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। কখনও বা তা জ্বল্ জ্বল্ করছে গাম্ভীর্যময় চেহারায়। প্রকৃতির রঙদারিও বহুবিচিত্র, প্রায় অবিশ্বাস্য ধরনের। আমার কারিগরি দক্ষতা সম্বল করে রেখায়, তুলির আঁচড়ে কখনও মসৃণ-কর্কশ বুনোট, কখনও বর্ণালী নানা আস্তরণের ভেতর দিয়ে সেই সব স্মৃতি-বিজড়িত মুহূর্তগুলো প্রকাশ করতে চেয়েছি।'

ইদানীং জল বা সমুদ্রতল নিয়ে তাঁর যে কারবার, বোধগম্য কারণেই সেসব ছবিতে নীল এবং ধূসরবর্ণ প্রাধান্য পেয়েছে। রূপবন্ধে জলতলের গাছগাছালি, প্রবালপুঞ্জের আভাষ। থেকে থেকে অনেক কিছু বেরিয়ে আসতে চাইছে হালকা এক আস্তরণ বা পর্দা ভেদ করে। রঙের এই স্তরবিভাজনে নিশ্চয়ই পাকা হাতের পরিচয় মেলে। সবই কিন্তু সুন্দরের প্রতিভাস নয়। জলতলের স্তব্ধতা, অন্ধকার আর ছম্‌ছমে রহস্যময়তাও সময় সময় উপজীব্য। এসেছে ছবিতে করাল দংষ্ট্রাবিস্তার করে অদ্ভুত, ভয়াল, ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক জীব কিংবা

যাছ। কল্পনার ব্যাপার ; শিল্পীর মনে হয়েছে আভাসই যথেষ্ট। কোনো অবস্থাতেই শিল্পী নিতান্ত ফটোগ্রাফিক রিয়ালিজমের ধার ধারেন নি।

এই স্মৃতির গহীন বা অচেতন প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আকাশযাত্রার সুযোগ-সত্ত্বেও শিল্পী বিদেশগমন করেছিলেন সমুদ্রপথে এবং স্বেচ্ছায়। সাগর বা মরুর অদম্য আকর্ষণ তার কাছে। নানা চেহারায়, নানা মুডের সমুদ্র জুড়ে ছিল বা রয়েছে তার কল্পনায়। প্রদর্শনীতে তাই প্রশ্নের মুখোমুখী হন শিল্পী : তুমি কি ডুবুরী? এক নেভাল অফিসার তাঁর ছবি দেখে বলেছিলেন, সমুদ্রে জীবন কাটিয়ে আমরা যা দেখি নি, তুমি আমাদের তা-ই দেখালে। আবার প্রদর্শনী হলে আসব তোমার ছবি দেখতে।

বলা চলে শিল্পীর বিশেষ বাহাদুরি রঙের ব্যবহারে। হালকা রঙের প্রয়োজনই বেশি, কিন্তু প্রয়োজনে চড়াও বাদ যায় না। পরিপূরক রঙ বা সীমিত রঙের ব্যবহারেও যথাযথ এফেক্টের অপ্রতুলতা নেই। বর্ণবিন্যাসে এঁর জুড়ি মেলা ভার। বিনা দ্বিধায় শিল্পীকে আমাদের অন্যতম সেরা কলারিস্ট বা রঙের কবি ও যাদুকর বলে আখ্যাত করব।

বিমল দাশগুপ্ত সব মিলিয়ে অক্লান্ত কর্মী। চিন্তায়, পরীক্ষায়, প্রকাশে তাঁর ক্ষান্তি নেই। দেশ-বিদেশে ছবি প্রদর্শন করেছেন। ডাক পেয়েছেন আন্তর্জাতিক আসরে। পুরস্কার-সম্মানও অপ্রাপ্ত থাকে নি। লণ্ডনের স্টেট গ্যালারির এক অধিকর্তা শিল্পীর জলরঙা কাজ উচ্চ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বলে মন্তব্য করেছিলেন। আর একবার সুবিখ্যাত আলোচক এরিক নিউটন ন্যাশনাল গ্যালারির সংগ্রহভুক্ত কাজের অন্যতম তিনটি বলে যা বাছাই করেছিলেন, তাতে ছিল দুটি আমাদের শিল্পীর ও একটি হুসেনের ছবি। তবে তুলনায় যথাযোগ্যভাবে শিল্পী আলোচিত হন নি। আশা করা যায় তাঁর সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও আলোচনা বৃদ্ধি পাবে, বিশেষত যখন যাত্রা-অন্বেষণে শিল্পীর ছেদ পড়ে নি।

ঘুরে বেড়ানো দেখে যাওয়া যেন একটা নেশা। কারুর ভালো কিছু দেখলে স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে তারিফ করেন শিল্পী। প্রশংসায় তিনি অকৃপণ। হঠাৎ আবিষ্কার করলেন এক বন্ধুর ছোট একটি বাগান। ঘাসে-গাছে-লতায়-পাতায় ঘেরা এক টুকরো রূপময় জগৎ। বলে উঠলেন তিনি, নিজেকে শিল্পী বলে মনে করতাম এতদিন। এখন দেখছি আমার চেয়েও বড শিল্পী তুমি।

বিমল দাশগুপ্ত যথার্থই অহঙ্কারবর্জিত, খাঁটি রূপ-সন্ধানী শিল্পী।

২.

অচ্যুৎ রামচন্দ্রন

'আজ আমি ছবি আঁকি, মূর্তি গড়ি, কিন্তু এ নিয়েই জীবন কাটবে, সেকথা নিজেও ভাবি নি। স্নাতকোত্তর পাঠের শেষে গান-বাজনার দিকে ভিড়েছিলাম। নিয়মিত গানের প্রোগ্রাম করেছি রেডিওতে। সঙ্গীতশিল্পীই হতে চলেছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল, রং-তুলির ব্যাপারটা শিখলে কেমন হয়? মাদ্রাজে পাণিক্কর সাহেব তখন আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ওখানকার কথা যখন ঘুরছে মাথায়, তখন হঠাৎ শান্তিনিকেতনের গল্প শুনি পরিচিত এক মহিলার কাছে। উনি ছিলেন সেখানে, আর পরামর্শ দিলেন সেখানেই যাবার জন্য। শেষ অবধি গেলাম এবং চিত্র-ভাস্কর্য দুই-ই শিখলাম। মোড়ই ঘুরে গেল জীবনের। সেকথা নিজেই অবাক হয়ে ভাবি।' শিল্পী অচ্যুৎ রামচন্দ্রন বলছিলেন তাঁর নিজের কথা।

আজকের দিনে বিশেষত কিউবিজমের সূত্রপাত থেকেই যখন ফর্মের ভাঙচুর আর বিমূর্ততার লক্ষণ সুপরিস্ফুট, তখন অনেকের আশঙ্কা হয়েছিল যে, এবারে ছবিতে মনুষ্যমূর্তি বা আকৃতির অবলুপ্তির দিন এল। আবার একেবারে তা নিশ্চিহ্নই বা হয় কেমন করে? প্রথম যুদ্ধোত্তরকালেও জার্মান এক্সপ্রেসনিস্টরা যুগের হতাশা-আর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের কাজে মনুষ্যমূর্তি উপজীব্য করেই। ক্রমে আসরে পাওয়া গেছে ফ্রান্সিস বেকন বা আরও বহুজনকে। এদেশেও সাম্প্রতিককালে তায়েব মেহতা, প্রকাশ কর্মকার বা যতীন দাসের তুলিতে কখনও দণ্ডায়মান, গতিশীল, কখনও বা দুমড়ানো-মোচড়ানো চেহারায় মানুষ রূপায়িত হয়েছে। শিল্পী রামচন্দ্রনও এই দলেই। শিল্পী এ-সত্ত্বেও অনেকখানি ভিন্ন। মুখ্যত তাঁর আস্থা ছবির বৃহদায়তনে। ভিন্নতা তাঁর রূপবন্ধের জটিলতায়, ভাষায় ও বক্তব্যে।

রামচন্দ্রনের জন্ম কেরলায় ১৯৩৫ সালে। ছোটবেলায় ছবির প্রতি ঝোঁক ছিল। ছুটিতে, অবসর সময়ে চেষ্টা করেছেন আঁকার। তবে সেসব খুবই মামুলি ব্যাপার। তাঁর শান্তিনিকেতন গমন এবং রামকিঙ্কর-সান্নিধ্য, কর্মে ও চিন্তায় তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে উত্তর-জীবনে। ছবি আঁকার সঙ্গে ভাস্কর্যকর্মও করেছেন। কিন্তু দিনের পর দিন সাঁওতাল পল্লীতে গিয়ে স্কেচ করে পেয়েছেন বিশেষ আত্মপ্রত্যয়। কলমে-তুলিতে অবলীলায় কোনো অবয়বী ছবি ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে তিনি স্বচ্ছন্দ, আড়ষ্টতার

বালাই নেই। সঙ্গে রয়েছে আশৈশব পরিচিত ভিত্তিচিত্র। এই অভিজ্ঞতা রূপবন্ধের ব্যাপারে জুগিয়েছে তাঁকে প্রেরণা। আর কাছাকাছি বা অন্তরঙ্গ-পরিচয়ের বিষয়টা তাঁকে ভিত্তিচিত্র রচনায় এবং সে কাজকে স্বকীয়তামণ্ডিত করতে সাহায্য করেছে। আর প্রভাবিত হয়েছেন তিনি একদা শান্তিনিকেতনবাসী শিল্পী কিরণ সিংহ, বিশেষত এঁর চিন্তা ও জীবনাদর্শ দ্বারা।

একাগ্রতা বা কারিগরি দক্ষতাই সব নয়। সৃষ্টিকে রসোত্তীর্ণ করার জন্য প্রয়োজন মননের। শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ এবং ভাবনা-আশ্রিত উপস্থাপনা সে-সবের অন্যতম। সে হিসাবেও, অর্থাৎ চিন্তা ও প্রকাশেও বিশিষ্টতার দাবি রয়েছে রামচন্দ্রের। রেনেসাঁ আমলের শিল্পীদের মতই তাঁরও ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। মাংসল, পেশীবহুল সব চেহারা সময় সময় মিকেল এঞ্জেলো বা আরও অনেককে স্মরণ করায়, কিন্তু বিসাদৃশ্যও নিশ্চয়ই রয়েছে। নান্দনিক প্রতিবেদনই চরম কথা নয়, তাঁর চোখে পেশল শরীর কখনও কখনও দলা-পাকানো মাংসপিণ্ড। অথবা সুপ্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় মাস্টারদের অনুসরণে-কৃত ছবিতে আমাদের শিল্পীকে দেখি অন্য সুরে তার বেঁধেছেন। যেমন দ্য লাস্ট সাপারে, তাঁর কাছে মুখ-চোখের চেয়ে হাত বা পায়েই যেন বিশেষ বক্তব্য বিধৃত। তেমনই, তাঁর করা দ্য এনাটমী লেসনে শল্যবিদ-শিক্ষকের ব্যাখ্যা নয়, পরিচিতি কোনো রাজনৈতিক নেতার মহান প্রচারকর্মরত চেহারাটাই বড হয়ে উঠেছে। সমান্তরাল ভাবনা অথবা পুর্বানুবৃত্তির ধারণাও ছুঁয়ে গেছে সময় সময়। দেখি, জার্মান শিল্পীরসের বাইবেল ভিত্তিক স্বর্গ-নরক কাহিনীর অনুকরণে এই শিল্পী এঁকেছেন মহাভারতের এক কাহিনী। সে ছবিতে রূপায়িত হয়েছে যদু বংশের ধ্বংস-কথা। শরীরীদের গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি ভিড়। সবাই যেন শূন্যে ভাসমান। আগুনের হলকার আভাস এদিক-ওদিক। মানুষও সব নয় চেহারায়, অন্তত মুখাকৃতিতে। বহু ক্ষেত্রেই জন্তু-জানোয়ারের মুখের আদল। কেরিকেচার যেন। আবার হাত-পা অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথেষ্ট বাস্তবানুগ হলেও, আগুনের প্রতিভাস তিব্বতীয় তঙ্কার ধরনের, অর্থাৎ বলা চলে বহুলাংশে স্টাইলাইজড্। দুমড়ানো-কুঁচকানো বহু চেহারায় যেমন একদিকে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি, আবার অন্যদল যেন দুঃখ-যন্ত্রণা রহিত। তারা সব বিস্ময়ে হতবাক। সূর্য বা অগ্নিবলয়ে ধাক্কা খাচ্ছে কেউ কেউ। সমগ্রভাবে বীভৎসতাই প্রকট। এই বিয়োগান্তিক চিন্তাই প্রকাশ পেয়েছে আরেকভাবে। সে-যন্ত্রণা মুখাত
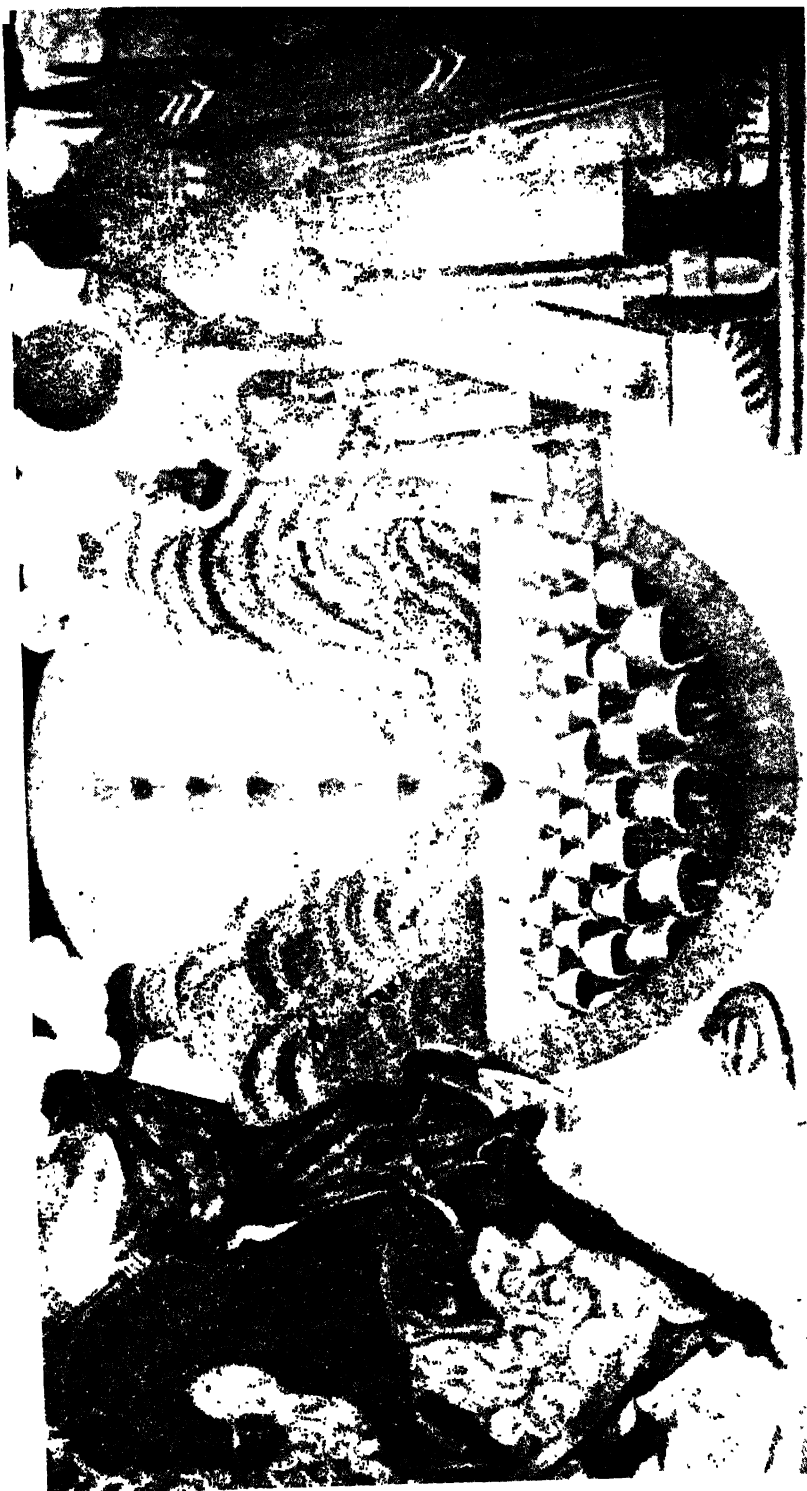
বিমল দাশগুপ্তের সাম্প্রতিক সিরিজের একটি ছবি

বেদনাজাত এবং বিশ্বজনীনও বটে। বিষয়বস্তু এবং প্রেরণা সে সব ছবিতে চিরকালীন খৃস্টকাহিনী।

সব ছবি তা বলে কল্প-কাহিনী বা পরিচিত অর্ধপরিচিত কথা-গাথার ব্যাপার নয়। আশেপাশের দেখাজানা জীবন, বা নানা সময়ের নানা অভিজ্ঞতাও রূপ পেয়েছে অনেক কাজে। আর মুভিং বডিস্ বা চলমান শারীরী-বৃত্ত এসবের অন্যতম। আপাত দৃশ্যমান হাত-পায়ের টুকরো। কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু শিল্পীর ব্যাখ্যায় একতারা হাতে সঙ্গীত ও নৃত্যরত বাউলেই নানা ভঙ্গির প্রকাশ রয়েছে এতে। চিন্তা অন্য খাতে প্রবহমান শিল্পীর কালীপূজা ছবিতে। স্কন্ধকাটা মূর্তি সব ছবি জুড়ে। মাঝে দেখা যাচ্ছে একটা হাড়ি-কাঠ। দেহধারী মুণ্ডহীন এক মানুষ গলা দিয়েছে তাতে। বুঝতে কষ্ট হয় না গ্রাম বাংলার এক চিরাচরিত দৃশ্য শিল্পীর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। কালীপূজার বাহ্যিক আড়ম্বর ও হৈচৈ-এর পথ বেয়ে শিল্পীর ভাবনা পৌঁছে গেছে ভিন্ন চিন্তালোকে। মানুষ সেখানে অদৃশ্য নিয়তির হাতের পুতুল। বলি তখন আদিম জীবনযাত্রাভুক্ত এক পবিত্রানুষ্ঠান। আবার যে বলি হবে তার ধারণাই নেই যে অমোঘ নিয়তির কোপ নেমে আসছে তারই ওপর! রঙের খুবই সীমিত ব্যবহার। মুখ্যত লাল, খানিকটা হলদে আর বাকিটা কালোয় ফুটে উঠেছে। সব মিলিয়ে যেন এক আদিম শিহরিত চেহারা।

ভিত্তিচিত্র সম্পর্কে শিল্পীর উৎসাহের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এ-পর্যায়ের কাজের ও পরীক্ষার মধ্যে জন্মশতবর্ষে দিল্লীতে গান্ধীদর্শনের জন্য করা কটি প্যানেল বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। প্রধান বক্তব্য, হিংসা অন্তেই অহিংসা। দ্বেষ, ঈর্ষা—পরিণামে বিরোধ ও যুদ্ধ এবং তারই পাশাপাশি শান্তি ও অমৃতবাণীর আভাষ। চড়া লাল, হলদে এবং শাদায়-কালোয় ফুটেছে বক্তব্য। ভিত্তিচিত্র সম্পর্কে শিল্পীর মনে বিশেষ ধারণা বিদ্যমান। এই সব কাজ হবে একটা নিয়মানুসারী। যেমন, অবস্থিতি হবে এর স্থাপত্য অনুগামী। বক্তব্য, সহজ, সরল। শিল্পভাষা সাধারণের বোধগম্য হতে হবে। আর বক্তব্য একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে হবে বিকেন্দ্রিত। অর্থাৎ, দর্শক এগিয়ে যাবে ধাপে ধাপে। তবেই সহজ হবে তার পক্ষে বক্তব্যের যথাযথ অনুসরণ।

বড় আকারের এবং বড়দের জন্যও বটে, ছবি আঁকা ও ভাবনা-প্রকাশের সঙ্গে ছোটদের কথাও আসে শিল্পীর মনে। তাই লেখেন

আপন ভাষায়, অলঙ্করণ করেন স্বীয়মতে—হনুমানের বা আরও অন্য সব গল্প। সুখের কথা, গোড়াতেই এগিয়ে আসেন বিদেশী প্রকাশক। জাপানে প্রকাশ হওয়ার পর সংযুক্ত রাজ্যেও প্রকাশিত হয় তাঁর বই। বলা বাহুল্য সবই উচ্চপ্রশংসিত। আবার নিয়মের পঠন-পাঠনেও বিরতি নেই। গত বছর-পনেরো যাবৎ শিল্পী দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায় শিল্পশিক্ষাদানে রত।

সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ শিল্পীর ড্রইং-য়ে। সময়ে সময়ে তা বর্ণরঞ্জিত হয়ে ওঠে। এভাবেই পাওয়া গেছে তাঁর নিউক্লিয়ার রাগিণী সিরিজ। এর প্রেরণা রাজস্থানী মিনিয়েচার আর রূপায়িত হয়েছিল কাজগুলো পোখরণে আনবিক বিস্ফোরণের পরে। তাই এ-ধরনের নামকরণ। নায়িকা অভিজাত-তনয়া, অর্থাৎ রাজকন্যা বা সুসজ্জিতা রমণী কেউ নয়, নেহাৎই গ্রাম্য কৃষকবালা। আবার সাধারণ মানুষ তাদের অদৃশ্য-সুতোয়-বাঁধা পুতুলের চেহারায় ফুটে উঠেছে শিল্পীর সাম্প্রতিক প্যাপেট সিরিজে। প্রতিবেশী কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদই কিংবা শোষক-শোষণ কথাই এসবে প্রতিফলিত। রাজনৈতিক আশ্লেষও যথেষ্ট সোচ্চার। তাই, বিশেষত শেষোক্ত ধরনের কাজ থেকে বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে শিল্পী বিশ্বাস করেন যে, শিল্পীসৃষ্টির পিছনে কিছু বক্তব্য থাকবে। নিজেকে গজদন্ত মিনারবাসী মনে করতে তিনি নারাজ। সমাজ-সচেতন হওয়া শিল্পীর কর্তব্য বলেই তাঁর বিশ্বাস। তাই বোধহয় তাঁর রাগিণীর চেহারা ভিন্ন। প্রতিবেশী দেশে হলেও, রাজনীতির পুতুলখেলার প্রতি তাঁর কটাক্ষ। আর এ-প্রসঙ্গে তাঁর অন্যতম শিক্ষাগুরু বলে তিনি মনে করেন ডস্টয়ভস্কির মতো সাহিত্যকারকে।

শিল্পী রামচন্দ্রন ভেবেছেন, ভাবিয়েছেন অনেক। মধ্য-চল্লিশের জীবনেই অনেকখানি শুধু পথ অন্বেষণ নয়, স্বীয় বিশিষ্ট ধরনে বহুকিছু প্রকাশেও সক্ষম হয়েছেন। তাই তাঁর আগামী দিনের গতিপথ ও কাজের জন্য, সন্দেহ নেই, বহু রসিকই সাগ্রহ অপেক্ষায় থাকবেন।

সুধীর চক্রবর্তী

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত : কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী

'কঙ্কাবতী' কিংবা 'ডমরুচরিতে'র লেখক হিসাবে বিখ্যাত রসসাহিত্যিক যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম আমরা জানি, বলতে গেলে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প তাঁরই আবিষ্কার। কৃষ্ণনগরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ঘূর্ণী নামক গ্রামে একদল কুমোর নিখুঁৎ বাস্তবশৈলীর মাটির পুতুল গড়তে পারতেন। ভারতীয় যাদুঘরের সহকারী অবেক্ষক ত্রৈলোক্যনাথ (তাঁর সরকারি নাম টি. এন. মুখার্জি) ভারতের রাজস্ব ও কৃষি বিভাগে প্রদর্শনী বিভাগের মুখ্য পরিচালক ছিলেন। এই সময়ে তাঁকে ভারত ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলির জন্য শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল এবং প্রণয়ন করতে হয়েছিল ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের এক বিস্তৃত ক্যাটালগ। ফলে ১৮৮১-১৮৮৭ সালের মধ্যবর্তী কালের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্প ও শিল্পীদের সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট খবর রাখতেন। ১৮৮৩-৮৪ সালে অনুষ্ঠিত 'ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশনে'র জন্য কারুশিল্প সংগ্রহ করতে করতে তিনি উপস্থিত হন ঘূর্ণীতে এবং সংগ্রহ করেন বহু মৃৎশিল্প। কুমোরদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়ে ওঠে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাদের সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথই প্রথম লিখিত বিবরণ তৈরি করেন। ১৮৮৮ সালে তিনি জানান :

> 'Krishnagar modellers belong to the Hindu caste of Kumars, or Potters, one of the nine artisan classes of Bengal, whose rank stands just beneath the Brahmans and writers. From time immemorial the occupation of the caste has been to make earther vessels, and the figurative representations of devine manifastations described in sacred books.

এই কুমোর ও মৃৎশিল্পীরাই কালক্রমে হয়ে ওঠেন মডেলার ও বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী। ত্রৈলোক্যনাথ জানিয়েছেন :

> But it is said the modellers owe to Dr. Archer the notice which Europeans now take of their work. Krishnagar models and scenes were sent to the different International Exhibitions sine 1951, where they always forms objects of great admiration and curiosity.

কে এই ডঃ আর্চার? অনেক অনুসন্ধানেও আমি জানতে পারি নি। তবে ১৮৫১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণনগরের যে সব মৃৎশিল্পী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বারবার সম্মান ও অভিজ্ঞান পেয়েছেন তাঁদের একটি তালিকা প্রণয়ন করতে পেরেছি। বলাবাহুল্য মৃৎশিল্পীর এই সম্মান ও স্বীকৃতির পশ্চাদপটে ছিল ত্রৈলোক্যনাথের প্রত্যক্ষ-প্ররোচনা এবং সক্রিয় উদ্যোগ। কারণ ১৮৮১ সাল থেকে অনুষ্ঠিত সব কটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শন সামগ্রী পাঠাবার দায়িত্ব ছিল ত্রৈলোক্যনাথের। তাঁর রচনা থেকেই আমরা জানতে পারি উনিশ শতকের শেষার্ধের অবিস্মরণীয় মৃৎশিল্পীদের সানুপুঙ্খ বিবরণ। আপাতত প্রথমে দেখা যাক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও পুরস্কার প্রাপকের তালিকা :

	প্রদর্শনীর নাম	স্থান	সাল	পুরস্কার প্রাপকের নাম
১।	এগজিবিশন অফ দি ওয়ার্কস অফ ইণ্ডাস্ট্রি অফ অল নেশনস্	লণ্ডন	১৮৫১	শ্রীরাম পাল
২।	এক্সপোজিশন ইউনিভার্সেলে	প্যারিস	১৮৫৫	শ্রীরাম পাল
৩।	এক্সপোজিশন ইউনিভার্সেলে	প্যারিস	১৮৬৭	যদুনাথ পাল
৪।	মেলবোর্ন ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশন	মেলবোর্ন	১৮৮১	মতিলাল পাল গোপালচন্দ্র পাল যদুনাথ পাল
৫।	আমস্টারডাম এগজিবিশন	আমস্টারডাম	১৮৮৩	যদুনাথ পাল
৬।	ফরেন আর্ট ইনডাস্ট্রি	বস্টন	১৮৮৩	চন্দ্রভূষণ পাল

৭।	ইন্টারন্যাশনাল কলোনিয়াল	জার্মানি	১৮৮৩	যদুনাথ পাল
৮।	ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশন	কলকাতা	১৮৮৩	শ্রীরাম পাল মতিলাল পাল যদুনাথ পাল রাখালদাস পাল
৯।	কলোনিয়াল অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান এগজিবিশন	লণ্ডন	১৮৮৬	চন্দ্রভূষণ পাল যদুনাথ পাল রাখালদাস পাল
১০।	গ্লাসগো ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশন	গ্লাসগো	১৮৮৮	যদুনাথ পাল বক্রেশ্বর পাল রাখালদাস পাল নিবারণ পাল
১১।	এক্সপোজিশন ইউনিভার্সেলে ইন্টারন্যাশনালে	প্যারিস	১৯০০	যদুনাথ পাল চারুচন্দ্র পাল

এই তালিকা নিশ্চই অসম্পূর্ণ। অধিকতর অনুসন্ধান এবং তথ্যসংগ্রহ হলে হয়তো আরও অনেক সফল কৃষ্ণনাগরিক মৃৎশিল্পীর নাম মিলবে। তবে প্রস্তুত তালিকার দিকে খুব অলস ভাবে চোখ বোলালেও দেখা যায় ১৮৬৭ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত যদুনাথ পাল নামে একজন শিল্পীর নিশ্চিত একাধিপত্য। প্রশ্ন জাগে, কে এই যদুনাথ পাল? কী তাঁর পরিচয়?

সে প্রসঙ্গে যাবার আগে, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের আদি পুরুষদের নষ্টকোষ্ঠি খুঁজে দেখা দরকার; কেননা সেই পরিপ্রেক্ষণীতে দেখলে যদুনাথ পালের মূল্যায়ন সার্থক হবে।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সমাজ সম্পর্কে সর্বপ্রথম লিখিত বিবরণ আমরা পাই ত্রৈলোক্যনাথের লেখা ইংরাজি গ্রন্থ 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার অফ ইণ্ডিয়া'র ১৮৮৮ সালের প্রথম সংস্করণের ছাব্বিশ থেকে ছত্রিশ পৃষ্ঠার মধ্যে। একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ও তথ্যভিত্তিক বিবরণ হিসাবে এ-রচনার অনেক অংশ

উদ্ধারযোগ্য ও বিবেচ্য। তিনি জানিয়েছেন :

> Jadunath Pal, his brother Ramlal Pal, his nephew Bakkeswar Pal, and his relation and neighbour Rakhaldas Pal are now the only four clay modellers of note at Krishnagar, a town about 60 miles north of Calcutta. The figures made by them have acquired great calebrity and they have repeatedly gained medals and certificates in most of the International Exhibition held since 1851.

এই বিবরণে কিছু অসম্পূর্ণতা আছে। কারণ ১৮৫১ সালের লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'Exhibition of the Works of Industry of All Nations' প্রদর্শনীতে যদুনাথ পাল বা উল্লিখিত বাকি তিনজনের কেউ অংশ নেন নি। এই প্রদর্শনীতে প্রেরিত বিভিন্ন হিন্দু জাতি ও বৃত্তিজীবীর মডেল পাঠানোর জন্য রয়্যাল কমিশনের সভাপতির সই করা সারটিফিকেট ও মেডেল পেয়েছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। এই সারটিফিকেট ও মেডেল আমি দেখেছি শ্রীরাম পালের বংশধরদের বাড়িতে। তাই অনুমান করি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রেরিত মডেলগুলি ছিল শ্রীরাম পালের রচনা। শ্রীরাম পাল (১৮১৯-১৮৮৫) কৃষ্ণনগর মৃৎশিল্পী সমাজের প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী। ত্রৈলোক্যনাথ হয়তো অনবধান বশত শ্রীরাম পাল বা তাঁর ছেলে চন্দ্রভূষণ পালের উল্লেখ করেন নি। অবশ্য 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচারস অফ ইণ্ডিয়া' লেখার সময় শ্রীরাম পাল জীবিত ছিলেন না। তবে তাঁর ছেলে চন্দ্রভূষণ জীবিত ছিলেন। অথচ কোন অজ্ঞাত কারণে ত্রৈলোক্যনাথ চন্দ্রভূষণের নাম উল্লেখ করেন নি, অথচ শ্রীরাম পালের ভাইপো (তিলকচন্দ্রের ছেলে) রাখালদাস পালের নাম উল্লেখ করেছেন। চন্দ্রভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, ১৮৮৩ সালের বস্টন প্রদর্শনীতে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ যদুনাথ পালের ভাইয়ের নাম অসতর্কতাবশত রামলাল লিখেছেন, প্রকৃতপক্ষে রামনাথ হবে। তাঁর উল্লিখিত চারজন প্রখ্যাত শিল্পীর পাশে যোগ হবে নিবারণ পালের নাম। একই বইয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিভিন্ন শিল্পীর কাজের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি নিবারণ পালের নাম উল্লেখ করে জানিয়েছেন :

Fruits and vegetables by Nibaran Pal sent to Glassgo Exhibition.

তৎকালীন বিশিষ্ট চারজন মৃৎশিল্পীর মধ্যে তিনজন সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ মূল্যবান মন্তব্য ও তথ্য দিয়েছেন। যদুনাথ পাল সম্পর্কে বলেছেন :

> Work of modelling the tribes from the nature was first commenced during the Calcutta International Exhibition, when typical specimens were brought to Calcutta, and this figures made in clay by Jadunath Pal, under the supervision of Dr. Watt, C. I. E. Jadunath Pal has no equal in India in this kind of work.

শেষ বাক্যের অসামান্য মূল্যায়ন সম্ভবত কৃষ্ণনগর মৃৎশিল্পীর প্রতি সর্বপ্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি। অনুকরণাত্মক শিল্পে যদুনাথের নৈপুণ্য পরবর্তীকালে প্রসারিত হয়েছিল।

গ্লাসগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ত্রৈলোক্যনাথের উদ্যমে পাঠানো হয়েছিল রাখালদাস পালের তৈরি কয়েকটি মাটির মডেল। 'আর্ট ম্যানুফাকচার্স' বইয়ে উল্লিখিত ঐ মডেলগুলি ছিল : (ক) দুর্গাপূজার বলিদান দৃশ্য (খ) আসামের একটি চা বাগিচা (গ) একটি বিয়ে ও তার শোভাযাত্রা (ঘ) জগন্নাথের রথযাত্রা (ঙ) জমিদারের কাছারি (চ) আহিফেন সেবন। শিল্পী সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

> Rakhaldas Pal is the best artist in miniature scenes, but he charges a very high price.

মূর্তিগুলির মূল্যমান সম্পর্কে বক্রোক্তি থেকে জানতে ইচ্ছা হয় কেমন দাম ছিল রাখাল দাসের শিল্পগুলির? ১৮৮৮ সালের মূল্যমান অনুযায়ী :

বিষয়	দাম
চা বাগিচা	১২০০৲
দুর্গাপূজা	১৭৫৲
বিয়ের শোভাযাত্রা	৪৭৫৲
জমিদারের কাছারি	১৫০৲
রথযাত্রা	৩৬০৲
আহিফেন সেবন	৪০৲

এর পাশাপাশি তুলনা করা চলে বক্রেশ্বর পালের তৈরি কয়েকটি মডেল ও তার দাম। যা ত্রৈলোক্যনাথ উল্লেখ করেছেন। মডেলগুলি গ্লাসগো প্রদর্শনীতে গিয়েছিল :

বিষয়	দাম
চড়ক উৎসব	১৫০৲
নবদ্বীপের পণ্ডিত সভা	৪০৲

ত্রৈলোক্যনাথ জানিয়েছেন :

> **Bakkeswar Pal acquire a special proficiency in making models of Bengal fishes.**

এই রকম মাছের মডেল গ্লাসগোতে পাঠানো হয়েছিল। দাম ধার্য হয়েছিল তিনশো টাকা।

ত্রৈলোক্যনাথের লেখা বিবরণ অনুধাবন করলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, উনিশ শতকের শেষার্ধের কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সম্পর্কে। বস্তুত এই সময় ছিল এখানকার মৃৎশিল্পের স্বর্ণযুগ। কাজের স্বীকৃতি, খ্যাতির প্রসার, ব্যক্তিগত শিল্প দক্ষতায় উৎকর্ষ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এই চারদিক থেকেই সুসময় এসেছিল। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলি এই সময়ই সংগঠিত হয় এবং ঘটনাচক্রে সেগুলির শিল্প নিদর্শন সংগ্রহের কাজে যুক্ত ছিলেন জর্জওয়াট ও ত্রৈলোক্যনাথ। এই দুই শিল্পরসিক অকৃপণভাবে কৃষ্ণনগরের মাটির কাজ কিনেছেন এবং শিল্পীদের জুটিয়ে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্মান ও পায়ের তলায় স্বাবলম্বনের মাটি। এর জন্য ত্রৈলোক্যনাথকে কম সংগ্রাম করতে হয় নি। কারণ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের বাস্তবানুকরণ, বিশেষত, সত্যিকারের পোশাক পরাবার প্রবণতা অনেক ইংরেজ শিল্পরসিকের মনঃপূত ছিল না। ত্রৈলোক্যনাথ উল্লেখ করেছেন এমন এক বিরূপ ধারণার নমুনা :

> The late Mr. Locke, Superintendent of the School of Art, Calcutta, however found fault with their unhappy predilection for introducing pieces of real fabrics in the clothing; actual hair and wool in the figures, and in the accessories, straw and grass etc. In his opinion, this has a tendency to lower their work to the level of ingenious toy-making.'

সওয়াল জবাবে শিল্পরসিক ত্রৈলকানাথ কৃষ্ণনগর শৈলীর সপক্ষে বলেছেন :

> But whatever objection there might be in a purely artistic point of view to the practice of putting actual hair, wool and other accessories on the figures, it cannot be denied that it gives to them a very life-like appearance. Considerable delicacy and ingenuity are often displayed in the preparation and manipulation of these accessories.

মুগ্ধ শিল্পবোদ্ধা ত্রৈলোকানাথ কৃষ্ণনগর শৈলীর প্রশংসায় না বলে পারেন নি যে,

> There is considerable delicacy and fineness in their work ; the figures are instimet with life and expression and their pose and action are excellent.

ত্রৈলোক্যনাথের দেওয়া বিবরণের ওপর নির্ভর করে বলা যায়, ১৮৮৮ সালে কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীতে নামকরা মৃৎশিল্পী ছিলেন মাত্র পাঁচজন। যদুনাথ, রামনাথ, বক্রেশ্বর, রাখালদাস ও নিবারণ। এর সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি চন্দ্রভূষণ পালের নাম। শ্রীরাম পাল আগেই মারা গেছেন। এই ছয়জন শিল্পী মোট দুটি বংশধারার সন্তান। অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের মৃতশিল্পের উৎকর্ষ ও খ্যাতি খুব সামান্য পরিসরে সীমিত ছিল। পরে, বিশ শতকের গোড়ায় আরও কিছু শিল্পী এসে বসতি করেছেন ঘূর্ণীতে। তাঁরা এসেছিলেন কৃষ্ণনগরের কুমোর পাড়া থেকে এবং বলাবাহুল্য, নিশ্চিন্ত বিপণনের লোভে। কারণ ইতিমধ্যে কৃষ্ণনগরের পুতুলের নাম ডাক হয়েছে। বাইরে থেকে ক্রেতা আসছে। পূর্ববঙ্গের জমিদাররা মোটা অর্ডার পাঠাচ্ছেন। মিশনারি ও সাহেবরা প্রচুর পরিমাণে হিউম্যান ফিগার কিনছেন ও বিদেশে পাঠাচ্ছেন বা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান ও পদক পান শ্রীরাম পাল, অবশ্য তিনি সরাসরি তাঁর হাতের কাজ পাঠান নি অথবা প্রদর্শনীতে তাঁর শিল্পরচনা তাঁর নিজের নামে পঙ্ক্তিভুক্ত হয় নি। ১৮৫১ সালে লণ্ডনের হাইড পার্কে অনুষ্ঠিত এই Exhibition of the works of Industry of all nations প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল পাঠান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। অভিজ্ঞান পত্রটি তাই ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানির কপালে জুটেছে। তার বয়ান এই রকম :

Exhibition of the works of Industry of all nations :

I hereby certify her Majestys Commissioners upon the Award of the Honour have presented a prize medal to the Honourable East India Company for clay figures representing the various Hindoo Cast and profession manufactured in Krishnagar as shown in the Exhibition.

Exhibition Sd/- Illegible
Hide Park, London, President of Royal Commission
15th October, 1851.

এই অভিজ্ঞানপত্র ও মেডেল আমি পেয়েছি শ্রীরাম পালের বর্তমান বংশধরদের কাছে (দ্রষ্টব্য আলোকচিত্র)। কৃষ্ণনগরের মহিমময় মৃৎ-শিল্পের ইতিহাসে এবং সামগ্রিকভাবে বঙ্গীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রথম দিকের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দুর্লভ গৌরব অর্জনকারী শিল্পী শ্রীরাম পালের নাম আমরা ক-জন জানি?

প্রাপ্ত বিবরণ ও তথ্য অনুসারে শ্রীরাম কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পশৈলীর আদিপুরুষ বলে কথিত মোহন পালের প্রপৌত্র। তাঁর জন্ম ১৮১৯, মৃত্যু ১৮৮৫। তাঁর একমাত্র সন্তান চন্দ্রভূষণ পালও খুব বড় শিল্পী ছিলেন। ১৮৮৩ সালের বস্টন প্রদর্শনীতে তিনি স্বর্ণপদক পান এবং ১৮৮৬ সালের লণ্ডন প্রদর্শনীতে পান ব্রোঞ্জ পদক।

লণ্ডনের হাইড পার্ক প্রদর্শনীর চেয়েও বড় স্বীকৃতি শ্রীরাম পাল পান ১৮৫৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত Exposition Universelle-তে।

এই প্রশংসাপত্রটি শ্রীরাম পালের প্রপৌত্র প্রকাশ পালের মৃৎশিল্পের শো-রুমে এখনও টাঙানো আছে। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন (১৮৪৮-৭০) স্বাক্ষরিত এই প্রশংসাপত্র ফরাসী ভাষায় লেখা, যার শিরোনাম :

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855
INDUSTRIE - BEAUX-ARTS

এর ভেতরকার মর্মোদ্ধার করলে দেখা যাবে যে, উক্ত প্রদর্শনীর আন্তর্জাতিক জুরিবৃন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীর পদক প্রদান করেছেন, কৃষ্ণনগর, সাতারা, বেলগাঁও, পুনা ইত্যাদি বৃটিশ ভারতভুক্ত অঞ্চলের শিল্পীদের মূর্তি ও পুতুল রচনার

দক্ষতার জন্য। সম্রাটের স্বাক্ষরিত এই মূল অভিজ্ঞান পত্রটির নিচে এক কোণে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তলিপিতে লেখা আছে :

Certificate awarded to
Sri Ram Pal
of Ghoornee, Zilla Nuddea

দুষ্পাঠ্য সইয়ের তলায় ম্যাজিস্ট্রেট কথাটি পড়া যায়। বাঁ পাশে লেখা আছে : 1 July 1857, Krishnagar।

অনুমান করা যায়, বেলগাঁও, পুনা, সাতারা ইত্যাদি জায়গায় শিল্পীদের জন্যও এমন এক-একটি অভিজ্ঞান পত্র এসেছিল। কৃষ্ণনগরের জন্য যেটি এসেছিল সেটি জেলাশাসক শ্রীরাম পালকে দেওয়ায় বোঝা যায় যে, প্রেরিত পুতুলগুলি শ্রীরাম পালের তৈরি ছিল। এই অভিজ্ঞান পত্রের সংশ্লিষ্ট পদক আমি পেয়েছি শ্রীরাম পালের আরেক প্রপৌত্র সরোজ পালের কাছে। প্রথম পদকটির সামনের দিকে তৃতীয় নেপোলিয়নের মুখ খোদিত এবং লেখা আছে :

NAPOLEON III. EMPEREUR

পেছনে খোদিত আছে একটি সুন্দর অলংকরণ এবং গোল করে লেখা আছে : Exposition. Univer selle, Agriculture Industrie, Beaux-Art, Paris 1855। পদকটির খোদাইকারের নাম : ELBERT BARRE।

শ্রীরাম পালের নাম খোদাই করা আরেকটি পদক পাওয়া গেছে ১৮৫৮ সালের, কিন্তু সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞান পত্রটি পাওয়া যায় নি। ১৮৫৮ সালের পদকটির সামনের দিকে সম্রাট নেপোলিয়নের মূর্তি ও নাম আছে প্রথম পদকটির মতো। পেছন দিকের মাঝখানে লেখা আছে SREERAM PAUL এবং তার চারপাশে গোল করে লেখা Exposition Universelle DE M DCCC LX VIII. A PARIS Recompenses। পদকটির খোদাইকারের নাম H. PONSCARMEF।

কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অভিজ্ঞান পত্র ও পদক প্রাপ্তির বিবরণ ব্যতীত শ্রীরাম পাল সম্পর্কে আজ অবশ্য কোন তথ্য পাবার উপায় নেই। সম্ভবত এই শিল্পী যতখানি শিল্প-দক্ষ ছিলেন ততটা পুথিগত ভাবে শিক্ষিত ছিলেন না। নিজের একটি আবক্ষ ছোট মৃৎমূর্তি তিনি তৈরি করেছিলেন, তাঁর হাতের কাজের নমুনা বলতে ঐ সামান্য জিনিসটি আছে। তাঁর ছেলে

চন্দ্রভূষণ পালেরও একটি ধূসর আলোকচিত্র পদক এবং জীর্ণ অভিজ্ঞান পত্র ছাড়া কোন জীবন-তথ্য ও শিল্পকর্ম আমরা পাই নি। এ-ব্যাপারে আমাদের ক্ষোভ ও বেদনা প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় এই ভাবে বলা যায় যে, 'তার একটিও আজ নেই, কারণ পাথরে নয় মাটিতে তাদের গড়া হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের মাটি এঁটেল হলেও পাথরের মত বহুকাল স্থায়ী নয়। সে মাটি গুণীর হাতে পড়লে নানা বস্তুর রূপ নেয় কিন্তু সে সব বস্তুর ধর্ম নিতে পারে না।'

কৃষ্ণনগরে মৃতশিল্পের প্রথম যুগের শিল্পী গোষ্ঠির মধ্যে শ্রীরাম ও চন্দ্রভূষণ সম্পর্কে যেটুকু তথ্য বা অভিজ্ঞান পাওয়া যায়, সেটুকুও মেলে না বক্রেশ্বর ও নিবারণ পাল সম্পর্কে। শুধু ত্রৈলক্যনাথের বই থেকে জানা যায়, এঁদের কাজ গিয়েছিল গ্লাসগো প্রদর্শনীতে। অথচ সৌভাগ্যক্রমে যদুনাথ পাল সম্পর্কে প্রচুর বিবরণ ও তথ্য পাওয়া যায়। সেই বিবরণ উপন্যাসের মতোই উত্তেজক ও আকর্ষণীয়।

১৯১৫ সালে কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণীতে আসেন লর্ড কারমাইকেল। তাঁর সম্মানে ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পের এক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। উপস্থিত থাকেন সব মৃৎশিল্পী। একমাত্র বৃদ্ধ শিল্পী যদুনাথ আসেন নি। তেজস্বী এই উনিশ শতকীয় শিল্পী জানান, লর্ড কারমাইকেলের ইচ্ছা হলে তাঁর বাড়ি আসতে পারেন। যদুনাথ শিল্পী হিসাবে এতদূর প্রথিতযশা ছিলেন যে, শুধু তাঁকে দেখবার জন্য কারমাইকেল প্রদর্শনী ক্ষেত্র থেকে পায়ে হেঁটে শিল্পীর বাড়ি আসেন, করমর্দন করেন এবং কৃতার্থ বোধ করেন। যদুনাথ একই সঙ্গে ভালো চিত্রশিল্পী, প্রতিকৃতি নির্মাতা ও বাস্তবানুকরণকারী মৃৎশিল্পী ছিলেন। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানকালে পুরানো দিনের শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জীবন-তথ্য ও আনুষঙ্গিক বিবরণ পাওয়া যাবে যদুনাথ পাল সম্পর্কে। এঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত রচনা করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ (১) যদুনাথ পাল কৃষ্ণনগর মৃৎশিল্পশৈলীর সবচেয়ে যশস্বী ও সার্থক রূপকার; (২) তাঁর জীবনকাল সুদীর্ঘ বিস্তৃত এবং বহু ঘটনা ও বৈচিত্র্যে আকীর্ণ; (৩) উনিশ শতকের শেষ দিকের কলকাতার নানা শিল্প-উদ্যোগ ও শিল্পোৎসাহীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; (৪) ইংরাজ প্রশাসকরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে যদুনাথ পালকে আধুনিক শিল্পধারা ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়াস করেছিলেন; (৫) সেকালের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে একমাত্র যদুনাথই নানা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় মডেলার হিসাবে চাকরি করেছেন এবং সংস্পর্শ ও সংঘর্ষে এসেছেন

সেকালের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ; (৬) তাঁর মধ্যে ছিল উনিশ শতকীয় বাঙালি সুলভ বিপুল দৃঢ়তা, প্রবল ব্যক্তিত্ব ; আত্মমর্যাদা বোধ ও তেজস্বিতা।

ভারতে ইংরাজ সরকারের কৃষি ও রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারি স্বনামধন্য স্যার ই. সি. বাক ১৮৯৮ সালে এক প্রশংসাপত্রে যদুনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন :

> Jadunath was the prince of modellers in the 1880-90 decade and I believe just as loud now. He made the life-size models for the 1886 Exhibition and others under meek of scientific measurement for the Paris Ethnological Museum. His specimens in Calcutta Museum etc. are very clener.

প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মকথায় লিখেছিলেন :

> কৃষ্ণনগরের কুমোরদের মত বাঙ্গলায় অপর কেউই ক্লেমডিলিঙে ওস্তাদ ছিল না। আমার ছেলেবেলায় যদু পাল নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় কারিগর ছিলেন, তাঁকে নির্ভয়ে আর্টিস্ট বলা যায়।...দাদা তাঁর অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েন—এবং দাদার অনুরোধে তিনি বিলেতি বইয়ের ছবি দেখে ভিনাস গড়তেন।

যদুনাথ পালের জন্ম ও মৃত্যুর সাল সম্পর্কে বিতর্ক আছে। 'ভারতের ভাস্কর ও শিল্পী' নামক এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় গ্রন্থের রচনাকার্যে দীর্ঘদিন ব্যাপৃত কমল সরকার বাঙালি শিল্পীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে অত্যন্ত শ্রমনিষ্ঠ ও সতর্ক। যদুনাথ পাল সম্পর্কে আমার প্রাথমিক তথ্য সন্ধানের সময় কমলবাবু আমাকে তাঁর প্রস্তুয়মান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে পড়তে ও নোট নিতে দেন। তাঁর আহরিত তথ্য অনুযায়ী যদুনাথের জন্ম ১৮৩৮ সাল। তিনি যদুনাথের মৃত্যু সাল সংগ্রহ করতে পারেন নি।

সম্ভবত কমল সরকার যদুনাথের জন্মসাল নির্ণয় করেছেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার একটি নিবন্ধ থেকে। কৃষ্ণনাগরিক প্রফুল্লকুমার সরকারের লেখা 'মৃৎশিল্পী যদুনাথ পাল' নামক এই নিবন্ধে শিল্পী সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। রচনার এক অংশে প্রফুল্লকুমার লিখেছেন যে, ঐ সময় (অর্থাৎ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে) যদুনাথের বয়স সাতাত্তর বছর। এই হিসেব সঠিক ভেবে গণনা করলে যদুনাথের জন্মসাল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এখন এ-প্রসঙ্গে আমার অনুসন্ধানের বিবরণ দিই।

১৯৬১ সালে 'ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস হ্যাণ্ডবুকের' নদীয়া খণ্ডে জনৈক এস. গোস্বামীর লেখা 'ক্লে মডেলিং ডল মেকিং অফ কৃষ্ণনগর' নামে একটি প্রতিবেদন-নিবন্ধ আছে। তাতে পুরানো মৃৎশিল্পীদের কয়েকজনের জন্ম-মৃত্যু সালের উল্লেখ আছে। সেই অনুযায়ী যদুনাথ পালের জীবৎকাল ১৮২১ থেকে ১৯২০। কৃষ্ণনগর পৌরসভার শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থে (১৯৬৪) যদুনাথ পাল সংক্রান্ত টীকায় শিল্পীর জন্মসাল উল্লিখিত হয় নি, কিন্তু বলা হয়েছে: 'কাশীতে প্রায় একশো বছর বয়সে কৃষ্ণনগরের গৌরব বিশ্ববিখ্যাত মৃৎশিল্পী যদুনাথের মৃত্যু হয়।' কমল সরকারও যদুনাথের বারাণসীতে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন তবে সাল তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নন বলে তা উহ্য রেখেছেন।

যদুনাথের জন্ম-মৃত্যুর সম্ভাব্য সময় নির্ণয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন শিল্পীর প্রপৌত্র রবীন্দ্রনাথ পাল। ভারতীয় রেলওয়ের পদস্থ কর্মী এই ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি যদুনাথ পালের অনেক কাগজপত্র, দলিল ও পদক সংরক্ষণ করে রেখেছেন। তাঁর সংগ্রহ থেকেই আমি পেয়েছি যদুনাথের আঁকা ছবি এবং একটি দুষ্প্রাপ্য ফটো। রবীন্দ্রনাথ পালের বাবা তারিণীচরণ পালের কাছে বারানসীতে যদুনাথ শেষ জীবনে থাকতেন এবং হরিশচন্দ্র ঘাটের কাছে সোনার পুরাতে তারিণীচরণের বাসা বাড়িতে যদুনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রবাবুর পারিবারিক খাতায় যদুনাথ পালের জন্ম ও মৃত্যুর সাল এমনকি তারিখও লেখা আছে। সেই অনুযায়ী শিল্পীর জন্ম ১৮২২ সালের ১১ই জানুয়ারি। মৃত্যু ১০৭ বছর বয়সে ১৯২৯ সালের ২৫শে নভেম্বর। সেনসাস হ্যাণ্ড বুকে এস. গোস্বামী লিখেছেন ১৮২১-১৯২০। প্রফুল্ল সরকারের প্রবন্ধের হিসাবে জন্ম সাল ১৮৩৮। এ-প্রসঙ্গে কোন্ তথ্য সর্বাধিক গ্রহণীয় তা বিতর্কমূলক। তবে পারিবারিক খাতার উল্লেখ বোধহয় অগ্রহণীয় নয়।

যদুনাথের পিতার নাম আনন্দ পাল। কিন্তু আনন্দ পালের পূর্বপুরুষদের নাম বা কোন বিবরণ মেলে নি। কৃষ্ণনগরের অন্য কোন মৃৎশিল্পী পরিবারের বংশলতিকার কোনো শাখায় যদুনাথের উল্লেখ নেই। মনে হয় আনন্দ পাল কৃষ্ণনগরের বাইরে থেকে এসে ঘূর্ণীতে বসবাস করেন। তাঁর কোন নিজস্ব বাস্তু ছিল না। ঘূর্ণীর পুরানো শিল্পী বিজয়কৃষ্ণ পাল (১৮৮৭-১৯৬৭) তাঁর স্মৃতি থেকে বলে গেছেন, যদুনাথের বাবা আনন্দ পাল নদীয়ার উত্তর পূর্ব অংশের কোনো জায়গার মানুষ ছিলেন। সেখান থেকে জলাঙ্গীর নদীপথে

তিনি নৌকা করে খড় এনে ঘূর্ণীর ঘাটে নামতেন ও ব্যবসা করতেন। এইভাবে ঘূর্ণীর কুমোরদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, হয়তো দূর আত্মীয়তাও ছিল। ক্রমে তিনি ঘূর্ণীতে বসবাস করেন। তাঁর ছেলে যদুনাথ ও রামনাথ মাটির মডেল গড়া শেখেন শ্রীরাম পালের কাছে। যদুনাথ তাঁর কর্মনৈপুণ্যে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ভবিষ্যতে ইংরাজ ক্রেতা এবং শিল্পরসিকদের প্রশংসা ও অর্থানুকুল্য লাভ করে ঘূর্ণীতে যদুনাথ বেশ বড় দোতলা বাড়ি (রামনৃসিংহ আদিত্যের ৪০৮নং সম্পত্তি) কেনেন। সংশ্লিষ্ট দলিলে লেখা আছে :

> মহামহিম শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল পিতা ৺আনন্দ চন্দ্র পাল জাতি কুমার, পেষা জাতিয় সাং ঘূর্ণী থানা কোতয়ালি সবরেজেষ্টারি কৃষ্ণনগর জেলা নদীয়া

দলিলের তারিখ, ৩০শে জুলাই ১৮৮৪। যদুনাথের এই বাড়ি আজও রয়েছে তালাবন্দী হয়ে। বংশধরেরা অন্যত্র কর্মরত, অন্য ব্যবসায় ও চাকুরিতে। শিল্পীর সম্মানে কৃষ্ণনগর পৌরসভা তাঁর বাসস্থান সংলগ্ন রাস্তাটির নাম দিয়েছেন যদুনাথ পাল লেন।

যদুনাথ পাল তাঁর হাতের কাজের শিল্পনৈপুণ্যে ও আচার ব্যবহারে মুগ্ধ করেছিলেন নদীয়ার জেলা শাসক সি. সি স্টিভেন্‌স্‌কে ১৮৭০ সালের আগের কোনো সময় এবং তার ফলেই তার ভাগ্য খুলে যায়। স্টিভেন্‌সের লেখা একটি প্রশংসাপত্র থেকে এই বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বোরড্‌ অফ রেভিনিউয়ের সদস্যরূপে ১৮৯৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে স্টিভেন্‌স্‌ লিখেছেন :

> I have known Jadunath Pal of Krishnagar for more than 26 years. When Lord Northbrook was Viceroy, he desired to have one of Krishnagar modeller educated at the Calcutta School of Art at his expense, and I (being then Magis trate of Nadiya) was asked to select a suitable person. I chose Jadunath Pal as being the clenerest of the modellers and at the same time young enough to perfect by tudy. My speculation were realized and he attained a high degree of skill. He did some good works for the Calcutta

Exhibition of 1883 and was for sometime employed by Martin Burn Co., he has also distinguished himself highly in Calcutta Art Exhibition. Among other works of his hands I have seen some excellent busts done by him. One of myself was exhibited at the last Calcutta Exhibition. He is a thoughtful respectable man.

ইংরাজ রাজপুরুষ যাঁকে চিন্তাশীল ও সম্মানীয় ব্যক্তি বলে মনে করেছিলেন সেই যদুনাথের জীবন সংগ্রামে আত্মমর্যাদা রক্ষায় ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অনেক কাহিনী আছে। হয়তো সেইজন্য যদুনাথ গড়েছিলেন আদর্শ পুরুষ বিদ্যাসাগরের মাটির মূর্তি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) এই মূর্তিটি (৫৪ × ৪৪ সেন্টিমিটার মাপের) বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। মূর্তিটি পরিষদকে দান করেছেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ। মূর্তিটির নিখুঁৎ বাস্তবতা ও কপালের শিরা উপশিরা দেখে বোঝা যায় যে, যদুনাথ সামনা-সামনি বসে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিমূর্তি তৈরি করেছিলেন।

স্টিভেন্‌স্ সাহেবের চিঠি ভাল করে পড়লে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাচাই হতে পারে। তিনি ১৮৭০ সালে যদুনাথের বর্ণনায় 'young enough to perfect by study' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ পাল প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এবং সেনসাস হ্যাণ্ড বুকের উল্লিখিত জন্মসাল অনুসারে এই সময়ে যদুনাথের বয়স ৪৯ বা ৫০ বছর। 'young enough' কথাটা কি এই বয়সে খাপ খায়? বরং প্রফুল্ল সরকারের বিবরণ অনুযায়ী এই সময় শিল্পীর বয়স বত্রিশ। এই বয়সটিই সঙ্গত মনে হয় এবং তদনুযায়ী যদুনাথের জন্মসাল ১৮২০ নয় ১৮৩৮ সাল।

স্টিভেন্‌স্ সাহেবের চিঠি থেকে ভাইসরয় নর্থব্রুক সাহেবের একটি সদিচ্ছার খবর পাওয়া যায়। ভাইসরয় নর্থব্রুক (১৮৭২-১৮৭৬) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত 'ক্যালকাটা ফাইন আর্ট একজিবিশনে'র দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে (১৮৭৪) উদ্বোধক ছিলেন। এই প্রদর্শনীতে যদুনাথ পাল মৃন্ময়মূর্তি রচনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন। 'সুলভ-সমাচার' সংবাদ পত্রে যদুনাথের পুরস্কার প্রাপ্তির খবর প্রকাশিত হয় এই ভাষায়:

> 'কৃষ্ণনগরের যদুনাথ পাল মৃন্ময়ী প্রতিমূর্তি গঠন দ্বারা জর্জ ফিবর সাহেবের পারিতোষিক পাইয়াছেন।'

এই সময়ে যদুনাথ নর্থব্রুকের আগ্রহে ও স্টিভেন্সের সুপারিশে সরকারি আর্ট স্কুলে শিক্ষা-গ্রহণে রত ছিলেন। কিন্তু ১৮৭৪ সালের আগেই নর্থব্রুক কৃষ্ণনগর শৈলীর খবর পেলেন কোথা থেকে? যা থেকে তাঁর কলকাতা আর্ট স্কুলে একজন কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীকে নিজের অর্থানুকূল্যে কাজ শেখাবার আগ্রহ হল?

মনে হয় ১৮৫১ থেকে ধারাবাহিক ভাবে কৃষ্ণনগর শিল্পীদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের খবর তিনি রাখতেন। ১৮৫১ ও ১৮৫৫ সালে লণ্ডন ও প্যারিস থেকে শ্রীরাম এবং ১৮৬৭ সালে প্যারিস থেকে যদুনাথ পুরস্কৃত হন। ভারতের বড়লাট হিসাবে ১৮৭২ সালে যোগ দেন নর্থব্রুক। কৃষ্ণনগর শিল্পীদের সাফল্য-সংবাদ তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স্ যে নর্থব্রুকের ইচ্ছাতেই একজন শিল্পী নির্বাচন করেন, প্রশংসাপত্রে তার উল্লেখ রয়েছে। যদুনাথকে নির্বাচন করাটা নিতান্তই স্টিভেন্সের দূরদর্শিতা। নর্থব্রুক তখন তাঁকে চিনতেন না।

এই সব তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, যদুনাথ তরুণ বয়সে (প্রফুল্ল সরকারের মতে ২০ বছর বয়সে, আমাদের বিশ্বাস ৩২ বছর বয়সে) ১৮৭৪ সালের দ্বিতীয় কলকাতা প্রদর্শনীর আগেই কোন সময়ে কলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষানবিশ হিসাবে ভর্তি হন, তাঁর বৃত্তি ছিল চল্লিশ টাকা। তিনি প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে এখানে মডেলিং শিখে জাতিগত বিদ্যা ও দক্ষতাকে প্রকরণগত উৎকর্ষতায় জীবিত করে নেন। ছাত্রজীবনের পর তিনি আর্টস্কুলেই মডেলিং বিভাগে নির্দেশকের কাজ পান। কিন্তু সামান্য একটি ঘটনায় তিনি চাকরি ত্যাগ করেন।

এই সময় আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেম স্বনামধন্য হেনরি হোভার লক (১৮৩৭-১৮৮৫)। ইংলণ্ডের সাউথ কেনসিংটনের স্কুল অব ডিজাইনের এই কৃতী ও তেজী ছাত্র ১৮৬৪ সালে কলকাতার আর্ট কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন এবং মাত্র ৪৭ বছর বয়সে অধ্যক্ষ থাকাকালীন মারা যান। আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন সংগঠক-অধ্যক্ষ লকের আমলে আর্টস্কুলের, তথা বাংলার, ললিতকলার প্রভূত উন্নতি হয়। ১৮৭৫ সালের দ্বিতীয় 'ক্যালকাটা ফাইন আর্ট একজিবিশন'-এর সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেক লক। কিন্তু তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও ক্রোধ প্রবণতার ফলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল না। তখনকার 'সঞ্জীবনী' সংবাদপত্রে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল: 'কিন্তু লকের মেজাজ বড় ভালো ছিল না, বিচক্ষণ কার্যপটু ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইয়াও সামান্য

ক্রুটিতে তাঁহার অন্তরে ক্রোধ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিত।'

আর্ট স্কুলের কাজ থেকে যদুনাথের পদত্যাগের মূলে ক্রোধী লক সাহেবের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। ঘটনাটির বিবরণ প্রফুল্ল সরকারের ভাষায়;

'যদুবাবুর কলিকাতা আর্ট স্কুলে অবস্থান কালে তাঁহার একটি ছাত্র কলিকাতা শিল্প প্রদর্শনীতে 'বাস্ট' গড়িয়া দিয়া স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হয়। লক সাহেব তখন স্কুলের অধ্যক্ষ। তিনি বাস্ট নির্মাণে ব্যবহৃত প্লাসটারের দাম কাটিয়া লওয়াতে যদু আর্ট স্কুলের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।'

দুই স্বাধীন চিত্ত ব্যক্তির সহাবস্থান সম্ভব হয় নি বলে বাংলার মৃৎশিল্পী বেছে নেন তাঁর নিঃসঙ্গ অভিমানের গৌরবময় অথচ অনিশ্চিত জীবন।

এর পর যদুনাথ রাণীগঞ্জে মারটিন বারন্ কোম্পানিতে পটারি ওয়ার্কস বিভাগে নকশার কাজ করবার জন্য চাকরি পান। বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা। কলকাতার আর্টস্কুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষীণ হলেও শিল্পরসিক ও রাজ-পুরুষদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল। ১৮৬৭ সালের প্যারিস প্রদর্শণীতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন আর্ট কলেজে যোগ দেবার আগে। আর্ট কলেজের পরবর্তী পর্বে তাঁর কাজ পাঠানো হয় ১৮৮১ সালের মেলবোর্ণ প্রদর্শনীতে। এখানে দেখানো হয় তাঁর তৈরি মাটির লাঙল, হাতি, উট, মহিষ ও ষাঁড়। এর:পরে ১৮৮৩ সালে তাঁর তৈরি পাঁচটি পূর্ণাবয়ব মডেল (চাষা, বেনিয়া ও কাপড় বেচা মারোয়ারী সহ) পাঠানো হয় হলাণ্ডের আমস্টারডামে। আমার সংগৃহীত পদক থেকে দেখা যাচ্ছে যদুনাথ ১৮৮৩ সালের জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কলোনিয়াল প্রদর্শনী থেকেও পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এই সময় কলকাতায় সংগঠিত হচ্ছিল ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল একজিবিশনের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি। মুখ্যত টি. এন, মুখার্জির প্রত্যক্ষ চেষ্টায় ও স্যার এডওয়ার্ড বাকের সমর্থনে যদুনাথ পালকে সরকার নিযুক্ত করেন মডেল্ নির্মাণের কাজে। ডক্টর জর্জ ওয়াটের তত্ত্বাবধানে যদুনাথ পাল কলকাতায় নিয়ে আসা আদিবাসীদের জীবন্ত আদর্শ সামনে রেখে তাদের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি গড়ে দেন মাটি দিয়ে। সেইগুলি ১৮৮৩-৮৪ সালের কলকাতা প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। একাজে যদুনাথের অনুপম দক্ষতা বিষয়ে টি. এন. মুখার্জির মন্তব্য;

'Jadunath Pal has no equal in India in this kind of work.'

এই প্রদর্শনীর জন্য যদুনাথের দ্বারা প্রস্তুত আন্দামান নিকোবরের আদিবাসী নারীমূর্তি বিশেষ প্রশংসা লাভ করে এবং সেগুলি ভারতীয় যাদুঘরে রাখা

হয়। এর পরে ১৮৮৬ সালে লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড কলোনিয়াল একজিবিশন'-এও তাঁর নির্মিত মূর্তি পাঠানো হয় এবং তিনি পুরস্কৃত হন। ১৮৮৭ সালে যদুনাথ আবার কলকাতায় আর্টস্কুলে চাকরি নেন। এই সময় স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ডব্লিউ. এইচ. জাবিন্স্। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে সংরক্ষিত 'Minutes of the trustees of Indian Museum'-র ১৮৮৮ সালের ১১ই জুনের থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার যোগ্য;

'With reference to the Trustees Order, IV-9, dated 14th May last, read an endorsement from the Under Secretary to the Government of Bengal, Revenue Department 1724-145 Mis (7) dated 19th May/88, forwarding Copy of Bengal Government Letter No. 1722-143 Mis (7) of the same date together with a copy of the letter from the Government of India No. 318 dated Simla the 1st May/83 on the subject of maintaining the modeller, Jadu Nath Pal and his establishment, at a monthly cost of Rs. 100/- for another year under the control of the Superintendent of the School of Art for the purpose of preparing for the Government of India, models representing agricultural operations & c. for the Imperial Institute, according to a list to be furnished by Mr. T. N. Mukherjee, the Assistant Curator, Order (in circulation) send copy of the papers to the Assistant Curator for information and guidance.'

এই বিস্তৃত উদ্ধৃতি থেকে অভ্রান্ত ভাবে প্রমাণ হচ্ছে ১৮৮৮ সালের জুন মাসের এক বছর আগে থেকে যদুনাথ কলকাতার আর্টস্কুলে মাসিক একশো টাকা বেতনে কাজ করেছেন। এই পদটি সম্ভবত বছর-বছর নবীকরণ করতে হত। কতদিন এই পদে তিনি কর্মরত ছিলেন তা নির্ণয় করা শক্ত। তবে আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ই. ডি হ্যাভেলের (আর্টস্কুলে যোগদান ১৮৯৬) সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে যদুনাথ কর্মত্যাগ করেন। সে প্রসঙ্গ পরে আসবে।

ইতিমধ্যে ১৮৮৮ সালের গ্লাসগো প্রদর্শনীর জন্য যদুনাথকে দিয়ে জর্জ

ডাইরেক্টর, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের সৌজন্যে

ওয়াট ও ত্রৈলোক্যনাথ তৈরি করিয়েছিলেন আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের খাম্‌তি, গারো, মিশমি, দাফলা, নাগা, মিকির, কারেন, সাঁওতাল ইত্যাদি আদিবাসীদের সতেরটি বিরাট মূর্তি। এগুলি পরে ভারতীয় যাদুঘরে স্থান পায় এবং সেখান থেকে প্রতিরূপ তৈরি করে পাঠানো হয় লণ্ডনের 'ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট' ও ইউরোপের অন্য কয়েকটি যাদুঘরে। কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে অবশ্য যদুনাথ পালের এই শিল্পকাজগুলি এখন আর নেই।

১৮৮২ সালে আমস্টারডামে এবং ১৮৮৬ সালে লণ্ডনে যে-প্রদর্শনী হয় তার ভারতীয় বিভাগে রক্ষিত যদুনাথ পালের নির্মিত পূর্ণাবয়ব আদিবাসী মূর্তিগুলি যেমন আকর্ষণ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণ দিয়েছেন টি. এন. মুখার্জি। লণ্ডনের কলোনিয়াল একজিবিশনের তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি লিখেছেন :

'In the Amsterdam International Exhibition of 1882, an interesting feature of the Indian Section was a row of native shops with life-size figures. This novel scene was repeated at the Colonial and Indian Exhibition ; and the place where it stood was always densely crowded with visitors. At the Exhibition were also shown a large number of life-sized ethnological models, illustrating the different aboriginal tribes who still lead a savage life among the jungles and mountain fastnesses of India.

এরপর যদুনাথ ১৯০০ সালের প্যারিস প্রদর্শনীতে পাঠান নানা দেশের সৈনিকের মডেল। ১৯০৬ সালে 'ক্যালকাটা ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড এগ্রি-কালচার একজিবিশনে'ও তাঁর কাজ প্রশংসা পায়। ইতিমধ্যে যদুনাথ পাল ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে পড়েন। শোনা যায়, তাঁর কাজ দেখে রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে ইংলণ্ডে যাবার সুযোগ দেন কিন্তু সামাজিক অনুশাসনে ও মার অনুমতি না পেয়ে সে সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হন। আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেলের সঙ্গে একটি মূর্তি-গঠন উপলক্ষে তাঁর বিরোধ ঘটে যায়। এ সম্পর্কে প্রফুল্ল সরকার লিখেছেন :

'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মূর্তি হ্যাভেল সাহেব গড়েন ; সেটি অপছন্দ হওয়ায় ফেরৎ দেওয়া হয়। যদুবাবুর উপর নির্মাণের ভার পড়িল। তিনি প্রশংসার সহিত কাজ সম্পাদন করিলেন। স্টেটস্‌ম্যান পত্রে ঠাকুরবাড়ির কেহ তাঁহার

প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন। ইহাতে হ্যাভেল সাহেব মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। কাজেই যদুবাবুর ন্যায় তেজস্বী লোকের আর তাঁহার অধীনে কর্ম করা পোষাইয়া উঠিল না। তিনি পদত্যাগ করিয়া দেশে আসিলেন।'

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যদুনাথের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তাঁর মধ্যমপুত্র চারুচন্দ্র পালের উপর বেশি ভরসা রাখতেন তিনি। ১৯০০ সালের প্যারিস প্রদর্শনীতে যদুনাথ ও চারুচন্দ্র একসঙ্গে পুরস্কৃত হয়েছেন দেখা যায়। কিন্তু সম্ভবত আর্থিক অনিশ্চয়তার কথা ভেবে চারুচন্দ্র যোগ দেন পুলিশ বিভাগে। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে।

১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রফুল্ল সরকার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লিখেছেন, 'তাদৃশ উৎসাহের অভাবে এই গুণী শিল্পী এখন নিতান্তই হীনভাবে দিন যাপন করিতেছেন। উপার্জনক্ষম পুত্রের বিয়োগে দুরবস্থাগ্রস্ত বৃদ্ধ শিল্পীর মুখপানে দেশের ধনী ও শিল্পানুরাগীগণ চাহিবেন কি?'

শেষ জীবনে আর্থিক দুর্গতি ও শোকগ্রস্ত মানুষটি ভেঙ্গে পড়েন নি। তাঁর প্রপৌত্রের কাছ থেকে সংগৃহীত কাগজপত্র থেকে জিওলজিক্যাল সারভে অফ ইণ্ডিয়ায় ডাইরেক্টরের পক্ষে লেখা একখানি চিঠি পেয়েছি। তাতে লেখা (১৫ নভেম্বর ১৯১৮):

'I write to inform you that we requre a man to cement together some fossil bones. I should be glad to be informed at an early date whether you are willing, and on what terms to undertake the work which must be done, as previously at my office.

2 It is estimated that for a good energetic man there is work for at least a fortnight working full-time.

উনআশি বছরের বৃদ্ধ যদুনাথ কি এই পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ নিয়েছিলেন? জানা যায় না।

কিন্তু তাঁর মধ্যে এই সময় দেখা গিয়েছিল পৌত্র তারিণীচরণের জীবিকার জন্য চিন্তা। সে সম্পর্কে তাঁর শিল্পী-সুহৃদ গগনেন্দ্রনাথকে তিনি নিশ্চয়ই কোন অনুরোধ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠি (১৪.১২.২০) আমরা পাই। ৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন থেকে তিনি লিখছেন:

'My dear Jadunath,

I saw Mr. Gourlay and had a talk about your case. He has promised to do something for your grand-son'

সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য শিল্প প্রসঙ্গ এসেছে ;

We open our exhibition on 27th December. Can you send me the painting of Durga (পট) before that date ?

এ চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে, যদুনাথের আঁকা পটচিত্র গগনেন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল। যদুনাথের শেষ জীবন তাঁর পৌত্র তারিণীচরণের বারাণসীর বাসাতেই কেটেছিল। লিখিত বৃত্তান্তে জানা যায়, 'শেষে যদুনাথকে সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যান এবং সেখানে যদুনাথের নাতিকে মৃৎশিল্প নির্দেশকের চাকুরী দেন।'

১৯২৯ সালের ২৫শে নভেম্বর বারানসী প্রবাসে দৈবের বশে তাঁর মৃত্যু হয়। অসামান্য প্রতিভাবান, অত্যাশ্চর্য শিল্পকুশল এই তেজস্বী বাঙালির উত্থান-পতন কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের মতোই গৌরবময় ও নৈরাশ্যমণ্ডিত। তাঁর এককালের অর্গলবদ্ধ বসত বাড়ির মত যদুনাথের শিল্পকর্মগুলিও আজ কুহেলিধূসর। শুধু বারাণসীতে আছে মদনমোহন মালব্যের মূর্তি। আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ম্লান প্রকোষ্ঠে রয়েছে পরিচয়বিহীন বিদ্যাসাগর মূর্তি।

পাদটীকা

১। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ বিষয়ে বিস্তারিত ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস জানতে গেলে উৎসাহী পাঠক 'সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস', কলকাতার গ্রন্থাগারে পাবেন বর্তমান নিবন্ধ-লেখকের রচিত একটি মনোগ্রাফ।

২। যদুনাথ পালের বংশ তালিকা (প্রপৌত্র রবীন্দ্রনাথ পালের সৌজন্যে প্রাপ্ত) :
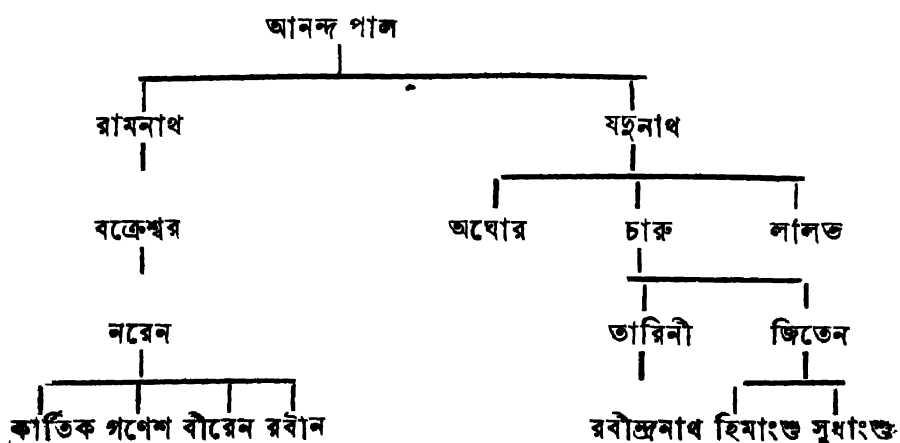
হিতেশরঞ্জন সান্যাল

পোড়ামাটির মূর্তিশিল্প

বাংলায় স্থাপত্যালঙ্কারে উদ্ভব

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক

পোড়ামাটির কাজ বাংলার অন্যতম প্রধান শিল্প। প্রাচীন কাল হইতে পোড়ামাটির অলঙ্কৃত ফলক, চিত্রিণী ইষ্টক, দিয়া মন্দিরাদির দেওয়াল সাজাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক হইতে ইহার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টম-নবম শতকে নির্মিত ময়নামতী, পাহাড়পুর, মহাস্থান, বিরাট প্রভৃতি স্থানের বিপুলায়তন মন্দিরগুলির দেওয়াল বড়-বড় পোড়ামাটির উৎকীর্ণ ফলক দিয়া সাজান হইয়াছিল। মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ হইতে বহু অলঙ্কৃত মৃৎফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ফলকগুলিতে মূর্তিই বেশি দেখা যায়। ফুল, লতা, পাতার অলঙ্কার ব্যবহার হইয়াছে মূর্তির আনুষঙ্গিক হিসাবে। নবম হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নির্মিত ইট দিয়া তৈরি নাগর বর্গীয় মন্দিরেও পোড়ামাটির অলঙ্কার আছে। তবে এই মন্দিরগুলিতে ফলকের সংখ্যা কম। কাটা ইটের ফুলকারি ও অন্যান্য নকশা দিয়াই বেশির ভাগ অলঙ্কার রচিত হইয়াছে। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে দেওয়ালের উপর মূর্তিফলক দেখা যায়। বোলাড়ার (বাঁকুড়া জেলা) সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরে এইরূপ তিনটি ফলক আছে। নবম হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে মন্দির তৈরিতে পাথরের ব্যবহারও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কিন্তু পাথরেও ফুলকারি নকশাই বেশি, মূর্তির অলঙ্কার বিশেষ নাই।

ত্রয়োদশ শতক হইতে প্রায় আড়াইশত বৎসর বাংলায় মন্দির নির্মাণে ছেদ পড়িয়াছিল। কিন্তু স্থাপত্যালঙ্কার শিল্পের চর্চা অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। ত্রয়োদশ শতকে নবাগত মুসলমান বিজেতাগণ ইসলামি স্থাপত্যের প্রবর্তন করেন। ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে নির্মিত মসজিদ, মজার প্রভৃতি মুসলমানদের ধর্মীয় সৌধসমূহের গাত্রালঙ্কার ফুলকারি নকশা দিয়া

তৈরি। মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কারণ ইসলামের নিয়ম অনুসারে মানুষ বা পশুপক্ষীর মূর্তি তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে মন্দির-স্থাপত্যের চর্চা আবার নূতন করিয়া শুরু হয়। নূতন মন্দিরগুলির গাত্রালঙ্কারেও ফুলকারি নকশার প্রাধান্যই দেখা যায়। বোধ করি শিল্পী ও স্থাপয়িতাগণ পূর্বের সংস্কার কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াই মূর্তির ব্যবহার বিশেষ করিতেন না। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে ফুলকারি নকশার সঙ্গে দুই-একটা করিয়া মূর্তি দেওয়া হইতে থাকে। তবে অনেক মন্দিরের গাত্রালঙ্কারে একটিও মূর্তি নাই। মূর্তির বহুল প্রচলন হইতে প্রায় একশত বৎসর লাগিয়াছিল। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে মন্দিরের গাত্রালঙ্কারে মূর্তির স্থানই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ফুলকারি নকশা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে পরিগণিত।

দেখা যাইতেছে বহুদিন পোড়ামাটির স্থাপত্যালঙ্কারে মূর্তির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল না। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় যখন মন্দিরের গাত্রালঙ্কারে মূর্তির ব্যবহার আরম্ভ হয় তখন মাটির ফলকে মূর্তি খোদাইয়ের কাজ নতুন করিয়া আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। নূতন শৈলী কী ভাবে গড়িয়া উঠিল এখন তাহার আলোচনা করিব। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের কতগুলি মন্দিরের গাত্রালঙ্কার হইতে নূতন শৈলী উদ্ভবের সূত্র পাওয়া যাইবে।

গোকর্ণ গ্রামে (মুর্শিদাবাদ) নৃসিংহদেবের একটি মন্দির আছে। মন্দিরটির মুখভাগে কতকগুলি উৎকীর্ণ মৃৎফলক সাজান রহিয়াছে। ফলকগুলি সম্ভবত বর্তমান মন্দিরের নয়। আদি মন্দিরটি ভাঙিয়া গেলে তাহার গাত্রালঙ্কারের ফলকগুলি তুলিয়া আনিয়া বর্তমান মন্দিরের গায়ে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলকগুলির মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠালিপি আছে। ইহাও আদি মন্দিরের বলিয়াই মনে হয়। লিপিটির সাক্ষ্য অনুসারে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ। নৃসিংহ মন্দিরের গায়ে সাজান ফলকগুলি ষোড়শ শতকের শেষদিকে তৈরি করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

নৃসিংহ মন্দিরের মুখভাগে দুই ধরনের মূর্তি আছে। এক ধরনের মূর্তি দেখিলে বোঝা যায় যে শিল্পীগণ মূর্তি গঠনের কৌশল ভালোই জানিতেন। ফলকের উপর মূর্তি বেশ গভীরভাবে খোদাই করা। দেহের ভঙ্গ অনেক প্রকার এবং বৈচিত্র্যময়। তবে মূর্তিগুলির আকার হ্রস্ব, দেহ স্থূল, ভারি এবং

কঠিন মাংসল। দেহের গড়নও খুব বলিষ্ঠ নয়। কমনীয়তা বা লালিত্য বিশেষ নাই। মুখভাব প্রায় ভাবলেশহীন। আচরণে বা ক্রিয়ায় গতির কোনো ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ বৈশিষ্ট্য ঘুড়িষার (বীরভূম) রঘুনাথ (বর্তমানে শিব) মন্দিরের (প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৩৩) মূর্তিসমূহে এবং বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) শ্যাম রায় মন্দিরের (১৬৪৩) কিছু মূর্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে শ্যামরায় মন্দিরের মূর্তিগুলিতে, বিশেষ-ভাবে পূর্বদিকের মুখভাগে ছাজার নীচে বসানো রাম ও রাবণের মূর্তিতে, অঙ্গসৌষ্ঠব কিছুটা বেশি। গতির ইঙ্গিতও এই মূর্তি দুইটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শৈলীর প্রশ্নে গোকর্ণ, ঘুড়িষা ও বিষ্ণুপুরের মূর্তিগুলির সঙ্গে ওড়িশার চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকীয় পাথর ও কাঠের ভাস্কর্যকলার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। ত্রয়োদশ শতকের পর হইতে ওড়িশার আঞ্চলিক ভাস্কর্যে সৃজনশীলতা লোপ পায়। কিন্তু ওড়িয়া শিল্পীদের কারিগরি পটুত্ব বহুদিন ছিল। ওড়িশার চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকীয় মূর্তিগুলি খুব গভীরভাবে খোদাই করা। দেহ পরিপুষ্ট এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ ও বর্তুল। দেহের গড়নও বেশ দৃঢ়। বস্ত্রালঙ্কারের সজ্জা ভালোভাবেই দেখান হইয়াছে। প্রথাবদ্ধ এক ধরনের লাবণ্যও এই মূর্তিগুলিতে আছে। কিন্তু ইহাদের ভাব ও ভঙ্গিতে প্রাণ নাই। রেখা ক্রমশ কঠিন ও নিশ্চল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া দেহের সাবলীলতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অবশেষে মূর্তিগুলি হইয়া উঠিয়াছে কঠিন এবং স্থাণু। দেহের ভঙ্গে গঠনগত বৈচিত্র্য আছে বটে কিন্তু ভাবগত তাৎপর্য নাই।

গোকর্ণের দ্বিতীয় ধরনের মূর্তি অপটু হাতে গড়া কাঠ-খোদাইয়ের কাজের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হাতুড়ি বাটালি দিয়া কাঠ খোদাই করিতে গেলে প্রথম দিকে কাঁচা হাতের খোদাই খুব গভীর হয় না। সরলরেখায় দাগ টানা হয় বলিয়া কোণগুলি হইয়া উঠে তীক্ষ্ণ ও কর্কশ। ফলে মূর্তি সমতলবদ্ধ ও কোণাল হয়। গোকর্ণের মন্দিরে শ্রীদেবীর মূর্তিটি এইরকম। অনুরূপ মূর্তি বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলা নামে খ্যাত কৃষ্ণ রায় মন্দিরে (১৬৫৫) আছে। কাঁচা হাতে পাথর খোদাই করিতে গেলেও ফল একই রকম হইবে। তবে সমকালীন বাংলায় পাথরের কাজ নূতন করিয়া শুরু করিবার আবশ্যক ছিল না। কিন্তু কাঠের দরজা-জানালার সরদল, পাড় ও পাল্লায় এবং চালের কাঠামো গড়িবার কাঠের আড়া, মুদোন ও কোনাচের উপর খোদাই কাজের চাহিদা বাড়িতেছিল। তাই নূতন করিয়া কাঠ-খোদাইয়ের কাজ শেখা

অনেকের দরকার হইয়া পড়ে।

গঠন-কৌশল খানিকটা আয়ত্ব হইবার পর কাঠ-খোদাইয়ের কাজ যে-রকম হয় তাহার মতো মূর্তি আছে বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণ রায় মন্দিরে, দিগনগরের(নদীয়া) রাঘবেশ্বর শিব মন্দিরে (১৬৬৯) এবং বোরাগড়ের (হুগলী) গোপাল মন্দিরে (১৬৭৯)।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে আর-এক ধরনের মূর্তি প্রচলিত হয়। এই মূর্তিগুলির সাবলীল স্বচ্ছন্দ রেখাপ্রবাহ অনেকটা পটের টানা রেখার মতো। পটে যেমন একটানে রেখা আঁকা হয়, লোহার ছুরি বা নরুন অথবা বাঁশের চাঁচ দিয়া, তেমনি একটানে মাটির ফলকে রেখা কাটিয়া মূর্তি গড়া হইয়াছে। সাধারণত পটে বর্ণিকাভঙ্গ দেখা যায় না। এই মূর্তিগুলিতেও ঢাল নাই। সূক্ষ্মাগ্র চিবুক ও তীক্ষ্ণ কোনাল নাক হইতে কান পর্যন্ত টানা প্রশস্ত ও ছড়ান মুখমণ্ডল ও টানা পটলচেরা চোখ অনেকটা ওড়িশার পটের মতো। রংয়ের প্রভাবে পটের ছবিতে অনেক ক্ষেত্রে একটা কোমল ভাব থাকে। এই মূর্তিগুলির দেহেও কোমলতার লক্ষণ আছে। গড়নের দোষে মূর্তিগুলিতে আড়ষ্টতা থাকিলেও কিছুটা সজীব ভাব এবং লাবণ্যশ্রী দৃষ্টি-গোচর হয়। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য (ষোড়শ শতকের শেষ বা সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে) কর্তৃক ধূমঘাটে নির্মিত যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরের অলঙ্করণে এই ধরনের মূর্তির আদিরূপ দেখা যায়। মন্দিরটি কয়েকটি ফলক এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। একটু উন্নত কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইবে বৈদ্যপুরের (বর্ধমান) দেউলে (১৫৯৮), সুলতানপুরের (হাওড়া) খটিয়াল শিবমন্দিরে (১৬৬৬), দিগনগরের রাঘবেশ্বর শিবমন্দিরে (১৬৬৯) ও বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরে (১৬৯৪)।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে আরও এক ধরনের মূর্তি উদ্ভূত হইয়াছিল। এই মূর্তিগুলি কাঠ বা রং দিয়া মূর্তি করার অভিজ্ঞতা নিয়া তৈরি করা হয় নাই। দেখিলে মনে হয় শিল্পীরা সরাসরি মৃৎফলক খোদাই করিয়া মূর্তি করিবার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। গঠন কৌশলে অপটু হাতের ছাপ অত্যন্ত পরিষ্কার। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় সরলরেখায় টান করিয়া গড়া। সমস্ত দেহের কাঠামো একটা নির্দিষ্ট দিকে বাঁধা। বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণ রায় মন্দিরে অসুর-গণের সহিত কালীর যুদ্ধের দৃশ্যটি এই ধরনের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আক্রমণোদ্যত কালীর মূর্তিটিতে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ও আদিম উদ্দামতা ফাটিয়া

ফাটিয়া পড়িতেছে। সরলরেখায় গড়া টানা দেহটি সামনের দিকে ঝুঁকিয়া থাকিবার ফলে প্রচণ্ড উদ্দামবেগ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। কৌম জীবনের অমার্জিত প্রত্যক্ষভাব ও উগ্রতা মূর্তিটিতে খুব স্পষ্ট।

প্রধানত এই চারটি ধারার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে পোড়ামাটির স্থাপত্যালঙ্কারে মূর্তি রচনার স্বতন্ত্র শৈলী উদ্ভূত হয়। পোড়ামাটির স্থাপত্যালঙ্কারে মূর্তি শিল্পের নির্দিষ্ট মানও এই সময় গড়িয়া উঠিয়াছিল। মানসম্মত মূর্তিতে খোদাই করিবার কৌশল নেওয়া হইয়াছে প্রথম ধরনের মূর্তি হইতে। দ্বিতীয় ধরনের মূর্তিতে যে-সংযম প্রত্যক্ষ করা যায় তাহার মধ্যে তৃতীয় ধরনের মূর্তি হইতে নেওয়া স্বচ্ছন্দ রেখা, সজীব কোমলতা ও লাবণ্য সঞ্চার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে একটা প্রাণবন্ত ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। প্রাণবন্ত ভাব চতুর্থ ধরনের মূর্তি হইতে গৃহীত। তবে সংযম ও শাসনে তাহার প্রবলতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। আবার গভীরভাবে কাটিয়া নমনীয় দেহ গড়িবার চেষ্টায় দেহের অঙ্গও ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে। ভঙ্গি যে প্রচণ্ড ও উদ্দাম হইয়া উঠিতে পারে নাই ইহা তাহার অন্যতম কারণ। তবে মানসম্মত মূর্তিতেও ভাব ও ভঙ্গির বৈচিত্র্য কম এবং ব্যঞ্জনা গভীর অর্থবহ নয়। জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, জটিল মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কোনো পরিচয় মানসম্মত মূর্তির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় স্থাপত্যালঙ্কারের জন্য মূর্তি তৈরি করিবার প্রশ্ন যখন উঠিল তখন মৃৎফলক কাটিয়া মূর্তি গড়ার অভিজ্ঞতা শিল্পীদের ছিল না। তাই অন্যান্য জিনিস দিয়া যাঁহারা মূর্তি করিতেন, মৃৎফলকে মূর্তি গড়িবার জন্য তাঁহাদের ডাকিয়া আনা হইল। তবে মূর্তি গড়ার কাজ জানা শিল্পীদের খুঁজিয়া পাইতে খুব অসুবিধা হয় নাই। কারণ, ইঁহারাও স্থাপত্যালঙ্কার শিল্পীদের মতো সূত্রধর জাতির লোক। অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞাতি-গোষ্ঠিও হইয়া থাকিতে পারেন। এখন সূত্রধরগণ প্রধানত কাঠের দরজা, জানালা এবং আসবাবপত্র তৈরি করেন। কিন্তু কিছুদিন আগেও সূত্রধরগণ অনেকরকম শিল্পকর্ম জানিতেন। তাঁহারা কাঠ, পাথর, হাতির দাঁত ও মাটিতে নানাপ্রকার মূর্তি ও নকশা খোদাই করিতেন। বাড়ি, মন্দির ও রথের গায়ে এবং পুথির পাটা ও পাতায় ছবিও তাঁহারা আঁকিতেন। সূত্রধরগণ অনেকেই এখনও পূজার প্রতিমা গড়িয়া দেন। আবার সূত্রধরগণ স্থপতির কাজও করিতেন। পাকাবাড়ি, মন্দির প্রভৃতি গড়ার কাজ তাঁহাদের

বৃত্তির অন্তর্গত। বাংলায় এখন যে-অসংখ্য মন্দির দেখা যায় তাহার অধিকাংশই সূত্রধরগণের হাতে তৈরি। স্বজাতির মধ্যে বিভিন্ন রকম শিল্পবিদ্যা প্রচলিত ছিল বলিয়া চারটি পৃথক ধরনের মূর্তি হইতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য একত্রিত করিয়া একটা স্বতন্ত্র শৈলী সৃষ্টি করা সূত্রধর শিল্পীগণের পক্ষে তুলনায় সহজ হইয়াছিল। তবে এই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্থাপত্যালঙ্কারে মূর্তিশিল্পের বিকাশ বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। মন্দিরগাত্রের অলঙ্কারে অনেকরকম দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে দেশীয় অভিজাতবর্গের জীবনযাত্রা, বিদেশী বণিকগণের কার্যকলাপ প্রভৃতি নানা দৃশ্য দেখা যায়। বিষয়বস্তুর এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মূর্তিগুলিতে ভাবের বৈচিত্র্য নাই। মন্দিরগাত্রে বহুসংখ্যক মূর্তি সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। সবগুলি মিলিয়া একটা বিস্তৃত ডিজাইন গড়িয়া উঠে। কিন্তু তাহার মধ্যেই মূর্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য লোপ পাইয়া যায়। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনোটিকে পৃথক করিয়া চিনিয়া নেওয়া যায় না।

বিদ্যা মুন্সী যুদ্ধে দেখা থিয়েটার—ইংল্যাণ্ডে

একটু আত্মকথা এসেই পড়ছে, শুরুতে।

ছোটবেলা থেকেই আমাদের পরিবারে একটা রেওয়াজ ছিল এক সঙ্গে বসে পড়ার। একজন পড়তেন, বাকিরা গোল হয়ে বসে শুনত। আমার বাবা ছিলেন আইনজীবী, সারাদিন তার প্র্যাকটিস্ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু রবিবার কিংবা অন্যান্য দিন সন্ধ্যায় যখনই বাবা খানিকটা সময় করে নিতে পারতেন তখন বসত আমাদের পড়ার আসর। বাবা তার গমগমে সুরেলা গলায়, অসাধারণ স্পষ্ট উচ্চারণে আমাদের বই পড়ে শোনাতেন—কখনো গুজরাতি, কখনো ইংরাজি ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য থেকে। বহুবার একই বই পডতে-পড়তে তাঁর প্রায় মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল পাতার পর পাতা। কখনো-কখনো আমরা ভাই-বোনেরাও পড়তাম যে সব বই আমরা সবে আবিষ্কার করেছি অর্থাৎ সেই প্রথম পড়ছি এবং খুব মজা পেয়েছি। আমাদের সেই পড়ার আসরে একনিষ্ঠ শ্রোতা ছিলেন আমার মা। আমার ছোট ভাই, তার বয়স তখন বই পড়া শুনে বোঝার মত নয়, কিন্তু সেও কান পেতে শুনত—হয়তো একসময় দেখতাম সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পড়ার ব্যাপারে বাছ-বিচার বড় একটা ছিল না—প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, বিভিন্ন বিষয়ে রচনা, নাটক সব পড়া হত। এমন কি সাময়িক পত্রিকা থেকে ভালো-ভালো প্রবন্ধও পড়া হত, কিন্তু এ ব্যাপারে বাবার ঘরানাটা ছিল একটু ভিন্ন জাতের। বাবা বিশ্বাস করতেন যে ইংরাজি ভাষায় ভালো সাহিত্য ভিক্টোরিয়ায় যুগের পরে আর লেখা হয় নি। সুতরাং যখন ইংরাজি সাহিত্যের পাঠ হত বাবা তখন শেকস্পিয়র, টেনিসন এবং ডিকেন্স-এর খানদানি চৌহদ্দির বাইরে বড় একটা যেতে চাইতেন না। তবে মাঝে-মাঝে 'আধুনিক' লেখক হিসাবে বার্ণার্ড শ থেকে কচিৎ-কদাচিৎ পড়ে শোনাতেন। ব্যস্ ঐ পর্যন্ত।

বাবা তাঁর অল্প বয়সে চমৎকার ধাঁধাই শেকস্পিয়রের রচনাবলীর একটি পুরনো সেকেণ্ড হ্যাণ্ড এডিশন কিনেছিলেন। আমার এখনও মনে পড়ে, লালচে বাদামি মরক্কো লেদারে বাঁধানো, পাতার ধারগুলোতে সোনালি রঙ করা সেই বই। পুরনো হয়ে যাওয়ার ফলে পাতাগুলো হলদেটে হয়ে গেছে। জীর্ণও হয়েছে খানিকটা। সার হেনরি আরভিং, এলেন টেরি এবং অন্যান্য ইংরেজ অভিনেতা-অভিনেত্রী, যারা বহুযুগ আগে শেকস্পিয়রের নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাদের অনেকের ছবি ছিল বইটিতে।

আমি তখনও শেকস্পিয়রের কোনো নাটক দেখি নি। তবু পাঠ্য বইয়ে 'পূর্বাপর সম্পর্ক উল্লেখ পূর্বক' শেকস্পিয়রের অমুক চরিত্রের ব্যাখ্যা লেখ এই বিরক্তিকর একঘেয়েমির মধ্য দিয়েই তখন আমার শেকস্পিয়রের সঙ্গে পরিচয়ের শেষ নয়—শেকস্পিয়র তখন থেকেই আমার কাছে প্রাণবন্ত নাটকের মধ্য দিয়ে পরিচিত। এটা ঘটতে পেরেছিল আমাদের সেই পারিবারিক পাঠচক্রের ফলে।

সেটা আমার স্কুলের শেষ বছর অর্থাৎ স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ঢুকব কলেজে। সেই বছর স্কুল থেকে প্রাইজ পেলাম দুই খণ্ডে 'ল্যাম্বস্ টেলস্ ফ্রম শেকস্পিয়র।' শেকস্পিয়রের যে নাটকের মূল পাঠের সঙ্গে তখনো আমার পরিচয় হয় নি প্রাইজে পাওয়া বইতে তারও অনেকগুলির গল্পাংশের একটা আভাস পেলাম।

এরপর, বয়স তখন আমার আঠারো কি উনিশ। ঠিক হল, আমি ইংলণ্ডে যাব পড়াশুনা করতে। শেকস্পিয়রের নিজের দেশে তার নাটকের অভিনয় দেখতে পাব! মন নেচে উঠল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার এক বছর আগে ১৯৩৮ সালের অগস্ট মাসে আমি লণ্ডনে পৌঁছলাম। কিন্তু লণ্ডন আমাকে হতাশ করল।

ওয়েস্ট এণ্ড হচ্ছে লণ্ডনের থিয়েটার-পাড়া। খুঁজে-খুঁজে এমন একটা থিয়েটার হল দেখলাম না যেখানে তখন শেকস্পিয়রের নাটকের অভিনয় হচ্ছে। পরিচিতদের জিজ্ঞেস করে জানলাম—স্ট্র্যাটফোর্ড অন অ্যাভন-এ যে শেকস্পিয়র মেমোরিয়াল থিয়েটার আছে সেখানে অথবা মফঃস্বলের কিছু অখ্যাত ছোট থিয়েটার হল ছাড়া আর কোথাও আমি শেক্সপিয়রের নাটকের অভিনয় দেখতে পাবো না। তবে, যদি ওয়েষ্ট এণ্ড এর কোন খানদানি থিয়েটার হলে শেকস্পিয়রের নাটকের অভিনয় দেখতে চাই তাহলে আমাকে প্রায় এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। কারণ শেকস্পিয়রের নাটকের অভিনয় অত্যন্ত

ব্যয়সাপেক্ষ আর তাছাড়া শেকস্পিয়র তখন আর এত জনপ্রিয় নয়। এক-মাসও চলে না কোনো হলে তার নাটক। পয়সা দেনেওয়ালা প্রডিউসারেরা নিছক কেন শেক্সপিয়রের নাটকে পয়সা ফেলবে? তার চেয়ে তারা 'ড্রয়িংরুম কমেডি' কিংবা জনপ্রিয় কোখনো বিচিত্রানুষ্ঠানে পয়সা ঢেলে অনেক বেশি মুনাফা করতে পারে। সুতরাং আমার আঠারো-উনিশ বছরে শবরীর প্রতীক্ষা শুরু হল—কবে শেকস্পিয়র আসবে তার জন্য।

কিন্তু একালের সেই শবরীকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। ইংলণ্ডে পৌঁছনোর মাস কয়েকের মধ্যে সম্ভবত ১৯৩৯ সালের বসন্ত-কালে শুনলাম কয়েকজন ভারতীয় বন্ধুর একটা দল গাড়ি করে যাচ্ছে স্ট্র্যাটফোর্ডে। ভিড়ে পড়লাম তাদের দলে।

স্ট্র্যাটফোর্ডে আমি সেই প্রথম 'রিচার্ড দ্য থার্ড'-এর অভিনয় দেখি। 'রিচার্ড দ্য থার্ড' নাটকের সঙ্গে আমার পরিচয় তার আগে হয় নি; যদিও এক দশক বাদে যখন আমি ইংলণ্ড ছেড়ে আসছি তখন ইতিমধ্যেই এটি হয়ে উঠেছে আমার সবচেয়ে বেশি বার দেখা নাটক। সব মিলে তিনবার আমি 'রিচার্ড দ্য থার্ড'-এর অভিনয় দেখেছিলাম। স্ট্র্যাটফোর্ডে নাম-ভূমিকায় কে অভিনয় করেছিল আজ আর মনে নেই। পরের দুবার রিচার্ডের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ডোনাল্ড উলফিট এবং খোদ লরেন্স ওলিভিয়র।

আশ্চর্য, তিন-তিনবার 'রিচার্ড দ্য থার্ড'-এর অভিনয়ে—রাজা রিচার্ডকে তিনটি বিভিন্ন, পৃথক চরিত্রের মানুষ বলে মনে হয়েছিল। প্রথমবার মনে হয়েছিল রাজা রিচার্ড ছিলেন একজন 'ভিলেন' যাকে দেখলেই মন বিষিয়ে ওঠে। দ্বিতীয় নাটকের অভিনয়ে মনে হয়েছিল রাজা রিচার্ড ছিলেন আমাদের যাত্রার ধরনের একাধারে 'ভিলেন', অন্যদিকে নায়ক-এর একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। ওল্ড ভিক থিয়েটারে লরেন্স ওলিভিয়র অভিনীত রিচার্ড দ্য থার্ডকে দেখলাম—এক মর্মান্তিক চরিত্র। যার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাকে অক্ষম করে দিয়েছে। মানসিক দিক থেকে সে অত্যন্ত তিক্ত, বিরক্ত এবং অনেক সময়েই মনে হয়েছে প্রতিহিংসাপরায়ণ, ছোবল মারার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু তবু, তার নিজের কৃত অন্যায়ের তুলনায় তার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার পরিমাণ অনেক, অনেক বেশি। এই রিচার্ড দ্য থার্ড দর্শকদের সমবেদনা সবটুকু কুড়িয়ে নিয়ে যায় মঞ্চ থেকে। আমার এ অভিজ্ঞতা অনেক পরে হয়েছে। কারণ স্ট্র্যাটফোর্ড-এ আমি মেমোরিয়াল থিয়েটার-এর অত্যাধুনিক বাড়ি অথবা শেকস্পিয়রের নাটকের অভিনয় দেখতে

যতটা আগ্রহী ছিলাম তার চেয়েও আমার বেশি আগ্রহ ছিল যে-বাড়িতে শেকস্পিয়র জন্মেছিলেন, অথবা হাঁসুলি বাঁকের মতো আঁকাবাঁকা আভন নদীর পারে শেকস্পিয়রের স্ত্রী অ্যান হ্যাতওয়ে যে কুটিরে দিন কাটাতেন তাই দেখার জন্যে।

অবশ্য এর আগের কয়েক মাসে ওয়েস্ট এণ্ড-এর বিভিন্ন থিয়েটারে আমি কিছু-কিছু অভিনয় দেখে নিয়েছিলাম। নোয়েল কাওয়ার্ড-এর কমেডি 'প্রাইভেট লাইভস্'; ডেসার্ট সঙ নামে গীতিনাট্য গোছের একটি নাটক যেটি বহুদিন একনাগাড়ে হাউসফুল যাচ্ছিল; এ ছাড়া টেরেন্স ব্যাটিগান-এর 'টোনি ড্রস্ আ হর্স'। শেষোক্তটি অবশ্যি খুব একটা গভীর নাটক নয়। সম্ভবত ঐ নাটকটিই আমি ইংলণ্ডে এসে প্রথম দেখি বলে আমার এখনও মনে আছে।

এই তিনটি নাটক দেখার পর আমি স্থির করলাম এবার থেকে যেটুকু পয়সা বাঁচাতে পারি তা দিয়ে ফিল্ম দেখব। টোটেনহাম কোর্ট রোড টিউব স্টেশনের কাছে একদিন 'অ্যাকাডেমি' নামে একটা ছোট সিনেমা হল আবিষ্কার করলাম। এখানে নিয়মিত বিদেশী ছবি দেখান হত। এখানেই আমি আমার জীবনের প্রথম সোভিয়েত ফিল্ম দেখি। তাছাড়া দেখেছি কিছু ফরাসী ফিল্ম এবং একটি খুব সুন্দর মেক্সিকান ডকুমেন্টারি।

হিটলার তখন থার্ডরাইখের সীমান্ত বাড়িয়ে চলেছে একের পর এক দেশ গ্রাস করে। প্রথমে অস্ট্রিয়া, তারপর সুদেতান ল্যাণ্ড, পরে গোটা চেকোশ্লোভাকিয়া। ব্রিটিশ শাসক শ্রেণী এবং তাদের টোরি গবর্ণমেন্ট-এর ফ্যাসিজম—তোষণনীতি সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকানো গেল না। ১৯৪০ সালের জুন মাস নাগাদ পূর্বে রাশিয়া এবং পশ্চিমে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এর মাঝে দু-একটি খুচরো জায়গা ছাড়া প্রায় সমগ্র ইওরোপ নাৎসি বাহিনীর পদানত। ইংলণ্ডে আগ্রাসনের জন্য প্রস্তুত বিপুল নাৎসি বাহিনী তখন ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে। লণ্ডন নিষ্প্রদীপ। কঠোর ব্লাক আউটের কানুন মেনে চলতে হচ্ছে। অন্যান্য সাধারণ নাগরিকদের মতোই অসংখ্য অভিনেতা ও থিয়েটারের লোকেরা সেনাবাহিনীতে চলে গিয়েছে। পেশাদার থিয়েটারগুলির তখন খুবই দুর্দশা।

১৯৪০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর শুরু হল লণ্ডনের উপর নাৎসি বিমানবাহিনীর ব্লিৎস্ক্রিগ আক্রমণ। রাতের পর রাত সেই প্রাচীন নগরীর উপর স্বস্তিকার তিলক আঁকা, কালো শকুনের মতো নাৎসি বিমানবহর মৃত্যু ও ধ্বংস যেন

প্রসঙ্গ ঃ 'পোড়ামাটির মূর্তিশিল্প'

ওপরে, বাঁয়ে—মহিষমর্দিনী, নৃসিংহ মন্দির, গোকর্ণ (মুর্শিদাবাদ)।

ডাইনে—শ্রী, নৃসিংহ মন্দির, গোকর্ণ

নীচে বাঁয়ে—কন্যা, বাঘেশ্বর শিব মন্দির, দিগনগর (নদীয়া)

ডাইনে—অসুরগণের সহিত কালীর যুদ্ধ, কৃষ্ণরায় মন্দির (জোড়বাংলা), বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)

ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। শুধু ফ্যাক্টরি আর বাড়ি ঘরদোর বিমান আক্রমণে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তা নয়, ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি, হাউস অব লর্ডস ও ন্যাশানাল গ্যালারি নাৎসি বোমার আঘাত থেকে মাথা বাঁচাতে পারে নি। অসংখ্য থিয়েটার ও কনসার্ট হলেরও একই দশা। রাত হলেই হাজার-হাজার লণ্ডনবাসী মেয়ে, শিশু, পুরুষ কাছের ভূগর্ভ রেল স্টেশনে গিয়ে আশ্রয় নেয়—একটু যদি ঘুমোতে পারা যায়। পরদিন ভোরে তাদের অনেকেই বাড়ি ফিরে হয়তো দেখে যেখানে কাল সন্ধ্যায়ও তাদের আশ্রয় দাঁড়িয়েছিল সেখানে বোমার আঘাতে পুকুরের মতো গর্ত হাঁ করে আছে। তথাপি হিটলারের স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল তারা। ঝটিকা আক্রমণের সেই ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ডের মানুষের বাঁচার জন্য একরোখা, অপরাজেয় একটা প্রবল ইচ্ছা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল।

মাথার উপরে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা। তথাপি এয়ার রেড শেলটারগুলিতে সেই ভিড়ের মধ্যেও জীবনকে যতটা আরামদায়ক, যতটা সহজ করা যায় তার অবিরাম চেষ্টা চলছে। কিছু কিছু সংস্কৃতি সংগঠন এয়ার রেড শেলটারে গান বাজনার স্বতঃস্ফূর্ত আসর জমাত। শিল্পীদের অনেকেও তো সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গেই এয়ার রেড শেলটারে আশ্রয় নিয়েছে—তারাও লেগে যেত এই সব অ্যামেচার গান বাজনার আসরে। সেই কঠিন দুর্দিনের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক মানুষই উপলব্ধি করেছিল জীবন ও সভ্যতার বিরুদ্ধে নাৎসিদের সামগ্রিক আক্রমণকে প্রতিহত করতে হলে যেমন ফাইটার প্লেন চাই অথবা ক্ষুধার সময় খাবার চাই, তেমনি চাই মনকে চাঙা রাখার জন্য মনের খোরাক। ক্রমশ ক্রমশ ইংলণ্ডে পৌর কর্তৃপক্ষ এবং গবর্ণমেন্টও এই সত্যকে স্বীকৃতি দিতে লাগল।

প্রতি রাতে নাৎসি বিমান আক্রমণের ফলে সন্ধ্যার কনসার্টের পাট উঠে গেছে। কিন্তু তার জায়গায় এলো ট্রাফালগার স্কোয়ারে ন্যাশন্যাল গ্যালারির সিঁড়ির উপর প্রত্যহ দুপুরে লাঞ্চের সময় কনসার্ট। শুধু লণ্ডনে নয় স্টার বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেস্টার ইত্যাদি শহরের কাউন্টি কাউন্সিলও এই ধরনের কনসার্টের আয়োজন করেছিল দিনের বেলা। বিখ্যাত কনডাকটর ম্যালকম সারজেন্ট টমাস বিচাম, বিশ্ববিখ্যাত অর্কেস্ট্রা লণ্ডন ফিলহারমনিক কিংবা বৃটিশ সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা ; পিয়ানিস্ট মায়রা হেস-এর মতো প্রখ্যাত সব শিল্পীরা এইসব কনসার্টে অংশগ্রহণ করতেন। অফিসে কাজ করে যে মেয়েরা, তারা দলে দলে আসতো, সারা রাত্রির ডিউটি শেষ করে আসতো ক্লান্ত এয়ার

রেড ওয়ার্ডেনরা। ছুটিতে যে-সব সৈন্য বাড়ি এসেছে তারা আসত আর আসত, দলে দলে শ্রমিক—লাঞ্চের ছুটির সময়। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে কিংবা ঘাসের উপর বসে স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে তারা ধ্রুপদী বাজনা শুনত বিশ্ববিখ্যাত সংগীত স্রষ্টাদের—হয়তো জীবনে তাদের এই প্রথম ক্ল্যাসিকাল মিউজিক শোনা।

সেই বছরেই অক্টোবরের মাঝামাঝি এলো 'লাঞ্চ টাইম শেক্সপিয়র', লাঞ্চের সময়ে শেক্সপিয়রের অনুষ্ঠান। তরুণ অভিনেতা ডোনাল্ড উলফিট চালু করলেন ব্যাপারটা। সপ্তাহে সামান্য ১০ পাউণ্ড দিয়ে উলফিট স্ট্রাণ্ড থিয়েটার ভাড়া নিলেন। থিয়েটার জগতে তারই সমতুল্য কিছু খ্যাতনামা শিল্পীকে জুটিয়ে উলফিট অনুষ্ঠান শুরু করলেন। অভিনেতাদের সম্মানী ছিল সপ্তাহে তিন গিনি—খরচ খরচার জন্য। ঘণ্টা খানেকের প্রোগ্রাম—শেক্সপিয়রে বিভিন্ন নাটকের অংশের অভিনয়। প্রবেশ মূল্য এক শিলিং একেবারে ঢালাও হার। প্রথমদিন দর্শকের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ থেকে ষাটের মতো, সুষ্ঠু ভাবেই অভিনয় হয়ে গেল। পরের দিন স্ট্রাণ্ড থিয়েটারের একেবারে পিঠের ওপর বোমা পড়ে ড্রেসিং রুম ধ্বংস হয়ে গেল—মঞ্চের উপর প্রায় কয়েক ইঞ্চি পুরু ধুলোবালির জাজিম পেতে দিয়ে গেল নাৎসি বোমা। কিন্তু অভিনেতারা দমলেন না। অভিনয় শুরু হওয়ার অর্থাৎ পর্দা ওঠার আগে মঞ্চেই অভিনেতারা সাজপোশাক পরে নিলেন—তারপর অভিনয় শুরু হল। একমাসের মাথায় দর্শকদের সংখ্যা হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বেসরকারি উদ্যোগ দেখেই হয়তো সরকারি উদ্যোগে দুটি সংস্থা পরে সারা দেশে সামরিক বাহিনী ও জনসাধারণের চিত্ত বিনোদ-দনের জন্য সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করেছিল।

লণ্ডনে প্রথম দিকের বোমাবর্ষণের পরে, অধিকাংশ বৃটিশ এবং বিদেশী ছাত্রছাত্রী রাজধানী থেকে দূরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমি নিউ কাসেল অন টাইন-এ কিংস কলেজে চলে গেলাম।

উত্তরে ইংলণ্ডে নিউ কাসেল শিল্পসমৃদ্ধ শহর। সেখানে আমি থাকতাম ওয়াই ডব্লু সি-এর হস্টেলে। আমার সঙ্গে অন্যান্য যে-সব আবাসিক ছিলেন তাদের কেউ অফিসে কাজ করতো, কেউ দোকানে অথবা অন্য কোথাও। ছাত্রী ছিলাম মাত্র আমরা জনা কয়েক এবং বিদেশী একমাত্র আমি। ঘর বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে এখানে আমাদের প্রধান

সমস্যা ছিল অবসর সময় কাটাই কি করে। বিশেষ করে সপ্তাহন্তিক অবসর। কেউ কেউ শনিবার নাচের আসরে যেত। কেউ ঘুরে বেড়াত কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে চরণিক হয়ে। বাকিরা যেত সিনেমা বা থিয়েটারে। অল্প কদিনের মধ্যেই আমিও নিয়মিত থিয়েটারে যেতে শুরু করলাম।

নিউ কাসেলের থিয়েটার রয়াল ছিল পুরোনো আমলের বনেদী বাড়িতে। বম্বের অপেরা হাউস অথবা কলকাতার এম্পায়ার পুনর্গঠনের আগে যেমনটা ছিল অনেকটা সেই রকম। মখমল মোড়া চেয়ার, ভেলভেটের পর্দা, দুধারের দেয়াল বরাবর বক্স। এবং পেছনে গ্যালারি। ওয়াই ডব্লু-সিএ-র আবাসিক আমরা বসতাম সবচেয়ে উপরের গ্যালারির একেবারে পিছনের দিকে। টিকিটে লেখা থাকত 'গডস্' অর্থাৎ 'গ্যালারির' অপভ্রংশ। আমরা তাকে বলতাম 'গডস্'। গ্যালারির সেই বিশাল উঁচু থেকে নিচে অনেক দূরে মঞ্চে অভিনয় দেখতাম বললে বোধহয় ঠিক বলা হয় না নিরীক্ষণ করতাম বলা যায়। উপায় ছিল না এ ছাড়া। কারণ প্রতি সপ্তাহে থিয়েটারে যেতে হলে ঐ এক শিলিং ছ পেনির টিকিট ছাড়া আমাদের পয়সায় কুলোতো না। ১৯৪২ সালের শেষ অথবা ১৯৪৩ সালের গোড়ায় যখন আমি কমিউনিস্ট হয়েছি তখন আমার সময় কেটে যেত বিভিন্ন প্রগতিশীল বৃটিশ সংগঠনের সভায় ভারত সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে। তার আগে পর্যন্ত এমন একটাও শনিবার বোধ হয় আসে নি যেদিন আমি থিয়েটারে যাই নি। অবশ্য পরীক্ষার তাগিদ থাকলে যেতে পারতাম না।

বিভিন্ন নাটকের দল ঘুরে-ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত থিয়েটারে হলে নাটক মঞ্চস্থ করত থিয়েটার রয়াল ছিল তার মধ্যে অন্যতম। এমন কি যুদ্ধের আগেও লণ্ডনের নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলির বাছা-বাছা নাটক থিয়েটার রয়ালে দেখা যেত। কারণ পেশাদার নাটকের দল এই সব প্রাদেশিক শহরের হলে প্রথম অভিনয় করে বুঝে নিতে চাইত রাজধানীর নাক উঁচু দর্শকেরা তাদের কতখানি গ্রহণ করবে। সেই মতো তারা অভিনয়ে কাটছাঁট বা সংযোজনও করত।

রবিবার অর্থাৎ 'সাবাৎ ডে'-তে নাটকের অভিনয় তখনও বিশেষ করে উত্তর ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে বিশুদ্ধ ক্রিস্টানের আচরণ বিরুদ্ধ বলে মনে করা হতো। সুতরাং ভ্রাম্যমান থিয়েটারের দল সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় অভিনয় করত। শনিবারে একটা অতিরিক্ত ম্যাটিনি শোর ব্যবস্থা থাকত। রবিবারটা তারা তল্পি-তল্পা নিয়ে ট্রেনে চড়ত পরবর্তী শহরে

অভিনয়ে যাবার জন্য। নাৎসি আক্রমণে যখন লণ্ডনের অসংখ্য থিয়েটার বিধ্বস্ত ও বন্ধ হয়ে গেছে তখন এবং তার পরেও লণ্ডনের থিয়েটার হলগুলি নতুন করে খোলার পরেও, নিড কাসেলের এই থিয়েটার রয়াল আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিল বিখ্যাত অভিনেতাদের অসংখ্য বাছাই করা নাটক দেখার।

এই হলেই 'ডক্টরস ডিলেমা'-তে আমি ভিভিয়ান লে-র অভিনয় দেখেছি। 'ডেভিলস্ ডিসাইপল্'-এ দেখেছি রবার্ট ডোনাটের অভিনয়। উভয় নাটকই বার্নার্ড শ-র। 'ম্যাকবেথ'-এর এক অসাধারণ রূপায়ণ দেখেছি এই হলে। লেডি ম্যাকবেথ-এর সে অভিনয় আমি ভুলব না। শুধু ভুলে গেছি সেই অসামান্যা অভিনেত্রীর নাম। পেগি অ্যাশক্রফট, মাইকেল রেডগ্রেভের অভিনয়ও দেখেছি এখানে সমকালীন আরও খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পাশাপাশি। সমকালীন লেখক জে. বি. প্রিস্টলে ও নোয়েল কোওয়ার্ড-এর নাটকের অভিনয়, আর দেখেছি দাফ্‌নে দ্যু মারিয়ার 'রেবেকা'র নাট্যরূপ।

মাঝে-মাঝে কয়েক মাস অন্তর-অন্তর এই থিয়েটারে ব্যালে হতো। প্রথম যখন স্যাডলাস ওয়েলস্ ব্যালের বিজ্ঞাপন ঘোষিত হল, তখন আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। অবশ্য তার একটা কারণও ছিল। লণ্ডনে আমি পৌঁচেছিলাম ফ্রান্স হয়ে। মার্সাইতে নেমে আমার এক দাদার সঙ্গে ট্রেনে প্যারিসে আসি। প্যারিসে প্রথম আমার জীবনের অপেরা দেখেছিলাম 'স্যামসন্ ও ডেলাইলা'। সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অচেনা এই শিল্পরূপ আমাকে প্রথমটা হতভম্ব করে দিয়েছিল। খুব যে মনোহরণ করতে পেরেছিল তাও নয়। ওয়াই ডব্ল্যু সি এ-তে আমার বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ শেষ পর্যন্ত আমাকে ব্যালেতে টেনে নিয়ে গেল। এরপর থেকে আমি স্যাডলার্স ওয়েলস-এর একেবারে একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে গেলাম। সে সময়ে প্রাইমা ব্যালেরিনা ছিলেন মার্গট ফন্‌টেন। তার সঙ্গে প্রধান পুরুষ নর্তক ছিলেন রবার্ট হেলপ্‌ম্যান। এরপর থেকে ক্ল্যাসিকাল ব্যালে আমার বাদ যেত না। শহরে ব্যালে এলে সপ্তাহে তিনবার চারবার পর্যন্ত দেখেছি।

থিয়েটার শিল্পের আর একটি অপরিচিত রূপ ক্রমে আমার ভীষণ ভালো লেগে গিয়েছিল সে হল 'প্যান্টোমাইম'। প্রকৃতপক্ষে প্যান্টোমাইম বলতে আমরা সাধারণত যে মূকাভিনয় বুঝে থাকি এ মোটেই তা নয়। আসলে প্যান্টোমাইম ওদেশে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে বহুকালের প্রথাগত নাটক যা

পারিবারিক আনন্দের খোরাক যোগায়। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে দেখতে যায় লোকে প্যান্টোমাইম। অতি সাধারণ, পরিচিত রূপকথা, যেমন 'সিণ্ডারেলা', 'স্লিপিং বিউটি', 'পুস্ ইন বুটস্' ইত্যাদি গল্পের সঙ্গে অজস্র পরিচিত ছড়ার, অদ্ভুত-অদ্ভুত চরিত্রের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি হয় প্যান্টোমাইম। এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় প্রচুর নাচ, মজার অথবা রোমান্টিক গান এবং সাময়িক বিষয় নিয়ে ঠাট্টা ও পরিহাস যা ছোট ছেলেমেয়েদের মাথায় ঢুকবে না কিন্তু বড়রা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়বে। প্যান্টোমাইমের কতগুলি নিজস্ব অলঙ্ঘনীয় নিয়ম আছে যা না থাকলে প্যান্টোমাইম হয় না। অত্যন্ত কুৎসিত এবং অনিষ্টকারী একটি নারী চরিত্র প্যান্টোমাইমে থাকবেই, যাকে বলা হয় 'ডেম'। সে হয় হবে ডাইনি, নচেৎ বিমাতা—এই ভূমিকায় সর্বদা অভিনয় করতেন প্রখ্যাত পুরুষ অভিনেতারা। অন্যদিকে প্যান্টোমাইমে নায়ক অর্থাৎ রাজপুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করবে সব সময়ে সুন্দরী, তরুণী অভিনেত্রী। সরোবরে স্নান করে কোলা ব্যাঙ যেমন এক লহমায় শাপমুক্ত রাজকুমারে পরিণত হয় আমাদের রূপকথায় তেমনি প্যান্টোমাইমে যাদু-স্পর্শে এরকম রূপান্তরের দৃশ্য অবশ্য অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন পরীর যাদুদণ্ডের স্পর্শে প্যান্টোমাইমে কুমড়ো আর ছ-টা শাদা ইঁদুর এক লহমায় পরিণত হবে সিণ্ডারেলার জন্য ছ-ঘোড়ায় টানা অপূর্ব এক সোনার রথে, কিংবা রাজপুত্রের একটি চুম্বনে সমস্ত ঘুমন্ত রাজপুরী আর তার সুন্দরীরা জেগে উঠবে। ঝলমলে মঞ্চসজ্জা প্যান্টোমাইমের বৈশিষ্ট্য। আর বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে না দেখলে প্যান্টোমাইমের অর্ধেক আনন্দই মাটি। ক্রিসমাসের সময় লণ্ডনের প্রায় অর্ধেক থিয়েটার হলে প্যান্টোমাইম হবেই! জানি না আজও ইংলণ্ডে এই প্রথা চলে আসছে কিনা! আজ হয়তো 'সুপার ম্যান' অথবা 'ফ্যান্টমের' তাড়া খেয়ে ইংরেজ শিশুদের মন থেকে প্যান্টোমাইমের পরীরা পালিয়ে গেছে।

থিয়েটার রয়াল ছাড়াও নিউ কাসেলে আরও দুটি থিয়েটার হল ছিল যেখানে নিয়মিত অভিনয় হতো। এর মধ্যে একটি টাইনসাইড রেপারটরি থিয়েটার। খুব ছোট হল। একবারই গিয়েছিলাম ওখানে একটি নাটক দেখতে আমার কিছু বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে। মফঃস্বলের ছোট শহরে এবং লণ্ডনের শহরতলী অঞ্চলে তখন এরকম অনেক ছোট ছোট থিয়েটার হল ছিল। লণ্ডনে নাটকের বড় বড় প্রযোজকেরা নতুন নতুন নাটকে সব সময়েই কিছু প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং তার সঙ্গে কিছু নতুন শিল্পীদের দিয়ে

অভিনয় করতেন। কিন্তু রেপারটরি থিয়েটার কম্পানিগুলি চলত অন্য ধরনে। এদের নিজেদের স্থায়ী সর্বক্ষণের মাইনে করা অভিনেতা-অভিনেত্রী থাকত, সারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ একসঙ্গে অভিনয় করত। ফলে রেপারটরি থিয়েটারে সংঘবদ্ধ একটা নাট্যগোষ্ঠি গড়ে উঠত। সব সময়ে একজনই যে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করত তা নয়। আজ যে নায়িকায় ভূমিকায় অভিনয় করল পরের নাটকে হয়তো সে মঞ্চে মাত্র একবার ঢুকেই তারপর চলে যাবে —কারণ তখন সে বাড়ির ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয় করছে। প্রত্যেক সপ্তাহে সন্ধ্যায় একটি নাটকে অভিনয় করছে, দিনের বেলায় আর একটি নাটকে ভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের মহড়া দিচ্ছে। এই সব থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতো এবং এদের শৃঙ্খলা-বোধ ছিল অসাধারণ। পরে শুনেছিলাম লণ্ডনের অনেক ডাকসাইটে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাটকে হাতেখড়ি হয়েছিল এইসব ছোট ছোট রেপারটরি থিয়েটারে।

নিউ কাসেলে আর একটি থিয়েটার ছিল—নিউ কাসেল পিপলস্ থিয়েটার। আমার এক বন্ধু এবং ইন্টারন্যাশানাল ফ্রেণ্ডশিপ ক্লাবের আমার সহযোগী সদস্য বেনি রসন নিয়মিত এখানে অভিনয় করত। ফ্রেণ্ডশিপ ক্লাবের আমাদের অনেককেই রসন এই থিয়েটারের সভ্য করে নিয়েছিল। বছরে সামান্য একটা চাঁদা দিয়ে যে কেউ এর সভ্য হতে পারত এবং প্রতিটি নতুন নাটকের জন্য সভ্যরা বিনামূল্যে একটি টিকিট পেত। সভ্যরা তাদের সঙ্গে অতিথি নিয়ে গেলে তাকেও কনসেশন রেটে টিকিট দেওয়া হতো। পিপলস্ থিয়েটারের এই সব সভ্য যারা অভিনয় করতে পারতেন না তারা স্টেজে সাহায্য করা, সেট তৈরিতে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করা, পোশাক তৈরি করা ইত্যাদি কাজে যাতে সাহায্য করতে পারেন তার চেষ্টা হত। এখানে আমি অপেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেক নাটক দেখেছি। তার মধ্যে মনে পড়ছে শন ও কে সি-র 'রেড রোসেস্ ফর সি'-ক্লিফোর্ড ওদেৎস্-এর 'ওয়েটিং ফর লেফটি' এবং সোবিয়েত লেখক এফিনোগেনোভ-এর 'ডিসটান্ট পয়েণ্ট'। এফিনোগেনোভ যুদ্ধের ফ্রন্টে সাংবাদিকের কাজ করতে গিয়ে পরে নিহত হন। চেকোশ্লোভাক নাট্যকার কারেল চাপেকের 'ইনসেক্ট প্লে'-র অভিনয় আমি এখানেই দেখি। গুবরে পোকা, পিঁপড়ে, মৌমাছি ইত্যাদি কীট-পতঙ্গের চলাফেরা ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের ব্যবহার সম্পর্কে ইঙ্গিত ও মন্তব্য—এই

ছিল এই নাটকের বিষয়বস্তু। শুনেছি এরা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনয় করেছিল। কিন্তু সে আমি নিউ কাসেলে যাওয়ার অনেক আগে।

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিবারের এক তরুণ। সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে যোগ দিল স্পেনের গৃহযুদ্ধে রিপাবলিকানদের পক্ষে। কিন্তু ফ্রাঙ্কোর জয় তার সমস্ত আশা চুরমার করে দিল। ভগ্নহৃদয় সেই তরুণ আমেরিকা ও কানাডার সীমান্তে গ্রেট লেকস্-এর মধ্যে একটা লাইট হাউসে চাকুরি নিয়ে চলে গেল। মূল ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে, নির্জন সেই লাইট হাউসে মাসে একবার করে একটি মোটর বোট তার চিঠিপত্র, তার মাইনে আর সারা মাসের খাবার নিয়ে আসে। তিন মাসের মধ্যে তাকে স্থির করতে হবে সে চাকুরিতে স্থায়ীভাবে থাকতে চায়, না চাকুরী ছেড়ে দিতে চায়। শুরু হল তার অন্তর্দ্বন্দ্ব। নাটকের সমস্ত ঘটনাটাই ঘটছে লাইট হাউসের একেবারে চূড়ায় একটি ঘরে—যে ঘর তার কাজের ঘরও বটে, শোয়া বসার ঘরও বটে। ঘরের দেওয়ালে একটা পাথরের মাথায় পর পর অনেকগুলি নাম খোদাই করা। নামের পাশে প্রত্যেকের বয়স এবং কোন দেশের অধিবাসী সেই পরিচয়ও খোদাই করা রয়েছে। সেই বিরাট জলধির মধ্যে নির্জন সেই পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে দুই শতক আগে এক জাহাজ ডুবিতে যে-সব হতভাগ্য প্রাণ হারিয়েছিল—নামগুলি তাদের। লাইট হাউসের সেই নির্জন নায়ক দিনের পর দিন এইসব নামের তালিকার দিকে তাকিয়ে কল্পনায় বোঝার চেষ্টা করত—তারা কারা ছিল? কেনই বা তারা ইওরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে জাহাজে চড়ে এই সুদূর আমেরিকায় আসছিল? জমি থেকে উৎখাত হয়ে বৃটিশ কৃষক সেই জাহাজে পাড়ি দিয়েছিল অজানা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে। জার্মানি ও ফ্রান্স থেকে পরাজিত বিদ্রোহীর দল ছিল সেই জাহাজে। পোলাণ্ডের ইহুদি—অত্যাচারের ভয়ে দেশত্যাগী হতে চেয়েছিল সেই জাহাজে চড়ে। এদের প্রত্যেকেই চেয়েছিল সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে পালিয়ে গিয়ে বাঁচবে। কিন্তু কেউ শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারল না। পাথরে খোদাই সেই মৃতের তালিকার দিকে তাকিয়ে কল্পনা করতে-করতে নায়ক যেন একদিন তার নিজের ভূতকেই চোখের সামনে দেখতে পেল। তৃতীয় মাসে যখন মোটরবোট এল ততক্ষণে নায়ক স্থির করে ফেলেছে সে ফিরে যাবে। ফিরে যাবে সেই মূল ভূখণ্ডে যেখানে জীবনের স্পন্দন রয়েছে। যেখান থেকে পলায়নে কোন মুক্তি নেই।

নিউ কাসেল পিপলস্ থিয়েটারে আমি সমকালীন বিষয়বস্তু অবলম্বনে এই

নাটক দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। নাটকের নাম 'আওয়ার রক'। পরে আমি এই কাহিনী অবলম্বনে তোলা ফিল্ম দেখেছি। সেই ফিল্মে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মাইকেল রেডগ্রেভ।

একটা ঘটনা এখানে আমি উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯৪৩ সালের শেষাশেষি বেনি রসন যুদ্ধে যোগ দিয়ে ভারতে এসেছিল। আমিও তারপর নিউ কাসল ছেড়ে প্রথমে শেফিল্ড ও পরে লণ্ডনে চলে আসি। রসনের সঙ্গে তারপর থেকে আমার আর কোন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু ১৯৪৭ সালে আমি যখন দেশে ফিরে এলাম তখন শুনলাম আমার বাড়ির ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বেনি রসন বম্বেতে আমার বাড়িতে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করেছিল। আমার ছোটবোন তাকে নিয়ে পৃথ্বিরাজ কাপুরের অভিনয় দেখিয়েছিল এবং আন্ধেরির যে বাড়িতে আই পি টিএ-র কেন্দ্রীয় স্কোয়াড থাকত ও মহড়া দিত সেখানে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৪ সালে মাত্র কয়েকমাস আমি শেফিল্ডে ছিলাম। নিউ কাসেলের তুলনায় নাটক থিয়েটারের ব্যাপারে শেফিল্ডকে মনে হত মরুভূমি। যদিও শেফিল্ডে আমি 'রিচার্ড দ্য থার্ড' দেখেছি ডোনাল্ড উলফিট ও তার ভ্রাম্যমাণ নাটকের দলের। ঐ বছর শেষের দিকে ফিরে আসি লণ্ডনে।

উত্তর ইংলণ্ডে থাকার সময়ে আমাকে বার কয়েক কাজের জন্যই লণ্ডনে আসতে হয়েছে। প্রত্যেকবারই আমি চেষ্টা করেছি ইউনিটি থিয়েটারে নাটক দেখার। খুব বড হল নয়, সাজসজ্জাও নেই বললেই চলে। ইউনিটি থিয়েটার চালাতো তখন প্রধানত কমিউনিস্টরা ও ওয়াই সি এল। অনেক-খানি প্রপাগাণ্ডিস্ট ধরনের ছিল ইউনিটি থিয়েটারের লক্ষ ও উদ্দেশ্য। নিউ কাসেলের পিপলস্ থিয়েটার অতটা ছিল না। ইংলণ্ডে সাধারণ মিউজিক হলগুলির একটা ট্রাডিশন বিগত শতকে গড়ে উঠেছিল। সন্ধেবেলা বৃটিশ শ্রমিক নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করার জন্য এক গ্লাস বিয়ার খেতে-খেতে মিউজিক হলে নানারকম চিত্তবিনোদনকারী অনুষ্ঠান দেখতে বা শুনতে যেত। এই ট্রাডিশনকে ভিত্তি করে ইউনিটি থিয়েটার এক ধরনের বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশন করত। সমসাময়িক বিষয়ের উপর ক্যারিকেচার ও হাস্যরসের সঙ্গে এতে থাকতো প্রচুর নাচ ও গান। নাটকের অভিনয়ও হত এখানে। শন ও কেসি'র 'দ্য স্টার টার্নস্ রেড' নাটকের অভিনয় হয়েছিল ইউনিটিতে কিন্তু আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

পাকাপাকিভাবে লণ্ডনে ফিরে এলাম ১৯৪৪ সালের শেষদিকে। যুদ্ধপূর্ব

যুগের তুলনায় লণ্ডনে নাটকের জগতে ততদিনে বিরাট রূপান্তর ঘটে গেছে। অনেক থিয়েটার হলে তখনও সেই সনাতন জোলো কমেডির অভিনয় কিংবা সস্তা নাচ-গানের আসর চলে আসছিল বটে, কিন্তু আবার অনেক হলেই ধ্রুপদী নাটক কিংবা চিন্তার খোরাক যোগায় এমন নাটকের অভিনয় হত। লরেন্স ওলিভিয়র, সিবিল থর্নডাইক, রালফ রিচার্ডসন এরা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় নাট্যশালার জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। এরা ওল্ডভিক-এ শুরু করলেন রেপারটরি কোম্পানি। মুখ্যত শেক্সপিয়র, ইবসেন এবং অন্যান্য ক্লাসিকাল নাটকের অভিনয় হত এখানে। ইবসেনের 'গোস্টস্' এবং 'পিয়ের গিন্ট', শেক্সপিয়রের 'রিচার্ড দ্য থার্ড', 'হ্যামলেট' আর 'টেমিং অব দ্য শ্রু', চেকভের 'আংকল ভানিয়া' দেখেছি ওদের অভিনীত। একই রাস্তার দুই পারে মাত্র অল্প কয়েকদিনের ব্যাবধানে বৃটিশ মঞ্চের দুই বিশাল খ্যাতিমান অভিনেতা রালফ রিচার্ডসন এবং জন গিলগুড-এর হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় দেখা, সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। একই ভূমিকায় অভিনয় করছেন দুজন কিন্তু একেবারে ভিন্ন প্রযোজনা। ওল্ড ভিক-এ লরেন্স ওলিভিয়রের নির্দেশনায় রালফ রিচার্ডসন অভিনয় করলেন প্রিন্স অব ডেনমার্ক-এর ভূমিকায়। ওলিভিয়রের নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য হল নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র এমনকি সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম চরিত্রটিকেও প্রাধান্য দিয়ে একটা সামগ্রিক, বিশাল ট্রাজেডি গড়ে তোলা। রাস্তার অন্য পারে জন গিলগুডের নির্দেশনায় আর একটি থিয়েটার হলে স্বয়ং গিলগুড একই চরিত্রে অভিনয় করে গেলেন যা রূপায়ণের দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গিলগুড-এর হ্যামলেটে শুধু প্রিন্স অব ডেনমার্ক-ই মুখ্য—আর সব চরিত্র প্রায় মূল্যহীন।

১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালে ইওরোপে নাৎসি জার্মানির পতন ঘটে গেছে। লণ্ডনে সেই সময়ে মুক্তাঙ্গন নাটক অভিনয়ের পালা শুরু হল। রিজেন্ট পার্কে আমি 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' ও 'মিড সামার নাইটস্ ড্রিম' দেখেছিলাম। পার্কের বিশাল বিশাল গাছের সারির পটভূমিতে প্রাণবন্ত নাটক। এর চেয়ে উপযুক্ত পটভূমি বোধহয় হয় না।

ঠিক এই সময়ে নিজের লেখা নাটক ও নিজের নির্দেশনা নিয়ে লণ্ডনে প্রথম অভিনয় করলেন পিটার উস্তিনোভ। পরবর্তীকালে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। সোবিয়েতে বিপ্লবের সময় পিটার উস্তিনোভ-এর বাবা-মা লণ্ডনে এসে বসবাস শুরু করেন। বেজওয়াটার থিয়েটারে উস্তিনোভের 'দ্য রাশিয়ানস্' নাটকের অভিনয় দেখি আমি। বিপ্লবের সময়

দেশত্যাগী রুশ পরিবারের মানসিক টানাপোড়েন নাটকের মূল সূত্র। লণ্ডনে তাদের ঘরে বসে প্রৌঢ় জারপন্থী জেনারেল আর কাউন্টেসেরা যুদ্ধের মধ্যে নাৎসি বাহিনীর প্রত্যেকটি অগ্রগতির খবর শুনে আহ্লাদে মেতে উঠছে। কেউ তাদের জারের আমলে পাওয়া মেডেল সাফ করছে, কেউ দিন গুনছে কবে আবার তাদের সেই পুরনো বনেদী জমিদারিতে ফিরে যাবে। অন্য-দিকে পরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম যারা তরুণ-তরুণী, যারা বিদেশে জন্মেছে এবং কোনদিন রুশভূমিতে পদার্পণ করে নি, লাল ফৌজের বিজয়ের সংবাদে তাদের মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে দেশপ্রেমের গর্ব। তাদের স্বপ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন —কবে সোবিয়েত ভূমিতে ফিরে যাবো। তাদের বাবা-মায়েরা তাদের মনে সোবিয়েত ভূমি সম্পর্কে যে ভয়াবহ ছবি দেগে দিয়েছিল—সে ছবি মলিন হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তাদের পিতৃভূমি হয়তো ঠিক অতটা খারাপ নয়। নাটকের মধ্যে কাঁচা হাতের ছাপ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু অনেক কাগজই তাদের সমালোচনায় লক্ষ্য করেছিল সেদিন—উস্তিনোভ ভবিষ্যতের নাট্যকার।

সে সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দিয়ে আমি এই স্মৃতিচারণায় ছেদ টানতে চাই। ১৯৪৪ সালের শেষে অথবা ১৯৪৫ সালের গোড়ায় আমি তখন লণ্ডনে। একজন তরুণ শ্রমিক, নাম তার স্টিভ, সে ছিল নিউ কাসেলে ইয়ং কমিউনিস্ট লিগ-এর সদস্য। স্টিভ খবর পাঠাল সে তার রেজিমেণ্টে যোগ দিতে যাওয়ার পথে লণ্ডনে দিন দুয়েক থেকে যাবে। আমার জার্মান বন্ধু যাকে আমি নিউ কাসেল থেকে চিনতাম তারও সঙ্গে পরিচয় ছিল স্টিভ-এর। আমরা দুজনে ঠিক করলাম স্টিভ তার রেজিমেণ্টে যাওয়ার আগে তিনজন একটু ভালো করে খাওয়াদাওয়া করব এবং ওল্ড ভিক-এ স্টিভকে একটা নাটক দেখিয়ে দেবো। স্টিভ যখন শুনলো যে সে শেক্সপিয়রের নাটক দেখতে যাবে তখন সে প্রায় হতবাক—সম্ভবত ভয়ে। কারণ শেক্সপিয়রের সঙ্গে স্টিভ-এর পরিচয় তার পনেরো বছর বয়সে, সংক্ষিপ্ত স্কুল জীবনে, পাঠ্য বইয়ের মধ্য দিয়ে। ওল্ড ভিক-এ আমাদের সঙ্গে 'টেমিং অব দ্য শ্রু' দেখার পর স্টিভ ভাবতেও পারছিল না যে শেক্সপিয়র এমন হতে পারে।

ইংলণ্ডের সেই শ্রমিক পুত্রকে আবার তার জাতীয় সংস্কৃতির মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য একটা গোটা মহাযুদ্ধের রক্তাক্ত পথ পার হয়ে আসতে হয়েছিল।

অমিয়ভূষণ মজুমদার ম্যানইটার

ডেন্জড্? সে বললে, তা আলোতে, অন্ধকারে। মেবার রেঞ্জার……

অঁাউউঙ্গ-অঁউউঙ্গ-অঁউউঙ্গ-অঁাঅঁা।…ফরেস্ট বাংলোর ম্যাটিং ঢাকা পাটাতন মেঝে, তার উপরে রাখা সাদা টেবল ক্লথ ঢাকা বড় টেবল থর থর করে কাঁপল। বড় টেবল ল্যাম্পটা দপ্‌দপ্ করল। সে এক চোখ বন্ধ করে শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার সময় দিল। পরে বললে, সাতফুট উঁচু এক বাঘ। আর কি বীভৎস। বাঁ চোখ গলে কোটর থেকে বেরিয়ে রস গড়াচ্ছে; বাঁ কানটার ডগা কিছুতে কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে; মাউন্ট করা চামড়ায় পোকা ধরলে যেমন, ইতস্তত থাবা থাবা পশম খসা। পিছনের দু-থাবা পেটের নিচে গুটানো, সামনের থাবাব উপরে ধীরে-ধীরে মাথা তুলছে। যখন দেখেছিলুম মাথা-পাছা যোগ করে রেখাটা মাটির সঙ্গে দশ ডিগ্রিতে ছিল, তা অনুমান ত্রিশ ডিগ্রিতে এসেছে, আর উন্মুক্ত ঈষৎ কালচে লাল জিভ দেখানো মুখটা ক্রমশ আমার দিকে ফিরছে। আর, কি আশ্চর্য! পালাচ্ছি না, পালানোর চেষ্টা করছি না, মনে করছি মানুষের ভাষা বুঝবে, মন্ত্রের মতো এক ভাষায় প্রার্থনা তৈরি করছি; যেন তাতে সেই বাঘ আমাকে রেহাই দেবে, যেন তার থাবার আশ্রয়ে সুন্দর এক নিশ্চিন্ততা খুঁজে পাব; আর কেউ, কিছুই আমাকে ভীত করবে না; বলছি: হে ইকোলজির রক্ষাকর্তা, হে মানব সভ্যতার উৎস……। সেটা যে কি রকম অবস্থা, সেই সাতফুট বাঘের সাক্ষাৎ পাওয়া, তা বুঝতে, যদি আপনি সাধারণ বাঙালি হয়ে থাকেন, কল্পনা করুন আপনি দাঁড়িয়ে আর উপর দিকে চেয়ে আপনার মাথার দেড়ফুট উপরে গরম নিশ্বাস বহানো লালা আর দম বন্ধ করা পচাগন্ধ ছড়ানো মাথাটাকে দেখছেন।

বলা বাহুল্য এটা দুঃস্বপ্ন। আর স্বপ্নে আমরা স্পষ্ট করে কথাও তৈরি করি না। কাজেই ইকোলজির রক্ষাকর্তা, মানব সভ্যতার উৎস, কিংবা স্বরূপ, নিশ্চয়ই সেই যে কথা তৈরি হওয়ার আগের স্তরের মন যাকে বলে

তার অনুভূতি। কিন্তু ঘেমে উঠেছি। যদিও জিপটার বডি স্টিলের, জানলা, উইণ্ডস্ক্রিন নাকি ফাইবার গ্লাসের। এবং এয়ার কনডিশানড্। নাকি রেঞ্জারের শ্বশুরের দেয়া। চোখ চেয়ে দেখলাম তখন বিকেল হতে সুরু করেছে। যা আমার ছিন্না নিদ্রা ভাঙিয়েছে সে মাথার উপরে ছোট বেলটা। বন্ধ কাঁচের জানলায় বাইরে আমার বন্ধু রেঞ্জ অফিসারকেও দেখতে পেলুম।

অর্থাৎ সে আর তার ট্র্যাকার মোষের বাচ্চাগুলোকে সব সময়ে পছন্দ মতো হয় না, দুটি মাদী, একটি পুরুষ, আবার যথাযোগ্য জায়গায় বেঁধে রেখে এল। সেই নবযৌবন পেয়েছে এমন সুন্দর পুষ্ট বাচ্চা তিনটি, যাদের মৃত্যু হলে বাঘটার হদিশ পাই, কিন্তু যারা পুরো দুটো দিন দুটো রাত ভীত, ঘর্মাক্ত, এমন কি বোধ হয় শীর্ণতর হয়ে বেঁচে থাকছে।

সে যাওয়ার সময়ে গাড়ির দরজাগুলোকে ভিতর থেকে লক্ করে দিতে বলেছিল। দুরাত দুদিন ঘুম হয় নি; খাওয়াটা ভালো হয়েছে, এমন কি স্নানও, আর তা প্রচুর সাবান দেখে স্বচ্ছজলের ঝর্ণায়—কাজেই ঘুম আসতেই পারে একা দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকতে গেলে। উপরন্তু এ অঞ্চলেও নাকি লোধাদের মতো এক আদিবাসী সম্প্রদায় আছে যারা অন্যের জিনিসকে দিতে হয় না এ-নীতিতে বিশ্বাস করে না। আমি অবশ্য জানি না লোধাদের সম্বন্ধে এ-রকম ধারণা কেন করা হয়, অথবা তাদের সমাজ থেকে প্রকৃতপক্ষে তারা বিষয়-অধিকারের মতো কষ্টদায়ক এবং অমঙ্গলজনক নীতিকে দূর করতে পেরেছে কিনা। গাড়িতে রডার হাল্কা শট গানটা রেখে সে তার ভারি ম্যানলিকার এবং তার চাইতে কিছু কম ভারি উইনচেস্টার নিয়ে রওনা হয়েছিল। এই জিপটাই আমাদের তাঁবু। ভোরে ফেরার পথে যে ঝর্ণায় সেই স্নান ইত্যাদি, তার কাছে উঠবার সময়ে এক তিতির পালে গুলি চালিয়ে তিনটি পুষ্ট তিতির পাওয়াতে জনপ্রতি একটা পাতে পড়েছিল। রেঞ্জারের সঙ্গে চলে বেড়ানোর এই এক সুবিধা। তখন ভোরের আলো ফুটছে, আলোটার তখন বাদামী রং, তিতির দলটা রাস্তা পার হচ্ছিল। তিতির নিয়ে আমরা তখন সেই ঝর্ণার কাঠের ব্রিজটায়, জিফটা ছিল ব্রিজের এপারেই ঝর্ণার ধারে, বাঘের ডাক শোনা গিয়েছিল, যেন তা বন্দুকের শব্দের উত্তরে চ্যালেঞ্জ। আর ব্রিজের উপরে সেই সাধুকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে ভয় পাওয়ার মতো একটা ভাব হয়েছিল।

অসুবিধা যা তা আমার স্বেচ্ছা-আহৃত। রেঞ্জার এক ম্যানইটার বাঘকে ট্র্যাক্ করছে। তার সঙ্গে আসার অর্থই অসুবিধা কষ্ট, বিপদ সেধে নেয়া। রেঞ্জার অবশ্যই দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, তাও সে আমাকে রাইফেল ছাড়াই এখানে রেখে গিয়েছিল তার কারণ জিপটাকে তুলে ফেলে দেবে এমন হাতি এ-অঞ্চলে নেই। বড় প্রাণী বলতে ছোট বড় দু দল গবয় যারা খোলা জায়গায় থেমে থাকা জিফের কাছে আসবে এ-রকম কল্পনা করাও যায় না। গুল বাঘ আছে কয়েকটি, দু-রাতেই তাদের সেই করাত চেরার শব্দ কয়েকবারই শুনেছি। এখন এই বর্ষার পরে নাকি তাদের গর্ভাধান কাল। গুল বাঘ বলতে চিতা ছাড়া প্যান্থার এবং লেপার্ড দুই-ই। তা ছাড়া তারা সকলেই নিশাচর। বেলা দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত তারা কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করে। আমার এখানে একা থাকার স্বপক্ষে এই সব ল অব্ ইউনিফর্মিটি তো ছিলই।

তা ছাড়া জিফটি এখন যেখানে সেটাকে বনপথের চৌমাথা বলা যেতে পারে। একটা মাঠের মতো ব্যাপার ; লম্বায় একশ হাত, চওড়ায় কোথায় ত্রিশ কোথাও চল্লিশ ; তিন চার ইঞ্চি বেড়ের ছোট সোজা এক রকম গাছ আছে ; ছোট ছোট, বড় জোর এক বুক উঁচু কয়েকটি ঝোঁপ, এ-ছাড়া অনুজ্জ্বল সবুজ ঘাস। এ-রকম হওয়ার কারণ নাকি এই যে ঘাসের তলায় চাঁই-চাঁই পাথর। যার উপরে বাতাসে ওড়া বর্ষার জলে ভেসে আসা এক দেড় হাত পুরু একটা প্রলেপমাত্র পড়েছে মাটির, বড় গাছ শিকড় বসাতে পারে নি। জিপের পশ্চিম দিকে দু ফার্লং দূরে সেই কলোনিটা। ও-দিকেও গাছপালা কিছু পাতলা, তা ছাড়া বোধ হয় কলোনির অনেকটাই অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে। ফলে ঘরগুলোর কিছু কিছু চোখে পড়ে। কলোনিটা দুরবস্থায়। তা তাদের অনেক রোদ জলে কালো হওয়া খড়ের চাল, সাদা রং করা দেয়ালের অসংস্কৃত অবস্থা, ভাঙা দরজা-জানলা, গাছ গজিয়ে উঠেছে এমন পরিত্যক্ত মেঝের ঘর দেখে অনুমান করা যায়। এসব অনুপুঙ্খ বর্ণনা, অবশ্যই, রেঞ্জারের। আমি আর কখন গেলুম? পূর্ব দিকে বন। দক্ষিণে, আমার পিছন দিকে, ষাট সত্তর হাত দূরে সেই তেমাথা যার থেকে এই প্রান্তরটা চতুর্থ পথ হিসাবে বেরিয়েছে বলা যায়। গাছের ফাঁকে কলোনির দেয়ালের সেই বাদামী ঘেঁষা সাদা রংটাই প্রবল। হঠাৎ দেখলে রোদজলে পোড়খাওয়া কঙ্কালের কথা মনে ওঠে। সব বন্য প্রাণীই মানুষকে এড়িয়ে চলতে চায়, সেদিক দিয়ে এই ক্যাম্পটা নিরাপদ।

ম্যানইটারের কথা স্বতন্ত্র। তা হলেও যতদূর জানা গিয়েছে তার পরিক্রমার সময় বিকেল যখন সন্ধ্যায় গড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে তার হ্যাবিট যা সেকেণ্ড নেচার আমাদের ভরসা।

সামনে, উত্তরে, উইণ্ডস্ক্রিনের ফাইবার গ্লাসের মধ্য দিয়ে প্রান্তর; ছোট-ছোট ঝোপ, যার কয়েকটি ফণীমনসা, যার ডগায় হলুদ এবং লাল ফুল কখনও; আবার প্রান্তর; এখানে-ওখানে ছড়ানো সোজা পাঁচ ছয় বড় জোর দশ-বারো ইঞ্চি বেড়ের গাছ; প্রান্তরের ঘাস হলদে-ঘেঁষা; এমন করে পাহাড়টার দিকে এগিয়ে ঘন বন; যার নীলাভ সবুজের মধ্য থেকে একটা ছড়ানো ত্রিভুজ হেন অল্প হলুদ বেশি বাদামী রং চূড়া। ত্রিভুজ বলতে একটু আটকায়। শীর্ষবিন্দু যেখানে বর্তুল আকার নেবে, সেখানে আলম্ব সরলরেখায় এক ধ্বস নেমেছিল বোঝা যায়; ফলে ডান দিক থেকে ত্রিভুজের বাহুটি শীর্ষের দিকে ত্রিশ ডিগ্রির ঢালে ক্রমোন্নত, কিন্তু বাঁ দিকের বাহুটি উঠতে-উঠতে সেই ধ্বসের ফলে শীর্ষ থেকে দশ পনেরো হাত দূরেই থেমেছে। চূড়াটার রং বাদামী-হলুদের অসমান মিশ্রণ। ডানদিকের ঢালটিও নিখুঁত নয়, ছোট ছোট ধ্বস, বাতাসের ঘর্ষণে ক্ষয় বলব কি? যেন অশোকস্তম্ভের সেই সিংহ যে খাড়া না বসে ত্রিশ ডিগ্রিতে গুঁড়িমারা, আর এখানে-ওখানে যার পাথর চটেছে। যেন কুষ্ঠগ্রস্ত।

আমার স্বপ্নের হেতুটা বোধ হয় এর পরে না বললেও চলে।

বলছিলুম এক ম্যানইটারকে ট্র্যাক্ করতেই রেঞ্জারের বনে আসা, যে ম্যানইটার গত দু-বছরে কমবেশি পাঁচ হাজার বর্গ কিলোমিটার একটা অঞ্চলে অন্তত সাতাশ জন মানুষকে মেরেছে; যে ধূর্তকে অন্তত তিনজন নাম করা শিকারী বহু চেষ্টাতেও বধ করতে পারে নি। যে স্ত্রী-পুরুষ, যুবতী-প্রৌঢ়া, বানিয়া-আদিবাসীতে ভেদ করে না, যার থাবার কিছু পুরনো ছাপ এ-কয়েকদিন কয়েকবার অপ্রত্যাশিত জায়গায় চোখে পড়েছে। সে হয়তো আমাদের উপরেই চোখ রাখছে।

অর্থাৎ রেঞ্জার এক গুরুতর দায়িত্ব নির্বাহ করছে। সে দিক দিয়ে আমার পক্ষে তার সঙ্গী হওয়াই বরং অসঙ্গত। বন একই সঙ্গে আশ্রয় এবং বিভীষিকা হলেও, বিভীষিকাই বরং বেশি, তা সত্ত্বেও এই সব অরণ্যচারীরা এবং গুহ্যকেরা কেন অরণ্য এবং গুহাকেই অবলম্বন করে থাকে—এর উত্তর জানতে পারলে ভালো হত মনে করি। একবার তাকে বলেছিলুম: এদের মধ্যে বৈশ্য দেখছি না। পরে আর একবার বলেছিলুম, এদের এই এক

ধারণা প্রতিপক্ষকে বধ করতে তীর ধনুক, লাঠি, এ-সবই যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি না হলেও চলে। ফল ভালো হয় নি, রেঞ্জার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মনস্তত্ত্বের কথা তুলেছিল। হয়তো সন্দেহ করছিল আমার মস্তিষ্কে কিছু অসুস্থতা আছে। সুতরাং সতর্ক হয়েছি। অন্যদিকে আমি একজন ভ্রমণ-কারী যে বনের নানা পশু, পাখী, পতঙ্গ, এমন কি গাছের, তাদের পাতার গড়ন, রং ইত্যাদি দেখতে উৎসুক, ভবিষ্যতে স্মৃতি রোমন্থনের জন্য যে ক্যামেরায় ছবি তোলে. ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশ গান বয়ে বেড়ায়।

এদিকে রেঞ্জারকেই বা পুরোপুরি সুস্থ মস্তিষ্কের বলি কি করে? এই যে দারুণ ঝুঁকি নিয়ে অশেষ কষ্টে এক মৃত্যুকে সে অনুসরণ করছে তার সমস্ত সহানুভূতি সেই বুড়ো, অভিজ্ঞ, ধূর্ত বাঘের জন্য। 'আহা, তার পিছনের পা-টা খোঁড়া, তা তো তোমাকে দেখালামই।...দেখ বাঘের ঘ্রাণ শক্তি কিন্তু নিরামিষাশীদের মতো তীক্ষ্ণ হয় না, চোখই সব, যা তোমার টর্চের আলোয় সাদাটে লাল দেখাবে, অথচ তার একটাই নষ্ট বলে মনে হয়; শেষ যাকে ধরেছিল সেই মেয়েটির সতীনই বলেছে।...আহা তার তের বছরের দীর্ঘজীবনে মানুষের পাতা স্টিলের দাঁতওয়ালা ফাঁদ, গাদা বন্দুকের ছিটে গুলি যা হয়তো মরচে ধরা সাইকেলের বল, হয়তো সজারুর কাঁটা। হয়তো অনাবৃষ্টিতে ঘাস খরে যাওয়ার হরিণ চলে গেলে সে গৃহপালিত গরু মোষ ধরত, শুধু অনাবৃষ্টি কেন মানুষের জমির লোভেও পশুদের মরে পড়তে হয়েছে। এসব কারণেই সেই বাঘের আবেগ-বহুল মনে, (তার শরীরের উষ্ণ রক্তের স্রোত, তার শিকারের উষ্ণ রক্ত, তার আবেগ এমনই তো এক মোহনায় মেলে) সে ক্ষেত্রে মানুষের উপর বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, ঘৃণা ইত্যাদি জন্মালে তাকে কি দোষ দেবে? তা ছাড়া তার কাছে বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রেম, বাৎসল্য, তৃপ্তি সবই তো রক্তের উত্তাপ বাড়া কমা।

এখানে বলে নেয়া দরকার, সত্যের খাতিরে, রেঞ্জারের সেই মাঝবয়সী ন্যাড়ামাথা, ট্র্যাকার যার গড়ন, রং ইত্যাদিতে যাকে এক পাত্রে কম করে তিনটি জাত গলিয়ে তৈরি মনে হয়, আর্য না হোক, যবন, মোঙ্গল, এবং অস্ট্রিক, তার ধারণা বন-সাহেব আর ক্যামেরা-সাহেব দুজনেই, আর বোলো না সমান পাগল। নতুবা চারিদিকে যখন নিস্তব্ধ, (অবশ্য বন কখনই বা তা, যখন একেবারে ঝিম্ ঝিঁঝিঁ ডাকছে, কাঠঠোকরা ক্রোক্ ক্রোক্ মাথা ঠুকছে, সাতভায়রা কিচ্‌মিচ্ ঝগড়া করছে, এক হনুমান হয়তো হুপ্ করে উঠল, বাতাসের গতি বদলাতে ঝর্ণার কল্‌কল্ কানে এসে মিলিয়ে গেল)—সেই

নিস্তব্ধতার পাথর জড়ো উনানে যখন ভাত ফুটছে, তখন দেখবে সেই ট্র্যাকার ধীরে-ধীরে ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। যার অর্থ একটাই হয়—আর বল না, সমান।

এ বিষয়ে তার যুক্তিও ছিল। আমরা তখন কলোনি নিয়ে আলাপ করতে স্বভাবতই উত্তেজনা, অবিশ্বাস ইত্যাদি দেখিয়ে থাকব। যদিও ট্র্যাকার সরলভাবে তার সরল বিশ্বাসের কথাই বলেছিল, এ-অঞ্চলের সব আদিবাসী যে বিশ্বাসের অংশীদার। তাদের সকলের মতেই, ট্র্যাকার নিশ্চয়ই চেহারা অন্য রকম হলেও তাদেরই একজন। মানুষ যখন তলিয়ে যায়, তলাতে থাকে, যখন ধোঁয়ার মতো, মেঘের মতো ভাসতে আর পারে না, ভারি হয়ে যায়, তখন ঘুরে-ঘুরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে এই জায়গায় এসে পড়ে। কি যন্ত্রণা যখন এক রাতে দেখলে স্ত্রী দূরে সরছে, বিছানায় আসছে না, ছেলে কোল থেকে নেমে পালায়, মেয়েকে আদর করতে গেলে সে ভয়ে কঁকিয়ে ওঠে, এমন কি বাবা-মাকে প্রণাম করতে গেলে তারা হয়েছে হয়েছে বলে পা সরিয়ে নেয়, তখন এদিকের আদিবাসীরা কাঁদতে-কাঁদতে হাঁপাতে-হাঁপাতে শুঁড়িগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে এই কলোনিতে চলে আসে। তাদের কেউ ডাকে না, অভ্যর্থনা করে না, তারা যেন নিজের বাড়িতেই ফিরছে। ওদিকে যখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছে তখন তার বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ তাকে থাকতে বলে না, কেউ জিজ্ঞাসা করে না কবে ফিরবে, যেন সে এক মহাপুরুষ।…

ট্র্যাকার তার গেঁয়ো হিন্দিতে যখন এই গল্প করছিল তখন রেঞ্জার বলেছিল ব্রিজের সেই সাধু কলোনির সেই সাধু হতে পারে।

ট্র্যাকার বলেছিল, খুবই সম্ভব। নতুবা এই বনে কে আর ভিক্ষা করে বেড়াবে। গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করে সে যা পায় তাতেই কলোনি চালাতে হয়। চলছে না আর। একদিন শেষ হয়ে যাবে।

বললুম, এটা খুব পুরনো গল্প। কোথায় যেন পড়েছি। রসো, রসো, এটা কোন রোমান্টিক লেখকের গল্প হবে।

রেঞ্জার বললে, তুমি কি সেই জার্মান বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, সঙ্গীত সাধক সোয়াইৎসারের কথা বলছ?—যিনি আফ্রিকার বনে কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে কাজ করতেন?

বললুম, এই দেখ, এই দেখ, গল্পগুলো কেমন তৈরি হয়। কত পুরনো

গল্প কেমন নতুন হয়ে ওঠে। রেঞ্জার একটু ভেবে বললে, তা হলে এ-রকম হয় যে সেই সব পুরনো গল্প শুনে কেউ-কেউ নিজের জীবনে গল্পটাকে ফলাতে চায়।

এ ব্যাপারে আমরা মিনিট দশেক তর্ক করে থাকব।...

দরজা খুলে দিতে রেঞ্জার ভিতরে এসে বললে, ঘেমে উঠেছ, দেখছি, দুঃস্বপ্ন নাকি ?

আঙুল তুলে উইণ্ডস্ক্রিনের ফ্রেমে পাহাড় চূড়াটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম।

রেঞ্জার আরাম করে বসে। পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে কফির বড় ফ্লাস্কটা তুলে আনলে। তাকে সাহায্য করতে সেভাবেই কাপ দুটোকে আনলুম। রেঞ্জার কফি ঢাললে, ধোঁয়া উঠল, দুজনে যখন ঠোঁটের কাছে কাপ নিচ্ছি সে বললে, ইন্‌ট্রেস্টিং, ধ্বস নামার ফলেই হয়েছে। বাঘ-বাঘ ভাব একটা বটে। সে হাসল।

বললুম, আচ্ছা দেখ, ওটা কি গল্পের মূল হতে পারে না ?

: গল্পের ?

: তোমার সেই তের বছরের ধাড়ি বাঘের ?

সে আবার হাসল, বললে, মন্দ বল নি, খুবই ইলিউসিব, কি বলে, অলীক-অলীক ভাব।

যেদিকে রেঞ্জার উঠেছে সেদিকে ট্র্যাকার এসে দাঁড়ালে রেঞ্জার পকেট থেকে চাবি বার করে দিলে। ট্র্যাকার জিপের পিছন দিকের লোহার দরজা খুলে স্টোভ ইত্যাদি বার করে রেঞ্জারের হাতের কাছাকাছি গাড়ির বাইরে ঘাসের উপরে জায়গা করে নিলে। এ বিষয়ে লোকটা ওস্তাদ। আধঘণ্টার মধ্যে সরু সরু কয়েকটা চাপাটি ভেজে ফেলবে, হয়তো কৌটাজাত মাশরুম গরম করবে চাপাটির সঙ্গে চলতে। সন্ধ্যার কিছু আগে সেগুলো খেয়ে নিলে সারা রাত চলে যাবে এ-রকম ভরসা করা হয়। এ-কয়েকদিনে তার রুটিন জানা হয়ে গিয়েছে। যেখানে সে বসেছে সেখানে একটা ছায়া কারণ সেটা পুবদিক আর সূর্য পশ্চিম দিকেই হেলেছে অনেকটা। তা হলেও রেঞ্জার তার ম্যানলিকারের চোঙটা বাড়িয়ে ধরলে সেটা ট্র্যাকারের মাথা পেরিয়ে ফুট খানেক ওদিকে থাকবে। নিঃশব্দে এসে বাড়ানো থাবা প্রথমে চোঙয়েই ঠেকবে যদি এক মিনিট আগেও দেখা যায়, লাফালেও ম্যানলিকারের সেই ভারি বুলেটের ধাক্কায়...

রেঞ্জার বললে, কিন্তু থাবার ছাপগুলো ?

মনে পড়ল যখন সকালে ঝর্ণার ধারে কফি তৈরি হচ্ছে আমরা একজন পুব একজন পশ্চিম মুখে এক হাত দূরে-দূরে বসেছিলাম। আমাদের দক্ষিণে সেই ঝর্ণা, আমাদের আর ঝর্ণার মাঝে ট্র্যাকার স্নান রান্না ইত্যাদির আগে কফি বানাতে ব্যস্ত। সে কিন্তু পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমে একই সঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে, এবং তা সকাল হওয়া সত্ত্বেও।

রেঞ্জার বললে, সেই সাতাশজন যারা অনুপস্থিত, তুমি বলবে, তাদের সবাই বাঘের পেটে, এমন যুক্তি নেই, সব কঙ্কাল পাওয়া যায় নি। কিন্তু এমন তো হতে পারে এখন থেকে তিন চার বছর পরে যখন এই ম্যানইটারের স্মৃতিও নেই তখন এমন বনের যে-সব অংশ অগম্য জলা, দুর্ভেদ্য বেতবন, সে-সব শুকিয়ে উঠতে থাকলে হয়তো একটা-দুটো করে কঙ্কাল পাওয়া যেতে লাগল···বললুম, তা বলছিলুম না, আমার স্বপ্নের কথা বলতে পারি। ওটা এখন কিছু দূরে থাক।

ঃ ওই পাহাড়টা কি নেমে আসছিল ?

বেশ হাসি পেল কথাটা বলতে, বললুম, ম্যানইটারটাই হয়তো তোমার ইকোলজির রক্ষক। কিছু পোচার তো কমায়, যার গল্প রটলে অন্য অনেক পোচার তোমার রেঞ্জকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু ওই ম্যানইটার থেকে রক্ষা পেতেই প্রথম মানুষ সভ্য হয়েছিল ঃ গুহা, ঘর বাড়ি, আগুন, আগুনের ওস্তাদ মানুষ, লাঠি, বল্লম, ক্রমশ তীর ধনুক এসব করে সভ্য হতে থাকল, অর্থাৎ এক বুড়ো স্থবির বাঘের ব্যাদান থেকে রক্ষা পেতেই···

গরম কফি সত্ত্বেও হাই তুলল রেঞ্জার। পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে ঝাড়ন তুলে এনে শূন্য কাপটাকে ভিতরে-বাইরে ভালো করে মুছে আবার পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে কাপটাকে রেখে সে পাইপ বার করলে। আটচল্লিশ ঘন্টার চুয়াল্লিশ ঘন্টা জেগে থাকার হাই উঠল আবার। ওটা সংক্রামক হওয়ায় আমাকেও ছাড়লে না, যদিও এই দুপুরে দু-তিন ঘন্টা ঘুম চুরি করতে পেরেছি। এ রকম সময়ে মনে হয় গাড়িটা ঘুরিয়ে, না থেমে চলতে থাকলে সন্ধ্যার পর পর ফরেস্ট বাংলোর পরিচ্ছন্ন, কোমল, সফেদ, কবোষ্ণ বিছানা পাওয়া যেতে পারে; যদি সে বিছানায় শুতে গিয়ে ভয় পেয়ে রাইফেল হাতে কর তবে নিশ্চিত জেন সাদা বিছানার উপরে সেটা একটা বড় জোর সবুজ গঙ্গাফড়িং, আসলে বনের আবহাওয়াটা তখনও তোমার মনেই আছে, নতুবা নিরাপদ।

রেঞ্জার ঘড়ি দেখলে, মৃদু খাঁকরি দিয়ে সোজা হল, দরজা গলিয়ে ঘাসে নামল, তার ম্যানলিকার হাতে নিলে ; বললে, এক ঘন্টার কিছু উপরে সময় আছে, ভোর রাতের সেই সাধু কলোনিতে ফিরেছে কিনা দেখলে হয়। খবর পাওয়া যায় হয়তো।

ঘড়ি দেখলুম। যদি সাড়ে ছয়ে সন্ধ্যা হয়, ছটায় অন্তত পৌঁছাতে হবে যেখানে সেই যুবক মোষটা বাঁধা আছে। তা হলে এই ক্যাম্পে রাত্রির জন্য তৈরি হতে পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচে ফিরতে হয়। সাড়ে-পাঁচে রওনা হতেই হবে কারণ তখনই গাছের ছায়াগুলো গেরুয়া বিকেলের গায়ে লম্বা কালো-কালো দাগ হয়ে পড়তে থাকবে। সুতরাং এই কলোনির জন্য আমরা এই সময়টাই দিতে পারি। আর তা দেয়াও ভালো, কিছু সময়ের জন্য মন হাত-পা ছড়িয়ে নেবে। চাপটা সব সময়েই সহ্যের বাইরে যাচ্ছে।

রেঞ্জারের পদ্ধতিতেই জিপ থেকে নেমে তার উইনচেস্টার নিলুম। ট্র্যাকার থাকবে। সে নৈশ আহার প্রস্তুত করতে থাকবে, তার নিজের এবং তার সম্বন্ধে আমাদের ভরসা ম্যানইটারের দ্বিতীয়-স্বভাব। সে অন্তত শেষ পনেরোটা ক্ষেত্রে, যদি অরণ্যের ইতিহাস বিশ্বাস করতে হয়, আর আমরা তা করছিও, দলের শেষের মানুষটাকেই নিয়েছে, আর তা যখন সে ঘরে ফেরার জন্য পা বাড়াচ্ছে, তা গরু মোষের পিছনে হোক, কিংবা ঘাসের বোঝা মাথায় তুলে, অর্থাৎ বিকেলের গেরুয়া তখন সন্ধ্যার খয়েরি রং নিচ্ছে। এই বেলা শেষের আলো যা অন্তত ফাইবার গ্লাসের মতো স্বচ্ছ তার মধ্য দিয়ে সে গলতে পারে না।

আমরা অবশ্যই সোয়াইৎমারকে আশা করি না। তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন, ডাক্তার ছিলেন, এ ব্যাপারটা যে সেন্ট আন্‌সায়েন্টিফিক তাতে সন্দেহ নেই। সে-সব আমরা সকালেই আলোচনা করে স্থির করেছি। হয়তো গাছ-গাছড়াই ওষুধ। বলেছিলুম সেকালেও কুষ্ঠ ছিল। আর গাছগাছড়া তা দমিয়ে রেখেছে। নতুবা ভারতবর্ষ এতদিনে পুরোটাই কুষ্ঠে ছেয়ে যেত। রেঞ্জার আবার বলেছিল, পুরো আনসায়েন্টিফিক্। হয়তো এই অঞ্চলটায় সে-সব গাছগাছড়া সহজে পাওয়া যায় বলেই স্থান নির্বাচন। এ-রকম ধারণা হয় না, পাশ করা ডাক্তার হলে পোশাকটা অন্যরকম হত না সেই সাধুর ? গায়ে যা ছিল তা রং চটা হালকা খয়েরি আলখিল্লা হতে পারে, সার্জনের অ্যাপ্রনকোট, অথবা পাদরীদের মারপ্লিস। তার পুরো মুখটাও দেখা যায় নি।

সে হয়তো আমাদের দেখে থাকবে। তার মুখটা লাল কিরণের সদ্যজাত সূর্যের দিকে ফিরানো ছিল। যেন সে-জন্যই ব্রিজের উপরে দাঁড়াল। ঝর্ণা সেখানে পূব-পশ্চিমে সুতরাং সূর্যের লাল রঙ ঝর্ণা বরাবর অব্যাহত। সে জন্য তার মুখের যেটুকু পাশ থেকে চোখে পড়েছে তার রং ছিল গোমেদের। কোন্ জাতি বলা যায় না। বয়স হয়েছে তা সাদা চুলে প্রমাণ।

সে যাই হোক, বেলা সাড়ে তিন-চারের ফাইবার গ্লাস স্বচ্ছতা থাকলেও আমরা তখন একই সঙ্গে কাছে এবং দূরে, এবং ঝোঁপগুলোকে বেষ্টন করেও যেন, দেখতে-দেখতে পাশাপাশি মৃদু ঢালে ওঠা দু ফার্লং দূরের সেই টিলাটার দিকে উঠেছি। বর্ষা পার হয়ে যাওয়া সেই ঋতুতে অদ্ভুত গরম লাগছিল। কেউ পিছিয়ে না পড়ি, এবং এদিকে-ওদিকে ছড়ানো ঝোপগুলো থেকে অন্তত দশ পনরো গজ দূরে থাকি দুদিক থেকেই, তা লক্ষ্য রেখে, শব্দ না করে এগোচ্ছি। পিছে গেলে বাঘে খায় এটা ম্যানইটারের বনে ধ্রুব সত্য। বাতাস না থাকায় নিশ্বাসে অসুবিধা হলেও এই এক সাধারণ সুবিধা আমাদের উপস্থিতি ছড়াচ্ছে না। একে তো এই অসুবিধা আছেই পশ্চিমের সূর্য চোখে, চশমায় এবং রাইফেলে পড়ছে প্রতিফলিত হচ্ছে।

পথের শেষটুকু এমন ফাঁকা যে চারিদিকেই পঞ্চাশ গজ করে চোখে পড়ে, সুতরাং সেটুকু যেতে আমাদের কম সময়ই লাগল যদিও তা কিছুটা খাড়াই।

ছোট কলোনি। সব সমেত পনেরো বিশটা কুটির কিছু দূরে-দূরে, একটা শুধু ইংরেজি এলের অক্ষরে বড় ঘর যার একটা চওড়া বারান্দাও আছে। যা থেকে বোঝা যায় সেটাই কলোনির হেড কোয়াটার। লক্ষ্য করতেই বোঝা গেল সেই পনেরো বিশটা কুটিরের দক্ষিণ অংশের কয়েকটি ব্যবহারের বাইরে চলে গিয়েছে, আগাছা বেড়ে সেই ভাঙাচোরা ঘরগুলোকে গ্রাস করছে। অন্য কুটিরগুলোকেও তাজা অবস্থায় দেখলাম না। বোঝাই যায় কলোনির অবস্থা ভালো নয়। কিছু একটা ঘটেছে। এই এল শেপ ঘর-টাতেই সাধু থাকবে। তার বারান্দাতেই দশ-বারোজন কিংবা পাঁচ-ছয়ও হতে পারে, কলোনিবাসীকে দেখতে পেলুম। অধিকাংশই বয়স্ক, কিন্তু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দেখলুম তাদের মধ্যে দু-তিন বছরের শিশুও আছে। বয়স্কদের মুখ, নাক, কান, হাত-পায়ের আঙুল প্রমাণ করছে তারা কুষ্ঠী। তা হলে শিশুগুলো? সাধু আশ্রমে নেই। তার ঘর খালি।

বলব কি ? রেঞ্জার অবশ্যই ভীরু নয়। নতুবা সেই নর খাদককে ট্র্যাক করে বেড়াত না, যে রেঞ্জার পূর্ণবয়স্ক চওড়া চোয়ালের পুরুষ প্যান্থার অথবা খয়েরিতে কালো গুলের ব্রোকেডে মোড়া লেপার্ড যুবতীকে দেখলে গাড়ির ইলেকট্রিক হর্ন টিপে তাড়ায় আর হাসে। আমি নিজেও অন্তত কয়েকবার তো রাতের জঙ্গলে ফ্ল্যাশ-গান আর ক্যামেরা সম্বল করে ঘুরেছি। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হতে থাকল ঃ দু রকম আছে, একটা সংক্রামক, একটা নয়, আর তুমি বলতে পার না কোনটি সেটি। মনে হতে থাকল নিশ্বাস নেয়া কি উচিত হচ্ছে এখানে ? কী সাংঘাতিক ! এই শিশুরা কি এই জগতেই জন্মালে ? কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য ! এরকম হঠাৎ মনে হল, নিশ্বাসে তো বটেই, দৃষ্টিতেও রোগের সংক্রমণ হতে পারে না কি ?

কতক্ষণ আর দম বন্ধ করে থাকা যায় ? আমরা তাড়াতাড়ি বেরোতে গিয়ে সেই এল চেহারা কুটীরের পশ্চিমে চলে গেলুম। আর তা ভালো হল মনে করলুম। সেদিকে বরং খানিকটা ফাঁকা, আর মনে হল বোধহয় নদী। রেঞ্জার বললে, চলো, চলো, ওদিকে নদীটার ধারে একটু ঘুরে যাই। এখন মনে হয়, বোধহয় নদীর জল ও বাতাসের বিশুদ্ধতার আশ্বাস আমাদের প্রাক-উচ্চারণ মনকে আকর্ষণ করেছিল। তখন যদি জানতেম !

রেঞ্জার সামনে ও দূরে দেখে স্থির করে নিলে উত্তরে গজ পঞ্চাশ গিয়ে যেখানে বেশ খানিকটা জায়গায় ঝোপ-ঝাড় চোখে পড়ে না, পাশাপাশি কয়েকটা সরু-সরু গাছ মাত্র, সেখানে উঠে জিপের দিকে চলা হবে। হাঁটা চলায় স্ট্রেইন কিছু কমবে।

এটা সেই ঝর্ণাই যার উজানে সেই ব্রিজ, এখানে বেশ চওড়া খাত। এই সময় রেঞ্জার বললে, আর হাত নেড়ে দেখালে। আমাদের পথের ধারে হলদে বালি, নীল জলটা দূরে, বালি আর এখানে-ওখানে ছড়ানো বোল্ডার যার কোন-কোনটা এক-দেড়ফুট খাড়া আর খয়েরি। থাবার ছাপ, ক্ষুরের ছাপ আছে বৈকি। নরম স্যাঁতা বালি তো। স্বভাবতই সামনে দূরে চোখ বা পা-র সঙ্গে মাটির দিকেও চোখ থাকছিল। সামনে একটা কালো রঙের বড় বোল্ডার। এদিকের মধ্যে এটাই সব চাইতে বড়। ফুট তিনেক উঁচু, মোটামুটি ফুট চারেক ব্যাসের। দুজনেই একসঙ্গে থমকে দাঁড়ালুম, দুজনের চোখেই একসঙ্গে পড়েছে। বাঁ হাত বাড়িয়ে রেঞ্জারও আমার সম্মুখগতি ঠেকালে। নতুন নয়, অন্তত আজকালের নয়, ধারগুলো ভেঙেছে,

একটায় তো একটা অন্য প্রাণীর পায়ের ছাপ পড়েছে। রেঞ্জার ফিস-ফিস করে বললে, বলতে-বলতে চারিদিক দেখেও নিলে, আমি তখন চোখ ছটোকে বড় বোল্ডারটায় আটকে রেখেছি। বললে, পুরুষ মোষটাকে যেখানে বেঁধেছি এটা মনে হচ্ছে তার চাইতে টাটকা। তখন ভাবিনি এতটা টাটকা ছাপ পাব যা এখান থেকে ছ মাইল দূরে বাঁধা দ্বিতীয় মাদি মোষটার কাছের ছাপের মতোই টাটকা। এক ভরসা এখনও সময় হয় নি, এখনও সাড়ে চারের রোদ।

কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। বোল্ডারটার গজ পাঁচেক এপারে একটা স্যাণ্ডাল। মেয়েদের স্যাণ্ডাল, ব্যবহারজীর্ণ কিন্তু একসময়ে দামি ছিল। আর থাবার ছাপও সেই ম্যানইটারের। একই সঙ্গে শকুনের ঝগড়ার চিৎকার আর ডানা ঝটপটানি কানে এল। পচা গন্ধটাও উড়িয়ে আনলে বাতাস। শকুন যখন তখন বাঘ নেই। কিন্তু কি দেখব? হায় ভগবান, কি দেখব?

কঙ্কাল ছাড়া কিছুই ছিল না। আর অন্যান্য প্রাণীরাও যে শকুনের বাগে এসেছিল তা খোঁড়া ম্যানইটারের থাবার পাশে একসেট অন্তত গুলবাঘের, একসেট অন্তত হায়েনার থাবার ছাপেই প্রমাণ। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে-যেতে মনে-মনে বললুম, তা হলে, রেঞ্জার এটা আটাশ নম্বর হল। এ-সময়ে খানিকটা দূরে বালিতে পড়ে থাকা একটা চেক কাপড়ের চওড়া টুকরো চোখে পড়ল, বাদামি আর লালে চেক্। বোল্ডারটাকে ঘুরে বরং জলের দিকে দুর্গন্ধ বাঁচিয়ে যাওয়া স্থির করলুম আমরা। না করলেই ভালো ছিল। শিয়াল, হায়না, কিংবা শকুন করোটিটাকে এদিকে টেনে এনেছিল। বালির উপরে শুকনো শ্যাওলার মতো তেমন রঙের কয়েক গোছা লম্বা চুল। দুজনেই একসঙ্গে শুধুইস্ বলতে পারলুম।

এ তো এক সমস্যাই যার সমাধান অন্যত্র হবে। রেঞ্জারের মুখ থম-থম করছে, করবেই। আমার মনে হল এ কলোনির কেউ না হয়ে যায় না। কিন্তু এই ভেবে আশ্চর্য লাগতে লাগল, ওরা তো আমাদের দুজনকেই বন্দুক হাতে দেখেছিল। তা হলে তো তাদের প্রতিহিংসার জন্য সমস্বরে আমাদের এই ঘটনার কথা বলা স্বাভাবিক হতো। উত্তেজিত হওয়া উচিত ছিল, সঙ্গে এসে ঘটনাস্থলের দিকে আঙুল বাড়ানো স্বাভাবিক ছিল। মানুষ তাই করে থাকে। যাদের আমরা দেখেছিলাম তারা কি হতাশায়

স্তম্ভিত ? নাকি এ অন্য কোনো মৃত্যু ?

রেঞ্জার একবার বললে, এই আশ্রমের একজন নেত্রীও থাকার কথা। এরকম শুনেছি।

একি তা হলে স্বাভাবিক মৃত্যু! এমন কি হতে পারে যে অবৈজ্ঞানিক উপায়েও কুষ্ঠের সেবা করতে গিয়ে নিজেও কুষ্ঠী হয়েছিলেন। এটা কি মৃতদেহের এক বীভৎস পরিণতি ? কিংবা এ কি এক আত্মহত্যা ? হঠাৎ দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখে আদর্শের মুখ থুবড়ে পড়া ?.. একবার আশ্রমে যাদের জন্ম সেই শিশুদের কথা মনে পড়ল। যদিও এখানে তো সকলেই কুষ্ঠী। তাও কি কারণ হয় ?

আমরা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি চলছিলাম, বিচলিত হলেও অসতর্ক হওয়া চলে না, জিফের পঞ্চাশ গজ দূরে সাধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আর তখনই আরেকবার আমাদের সমস্ত মন বন্ধ ঘড়ির মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। ঠোঁট, কান, বাঁ হাতের আঙুলগুলো······

মনে হল পিছন ফিরে দাঁড়াই।

সাধু ভাঙা-ভাঙা গলায় তার মিশ্র হিন্দিতে বললে, আপনারাই কি মোষের টোপ বাঁধছেন।

রেঞ্জার স্বীকার করলে আবার বললে, ওই প্রাণীগুলোর কষ্ট হয় না ?

রেঞ্জার তখন এই অদ্ভুত কৈফিয়ত দিলে—কষ্ট ? যদি হয় তবে তা খুবই ক্ষণস্থায়ী। ম্যানইটার বাঘ মোষের পিঠে লাফিয়ে পড়া থেকে মোষটার মেরুদণ্ড আর ঘাড়ের সংযোগ ভাঙতে এক মিনিট লাগতে পারে। তারপরে মোষের আর অনুভূতি থাকে না। আর তার আগের সেই এক মিনিট শরীরের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে পিঠের সেই বোঝাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। সেই শক্তিকে একমুখী সংহত করতে-করতে যন্ত্রণা অনুভব করার সময় থাকে। বরং সেই শক্তিকে সংহত করার একটা সুখ আছে।

শুধু স্থির হয়ে রেঞ্জারের কথা শুনলে। মনে হল ভাবছে। বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে।

রেঞ্জার বললে, ফাঁসিতে যেমন হয়। মোষটার নিজের শরীরের ভারও তার মৃত্যুকে সহজ করে। মানুষ আগে-পরে ভাবে বলে তার কষ্ট। ঘটনাটা খুব ক্ষণস্থায়ী। মোষ এখন মনের সুখে খেয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হলে বাড়ি ফেরার অভ্যাসটা তাকে হয়তো ব্যাকুল করবে। দু-একবার ডাকবে। একটু অবাকবোধ করে ঘাসে মুখ দেবে। আর তখনই হয়তো।

মানুষের কথা নাকি তার চরিত্রকে প্রকাশ করে, কথা নাকি এমন হতে পারে যা সে তার বাইরের আচার-আচরণে যতটুকু কথায় প্রকাশ করে তার আড়ালের গোপন অংশও ধরা পড়ে।

সাধু হাসল যেন। কিন্তু তাকে কি হাসি বলা যাবে? সেই ঠোঁট, সেই ব্রণস্ফীত মুখ।

রেঞ্জার বললে, বুঝি, বুঝি। কিন্তু এটা নাগাসাকির মতো ব্যাপার। এক মিলিয়ান আমেরিকান, পাঁচ মিলিয়ান জাপানীর মৃত্যুর বদলে দুই শহরে মোট দু লাখ লোকের এক মুহূর্তে মৃত্যু। ষাট লাখের বদলে দুই। একটা মোষের প্রাণের বদলে অন্তত পঞ্চাশ জন মানুষের প্রাণ বাঁচানো। এরই মধ্যে জানেন তো সাতাশ, এখন তো বলতে হয় আটাশ জন মানুষকে। বেঁচে থাকলে প্রতিমাসে গড়ে আড়াইজন।

সাধু বললে, কিন্তু সে কি কখনও মোষ মেরেছে? আপনি নিশ্চয় খবর রাখেন। গরু মোষ নিয়ে ফেরার পথে যে রাখাল শেষে থাকে, ঘাস কাটতে গিয়ে বিকেলের পরেও যে দল থেকে কিছু দূরে থাকে, বিকেলের পরে যে লাকড়ি নিয়ে ফিরতে থাকে তারাই। মোষের টোপে তাকে ধরা যাবে কি?

তখনই যেন প্রথম লক্ষ্য করতে পারলাম তার গলাটাও ফ্যাসফেসে, তার মুখের উপরে পশ্চিমের সূর্য পড়ছে। সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

সাধু বনের পথে চলে গেল, তা ওষুধ সংগ্রহের জন্য হতে পারে, ভিন্ন গ্রামে ভিক্ষা করতে হতে পারে।

আমাদেরও বিপদ হল। ট্র্যাকার ইতিমধ্যে খাবার তৈরি করছে; কিন্তু লক্ষ্য করলুম কোনো কিছু গলাধঃকরণ দুঃসাধ্য। গলার, মুখের ভিতর শুকিয়ে উঠেছে, তা গোপনে লুকিয়ে বারবার থু থু ফেলার ফলে। খুব ভালো করে গরম জল সাবান ইত্যাদি দিয়ে স্নান না করে জল গেলাও চলে না। রেঞ্জারও বললে, রাখ, রাখ, দেখা যাক। ফিরে এসে তখন। এখানে কড়া ডিস্ইনফেক্ট্যান্ট সাবান কোথায়?

কিন্তু হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য ঝিঁঝিঁ-র ডাক যেন থেমে গেল। পরমুহূর্তে নানা শব্দ জেগে উঠল। দূরে কোথাও একটা সম্বর ডাকল, হ র র র করলে হনুমান-নেতা, চোকগ্যাল চোকগ্যাল করলে উড়ন্ত পাখি, ক্যাঁঅ্যাও-ক্যাঁঅ্যাও করে ময়ূর সরে পড়ল, করাত চেরার শব্দে সাড়া দিলে প্যান্থার, আর দূরে অনেক দূরে আঁউউঙ্গ-অউউঙ্গ, অাঁ অাঁ, করে বিরক্তির সাড়া দিলে বাঘ। তারপরে আবার একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলল। সাড়ে পাঁচ

ঘড়িতে। গাছের ছায়াগুলো লম্বা-লম্বা হাল্কা বাদামি দাগ হতে শুরু করেছে।

রেঞ্জার আবার জিপ থেকে থেকে নামল। বললে, আসবে নাকি? এ সময়ে সকলের মুখই ফ্যাকাশে দেখায়। আধঘন্টার মধ্যে মাচানে পৌঁছাতে হবে। রোদের রং এখনও স্বচ্ছ হাল্কা-হলুদ। সে রং বাদামি হওয়ার আগে, সে রঙের উপরে গাছের ছায়ার দাগ খরেরি দাগ হওয়ার আগেই পৌঁছাতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রাণশক্তি যে পরিমাণে দুর্বল সেই পরিমাণে শ্রবণ ও দৃষ্টি তীক্ষ্ম। নানা কথাগুলো বার-বার মনে ফিরিয়ে আনা হল। পাশাপাশি। একই সঙ্গে কাছে ও দূরে দেখতে হবে। আক্রমণ দুদিক থেকে নয়। এ ওর গুলিতে ঘায়েল হলে চলবে না। পায়ের শব্দ নয়। দূর থেকে গলার শব্দ ভাসিয়ে দেয়া মন্দ নয়। কারণ সে ম্যানইটার। মানুষ তাকে ভীত না করে প্রলুব্ধ করে। তারপরে মাচানে বসে, এমন কি মাচানে ওঠার ব্যাপারও, তার চোখে পড়লে চলবে না। কারণ সে অভিজ্ঞ, ধূর্ত, গাছে থাকা মানুষ তাকে খোঁড়া করেছে। দড়িতে বাঁধা পশুতেও তার ভয়। সেটাই তার একটা চোখ নষ্ট করেছে, যদিও সে জানে না দাঁতগুলো পশুর নয়, লোহার।

প্রায় তিনশ গজের মধ্যে এসে পড়েছি। ছটা বাজতে-বাজতে মাচানে ওঠা যাবে। থামছি, চারদিক, সামনে, দূরে চেয়ে নিঃশব্দে কয়েক গজ, তারপরে আবার থামা। পায়ের তলায় কাঠি ভাঙলেও চলবে না। কারণ বাতাস বদলে এখন আমাদের দিক থেকে বইছে। একটা সুবিধে, ওদিকের শব্দ সহজে পাওয়া যাবে। আর এক পা খোঁড়া থাকায় চলার ব্যাপারে তত নিঃশব্দ দক্ষতা আর নেই। সামনে দু-তিন সারি ফাঁক-ফাঁক কেন্দু গাছ। গাছগুলোর মধ্য দিয়ে একটা অসমান প্রান্তের বনবীথি চোখে পড়ছে। বীথি হওয়ার দরুন সেখানে আলোটা ইতিমধ্যে গেরুয়া। নিজেকে আর-একবার সতর্ক করলুম, বনে তুমি পশুকে কদাচিৎ তার অবয়বের পুরোটা আঁকা দেখ। খানিকটা রং যা বিশেষ যায়গাটায় থাকা উচিত নয় অথচ আছে—এটাই তোমাকে সেই প্রাণীর উপস্থিতি জানায়, বিশেষ সে রং যদি বাতাসে কাঁপা পাতা বা ডালের চাইতে অন্য গতি নেয়।

কিন্তু হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক দারুণ শব্দ হল। কিছু যেন গাছপালা ভেঙে-চুরে পায়ের শব্দ করে ছুটছে। হাতি নয়। গণ্ডার এ-বনে নেই। প্যান্থার, লেপার্ড, বাঘের ধরন এমন অকৌশলের নয়। ভারি হরিণ কিংবা গবয়ের শেষ মুহূর্তে প্রাণ বাঁচানোর নিষ্ফল চেষ্টা এ-রকম হয় বটে। পাথর

হয়ে গিয়েছিলাম। দুটো রাইফেলই কাঁধ আর বুকের সংযোগে।

সেই বীথিটাতে, অবাক হয়ে দেখলুম, একটা মোষ ঢুকে পড়ল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। আমাদের অবস্থানের দিকে এগোচ্ছে। সব চাইতে কাছের গাছটার গুঁড়িতে আধঢাকা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। এখানে মোষ আসে কোথা থেকে? মোষের পায়ের শব্দের আড়ালে পাশের কেন্দুগাছটাকে ঘুরে সেই বীথির ধারের একটা গাছের গুঁড়িতে আশ্রয় করলুম। কিন্তু তখনও আশ্চর্য হওয়া বাকি ছিল।

মোষের দশ গজ পিছনে ছুটতে-ছুটতে সেই সাধু বীথিতে ঢুকে পড়ল, তার হাতে একটা পাতা-সমেত গাছের ডাল যা দিয়ে সে যেন মোষটাকে তাড়াচ্ছে। রাগে গা রি-রি করে উঠল। এমন কি সহিষ্ণু রেঞ্জারের নাক দিয়ে একটা অসন্তুষ্টির শব্দ হল এই কি জীবে দয়া দেখানোর সময়? সাধু বেশ জোরেই দৌড়াচ্ছে। ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ হচ্ছে। সে আমাদের পনেরো গজের মধ্যে এসে পড়েছে। এই সময়ে তার বাঁয়ের দিকে চোখ পড়তেই সে আর্তনাদ করে উঠল। কি যে সেই অশরীরী আকুল অব্যক্ত আর্তনাদ! সামনের দিকে একটা লাফ দিল সে। তার বাঁয়ের দুটো গাছের মধ্যে থেকে একটা হলুদ বাদামি কালো মেশান কিছু তার পিঠের উপরে লাফিয়ে পড়ল। সাধু পড়ে যেতে-যেতে ফিরল হাত তুলে। সে হাতে একটা ডাল। নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। বোধ হয় এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ।

ম্যানইটার তার বুকের উপরে। হাত-পা তখনও থর থর করছে। বোধ হয় খেতে শুরু করার আগে দেখে নেয়া। তার বাঁ দিকের গলা-চোখ আর ডানদিকের সুস্থ চোখের মধ্যে তার কপালের ছ-সাত ইঞ্চি জায়গা, রেঞ্জারের গাছের পাশ থেকে বাড়িয়ে ধরা কাঁধে বসানো সেপটিক্যাচ্‌ খোলা ম্যানলিকারের চোঙের ডগা থেকে সাত আট গজ। ম্যানইটারের চোখ সাধুতে, ঘ্রাণে নতুন রক্ত, কানে বোধ হয় আধ সেকেণ্ড আগেকার মোষ আর মানুষের ধুপধাপ পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি।

বলা বাহুল্য এ সব ক্ষেত্রে মিস্‌ হয় না। ম্যানলিকারের সেটাকে বেশ ভারিই বলতে হবে, শুধু অনেকটা ফাটায় না, তার প্রচণ্ড গতি দারুণ ধাক্কাও দেয়। তা হলেও রেঞ্জার চোয়ালের নীচে গলায়, সুবিধা পেতেই, দ্বিতীয় বার গুলি করল।

সে থামল। তার আগেই আমাদের ডিনার শেষ হয়েছে। সেই

নিস্তব্ধতায় সে আমাদের জিজ্ঞাসু মুখগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। টেবিলের উপরে পিতলের ডোমদার ল্যাম্পটা উজ্জ্বল। চারিদিকের হলুদ ডিস্‌টেম্পার করা দেয়ালে আমাদের কালো-কালো ছায়া ফুটছে। সে হুইস্কির বোতলটাকে টেনে নিলে, এক সঙ্গে জড়ো করে রাখা গ্লাসগুলোর একটা বেছে নিলে, শুঁকলে। এটা তার এক মুদ্রাদোষ দেখছি। যেন সব কিছুতে কোনো এক খারাপ গন্ধ জড়িয়ে থাকতে পারে। চামচ হাতে করেই সে নাকের কাছে নিয়েছিল একবার, মনে পড়ল।

বোতলটা খুলবার আগে সেটাকে হাতে রেখেই সে বললে, আমাদের সেই ট্র্যাকারের গাড়ি চালানোর এক কায়দা ছিল। গাড়ি যেন রবার অথবা রক্তমাংসে তৈরি, স্থিতিস্থাপক, যে রকম ইচ্ছা বাঁকানো চোরানো যায়। বনের অলিগলি, খানা-খন্দ, উঁচু-নিচু, এসব পার হয়ে চলতে যেন প্রকৃতিদত্ত বিশেষ-বিশেষ ক্ষমতা আছে গাড়ির। গাছ বেয়ে উঠবে মনে করে চোখ বুঁজেই অনুভব করলেন কাত হয়ে শুয়ে পড়েছেন, কারণ গাড়ি এক নালায় ভূমিসমান্তরাল ভাব ছেড়ে ছুটছে, ভয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মেলে দেখলেন গাড়ি ত্রিশ ডিগ্রির এক ঢাল বেয়ে সত্তর আশি কি. মি. বেগে নামছে। পারত-পক্ষে রেঞ্জার তাকে স্টিয়ারিং দিতে চায় না।

আমাদের অনেক কাজ করার ছিল। সেই ম্যানইটারের ঘেয়ো ছাল আনার কথা আমরা একবারও ভাবি নি। পচা গলা শরীরের সেই ম্যানইটার যার দু চোখের মাঝের প্রকাণ্ড গর্ত দিয়ে ঘিলু আর রক্ত গড়াচ্ছে তাকে ট্রফি করার কথা দূরে থাক, লাঠি দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে। বাঘের কি কুষ্ঠ হয়? আসলে শব্দটা ভয়ঙ্কর নয়, বীভৎস। কিন্তু সাধুর মৃতদেহটা মাটি চাপা দেয়া দরকার ছিল যাতে বন্য জন্তু, শকুন কাক ইত্যাদি মৃত্যুর প্রমাণ লোপ না করে। নিকটতম পুলিশ চৌকিতে মানুষের মৃত্যু সংবাদ দেয়াও প্রথা ছিল তখন। এ ছাড়া আমাদের স্নানের ও আহারের দরকার ছিল।

দেখলুম রেঞ্জার বিড়বিড় করছে: তাই বলে আমি কি করতে পারি? বুঝলে, আমি বছর তিনেক মাত্র বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী সুন্দরী, তা ছাড়া তার ছেলেপুলে হবে। আমি কি করে চার্জ নেব? অ্যাবসার্ড। এটা পুরোপুরি অ্যাবসার্ড যে আমি ওই কলোনির চার্জ নেব। বিশ্বাস কর আমার স্ত্রী বিশেষ সুন্দরী। না, আমি যা পারি না……

এ কথাটা বলে ফেলতে হল, তা ছাড়া কী দিয়েই বা আপনাদের বোঝাবো তখন রেঞ্জারের মনের অবস্থা কি ছিল। জিপের সিটে বসে, ব্যাক

রেস্টে হেলান দিয়ে, হাতে না-ধরানো পাইপ, সে বিড়বিড়, বিড়বিড় করে চলেছে। এ অবস্থায় ডান দিকে সরে বসে ট্র্যাকারকে হুইলের নীচে, ইঙ্গিত করে বসতে দিয়ে বলেছিলুম—চলো।

ফিস-ফিস করে বললেও সে বুঝেছিল। আর রাত এগারোটার মধ্যে অর্থাৎ সাত-আট ঘন্টার পথ চার ঘন্টায় জিপটাকে তার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে চালিয়ে এই ফরেস্ট বাংলোতেই আমাদের এনে তুলেছিল। জিপ থেকে নামতে-নামতে সেই পাইপ ধরিয়েছিল রেঞ্জার।

সে বোতল থেকে খুব ধীরে হিসাব করে, যেন এতটুকু বেশি না হয়, এমন ভাবে দু পেগ ঢেলে নিলে। ঠোঁটে লাগালে, জিভে গড়ালে, হাসল, তো, মশায়, না বললে মিথ্যা বলা হবে। আমি রেঞ্জারকে বলেছিলুম, কী করব বল? আমিও পারছি না ভার নিতে। দেখ, আমি আবার মাস সাত-আট আগেই রাজনৈতিক হত্যায় বিধবাকে, তার সন্তানও আছে, বিয়ে করেছি। এখন তো তাকে…

আমাদের টেবিলের একমাত্র মহিলা বললেন, কই, এই শেষ কথাটা তো আমাকে কোনোদিন বল নি?

সে বললে, আমি যে এরকম কৈফিয়ৎ দিয়েছিলাম তার এই এক প্রমাণ, রেঞ্জার তোমাকে দেখার পরে সেদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, তুমি সত্যি, অর্থাৎ প্রীতিবিন্দুবাবুর মৃত্যুর পরে তোমাকে বিয়ে করেছি কি না। অর্থাৎ তখন আমরা পরস্পরকে দেখছিলুম, শুনছিলুম, কিন্তু কি ভাবে যেন ওই এক সমস্যায় আটকে পড়েছিলুম।

সে তার হুইস্কি শেষ করলে। ক্যামেরা আর ফ্ল্যাশ গান যা টেবিলেই ছিল, বুকে ঝুলিয়ে চেয়ারের পায়ের কাছে থেকে এক হাতে এক লোহা বাঁধানো লাঠি, অন্য হাতে একটা টর্চ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে এখন রাত্রির বনে ঘুরবে।

তার স্ত্রী বললে, লাঠিটা দেখে নিয়েছ তো? দুটোই একরকম দেখতে।

তাকে এখন আর ডেজ্‌ড্‌ মনে হচ্ছে না।……

আঁউউঙ্গ, অঁউউঙ্গ, অঁউউঙ্গ, অঁা, অঁা।…

দু হাতের মধ্যেই, অন্তত কম্পাউণ্ডের মধ্যে তো বটেই। জুতো পরা পায়ের নীচে ম্যাটিং চাপা পাটাতন কেঁপে উঠল। হাতগুলোর কাঁপুনিতে টেবলটা কাঁপছে, বাতি থর থর করছে। না, না ম্যানইটার নয়—তাইতো প্রমাণ হল। কিন্তু।……

আঁউউঙ্গ, অঁা, অঁা...

সে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকাল, এক চোখ বন্ধ করে হাসল, বললে মেটিং সিজন তো।

সে চলে গেলে ফ্যাকাসে মুখে যে যার ঘরে যাওয়ার জন্য আমরা ফরেস্ট বাংলোর বারান্দায় এলাম। ঘরে-ঘরেই আলো, সে আলো বারান্দায়, বারান্দা ছাড়িয়ে লনে। লনের কোথাও ঘাস, বড়-বড় সেখানেও আলো। জানলার শিকগুলোর ছায়া পড়েছে। কিন্তু বারান্দাটা বরাবর চলে কয়েক গজ গিয়ে ঘরে ঢুকতে গা ছম-ছম করতে লাগল। ল্যাম্পগুলো থেকে আলো হলুদ-হলুদ, তার গায়ে কালো-কালো ছায়ার ডোরা। মনকে প্রবোধ দিতেই হল: চোখ গলেছে, খোঁড়া হয়েছে, অত্যাচারে-অত্যাচারে সাহস ও তেজের বদলে কুটিলতা, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ আর ঘৃণা মনে এমন একটা আট-দশ ফুট উঁচু বাঘ সত্যই এনক্লোজারের বাইরে বসে থাকতে পারে না। কখনই তা সম্ভব নয়। এ-রকম প্রবোধ দিতে হল নিজেকে। ঢোক গিলতে বোঝা গেল গলা শুকিয়ে কাঠ।

অসীম রায় কেওড়া পার্টি

ট্রেনে উঠতে না উঠতেই তাদের কেওড়ামি ফনফনিয়ে উঠল।

'অ্যাই ঘুম নয়, একদম ঘুম নয়।' বলেই এক হ্যাঁচকায় আধ-ঘুমন্ত ভদ্রলোকের গা থেকে কম্বলখানা সরিয়ে দিয়েই তার সুটকেসটা কাঁধে নিয়ে কাঁধ ঝুঁকিয়ে বুলা গান ধরে। 'আঁকাবাঁকা পথে মোরা কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই রাজা-মহারাজাদের দোলা। হে দোলা, হে দোলা।'

পাশ থেকে বাবু ভদ্রলোকের দিকে এক প্যাকেট সিগারেট বাড়িয়ে বললে, 'নিন ধরুন। একটা তো রাত্তির স্যার।'

থ্রি টায়ারের নীচের টায়ারে তারা গাদিয়ে বসে। ট্রেন হাওড়া ছেড়েছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন যাত্রী ঘুমের ব্যবস্থা করছে, কেউ-কেউ ঘুমন্ত।

এবার নীহার এক ঘুমন্ত যাত্রীর পায়ের কাছে রাখা ধুলো মাখা চটিখানা সন্তর্পণে তুলে নিয়ে আস্তে তার গালের নীচে রাখে। পশ্চিমী শ্রমিকটি গালে চটি দিয়ে অকাতরে ঘুমোয়। তারপর বুলা বিকট আওয়াজ বার করতে থাকে ক্রমাগত। তার সঙ্গে সঙ্গত করে ছোট খোকন, সে চিড়িয়াখানার উল্লুকের মতো ক্রমাগত শব্দ বার করে।

বয়স্ক ভদ্রলোকের পাশের বাঙ্কের সহযাত্রীটি ধড়মড় করে উঠে বসেছিল। কিছুক্ষণ এই কেওড়া পার্টির কারবার দেখে বললে। 'নাঃ। আজকে আর ঘুম হবে না।'

প্রথম ভদ্রলোক বাবুর দেওয়া সিগারেট টানতে টানতে বললে, 'ও কিছু না। জেনারেশান গ্যাপ মশাই, জেনারেশান গ্যাপ।'

বোধহয় গলা চড়ে গিয়েছিল। বুলা বললে, 'ইংজিরি বলছে রে!'

'কই চাঁদু, দেখি মুখখানা', বলেই বাবু সেই বয়স্ক ভদ্রলোকের থুতনি নেড়ে দেয়।

রোগা পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক বললে, 'এগুলো আমরাও করেছি।

এমন কিছু তোমরা করতে পারছ না।'

সমস্বরে তারা চেঁচিয়ে ওঠে। 'গুরু, গুরু, পায়ের ধুলো দাও।'

ভদ্রলোকের গলাটা গমগমে। নিচু খাদে কথা বলেন। মনে হতে পারে ভদ্রলোক যদি গাইতেন তো ভালো গায়ক হতেন।

'আপনার স্যার কী করা হয়?' বুলা যেন সত্যিই কৌতূহলী এইরকম তার ভাব।

'তোমাদের মতো ছেলে-ছোকরাদের নিয়েই আমার কারবার।'

'মাস্টারমশাই, তাই বলুন। ম্যাগো! ওয়াক থুঃ!' বুলার ঠোঁটে থুতু ফেলার আওয়াজ।

সঙ্গে সঙ্গে হু-উ-ক, হু-উ-ক হু-উ-ক উল্লুক ধ্বনিতে ট্রেনের কামরা প্লাবিত।

এবার বুলা চোখের ইশারায় বোতল বার করার ইঙ্গিত দেওয়া মাত্র গেলাস বোতল বার হতে থাকে। লাল সোয়েটার পরা ঠোঁটের ওপর পাতলা গোঁফের আঁজি এই নীহার ছোকরাটির হাবভাব অনেকটা ছুঁচোর মতো। একবার টক করে বসে পড়ে, একবার টক করে উঠে পড়ে, মাঝে-মাঝে দাঁত বার করে অকারণ হাসে, আবার প্যান্টের ওপর ঘিয়ে আলোয়ান মোড়া সন্দীপন বলে ছোকরাটির আলোয়ানের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দেয়। বিয়ার আর বাংলা পাঞ্চ করা হয়। একরাত্তির কলেজের অধ্যাপকটির হাতে দিয়ে নীহার তার দাঁত বার করা হাসি আর নিষ্পালক চোখে বললে, 'নিন স্যার।'

ব্যাণ্ডেল ছাড়ার পর গানের পার্টি বসে। পড়ন্ত ডিসেম্বরের চড়া ঠাণ্ডা জানালা-দরজার ফোকর দিয়ে ছুটে আসতে থাকে। ঘণ্টাখানেকের প্রবল হল্লায় কামরার যাত্রীরা প্রায় সবাই সজাগ, কেউ-কেউ উঠে বসে গান শোনে হাই তুলতে তুলতে, কেউ কেউ পেছন ফিরে নাক কান ঢেকে ঘুমোবার চেষ্টা করে। সন্দীপনের গলাখানা সুরেলা। সব দিক থেকেই সে এই পার্টিতে যেন ঠিক ফিট করে না। চেহারা নাম এমন কি তার গলার স্বর শুধু নয় তার গানগুলোও অন্যরকম। তার এক মামা না কাকা কে আই-পি-টি-এতে ছিল, তার প্রভাব বোধহয় তার বাড়িতেও পড়েছে। সে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গান গাইতে থাকে: একাকী থাকার দিন ভেঙে গেছে ভেঙে যাক / ভেঙে গেছে ভেঙে যাক / ধ্যানের মানুষে আজ মিশে গেছে হাজার মানুষে / মিথ্যা এ হাহাকার / ধ্যান ভাঙো

বয়স্ক ভদ্রলোকটি বলে ওঠে, 'বা বা।'

সন্দীপন গান ধরেছিল 'উই শ্যাল ওভার কাম' কিন্তু কয়েকটা লাইন গাইবার পরই বুলা চেঁচাতে থাকে 'এই সব ভুসিমাল থাক। লতা! লতা!'

এবার টেপ রেকর্ড করা লতা মুঙ্গেশকারের লগুন গীতিমালা ও তৎসহ-যোগে দর্শকদের হাততালি পরিবেশিত হতে থাকে। আধ ঘুমন্ত যাত্রীদের কেউ-কেউ কান থেকে কম্বল নামায়। কিন্তু ট্রেনের আওয়াজে অথবা ব্যাটারীর দোষে গায়িকার কণ্ঠ কেমন ঘ্যাড়ঘেড়ে। ঠিক জমে না।

রাত একটা বাজে। যাত্রীদের কেউ কেউ প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টায় মুড়ি-ঝুড়ি দিয়ে ট্রেনের দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে থাকে। কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। হঠাৎ বাবু তারস্বরে চেঁচাতে থাকে: 'লোকসভার শীতকালীন অধিষ্ঠানে যে যুগান্তকারী প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তা এবার শুনুন।'

বলেই একখানা বাংলা চটি বই ব্যাগ থেকে বার করে গলা খাঁকারি দিয়ে পড়তে শুরু করে। একেবারে কাঁচা পর্ণোগ্রাফি। চিনুমামা বলে কথিত এক যুবকের প্রবল পৌরুষের কাহিনী, সে কিভাবে একই রাত্তিরে তিন বোনের সঙ্গে মৈথুনে মত্ত হয়। যাত্রীরা সবাই আড়ষ্ট। বাংলা বিয়ার খেয়ে যে চটকা এসেছিল অধ্যাপক ভদ্রলোকের তা কেটে যায়। একজন নব বিবাহিত দম্পতি উবু হয়ে বসেছিল পাশাপাশি তারা তাদের মাথা দুটো কুণ্ডলী পাকিয়ে ট্রেনের দেয়ালে লেপ্টে রাখে।

হঠাৎ সন্দীপন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'ব্যাস ব্যাস! বন্ধ কর বাবু। সবটারই একটা সীমা আছে।'

'এই পাঁটাটাকে কে আনলে এখানে?' বুলা হুঙ্কার দেয়।

বাবু বললে, 'সীমা আছে। সীমা তোমার জন্যে ফ্রক বিছিয়ে বসে আছে।'

'হয়েছে, অনেক কেওড়ামি হয়েছে। রাত একটা বাজে।'

'তুমি কেন এলে বাপু। বাড়িতে গিয়ে দুদু ভাতু খাও।'

চিনু মামার পরবর্তী অধ্যায় বাবু সুরু করলে। কিন্তু বোধহয় এ কাহিনীটা তেমন জমাট নয় অথবা সন্দীপনের আপত্তিতে এই কেওড়ামির অনর্গলতায় ছন্দপতন ঘটে গেল।

বুলা আর একবার চেষ্টা করলে। ঘুমন্ত অধ্যাপকটির দিকে ইঙ্গিত করে তার সাকরেদকে বলল, 'ওর পশ্চাদ্দেশে আঙুল দে। ব্যাটা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে।'

কিন্তু বুলা সাড়া না দিয়ে তার চিনুমামা কাহিনী ব্যাগে তুলে রাখে।

কড়া ঠাণ্ডা। বোধহয় শীতের দাপটেই বুলা, বাবু, নীহারের ডানামেলা যৌবন তাদের ডানা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে।

নীহার বললে, 'তাহলে ঘুমনোই যাক। কী বল। এদেশের কিছু হবে বল? একবারই ফুর্তি করতে চলেছিস। বাড়িতে থাকলেই পারতিস। হাজারিবাগে না গিয়ে টুকুকে ঘরে বসে হিড়িক দিলেই পারতিস।'

সন্দীপন চুপ করে থাকে। সে টের পায় সমস্ত আবেগ উচ্ছমের মতো কেওড়ামিরও জোয়ারভাঁটা আছে। কখনও তা ঝিমনো কখনো বা উত্তাল। বুলা ইতিমধ্যেই মুড়ি দিতে আরম্ভ করেছে। বাবুও তার জুতো মোজা খুলছে। তারা দুজনে দ্বিতীয় তৃতীয় টায়ার নামায়। এ অবস্থায় নীহারের কথায় আপত্তি করলেই আবার কেওড়ামি উত্তাল হয়ে উঠবে। তাছাড়া সে তো নিজেই ইচ্ছে করে এসেছে তাদের সঙ্গে। কোথায় বা আর যাবে? তার এক খুড়তুতো ভাই লাইনের ছেলে আর এক বন্ধু সেও লাইন নিয়ে নিয়েছে। এইসব লাইনের ছেলেদের ভালো লাগে না সন্দীপনের। এমন মেপে-মেপে চলে, মেপে-মেপে কথা বলে, এমন কি বোধহয় মেপে-মেপেও হাসে কিংবা অন্যের দিকে তাকায়। অথচ স্বার্থের দায়ে অনেক সময় তারা আসে। যেমন গতবার টেস্ট ক্রিকেটের টিকিটের জন্যে দু-তিন দিন পর পর ধাওয়া করেছিল তার খুড়তুতো ভাই। তার দিন সাতেক পরে সন্ধের পর তাদের বাড়িতে গেলে কাকীমা কী রকম-ভাবে তার দিকে তাকালে। কাকীমা যেন সব সময় ওৎ পেতে আছে, পাছে তার ছেলেকে কেউ বিরক্ত করে, পাছে তার ছেলের সময় সামান্য নষ্ট হয়। 'আজকাল যেরকম স্টিফ কম্পিটিশান। তাছাড়া ও তো আবার কারুর সঙ্গে মেশে না। কতবার বলি টিচারদের সঙ্গে একটু আদান-প্রদান রাখতে।' খড়্গপুর আই-আই-টির ভাবী ইঞ্জিনিয়ার তার ভাইটি মাকে বলে, 'তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ মা। পার্সোনাল ফ্যাকটার আমাদের ওখানে কাউন্ট করে না।' তার সঙ্গে সন্দীপনের সামান্য আলাপ হতে না হতেই বেতের চেয়ারে শরীরের সামান্য অংশ সংলগ্ন রেখে কাকীমা বলে, 'আচ্ছা সন্দীপন, তোমরা সব ভালো আছো তো, বেশ।' সন্দীপন চট করে উঠে পড়ে। ফিরে যায়—'মাইরি শালা, অমিতাভ বচ্চন যা দিয়েছে' কিংবা 'রেখার ঐরকম লুক, ঐরকম বুকবাজানো লুক—বাংলা ছবিতে কোথায় পাবি রে।' অথবা হিন্দি ফিল্মের আততায়ীয়

ডায়লগে। মাঝামাঝি কোনো রাস্তা নেই যেখানে তার খুড়তুতো ভাইয়ের ম্যাড়মেড়ে নিরক্ত যৌবন অথবা বুলা, বাবুর প্রকাণ্ড ছ্যাবলামি থেকে অন্য আর একটা কিছু আছে। একুশ বছরে এসে সন্দীপন সেইরকম একটা জায়গা খোঁজে।

মাঝে-মাঝে অবশ্য অসহ্য লাগে, তখন মনে হয় বিনোদ চ্যাটার্জি লেনের রকের ভ্রাতৃত্ব এই মুহূর্তেই অবসান ঘটায়। টুকু, যার ভালো নাম সীমা, তাকে নিয়ে মন্তব্যগুলো এত বাজে লাগে সন্দীপনের যে মনে হয় অন্য কামরায় পালিয়ে যায়। অথচ এও জানে সে যদি সামান্য অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে তাহলেই কেওড়ামির উষ্ণ প্রস্রবণ বয়ে যাবে। আসলে বিনোদ চ্যাটার্জি লেনের শেষ বাড়িতে ক্লাস ইলেভেনের ফ্রকপরা টুকুর বোধহয় তাকে দেখতে ভালো লাগে, সে রকে এলে কয়েকবার জানলাতে টুকু এসে দাঁড়ায়। রাস্তায় একবার আলাপও করেছে সন্দীপন। কিন্তু এই তিলকে এমন তাল করা হচ্ছে কেন ভেবে পায় না।

ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে, রাত বোধহয় দুটো। কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করার পর চাপা উত্তেজনা নেমে যায়। শীতের আরামে কম্বল মুড়ি দিয়ে আর সকলের মতো সন্দীপনও ঘুমিয়ে পড়ে। আর ঘুমিয়ে পড়ার আগে সে মনে-মনে স্থির করে, চটবে না কোনো কথায়, এমনকি টুকুর কথাতেও।

ট্রেন লেট প্রায় চার ঘণ্টার ওপর। জীপে তারা কয়েকজন যখন তিলাইয়া ড্যামের ওপর ওঠে তখন তারা সবাই চিত্রার্পিত। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে বললে, এক ভদ্রলোক কলকাতা থেকে সোজা তার আমেরিকান গাড়ি ড্রাইভ করে ওপরের রেলিং ভেঙে বিরাট ড্যামের ঢাল দিয়ে নীচে বিস্তীর্ণ জলরাশিতে তলিয়ে গেছে।

'ব্যাটা নিশ্চয় মাল খেয়েছিল', বুলা বললে।

ড্রাইভার বললে, 'সেই রকম সন্দেহ হয়েছিল। তবে বেশ কয়েকদিন পর জল থেকে গাড়ি তোলা হল। তখন আর কি!'

সন্দীপন সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'কোথায় লাগে কাশ্মীর!'

'তুই কাশ্মীর দেখেছিস?'

'কী দরকার। এর থেকে নিশ্চয় ভালো নয়।'

বাস্তবিকই এই শীতের রোদ্দুরে তিলাইয়া ড্যামে এসে একটা বড় জিনিসের সামনে হঠাৎ দাঁড়াল তারা। বড় জিনিস তাদের জীবন থেকে

সরে গিয়েছে, বড় চিন্তা-ভাবনার কোনো অবকাশ নেই।

বুলাও বললে, 'গ্র্যাণ্ড না রে!'

'অতো কাব্য করিস নে, ওঠ' বাবু বললে।

'এইখান থেকে একটা ফিল্মের শট—ভিলেন চলেছে বেন্‌জ চেপে। পেছনে পুলিশ। ভিলেন রেলিং ভেঙে গাড়ি শুদ্ধ গড়িয়ে গেল।'

'তারপর অ্যামফিরিয়াস, জলের ওপর দিয়ে ভট-ভট করতে করতে...'

'দূরে কাপড় কাচছে হেমা মালিনী'

'তুই একটা পাঁটা! ড্যামে কাপড় কাচতে দেয়?'

সন্দীপন সিগারেট টানতে টানতে ভীপে ওঠে। একবার পেছনে তাকিয়ে এই জল-স্থল-আকাশ পরিব্যাপ্ত বিশালতার খানিকটা যেন ছেঁকে নিতে চায় তার চোখ দিয়ে।

বাবু বললে, 'এইখানে তুই হানিমুন করতে আসিস সন্দীপন।'

'তোর কিস্‌সু ভাবনা নেই। টুকুর বাবা রইস পার্টি। শ্বশুরমশাই সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

সন্দীপন হাসে। হাসি ছাড়া কিই বা করার আছে। তাছাড়া চটামটি করে ফয়দা নেই, তার মানে তার কৈশোর আর প্রথম যৌবনের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত আর এক কক্ষপথে যাওয়া। কিন্তু আর এক কক্ষপথ মানে তার আই-আই-টি ভাই, তার ওঁত পেতে বসে থাকা কাকীমা, আরও ইস্কুলের দু-তিন জন বন্ধুবান্ধব আছে তাদের সঙ্গে নতুন করে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা —তা প্রায় অসম্ভব। ভালো ইস্কুল মানে ইংরেজি মিডিয়াম ইস্কুল কিংবা ভালো কলেজ বা ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিক্যাল, কেউ-কেউ কস্ট একাউন্টেন্সি আবার কেউ-কেউ মরিয়া হয়ে জার্নালিজম ক্লাসে ঢুকে পড়ছে—কিন্তু এই সমস্তের বাইরে বেলাইনের লক্ষ-লক্ষ যে তরুণ, তাদের জীবনযাত্রা বলে কি কিছু থাকবে না? তার খুড়তুতো ভাইয়ের চেয়ে অন্তত বুলা-বাবু-নীহার তার বেশি আত্মীয়, সে যদি অসুখে পড়ে তার ভাইয়ের টিকি দেখা যাবে না। কিন্তু বুলা-বাবু-নীহার ঠিক আসবে।

হাজারিবাগে পৌঁছে প্রথম দুদিন মহানন্দে কাটে সকলের। আস্তানাটা জবর। ছোট্ট একখানা বাড়ির নীচতলা হোটেল, ওপরে মালিক আর তার নতুন বিবাহিত বউ। শীতের সাঁওতাল পরগনার এক বিশেষ মেজাজ আছে। প্রচুর খাওয়া আবার খাওয়ার পরই খিদে, প্রবল নিশ্চিদ্র ঘুম আর কনকনে শীতের হাওয়া তাদের মুখচোখ দুদিনেই তাজা করে তোলে। তারা

সন্ধেবেলা ঘুড়ি ওড়াবার রেস দেয়। বুলা-বাবু দুজনেই বাইশখানা, সন্দীপন নীহারও কাছাকাছি।

'হোটেল ফেল পড়ে যাবে রে।'

হোটেল বয় হেসে বলে, 'খান খান, খেতেই তো আসে লোকে।'

সেদিন সন্ধেবেলা নীহার সন্দীপন বাজার থেকে ফিরছিল চা আর প্রচুর মিষ্টি নোনতা সাঁটিয়ে। হোটেলের সামনে বাগানে ডালিয়ার বেডে নিওন আলো পড়েছে। কালচে-লাল-গোলাপী-হলুদ ফুলের ছোট ছোট থালা নিওন আলোয় অন্যরকম লাগে, যেন কাগজের বা কার্পেটের ফুল।

হঠাৎ বিকট আওয়াজে থমকে দাঁড়ায় তারা। টেপে একেবারে অচেনা লাগে বুলা আর বাবুর গলা। আজ সন্ধ্যায় একটা রাম পার্টির কথা ছিল। বোধহয় ঠিক তারপরই টেপ করা হয়েছে। বিষয়বস্তু সন্দীপন-সীমা সংবাদ। অনেকটা চিনুমামার কাহিনীর ছাঁদে ফেলা হয়েছে। সম্পূর্ণ আদি রসাত্মক, মাঝে-মাঝে বাবুর উল্লুকের আওয়াজ! যতখানি উঁচু পর্দায় চালানো সম্ভব ততখানি উঁচুতে টেপ চালানো হচ্ছে।

'নীহার, এটা কী?' রাগে সন্দীপনের গলার শির ফোলে।

'মাইরি, বিশ্বেস কর, কালীর দিব্যি! আমি এর মধ্যে নেই!'

'ঐ ক্যাসেট আমি এখনই ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

পেছন থেকে জাপটে ধরে তাকে নীহার।

'তুই যাস নে। তুই কিছু করলেই বুলা তোকে ঝাড়বে।'

বুলা বক্সার। বুলার সঙ্গে সে পারবে না। কিন্তু নীহারের গায়ের জোর বেশি, পেঙা কিন্তু ও বুলার থেকে অনেক বেশি মারকুটে।

'তুই আমার সঙ্গে থাকবি।'

'তারপর? তারপর তো আবার গিয়ে বুলাদের রকে বসতে হবে। তুই ছেড়ে দে। মাথা ঠাণ্ডা কর। চল বিয়ার খেয়ে আসি।'

সন্দীপন থমকে দাঁড়ায়।

নীহার বললে, 'ওসব ঝামেলা পাকিয়ে লাভ কী? আর তো কয়েকটা দিন।'

'ঠিক আছে, চল।'

আবার দুদিন কেওড়ামিতে দ পড়ে। বুলা বাবুর হাবভাব ভয়ানক বন্ধুত্বপূর্ণ। টুকু প্রসঙ্গ একদম ওঠে না। তারপর জঙ্গলে যাবার প্ল্যান করতে স্থানীয় অফিসে খোঁজখবর নিতে সময় কাটে।

বুলাই প্রকারান্তরে মিটিয়ে নিতে চায়। বলে, 'ছাখ, বন্ধু ইজ বন্ধু। বন্ধুকে কি সমীহ করতে হবে? তাহলে বাপ-দাদা আছে কেন বল।'

বিকেল পাঁচটায় তারা বেরোয় শ্যামবাবুর সঙ্গে। শ্যামবাবু এখানকার বহু পরিচিত গাইড, জঙ্গল তাঁর নখের ডগায়, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেও তাঁর ইলেকট্রনিক চোখ জানোয়ার ঠিক বেঁধে, তাঁকে সঙ্গে নিলে জানোয়ার দর্শন অবধারিত।

কাচ দিয়ে ঢাকা স্টেশন ওয়াগন, প্রায় বারো-চোদ্দজন যাত্রী, বেশির ভাগই বঙ্গসন্তান। তার মধ্যে দুটি সুন্দরী তরুণী, বোধহয় বোন, দুজন কাশ্মিরী শালে কান ঢাকা প্রৌঢ়া মহিলা আর বাকি পুরুষ, তারা সবাই বয়স্ক।

প্রথমে থামচা-খামচা বন। সবাই উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে কখন চিতা লাফিয়ে পড়বে সামনে। ধীর গতিতে গাড়ি ঘুরে-ঘুরে এগোয়, কখনো ওপরে ওঠে, কখনো নীচে নামে। জঙ্গলের মাঝে-মাঝে ছেদ, সেখানে কোথাও এক চিলতে জল সাঁকো পাথর। তখনও রোদ আছে আর সেই রোদে সন্দীপন দেখছিল জলে রোদে পোড়খাওয়া কাঠের বাহার আর পাতার রঙ। গাড়ি ঘুরতেই শুকনো পাতার ওপর নেমে এসেছে ঝুলন্ত কাঠের বাদামী ময়াল। কখনো রাস্তার পাশে অতিকায় গিরগিটি, আবার ঝরণার ধারে একেবারে কেশরশুদ্ধ সিংহের মুখ। আর সবুজ বললে কোনো মানে হয় না, তার অসংখ্য হেরফের—কখনো গাঢ় কখনো হালকা, কখনো বা উজ্জ্বল হলুদের ওপর সবুজের ছিটে, থাক্ থাক্ সিঁদুরে পাতার মাঝখানে সবুজ।

হঠাৎ প্রবল বাতকম্মের আওয়াজ আসে ঠিক সন্দীপন-নীহারের পেছনের সীট থেকে, আর সঙ্গে-সঙ্গে হাসির কলরোল। এইসময় আলো পড়ে এসেছে, শ্যামবাবু মাঙ্কিক্যাপে মাথা ঢেকে ঘণায়মান অন্ধকারে সার্চলাইট ঘুরাচ্ছেন গাড়ির ছাতের ফোকরে মুখ বের করে। তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আস্তে-আস্তে'। কিন্তু ইতিমধ্যে শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে এবং মাঝে-মাঝে হাসি আর উল্লু করব।

'আপনারা একটু থামবেন? এত শব্দে তো জানোয়ার পালাবে', শ্যামবাবু ফোকর থেকে মুখ নামিয়ে বললেন। কিন্তু হল্লা আরও বাড়ে। যাত্রীরা আড়ষ্ট ভাবে বসে থাকে।

'ওঃ!' হঠাৎ বুলা চেঁচিয়ে ওঠে, দীর্ঘশ্বাসী গলায়, 'একুশ বছর হল,

একটা মেয়ের স্বাদ পেলাম না!

'একটা মেয়েরও গন্ধ।' বাবু দোয়ার কি দেয়।

এবার গাড়ির হেডলাইটের ঠিক সামনে বাদামি থপ থপে একটা খরগোস পড়ে। উদভ্রান্তভাবে গাড়ির সামনের রাস্তা বরাবর অনেকক্ষণ সে দৌড়য়।

গাড়ি কোঁ-কোঁ শব্দে ওপরে উঠতে থাকে।

'এবারে আমরা ডেনসে ঢুকব', শ্যামবাবু বললেন।

জঙ্গল ক্রমশ গভীর। একবার অনেকটা ওপরে উঠে আবার নামে, আবার চড়াই। এবার দুপাশের জঙ্গল হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। গাছের ডাল ঠেকে গাড়ির কাচে। জঙ্গলের একটা অদৃশ্য টান বোধ করে যাত্রীরা, সবাই উদগ্রীব, এমন কি বুলা বাবুরাও। জঙ্গল যেমন বাড়ে তেমনি ঠাণ্ডাও বাড়ে। গভীর জঙ্গলের মাঝখানে ফরেস্ট লজের সামনে এসে গাড়ি থামে।

ঠাণ্ডায় দাঁড়ানো যায় না। সবাই রোস্তারার গরম ধোঁয়া-ওঠা চায়ে চুমুক দিতে থাকে।

'একটা বোতল আনতে পারলি না? তোরা জানোয়ারেরও অধম!' বুলা মন্তব্য করলে।

'মাইরি ভুল হয়ে গেছে', বাবু বললে।

রাত আটটা সাড়ে আটটায় গভীর জঙ্গলে গাড়ি ঢোকে। প্রবল ঠাণ্ডায় নাক দিয়ে জল পড়ে শ্যামবাবুর। কোঁত কোঁত করে আওয়াজ করেন আর সার্চ লাইট ঘোরান।

'লেপার্ড লেপার্ড।'

অনেকদূরে অস্পষ্ট চলমান জন্তুটি শুকনো পাতার ওপর দিয়ে আওয়াজ তুলে নেমে যায়। ঠিক বোঝা যায় না।

এবার একটু এগোতেই একপাল চিতল! আলোয় স্থির ছবি। সার্চ লাইট নাড়াতেই তারা ধনুকের মতো শূন্যে বাঁক খেয়ে বেরিয়ে যায়।

সবাই নিস্পন্দ। সন্দীপন ভেবেছিল বাবু বুলার শব্দ বিস্ফোরণে নৈশব্দ্য এখনই বুঝি খান খান হবে। কিন্তু তারাও আর সকলের মতো নিস্পন্দ উদগ্রীব। এবার গাড়ি মোড় ফিরতেই রাস্তার পাশেই সামান্য ফাঁকায় একজোড়া বিশাল সম্বর। চিড়িয়াখানা থেকে একেবারে আলাদা চেহারা। সারা গা যেন গলা চকোলেট। আয়তনে বিরাট। স্থির দৃষ্টিতে তাঁরা তাকিয়ে থাকে গাড়ির দিকে। শ্যামবাবু আলো নাড়েন অনেকক্ষণ ধরে, তারা নড়ে না।

'ক্যামেরা নেই ?' শ্যামবাবু ফোকর থেকে বলেন।

'তোরা একটা মাকড়া! সব আমাকে বলে দিতে হবে,' বুলা আক্ষেপ করে।

কিন্তু সন্দীপন ভাবে ক্যামেরার অজস্র শক্তিমান লেন্সেও কি এই গভীর অরণ্যের নিস্তব্ধতার আবহ ধরা পড়ে? আর ধরা পড়লেও তা বড় জোর দেয়ালে ক্যালেণ্ডার কিংবা আপেলের ঠোঙা। এই স্থির দৃষ্টি কানা খোড়া দর্শক সেখানে কোথায়?

আরও আধঘণ্টা পর শ্যামবাবুর আওয়াজ। 'ভালো করে দেখুন। বাইসন! বাইসন!'

তারা প্রথমে বুঝতে পারে না! নিশ্চিদ্র অন্ধকারে আলোর বৃত্তে চোখ ধাঁধায়। তারপর চোখ সয়ে গেলে ধীরে-ধীরে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক বিশাল বাইসন আধখানা শরীর পাহাড়ী ঝোরার জলে ডুবিয়ে বসে আছে। তার শিঙে কী ঝুলছে প্রথমে ঠাওর হয় না। ক্রমাগত আলো নড়তে থাকে সেই ধূসর অতিকায় কাঁধের উপর। তারপর সকলের গা শির শির করে ওঠে। এবার সেই স্তম্ভিত শক্তির রূপ উঠে দাঁড়ায়। কোথা থেকে জোগাড় করেছে কুঁড়িভর্তি পলাশের ডাল, শিঙে ঝুলেছে লতাগুল্মের ঝাড়। সহসা যেন তারা ভয়ঙ্কর এক সৌন্দর্যের সামনে এসে পড়ে, যখন বাইসনটি মুখ তুলে তাদের দিকে তাকায়। আর তার শিঙ ভর্তি ঝুলন্ত কুঁড়ি লতাগুল্মে সে তখন অপরূপ! শ্যামবাবুও চিত্রার্পিত। সার্চলাইট নড়াতে ভুলে গেছেন। হঠাৎ বলে ফেলেন। 'চার্জ করবে নাকি? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামনের রাস্তা ধরে দৌড়তে সুরু করে বাইসন। রীতিমতো মাটি কাঁপে তার পায়ের দাপে। জঙ্গলে মিলিয়ে যাবার আগে সে এক মুহূর্ত ফিরে তাকায়।

'গ্র্যাণ্ড!' কমবয়সী মেয়েটি বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে বাবু তার উল্লু করব তোলে।

সন্দীপন স্থির করলে, কলকাতায় ফিরে বিনোদ চ্যাটার্জি লেনের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবে না।

কলকাতায় ফিরে বেশ কয়েকদিন কেটেও যায়। সন্দীপন আর ও-মুখো হয় না। রোজ সন্ধেবেলা একলা একলা রাস্তায় ঘোরে, চাকরির জন্যে পরীক্ষা দেবে কিনা ভাবে, চাকরি সংক্রান্ত ম্যাগাজিন উল্টায়, কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে। খুড় কাকীমা এসেছিলেন—তাঁরা সপরিবারে

দিল্লী যাবেন, রেলের বার্থ রিজার্ভেশানের জন্যে যদি ভোর বেলায় সন্দীপন লাইনে দাঁড়ায়। সন্দীপন দাঁড়াল। টিকিট কিনে দেবার পর আবার সব চুপচাপ। কাকীমা আর তার ভাইয়ের যেন এটা পাওনা, সে এমন কিছু করে নি, যার জন্যে তাদের বাড়িতে ফের আসতে হবে। ইস্কুলের দু-তিনটে লাইনের ছেলের সঙ্গেও ভিড়বার চেষ্টা করে সন্দীপন। তাদের মুখে চোখে চাপা বিস্ময়। কী মনে করে অ্যাদ্দিন পর? এই রকম ভাব দেখায় তারা সন্দীপন পালিয়ে আসে। এক অনিবর্তনীয় ভবিতব্যের মতো বিনোদ চ্যাটার্জি লেন তাকে হাত ছানি দেয়।

বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে বুলাদের সরু গলিতে। রঙ জ্বলা বাড়ি, রেশনের দোকানের সাইনবোর্ডে বিকেলের আলো। কোকিল না, কাক ডাকে।

এমন সময় বাবু চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে সন্দীপন।' বুলা বললে, 'বোসে রাজা বোসো।'

দুমাস দূরে থেকে সন্দীপন আবার কেওড়া পাটিতে ফিরে আসে।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ শোকসংবাদ

একটা হট্টগোল ওঠে—গেল, গেল, গেল। বাইশ-চব্বিশ বছরের ছেলের দলটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্যারডির সুরে হৈ হৈ করে ওঠে—কী গেল, কী গেল, কী গেল।

এর মধ্যে ট্রেনের লাগাম টানা হয়েছে জোরে। একগুঁয়ে জন্তুটা গোঁ ধরে তাও খানিকটা এগিয়ে যায়। তারপরে একান্ত অনিচ্ছায় দাঁড়ায় এবং ফুঁসতে থাকে।

কোণে দুই বেঞ্চির মধ্যে কাপড় পেতে তাস খেলছিল মাঝবয়সীরা—গাড়ির উপছে-পড়া ভিড়কে অস্বীকার করে। তাদের ব্যাজার মুখে জিজ্ঞাসা—কী হোলো? এমন বেজায়গায় গাড়িটা দাঁড়ালো কেন? ধুর শালা, আজকাল আর জায়গা-বেজায়গা নেই।

দরজার কাছে বাইশ-চব্বিশের দল হল্লা করছিল, হিন্দী সিনেমার সংলাপ ও গান কপচাচ্ছিল, অশ্লীল রসিকতা করছিল। তারা হুড়মুড় করে ছোটে দেখতে—কী হোলো!

জনদুই লোক ট্রেন থেকে নেমে খোলা হাওয়ায় প্রস্রাব করতে বসে। তাদের লক্ষ্য করে দুটো ছোঁড়া ফুট কাটেঃ 'দাদা, এক্ষুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে। মাঝ পথে তখন হিসি চেপে হি-হি-হি—'

অ্যাকসিডেন্ট! অ্যাকসিডেন্ট! হাওয়ায় হাওয়ায় কথাটা ছুটে আসে। কী হয়েছে! কার অ্যাকসিডেন্ট! বেঁচে আছে!

একজন প্রৌঢ় ডিবে থেকে একটা পান আর একটু জর্দা মুখে ফেলে দিয়ে বলেন, 'আজকাল হোলো গিয়ে—বু'লেন—রোজই ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট। কাগজ খুললেই দেখতে পাবেন। কিন্তু সেই গিয়ে ব্রিটিশ আমলে—বু'লেন কিনা—'

'দাদা, এই গরমে বসে বসে ঘামছেন, আর বিরক্ত হচ্ছেন। এই সময় একটা আমলকী লজেন্স্ মুখে ফেলে দিন, তেষ্টা মিটবে, বিরক্তি চলে যাবে,

আরাম পাবেন। আমলকি লজেন্‌স্‌। দশ পয়সায় একটি। তিনটি নিলে চার আনা।'—হকার ভীড় কেটে কেটে চলাফেরা করছে।

সাদা-দাড়ি এক বুড়ো লজেন্‌স্‌ওয়ালাকেই শুধোয়: 'হ্যাঁ, বাবা, গাড়ি কখন চলবে?'

'পুলিশ আসুক। তবে তো।'

'পুলিশ কেন?'

'লাশ সরাতে হবে না?'

'লাশ! কে কাটা পড়েছে! হ্যাঁ বাবা, কে কাটা পড়েছে?'

'একটা ছেলে।'

অনেকে এতক্ষণে গপ্পের গন্ধে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে: 'কার ছেলে? কেমন ছেলে? কত বয়স? ফেরিওয়ালা? চালওয়ালা? কেমন করে মরল? ভিড়ের চোটে দরজা দিয়ে পড়ে গিয়েছিল? নাকি সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল?'

'অত শত জানি না মশাই। যান না, দেখে আসুন না।'

'না, তুমি তো—'

'আমার অত টাইম নেই। আমলকী লজেন্‌স্‌, তেষ্টা মিটবে। বিরক্তি চলে যাবে—'

'হ্যাঁ, দেখতে যাই, আর বসার জায়গাটা চলে যাক।'

তাসের দলের মুখে বিরক্তি ও ঘাম জমছে: 'নাঃ শালা, একটু তাস খেলবো তারও উপায় নেই! কাহাতক বসে বসে ঘামবো! আজ নির্ঘাত লেট্‌।'

'আর কখানা গাড়ি বাড়াতে পারে না।' বলে টেকো লোকটা।

একটি ছোকরা টিপ্পনি কাটে: 'গাড়ি বাড়লে অ্যাকসিডেন্ট বাড়বে।'

পান-রসিক ঠোঁট-লাল বাবু বলেন, 'চলুন, গার্ডকে গিয়ে বলি, তাড়াতাড়ি গাড়ি ছাড়ুক। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই।'

'আমি শালা এখানে বসে সত্যাগ্রহ করব।'

'ঠেস দিয়ে বসিস। তাহলে একটু নিদ্রাগ্রহও হয়ে যাবে।'

'না, না, ইয়ার্কি নয়। রোজ এই সব ভালো লাগে!'

'আচ্ছা, একটা ছেলে মারা গেল—'

'গেল তো গেল। আমরা কী করব?'

'চল্‌ মাইরি, আমরাও মারা যাই।'

'ইচ্ছে হয় তুই যা। আমি ওর মধ্যে নেই। আমি বড় জোর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে একটা শোকসভা করতে পারি।'

'লাশ সরানো হোলো না, এখনই শোকসভা ?'

'লাশের প্রস্থান না ঘটলে শোকসভার প্রবেশ নিষেধ—এমন আইন কোন্ কেতাবে লেখা আছে ?'

'না আইন অবিশ্যি নেই। ঠিক আছে, কর শোকসভা।'

'ছেলেটার তো নামও জানিস না। কী বলে শোক করবি ?'

'সব শোকসভাই তো এক। সব মরা লোকেরই একটা নাম – মহাপুরুষ। হে মহাপুরুষ, তুমি হ্যানা ছিলে, তুমি ত্যানা ছিলে।'

নামাবলী-জড়ানো এক পুরুত দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে, 'গাড়িটা যে কখন ছাড়বে ! আমি গেলে তবে বিয়ে হবে।'

'হো, হো, বিয়ে ! সে তো রাতে।'

'আগেও অনেক কাজ থাকে। বৃদ্ধি বোঝো ? বৃদ্ধি ?'

'না। বিয়ে তো হয়নি। কী করে জানবো বলুন।'

'বৃদ্ধি মানে পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ।'

'ও তাই বলুন। আমরা আমাদের নিজেদের ছেরাদ্দ করতেই বড্ডো ব্যস্ত থাকি। মাঝে মধ্যে আমাদের বাপ-পিতেমর ছেরাদ্দ করি। সে একেবারে চোস্ত ভাষায়—আপনার মন্তর তার কাছে একদম জোলো।'

'বিয়েটা না আটকে যায়।' পুরুতের উৎকণ্ঠা।

'আটকালে সরকারের ফ্যামিলি প্ল্যানিং সাকসেসফুল হবে।'

তাসের দলের মুখে চটচটে ঘাম। সিগারেটের ধোঁয়া সাপের মতো উঠছে। সিগারেট দাঁতে চেপে টেকো লোকটা বলে, 'শালা কত দেরী আর করবে। মরেছে তো একটা ছেলে। দিনে অমন কত শত মরে।'

'আচ্ছা দাদা, বাস্ রুট এখান থেকে কতদূর ?'

'অনেক দূর। নইলে আর এখানে বসে বসে গরমে সেদ্ধ হই ?'

অনেকে সেদ্ধ না হওয়ার চেষ্টায় ট্রেন থেকে নামে। অত লোককে নামতে দেখে ট্রেনের হকাররাও নেমে আসে। তারপর জোর বিকিকিনি। চা গরম, ধূপকাঠি, হজমীগুলি, মাথার তেল, দাঁতের মাজন, পত্র-পত্রিকা। দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে সবারই তাড়া, সবাই বিরক্ত, আবার দেখতে দেখতে একটা মেলাও বসে যায় যেন।

'ছেলেটাকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত।'

'কেটে দু টুকরো। ওকে জোড়া দিতে বাবা মোস্তাফার দরকার।'

'আহা ছেলেটার মুখে যন্ত্রনার ছাপ।'

'আমাদের মুখেও তাই।'

'দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা?'

তা কেউ বলতে পারে না। তবে শোনা গেল, কে একজন ওকে চেনে, সে গেছে ছেলেটার বাড়িতে খবর দিতে। বাড়ি নাকি বেশি দূরে নয়।

'কিন্তু গাড়ি কখন ছাডবে?'

'পুলিশ এলে—'

'তা বাছাধনেরা কোথায়! ঘুমোচ্ছেন।'

'বোধহয়। আপনিও একটু ঘুমিয়ে নিন দাদু।'

ক্যানভাসারের একটা কণ্ঠ হঠাৎ চাগিয়ে ওঠে: 'একটি ছেলে মারা গেছে। তাই আমরা আটকে পড়েছি। এই আটকে-পড়া সময়টাকে সুগন্ধে ভরিয়ে তুলুন। গোলাপী ধূপকাঠি কিনুন। এক বাক্সে পঁচিশটি কাঠি।'

'ওরে, আমাদের কাঠি দিতে এসেছে।'

'চুপচাপ বসে থাকবেন কেন। চিত্রবার্তা পড়ুন। পাঁচ টাকার বই দু টাকায়।'—পত্রিকা বিক্রেতা।

'কী বললেন? দু টাকার বই পাঁচ টাকায়?'

'ওঃ কী গরম।'

'পুলিশ শালারা যে কখন আসবে।'

ছোকরার দল মৃতদেহের কাছে এক চক্কর ঘুরে আসে। নীল জামা পরা ছেলেটি বলে, 'দেখলে সত্যি খারাপ লাগে। 'থেঁতলে—'

'কতটা খারাপ? কান্না পায়?'

'না, তা নয়। কিন্তু বিশ্রী—'

'তাহলে এসো আমরা একটা শোকসভা করি।'

'সত্যেন, তোর ধুতিপাঞ্জাবী পরা আছে তোকে সভাপতি মানাবে। এইবার সভাপতি ভাষণ। সত্যেন বল্—'

সত্যেন সুরু করে, 'বলব? বলছিস তোরা? আচ্ছা বলি। এই যে ছেলেটি মারা গেল। এ আমার খুব চেনা—ছেলেবেলা থেকে চেনা—এর নাম—এর নাম কী রে?'

'তোর ছেলেবেলার চেনা—আর নাম বলব আমি? নাম ধর বঙ্গবন্ধু—'

'দূর! ও তো সেখ মুজিবের নাম।'

'নামে কী আসে যায়। গোলাপ সর্বদাই গোলাপ। ধরা যাক তরুণকুমার—বেশ সিনেমা সিনেমা—'

সত্যেনের পছন্দ হয় নামটা ঃ 'হ্যাঁ, তরুণকুমার। এই তরুণকুমার ছিল বেকার। সে দরজায় দরজায় ঘুরেছে—এই আমাদের মতো। কোথাও কিছু জোটে নি। দিনের পর দিন তার হতাশা বেড়েছে। আজ সেই হতাশা তাকে ট্রেনের নীচে নিয়ে এসে দু টুকরো করে দিল। এরা আমাদের দেশের—জাতির—ভবিষ্যৎ। একটি ভবিষ্যৎ—

'ফরসা হয়ে গেল।'

'আজ এই মৃত্যুতে—'

'তিরোধানে—'

'ইয়ে—হ্যাঁ—আমার কোনো ভাষা নেই।'

নীল জামা বলে, 'দূর! এ একটা শোকসভা হোলো! শোন আমি বলি। বাংলার আকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। কে তাকে আশা দেবে, কে জোগাবে ভরসা? কেউ নেই। এই তরুণকুমার ছিল বাংলার ভরসা, বাংলার ভবিষ্যৎ। সে ছিল মহৎপ্রাণ। চোরা কারবার ও মাস্তানি নামক দুই মহৎ কর্মে সে নিযুক্ত ছিল। ভীড়ের ধাক্কায় আজ তিনি আউট—চিরতরে আউট। তার শূন্য স্থান পূরণ করবে কে?'

'আর একজন মাস্তান।'

ঝাঁকড়া-চুল চেঁচিয়ে বলে, 'দূর দূর! সামনে মড়া নিয়ে ঐ রকম মড়ার মতো শোকসভা চলে! মনে হচ্ছে তোরাই সরে গেছিস। এই টাইমে শোকসভা হবে এই রকম। ওরে আমার তরুণ রে! তুই আমায় ছেড়ে কোথায় গেলি রে। ওরে খোকা, তুই যে আমার কাছে পুঁই চচ্চড়ি খেতে চেয়েছিলি রে! তুই না থাকলে আমার কী হবে রে! মুখপোড়া যম আমায় দেখতে পেলে না রে, আগে তোকে নিলে রে! আমায় দেখতে পেলিনি রে, ওরে মুখপোড়া যম! ওরে খোকা তুই ফিরে আয় রে। আমি চলে যাই রে! তুই ট্রেনে চড়ে যদি গেলি, রিটার্ন টিকিট কেটে কেন গেলি না রে, ওরে খোকা রে—'

সত্যি যখন এই শোকসভা দারুণ জমে উঠেছে, তখন একটু দূরেই, যেখানে লাশ পড়ে রয়েছে এবং লাশকে ঘিরে একটি জন-বৃত্ত, সেখান থেকে যেন প্রতিধ্বনির মতো একটা মড়াকান্না তীব্রকণ্ঠে আছড়ে পড়ে এই নকল মড়াকান্নার গলা টিপে ধরে : 'ওরে মানিক রে, তুই এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলি রে

বাপ! একটা কথা ক রে বাপ, ও আমার মানিক! ও খোকা রে! একটু সাড়া দে। মা বলে একবার ডাক রে বাপ! আমি একবার তোর মুখে মা ডাক শুনি রে। ওরে মানিক রে—।' মৃত ছেলেটির বুড়ীমা এসেছে।

'এত তাড়াতাড়ি এলো মা-টা!'

'আর পুলিশবাবু এখনও এসে পৌঁছতে পারলেন না।'

'পুলিশ এলে যে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া যায়, আমাদের দুর্ভোগ তাহলে কে ভুগবে।' এক প্রৌঢ় কণ্ঠস্বর।

'ওরে মানিক রে, আমায় একবার ডাক বাবা।'

'পুলিশের দরকার নেই। আমরাই ডেডবড়ি নিয়ে যাবো ঐ শালা পুলিশের কাছে।'

'হঁ্যা, চল, চল। এর প্রতিকার চাই।'

'ওরে মানিক রে!'

'রোজ শালা দুটো-চারটে করে মরছে। আর দুখানা গাড়ি দিতে পারে না।'

'চল, পুলিশের কাছে। রেল পুলিশ যাব। লালবাজার যাব, রাইটার্স বিল্ডিং যাব। শুধু হাতে যাব না আমরা। ডেডবডি তুলে নিয়ে যাবো।'

'রাইটার্সে গিয়ে কি ট্রেন বাড়ানো যাবে?'

'সত্যি। চল রেল-এর কর্মচারীদের ঘেরাও করি।'

'কর্মচারী কেন? ম্যানেজার—'

'ও, কর্মচারী বুঝি আপনার ভাই-বেরাদর। তাই ওদের বাঁচাতে চাইছেন। ম্যানেজার কী করবে? প্রতিটি গাড়ি তো সে চালায় না। চালায় তো ঐ কামচোট্টা কর্মচারীরা। তারা ঠিক মতো কাজ করে না, তাই তো এই সব—'

'দাদার যে ম্যানেজারের ওপর খুব দরদ। এর জন্যে দায়ী কে জানেন। উপরওয়ালারা'

'তাহলে তো রেলমন্ত্রীর কাছে যেতে হয়।'

'আমি তো তাই বলছি। তাই চলুন। বেশি গাড়ি দেওয়ার মালিক তো তারা।'

'রেলমন্ত্রীকে পাবো কোথায়? দিল্লি যাবো।'

'কেন! এখানকার রেল দপ্তর ঘেরাও করুন।'

'একবার মা বলে ডাক মানিক!'

'রেল দপ্তর পরে হবে। এখন পুলিশ, লালবাজার, রাইটার্স চল।'

'রেল পুলিশকে কি রাইটার্স কন্ট্রোল করে?'

'পুলিশ কিছু নয়। গভরমেন্টই তো আসল। গভরমেন্ট যেমন হবে পুলিশও তেমনি হবে।'

'পুলিশ এসে পড়েছে। এসেছে। ঐ তো। ঐ তো।'

'এই যে পুলিশ বাছধন! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? ঘুমুচ্ছিলে না ঘুষ খাচ্ছিলে? এই দুটোই তো কাজ।'

অটল গাম্ভীর্য এবং নিশ্ছিদ্র বধিরতার দুস্তর বর্ম পুলিশের ব্যক্তিত্বকে ঘিরে আছে।

'বাবা মানিক আমার, একবার কথা ক মানিক।'

'রাইটার্সেই যেতে হবে। তারাই তো বেকার করে রেখেছে ছেলেদের। ও খেতে পায় নি, দুর্বল ছিল, তাই ও পড়ে গেছে, বা বেকারির জ্বালায় সুইসাইড্ করেছে।'

'বেকারির জন্যে দায়ী কেন্দ্র। চলুন রেলদপ্তরে।'

'দেখুন বন্ধুগণ, একটি নিরীহ প্রাণের মৃত্যুকে নিয়েও পলিটিক্স্।'

'পলিটিক্স্ তো আপনারা করছেন। যে কোনো ইস্যু থেকে ফয়দা তোলার তাল।'

'কক্ষনো না। আপনারা তো বিনা ইস্যুতেই ফয়দা তুলতে চাইছেন। আমরা অন্যায়ের প্রতিকার চাই।

'অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না।'

পুলিশের দল মহিমান্বিত পদক্ষেপে কাছে আসে। 'এই, কি হচ্ছে? এত গোলমাল কিসের। সর দেখতে দাও।'

'একটা ছেলে মারা গেছে।'

'এটা একটা দুঃখের ঘটনা। আপনারা চেঁচামেচি করছেন কেন? একটু শান্ত হোন।'

'মৃতকে শান্তিতে থাকতে দিন। আসেন!'

'তাড়াতাড়ি ট্রেন ছাড়ুন। আমাদের কি আর কাজ নেই। কতটা টাইম চলে গেলে ভাবুন তো।'

'ছাড়ছি, ছাড়ছি। এত তাড়াতাড়ি হয়? একটা ডেথ্ বলে কথা! এক ডেথ্! বুঝতে পারেন কথাটা। ডেথ্—'

'বুঝেছি। ডেথ্-এর মতো একটা ঘটনা ঘটলো, তাই তো আপনি এক

ঘুম দিয়ে এলেন !'

'কত কাজ আমাদের জানেন ?'

'তা আর জানি না ।'

'মানিক তোর মুখখানা কী হয়ে গেছে রে ! তোর সেই সুন্দর মখখানা এমন কে করলে রে !'

'গাড়ি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন ।'

'আমরা যাচ্ছি রাইটার্সে। চল চল রাইটার্স চল ।'

'আমরা যাব কেন্দ্রীয় সরকারের সব দপ্তরে ।'

'যান না। কে ধরে রেখেছে !

'চল, রাইটার্স। অকর্মণ্য অপদার্থ মিনিস্ট্রিকে গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দেব ।'

'কেন্দ্রের স্বৈরাচারী সরকার নিপাত যাক, নিপাত যাক ।'

'ডেডবডি নিয়ে চল ।'

'কোন্ শালা ডেড বডি নেবে ! এ ডেড বডি আমাদের, এ নিয়ে আমরা মিছিল করব ।'

'এ আমাদের ডেডবডি ।'

'এ আমাদের ডেড বডি ।'

দু দল ক্রুদ্ধ মানুষ দু দল লুব্ধ শকুনের মতো মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃতদেহের মালিকানা নিয়ে চলে কাড়াকাড়ি, কামড়াকামড়ি। কিন্তু বেশিক্ষণ তা করতে হয় না, রেলের চাকা আগেই সুব্যবস্থা করে দিয়েছিল—দুটো টুকরো অনেকখানি হয়েই ছিল, সামান্য টানাটানিতেই— ।

'ওগো বাবুরা, আমার মানিককে নিয়ে তোমরা কী করছ ?'

'অন্যায়ের প্রতিকার করছি ।'

'অন্যায়ের প্রতিকার আমরা করছি, বুড়ী মা। ওরা পলিটিক্স্ করছে ।'

দুটো টুকরো নিয়ে দুটো দল ছুটতে থাকে—যেন কে আগে যেতে পারে তার প্রতিযোগিতা। মুখে তাদের স্লোগানের রণগর্জন।

বুড়ী দমফাটা চিৎকার করে : 'ওরে, আমার মানিককে কোথায় নিয়ে চললি তোরা, ওরে হাড়হাবাতে মিনসেরা। আমার মানিককে ফেরত দে। এ কোন্ ডাকাতদের হাতে পড়লাম রে বাবা ! মানিককে নিয়ে তোরা কী করবি রে ! ও তো মরে গেছে রে। তাও ওকে রেহাই দিবি না ? মড়া ছেলেটা ফেরত দে রে—'

দুর্বল পায়ে, খুঁড়িয়ে, হোঁচট খেয়ে ছুটতে থাকে বুড়ি দু দলের পেছনে। একটু বাদেই দল দুটো ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। বুড়ি তখন মাথা চাপড়ায়, আর কাঁদে: 'আমি কোথায় যাবো রে এখন—'

পুলিশ অফিসার গাম্ভীর্য ভেঙে চেঁচিয়ে ওঠে: 'অ্যায় উল্লুকা মাফিক খাড়ে কিঁউ? পাকড়ো।'

পুলিশের দল একবার এদিক ছোটে, আবার অন্য দিকে ছোটে। ভুঁড়ি নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'কোন্ দলকে পাকড়াবো স্যার?'

অফিসার তোতলা হয়ে বলে, 'তাও বলে দিতে হবে?'

'না স্যার, আপনি বলেছিলেন, গদির দলকে না ধরতে। এবং কোন্‌টা গদির দল? দুটোই তো গদির দল মনে হচ্ছে। কাকে পাকড়াবো?'

'শালা, এত দিন চাকরি করছ, বুদ্ধি খাটিয়ে এইটুকু করতে পারো না?'

'আপনি বলে দিন স্যার কাকে পাকড়াবো।'

'শালা, বাপের অমুক অঙ্গ পাকড়াও গিয়ে। চাকরি করতে এসেছে! মাথায় এইটুকু ঘিলু নেই!'

বাপের অমুক অঙ্গ সেই মুহূর্তে সহজলভ্য না হওয়ায় পুলিশের দল হাতড়ায়, হাত ছোঁড়ে—শূন্যে। আর চেঁচায়: 'পাকড়ো, পাকড়ো।'

বুড়ি পাগলের মতো এদিক-ওদিক করে কাঁদছে: 'ওরে আমি এখন কী করব রে! কোন্ দিকে যাবো রে! ওরে মানিক রে, তোকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে রে শকুনের দল।'

'আরে বুড়ি, তোমার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করব।'

'আমার আর ক্ষতির দরকার নেই।'

'ক্ষতি নয়, পূরণ, পূরণ। ক্ষতিপূরণ।'

'পূরণ চাই না। পরানটারে দ্যাও বাবারা।'

নড়বড়ে দুটো মিছিলকেই পুলিশ ধরে ফেলে। দুটো মিছিলেরই গলায় যত জোর ছিল, পায়ে তত ছিল না।

দুই মিছিলই তম্বি করে, 'আমাদের আটকালেন কেন?'

'এ কি বেওয়ারিশ মাল পেয়েছেন?' বলে পুলিশ অফিসার।

'মুখ সামলে কথা বলবেন। শহিদকে বলছেন আপনি মাল!' দ্বৈতকণ্ঠে বলে দুই মিছিল।

'ঐ হলো। একই হলো। যা দিয়ে মুনাফা তোলা যায়, তাই মাল। তবে এ মাল বেওয়ারিশ নয়। ঐ বুড়ি রয়েছে। আর আমরা তার

জিম্মাদার, রক্ষক।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলে অফিসার: 'তা ছাড়া আধখানা মাল, মানে শহিদ নিয়ে কি মিছিল হয়?'

'ঠিক। ছুটো খণ্ডই আমাদের দিয়ে দিন।'

'আহা! আবদার! দু-টুকরো আমাদের দিন।'

অফিসার: 'আহা ঝগড়া করছেন কেন!'

'আপনি ইচ্ছা করলেই দুটো টুকরো আমাদের দিতে পারেন।'

'আপনার হাতেই সব। গোটা-টা আমাদের দিন।'

অফিসার: 'তা ঠিক। তাহলে আমায় একটু সন্তুষ্ট করে দিন।'

'তার মানে ঘুষ।'

'ছি ছি! কী বলছেন! দেশ থেকে ঘুষ তো উঠে গেছে। ভরতুকি। আমার রোজগার আর খরচের মধ্যে অনেক ফারাক মানে গ্যাপ থেকে যায়। সেখানে ভরতুকি দেবেন—দয়া করে, খুশি হয়ে। বলুন কে কত ভরতুকি দিতে পারেন?'

'শহিদকে আপনি নীলামে তুলতে চান?'

'বলুন। কত টাকা? হাজারের কমে হবে না। ডাকুন।'

'হা-জা-র-!'

'তা আর হবে না! একটা জলজ্যান্ত শহিদ, এবং গোটা। এক হাজার বেশি চেয়েছি? এক জোড়া পাঁঠার দাম কত? এক জোড়া বলদ? আর দেখছেনই তো—মাগ্‌গী গণ্ডার বাজার।'

'হাজার আমরা দিতে পারবো না।'—এক নম্বর দল।

'বেশ, ওঁদের তাহলে হাজারে দিয়ে দিই।'

'হাজার কোথায় পাবো?'—দু নম্বর দল।

'ফাণ্ড ড্রাইভ দিন।'—পুলিশ অফিসার। 'বাক্‌সো ঘোরান।'

'আমরা ও-সব বাক্‌সোবাজির মধ্যে নেই।'—দু নম্বর দল।

এক নম্বর দল বাক্‌সো ঘোরাতে শুরু করতেই জনতার মধ্যে শোনা যায়: পয়সা কোথায়! মাসের শেষ। ট্রেনটা যে কখন ছাড়বে! চাঁদা দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। হাত জোড়া। এগিয়ে দেখুন। *বিনা চাঁদায় শহিদ মিছিল বার করুন।*

তবু বাক্‌সো ঘোরে, এবং চাঁদা আদায় হয় সাকুল্যে তেরো টাকা ছাপান্ন পয়সা। 'এই নিন। যা তুলেছি সব নিন। বাকিটা ধার থাক। কাল নির্ঘাত দিয়ে দেব।'

'ভরতুকিতে ধার চলে না।'

'তাহলে এত কাছে এসেও একটা শহিদ মিস্ করব আমরা!'—এক নম্বর দল।

দু নম্বর দলও অনুপ্রাণিত বোধ করেঃ 'শহিদ আমরাও মিস্ করতে চাই না। মাল, মানে শহিদ, আমাদের দিন। ধারে—'

অফিসারঃ 'আপনারা দুজনে জয়েণ্টলি নিন শহিদটাকে। পাঁচ শো প্লাস পাঁচ শো—দু দলে মিলে ইউনাইটেড—'

'আমরা ওদের সঙ্গে ইউনাইটেড হবো?'

'না, না, জানি ওরা আপনাদের অচ্ছুৎ। আমি সমানভাবে ভাগ করে দেব—দুটো টুকরো দু দলকে। তারপরে দুটো মিছিল করবেন। ইউনাইটেড হয়ে হাজার টাকা ভরতুকি দিন।'

'পাঁচ শো-ই বা পাব কোথায়?'

'এর চেয়ে সস্তা আর হয় না। না পেলে আমাদের অন্য পার্টি ধরতে হবে। শহিদ মিছিল হোক এটা আমরা চাই—তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবো।'

বুড়ি তখন কাঁদতে-কাঁদতে দুটো টুকরো জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছেঃ 'ওরে মানিক রে—'

অফিসারঃ 'চটপট সিদ্ধান্ত নিন। নইলে অন্য পার্টি।'

'অন্য পার্টি পাওয়া এত সস্তা নয়। এখানে আর পাঁচ শো দেওয়ার পার্টি কোথায়?'

'তাহলে মর্গে নিয়ে যেতে হবে। সব ফর্মালিটির দায়ে পড়ে যেতে হবে। সেটা দুঃখের কথা—আপনাদের, আমাদেরও। এখন বডিটা দিয়ে দিতে পারতাম, যেন আমরা আসার আগেই আপনারা বডি তুলে নিয়ে চলে গেছেন। এখনও বলুন। বলুন। লাস্ট টাইম। লাস্ট টাইম। ফুরিয়ে গেলে আর পাবেন না। বলুন। সস্তা। খুব সস্তায় যাচ্ছে। হাজার টাকায় গোটা শহিদ।'

এমন সময় ট্রেনের পোঁ বেজে ওঠে। লোকজন দৌড়ে গাড়িতে উঠতে থাকে।

অফিসারঃ 'শালা গার্ড, একটু পরে পোঁ দিবি তো। সবে দরদাম শুরু করেছি। ও দাদা, আপনারা সবাই চলে যাবেন না। অর্ডিনারি লোকরা যেতে পারে। ওদের পলিটিক্যাল কন্‌শাস্‌নেস্ কম। কিন্তু আপনারা

পলিটিক্যাল ওয়ার্কাররা, পেট্রিয়টরা যেতে পারেন না। আপনাদের শহিদ মিছিল বার করতে হবে। আপনারা দেশের আশা। আপনারা দেশের ভবিষ্যৎ।'

পেট্রিয়টরা ছুটছে ট্রেন ধরতে। পুলিশরা তাদের পেছন-পেছন ছোটে। বলে: 'ও দাদা, যাবেন না। আরো সস্তা করে দেব। একটু বাড়ান ভরতুকি। মাইরি বলছি, খুব সস্তায় শহিদ দেব। এর চেয়ে সস্তায় কোন শালা দিতে পারবে না।'

পেট্রিয়টরা পুলিশের আকুল প্রার্থনায় কান না দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে। গাড়ি চলতে শুরু করে। কেউ তাস বিছোয়। পুরুত বলে, 'বিয়েটা বোধহয় দিতে পারবো।' কেউ বলে, 'শহিদ মিছিলটা করলেই হত।' অন্যরা বলে, 'দামে পোষালো না তো।' 'এই সিটটা আমার ছিল, আপনি বসেছেন কেন, শালা চোট্টা।'

অফিসার: 'আজকালকার লোকদের শালা দেশপ্রেম একদম নেই। সে ছিল ব্রিটিশ আমলে—'

বুড়িটা মরা ছেলের দুটো টুকরো একসঙ্গে সাজিয়ে তার ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদছে: 'ওরে মানিক রে—তোর এ হাল কে করলে রে—'

বিশ্বনাথ বসু এই প্রেম

উত্তরের জানলাতে জং পড়েছিল। শীত বিজনের পক্ষে যেন দীর্ঘ-দীর্ঘতম ঋতু। আর আজ ছিটকিনি খুলে দিতেই টানাটানা শিকের মধ্য দিয়ে জল জঙ্গলের উপর সামান্য ঝড়। বসন্তের।

ওদিকে যেতে পায়ে ঘসা একখণ্ড চোরা রাস্তা। গিয়ে দাঁড়ালে, পেছনে কালোদিঘি, পাড়ে শিশু চালতার জংলা ও সামনে আদিগন্ত গমের গাঙ। উড়ন্ত পাখির ঝাঁকে কি একদা অসংখ্য তীর ছোঁড়া হয়েছিল আর তা সব লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে গেঁথে আছে—গমের কঞ্চিতে শিষগুলো বাদামি ও সবুজাভ পালকের মতো? একটু বসলে, মুক্ত বাতাসে ক্ষেতের ঘুঙুর বেজে যায় বা যেন সর্বক্ষণ অজস্র সজারুদের ঝমঝম চলাচল! রৌদ্রতপ্ত এককোণে ভোরের চষাভূমি থেকে উত্থিত বাষ্প। তারপর আরো একত্রিত মৃত্তিকার নানা বর্ণে শস্যের উৎসব। কিন্তু ওদের বাড়ি ও উঠোন ভেঙে অত যাওয়া উচিত নয়। বিশেষত এই ঝড়ে?

গত সপ্তাহে ও বাড়িতে বিয়ের পরব ছিল। সন্ধ্যারাতে হঠাৎ হ্যাজাকের আলো আর সারারাত সাদির গীত হলো। সে গীত করুণ কান্নার মতো। বিজনের ঘুম এসে যায়। কিন্তু মধ্যরাতে ঘুম ভাঙতে ঐ গীতগুলোই এত আবহিত ও মধুর যেন বৈশাখীর বর্ষণ বা দোতারার চঞ্চল বাজনা। পরদিন বিয়ের কনে সে অপরিচিতা মঞ্জুরিত আম ও বেল গাছের কাছে এসে দাঁড়াল ঘন কালো চুলে। দুর্লভ দৃশ্য। একসময় বিজনকে দেখেই ও নিঝুম জঙ্গল, হাঁস-মুরগির দিকে চেয়ে এমন বিষণ্ণা হয়ে গেল যেন কপালকুণ্ডলা!

ওদের ব্যস্ত অফিস বড় মাঠের পরে ও কাঞ্চনের লতাঝাড়ের আড়ালে আশ্রমের মতো। মানি প্ল্যান্ট জড়ানো জল বাঁধার জালজাল তারের বেড়ায় মাঝ বরাবর ভাঙাচোরা দূরত্ব। এই নাতিদীর্ঘ পথটুকু পেরুতে এত সময় লেগে যায় যে রোজ দেরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। অফিসের ভেতর

দেওয়ালের রঙ সিফোম গ্রিন, গোল গোল থামগুলো যেন ইউক্যালিপটাসের কাণ্ড আর শিলিং-এ স্কাই ব্লু। বিজন তার সেকসনের সিনিয়র। ওর কাজের টেবিল এককোণে ও এক টু আলাদা। মাথা ওঠাতেই যেন সিগারেটের তেষ্টা পায়। কারণ বয়স? না প্রেসার? গত বছর এ অফিসে পাঁচ ছটি মেয়ে কাজ পায়। তার একজন এ সেকসনের। আশ্চর্য সুশ্রী। উপরন্তু এ ঘরের অন্যান্যরা বিবাহিত। অফিস আর তার নির্দিষ্ট নিয়ম ও নৈতিকতা। কাজের চাপ পড়লে চোখ নড়াবার উপায়ও থাকে না। টিফিন আওয়ারে বা তেমন দিনে অন্য মেজাজে অফিসের ওরা যখন খেলা সিনেমা উপগ্রহ প্রভৃতি তর্কবিতর্ক এনে ফেলে, বিজনের কখন-কখন এমন ভালো লাগে যেন তা জ্যৈষ্ঠের দুপুরে এক গ্লাস লেবুর সরবৎ বা তোর্মার বাতাস। কিন্তু ওরা যখন বিজনের উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে—ফ্যানের হাওয়া থেকে সরে বিজনকে জানলাতে যেতে হয়। কেননা তৎক্ষণাৎ ওরা আলোচনার স্বর ও রসে ঘূর্ণি-বানাতে এত দক্ষ যে প্রতীতি জন্মে ওদের দাম্পত্যে ইদানীং ওথেলোর কমপ্লেকস, বা অসিধারা ব্রত পালিত হচ্ছে। কোন-কোন দিন আবার এত তিক্ত হতাশ হয়ে যায় যে যেন চলন্ত ট্রেনে—ঠ্যাংএর নীচে শোয়া-বসা মানুষ রেখে—ঠ্যাঙের উপর ট্রে ফেলে ওরা ভাত মাংস গিলছে। কেউ হয়ত রেগে বলেই ফেলে—বিজনদা বিয়ে করবেন না? বিজন হাসে। সে হাসি আরো মারাত্মক। এমন কি নতুন মেয়েটিরও নাকি উক্তি—ভদ্রলোক অপদার্থ। এবং অমনি দেবুর শুদ্ধি—না, পুরো পদার্থ।

একদিন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, গরম চাতে চুমুক দিতে, না-দিতেই দেবু প্রস্তাব করে বসল—পিকনিকের প্রোগ্রাম হোক। এ হল দেবু, মরুর বিভীষিকা! তবু বিজন চমকে উঠেছিল—পিকনিক! প্রথমে সবুজের ঘনান্ধকার, চা পাতার উষ্ণ সমতল, নানা মেঘ আর শেষে বজ্রপাতের দেশ। ধূম্র পাহাড়কে খণ্ডিত করে স্রোত-সংকুল নদী। ঘূর্ণি উৎরাই। কমলার বাজার। ভয়াল খাদ। এক পশলা বৃষ্টি। শীতশুভ্র ঠাণ্ডা মূর্তির মতো মানুষেরা। তাজা চোলাই ও অরেঞ্জ ওয়াইন। বিজনকে এবার চারমিনার ধরাতে হয়।—ও যাবে? থামের পাশে চেয়ারে বসে, ডেস্কে কর্মরতা মোমের শকুন্তলা। ওরও ভালোবাসা নাকি হয়ে আছে। অবশ্য মটোর-বাইক আরোহী সে যুবা পাড়ার ত্রাস।

কলাপাতা রুক্ষবাতাসে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে গেছে। শিমূল গাছ থেকে

তুলো ভেসে-ভেসে আসে যেন হাঁসের শাদা ছানা, গোলাপ ; এ্যাসবসটসে ও রাস্তায় সেগুলো লাফায়, পড়ে, গড়ায় যেন পিং পিং। ঝড়ের দিকে চেয়ে বিজন আজ স্থির করে শেষ-বাতিতেই যাবে। অন্তত: শুলুক সন্ধানে। ওদিকে একটা সিনেমার হলও আছে। ইউরেকা! সে হবে ডাবল বেনিফিটের মত। নিজেরও স্বস্তি আর ওরাও নিশ্চিন্ত হবে। তা ছাড়া মধ্যরাত।

একটি চলতি রিক্সাতে ও উঠে বসল। পরনে ওর পাতলা কাগজের মতো আদ্দির পাঞ্জাবি ও হালকা প্যান্ট। দশ-বারো মিনিট পথ যেতে পঞ্চরঙ্গী ছাড়িয়ে শহরের পূর্ব প্রান্তে। রাস্তা সেই টানাটানা, পরিচ্ছন্নতা সাম্প্রতিক গ্রামগঞ্জের। ভগ্নজর্জর ভৌতিক দালান, পতিত প্রান্তর, সাঁকো শুষ্ক খাত ও সংরক্ষিত বনভূমি। সরু বাঁধ আর নবোদ্গত পাতার শাল-অশ্বত্থ যেন জলরঙে আঁকা। সে পত্রোল্লাস প্রধান অরণ্যে চলে গেছে। উল্টোদিকে বাংলোর মতো প্রেক্ষাগৃহ—'আলোছায়া।'

ও নেমে পড়ল। হলের মুখে চা-রুটি-পানের কটা ঘুমতি দোকান। হলের ভেতর কিছু ভিড়, সামনে টাঙানো একটা ম্যাড়মেড়ে ব্যানার। বিজন তার ছক কেটে এসেছে; এরপর প্রচণ্ড ভিড় কি আলতু-ফালতু ফিলিম দেখেই যেন ফিরে যেতে গিয়ে, হঠাৎ এক কলিগের বাড়ির খোঁজে, বাকিটুকু। এক-আধ ফার্লঙের পর সে প্রসিদ্ধ পৃথিবী? রাস্তাতেই নাকি মোড়া পেতে বসে নব যুবতীরা ও সারসার ঘর।

এদিকে ইলেকট্রিকের পোস্ট নেই। শেষ বাতি? রাত-বিরাতে নিশ্চয় তেমন নিরাপদ নয়। ভাঙাচোরা ঘর বাড়ির ঘিঞ্জি গলি, আর সে গলির কাছে তাস পেতে, দাঁড়িয়ে ও উবু হয়ে বসে একদল যেন ষণ্ডাগুণ্ডা মদ-ভাঙে লোভ হয়ে আছে। এরাই কি ভাড়ুয়া? জঘন্য ঘাঘি? কাল রাতে ওয়াগন বা জেল ভেঙে এসে জড়ো হয়েছে? বিজন সতর্ক হলো। আগন্তুকের আপাদমস্তক এমন তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করছিল, যেন ওরা আসলে শুল্ককর্মী। প্রশ্ন—কি সাঙাৎ! পনৃজা আছে? বিজন ভড়কালো। কিন্তু অমনি ফেরা যায় না। ও দাঁড়িয়ে পড়ল, কলিগের বাড়িটা জানতে গিয়ে গলার আওয়াজও ভেঙে গেল, আর সে অপরাধ-বোধের জন্য বিজন তখন কিংকর্তব্য বিমূঢ়। ও ঘামছিল। লোকগুলোর যেন ভাঙা বোতলের মুখ। শেষে একজন কষাগলায়—পেছনে ফেলে এসেছেন। 'পেছনে'। এটা যেন ধাঁধাঁর ভাষা যার আসল অর্থ হল—ও সন্ধান পাওয়া বাবু তোমার মত কুমড়োর

কর্ম নয়। এ বহুৎ এলেমের বিজনেস্। চৌকাঠেই ঠকিয়ে দেবে।

নতুন জুতোর পা যেন ওর আবার হলটার কাছেই এসে যায়। আর কোথা থেকে রোগা শুকনো ব্ল্যাকার বেরিয়ে এসে বিজনের সামনে লটারির টিকিটের মতো এক গোছা রঙিন টিকিট ধরে বলে—দাদা দেব? কাউন্টারে কিন্তু নেই।

বিজন প্রায় মুমূর্ষুস্বরে উচ্চারণ করল, কত?—সাড়ে তিন। আর দুটো নিলে ছয়। কর্নারের। বিজন এবার সপ্রতিভ—আমি তো একাই। ছেলেটি ওর পোশাক ও কালো মুখের দিকে চেয়ে হাসল। সে হাসির কারণ হয়ত এই—ওদিকে গেলেন কেন? ওখানে তো এখান থেকে যেতে হয়। বিজন প্রায় শিউরে উঠলো ও অনভ্যস্ত মাতালের মতো মাথা নাড়াল। ব্ল্যাকার বলল—ঠিক আছে তিন দিন। 'সি'রো। ও তাড়াতাড়ি পাঁচটাকার নোট বের করে দেয়।—শো তো ভাঙেনি।—আরো আধঘন্টা। আধঘন্টা। বিজন দূরের একটা দোকানে ঢুকে চা চাইল। চা-টা চমৎকার। বিজন বলল—বন কত?

ক্রমে ভিড় বাড়ছিল। সর্বত্রই কি এখন শহুরে হাওয়া? না হাওয়া উল্টো বইছে? জনতার এই অংশই কি বেশি বেশি করে সিনেমা জলসায় উৎসুক হয়ে উঠছে? একদিন বিজনেরও অসহ্য শখ ছিল। আর, আজ ক-বছর পর অগত্যা তাকে দেখতে হচ্ছে। নিঃসঙ্গতা? না, অলস অনীহাই? তাছাড়া কাগজপত্র, পোস্টার, অফিসের আলোচনা সমালোচনা ইত্যাদি থেকে ওর এই ধারণা হয়েছে যে ইদানীন্তন চলচ্চিত্র দু প্রকারের: অর্থাৎ কতকগুলো এত সুক্ষ্ম ও দ্ব্যর্থবোধক যেন অণুবীক্ষণ লাগে আর অধিকাংশ এত প্রচণ্ড যে বক্স থেকে বোধহয় দেখা উচিত।

যতক্ষণ আলো ছিল আর গানও ছিল—বিজনের পীড়িত লাগছিল। এ এক বিশ্রী অসুবিধা। কিন্তু সংবাদচিত্রে জীবজগৎ, খেলাধূলা ও ঠাণ্ডা রৌদ্রে শোভমানা প্রকৃতির পর যখন রঙিন ফিলিম শুরু হলো বিজনও 'স' রোতে বসে দর্শক হয়ে যায়।

আরম্ভেই রঙ, রূপ ও জঙ্গম জীবনের তীব্র আকর্ষণ: নীলপ্রভ জলোচ্ছ্বাস, ধু-ধু সৈকত, অরণ্য ও অনবরত অশ্বক্ষুর ধ্বনি এবং জিঘাংসা, রিরংসা, গ্রাম, ঘাম, সংসার, ভাঙন ইত্যাকার আলোড়ন; অনন্য অনন্যা নায়ক-নায়িকা, তাঁরা আবর্তিত, বিযুক্ত আর বিভিন্ন আবহে এত একাকার যেন প্রকৃতি ও প্রতিকৃতি।

গল্প-অভিনয়-শব্দ-সুর পরিস্রুত হতে থাকে—ক্রমেই যেন এক অন্তর্লীন উর্ধগতি। অনিন্দ্য নরনারী। অনবদ্য ভনিতি, সুরভিত শান্তনদী, মৃদঙ্গ নৃত্য, চন্দনারণ্য, প্রায় পাখি-কণ্ঠে গীত-মূর্ছনা, নতোন্নত পাহাড়, রহস্যময় মুদ্রা। অর্থাৎ ললিত সুসঙ্গত ও নয়নাভিরাম দৃশ্যের পর্বপর্বান্তর।

তারপর এ চিত্র যখন শেষ হয়ে যেতে থাকে : বাতাস, পদ্মাভ রাত, আর চুম্বনদ্যোত যেন ছায়া, নগ্ন গন্ধর্ব উর্বশী, যাদের পদতলে ও চতুর্দিকে শুভ্র ঘন জলপ্রপাত, গন্ধক উপত্যকা, উচ্ছলিত উদ্ভিজ্জ ও শঙ্খপর্বত।

হল-ভাঙা ভিড় এড়াতে বিজনকে তাড়াতাড়ি অন্য রাস্তায় যেতে হল। ও কি ভুল পথেই এসে পড়ল? নীরব নির্জনতা, ঝর-ঝর হাওয়া, জ্যোৎস্নার আভা ও পাতাডালের ছায়া-ছায়া আলপনা। কবে যেন ওরা পাঁচ-সাত ক্রোশ এই পথ হেঁটেছিল। ওর চুলে হঠাৎ একটা জোনাকি উড়ে এসে বসেছিল। জোনাকিরা কি রাতের প্রজাপতি?

সন্ধ্যারাত যেন আজ জলতরঙ্গের মত বয়ে গেছে। কিংবা এতক্ষণ ও জলবৎ কাঁচা মদ খেয়েছে, আর ধমনী উপধমনী শিরা উপশিরা যোগে রক্তের মধ্যে সে মদ রিমঝিমঝিম, মাইল্ড ওয়াইন? অচিহ্নিত এ রাস্তা ও রাত। আর ঘরে ফেরা যাবে না—যেন বারো বছর বারো মাস, ঘুমনোও যাবেনা যেন—বারো বছর বারো মাস আর। এ কি নান্দনিক উল্লাস? কস্তুরী ঈর্ষা? না, অন্য অনুভব : হিংস্র—সম্মোহক—সঙ্গীতোপম—ভ্রূণ!

রামকুমার মুখোপাধ্যায় গোষ্ঠ

লক্ষ্মণ সাতসকালে টেনাতে মুড়ি বেঁধে ভেড়া-ছাগল আর গরু-মোষের পাল নিয়ে বেরিয়েছিল। মুখে শব্দ করছিল—'হুই' 'হুই'। ধান কাটা শেষ। সারা মাঠ খাঁ খাঁ। অনেক দূরে যেখানে মাঠগুলো সব গোল হয়ে মিশেছে, সেখানটা খানিক সবুজ। মাঠে ধানের কাটা গোছ। গোছের গায়ে কোথাও কিছু ঘাস আর কোথাও নতুন গজিয়ে ওঠা ট্যাং টাং-এ একটা ধান শিষ্। জমি দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে লক্ষ্মণের পায়ের পাতায় বেদনা লাগে। কাটা গোছ ঠিক গুণছুঁচ। পট্‌পট্ বেঁধে। লক্ষ্মণ টেরিয়ে টেরিয়ে খানিক হেঁটে একবার দাঁড়ায়। হাতটা বুলিয়ে নেয় পায়ের পাতায়। জাড়টা খুব লাগছে। প্যান্টের সরকাটা নামতে নামতে বেড়াল ঘুলঘুলি, লুড়লুড়ি ছুঁই ছুঁই। সুরকিটা জাব্দা করে লাগায় লক্ষ্মণ। কত্তাদের দেওয়া টেরিলিনের আধ-ছেঁড়া জামার উপরের বোতাম দুটো আঁটে। আঁটকে কি হয়, আবার বেরিয়ে আসবে। ঘরদুটোর ব্যাঁত এমন ফাড়া বোতামটি ঢুকবে ফুস করে, বেরিয়ে আসবে ফচ্ করে। সেপ্টিপিনটা তৃতীয় ঘুলঘুলিটায় আটকায়। নীচের দিকের জামার দুটো ফুঁপি গিঁট মেরে ঢুকিয়ে দেয় প্যান্টের ভেতর দিকে। জামাটা বড় পছন্দ হয়েছে লক্ষ্মণের—বেশ বড় সড়। হাঁটু পর্যন্ত শীতে লাগবে নি। মায়ের ছেঁড়া কাপড়টা বড় ভাই নিয়েছে অর্ধেক, তার অর্ধেক্‌। কাঁধের দু-পাশ দিয়ে এধার ওধার চালিয়ে দেয়। বাদনা পরব হয়েছে গেল মাসে। মাঠে মাঠে সে সুর এখনও ভাসছে। লক্ষ্মণ মনে মনে গুনগুন করে—'অহিরে, এতদিন যে চরাই কাড়া। রাতে রাতে খেলাল করি রে / আজ তোর দেখিব মর্দান। / অহিরে'—গলাটা লম্বা সুরে টান দিয়ে, কাঁড়ার গায়ে হাল বুলুতে বুলুতে, টিংটিং-এ শরীরটা চাবুকের মতো তুলে দেয় কাঁড়ার পিঠে। আবার সুর ধরে—'অহিরে।' কাঁড়া, গরু, ছাগল, ভেড়া দুদিকে মুখ বুলুতে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। এগোতে এগোতে দূরে চলে যায়। পাথরের চাঁই, উঁচু আইল, নিচু ক্ষেতের ভিতর যেতে-যেতে

ছোট হয়ে আসে। যেন লাল ধুলো, বিশাল চাঁই-এর মাঝে কতকগুলো চলমান বিন্দু হয়ে যায়।

চারদিক থেকে বিন্দুগুলো এসে জড়ো হয় বাঁধের উপর। জড়োসড়ো হয়ে বসে। পাহাড়ের মাঝের ফাঁকটা দিয়ে লাল থালিটা উঁকি মারে। নড়েচড়ে বসে সব। লক্ষ্মণের মতোই তের-চোদ্দ বছরের সব। রামের বিটিও আসে। পিঠে রোদ পড়ে—তাত আসতে এখনও দেরি। বেশ জাড় পড়েছে দিন কতক। ই এমন জেলা—শীতে যেমন কাঁপুনি, গরমে তেমন তাতানি। পাথর—রোদে আগুন, ঠাণ্ডায় বরফ। খানিক রোদ খেয়ে সব একটু মচমচায়। তিরতির করে উঠে যায় মহুয়া গাছটার ডালে ডালে। বুড়ি ছুঁয়ে এসে ছুঁয়ে দিলেই চাল। দুজন একসঙ্গে ঝাঁপালে যে নেমেছে পরে, সে হবে চোর। নেড়োর ব্যাটা অত ছোটাছুটি করতে লারে—জনম খোঁড়া। খানিক হাঁটলেই পায়ে বেদনা লাগে। রেতে বিছনায় থাকা দায়। বাঁশি আনে হাতে করে। চাটানটার ওদিকে খালের ধারে পাথরের চাঁইটার ওপর বসে বাঁশি বাজায়। রামের বেটি বুধি আগে ছুটত খুব পাঁই পাঁই করে। এখন কেমন লাজ লাগে। গতবছরে মা নিজের জামাটে দিয়েছে তাকে পরতে। গত বছরও ফিঙে খেলেছে সব একসাথে। ঝাপটা ধরেছে মদনাকে। মদনা যেন কেমন তাকিয়েছিল সেদিন। উপেনের পাশে বসে বাঁশি শোনে। আপন মনে কালো পাথরের উপর কাঁকরের লাল ঢেলাটা দিয়ে আঁকিবুকি কাটে—কখনও ফুল হয়, কখনো দেওয়াল ছবির দুটো পাখি, কখনো আধ ফোটা পদ্ম আর ভ্রমর। কালো পাথরের বুকে আবছা লালের টানে মিটমিট করে ওগুলো। বুধি আপন মনে করে ওসব। তবুও সোয়াস্তি নেই দূরে বসে। কালকে মদনা ডাংগুলি খেলে এসে, বাঁশি শুনবে বলে উপেনের পাশটিয় বসে। খানিক পরে দাঁড়িয়ে ভ্যাবাতে থাকে—'হম তুম এক কামরা বন্দ হয়।' আবার খানিক পরে যাবার সময় উপেনের পরনের গামছাটা খুলে দিয়ে দে ছুট। খুব গাল খেয়েছিল বুধির কাছে।

সূর্যটা পাহাড়ের মাথা বরাবর উঠে আসে। আলোটা চারদিক ছড়ায়। অর্জুন গাছটার মাথা ছুঁয়ে, নিম গাছটার ডাল ধরে পুকুরের জলের উপর চিক চিকিয়ে ওঠে। একটা মাছরাঙা ছো মেরে পুকুর থেকে তুলে নেয় কোনো টিকলি মাছ। ঢেউগুলো একটু উঠে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য্য জলের মাঝে কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। জলের স্থিতির সাথে-সাথে আবার সব জুড়ে একখানা হয়। 'আধা কাজ আধা খাবার'-এ কাটানো পুকুরটার

ধারে এসে বসে সব। লক্ষ্মণ, মদনা, অঙ্গদ চাদরের মুড়িগুলো খোলে। উপেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসে। বাঁশিটা রাখে ঘাটের পাথরটার উপর। বুধি গায়ে জড়ানো কাপড়টা খুলেই কেমন চকচকিয়ে ওঠে। মায়ের ব্লাউজটা নেমে গেছে বুকে নীচে অবদি। ওপরের বোতামটা নেই। কাপড়ের খানিকটা গলায় জড়িয়ে নীচে নামিয়ে দিতে চায়। টান দেয়। কাপড়ের অন্য পাশে বাঁধা মুড়ির পুঁটুলিটা উঠে যায় গলা অবদি। আবার টেনে নামায়। ব্লাউজটা গলার কাছ পর্যন্ত তোলে। চারদিক কেমন চলচল করে। জামাটাকে শত চেষ্টাতেও বাগে আনতে পারে না বুধি। শেষে মাটির দিকে মুখ করে ঝুঁকে পড়ে। পুঁটুলিটা বুকের ওপর ঝোলে। আড় চোখে তাকায় বুধি লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, মদনার দিকে। মাহাতোদের ক্ষেত থেকে চুরি করা আনা দুটো পেঁয়াজ নিয়ে সব কাড়াকাড়ি করছে। সব পেয়েছে এক কোষা করে। লক্ষ্মণের উপরি এক কোষা। ঠুক করে বুধির নাকে লেগে পড়ে যায় বুধির কোলে। খুশি হয়ে লক্ষ্মণকে দুটো গাল দেয় বুধি—মুখপোড়া, বেদো।

মাহাতোদের ঘরে দুবছর বাগালি করছে লক্ষ্মণ। বড় ভাইটা গত বছর বাগাল থেকে লাগাড়ে হয়েছে। এখন বছরে তিনশ টাকা বেতন। আর বছর চারেক পরে ছশ টাকা বেতন হবে। বাপের চায়ের দোকান আছে বাস রাস্তার ধারে। আধসের বেসনের পাকৌড়ি ভাজে। রথীন বেকারির কাছে দিনে এক ডজন পাউরুটি কেনে। সামনের রাস্তায় কাজ হচ্ছে। নিত্যিদিন আটটা পাউরুটি কাটে। এখন পাকৌড়ি ওঠে তিনপুয়া বেসনের। রেতের বেলা সব একটু নেশা করতে আসে। খাটুনির শরীর—জমে ভালো। লক্ষ্মণের পরের ভাইটার এঁড়ে লেগেছে। দিন রাত ঘিন ঘিন করে মাকে জ্বালায়। ছোটটা বছর পার হতে দেয়নি। সেটা দিনে রেতে মায়ের দুধ ধরে ঝোলে। আগেরটা কাছ ঘেঁসলে হাত ঝিনকোয়। লাউয়ের মতো বাঁয়ের মাইটা ধরে ডাঁয়েরটা খায়, ডাঁয়েরটা ছেড়ে বাঁয়ের। লক্ষ্মণ মেজো। মায়ের কাছ ঘেঁসার উপায় নেই। মাহাতোদের পাল নিয়ে সকাল বেলা বেরোয়। দুপুরবেলা মাহাতোদের ঘরে ভাত খেয়ে আসে। ঘর ঢুকলেই মায়ের ঘনঘনানি, কখন বেতন হবে। এখন পেটভেতো। পোথম বছর বেতন মাসে তিন টাকা—সম্বৎসরে ছত্রিশ টাকা। মা তাক করে আছে কখন টাকা আসে। লক্ষ্মণ এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়ায় পরের বছরের বেতনের সোয়াস্তিতে। বেতন পেলেই বাপের মতো রাস মেলায় গিয়ে হিমামালিনী

আর ববির পাশে বসে ছবি তুলবে। সার্কাসে কলকেতার বুকে চশমা মায়ের নাচ দেখবে। ধ্রুবোর মাটির মানুষ দেখবে। লক্ষ্মণ জানে আসছে বছর তার বেতন আর সেজন্যেই মাকে কাটিয়ে কাটিয়ে বেড়ায়।

দুপুরে পোথম খেয়ে আসে মদনা। তারপর অঙ্গদ, উপেন, বুধি সব একে একে। ধান কাটার পর ঝাড়ার সময়। বেতন নিয়ে খানিক গোল-মাল গত বছর থেকে লেগে আছে। এমনিতেই অর্ধেক লোক পুবে হুগলি, বর্ধমানে খাটতে যায়। বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় ঝরে কম। দেশে বান হলে মানভূম আর মল্লভূম মালক্ষ্মীর মরম নরমায়। তাতেও ডাঁটিতে এক কোনা ঝড়লে বাপের ভাগ্যি ভালো। গেরস্থের সারা বছর খাটার লোক লাগে না। নিজেরা গায়েগতরে চালিয়ে নেয়। এই রোয়া কাটায় মুনিস জন। ঘরের মায়ালোকের তাতেই তুপতুপোনি। হাভাতের হাঁড়িভাগ ভাদ্র মাস আর গেরস্থের পৌষ মাস, বাপের ঘরে মেয়ে নে যাবার তখন কি হুদহুদোনি! বোয়েদের মুখ সব ঝুড়ি—ছাঁ আগুলো, বুড়োবুড়ির তৎবির কর, কামিনদের তেলমুড়ি দাও, তারপর হাঁড়ি চাপাও। ভাত নামাতে সুর্যি গড়ায়। ভাতের থালাটি কোল ধরে টানবে আর লাল থালাটি তখন বাঁধের উপর দিয়ে সুড়সুড় করে জাম, আশুথ, মহুয়া, পলাশের মাথা ছুঁয়ে নেবে যাবে রাঁচি রোডের উপর।

হি হি করে কাঁপতে-কাঁপতে ভাত খেয়ে ফেরে লক্ষ্মণ। দাঁতগুলো ঠকঠক করে উপর নীচে লাগে। জড়োসড়ো হয়ে পুকুর পাড়ের আধডোবা লাল-টিপের দিকে তাকায়। লালে ঘোর লাগছে। উপেন পাথরটার উপর বসে বাঁশি বাজায়। সূর্য ঢলে পড়ে পদ্মপুকুরের জলে। বাঁশির সুর ছড়িয়ে যায়—

প্রেম সরোবর জলে পিরিতি কমল দলে
নবীন ভমরা রস খায়…।

মদনা পোথমে খচাতে গিয়ে নাচছিল সামনে দাঁড়িয় দাঁড়িয়, ছৌ-এর তালে। নাচতে নাচতে দেখে গাটা বেশ গরম হচ্ছে। অঙ্গদ এতখন্ বটের ডালে চেপে পাঁতা ছিঁড়ে। মুকুট বানাচ্ছিল। সব রাজার মুকুট। ঝপাঝপ পরে নেয় সব এক একটা মাথায়। সব এখন রাজা। মদনা ঘুরে ঘুরে নাচে। একটু ঘুরতেই সব আঁচ পায় গরমের। উপেন সুর পাল্টায়। ছৌনাচের সুর। সব দল বেঁচে নাচে মুখে শব্দ করতে করতে—

উরর দাঘিন গেদা, দাঘিন গেদা, দাঘিন গেদা,

উরর গেদা গেড়েন, গেদা গেড়েন, উরর গেদা গেড়েন।

যত নাচে তত গা গরম হয়। ঘাম ঝরে। দেখতে দেখতে পশ্চিমের আকাশে লালের উপর কালোর পোঁচ পড়ে। দূরের সবুজ বনটা কালো হয়ে এগিয়ে আসে আরো সামনে। পা ভেরে যায়। গা টলায়। পুকুরপাড়ের দিকে তাকিয়ে সব ছুট। আঁধার নাবছে। জোটাতে হবে সব। গুয়োলে গিয়ে কাউকে কাপড়ের পাড়, কাউকে শন দড়ি আবার বদল তুটোকে শনের গলানির সাথে লাইনের জাব্দা দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে। তারপর মুখের সামনে ঘাস খড়। ডাং নিয়ে যে যেদিক পারে দে ছুট।

'হুই' 'হুই' শব্দ ওঠে কালচে মাঠের চারদিক। থকথকে নেমে আসা ঠাণ্ডার ভেতর গরুর ছোটাছুটি, কাঁড়ার পায়ের ভারি শব্দ। ভেড়া ছাগল ভিড়ভিড় করে ছোটে। কাঁচা রাস্তার লালধুলো ভরভর করে ওড়ে চারদিক। খয়েরি এঁড়েটা মাথা নাড়ে। ডাং-এর ফটাস ঘা খেয়ে আবার মাথা সোজা করে চারদিক ঠেলে ছুট। উপেন নেংচাতে নেংচাতে আসে পেছন পেছন। সামনের দিকে তাকিয়ে বলে—'লোখন, তুওর গাবিন ভেড়া কই বটে?' চোখ পড়ে সবার। নাই আছে। ভেড়াটা বিয়োবে। লদ্‌পদ্‌ করতে করতে সবার পেছন পেছন যায়। আজ চোখে পড়ে না।

লক্ষ্মণ পিছপনে ছুটে। তির তির করে একেবারে বাঁধের গায়ে। চাটানটার নীচে। সাঁকোটার তলায়। কাটা গাছটার গুঁড়ির পাশে। আবার ছোটে। বড় আইড়টার তলায়। কোথাও নেই। অন্ধকার খানিক দূরের গাছপালা ঢেকে দেয়। ছুটতে ছুটতে মাহাতোদের ঘরে। গোয়ালে সব একে একে বাঁধে। বড়গিন্নি খর খর করে ছুটে আসে। শিয়ালে খেলে, মাহাতো গিন্নি বলে, বুকে পাথর চাপা দেবে। নাকচোখ ঝামরে আসে লক্ষ্মণের। ছুট মারে। মদনা, অঙ্গদ, আর খানিক পরে উপেন এসে জুটে পুকুর পাড়ে। মাহাতোদের বড় কত্তা পালুই দেয়া বন্ধ রেখে বাখান করতে করতে ছুটে আসে। সবাই চারদিক ঘোরে। চোখে পড়ে না। মুখে শব্দ করে ডাকে। শীতের সঙ্গে তেমনি নিশ্চুপ। রাস্তার ধারের মজা কুয়োটাতে উঁকি মারে লক্ষ্মণ। ডাং চালায় স্যাট্‌ করে। খানিক পচাজল ছিটকে আসে চোখে মুখে। আবার দৌড় দেয় মাঠ বরাবর।

সামনে চড়াই উৎড়াই। একেবারে উঠে গেছে রাঁচি রোডের গা অব্দি। অনেকখানা লক্ষ্মণের চেনা। গড়গড় রাস্তায় তিরতির করে ছোটে। সামনের অন্ধকার বাড়ে। বহুদূরে টাউনের আলো। পাকা দালানের মাথায় জ্বলছে।

সবচেয়ে জ্বলজ্বলেটা মাড়োয়াড়িদের নতুন পাকা বাড়িটার। সামনের আলোটা দেখে চোখটা আরো ধাঁধিয়ে যায় লক্ষ্মণের। আরো সামনে যেতে পথটাও একেবারে অচেনা হয়ে যায়। দূরে বরাকর রোডের উপর দিয়ে রাতের শেষ গাড়িটা চলে যায়। চোখটা যেন আলোটা চেখে অন্ধকারে ডুবে যায়। আবার ছোটা। লাড়ার উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়ে সামনে পড়ে। হাত দুটো দিয়ে সামলে নেয়। উঠে আইড় খোঁজে। খানিকটা সোজা পথ আইড় বরাবর। মুখে ডাক দেয়। কোন সাড়া নেই। বুকটার ধকধকানি বাড়ে। আবার আস্তে আস্তে হাঁটা—গলা ছেড়ে ডাক। চাঁদ উঠতে আরো কতক দেরি।

বহাল জমিটায় নেমে ভচাং করে পা গেদে যায় লক্ষ্মণের। পা থেকে জল হাঁটু অব্দি উঠে আসে। ছোটার তাতটাও মিলিয়ে যায় নিমেষে। মাথার চুল পর্যন্ত সিড়সিড়িয়ে ওঠে। কাঁপুনি লাগে। শীতটা ঝাঁপটে ধরে। সিডসিড করে ঠাণ্ডা হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে বয়ে যায়। বড় জাড় লাগে। আস্তে আস্তে হেঁটে ওঠে পুকুরটার পাড়ে। পেছন দিকে তাকায়। অথৈ মাঠ। গাঁ থেকে অনেক দূর। ডর লাগে। বড় বট গাছটা আড়াল রেখে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসে। ভেতরের ঘামের ফোঁটাগুলো বরফের মতো জমাট বাঁধে। টেরিলিনের ঢলঢলে জামার বুকটা মুঠি করে আটকে ধরে। কাপড়ছেঁড়াটাকে ঢেকে দেয় মুখ অব্দি। গলার ভেতরটা যেন কেমন জমাট বেঁধে আসে।

দূরে একটা শব্দ ওঠে—ভ্যা। লক্ষ্মণ গাছের নীচে। হাত দুটো পাশে হেলানো। পিঠটা গুঁড়িতে, মাথাটা হেলে গেছে বাঁয়ে। উদোম পা দুটো হাঁটু বরাবর বাঁকা। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাপিয়ে আবার শব্দটা আসে—ভ্যা। নিমেষে পা দুটো সোজা হয়ে যায় লক্ষ্মণের। গালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে আসা লালটা জামায় মুছতে মুছতে আন্দাজ করে জায়গাটা কোথায়। সমস্ত স্মৃতি যেন ঢাকা পড়ে গেছে কোনো কিছুতে। তৃতীয় 'ভ্যা' ডাকটাতে যেন বাজের আলোর ঝলকানি খায় লক্ষ্মণ। জমাট পা দুটো হঠাৎ রণপা হয়ে যায়। বিশাল গামলার মতো উপুড় হওয়া গাছ, পাথর, সাঁওতালডির বিদ্যুতের পোস্ট, আর সমস্ত আকাশটা নিমেষে খানিক ফাঁক হয় এক ফালি কাটা চাঁদে। লক্ষ্মণ ছোটে, ভ্যাবানোর শব্দটা কাছে আসে। আরো কাছে। আর একটু। পাথর, গাছ, ঝোপ, বাঁধের লাউগাছের লতাপাতা ডিঙিয়ে আইড়টার নিচে দাঁড়ায় লক্ষ্মণ। সামনে ভেড়াটা। হলদে

চোখ দুটোতে চাঁদের আলো। চিক চিক করছে। ঘুরে এধার ওধার হাতড়িয়ে ডাং খোঁজে লক্ষ্মণ। কিছু নেই চারপাশে। ছুটে যায় ভেড়াটার কাছে। হাতটা দিয়ে চেপে ধরে শিংটা। মাথার ওপর বসিয়ে দেয় এক ঘা, দু ঘা, তিন ঘা। ভেড়াটা আরো জোরে চেঁচায়। হাঁপিয়ে ওঠে লক্ষ্মণ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাতটা অসাড়। পুয়োতি পেট এলিয়ে ভেড়াটা শুয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার তাগিদ নেই। শুধু অসাড়, নির্বাক চাওনি। আবার একবার ডাক পাড়ে। বেদনা উঠেছে। পিছনে রস ঝরে। ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে যায় লক্ষ্মণ। হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে আইলের উপর। ভেড়ার গলাটা জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে।

চোখ দিয়ে খানিক জল বেরিয়ে আসতে গলাটা খানিকটা ফাঁকা হয়। ভেড়াটাও সোজা হয়। মাথা নেড়ে ঝিমোয়। লক্ষ্মণ কানটা ধরে তোলে। পায়ে-পায়ে নিয়ে যায় পুকুরপাড়টার দিকে। ওখানটা গাছআড়ালে হাওয়া খানিক কম। সামনে ফাঁকা জমি। লাড়ার খাঁজকাটা মুখ। আড়ার উপর পাশাপাশি হাঁটা। সব চুপচাপ। এখান-ওখান গাছের জড়সড় নিশ্চুপ ডাল। দূরে একাকার অন্ধকার মাঠ-আকাশ। মাথার ওপর সিকে ফালি চাঁদ।

রাতটা জাড়ে কাঁপে। পায়ের নিচের ঘাতপাতাগুলোর ঠকঠকানি ভাব। হাঁটতে চায় না ভেড়াটা। ভেবিয়ে ভেবিয়ে বসে পড়ে। কখনো কান, কখনো শিং, কখনো গায়ের জমাট লোম ধরে এক-পা দু-পা করে এগিয়ে যায় লক্ষ্মণ। গাছের তলা পৌঁছে গেছে। ভেড়াটার লোমে হাত বোলাতে-বোলাতে লক্ষ্মণের ঘরটা মনে পড়ে যায়। বাপ এতখন্ নেশা করে দোকানে পড়ে আছে। দাদা খুঁজছে সামনের মাঠগুলোতে। মা ভরতশতরুকে নিয়ে দুয়োর গোড়ায় বসে একধার থেকে গাল দিচ্ছে। দাদা ফিরলে মা-বাপকে ডাকতে পাঠাচ্ছে। এঁড়ে লাগা ভরত ঢুলতে ঢুলতে মায়ের কেঁথা জড়িয়ে সেঁদিয়ে গেছে কলসির কোণায়। শতরু মায়ের কোলে বেশ গরমে ঘুমুচ্ছে—ঢুল ঢুল চোখে দুধ টানছে ঘত্‌ঘত।

ভাবতে-ভাবতে লক্ষ্মণের চোখ নাক দিয়ে খানিক জল গড়ায়। একটা হাওয়া দূর থেকে এগিয়ে এসে গাছের পাতাগুলোকে সিরসিরিয়ে চলে যায়। পাতার শব্দটা বেশ খানিক থেকে যায়। ভেড়াটা আবার ভ্যা ভ্যা করে। পেটে হাত বুলুতে বুলুতে লক্ষ্মণ কোলের উপর তুলে। কোলে তুলতেই বেশ গরম লাগে। লোমগুলোয় হাত ঢুকিয়ে তাত নেয়

লক্ষ্মণ। পা দুটো জড়ো করে ধুমসো পেটটার নীচে চালান দেয়। শরীরটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে আঁকড়ে ধরে ভেড়াটার গলা। মুখটা চলে যায় সামনের দু-পায়ের হাড়কাঠির ভিতর। খুব আরাম লাগে। শীতটা হাওয়াতে উড়তে-উড়তে লক্ষ্মণের পিঠ ছুঁয়ে মাথা টপকে দূরে চলে যায়। ভেড়াটাও আর খানিক ভ্যাবায় না। চাঁদের আলোয় গাছগুলো তিরিশ-চল্লিশ হাত হয়ে শুয়ে যায় চারদিক। শাল, মহুয়া, পলাশ গাছগুলো চাঁদ চলার সাথে সাথে এদিক-ওদিক পাশ ফেরে। গাছগাছালির ফাঁক পায় চাঁদটা। জল, পুকুর, গাছ, পাথরের চাঁই এসব কিছুর সঙ্গে একাকার হয়ে যায় লক্ষ্মণ আর বুধু। ঠিক একটা উইঢিপি কি ছোট্ট পাথরের চাঁই।

দূরে শেয়াল ডাকে—হুকা হুয়া। শীতে গা গরম করছে ডেকে। ভেড়াটা তড়াক করে ওঠে। ছনমন করে। ঢুলুনিটা কেটে যায় লক্ষ্মণের। চাঁদের আলোয় একটা ছোট গাছের ডাল চোখে পড়ে। তুলে এনে পাশে রাখে। লক্ষ্মণ বোঝায়—'শো ভেবলি শো, শো বুধু শো। তোকে ধরতে দুবো নাই বটে। উয়ার ঠ্যাং ভাঙি দুবো।' পাশে ডালটা ঠুকে শব্দ করে শোনায় কেমন জোরে মারবে।

পেট থেকে কঁকঁ করে একটা শব্দ উঠে আসে। সুরকিটা নামতে-নামতে আড়কাঠি পেরিয়ে গেছে। লাইকণ্ডলটায় কেমন একটা বেদনা ঠেকে। ঢোক গিলে লক্ষ্মণ। গলাটা কাঠকাঠ। থুথু ঘেঁটে। পেটে জল যায় না। ভেড়াটা আবার ভ্যাবায়। গায়ে-পিঠে হাত বুলোয় লক্ষ্মণ। ভারি আলানটার উপর হাত পড়ে। তালের মতো ফুলে আছে। বাঁট দুটো উপর থেকে নিচে নেমে এসেছে টানটান হয়ে। দুধে ভর্তি। ফেটে পড়বে যেন। হাত পেতে ভেড়াটার সুখ হয় যেন। শব্দ করে হুঁ-হু। মাথাটা ঢোকাতে চেষ্টা করে লক্ষ্মণ। হাতের চাপে বাঁটের খুসকি ছেড়ে দূরে ছিটিয়ে পড়ে খানিক দুধ। লক্ষ্মণ মাথাটাকে আবার নামায়। ঠোঁট-বাঁট তফাৎ থেকে যায়। লক্ষ্মণ কোল থেকে নামায় বুধুকে। তেমনি হেলে যায় বুধু। হাঁটু দুটো মুড়ে আধশোয়া হয়ে যায় লক্ষণ। ডান হাতটা বুধুর বুকের উপর দিয়ে চলে যায় ওদিকে। মাথাটা নেমে আসে লক্ষ্মণের। পেছনের পা দুটোর মাঝে ঢুকে যায় মাথাটা। মাথাটা এদিক-ওদিক করতে-করতে জিব দিয়ে ধরে ফেলে বাঁ দিকের বাঁটটা। ফিচলে বেরিয়ে যায় মুখ হতে। আরো ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্মণ মাথার সবটুকু চাপ আলানের উপর ছেড়ে দিয়ে। বগলের মাঝে পেছনের সারা অংশটা। হাতদুটো

পড়ে দুটোর গায়ে। বুধির সামনে পা দুটো হেলে গিয়ে পড়েছে লক্ষ্মণের পিঠে। জিব দিয়ে তালুতে বাঁটটাকে চেপে ধরে লক্ষ্মণ। দাঁত দিয়ে আস্তে করে চাপ দেয় বাঁটের গোড়াতে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা দুধ জিবের নিচে, জিবের উপর, দুদিকের গাল, তালু ছুঁয়ে গলা বেয়ে নামে। উষ্ণ দুধ। গলার নালীটা ফুটে ওঠে। শ্বাসের টানে ফুলতে-ফুলতে আবার মিলিয়ে যায়। আবার ফুলে ওঠে। আঠার মতো জমাট দুধটা নালির বাঁকা পথ দিয়ে একটু-একটু করে নামে। নিশ্বাস নিতে বাঁটটা ছেড়ে দেয় লক্ষ্মণ। দ্বিতীয়টা ধরে। গাল দুটো আবার ফোলে। আলানে হাত দিয়ে বোঝে চড়চড়ানিটা কমে অনেক নরম হয়েছে। গাল দুটো ফোলা কমার সাথে সাথে আলানটা অনেক কমে আসে—ফুলে ওঠে পেটটা। চারদিকের গাছপালা পাথরে জমাট শত শত মাইল ছড়ানো শীতের মাঝে বুধুর বাঁট থেকে একটা উষ্ণস্রোত লক্ষ্মণের পেটে বয়ে যায়।

রাত ভারি হয়। চারদিক গমগম করছে। ভেড়াটা এদিক-ওদিক গড়ায়। পা ছোঁড়ে। একভাবে চেঁচায়। লক্ষ্মণ চারদিক তাকায়। গায়ে হাত বুলোয়। বোঝে ব্যথা উঠেছে। বিয়োবে। ভাবতেই লক্ষ্মণের সারা শরীরে একটা তরল বরফের স্রোত বয়ে যায়। বেশ খানিক দূরে একটা আগুনের শিখা গাছটার মাথা ছুঁয়েছে। ছোটে লক্ষ্মণ। নিশ্বাস চেপে পা দুটোকে তাড়াতাড়ি তুলে নামায়। আইড় জমি সব তখন এক। আগুনটা কমে আসছে। ভেড়াটা তেমনি ভ্যাবাচ্ছে পিছনে। গলার স্বরটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে-হতে মুছে যায়। বেশ খানিক দূরে মাঠরাখাদের ঝুপরিগুলো চোখে পড়ে। পুকুরের পাড়টা পেরিয়ে আর একটু দূর। পৌঁছে যায় খানিক পরে আগুনের সামনে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বাপের নাম বলে। দু-আঁটি খড় বগলে কুড়োয়। প্যাঁকাটির গোছার ডগটা ধরায়। আবার ছুট। আগুনটা হাওয়াতে এগিয়ে আসে মুখের দিকে। লক্ষণের মুখে, পেটে, মাথায় ছড়িয়ে যায়। দুটো ঘামের ফোঁটা দুগালের পাশ দিয়ে নেমে আসে। কাণ পাতে শব্দ শুনতে। প্যাঁকাটির পটপট শব্দ। মাথার উপর হাতের উপর চেপে ধরে প্যাঁকাটির গোছাটা। আগুনটা নাচতে-নাচতে উপরে ওঠে। আধা অন্ধকার, জমাট শীত সব কিছু আগুনের শিখায় দুফাঁক হয়ে যায়। দূরের আকাশ ছোঁয়া মাঠটার বুকে তখন একটা দুরন্ত আগুনের উন্মত্ত গতি।

সামনে এসে পড়ে। নিথর। কোন শব্দ নেই। আগুনটা ধরে

ছোটে লক্ষ্মণ। শুয়ে আছে খানিক সামনে। বাচ্চা হয়েছে। একটা নড়ে, অন্যটা স্থির। মরা বাচ্চা বেরিয়েছে। এদিক-সেদিক ভাঙা ডাল আনে দু-একটা। গায়ের নেকড়া ফালিটা দিয়ে বাচ্ছাটার গায়ের রস মোছে। আগুনে সেঁকে। বাচ্ছাটা একটু চনমন করে। মা-টা আগুন পেয়ে সোজা হয়। মরা বাচ্ছাটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে লক্ষ্মণ। তেমনি স্থির। ভয়ে বুকটা সিঁটিয়ে ওঠে। পাশে নিয়ে বাঁচাটাকে হাতে তোলে। আদর করে। গালে মুখ ঠেকিয়ে সোহাগ করে। আগুনটা তখনও পিটিপিটি জ্বলছে।

রাত তরল হয়ে আসে। আগুনটাও নিবু নিবু। গায়ের কাপড়ে বাচ্ছাটাকে ঢেকে ভেড়াটাকে সামনে রেখে হাঁটে লক্ষ্মণ। সকাল হতে না হতে ঘর ঢুকে যাবে। লক্ষ্মণ বোঝায়—'উই খানিক দূর।' আবার হাঁটে। —'উই, সামনে।' আবার হাঁটা, খানিক পরে—'আলুম বলে।' চাঁদ আরো খানিক হেলে যায়। লক্ষ্মণ চেঁচায়—'আইসা গেছি।'

হৈ হৈ করতে করতে ছুটে আসে মদনা, অঙ্গদ, উপেন আর সব। ভোর রাতে জেলেদের দোঁড়া জালে সবাই মিলে টান মারে ওরা। হাতের কাছে বিড়ি এগিয়ে দেয়, লোকের খড় পালুই থেকে খড় চুরি করে এনে আগুন ধরায়। আজও বসেছিল তেমনি। দেখতে পেয়েই হৈ চৈ করতে-করতে ছুটে আসে। লক্ষ্মণের বগল থেকে টেনা সমেত বাচ্ছাটাকে নেয়। গলা পেয়ে বিছনা থেকে গাল পাড়ে গিন্নী—'মাগো এত বাগাল দেখলুম, এমন তিলে খচ্চর দেখি নি। ভোরবেলা ঠাকুর নাম করব তা লয়—হরি হরি।' বড়গিন্নীর জিনিস বাঁধা রাখা টাকায় কেনা। বড় টান তার ভেড়াটার উপর। বিছনা ছাড়ার সময় বড়কর্ত্তা চোখ বুজে এদিক-ওদিক খানিক সোহাগ করছে—তা কে নেয় কার সোহাগ। মাথাটা দিল ছুঁড়ে। হেঁচকা টানে বড় কর্ত্তার মাথা তেমনি আধহাত উঠে রইল। মেজগিন্নী কর্ত্তার দিকে পাশ ফিরে বলে—'ভেক ছাখে গা জ্বলে। আর কারো ভেড়া নাই নাকি! মেজকর্ত্তা তেমনি নাক ডাকছে দেখে ,রেগে এক খামচি মারে মুখটায়। আঠালো চোখ মেলে মেজকর্ত্তা হাঁ হয়ে থাকে। পিলপিল করে গুড়ের ভাঁড়, তেলের ভাঁড় বেরিয়ে আসে দুয়োর গোড়ায়। একটা বাচ্ছা মরে গেছে শুনে পিঁড়াটাতে মাথা ঘুরে বসে পড়ে বড় গিন্নী। চিলে কোঠা থেকে বুড়োবুড়ি চিৎকার করে—'ওর বাপের তেলেভাজার হাড়িকড়া কেড়ে নে আয়। বড় কর্ত্তা গিন্নীর চোখ ছল ছল মুখ দেখে তেড়ে যায় লক্ষ্মণের

দিকে। বলে দেয়—'তোর পায়া বাগাল আর ঘর ঢুকতে ঢুবোনি। দূর হ। ভেড়া ছাগলের কাছ ঘেঁসবি নি। তাপর টাকা আমি তো সে ঠিক তুলে লুবো।

তড়াক করে লাফিয়ে লক্ষ্মণ ভেড়াটার দিকে ছুটে যায়। তেড়ে ওঠে সবাই। ছোট কত্তা টাউনে কলেজে পড়ে। ব্রাশ দিয়ে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজে। খুড়ি চেঁচায়—'ওরে মনা, বুরুশ বন্ধ কর‍্যা ছ্যালাটাকে দুঘা বসা। সেজগিন্নী লক্ষ্মণের পাছায় চটাস-চটাস করে বসিয়ে দেয় দুঘা। ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে লক্ষ্মণ। বড় গিন্নী আবার খানিক সামনে গাল পাড়ে—'মুখপোড়ারা পুকুর পাড়ে ডাংগুলি খেলে। সব খানকির ছেলে। দুবো সব কটার মুখে লুড়ো জ্বেলে।' খানিক দূরে দাঁড়িয়ে পা নেড়ে বলে উপেন—'সবাইকে গাল দিবেনি খুড়ি।' মদনা, অঙ্গদ গলা মেলায়—'হঁ, নাই দিবে।' খুড়ি একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে—'হঁরে বেদোর ব্যাটারা।' উপেন মাথা নাড়িয়ে বলে—'বেশ হয়চে, তোমাদের বন্দুক থানায় লিয়ে গ্যাচে।' মদনা বলে—'পঞ্চাতের ভোটে হেরেচে-হেরেচে।' তেড়ে যায় ছোট কত্তা। সব দে ছুট।

এতখনে লক্ষ্মণের মা খবর পেয়ে বাঁ বগলে ছেলেটাকে নিয়ে কাপড় সামলাতে-সামলাতে ছুটে আসে। গালাগালি শুনে, ঢেঁকির মতো উঠে আর নামে। লক্ষ্মণ কাছ ঘেঁসে বলে—'উ ভেড়াটা—'। কথা শোনে কে কার। গালাগালির গলা চড়ে। লক্ষ্মণ বলে কাঁদতে-কাঁদতে—'বুধু এইটুন থেকে, ভেবলি এইটুন থেকে—'। লড়াটা ধরে টানতে-টানতে লক্ষ্মণের মা ছেলেকে ঘর নিয়ে যায়। লক্ষ্মণ পিছন পনে টানে। লক্ষ্মণের মা জাব্দা করে হাতটা ধরে হড়হড় করে টেনে নিয়ে যায়। শেষবার পিছনপনে তাকিয়ে গলা তুলে শুনিয়ে দেয়—'তোদের ঘরে না খাটলেও আমার ব্যাটার ভাত জুটবে বটে। তোদের ঘর না থাকলি আর কি আমার ব্যাটার বাগাল খাটার ঘর নাই?' লক্ষ্মণ আবার পিছন ফিরে বলে—'অয়, অয়'—। পিঠটায় চটাং করে এক ঘা বসিয়ে দেয় লক্ষ্মণের মা। ভ্যা ভ্যা করে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের পিছন পিছন চলে লক্ষ্মণ।

আফসার আমেদ আদিম

বন্যার পরে দুটো পরিবর্তন হয়েছে। এক পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন ঘর, দুই বাপের বিয়ে। দুটোই আকস্মিক। বন্যা না হলে নতুন করে ঘর করার কোনো দরকার ছিল না। আর বানের পরেই সাপে ছোবল দিল মাকে। ওই তো কাঁচা কবরের খাল ভর্তি হয় নি এখনও, বাঁশে পচন ধরে নি সে রকম। তিনমাস পেরোতে না দিয়েই বিয়ে করল বাপ। আজমগাছির খবির মল্লিকের সেজ বেটিকে। এখনও ভালো করে শাড়ি পরতে পারে কি পারে পারে না। বাপ ব্যাটার একই গাঁয়ে বিয়ে। বাপ বিয়ে করার পেছনে ছেলে কায়েম আলি কোনো বাধা দেয়নি। বরং দু-বোন ভাঙা মালচি দিয়ে বাপের বিয়ে বন্ধ করতে চেয়েছিল। ইজ্জত আলি কাউকে না জানিয়ে রাতারাতি বিয়ে করে ফেলল। খবির মল্লিকের মেয়ে পার করার নেহাৎ দায় ছিল।

দু-বোন হাসিনা কাশেনা লোক মারফত জানিয়ে দিল বাপের ভিটেতে আর যাবে না। আর গেলেও কি সৎমা ভাত দেবে! ভায়ের ভাত ভাজের হাত। বাপের বাড়ি মা আছে যে খাবে। ইনিয়ে বিনিয়ে সাত কাহন বলে পাঠিয়েছে।

লোকে ভেবেছিল কায়েম আলি বাপের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবে না। তাদের মিঞার পুকুর কাটায়ে কাজ করছিল কায়েম। ঘুরে-ঘুরে ওপরে উঠে পাঁকমাটি ফেলছিল নারকেল সুপারি বাগানে। সারা শরীর জুড়ে ঘামের সুতো গড়িয়ে চলেছে। সোজা বাপ ছেলের খোঁজে চলে এসেছে। বাপের সঙ্গে ছেলের অল্প চোখাচুখি। কায়েম চোখ নামিয়ে নিয়েছে। বাপের গা থেকে আতরের গন্ধ ছাড়ছে। চুলও বরকামায়ের মতো ছাঁটা। গায়ে নতুন গেঞ্জি-লুঙ্গি। ঝোড়া ফেলে কায়েম নারকেল গাছের ছায়ায় বসেছে। বাপ গামছায় ভরে মুড়ি শশা তার সঙ্গে কনে শ্বশুরঘর যাবার

রসগোল্লা এনেছে। কায়েম খেতে লাগল মুড়ি। বাপ ছেলের চোখের দিকে তাকাচ্ছে না, না ছেলে মুখ গুঁজে আছে। দুটোই।

ইজ্জত আলি বলল 'তোর মা এল।'

'অ।'

মুড়ি খেয়ে চলেছে সে।

'মাছ ধরতে হবে।'

'কেন?'

'কুটুম এইচে।'

'যাই।'

বাকুলে মাটি তুলে উঁচু করতে গিয়ে বাঁশতলার ডোবাটা পুকুর হয়ে গেছে। ডোবাটার জল থাকলে আর বড় পুকুরে যেতে হয় না। একটা তালগুঁড়ির ঘাট। বাকুল থেকে নামতে হয় একটু ধাপে-ধাপে নিচুতে। চারদিকে বাঁশঝাড় কাঁটাঝোপে বুনোলতার জটিল জড়াজড়ি।

আগের বছর বাপ-ব্যাটায় ডোবাটার মাটি কিছু তুলে দিয়েছে। এখন মাঝখানে এক মানুষ গর্ত। বাঁশপাতা পচে পচে ডোবার পাঁক কালো হয়ে যায়। তার মধ্যে চারা পোনা মাথা গুঁজে দিয়ে থাকে। বড় পুকুরে ঘরের বউ যাবে না ভালোই হয়েছে। ঘরে আর একটা মেয়েমানুষ এল ঘাট সরবে। আসলে কায়েমের সে মা।

কায়েম চেয়েছিল মা মায়ের মতো হোক। বা আগের মা ফিরে আসুক। কোনটা-ই নয়। আসলে মা মায়ের মতো হোক এই ইন্দ্রিয়ঘন মন কোনো অবয়বে শৈশবের স্পর্শসুন্দর মাকে বাঁধতে চায়। শিকনি-নাকি মা তার ইচ্ছের বিরোধী। তবু কেন মনে হয়েছে তো হয়েছে—যা হয়েছে তার করার কিছু নেই, বলার কিছু নেই।

কায়েম আলির নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপারটা দেখে পাড়াপড়শীরা ভাবল মেঘ জমেছে, বজ্রপাতের দেরি নেই।

বড়চাচি আনুনানি তো আনাচে-কানাচে ফিসফাস করছিল।

হাতছানি দিয়ে ডাকলে বড়চাচি।

কায়েম জালের মাছ বালতিতে রেখে বাঁশপাতা মাড়িয়ে কাছে গিয়ে দেখল রশিদের মা-ও জুটে গেছে।

বড়চাচি আহা-উহু করে উঠল। 'তোর মা বেঁচে থাকলে বুড়োকে বে করতে দিত নাকি? সে ক্ষমতা ছিলনি ইজ্জত আলির।'

আনুনানি বলে 'তোর ই-কি কথা লো বড় বউ, বেটাছেলে বে করবেনি তো কে করবে না। বুড়ো বয়েছে অসুখ-বিসুখ আছে—আপন পরিবার নেই—কে দেখবে তখন?'

রসিদের মা জুড়ে দেয় 'তাইতো আপন মাগের মতো সেবা কেউ পারবে নাকি।'

আনুনানির প্রশ্ন 'তোর মাকে দেখলি নাকি?'

কায়েম আলি মাথা নাড়ে। 'না।'

রশিদের মা বলে 'পরিষ্কার হয়েছে।'

আনুনানি আসল কথাটা বলল। 'তোর বউ তোর বাপের বউ এক বয়েসি। একই গাঁয়ে ঘর তো? মোর চাশতো ননদের শউরঘর—তার শাউড়ি মরে যেতে আজনগাছি গেছনু, ওই তোর মা কাজের ঢের, বাক্সির হাটে আনাজ বেচতো—বাপের সংসারে কম দেহ মাটি করেছে আবাগীর বেটি।'

কায়েম আলির পায়ে অনেকগুলো বাঁশপাতা কাদায় জড়িয়ে গেছে। পেছনে ফেরে।

বড়চাচি বলে 'চলে যাচ্ছিস ভাসুর পো?'

'কি কও?'

'বাপের সনে রাগমাগ করিসনি যেন। বাপ হাজার অন্যায় করলেও বলতে নেই। মানিয়ে গুনিয়ে চলিস বাবা।'

'কিছু ভাবিসনি চাচি, মুই কিছু মনে লিইনি।'

'এই তো কায়েম আলিকে কেউ নুনের হাঁড়িতে ফেলতে পারবে। যা যা—'

গোল করে জাল ফেলতে গিয়ে ঘাটে নামতে দেখল হাফেজাকে। লুকোচুরি হাসছে। ঘষ ঘষ বাসন মাজছে। পিঠের কাপড় সরে গেছে তবু মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছে। হয়তো ঘোমটায় হাসি লুকোচ্ছে। তাই সে-রকম গন্ধ পেয়ে কায়েম আলি তাকায় না বউ-এর দিকে। মেয়েমানুষের সবেতেই হাসি।

বউ ডাকল 'ওগো।'

গলার ভেতর থেকে একটা শব্দ বেরোল কায়েমের।

'মাছ পড়েছে?'

'চারা।'

'গাংতাড়া মাছ যেন একটাও ধরে লিয়ে যেওনি।'

'কেন ?'

'হাঁড়িতে উঠলে তুমার মা সে তরকারি খাবেনি আর।'

এবার কায়েমের কৌতূহল জন্মায় 'তুই কি করে জানলি ?'

ছেনালির মতো হাসে হাফেজা। গা জলে যায় কায়েমের। 'হাসচিস যে ?'

'জানুনি মোদের আজনগাছির দখিন পাড়ায় ঘর যে তুমার মায়ের।'

'অ।'

'বাপের হাত ফুটো। কাঙাল ঘরের মেয়ে।'

হাফেজা ফিক ফিক খুব হাসে। কায়েমের মনে ধরে হাফেজার এই ঘটনায় চমক লেগেছে। বেশ একটা তরতাজা অনুভূতিতে আছে। যেমন হোক্ গাঁয়ের সঙ্গী সাথী পেয়েছে। তাও আবার সে মা। এই যে মা বা শাশুড়ি অনুভূতি হাফেজাকে প্রাণোচ্ছল করেছে।

কাশমলি গাঁয়ের বাপের সাড়ুভাই এসেছে। ছোকরা এখনও পঁচিশ পেরোয় নি। মেজবোনকে আগের বছর বিয়ে করেছে। আর ইজ্জত সেজকে। শালির ঘরসংসার কেমন হল দেখতে এসেছে। তার সঙ্গে কনের সবচেয়ে ছোট বোনটি। তাদের নাস্তা দেওয়া হয়ে গেছে। বাপ নিজেই খাতির করছে। সাজা পান-দোক্তা দিয়ে নিজেই নিয়ে গেল। ছোকরা সাড়ুভায়ের সঙ্গে খোশগল্প লাগিয়ে দিয়েছে ইজ্জত আলি।

টুকটুকে লাল শাড়ির আড় ঘোমটায় কাচের চুড়িভরা বেলন-বেলন হাতটা শুধু আঢাকা। পেছন ফিরে আনাজ কুটছে।

শব্দ না হয় এমন মাছের বালতি রাখল কায়েম আলি। তবু শব্দ হয় ঝনাৎ। নতুন বউ একহাত ঘোমটা টেনে দেয়। হাফেজা দাঁতে আঁচল কেটে মুখ বন্ধ রেখে সারা শরীর কাঁপিয়ে হাসি গড়িয়ে দিল ভেতরে-ভেতরে। নতুন বউ-এর পিঠে গুমগুম কিল চালায় 'ওলো তোর ছেলে যে, ঘুমটা দিস।'

হাফেজাকে আলু ছুঁড়ে মারল। তারপর লজ্জায় ঘোমটা টেনে দিল এক হাত। সত্যি অবস্থা দেখে দয়া হয় কায়েমের। রান্নাঘর থেকে চলে গেল সে।

শাউড়ি বউ-এ খুব ভাবসাব। ঘাটে যায় শাউড়িকে সঙ্গে নিয়ে বউ। হাফেজার মনে হয় শাউড়ি না দেখেছে কি। ও তো সাবেরা। বিয়ের আগের বছর পর্যন্ত হাটে-ঘাটে খালে-বিলে কেটেছে। বাঁশপাতার বস্তা

বাঁধকোল থেকে বয়ে এনেছে এই সেদিন। আসলে সাবেরা মা নয় শাশুড়ি নয় সে একজন বউ। হাফেজা ছিল বলে যেন বেঁচে গেল। দুজনের অনেক হাসাহাসির কথা হয়। কখনো হাফেজা কিল মারে তো নতুন বউ আঁচলের ফাঁকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খামচে নয় যেখানে-সেখানে। আসলে দুটিতে আগে এরকমই ছিল। আজ রঙিনতায় উদ্ভটভাবে মুখোমুখির ফলে পীরিত আরো জমে উঠেছে।

কায়েম আন্দাজ করতে পারে।

ইজ্জত একটা আরশি কিনে এনেছিল সেটা আগে দেওয়ালে পেরেক সেঁটে টাঙিয়ে দিয়েছে। রান্নাঘরে ইজ্জতের যাওয়ার দরকার হয় নি। প্রয়োজন হলে বউমাকে ডেকেছে। রান্নাঘরে দাপাদাপি ঝনঝনানি—দুজনের খুনসুটি টের পেয়েছে। বাঁচোয়া। কাঁচা নতুন মেয়েটা ভয়ে লজ্জায় থাকত। বেশ দুটিতে হাসিখুশিতে আছে। বাপের ঘরে কান্না দেখে ইজ্জত ভয় পেয়েছে। কি করে সামলাবে। এখানেও কাঁদবে ভেবেছিল। তা তো নয়ই—দুজনের দেখা হতেই এমন ওড়াউড়ি খুনোখুনি-হাসাহাসি ভাব এনেছে যে ইজ্জতের সে মেঘ কেটে গেছে। নদী পেরোতে গিয়ে নৌকোর অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। জলে পা ডুবিয়ে ছেলেখেলা করেছে। এতটা পথ হেঁটে আসতে গিয়ে কখনো পানির কলে দাঁড়িয়েছে। বোনাই পেছন ফিরে কল টিপে দিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে দিয়েছে। একটা উড়নি গায়ে ছিল। নীল। চুমকি বসানো। সেটা বার বার খুলে ফেলছিল। ছোট বোনটার হাত ধরছিল কখনো-কখনো।

বাপের দিকে বেশিবার তাকানো যায় না। ছেলে বেজার এরকম ভাব প্রকাশ পেলে খারাপ দেখাবে। বাপের ইচ্ছের বিরোধী হতে চায় না। বরং ওদের দেখে মনে হয় মানিয়েছে বেশ। কেমন দুটিতে হাসিখুশিতে কাটাবে। আর বাপ ছেলে সারাদিন কাটাবে বাইরে-বাইরে। গরমকালে মাটি কাটার কাজ। বর্ষায় রোয়াবাঁধা—শীতে ধানকাটা ধানতোলা। মা মারা যাবার পর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘরের বউ হাফেজা দিনদুপুর গুজরান করবে একা। তাই দিনদুপুরে মোসলেমা এসে থাকতো সারাক্ষণ।

মোসলেমার আবার বিয়ে দেবে বলেছে তার বাপ।

মোসলেমার হাত থেকে রেহায় পেত না কায়েম। বিয়ের বন্দোবস্ত পাকা! না হয় দুজনে পালাবে। মা জানল বাপ জানল। বোনেরা এসে বোঝাল। আসলে মোসলেমা ছিল কায়েমের থেকে বয়েসে বড়। বন্ধক

ডেঙায় তাল খেজুরের পাতা কেটে-কেটে বেড়াত কায়েম। মোসলেমার চুলের গায়ের গন্ধে মন ভরল। পরে তো মনে হয় নি মোসলেমার গায়ের গন্ধে বয়েসের কোনো উনিশ-বিশ আছে। মোসলেমা তো তা জানত তবু কেন তার এ কথা মনে হত না যে কায়েমের কাছ থেকে তার তফাৎ থাকা উচিত। স্বামী মরে গেলেও মোসলেমা তো শুকিয়ে যায় নি। ফিসফাস আঁচলে চুলে গা থেকে ছড়িয়ে পড়া বুক কেমন করা গন্ধ টেনেছে।

হাফেজার গায়েও এই একই গন্ধ। সে বছরই জোর করে আজনগাছি নিয়ে গিয়ে দুধেল গাই-এর সন্ধানের নাম করে রাতেরবেলা হাফেজার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। বোনাই দুটো।

এখন পাত্র খুঁজছে মোসলেমার বাপ।

মোসলেমা চলতে গিয়ে চলে কি চলে না। পেছু ফিরবে কি এগিয়ে যাবে। চলতে গিয়ে পাছা দুলবে কি দুলবে না। কায়েম থ হয়ে এখনও তাকিয়ে থাকে। মনে হয় এখনই কাছে এগিয়ে আসতে পারে। তবে চলে যায়।

চারদিকে তাকিয়ে ঘোমটাটা কমিয়ে আনে অনেকটা সাবেরা। হাফেজা হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সাবেরা হাসল। ঝাঁপিয়ে পড়ল হাফেজা। টুকটুকে লাল শাড়িটা যেন খুলে নেবে। চুলোর কাছে এই গরমে এমন ঘোমটা দিয়ে থাকা যায় কি। 'হ্বালা তোকে কে দেখচে লো—বউ হয়ে মাথা কেটেচিস।'

'আহা তুই লতুনবেলা কি করেছিলি লা।'

'মুই অত মানিনি।'

'তোর কি এমনতর বে হয়েছিল ?'

'কেমনতর ?' হাফেজা সাবেরা কি উদ্দেশ করেছে ধরেও যাচাই করতে চায়।

'আহা জানিসনি ?'

'কি ?'

'এমন সেয়ানা ছেলের মা হয়ে এয়েচিস ?'

'মা নয় মাগ হয়ে এয়েচি।' হাফেজা গমকে-গমকে হাসে। পাগল হয়ে যাবে যেন। শুনে হাসবে না কাঁদবে। ছেলেকে লজ্জা করছে। নিজের শ্বশুরকে কি এমন লজ্জা করেছিল হাফেজা। না খিলবে ডায় যখন

থেকেছে শ্বশুরকে কচু দেখিয়েছে। লাজলজ্জা সামনাসামনি। চোখে ক্যাটকেটে না দেখায় এমন চলন-বলন না করলেই হল। তবে খিলবেড়া দিয়ে কপালে কুমকুম বোলানো, চোখে কাজলটানা—পায়ে আলতা বোলানো। শ্বশুরের চোখের সামনে মাথার কাপড় খসিয়ে কি চুলের বিনুনি দেখিয়েছে। একজন বউ-এর যতটুকু অনুভূতি তা পূর্ণতায় অনুভব করে নিয়েছে। সে তো এক স্বাদ। সাবেরার আলাদা অনুভব। সেয়ানা ছেলে যদি সামনে আসে তাহলে মরে যাবে। মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। ধূলোয় কণা-কণা হয়ে মিশে যেতে চাইবে। এ এক বড় সমস্যা। লুকিয়ে-চুরিয়ে যদি সাজে যদি মনে পড়ে যায় যোয়ান ছেলের মুখ বুঝি টিপটা গোল হবে না, কাজল টানতে লজ্জায় কেঁদে ফেলবে।

'মোর ভাতার তোর ছেলে মনে হলে কি [illegible]য়!'

'কি হয়?'

'মনে হয় যেন কাঁদি না হাসি।'

'তুই তো হাসবি, মোর না হয় কান্না পাবে।'

'আহা কান্নার মুখে ঝ্যাঁটা।'

হাফেজা যেন টগবগ করছে। ছাঁচতলায় ঘরের কানাচে বসে বিড়ি টানতে টানতে রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়ে যেতে দেখতে পায় কায়েম। ঝুপ ঝুপ করে কেমন সন্ধে নেমে আসছে। কিছু তারা কিছু জোনাকি কাছে দূরে এক হয়ে চোখের ঝাপসায় সামগ্রিক হয়। কিছু জোনাকি তারা নয় কিছু বিন্দু। খাটুনির শরীর এমন এক ঝিমমেরে আসে। জোনাকি খসে না তারা খসে ঝুর ঝুর ইন্দ্রিয়ের গ্রহণে যেটা সহজ সেটা-ই হালকা মনে নেয়। ভিজে গামছা ঘষড়ানি দেয়। হাই ওঠে। ছাগলগুলোকে রান্নাঘরে তুলল না হাফেজা। ডাকতেও কেমন লজ্জা হয়। সংমা রয়েছে। শেয়ালেরা ঝোপঝাড় থেকে কি মুখ বাড়ায় নি, জ্বলজ্বলে চোখে কি দেখতে পায় নি। টুঁটি টিপে নিয়ে যাবে এখুনি। অগত্যা নিজেই ছাগলদুটোর কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়। রান্নাঘরে হুটোপুটি পড়ে গেল। নতুন মা এমন লজ্জা পাবে জানলে যেত না। তার চেয়ে ছাগলদুটোর মরা ভালো ছিল। নতুন মা যে একেবারে ছেলেমানুষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো হাফেজার থেকে উনিশ বিশ। হাফেজা একটা গোঁত্তা দিল। নতুন মা রান্নাঘরের কোণে সেঁধিয়ে গেছে। হাফেজার খনখনে গড়িয়ে পড়া হাসি। মাকে আড়াল করবার দায়িত্ব। তার সঙ্গে একটা কিল বসিয়ে দিল

বেমালুম। 'যাও যাও তুমার কচি মা লজ্জা করছে।'

কোনো রা না কেড়ে ছায়ার মতো বেরিয়ে গেল কায়েম।

'ওলো তুই মরবি।'

সাবেরা কিল দেখায়।

'তোকে কুবু বেগানা মরদ ধরতে এল যেন।'

'যা!'

'অমন তরাস বুকে যদি তবে এলি কেন?'

'মুই চলে যাব।'

'ও আমার লজ্জাবতী লতা রে, ভাতার ধরলি, ভাতারের ঘর না করে চলে যাবি—ল্যাকা, মোর শউরের কোলের মাগ। শউরের মোর ওমর ফিরে এল। সত্যি মোর [illegible]কে দেখে কেউ বলবে যে তার এতবড় ছেলে আছে। তবু ছেলেকে মুখবোঁজা দেখে বলবে অনেক বয়েস হয়েছে। মোর বুনেরা কত ধরেছে বুনাই সিনিমা লিয়ে চল—হাটে মেলায় ঘুরব সখ আহ্লাদ যেন নেই। তুই কি মনে করিস মোর শউর বুড়ো হয়ে গেছে। তুই জানিসনি। মোর শউড়ি মরনয়ালি মরে গেছে, আল্লা তার ভালো করুক, শাউড়ির মনে ভাব ছিল কি। এমন টুকটুকে শাড়ি কিনে আনতো শউর মোর নিজের লজ্জা পেত।'

সাবেরা কড়ির মতো চোখ তুলে গিলতে থাকে।

'মোর শউরের বে হয়েছিল ষোল-সতের বয়েসে। মোর শাউড়ির তখন ন-দশ। আপন মামাতো খুপতো ভায়ে বিয়ে। মেয়ে বড় হতে শউরের ঘর কত্তে এয়েছিল মোর শাউড়ি। মোর ভাতার পেরথম বয়েসের ছেলে। তারপর দু মেয়ে। আর ছেলে মেয়ে না হতে তখন থিকে শউর খেপেছিল বে করবে বলে। শাউড়ি ছিল খাণ্ডাস,—শউরকে তালে রাখতো?'

হাফেজার কাছে সরে এসেছে সাবেরা।

'বউমা, বউমা।'

হাফেজা নেচেকুঁদে ওঠে। 'ওই যা ডাকে যে লো।'

সাবেরা জড়সড় হয়ে যায়।

'তোকেই ডাকে বুঝি সাবেরা।'

'না

'হ্যাঁ বুঝতে পারিনি আর। মোকে কেন ডাতবে।'

সাবেরা এতটুকু হয়ে যায়।

শস্তা আঁচলচাবি বাঁধা আছে সাবেরার আঁচলে। ঘোমটা দিয়ে ঝনাৎ করে পিঠে ফেলে দেয় সেটা। নাকের পাটা কুচকে যায়। সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘামের কণা টলমল করছে। মুহূর্তে সেগুলো ভাঙতে শুরু করে।

'বউমা বউমা তুমাদের মধ্যে একজন এস না।'

হাফেজা চোখ মটকায় 'দেখলি।'

সাবেরা কেঁপে যায়। তারপর ঠোঁপ টিপে সট করে বেরিয়ে পড়ে রান্নাঘর থেকে।

লোকটি উমরায় দাঁড়িয়ে।

ঘোমটার বহর দেখে ইজ্জত আলি নিজের বউকে চিনতে পারে।

'শুনচ।'

মুখের ভেতর থেকে অল্প শব্দ বেরোয় 'কি?'

'রাঁধাবাড়া বাকি আছে আর?'

'না।'

'ছাখোদিকি কত রাত হল—কুটুমমানুষ এখুনো খেলনি। তুমি কিছু খেয়েচ গা?'

নিরুত্তর সাবেরা।

'ঘরে তো কিছু খেলেনি—কেঁদেচ ঢের—ছাখোদিকি।'

একটা খেজুরচারার মতো গেঁথে গেছে ছাঁচতলায় সাবেরা। আড় ঘোমটার আড়ালে কোনো ছেলেমানুষ ভাবান্তর ঘটল কি তন্ন তন্ন করে খোঁজে ইজ্জত। সারা সকাল কেঁদেছে। এখন বউমাকে সাথি পেয়ে অনেকটা মনমারা ভাবটা কেটে গেছে। না হলে এমন করে ডাকতে পারত না। আর ডাকতেই যখন এসেছে তখন মেঘ কেটেই গেছে।

ঠোঁঠের কোণায় মাছির মতো তিল অসম্ভব তেলালো। কারো কারো খয়েরি হয়, এটা একেবারে মিশকালো। মানুষ যদি শূন্যতায় কারো অবয়ব কল্পনা করতে পারে তাহলে তার মনে ধরা কোনো চিহ্ন শূন্যতায় প্রথম রেখা আঁচড় কাটে। অত উঁচুতে খিরিশ ডাল কুড়ুল দিয়ে কাটতে কাটতে অনেকবারই নিচের দিকে তাকিয়েছে। বুঝি দেখতে পেল সে তিলটা। ঠোঁটের কোণে মিশকালো কাজুলের ফোঁটা। হয়তো সেটা অস্থিরতায় ছিটকে পড়া একফোঁটা কাজল।

বর্ষামাসের জ্বালুনের বড় অভাব তাসের পরিবারের। বড় হেঁসেল। নিজেরা কত্তাগিন্নি—চারছেলের বউ, তাদের ছেলেপুলে গোনাগাঁথা যাবে না। কেউ যায় স্কুল, কেউ কলেজ। ছেলেরা কেউ আপিস। কেউ ব্যবসা সামলায়। তাসের মিঞা পুরনো ব্যবসাটা দেখে। ধানকল। আর তার লাগোয়া মুদিখানা।

হাটুরে মেয়ে-মদ্দ আনাজ বিক্রি করে ফিরে এল। কায়েমের বাপ-ব্যাটার কোনো জমি-জমা নেই। নেই বর্ষার সঞ্চয়। তাসের মিঞা আছে। তার বাড়িতে সারাবছর কাজ। কায়েম আলি বাঁধা। বন্যায় ঘর গেল কিন্তু কাজ পেয়েছে ঢের। ভাঙা ঘর ছাড়ানো আর নতুন তৈরি করা। মাটি সমান করা। কে করতো দু-খানা ঘর, রান্নাঘর। বাপ কখনো বসে থাকে না। এখন আবার টিউকল তৈরির কাজে লেগেছে। পাঁই পাঁই পাইপ ঘোরায়।

চক্কর দেয় সারাক্ষণ। এই ছিল এই নেই। আবার কোথা থেকে চলে এল। বন্ধকডেঙার শুকো চৈত্রদিনে যেন আগুন ধরিয়ে দিলে। পায়ের তলায় শুকনো পাতা। পাতাঝরা ডালপালা শূন্যতায় রুক্ষ শুষ্ক বন্ধ্যা পাঁসুটে অথচ সজীব। কিছু হলদে পাখি রং দিয়ে যায়। আগুন দেবে কে? পলকা ডালে হাত বাড়িয়ে দেয় মোসলেমা। একটা অনুনয়ের ভাবে যেন খসে আসে হাতে শুকনো ডালপালা। আম খিরিশ বাঁশপাতা ঝাঁট দিয়ে জড়ো করে। এগুলো সব যাবে তাসের মিঞার বাড়ি। গ্রীষ্মকালে ধানের কাজে লাগবে। বন্যার পরে উচ্চফলনশীল ধান চাষ করে পুষিয়ে নিয়েছে। ধানের কাজ করতে অনেক জ্বালানি দরকার। ওই মোসলেমা কখনো কায়েমের সঙ্গে ধান ভানাতে যায়।

দুজনে তাসের পরিবারে বাঁধাধরা খাটে।

খিরিশ গাছ থেকে নেমে এসে খুঁজছে মোসলেমাকে। দূরে বাঁশঝাড়ে শুকনো কঞ্চি ছাড়াচ্ছে। আঁচল লুটোচ্ছে। বেদনায় হাত ওপরে তোলার মতো নিখুঁত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে। ডাকলে আঁচলটা ডাকবে কায়েমকে। কাছে গেলে আঁচল দুলিয়ে একটু হাওয়া করবে না কি মোসলেমা। শূন্যতায় সেই মিশকালো তিল অনুভব করেছে কায়েম।

পা বাড়িয়ে দিয়েছে।

মোসলেমা হা হা করে উঠল যেন। হাত উচিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করে। পেছন ফিরে কায়েম হাসে। হাফেজা দূরে বাঁশপাতা ঝাঁট দিচ্ছে। পাটা

ঘুরে গেল সেদিকে। অল্প এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দেখে মোসলেমাকে। হাত দুটো সেই শূন্যে। দেহলতায় ঝাঁপিয়ে পড়া আঁকড়ে ধরা ভঙ্গিতে স্থির নিষ্কম্প। একটু এগিয়ে যেতে হাফেজাকে একাকে দেখল না কায়েম। তার নতুন মাও দাঁড়িয়ে আছে। কায়েম পেছু ফিরবে ভাবল। নতুন মা শুকনো ঢেলা দিয়ে আমগাছে ছুঁড়ছে। আম পাড়ছে। কায়েমকে দেখে মুখে আঁচল চেপে শ্বেতশুভ্র হাসিটা চাপাচুপি দিয়ে মোটা শেকড় টপকে সট করে গাছের আড়ালে চলে গেল। হাফেজা সাবেরার এই লুকোচুরির মানেটা খুঁজতে ঘাড়টা বেঁকিয়ে কায়েমকে দেখল। কায়েম থতমত খেয়ে পেছন ফিরতে যাবে কি হাফেজা ঝাঁটা ফেলে দৌড়ে গেল।

কায়েম থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ।

'এই গাছ থিকে বুঝি নামলে গা।'

'হ্যাঁ।'

'একেবারে ঘেমে গেছ।' আঁচল দুলিয়ে হাওয়া করতে থাকে।

মোসলেমা বাঁশঝাড়ে সেই একই ভঙ্গিমায় স্থির। কায়েম সেদিকে আর তাকাবে না। মোসলেমার কাছে গেলে সেও এমন হাওয়া করত। এখন মনে হয় মোসলেমার অধিকার নেই। কি দরকার মোসলেমার কাছে দুর্বল হবার। মোসলেমার চুল আছে, যত্ন করে খোঁপা বাঁধে, বাঁধুক। হাফেজার কি চুল নেই! আর অন্যের মতো ভালো করে ঘুরিয়ে শাড়ি পরতে পারে মোসলেমা, পরুক। হাফেজাও তো পারে।

'আহা কি ঘেমে গেছ দ্যাখো।'

'এত গরমে ঝ্যাঁটা হাতে করেচিস।'

'অতে মোতে যুক্তি করে চলে এনু।' আমগাছের দিকে হাত বাড়ায় হাফেজা।

কায়েম দেখতে পায় রঙিন আঁচল। মুখটা কত না লাল।

কায়েম হাফেজার মুখে তিল খুঁজছে। ঠোঁটে নয়, থুতনিতে। খয়েরি, না লাল।

হয়তো আলতা কুমকুমের ছোঁয়া লেগে লাল হয়ে গেছে।

'ও বউ তোর থুতনিতে তিল কোথা থেকে এল?'

হাফেজা থুতনিতে হাত বোলায় 'তুমি আগে দ্যাখো নি?

'না।'

'তুমার চোখ কুথায় ছিল অ্যাঁ এতদিন?'

'সত্যি বলচি।'

'মোকে বুঝি ভালো করে ছাখো নি বোধহয়।'

'না তো।'

'কি উদাস মন ছাখো।'

সত্যি ছাখেনি কায়েম আলি।

অত সূক্ষ্ম শিল্পকর্মে চোখ দেবার চোখ থাকলে দিত। নাকটা বোচা কি শিম অত খেয়াল কোনোদিন করে নি। একটা আস্ত মেয়েমানুষের শরীর সে অনুভব করেছে, দেখেছে।, তার জন্যে সযতনে সূক্ষতায় এমন নিখুঁত কারুকাজ তার অজান্তে কি করে লুকিয়ে থাকে, লুকিয়ে রাখে। হাফেজা খল খল করে হাসে। তুমার মায়ের ঠোঁটে আছে। তিল নয় জরুল, কালো, চিংড়িমাছের চোখের মতো।'

'তাই বুঝি! তারপর আর কোনো প্রশ্ন করার নেই। হাফেজার জানাবার ছিল জানিয়েছে। কায়েম শুনেছে। আর থাকতে পারে কি কোনো কৌতূহল।

এক ঘুমের পর। রাত থাকতেই এমন করে অনেক সময় ঘুম ভেঙ্গে যায় প্রায় কায়েমের। এই গরমে পাশে কুর্তোবিহীন হাফেজা শুয়ে থাকে। ঘুমোয়। কায়েম হাফেজার থুতনিতে হাত দেয়। তিলের কোনো অবয়ব খুঁজে পায় কি না স্পর্শ করে। না। ঠিক কোন্‌খানটায়। অনবরত চুরি করে তন্ন তন্ন নিরাশ খোঁজে সে। হাফেজার ঠোঁট খুলে যায়। চোখের শীতল পাতা খুলে যায়। থুতনি ঝুলে যায়। ফিসফিসোয় 'আঁধারে কি তিল খুঁজে পাবে নাকি।'

কায়েম চোরের মতো হাত সরিয়ে নেয়। ভয় পায় যেন।

বিছানায় একটা হাসি গড়িয়ে গেল। 'মরণ ছাখো।'

কায়েম নিঃশব্দ নির্বাক। আসলে তিলের কোনো অবয়ব আছে কিনা দেখছিল সে।

'ওগো।'

'কি?'

'কি খুঁজছিলে?'

'হাত দিয়ে দেখছিনু।'

'কি?'

'তিল!'

'মরণ।'

'সত্যি।'

'পাগল।'

'যা বলবি তাই।'

হাফেজা নাকি নাকি সুরে ইনোয়।

কায়েম চুপ।

এই অন্ধকারে হাফেজার কোথায় কী সংস্থান ঠাওর করতে পারে না।

হাফেজা বলে 'শুনচ?'

'কি?'

'এই আঁধারে ভূতের মতো শুয়া যায়—কেরোচিন নেই, কাল লাইন দিয়ে একটু কেরোচিন এনো না।'

'আনব।'

ফাটাফুটি ছিটেবেড়ার দেওয়াল লোলচর্ম বুড়ির বলীরেখার মতো ভাংচুর স্বতঃচৌচির। বাপব্যাটায় ঘর বার দুই দেওয়ালে কাদা ধরাতে লেগেছে সকাল থেকে। কুঁচো খড় আর কিছু তুঁষ মেখেছে। ডোবার পাড় থেকে নরম মাটি এনেছে। বাপ এ কাজে ঘুনো। কায়েম এখনও অনেক কাজ বাপের কাছ থেকে শিখে নিতে পারে। ঘরের ভেতর থেকে কিছু জিনিস-পত্তর সরাতে হয়। যেমন দেওয়ালের তাক। রেহেল কোরাণ। দেওয়ালের গা ঘেঁষা সস্তার আলনাটাও। পেরেকে ঝোলানো আরশি। কয়েকটা ক্যালেণ্ডার। হাফেজা নিজেই ওগুলো বের করে এনেছিল।

সাবেরাকে আরো অনেককিছু বের করতে হয়েছে। একটা সাবেক কালের সিন্দুক আর একটা পোর্টমান। আর সব গিন্নির নিজের হাতের তৈজস টুকিটাকি। সাবেরা যে আয়নাটায় মুখ দেখে সেটা আবার একটু বড়। ডিবে, এতগুলো শিশি বোতল। বিছানা বালিশ সব। যা গরম পড়েছে, কাদা লেপা ঘরে কদিন আরামে ঘুমোনো যাবে।

কায়েম কাদা ছানতে ছানতে দেখল মাকে। এখন সামান্য লজ্জা কেটেছে। তবে কায়েমের চোখে চোখ ফেলেনি আজ পর্যন্ত। কায়েম ভাবল একফোঁটা মেয়েটা তার মা হয়ে গেল। মা হবার বয়েস না থাক মা হয়েছে।

কায়েম হাঁ হয়ে জঙ্গলটা খোঁজার চেষ্টা করে। ঠোঁটেই তো পেছন ফিরে বাঁকা হয়ে বসে আছে তার মা। সিন্দুকের ডালা সরিয়ে এটা ওটা

পরখ করে দেখছে। পেছন থেকে বাঁ পাশের ঠোঁটদুটো দেখা যায়। জরুলটা নেই তো। ডানঠোঁটে আছে নিশ্চয়। ওপর না নিচের ঠোঁটে ?

সাবেরা পেছন ফিরল। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় এটা সেটা ধাঁ করে গড়িয়ে উড়ে যাবার মতো সাবেরা রান্নাঘরের দিকে ছুটেছে। কায়েম থ।

সাবেরা পড়বে কি মরবে। হাফেজাকে দেখতে পেল না। চুলোর আগুন গায়ে মাখবে কি পুকুরে ঝাঁপ দেবে কি রান্নাঘরে লুটোপুটি খায়।

দেখল ছেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কী লজ্জা। টুকটুকে শাড়ির আঁচল খাবলা মেরে এক হ্যাঁচকায় টেনে দিল মাথায় তারপর তীরবেগে ছুটে এসেছে। নিজের মরদ সাবেরাকে এই অবস্থায় দেখেনি বারেক। এখন আরো অন্য কারণে লজ্জায় গায়ে আগুন মাখতে চায়। পুকুরে ঝাঁপ দিতে চায়। প্রথমে মাথায় কাপড় টেনেছিল। কুর্তো ছিল না সে খেয়াল করেছে কে। যাকে দেখে লজ্জা করে, তারই কাছে এমন উদোমপাদাম হলো। যাকে দেখে করি ডর, সে হয় বিয়ের বর। একী লজ্জার কথা একী লজ্জার কথা। কয়লা আঁচ পেয়ে যেমন লাল হতে থাকে তেমনি সাবেরা ঠোঁটে আঁচল কেটে শরীরের ভেতর সবকিছু নাড়াচাড়া করে হাসে।

হাফেজা ঘাট থেকে ফিরে এসে কিছু আঁচ করল সাবেরাকে দেখে। কিছু বলতে না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাফেজার ওপর সাবেরা। বগলের নিচে নরম মাংসে নখ চালাল। দাঁত দিয়ে যেন কামড়ে কুমড়ে নেবে হাফেজাকে। হাফেজা চেঁচিয়ে উঠল 'কী করিস লো মাগী ?'

সাবেরা ছেড়ে দিল।

বুকে হাত বুলোতে থাকে হাফেজা। দুটো নখের দাগ লাল হয়ে আছে। 'কি করলি দেখেছিস।'

সাবেরা একদলা থুতু নিয়ে নখ বসানো জায়গাটায় লেপে দেয় 'ঠিক হয়েছে।'

'কেন লো কি হয়েছে ?'

'তোর ভাতার কেন মোকে অমন করে দেখে ?'

'দেখেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে কি হয়েছে ?'

'মোকে লজ্জা করে নি লা।'

'তোর তো ছেলে লো।'

'না মোর লজ্জা করে।'

'ছেনালি।'

'মোর জমিনের সঙ্গে মিশে যেতে লাগে।'

'ঢং।' হাফেজা রাগ দেখাল। পাছাঘোরা দিয়ে নাক মুখ বাঁকিয়ে এটায় ওটায় হাত দেয়। রান্না ঘরে দুটো চুলো। হাফেজা একটায় রান্না করে অন্যটায় সাবেরা। দুটো হাঁড়ি। আলাদা খায় বাপব্যাটা। সংসারের হাঁড়িকুড়ি হাতাখুন্তি সব যা ছিল ভাগ করে নিয়েছে। এটা ওর নেই তো ও চেয়ে নেয় এর কাছ থেকে। এক ঘরে দুটো মেয়েমানুষ – দুজনেই দুই গিন্নি হওয়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে। এই আলাদা হওয়াটা কোথায় রইল তাহলে। বাপব্যাটা কাজে চলে যায়। হাফেজা কখনো সাবেরার ঘরে দোকলা হয়ে গল্পসল্পে কাটায়। মেয়েছেলের পেটে কথা ফুটে না বলতে পারলে গা জ্বালা করে। দুজনে ভুটভুট করে। বিয়ের আগে দুটিতে যেমন ছিল তেমনই আছে। বাপব্যাটার অনুপস্থিতে দুজনে যেন প্রাণ ফিরে যায়। সাবেরা যায় হাফেজার ঘরে। সেখানে অনেক কথা। অনেক হাসি।

সন্ধেবেলা অন্ধকারে গায়ে গা ঠেশে উসরায় বসে থাকে দুজনে। বাপ-ব্যাটা আগে-পিছু আসে কেউ কেউ। বাপ এলে সাবেরাকে উঠতে হয়। ব্যাটা এলে হাফেজাকে। দুজনে বেশ কাটায়। এক এক সময় সাবেরার সতীনের ছেলে ওদের মধ্যে এসে সব গোলমাল করে দেয়। এ এক ঝামেলা। তখন হাফেজার ওর এক হাত নিয়ে নেয়। অন্যদিন হাসাহাসি করে এ নিয়ে। সইকে রাগায়। আজ হাফেজা নখের আঁচড় খেয়ে রাগ দেখিয়েছে। হাফেজার মধ্যেও এ নিয়ে পরিবর্তন দেখা দেয়। ভাবায়। বেশ ঝামেলা। হাফেজা রাগ করেছে সাবেরা বুঝতে পারে! ছেলেমানুষের মতো শিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'হাফেজা তুই রাগ করেচিস লয়?'

না তাকিয়েই জবাব দেয় হাফেজা 'না।'

'মুই দেখবি মরে যাব। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলব।'

হাফেজা শিউরে ওঠে। সাবেরার রাগ না হোক অভিমানটা তার চেয়ে বেশি হয়ে তাকে ছাড়িয়ে গেল।

হাফেজার রাগ যায় ধুয়ে মুছে। পেছন থেকে কোমরটা জড়িয়ে ধরে 'সইলো তোকে লিয়ে মুইও মরি।'

সাবেরা হাত ঝনকা মারে 'যা!'

'কেন লো ?'

'মোর ভালো লাগছেনি ।'

'বাপের ঘরে যাবি ?'

'না ।'

'তবে ?'

'দুচোখ যিদিকে যায় চলে যেতে মন হয় ।'

'মন এমন উড়ু উড়ু ?'

'হ্যাঁ ।'

'মোকে ছেড়ে থাকতে পারবি ?'

সাবেরা চমকায় যেন। তাইতো হাফেজা তার জানের জান তাকে ছেড়ে কোথায় যাবে সে। হাফেজা যদি রাজি হয় দুজনে দোজখেও যেতে পারে। রাগ অভিমান ভালো না লাগা বোধটা ধুয়ে মুছে যায় পলকে। ফিক করে হেসে ফেলে। হাফেজার গলা জড়িয়ে চুমু খায়। হাফেজা সাবেরারও। দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। হাফেজার কাছে সাবেরার কোনো শরম নেই।

রশিদের মা ছুটে এসেছে। 'কই লো তুরা অত ঢলাঢলি করিস কি লেগে ?'

সাবেরা বেরিয়ে আসে 'মোরা কত কথা কইচি গো বুবু।'

রশিদের মা নাক কুঁচকে চালের বাতা ধরে দাঁড়িয়ে। 'আহা কচি বয়েসের বউ কত কথাই কইবি।'

উসরায় পিঁড়ি এনে দেয় হাফেজা। 'চাচি বসো গো।'

'না না বসবনি মোর কত কাজ পড়ে রইচে।—হ্যালা কায়েমের মাগ তোর নতুন শাউড়িকে মা বলিস তো !'

হাফেজা হেসে গড়িয়ে পড়ে 'চাচি কি বলে ছাখো।'

'ছেনাল বউ হাসিস ক্যানো অত, রং ঢং-এর মেয়ে রং ঢং-এর লোকের কাছে রং ঢং করবি—সিনিমা করবি বাইস্কোপ করবি।—ও কায়েম আলির মা।'—.

সাবেরা চমকে ওঠে। নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাফেজা আঁচলচাপা হাসি হাসছে।

রশিদের মা আবার বলে 'সোয়ামী বুকে বাঁ-পা ঘষে দিলেও সুখ। সোয়ামী যার পথে ঘাটে কাটা হয়ে মরে যায় সে বুঝে কি চীজ। কেউ দেখবেনি—আপন ব্যাটা মুখে মুতে দিবে। সোয়ামীর থাকে তো আঁচলে

বেঁধে খাই।'

গন্ধ পেয়ে আন্নুনানি এসেছে। 'ইজ্জতের মাগ পরিষ্কার হয়েছে। যেমন রূপ তেমন গুণ। শুধু মোর ভাগ্যেই খাণ্ডাস বউ জুটল। যেন মোকে শুচে খুঁচে খেয়ে লেয় গো।'

'আর তুমিও তার পিছু লাগো মামি।' রশিদের মা মুখ বাঁকায়।

'যা যা তোদের আজকেলের বউদের এক কথা। মোর বয়েসকালের শউর শাউড়ির পাল্লায় পড়ত তাহলে বুঝত। একটু বে-কন্টল চললে বুকে শিল চাপা দিয়ে ফেলে রাখতো। হ্যাঁ হ্যাঁ আজে খাঁয়ের বেটিকে তো জানোনি—মোকে কম জ্বাইলেচে মোর শাউড়ি।'

সাবেরা আর একটা পিঁড়ি এগিয়ে দেয়।

'এই কি সোন্দর বউ ছাখো দিকি। ছেলে ছেলের বউ মরদ লিয়ে কেমন মানিয়ে গুনিয়ে আছে ছাখো দিকি। পুরুষমানুষের আবার কি বয়েস—তকদিরকে কে মানে বলতো।'

'কই গো ইদিকে একবার এসো না।'

ইজ্জত আলি ফিরেছে।

ইজ্জত আলি কখন ফিরেছে কেউ অত লক্ষ করেনি।

রশিদের মা মাথায় কাপড় তুলে দেয়। 'যা লো বুবু, মরদ ডাকছে।'

সাবেরা হাফেজার দিকে একবার তাকায়। হাফেজা রান্না ঘরে সেঁধিয়ে গেল। সাবেরা মাথায় ঘোমটা দিয়ে আঁচল সামলে ঠোঁট টিপে এগিয়ে যায়। সোয়ামী হাট থেকে এত সামিগিরি এনেছে দেখে চক্ষু চড়কগাছ। মনে হয় যেন এখনই নেচে উঠবে। নতুন শাড়ি কুর্তো সায়া আরো অনেককিছু। বাসতেল কাঁখুই সাবান অনেককিছু। সাবেরা শুধোয় 'কেরোচিন আনোনি?'

'পাইনি।'

'কুন্ দিকের ঠোঁটে জরুলটা আছে গো বউ, নিচের ঠোঁটে না ওপরে? বাঁয়ে না ডাইনে?'

'কে সাবেরার?'

'হুঁ।'

'ডানদিকের ওপরের ঠোঁটে।'

তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা। 'কেন বলতো?' হাফেজা প্রশ্ন করে।

'এমনি।'

অন্ধকারে বুঝি চোখ জ্বল জ্বল করে হাফেজার।

কায়েম হাফেজার বুকে মুখ গুঁজে দেয়। ধীরে তর্জনিটা চিবুকের কাছে নিয়ে যায়।

তিলটার অবয়ব স্পর্শ করার নেশায় পায় যেন।

হাফেজা বলে 'কী খুঁজছো?'

'তিল।'

'হাতে লাগবেনি। ই তো জরুল নয়।'

'জরুল হাতে লাগে বুঝি?'

'হুঁ।'

স্পর্শ না করুক অন্ধকার না থাকলে তবু তিলটা দেখতে পেত হাফেজার। ঘরে আলো নেই এ এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। বাজারেও কেরোসিন নেই। ঘরে দম বন্ধ হওয়া অন্ধকার। গাছেরা চাকা চাকা অন্ধকারে নিঃসীম জড়াজড়িতে কাটায়। ব্যাঙ মেঘ ডাকে। ঝিঁ ঝিঁ রা ডেকেই চলেছে। কায়েম হাফেজার তন্দ্রায় রঙিন সুতোয় আঁকাবাঁকা কারুকাজের সংগে স্পর্শিত হয়। কোথায় কোন্‌খানে ফাঁক রয়ে গেল বুঝি। তর্জনি দিয়ে তিল খুঁজে ফেরে। সেখানে এক সৌন্দর্য আছে ঠোঁটের স্পর্শে যদি পাওয়া যায়।

বাপব্যাটা আজ দুপুর দুপুর ফিরে পড়েছে।

দুজনেই চান করে এল।

সাবেরা খেতে দেয় ইজ্জতকে। হাফেজা কায়েমকে।

ইজ্জত ভাত-ঘুমের জন্যে বিছানায় আড় হল। সাবেরা রান্নাঘর গুছোচ্ছে তখন। এই সময় সাবেরার যত কাজ এসে পড়ল। ইজ্জত চোখ বুঁজেই পাশের ঘরের উদ্দেশে বলে 'একঘন্টা বাদে নিদ থিকে তুলে দিস বাবা কায়েম আলি।'

কায়েম হাঁকে 'ঠিক আছে।'

'বেলাবেলি যাব।'

'আচ্ছা।'

এ ঘর থেকে ও ঘর কথাবার্তা হয়।

হাফেজা চোখ বড় করে 'কুথা যাবে অ্যাঁ।'

'বাক্সির হাট, লাইন দিয়ে কেরোসিন আনতে।'

'তুমার শউরবাড়ি একবার ঘুরে এস না, মনবোধের ছেলেপুলে হল কি খপর এনো না। বলবে বুনের বুন একবার খপর লিলনি।'

কায়েম চুপ করে থাকে।

হাফেজা বায়না করে 'যাবেগা ?'

'আগে কেরোসিন পাই।'

'কেরোচিন তুমার চুলোয় যাক।'

'রাতে আঁধার লাগেনি ?'

'লাগে। যাবে তো ?'

কায়েম থুতনির তিলটা দেখার চেষ্টা করে। হাফেজা তা বুঝতে পেরে চালাকি করে আঁচল চাপা দেয়। 'ভারি আবদার।'

'না দেখাস রাতেরবেলা দেখব। আজ কেরোসিন আনছি।'

'পাগলামি ছাড়ো তো—যাবে কি না বল।'

'যাব।'

হাফেজা যেন বাঁচল।

রোদ পড়তে বাপব্যাটা কখন বেরিয়ে গেছে।

রান্নাবান্না সেরে বাকুলে তেলাই পেতে দুই সই-এ কত কথা বলে তার হিসেব নেই।

হাফেজা বলে 'আজ বাপ ব্যাটার সুবুদ্ধি দিয়েছে—তেল আনতে গেছে। রেতের বেলা কুকাব আঁধার ভালো লাগে নাকি ?'

সাবেরা বলে 'আঁধার হয়েচে ভালো হয়েছে। আঁধারই ভালো।'

'আঁধারে তোর ব্যাটা মুখ দেখতে পায়নি হাত বুলিয়ে দেখে।'

'যা বেশরম মেয়ে।'

'তোর ?'

সাবেরা পায় তো হাফেজাকে খেয়ে নেয়।

'সাবেরা তোর মনে পড়ে কোলাঘাট গেছনু দুজনে চাল লিয়ে ?'

'খুব।'

হাফেজা হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। 'চালপটির হোসেন তোর হাতটা ধরে ফেলেছিল খপ্ করে।'

'হ্যাঁ লো মোরটাই দেখলি, আর তোর। তোকে সেই কালোপানা ছোঁড়াটা চোখ মেরেছিল বলে গাল দিয়েছিলি কত মনে নেই বুঝি ?'

'যা।'

'আর বলব ?' সাবেরা সুযোগ পেয়েছে হাফেজাকে ক্ষেপাতে।

'ভালো হবেনি কিন্তুন।'

'এবের, সাবেরাকে তো চিনিস।'

'চিনবনি ফের।'

'তবে লাগিস কেন ? মোর মনটাকে কষ্ট দিস।'

হাফেজা সাবেরার কাছে আরো সরে যায়। 'কী কষ্ট পাস ?'

'শুধু ঠাট্টা করিস—মোর কি পালাই পালাই মন হয়নি—তোর ভাতার মোর ব্যাটা এ জেবন রাখব কুথা।'

'রাগ করেচিস সাবেরা।' পিঠে হাত দেয় তার।

'যা।' হাতটা সরিয়ে মুখ ঘোরায়।

হাফেজা যেন বুকের সঙ্গে মিশে যায় সাবেরার। 'ও সাবেরা অমা বাপব্যাটা যা সম্পক্ক হয় হোক, তুই আমি দুই সই। কি বল ?'

হাফেজার মুখ পেলে যেন সাবেরা আর কিছু চায় না। আসলে দুজনে একবিন্দুতে মিলিত হলেও কোথায় যেন বিচ্যুতি ঘটে কখনো সখনো। তখন কি আর কষ্ট পায় না সাবেরা। একবার একবার সই সই খেলা। ফের শাশুড়ি বউ-এর সম্পর্ক। এমন ছলনা সহ্য হয়। কী ঝামেলায় যে ফেলেছে। ভেবেছিল হাফেজার কাছে দুটো মনের কথা বলে জান ঠাণ্ডা করবে। দ্বিগুণ জ্বলে। তারপর হাসি ঠাট্টায় সব ভুলে যায়।

এই আঁধারে কে বলবে দুই শাশুড়ি পুত্রবধূ বসে আছে। দুই সই।

দুজনে অন্তরঙ্গ বসে ঘামাচি মারে।

রাত বাড়ে। বাপব্যাটা এখনও ফেরে না।

দুজনে খেয়ে দেয়ে টিকতে পারল না ঘরের ভেতর যা গরম। আর যা দম ফাটা আঁধার। আঁধার তো পোকার সার। কিলবিল করে ঘুরছে ফিরছে।

সাবেরা শূন্য আকাশের নিচে চিৎ হয়।

হাফেজা বলে 'এখুনো এলুনি।'

'ততখান গা ঠেণ্ডা করি।'

'আজ আর এসবেনি, মোর বাপের ঘরে যেতে বলেচি, ওই তো বাক্সির হাট থিকে দু-পাউড়ির পথ। মোর বাপ এসতে দিবে নাকি ?'

'মুইও যেতে বলে দিয়েচি।'

'তালে কেউই এসবেনি।'

'গা ঠেণ্ডা করি।'

একটু আলো নেই। অন্ধকার হাতড়ে খাওয়া দাওয়া সেরেছে। পোকা খেল কি ছাই খেল। বমি বমি লাগে।

আকাশের তলায় দুজনে শুয়ে থাকে চুপচাপ। কখনও কথা বলে কি বলে না। কথা বলার কোনো প্রয়োজন বোধও করে না। গা ছুঁয়ে থাকে দুজনে দুজনের। দুটো মেয়েমানুষ আকাশের তলায় আঁধারে শুয়ে আছে নিশ্চুপ। চারদিকে প্যাঁচানো অন্ধকার, গাছগাছালিতে শানানো দাঁত নিয়ে ইড়িশবিড়িশ কাটে। শুয়ে পড়লে দিক্‌নির্ণয় করতে বিভ্রম লাগে। যেদিকটা রান্নাঘর ভাবে অথচ সেদিকে রান্নাঘর নেই শোবার ঘর। তন্দ্রা জড়ালে আরো কত ভুল হয়। তন্দ্রায় সাবেরার ভুলে সাবেরা চমকায়। মানুষ এমন ধেয়ানেও ছবি দেখে নাকি। কত উদ্ভট ছায়াচিত্র পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তাকে কাটাছেঁড়া করে।

কত রাত হল কে জানে। অনেক হয়েছে। রাতের পাখি সুদীর্ঘ সময় নিয়ে ডেকে যায়। হাফেজার হাই ওঠে। সাবেরা ঘুমোতে পারে খুব। পড়লেই ঘুম। আঃ মরণ কেমন চিৎ হয়ে যোয়ান মেয়েটা অঘোরে ঘুমোয় ছাখো। কেউ যদি তুলে নিয়ে যায় দোলায় দুলতে দুলতে যেন চলে যাবে।

হাফেজার হাই ওঠে। চোখ ছোট হতে থাকে।

গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আর বাইরে থাকা যায় না। চোখ জড়িয়ে রয়েছে ঘুমে। শূন্যে না মাটিতে শুয়ে আছে আন্দাজ করে। নাড়া দেয় সাবেরাকে। জোরে নাড়া দিতে চমকে উঠে পড়ে সাবেরা। মুখে হাত দিয়ে বুঝতে পারে সাবেরা এমন ঘুমিয়েছে গালে লালা গড়িয়ে গেছে।

উঠে বসে ফের ঝিমোতে থাকে। হাফেজার তন্দ্রাটাও কেমন ঘোরতর অবাস্তব। সাবেরাকে নাড়া দিয়ে জাগায়। 'ও সই ঘরকে চ।'

সাবেরা 'উ' করে, তারপর ফের ঝুঁকতে থাকে।

'ওই সই ঘরকে যেয়ে নিদ যাবি।'

সাবেরাকে তুলে দাঁড় করায়। সাবেরা ঘুম থেকে উঠে নিশি পাওয়া মেয়েমানুষের মতো তড়বড় পা ফেলে চলেছে। ঘুম পেয়েছে খুব তাই তড়বড়িয়ে চলে গেল হাফেজাকেই ফেলে। হাফেজার অন্ধকারে চোখ জ্বলে না। এদিক না ওদিকটা। কোন্‌টা তার ঘর। দুছাই আলোও নেই। তন্দ্রায় বিরক্তি বোধও করে। এদিক না ওদিক। এদিকেই। ঘরে ঢুকে ভুল হয় সাবেরা সে বিছানায় শুয়ে আছে। তারই ভুল। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে পাশের

ঘরে বিছানা হাতড়ে শুয়ে পড়ে হাফেজা। শুলে কি আর জ্ঞান থাকে নাকি, নিঃসাড় অতল ঘুম।

দুটো ছায়া অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে ফেরে। বাপ আর ব্যাটার হাতে কেরোসিনের টিন। কেরোসিনের লাইন এত বড় হয় যে কোনোদিন দেখেনি কায়েম। তারপর ওখান থেকে শ্বশুরবাড়ি। বাপ ব্যাটার শ্বশুর-বাড়ি এক। বাপও গেল। ওখানে খাওয়া দাওয়া করল বলে ফিরতে এত রাত।

পাশাপাশি ফিরছিল। বাকুলে ঢুকে যে যার ঘরে চলে গেল।

অন্ধকারে কে খুঁজবে কুপি, কে জ্বালাবে আলো। হাফেজা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

কায়েম শুয়ে পড়ে।

ঘরে চাকা চাকা অন্ধকার। জোনাকিরা এসে উপহাস করে যায়। কায়েমের তন্দ্রায় বরফ জমে।

হাফেজার হাত এসে পড়েছে কায়েমের বুকে। ধীরে ধীরে সে শিহরণ নিঃশব্দে রসায়ন বিক্রিয়ার মতো দানা বাঁধে। কায়েম আবেশে হাফেজার বুকে মুখ লুকোয়। হাফেজা ঘুমোয় অথচ সাড়া দেয়। কায়েম কি ঘুমোয় না। ঘুম নয় ঠিক ঘুমের আমেজ। অথচ তৃপ্ততায় পূর্ণতায় এগিয়ে যাচ্ছে। অপেক্ষায় সাড়া পেয়ে এমন যত্নে এগিয়ে যায় যার বিকল্প নেই। অথচ হাফেজা ঘুমোয়। হাফেজা ঘুমোয় তো কিছু এসে যায় না। কায়েমের তন্দ্রায় উজ্জ্বল রং-বে-রং স্ফটিক ঠুং ঠাং বেজে চলুক। শূন্যতায় আঁধারে সেই হাফেজার তিলের স্পর্শ পেতে চায়। কোনো অবয়ব নেই অথচ স্পর্শ পাবার তর্জনি ইচ্ছায় ঘোরাফেরা করে। এই চোখ। মুখ। কপাল। চিবুক। ঠোঁট। ঠোঁট। ঠোঁট। ঠোঁট। হাত অসাড় হয়ে যায়। ঠোঁটে কি না থুতনিতে? স্পর্শ পাওয়া যায় না। হয়তো ঠোঁটেই। তাই কি। মাথায় সব গোলমাল ঠেকে। ঠোঁটে তো নয়, থুতনিতে। তবে ঠোঁটে কেন? ভালো করে পরখ করে। ঠোঁটের উপকণ্ঠে কোনো অবয়ব তর্জনিতে ঠেকেছে। জরুল। আশ্চর্য। ঠোঁটের বাঁদিকে না ডানদিকে। দিক নির্ণয় করতে তন্দ্রা গেল ছিঁড়ে। ডানদিকেই। ঠোঁটের ডান দিকের জরুলটা সাপ ছোঁয়ার মতো ছুঁয়ে দেয়। একেবারে নিঃসাড় হয়ে যায়। এক মুহূর্ত বুকের ধুকপুকুনি শোনে। তারপর লাফ মেরে মেঝেয় নেমে আসে।

হাতে মাছকাটা কাটারি হাতড়ায়।

ঘরের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

মেঝেতে মাথায় হাত দিয়ে আঁধারে বসে পড়ে কায়েম।

অন্য ঘরেও তো সেই একই অন্ধকার আছে।

কায়েম ঝিমমেরে বসে থাকে। কত সময় চলে যাচ্ছে চুপি চুপি। কাটারি পায় না। ঘরের ভেতর ভূতের মতো নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। এটায় হাত দেয় ওটায় হাত দেয়। নেই। গা জ্বলে যায়। সারা শরীরের ভেতর বার বার জ্বলে গেল। ছটফট করে সে। ঘরে চাকা চাকা অন্ধকার। কিলবিল করছে। চারদিকে তার চোখ। গা জ্বলে গেল গা জ্বলে গেল। কেরোসিনের টিন উপুড় করে গায়ে ঢেলে দিল! আহ্ কি ঠাণ্ডা। সময়গুলো কেমন ঝুর ঝুর গুঁড়ো হয়ে ঝরে যাচ্ছে। এই আঁধারে চোখ বড় জ্বালা করে। দেশলাই কোথায় রাখল। এই সময় সব ভুলভাল হয়ে যায়। জাকুল তিল তিল জাকুল। তিলের কোনো অবয়ব থাকে না। জাকুলকে ছোঁয়া যায়। গা জ্বালা করে। কেরোসিনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত গায়ে ঢেলে দেয়। ভূতের মতো বেরিয়ে এসেছে বাইরে। রান্নাঘর। দেশলাই। অন্ধকার। চোখের শত্রু। আগুন চোখের আরাম। শীতলতা। গা জ্বলে যায়। জ্বলে গেল।

সে একা নয় রান্নাঘরে তারও আগে কোনো ভূত দেশলাই খুঁজছে। দাঁত নখ ভাঙা সিংহের মতো দেওয়ালে আর কত আঁচড় কামড় দেবে।

গুম মেরে অন্ধকারে বসে থাকে দুজন পশু। তাদেরও চোখে জল আসে।

মানিক চক্রবর্তী রুদ্ধ সংবাদ

রমেশ এখুনি মরবে, অশোক জেনে গেল।

অশোক সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামার সময় দেখল, বাথরুম থেকে ওর দাদা রমেশ লাঠিতে ভর দিয়ে বেরুচ্ছে। একটা কাঠের টুকরো না কি, তাতে ঠোক্কর লেগে দাদা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। বাস হয়ে গেল—। অশোক দরজা দিয়ে বেরুবার সময় ধুপ্ করে পড়ার সেই শব্দটা, তারপর আর কিছু জানে না। জিরো আওয়ারের মতো টানা পাঁচিলটা পেরুল। গলিতে পা দিয়ে একটা ট্যাক্সি চলে যাবার শব্দে বাকিটা গুলিয়ে ফেলল। গলি দিয়ে সোজা কিছুটা গেল। রঞ্জুর চায়ের দোকানে ঢুকে বসল।

সকাল সাড়ে আটটাও হয় নি। লম্বা টুলটায় বসে, চোখ বুজে পলকের জন্য একবার তার দাদা রমেশের মৃতদেহটার কথা মনে করল। থার্ড স্ট্রোক, এবং মৃত্যু। প্রথমটা গোপির বউ স্বপ্না রান্নাঘর থেকে প্রায় ছুটে আসবে। গোপি নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠে বিছানার ওপর বসে আছে। হারামজাদা আবার চা পেটে না পড়লে একটা কথাও বলে না। স্বপ্না আঁতকে উঠে গোপিকে ডাকবে, অথবা কি করবে ছাই কে জানে—মেয়েটা নিজেও তো ছ-সাত মাসের পোয়াতি। মোটে জোরে কথাই বলতে পারে না! চিঁ চিঁ করে সারা বাড়িময় ডেকে বেড়ায়।

দু-এক সেকেণ্ড থেকে গেলেই হত। ইচ্ছে করে অশোক থেকে গেল না।

রঞ্জু চায়ের গ্লাসটা নামিয়ে দেবার ঠিক আগে অশোক বাইরে বেরোল, আর পেছনের দেয়ালে ভীষণভাবে মুতে এল। তারপর ভাবল, দোকানে বসেও শান্তি নেই। গোপি এখুনি খবর দিল বলে। গোপি জানে, এটা অশোকের অনেকদিনকার ঠেক। হাফ-প্যান্ট পরা গোপি আগে কতবার রঞ্জুর দোকানটায় এসে অশোকের কাছে চার আনার জন্যে হাত পেতেছে, সেই গোপি। গোপি আজ কেমন বাবু। চেহারাটা সেই চোয়াড়ে-ই আছে, কিন্তু জেল্লা বেড়েছে বিস্তর। ব্ল্যাক মানির পয়সা, শালা। দেখ্-দেখ্ করে

একেবারে অনেকখানি ওপরের টঙয়ে গিয়ে বসে পড়েছে গোপি। নীল প্যাকেটের বিদেশী, লম্বা সিগারেটগুলো খায়। নিজের ঘরটায় কার্পেট-পেতে, সোফা সাজিয়ে, টি, ভি, ফ্রিজ, এবং ডিভান-টিভান পেতে এলাহী কাণ্ড। সঞ্চয়িনী না কি যেন সব হালে গজিয়েছে, মানি মাল্টিপ্লেকেশান স্কিম, তারই একটার রাতারাতি ম্যানেজার-ট্যানেজার গোছের হয়ে বসেছে ঐ গোপি। কি করে হল, কোথায় ধান্দা করল, ভগবান জানে। কিন্তু হল তো? এখন নাকি শোনা যায়, ও ইচ্ছে করলে নিজের একটা গাড়িও কিনতে পারে। শুধু ইনকাম ট্যাক্সের ভয়ে কিনছে না। কোম্পানির গাড়ি, তেল খরচা নিজে দিচ্ছে—মাঝে-মাঝে চড়ে বেড়ায়, মাঝে-মাঝে অফিসেও বেরোয়। অথচ অশোক সেই যে কাঁধে ভুত চাপার মতো ব্যাটারির বিজনেস দিয়ে কি একটা শুরু করল, শালা তার না হয় এদিক, না ওদিক—। নেহাত বাড়িটা পৈতৃক বলে রক্ষে, নইলে দোতলার অমন বড় ঘরে অশোক যেভাবে ব্যাটারির বাক্স আর র-মেটিরিয়ালগুলো রাখে, ঘরটার দেয়ালে শুধু কালির ছিটে-ছিটে দাগ, এককোণে একটা নড়বড়ে সেই ক্লাইভ আমলের তক্তপোষ, চিটে ধরা বালিস-বিছানা, ভাড়াটে বাড়ি হলে বাড়িঅলা টান মেরে সব রাস্তায় ফেলে দিত। আসলে অশোক যেন গত পনেরো-ষোল বছর ধরে এক জায়গাতেই কেমন আটকে রইল, আর বাড়ে নি। এদিকে চারপাশের সব কিছু চড়চড় করে বেড়ে গেছে, চোখের সামনে অদ্ভুত কেমন পাল্টে গেছে, অশোককে যেন আর ওরা মানুষ বলেই জ্ঞান করছে না—এরকম ভাব।

নিচু হলে রঞ্জুর দোকানের কালো টিনের চাল টপকে ট্রামের তার দেখা যায়। অথচ রাস্তাটা দেখা যায় না, অদ্ভুত! অশোক এক মুহূর্ত নিচু হয়ে আরো দেখে নিল, আকাশটা সুবিধের না। বৃষ্টি নামবে শালা। শ্মশানে ভোগাবে আজ। চায়ের গ্লাসটাও কখন টুকটুক করে শেষ হয়ে গেছে। মনের ভেতরটা এখন কিছুতেই কেমন যেন ছাড়িয়ে, বড় হতে পারছে না—। সকালবেলা চা-টা খাবার সময়টা অন্তত, সেই বেলা দশটা, সাড়ে দশটা অবধি বেশ কিছুটা হাল্কা-হাল্কাই তো অশোকের লাগে—গত কুড়ি-বাইশ বছরই তো লেগে আসছে, অন্তত যখন থেকে এই রঞ্জুর চায়ের দোকানে সকালবেলাটা ঘণ্টাখানেক বসা, প্রায় একরকম চুপচাপই কেটে যায় ও সময়টা; কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে রঞ্জুই একটু যা গল্প করে, তাছাড়া আর যারা পুরনো, বহু পুরনো সব বন্ধুবান্ধব, কেউ এখন আর বড় একটা এই দোকানে বসে না। নতুন কোনো চ্যাংড়া, উঠতি দলও, যেমন পাড়ার

গোপি-টোপিদের বন্ধুবান্ধব, জুনিয়ার ব্যাচ এবং তার চেয়েও জুনিয়ার ব্যাচটাও কেউ নিয়ম করে কিছু এখানে মোটে আড্ডা মারে-না। ভাবতে গেলে রঞ্জুর দোকানটাও কেমন যেন, এক ফোঁটা শ্রীবৃদ্ধি কিছু তো ঘটেই নি, বরং আরো সেই ঝুল পড়েছে, কালির পর কালি—বাঁশ দিয়ে খাটানো সেই কোন আমলে আলকাতরা দেয়া টিনের চাল, সেই উল্টোদিকে বিপিনবাবুর কয়লার দোকানটা, পচাদের মুদি দোকান, কুণ্ডুদের বাড়ির রোয়াক—আজীবন বন্ধ—ওদের নিচের দিককার দুটো জানালা। যেন বেছে-বেছে এই জায়গাতেই অশোক তার সকালবেলাকার খোয়ারি ভাঙে।

আরিব্বাস! দূর থেকে ওটা কে? গোপি আসছে না? গোপি আসছে। গোপিই তো। অশোক একবার রঞ্জুর দোকানের ভেতরে অন্ধকারটা এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঠাওর করবার চেষ্টা করল। গুটি চার-পাঁচেক লোক ভেতরে, সবাই চেনা—। গোপি আরো খানিকটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে, এখনো প্রায় গজ ত্রিশেক দূরে। রঞ্জু দোকানের ভেতরে কাকে যেন ওমলেট ভেজে দিচ্ছে, ছাঁৎ-ছাঁৎ আওয়াজ উঠছে বিশ্রী। কেমন যেন করছে অশোকের ভেতরটা, এই রে— গোপি তাহলে সত্যিই খবর দিতে আসছে। বহুৎ ঝামেলা—

গোপি দোকানে ঢুকল না, ছাড়িয়ে চলে গেল। এমন কি ঘাড় ঘুরিয়ে ভেতরটা দেখলও না! দেখলেও চট্ করে অশোককে খুঁজে পেত না অবশ্য, ঘাড় বাঁকিয়ে অশোক একটু লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল। এক নজরে যতটা আড়াল করা যায়, ঢোঁক গিলে সামলে নেয়া যায়, সেরকমই কিছু একটা আর কি—

গোপি রঞ্জুর দোকান ছাড়িয়ে আরো একটুখানি বড় রাস্তার দিকে বাঁক নিতে, না নিতে, অশোক বুঝে নিল, পয়সা হয়েছে বাঞ্চোতের। ফাইন ধুতিটাকে লুঙ্গির মতো করে পরে, হাইহিল স্লিপার পায়ে বাবু এগিয়ে যাচ্ছে। কেমন করে এগোচ্ছে হে! চোখ টান টান করে যতদূর অশোক পারে গোপির পছন দিকটা দেখে নিচ্ছিল। বাপ মারা যাবার মতো হাঁটা কি? যার বাপের গোপিই সবেধন নীলমণি ছেলে, বা পুত্র? কি জানি। কিন্তু রমেশের না মরেও তো উপায় নেই—অন্তত যতটুকু অশোক দেখে এসেছে? মরবেই। রমেশ ধুপ্ করে পড়ে গিয়েছিল, সেই শব্দটাও পর্যন্ত স্পষ্ট শুনে এসেছে অশোক, এর আর চারা নেই! তবু গোপি আগে অশোককে খুঁজতে বেরোয় নি—? বাড়িতে দ্বিতীয় আর ব্যাটাছেলে প্রাণী বলতে কে আছে।

অশোক ছাড়া? শুধু ব্যাটাছেলে বলে কেন, বাড়ির দোতলায় (বর্তমানে পরিত্যক্ত) দাদা রমেশ আর বৌদির সেই আদ্দিকালকার শোবার ঘরটা (যেখানে এখন শ্রীমান গোপিবাবুর স্টোর রুম হয়েছে), তার পাশেই অশোকের ব্যাচেলার-ড্রেন মার্কা বেশ হলঘর-পানা ঘর (অবশ্য দুটোই হলঘর); তবে কি গোপি সত্যি-সত্যি তার কাকা অশোককে, বাবার সদ্য-মৃত্যুসংবাদটা প্রথম মানুষ হিসেবে জানাতেই ভুলে গেল?

মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল অশোকের। ঘাড় সিধে করে, সারসের মতো গলা বাড়িয়ে গোপির চলে যাওয়া তখনো দেখতে লাগল। একটা মাছি বারবার গায়ে উড়ে উড়ে বসছে। গলাটা আরো বিস্বাদ। আর এই মৃত্যু, শালা, যত এড়াতে যাওয়া যায়, ততই চারদিক থেকে একেবারে ভন্‌ভন্‌ মাছির মতো—অশোক মাছিটাকে এখন ধরবার, মারবার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল। গুনগুন শব্দ শুনে পেছন দিকটায় খানিকটা অন্ধকারে তাকাল। এখন আর দেখতে পাচ্ছে না। আবার গলা বাড়িয়ে, গলিটা যেখানে বড় রাস্তায় মিশেছে, যেখান দিয়ে 'গোপিবাবু এইমাত্র গেলেন,' ঘাড় উঁচু করে দেখতে লাগল।

'কাকে খুঁজছিস রে, সকাল-সকাল; চা টা ঠাণ্ডা জল হয়ে গ্লাসে পড়ে রইল—নিয়ে চলে এলুম-তোর তো কোন হুঁশই ছিল না, শরীর খারাপ—?' অন্ধকার, যে কোনো একটা কোণ থেকে রঞ্জু গলা বাড়িয়ে বলছে, অশোক বোকার মতো থাকল।

'চা-টা পুরো খাইনি? অ। আর একটা দিও তো' অশোক হাল্কাভাবে বলে ব্যাপারটা সামলাতে চাইছে। কি করে সে জানাবে রঞ্জুকে, রমেশের মৃত্যু হবার খবরটা সে শুধু খুঁজছে এখন—শুনতে পেয়েছিল ধুপ্ করে পড়ে যাওয়ার শব্দটা, জিরো আওয়ারের মতো পাঁচিলটাও পেরিয়েছিল, তারপর একটা ট্যাক্সির শব্দে বাকিটা গুলিয়ে ফেলেছিল। সব ব্যাপারটাই কেমন যেন আশ্চর্য উৎকণ্ঠার, অথচ দু এক সেকেণ্ড থেকেও গেল না অশোক।

মাছিটা আবার ভনভন করে পায়ে সল, উড়ে গেল। পারলে মাছিটাকে এখন গিলে খেয়ে নিত অশোক!

গোপি যে গেল, গোপি কোথায় যেতে পারে? আস্তে আস্তে বেলা বাড়ছে। মেঘ হয়ে আছে ঠিকই, তবু মসমস-মসমস করে অফিস যাওয়া বাবুরা গলিটা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায়, ডানদিকে-বাঁদিকে যাচ্ছে। রাস্তা তো নয়, একটা শ্মশান—। পাতাল রেলের কাজ যখন শুরু হয়েছিল,

তখন একরকম—এখন দু-তিন বছরে ব্যাপারটা প্রচণ্ড বিরক্তি আর রাগের মধ্যে এসে ঠেকে গেছে। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে যেতে হলেই দু-দুটো পাহাড় আর লোহার সেতু ডিঙোতে হয়। তার মধ্য দিয়েই ট্রাম চলছে, বাস আর মিনিবাসও চলছে পোঁদ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। আগে এ সময় কতরকম ব্যস্ততা আর কোলাহল, রোদে পড়ে চিকচিক করত। এখন সবই যেন গ্রামদেশের মতো নিস্তব্ধ। অথচ সবই চলছে, কিছুই তো থেমে নেই—শালা ফাটকাবজি, চোরাকারবার, ফুটবল খেলা নিয়ে গলিতে-গলিতে ফ্ল্যাগের ছয়লাপ, পার্টি নিয়ে মারপিট, সেইসঙ্গে এই মৃত্যুগুলো—যখন যা ভাবা যায়, তাই ঠিক-ঠিক হয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর বেলায়। পট্ করে বৌদিটা কেমন ১৯৭৮-এ মরে গেল। ভাবা যায়? বৌদির গলফ্-ব্লাডার অপরেশান, অশোক নিজে পাঁজাকোলা করে বৌদিকে পাঁচিল ডিঙিয়ে নিয়ে এসে ট্যাক্সিতে তুলল, নিউল্যাণ্ডে অপারেশান হল, পেট কেটে দেখা গেল ক্যানসার—আর, তারপর থেকেই সিংকিং। সিংকিং। কেবল সিংকিং। ডাক্তারদের ঐ একটা ভাষা, যা বৌদিকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে বাড়ি ফেরা ইস্তক অশোকের শুনতে-শুনতে কান পচে গেছে। বলেই দিল, তিনমাস বাঁচবে বড়জোর। তিনমাস পেরিয়ে একটা একটা দিন অশোকের কি যে গেছে—কারবার-টারবার সব মাথায় তো বটেই—খাওয়া-নাওয়ায় পর্যন্ত শান্তি নেই, সবসময় একটা উৎকণ্ঠা; অথচ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না।

সেই মৃত্যু আর এই মৃত্যু। ফুঃ। আপনমনে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে যেন প্রবল একটা ঘেন্না ঠেলে বেরুল অশোকের ভেতর থেকে। বেশ করেছি। বৌদি মারা যাবার পর আর কারুর ব্যাপারেই কোনো ইন্টারেস্ট নেই অশোকের।

'এই রঞ্জুদা—চা দাও তো আর একটা মাইরি।—চা দাও।' বাবু হয়ে টুলটার ওপর এবার বসল সে। যেন সব কিছুই এক মুহূর্তেই ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

বৌদি গেল যেন মা-ই চলে গিয়েছিল তার। বৌদির জন্যেই অশোকের যা পৃথিবী ছিল, যতটুকু থাকার। এখন বাদবাকি শুয়োরের বাচ্চাগুলোর জন্যে অশোকের সম্বল শুধু থুতু ছেটানো। চতুর্দিকে থুতু। থুতু। গোপি এবার ডাকতে আসুক, আর না-ই ডাকতে আসুক, ধীরে সুস্থে আগে চায়ের গ্লাসটা তো শেষ করবে অশোক, তার পরে কথা। বিন্দুমাত্র উত্তেজনা না—।

মঞ্জু চায়ের গ্লাসটা রেখে গেলে, যেন এক ঢোঁকেই সবটা মেরে দেবে, এভাবে গ্লাসটা বাগিয়ে ধরল অশোক।

খেতে-খেতে তার মনেও হয়েছিল, সে অত ভাবছে কেন—ভয় পাচ্ছে কেন! রাস্তার কুকুর-বেড়ালও তো অনেক মরে। সব মরাই কি এক। আসলে মৃত্যুটা না, মৃত্যু হয়ে যাবার আগেভাগে মৃত্যুর ভড়কিগুলো আর পাঁয়তারাগুলো অসম্ভব যন্ত্রণা আর বিরক্তির জিনিস। কিছু-কিছু লোক আছে, পাঁয়তারা করে-করে ভুগিয়ে, ভাগিয়ে তারপর মরে। অশোকের দাদা রমেশ ঐরকম চিজ। জীবনভোর শুধু কায়দা মেরেই গেল। অশোক গোঁয়ারের মতো না থাকলে, আজকে অশোকের যতটুকু পা রাখার জায়গা আছে, তাও কি থাকত? বৌদি ছিল বলেই অশোক শুধু আটকে ছিল কোনোমতে, বাড়ি থেকে বার করে দেবার যে তাল ফেঁদেছিল দাদা গোড়ার দিকে, অশোক দোতলার ঘর দখলটা দূরে থাক—রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে হয়তো শেষটা কোনো গুণ্ডা-সণ্ডার হাতে খুন হয়ে মারা যেত। বৌদি তাকে একরকম জোর করে আদায় করে দিয়ে ছিল, ওদের বাবার রেখে যাওয়া টাকার অন্তত চল্লিশ হাজারের মতো অশোকের শেয়ারটা। তা থেকে পাঁচ-সাত হাজার অবশ্য কারবারে গেছে, কিন্তু বাকি হাজার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের ব্যাপারে অশোক এখন একেবারে সেয়ানা, আঁকড়ে ধরে আছে বলতে গেলে। ফিক্সড করিয়েছিল বৌদিই, বলেছিল, 'মাসে-মাসে সুদ পাবি, তাই থেকে খরচা করিস, দাদাকেও দিবি দু-আড়াইশ করে, আর কিছু বলতে পারবে না।' বাব্বাঃ—কী বাঁচাটাই না বেঁচে গেছে অশোক? নইলে এখন আর দেখতে হত না। লেখাপড়া শেখে নি তো বটেই—বস্তুত অশোকের পুঁজি বলতে এখন কিছুই নেই। চল্লিশ বছর বয়সে অশোকের ক্যাবলামি অনেক বেড়েছে, শরীরের জোর, মনের জোর কমেছে। ব্যাটারি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, কিছু বোঝেই না এখনো। বরং দিন-দিন কেমন সব ভুলে যাচ্ছে। অর্ডার পেতে পারে বিস্তর দৌড়োদৌড়ি করলে, মফঃস্বলে-টলে ঘুরলে পয়সা কড়িও মন্দ হয় না, পুঁজিতে অন্তত কোনোদিন তো হাত পড়ে নি, আর সে সত্যি-সত্যিই তো একা মানুষ! আসলে আলস্য জিনিসটাই ওকে খেল—একেবারে শেষ করে দিল খেয়ে। দাদার অনেক ধান্দাবাজি, মতলব আর কর্মব্যাপ্তির পাশাপাশি অশোক যেন একটা মেড়া। দাদা না হয় এই হালে স্ট্রোক-ক্রোক হয়ে জবুথবু হয়ে গেছে, কিন্তু তার আগে? বাপরে বাপ—অশোকের মনে আছে, অশোককে চাবকাত কি! একেবারে চাবকে যেন

খুবলে নিত হাড় মাংস। অশোক যে কী করে এখনো আধাআধি হলেও বেচে আছে—সেটাই একটা আশ্চর্য বলতে হবে। সে এখন আর এত ভাবছে কেন—ভয় পাচ্ছে কেন!

অশোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৌদিটাও কি কষ্টই না করে গেছে দাদাকে নিয়ে। সেকেণ্ড স্ট্রোকের পর প্রায়ই ধরে-ধরে পায়খানায় বসিয়ে শক্ত মল কাঠি দিয়ে টেনে বার করে আনত বৌদি। আর ভাত দিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে অশোকের সামনে কাঁদত।

বৌদি থাকলে, দাদা ওভাবে নির্ঘাত মরে যাচ্ছে জেনেও অশোক কি সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রঞ্জুর দোকানে বসতে পারত?

অশোক হঠাৎ আবার দেখল, গোপি ফিরে আসছে। সাহস যা হয়েছিল, মুহূর্তে সমস্তটা জল হয়ে গেল। ঝটকা মেরে, পাশে বসে-বসে চা খাওয়া লোকটাকেও চমকে দিয়ে অশোক একদম নিজেকে আড়াল করে রইল।

চটাস চটাস গোপির চটির আওয়াজ। অশোক পাচ্ছে; তার বুক ওঠা-নামা করছে ভেতরে। আরো দ্বিগুণ করে ভয়, জড়তা এবং দুর্বলতা—অশোককে মুহূর্তের মধ্যে যেন একদম বরফ করে দিয়েছে। এই বুঝি গোপি রঞ্জুর দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল।

'কাকা!'

অশোকের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে।

এবারও গোপি দাঁড়াল না। মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে, যেন ভীষণভাবে কী একটা চিন্তা করতে-করতে চলে যাচ্ছে, ঘাড়টা শেষ পর্যন্ত একদিকেই হেলানো।

'গোপি রে—' অশোক তবু ডাকল না; প্রায় গলায় এসে গিয়েছিল। বাড়ি মাত্র দু-আড়াই গজের পথ, আর সবসমেত অশোক এসে রঞ্জুর দোকানে বসেছে ত্রিশ মিনিটও বোধহয় কাটে নি—এর মধ্যেই গোপি আবার ওর সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে অশোক ভাবল, আরো গভীরভাবে সে যেন পাঁকের মধ্যে আটকে গেছে। এর ভেতর একবার চট্ করে বাড়ি ঘুরে এলেও আসতে পারত, ফয়সালা হয়ে যেত সব কিছুর। কিন্তু এখন আর কিছুতেই পারবে না।

অথচ রমেশের মৃত্যুর খবরটা এড়িয়ে সে তো আর অনন্তকাল কোথাও পালিয়ে থাকতে পারবে না! এমন কি আর এক-দেড় ঘন্টার বেশি পারবেই না। বাড়ি তাকে ফিরতেই হবে। রমেশ ওভাবে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে

জানলে সে না হয় ব্যাটারির স্যাম্পেল-বাক্সটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে ভরে, কিছু পয়সা-কড়ি বেশি করে নিয়ে সারাদিনের জন্য বেরিয়ে পড়তে পারত। কী একটা গেরোর মধ্যেই না পড়ে গিয়েছে সে। বস্তুত এভাবে একটা হাড়-জ্বালানো ভূতের কেত্তন সামনে আগলে রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা পাহারা দেয়াটা আর যাই হোক, অশোকের মতো নিষ্কর্মা লোকের পক্ষে একটা বিমূঢ়তা! তাছাড়া এভাবে বাড়ির নাকের ডগায় বসে খবরটাকে এড়িয়ে যাওয়াও যাবে না। পাগল নাকি! একসময় না একসময় সবসমেত হুমড়ি খেয়ে পড়বে তার ওপর। ধরে নয়, একেবারে বেঁধে নিয়ে যাবে।

এভাবে হবে না, এভাবে হবে না। অশোক একটা কিছু করবে বলে যখন চারদিকে খুব আশায় আশায় তাকাচ্ছে, নিজের দিকে তাকিয়ে হঠাতই সে কেমন যেন চুপসে গেল। কী পরে আছে সে? প্রায় শতচ্ছিন্ন একটা লুঙ্গি, গায়ে টেরিলিনের ফাইবার উঠে যাওয়া ফাঁক-ফাঁক সেই দশ বারো বছরের হলদে জামাটা, পায়ে সেফটিপিন আঁটা স্ট্র্যাপের শীর্ণ হাওয়াই চটিটা। এই পরে গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় তো নয়ই, ঘর থেকেও কোন জায়গায় বেরুনো যায় না। সঙ্গে একটা পয়সাও আনেনি সে। রঞ্জুর দোকানে মাসকারবারি খায়, কখনো দু-মাস, তিন মাস পরেও দাম দেয়, দেরি হলে রঞ্জু আর এখন ওকে গালাগালি করে না অবশ্য—তবে, চা ছেড়ে একটু ওমলেট বা টোস্ট অথবা একটা লম্বু বিস্কুটের অর্ডার দিলেও হয়ে গেল! অমনি রঞ্জু দেরি করবে, ধানাই পানাই লাগাবে—হিসেব করতে বসবে আর শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যি হয়ত দেবে না।

সাড়ে নটা বেজে গেছে নির্ঘাত, অশোক একটা গলা খাঁকারি দিয়ে আবার দোকানের ভিতরটা দেখে নিল, ততটা অন্ধকার আর নেই আকাশটা খানিক পরিষ্কার হয়েছে নাকি? রঞ্জু উনোনের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল, খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর উড়ছে—কেউ পড়ার নেই। একটা পাতা না দুটোই? একটা। ও ফুটপাতের দোকানদার নির্মলবাবুর হাতে আর একটা, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। অশোক ভাবল, রঞ্জুকে সব খুলে বলবে নাকি! দোকানে এখন মাত্র তিনটে প্রাণী। একটু দূরেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে ট্রাফিকের জট ছাড়াচ্ছে, গাড়িঘোড়ার শব্দ আসছে বিস্তর। গলিটা দিয়ে লোক যাচ্ছে আরো বেশি করে। স্কুলের মেয়েরাও যেতে শুরু করেছে, কয়েকটা কাক খুটে-খুটে নিচ্ছে ড্রেনের পাশে পড়ে থাকা ধাড়ি ইঁদুরের ছোট্ট লাশ—বোধ হয় কুণ্ডুদের বাড়ি থেকেই

ফেলেছে কাল রাতে।

অশোক একটা কিছু প্রস্তুতি নিচ্ছিল; রঞ্জুকেই ডেকে বলবে। কিন্তু তার আগে আরো একটা চা দরকার। এবং এই শেষ, এর পরেই অশোক অন্যরকম হয়ে যাবে। গা ঝেড়ে উঠবে।

রঞ্জুর দিকে তাকাবার ফুরসত পেল না তখন। সময় বুঝে তখনই চার-পাঁচটা চা নেবে বলে কেটলি একটা হাজির হয়েছে। রঞ্জুর পিঠ দেখা যাবে এবার! হলদে মত পৈতে আছে। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও হয়। ফিস-ফিস করে দু-তিন মিনিট তো যা বলার—। কিন্তু কী বলবে অশোক? কী ভাবে বলবে—। সমাধান তো দু-পা হেঁটে বাড়ি গেলেই হয়ে যায়। বলতে যা সময় লাগবে সেটুকুও লাগে না।

তাছাড়া কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে যে দোকানে সকাল-বিকেল চা খাচ্ছে, বসে থাকছে, সেই দোকানেও পর্যন্ত অশোকের কোনো নিজস্ব সত্তা বলতে কিছু নেই। কারণ অনেকগুলো। প্রধান কারণ, রঞ্জু অনেক দিন ধরেই তাকে জপিয়েছিল। যখন টাকাটা পেয়ে রঞ্জুকে বলে ফেলেছিল, তখন থেকে। সেও প্রায় দশ বছর তো হয়েই গেল! টাকার ব্যাপারে অশোকের ভয় ছিল। বস্তুত যে ভাবে সে টাকাটা বৌদির দৌলতে নিজের আলাদা করতে পারল, তার মর্যাদা সম্পর্কে গোড়াতেই সচেতন হয়ে পড়েছিল—রক্ষে। পরের ব্যবসায় খাটানো বা ধার দেওয়া দূরে থাক—নিজের খরচ-খরচা সম্পর্কেও সে ছিল ভীষণ ভীতু আর সাবধানী। ওর ব্যাটারির ব্যবসাও একদিন যাবে, অশোক ধরে নিয়েছে—তবু সেই যে গোড়াতে পাঁচ হাজার টাকার মতো বার করে খাটিয়েছিল, ওখানেই রাখা আছে। তাতে ব্যবসা ডুবুক চাই বাঁচুক। অশোক জানে, আসলটা যদি টাইট করে রাখা যায়, সুদের টাকা দিয়ে অন্তত দু-মুঠো খেয়ে বাঁচবে—মরে যাবে না। এখনো সে যে গোপির সংসারে আড়াইশ টাকা করে মাসের প্রথমে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে—সেটাও তার কাছে পরম একটা ভরসার। গোপির বউ বিয়ে হওয়া থেকেই চিনে ফেলেছে। দাদা তো, বৌদি মারা যাবার পর জড়িয়ে-জড়িয়েও একটা কথা যে বলার, তা পর্যন্ত বলে না। গোপিই কি প্রথমে কম জপিয়েছে নাকি? দশ হাজার টাকার মতো রাখতে বলেছিল ওর স্কিমে, যা থেকে মাসে তিনশো টাকার মতো সুদ পাওয়া যেত—গোপিকে সে এককথায় 'না' করে দেওয়ায় গোপি কিছুদিন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেবার হুমকি দিয়ে তারপর ক্লান্ত হয়ে থেমে গেছে।

কোনোরকম ঝুটঝামেলার মধ্যে অশোক নেই। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একজায়গায় পাঁচটা লোক জড়ো হলে পর্যন্ত সে এড়িয়ে যায়। পাড়ার কোনো একটা বাড়িতে আজ পর্যন্ত সে ঢোকে নি। অশোকের চেহারাটা মোটামুটি লম্বা, সিড়িঙের মতো, আর খুবই ফর্সা, কোঁকড়ানো চুল—ছোট মুখ, ঠোঁট টুকটুকে লাল—চোখটা হয়তো একটু কটা। অশোক সিগারেট-বিড়ি খায় না, পান খায় মাঝে-মাঝে। দেখলে ওকে পাড়ার দুর্গোপুজোর প্রধান কর্মী বলে মনে হতে পারে, একথা অশোকও জানে, কিন্তু সে কোনো কিছুতে নেই। বয়স যখন কম ছিল, তখনই নেই—আর এখন তো সে আরো দমে গেছে মনের দিক থেকে।

পাড়ায় তার সম্পর্কে অনেক লোকের অনেকরকম ধারণা। যারা টাকার ব্যাপারটা জানে, তাদের ধারণা ও বাইরে কোনো স্মাগলিং-টাগলিংয়ের ব্যবসা চালাচ্ছে, মহা ধড়িবাজ—পাড়ায় কিছু বুঝতে দেয় না। যারা ওর কিছুই জানে না, তাদের কাছে ও মিটিমিটি করে হাসা, লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে-বাড়িয়ে হাঁটার একজন সাধারণ লেখাপড়া জানা যুবক, কোনো সাতে-পাঁচে নেই অবশ্য—তবে চোখে-চোখে রাখা প্রয়োজন। অশোক নিজে তার সম্পর্কে একটু বেশি মাত্রায় উদাসীন। উদাসীন না থেকে তার তো উপায় নেই।

অশোকের নিজের ধারণা, মানুষ জীবনে একজন কি দুজনের কাছে তার নিজের সমস্ত কিছু খুলে দিতে পারে। অশোকের কোনো স্ত্রী নেই; তা—বৌদির কাছে কিছুটা আশ্রয় পেয়েছে বলে যা কিছু হয়েছে, এছাড়া আর কাকে কী বলাকওয়ার রইল, অশোক তো বুঝতে পারে না। সে বুঝতেই পারে না, সত্যি এখনো বুঝতে পারে না—কী করে এত বড়টা হল, এই শহরটার মধ্যে মানুষ হল, চলাফেরা করল!

পাড়ার তিনটে মেয়েকে সে বিভিন্ন সময় তার বউ বলে মনে-মনে কল্পনা করেছিল। এক হচ্ছে স্বয়ং রঞ্জুরই বোন, আভা—। অশোকদের বাড়ির উল্টোদিকেই তো বস্তি, তারই একটাতে থাকত। আভার মধ্যে জিনিস ছিল, অশোক এখনও বিশ্বাস করে। হুগলীতে বিয়ে হয়েছে। দেখা নেই প্রায় সতেরো-আঠার বছর। তাতে আর কি, আভাকে সে এখনো স্বপ্নে দেখে, কখনো খুবই স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। এরকম স্বপ্ন বাকি দুজনের কাউকে তেমন দেখে না। তেমন জোরালোও নয় হয়তো তারা, ঝর্ণা মেয়েটা শিক্ষিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে ফ্যাক্টরির গাট্টাগোট্টা একটা মজুরকে। কাছেই থাকে—এই তো, কেদার বসু লেনে। এবং তৃতীয় মেয়েটা অবশ্য এ পাড়ার

নয়, তবে পাড়ার মামার বাড়ি ছিল, মাঝে-মাঝেই আসত। একবার পুজোর সময় বেশ জমে যায় লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ নিয়ে, তারপর কিছুদিন যাতায়াত থাকে, ব্যস—। বলতে গেলে এখানেও যেন অশোকের অন্য এক আলস্য কাজ করেছে। সে আলস্য ঐরকম, ভয়ের—সাবধানের। এদের মধ্যে আভাই তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই তো আলাপ, কিন্তু আভাকে কখনো তার প্রেমিকা ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। কী জানি—আভার কী ব্যাপার! আসলে হতে পারত, সব কিছুই হতে পারত—জীবনটাও এমন বিশৃঙ্খল থাকত না, সবই হয়তো সাজানো হয়ে যেত। গোলমালটা অন্য জায়গায়। গোলমালটা গোড়া থেকে পৃথিবীকে অবিশ্বাসের, নিজের গোঁয়ার-গোঁয়ার ভাবের এবং আরো গোলমাল, মাথার ওপরে কোনো গার্জেন না থাকার তাড়না। বিয়ে, সংসার এসব আর কি, এমন কিছু শক্ত না—কিন্তু নিজেকেই নিজে ঠিক গোছাতে পারে নি অশোক, আজও পারে নি।

ব্যাটারির বিজনেসটাও সে যে কম বোঝে তা নয়। সারা কলকাতা ঘুরে প্রায় প্রতিটি অলিগলির দোকান, বাজার, ঝোঁক উঠলে একবার-একবার করে যা অশোক বেরোত, যদি সে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে থাকত—অন্তত হাজার খানেক টাকা মাসে বাড়তি রোজগার কিছু নয়। অশোকের ভেতরে কোথায় যেন একটা মস্তিষ্ক ছিল। যখন মন আর কাজ করত না, মস্তিষ্ক তাকে চালাত। চালিয়ে-চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেকদূর। সে অর্ডার সিকিউর করতে পারে একদিনে পাঁচ-ছশো বাক্সের, সিকিউর তো করল- তার পরের কাজটুকু, ফ্যাক্টরিতে গিয়ে সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা, পেমেন্ট, কমিশন, এ সমস্ত কর্মে তার যত রাজ্যের আলস্য। আগে তবু বাড়ির ফোনটা ব্যবহার করত—গোপি কাজে লেগে যাবার পর সেটাও আর ইচ্ছে করে না। তাই সারাদিনে সে ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার অবধিও এখন দৌড়য় কিনা সন্দেহ। আলস্য তার ভালো লাগে। ব্যাংকে গিয়ে মাসের প্রথমে সুদের টাকাটা পেতে যা দেরি—তারপর খামের মধ্যে সেটা রাখবে আর পুটুস-পুটুস ভাঙাবে। একটা ধোপদুরস্ত জামা পরে না, সিনেমা দেখে না, যখন রাস্তায় বেরোয় তখন শুধু পুরোপুরি বিজনেসের জন্য, ব্যাগ নিয়ে—রসিদের বই নিয়ে, ক্যাশমেমো নিয়ে। নয়তো পাড়া থেকে, এ গলি থেকেই কোথাও সে বেরুবে না।

ঝুঙ্কুকে চায়ের কথা বলেছিল কি? সে দেখল, তার সামনে আবার

একটা চায়ের গ্লাস পড়ে আছে। ধোঁয়া উঠছে। রঞ্জু কাজ করে যাচ্ছে তখনো। বেলা নিশ্চয়ই আর একটু বেশি। আর ভেতরে ভেতরে তার মনের অবস্থাটাও এখন রক্ত জমাট বেঁধে কালো কালো হয়ে যাবার মতো। অনেকখানি সময় চলে গেছে তো—তাই। সকালের উত্তেজনা কুঁই কুঁই করে এখনো শীতে-কাঁপা কুকুরের মতো কোথায় যেন ডেকে চলেছে। এসব উত্তেজনা শক্ত সমর্থ পুরুষের জন্য, সবসময় যারা উত্তেজনা খুঁজে বেড়ায় সেসব পুরুষদের জন্য। অশোক নিয়ে করবেটা কি? চায়ের গ্লাসে একবার একটা টানা চুমুক দেবার পরেই সে একদম ঠিক করে নিল, রঞ্জু-টঞ্জু কাউকে বলার নয় এ জিনিস—। এমন কি, আর এখানে পাড়ার দোকানটায় বসে একটা সদ্য মৃত্যু-ঘটা জনৈক পরিবারের একজন হয়ে নির্বিকার বসে থাকার বা না থাকার, কোনো ব্যাপারই কোনো মানে নেই। ব্যাপারটাও খুব সাধারণ। দাদার থার্ড স্ট্রোক হয়েছে। মরে গেছে। অশোক যদি তখন বাড়ি থেকে না-ই বেরুত, তাহলে তাকেও ওপর থেকে নিচে নামতে হত, ডাক্তার ডাকতে হত—আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে হত, শ্মশানে যাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হত। নিজে নিজে সব না করলেও, সেই করার উত্তেজনায়, আবর্তের মধ্যে তাকে থাকতে হত, থাকতেই হত। বৌদি মারা যাবার পর যেমন নিজেই সব করেছিল। গোপি শুধু দেখেছে; এখন হয়তো গোপিই সব করত—নিজে দেখত'। ব্যাপারটায় খুব একটা তফাৎ নেই।

সবই ফোর টুয়েন্টি ব্যাপার। ওভাবে চলে আসাটা, দোকানে বসে-বসে ভেতরে ভেতরে তার ঘেমে যাবার জোগাড়—আর, গোপি বাঞ্চোতটার সড়াৎ-সড়াৎ করে একবার চলে যাওয়া আবার চোখের সামনে দিয়ে ফিরে যাওয়াটা। তুই গোপি করলিটা কি—খুব বীরত্ব দেখালি, আর—আমি কি আর তোয়াক্কা করি রে, তুই খবর দিলি না-দিলি তো যেন মহাশান্তি আর তাচ্ছিল্যভাব দেখানো হল আমাকে? যেখানে তুই জানিস, আমি রঞ্জুর দোকান ছাড়া আর-কোথাও নড়ি না এই সকালবেলাটা, কোনো বিজনেস নয়, ধান্দা নয়, এমন কি কেউ যদি আমাকে মোটা টাকার অর্ডারও দিয়ে বসে, আমি সেই ভাত-টাত খেয়ে সাড়ে এগারোটা, বারোটায় বেরুব। তার আগে কিছুতেই না। অশোক স্থির ও চিন্তিত, গোপিটা জেনেশুনে এভয়েড করে গেল। আজকাল ঐ রকমই করছে, বিয়ে হবার পর তো আরো বেড়ে গেছে এসব। কাঁচা পয়সা, রেস খেলছে, দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছে, মদ খাচ্ছে, মুহুর্মুহু সিগারেট, ঠোঁট থেকে আর নামায় না বাবু—। লাথি মারো

শালার—

চা শেষ করে বেশ টানাটান ভাবেই সে উঠল। আর দোকানে বসা নয়। অনেক খাবি খাওয়া হয়েছে। উঠতে গিয়ে মাথাটা সামান্য ঘুরেও উঠল। আবার একটু বসল অশোক। বসে ভাবল, দাদা যদি আজ না মারা যেত, তাহলে তো এখনও যাবার প্রশ্ন কিছু উঠত না। রঞ্জুর দোকানে অন্তত দশটা-সোয়া দশটা পর্যন্ত সে বসে থাকেই। এখন বোধহয় পৌনে দশটা মতো হয়েছে। হিসেব করে দেখল, দাদা মারা গেছে প্রায় দেড় ঘণ্টা মতো হয়ে গেল। গোপিটা কোথায় গিয়েছিল এ দিকে? ফোন করতে? কারণ বাড়ির ফোন ৩।৪ মাস ধরেই খারাপ। ডাকলেও কোনো লোক টেলিফোন অফিস থেকে আসে না। ফোন করতেই যাবে বোধ হয়। কারণ ডাক্তার ডাকতে গেলে ওদিক দিয়ে, হাজরা পার্কের গা ঘেঁষে ডাঃ রায়কে কল করত। ডাক্তার ডাকতে হলে এদিকে আসার মোটেও দরকার নেই। ফোনই হবে।

'এখুনি উঠছিস্ নাকি—তোর দুটো চায়ের দাম লিখব, না তিনটে?'

'যা খুশি।'

এতক্ষণ পর একটু কথা শুনে বা বলে, অশোকের যেন অস্বস্তিটা আর-একটু কমল। কিছু না বললেও হত। প্রায়ই কিছু বলে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোকানে বসেছে এবং একটা কথাও বলেনি এমন বিস্তর দিন গেছে। সাধে কি আর রঞ্জু ওর নাম দিয়েছে বোকাপাঁঠা? মাঝে মাঝে ও নামেও ডাকে। মুড না থাকলে সাড়া দেয় অশোক, নয়তো সাড়াই দেয় না। এখন যেন বিজ বিজ করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, ঠিক এখুনি বাড়ি যাবার ইচ্ছেটাও স্বাভাবিক ভাবে আসছে না। বসে বসেই সে ভাবল, হ্যা—এখন বাড়ি যাবার দরকারটাই বা কি, যেমন যায়, দশটা-সাড়ে দশটায় গেলেই হবে। হাতদুটো দুদিকে ছড়িয়ে, হেলান দিয়ে অশোক এবার বসে রইল।

স্থিতু হয়ে বসে, প্রথমটা অশোকের যেটা মনে হল, সে এর মধ্যে একবারের জন্যেও সেটা ভাবেনি!

তার হঠাৎ মনে হল, দাদা সত্যি-সত্যিই মরেছে তো? রমেশ কি সত্যি-সত্যিই মরেছে? এতক্ষণ ধরে এক পার্সেন্টও যে সম্ভাবনাটা সে রাখে নি, সেদিন থেকে সে আবার শুরু করতে চাইল। ঘটনাটা কি? রমেশ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, সে দেখে এসেছে। বাইরে বেরিয়ে ধুপ করে পড়ার শব্দটাও শুনেছে। বাকিটা আর শোনে নি—ট্যাক্সির শব্দে গুলিয়ে ফেলেছে।

যদি আটকে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না—অশোক নিজের চোখে দেখলেও তা বিশ্বাস করবে না। সবাই জানে, একটা বাচ্চা ছেলেও জানে—পড়ে গেলেই স্ট্রোক হবে, মরবেই। কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত পড়ে না গিয়ে থাকে? অশোক দূরের দিকে তাকিয়ে একবার ভ্রূ-কোঁচকাল। হ্যাঁ, ব্যাপারটা সে মন্দ ভাবে নি—যদি পড়ে না গিয়ে থাকে! কিন্তু ওখানে ওর পড়ে যাওয়া বাঁচাবে কে? বৌদি থাকলেও অশোক কথাটা বিশ্বাস করত। বাথরুমে যেতে হলে বৌদিই ধরে-ধরে নিয়ে যেত, হয়তো অন্ধকার বাথরুমের ভেতরে, বৌদি মগে করে জল ঢালছিল—বেরিয়ে এসে ধরেছে। কিন্তু বৌদিই তো নেই, কলা? তবে কি গোপির বউ ধরে ধরে আনছিল? অথচ গোপির বউকে কখনো অশোক রমেশকে ধরে-ধরে আনতে দেখে নি! যা ব্বাবা, ব্যাপারটা আরো দূরে চলে যাচ্ছে যে। অশোক বাড়িতে কতক্ষণ থাকে? আর যতক্ষণ থাকে, কবে বাড়ির কোন্ জিনিসটা সে দেখতে পেয়েছে! থাকে তো সে ওপরের তলায়—তার নামা শুধু একবার বাথরুমে স্নান করা আর সারাদিনের মধ্যে রান্নাঘরে ঢুকে চাট্টি ভাত খেয়ে নেওয়া। কিছু তো দেখার, লক্ষ্য করার কথা নয় তার? বাড়িতে এই যে তিন-চারমাস হল টি.ভি এনেছে, একবারও সে কি টিভির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে? এক মুহূর্তের জন্যেও? দাদার সঙ্গেও তার দেখা হওয়া সেটা চার পাঁচদিনের মধ্যে হয়তো একবার হল, কি তাও হলো না। তবে?

কিন্তু ধুপ করে পড়ে যাওয়ার শব্দটা? হুঁ হুঁ বাবা—সেটা তো আর মিথ্যে নয়। শব্দ সে শুনেছেই। একটা মানুষ পড়ে যাবার শব্দ, সেই সঙ্গে লাঠিটাও যে ছিটকে গেছে হাত থেকে সেই শব্দটাও শুনেছে- এবার সে ভাবতে-ভাবতে এটাও নতুনভাবে মনে করতে পারল! না, কোন ভুল নেই। দাদা মরেছেই। দাদাও মরেছে, সে-ও এখানে বসে রোজকার বরাদ্দ চা-টুকু খাচ্ছে, সময় কাটাচ্ছে। দাদা মরেছে তো কি আর করতে হবে। ও মরলেই বা, কি আর থাকলেই বা কি এখন, অশোকের কাছে? যেটুকু করার, শ্মশানে একবার যেতে হবে, যেতে তো হবেই—ব্যাগ-টাগ নিয়ে রেডি হয়ে জামাকাপড় পরে বেরুলে সেটাও হয়তো যেতে হত না! এখন এই অবস্থায় বেরিয়েছে, পয়সা নিয়ে বেরোয় নি, বাড়ি ফিরতেই হবে। বড় রাস্তায় উঠে পর্যন্ত দাঁড়ানো যাবে না।

অথচ, এই কয়েকটা বাড়ি পরেই, না হয় একটু গলির ভেতরে, একটা

লোক যে এরকম দেড় ঘণ্টাটাক আগে মারা গেল, পাড়ার একটা লোকের মুখেও কি এতক্ষণ সেটা শোনা যেত না? পাশাপাশি বাড়ির দু-চারজন তো সকলেই অশোকের পরে এসে চা খেয়ে গেল এবং অনেকক্ষণ আগে চা খেয়ে চলে গেল। ওরাও কি খবর পেয়ে ফের চায়ের দোকানে এসে অশোককে খবরটা দিয়ে যেত না? তাছাড়া এই যে ক্রমাগত গলির প্রায় সবকটা বাড়ির মানুষ এখান দিয়ে অফিস কাছারি চলে গেল, কয়েকজন তো অশোককে বসে থাকতে দেখেছেই—দেখে নি কি? কই, খবরটা তো কোনোরকমভাবেই এখন পর্যন্ত এলো না! ঠিক দশটা বজে। খবরটা কারুর না কারুর মারফৎ না এসে পারে—? একি ব্যাপার রে বাবা, একটা লোক যে মরে গেছে, সেই খবরটা মাত্র একশ গজ দূরে চায়ের দোকানে বসে থাকা তার ভাইয়ের কাছে আসবে না!

'রঞ্জুদা—একটা পান আনাবে? সাদা পান, সামান্য সুরভি জর্দা—'

'বাচ্চাটাকে পয়সা দিয়ে দে, এনে দিচ্ছে।'

'পয়সা আনি নি এখন গো—বেরুবার সময় দিয়ে দেব, আনাও না!'

'দাঁড়াও, হচ্ছে—।'

অশোক যদিও বুঝল দাঁতে-দাত চেপে বিরক্তভাবে রঞ্জু কথাটা শেষ করল, তবু সেদিকে মোটে মন দিল না। রঞ্জু বুঝবে কি, অশোকের ভেতরে এখন কত কী হচ্ছে। ভাবনার সূত্র ধরে টানতে-টানতে সে এর মধ্যে যে রঞ্জুর বোন আভাকেও একবার ভেবে ফেলেছে, কেলানে রঞ্জু সেটা বুঝতে পারছে না। অশোকের উৎকণ্ঠার সঙ্গে মধ্যে-মধ্যে মজাও লাগছে মন্দ না। সে প্রতিটি লোকের চলে যাওয়া দেখছে আরো বেশি করে, প্রতিটি লোকের দিকে বড় বেশি ঝুঁকে-ঝুঁকে তাকাচ্ছে। কেউ একজনও যদি রমেশের মৃত্যুর খবরটা পেঁাছে দেবার চান্সটা নিতে পারে। পান নিয়ে আসতে আরো একটু দেরি হোক না—অশোকের ক্ষতি নেই। তবু সে অপেক্ষা করতে রাজি আছে, যদি এখানে বসে-বসেই সে রমেশের মৃত্যু-খবরটা কারোর কাছ থেকে পেয়ে যায়! অশোক ক্রমশ নিজেকে আরো এলিয়ে দিল। মাথার চুলটা উল্টে ঠিকঠাক করে নিল কয়েকবার। মুখে তার মিটিমিটি হাসি ফুটে উঠল, যেমনভাবে প্রায়ই সে হাসে। মেঘের আর নাম-গন্ধ নেই। রোদ উঠেছে চড়া। মেথরের টিন-ঘেরা গাড়িটা ঘড়ঘড় করে সামনে দিয়ে চলে গেল। কুণ্ডুবাড়ির ঝি, পুরো বাড়িটা ঝাড় দিয়ে ময়লাগুলো ফেলতে গেল। রোয়াকের ইটগুলো দাঁত বার করে জেগে রয়েছে। কালো

কুকুরটা ওখানে শুয়ে। অশোকের কান চুলকোচ্ছিল, কেমন যেন চিড়বিড়-চিড়বিড় করে উঠছে পিঠের দিকটা। সে তখনো ঝুঁকে-ঝুঁকে গলি থেকে এসে বড়রাস্তার দিকে যাওয়া এ পাড়ার প্রতিটি লোককে লক্ষ্য করে যাচ্ছে, যদি কেউ খবরটা এখনো চট করে তার কাছে এনে পৌঁছে দেয়। দেবে, দিক্—কিন্তু বুকের ভেতর থেকে গুড়গুড়-গুড়গুড় করে 'বলহরি-হরিবোল,' 'বলহরি-হরিবোল,' বাজতে শুরুই করে দিয়েছে, আর বাকিটা কি রইল রে—?

পানটা এনে দিক। মুখে ফেলে, অশোক এখন বাড়ির ভেতর ঢুকবে।

সমরেশ বসু দৈবের হাতে নাই

কালো আকাশ। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। গাড়িটা এলো এক রাশ কালো ধোঁয়া উগরে। এঞ্জিনের আওয়াজ কানে এলো। শুনলে মনে হয়, এ গাড়ি তুফান মেল। কিন্তু দেখ, ইষ্টিশনে ঢুকছে যেন গোটা একটা বাছুর পেটে ময়ালের মতো। একে তো, ইষ্টিশনের বিজলি বাতিগুলোর কী মরণ দশা হয়েছে, কে জানে। লম্বা প্ল্যাটফরমের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত দুটো মাত্র বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। ঝাড়ালো দু-তিনটে গাছ, প্ল্যাটফরমের শোভা। গোড়া ঘিরে, গোল্ চক্কর শান বাঁধানো বসবার জায়গা। টিমটিমে বাতির আলোয় ঝাড়ালো গাছক'টার কিম্ভুত ছায়া প্ল্যাটফরমের অনেকখানি গ্রাস করে নিয়েছে। কিছু দেখা যায় না, অন্ধকার এখন ঘুটঘুটে। তার মধ্যেই হঠাৎ একটা কুকুর, নাকি শেয়ালই হবে, বা একটা মানুষ এদিকে ওদিকে ছুটে চলে যাচ্ছে। এমন বুক ধড়াস্ করে ওঠে! আর হাত দুটো আপনা থেকেই কোমরের ধুতির কষির কাছে চলে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে বসে।

রসিকলাল গড়াইয়ের মাথায় ছাতা। ইষ্টিশানের ঘরে আর বারান্দায় আলোগুলো জোরালো। সে ইচ্ছা করেই ওদিকে যায় নি। কাপড় হাঁটুর ওপর তোলা। গায়ে শার্ট। হাতে ঘড়িও ছিল। সেটা খুলে শার্টের ভিতরে ফতুয়ার পকেটে রেখেছে। পায়ে রবারের জুতো। লাল কাদায় পা আর জুতো মাখামাখি। প্ল্যাটফরমের যে-দিকটায় এ্যাস্‌বেস্টাসের শেড আছে, সেখানে একটাও আলো নেই। অন্ধকার থিকথিক করছে। তার মধ্যেই দু চারটে ছায়ার নড়াচড়া। ওরা কি যাত্রী? মনে হয় না। ইষ্টিশানের ঐ শেডগুলো হয়েছে সব হাভাতে মেয়ে-মদ্দদের থাকবার আস্তানা। ওখানে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে আরও কত রকমের লোক। চোর চোট্টা গুণ্ডা ছিনতাইবাজ। রসিকলাল গড়াই অনেক ভেবেই ওখানে যায় নি। গেলে একটু হয়তো বসতে পেত। ওখানে বেঞ্চি আছে।

মাথায় থাক বসা। সুখের থেকে স্বস্তি ভালো। ঐ কারণেই সে ইস্টিশানের ঘরের বারান্দায়ও যায় নি। সুখের থেকে স্বস্তি। কী দরকার, লোক জানানো, রসিক গড়াই এই রাত্রে গাড়ি ধরে বাড়ি ফিরছে। সংসারে কারোকে বিশ্বাস আছে?

নেই। কারোকে বিশ্বাস নেই। একবার যদি জানতে পারে—অই শালা! নিজের বউ-ব্যাটা-বেটি সুযোগ পেলে হাত সাফাই করে। আর বাইরে তো সব পর। কে কোথা থেকে কী ভাবে নজর রাখছে, কিছু বলা যায় না। বিশ্বাসী লোক কি আর সত্যি নেই? নেই? ইস্টিশান মাস্টার লোকটি চেনা। সজ্জন মানুষ। টিকেটবাবুও খারাপ না। আর যারা আছে তাদের বিশ্বাস কি? আশেপাশে কারা কোথায় বসে আছে, বলা যায় না। আলোয় গেলেই দেখতে পাবে, রসিকলাল গড়াই ইস্টিশনে। কেন? এত রাত্রে কোথা থেকে ফিরছে? আন্দাজ যাদের করবার, তারা ঠিক করে নেবে। তারা না হতে পারে গুণ্ডা মস্তান ছিনতাইবাজ। মানুষের মন। কিছু বলা যায় না। কুমতলব মাথায় চেপে গেলেই হলো। ওটা একটা নিশির হাতছানির মতো। যেমন দেবতার থানে ভর হয়, সেই রকম। আর এ হলো অপদেবতার ভর। একবার ভর করলে আর রক্ষা নেই। রসিক গড়াই নিজেকে দিয়ে তো চিনতে পারে। ও-রকম অপদেবতার ভর তারও অনেক বার হয়েছে। ছিনতাই গুণ্ডামি না। পড়ে পাওয়া ষোল আনার মতো। অন্যান্য পাওনায় থাবা বসিয়ে দিয়েছে। ভাবে না, এ আমার হকের ধন না। এ আমি নেব না। কিন্তু ভগবান যে মানুষের মধ্যে কী এক কল গড়েছে, তার অন্ধিসন্ধি বোঝা ভার। সামলানো যায় না। পাঁচ পাল্লার গুনতিতে যদি কেউ ভুল করে ছপাল্লা গোনে, তার ভুল শোধরাবার দায় কি রসিক গড়াইয়ের? ক্ষেত মজুরের হিসাবে, চালে আর টাকায় যদি এদিক ওদিক করে দেওয়া যায়, হাতে কিছু থাকে। এমনিতেই হাতে ধরে দিতে যেন বুকে আঁচড়ায়। হিসাবে কিছু চালাকি চাতুরি করে, যতটা ঠকানো যায়। তোমার হিসাব যদি তুমি বুঝে নিতে না পারো, সেটা তোমার দোষ। মহাজান কারবার এমনি চলে না। বাড়াবার ফন্দি-ফিকির জানা চাই। না, রসিক গড়াই সে-ফান্দিফাকর ভালোই জানে। আহা, বুঝলাম, ওটা তোমার হকের ধন না। মন মানে কই? সব মানুষেরই তাই। রসিক গড়াইও কি জীবনে জিভে কামড় খায় নি? খেয়েছে। তাকেও কেউ কেউ হিসাবে আনা মাটি চাল বুঝিয়ে তেইশটি মেরেছে।

জীবনটাই এমনি। এমনি করেই, রসিকলাল গড়াই আজ জোতজমি ঘর বাড়ি নগদ, সব বাড়িয়েছে। চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হয়ে বসেছেন তার ঘরে। জোতদার মহাজন হিসাবে এখন তার সবই দিনে দিনে বাড়ছে।

এত জেনে, সাবধান হতেই হয়। যা দিনকাল পড়েছে, কারোকে বিশ্বাস করার কোনো কথাই নেই। ঘর জ্বালিয়ে ডাকাতি করে নিয়ে যায়। আর এ তো পথে-ঘাটের ব্যাপার। ট্যাঁকে গোঁজা কড়ি। কম কিছু না। এক হাজার তিন শো সাতষট্টি টাকা। সুদে আসলে পাওয়ানা। এই পাওয়ানার জন্য দশটা ইষ্টিশন পেরিয়ে রেলের টিকেট কেটে আসতে হয়েছিল। গুঁইরাম ঘোষ লোকটা ভালো। আজ পর্যন্ত নেমকহারামি করেনি। হিসাবে গোলমাল নেই। আখেরের কথা মনে রেখে, রসিকের সঙ্গে কারবারে কোনোরকম ঝামেলা করে না। দেরি হয়ে গিয়েছে বলে, শেষে নিজেই রাতটা তার বাড়িতে কাটিয়ে যেতে বলেছিল। বিশ্বাসী লোক। টাকা গুনে দেবার সময় কাছে কারোকে থাকতে দেয় না। জানতে দেয় না। ইচ্ছা করলে, ঘোষই তো পিছনে লোক লাগিয়ে দিতে পারে। গুঁইরাম ঘোষ সে চরিত্রের মানুষ না। দশ বছরে সেটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। সেই জন্যই রাতটা কাটিয়ে যেতে বলেছিল। তাই, কে বলে। সেই মন। মন মানে না। কাজ মিটেছে, এবার ঘর চলো। মন ছটফট করে। লোকাল ট্রেনগুলো সব চলে গিয়েছে। এই প্যাসেঞ্জার গাড়িটা আট ঘণ্টা লেট্ করে আসছে। কোনো রকমে একবার পৌঁছুনো নিয়ে কথা।

রসিকলাল থাকতে পারে নি। কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়েছে। ইস্টিশনে এসে কেমন যেন গা ছমছম করছে। ভেবেছিল, যাত্রী বেশ কিছু থাকবে। বেশ কিছু দূরের কথা, একটাও আছে কি-না সন্দেহ। এই প্যাসেঞ্জার গাড়ির আশা কেউ করে না। বিহার থেকে আসছে। সময়ের মা-বাপ নেই। আসবার কথা বেলা একটায়। এলো রাত্রি ন-টায়। লোকাল ট্রেনে যেতে হলে, রসিক গড়াইকে আজ থেকেই যেতে হত। শেষ লোকালটা রামপুরহাট থেকে ছেড়ে গিয়েছে তিনটে নাগাদ। রসিক এসে পোঁছেছিল বেলা দেড়টায়। হিসাব কি এত তাড়াতাড়ি মেটে? কিন্তু খবর যখন পাওয়া গেল, প্যাসেঞ্জার গাড়িটা আসছে, তখন আর মন মানে নি। ছুটতে-ছুটতে এসেছে। দু-জায়গায় দঁক ছিল। লাল মাটির পাঁক। যেখানে জমে, সেখানে মোষও থমকে দাঁড়ায়। লাল কাঁকুরে মাটির সব ভালো। রাঢ়ের এ-অঞ্চলে যেখানে সেখানে জল জমে না। জমি ঢালু উঁচু। কিন্তু

খানা খন্দে দঁক হয়। মানুষ ডোবা দঁক। একটা বাতি সঙ্গে নেই। খুব সাবধানে আসতে হয়েছে। এসে, ইষ্টিশনটাকে শ্মশানের মতো মনে হয়েছিল।

অন্ধকার, টিপটিপ্ বৃষ্টি। দূরের কালো আকাশে অধিক কালো দৈত্যের মতো তাল গাছের দল। শালের জড়াজড়ি পাহাড়। প্ল্যাটফরমের ঝাড়ালো গাছের ছায়া। টিমটিমে দুটো বাতি। দেখলে অলক্ষুণে মনে হয়। মোড়ের অন্ধকারে তাকালে গায়ে কাঁটা দেয়। তার মধ্যে হঠাৎ এক-একটা মানুষ জানোয়ার, কোথা থেকে কোথায় ছুটে চলে যায়। কেবল ছুটন্ত ছায়া আর ভৌতিক শব্দ। রসিকলাল ইষ্টিশনের ঘর বরাবর, প্ল্যাটফরমে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়েছিল। খবরটা ভুল ছিল না। ইতিমধ্যে গাড়ি আসার খবর দিয়ে একবার ঘন্টাও বেজেছিল। গাড়িটা ইষ্টিশন কাঁপিয়ে ঝমঝমিয়ে ঢুকল। আওয়াজে কানে তালা। দম বন্ধ করা কালো পোঁয়া ছড়িয়ে আরও অন্ধকার করে দিল।

দু-চারটে লোক কোথায় ছিল। এদিকে ওদিকে দৌড় দিল। রসিক দেখলে, একটা কামরায়ও আলো জ্বলছে না। যে দু-একটা কামরায় টিমটিম করে আলো জ্বলছে, মানুষ একটাও নেই। যেন একটা ভুতুড়ে খালি গাড়ি। কেবলমাত্র ফার্স্টক্লাসের তিনটে কামরায় আলো জ্বলছে। ভিতরে লোকও আছে। তারা যে কেমন লোক, তা বোঝার উপায় নেই। এ-রকম ফাঁকা গাড়ির ফার্স্টক্লাসে, ফার্স্টক্লাস লোক কি আছে? তা ছাড়া, টিকেট চেকার যদি থাকে? জায়গা খুঁজতে-খুঁজতেই, গাড়ির বাঁশি বেজে উঠল। আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। রসিকলাল ভীরু ত্রস্ত চোখে দেখতে-দেখতেই তুমুল গর্জন করে ময়াল নড়ে উঠল। না, ঘুটঘুটে অন্ধকার কামরায় ওঠা চলবে না। রসিকলাল ছাতা গুটিয়ে, একটা টিমটিমে আলো-জ্বলা কামরায় উঠে পড়ল। সবে ঢুকেছে। পিছন থেকে আর-একজন লাফিয়ে উঠল, 'চলেন, ভেতরে চলেন।'

রসিকলাল চমকে কোমরে হাত দিল। দু-পা এগিয়ে পিছন ফিরে দেখল। চাষাভুষা মতো দেখতে একটা লোক। এক মাথা সাপ-কিলবেলে চুল। কালো কুচকুচে মুখ। থ্যাবড়া নাক। ছোট চোখ দুটো যেন লাল। শক্তপোক্ত গায়ে একটা বিবর্ণ ময়লা জামা। কোমরে গামছা বাঁধা। কাপড় হাঁটুর ওপরে। খালি পা। এক হাতে একটা মাটির হাঁড়ি। হাঁড়ির মুখ গামছা দিয়ে বাঁধা। কাঁধে একটা ঝোলা। অন্য হাতে একটা সরু দু-হাত লম্বা লাঠি। লাঠির ভাগ গুলতির মতো দু-ভাগ। গাছের ডাল বলে মনে হয়।

মাথায় বাড়ি দেবার মতো না।

গাড়ি তখন প্ল্যাটফরম ছাড়াচ্ছে। লোকটাকে দেখে তেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে না। গাঁয়ের গরিবগুরবো লোকের মতো। রসিকলাল কামরার ভিতর দিকে তাকাল। যা ভেবেছিল, তা না। একটা মাঝি আর মাঝিন এক পাশে গায়ে গা দিয়ে বসে আছে। রসিকলাল অন্য লোকটাকে আর একবার দেখল। কোন কৌতূহল নেই, নির্বিকার। চোখে যেন ঘুম ঘুম ভাব। সারাদিন মাঠে খেটেছে, দেখলে বোঝা যায়। তার ওপরে দু-চার পাত্র পচাই চাপিয়েছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না। কাচের বন্ধ জানালা দিয়ে আবার বাইরের দিকে মুখ ফেরাল।

রসিকলাল ভিতরে এগিয়ে গেল। ফাঁকা। জানালা ঘেঁষে বসবার আগে পিছনের লোকটাকে আবার দেখল। লোকটা হাতের হাঁড়ি রাখল বেঞ্চির ওপরে। পাশে রাখল কাঁধের ঝোলা আর সরু ডাল। রসিকলালের দিকে নজর নেই। কোমরের ছেঁড়া গামছাটা খুলে, মাথা মুছতে-মুছতে নিজের মনে বলছে, 'ই শালা কী ছিচকাঁদুনে বিষ্টি। থালাস করে না, পিনুকে মুচড়ায়।'

রসিকলাল আপাতত নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। দশটা ইষ্টিশন যেতে হবে। থামতে থামতে যাবে। কোথায় শমন ওত পেতে আছে, কেউ বলতে পারে না। ছোরা ভোজালি নিয়ে উঠলেই হল। জানালার কাচ বন্ধ। বাইরের কিছু দেখা যায় না। কাচটা আয়নার কাজ করছে। টিমটিমে আলোয় নিজেকে আবছা দেখতে পাচ্ছে। লোকটাকেও। হাঁড়িটা নতুন। হাঁড়িটার মুখ ঢেকে বাঁধা গামছাটাও নতুন। কেন? রসিকলাল লোকটার দিকে তাকাল।

লোকটা মাথা-মোছা গামছাটা উলটো দিকের বেঞ্চিতে পেতে দিল। হাঁড়িটা তুলে রাখল তার ওপর। নিজে বসল জানালা ঘেঁষে। ববেই, 'উই শালা, বিষ্টির জলে ভিজ্যে গেল্‌ছে। বলে কাঠের জানালা টেনে নামিয়ে দিল। হাত দিয়ে বেঞ্চি মুছে তার ওপরে বসল। পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বের করল।

রসিকলালেরও নেশা চাপল। পকেট থেকে বিড়ির কৌটো দেশলাই বের করলো। লোকটার দেশলাই ভেজা। কাঠি জ্বলছে না। দুটো কাঠি নষ্ট করে অশ্রাব্য উক্তি করল। রসিকলাল নিজের বিড়ি ধরাচ্ছে। লোকটার দাঁতে কামড়ানো বিড়ি। বললো, 'দেন তো বাবু, আগুনটা দেন।

ই শালার দেশলাই ভিঁজ্যে গেল্‌ছে।'

রসিকলাল জলন্ত কাঠি এগিয়ে দিল। লোকটা বিড়ি ধরিয়ে, লম্বা টান দিল। দিয়ে, হাঁড়িটার গায়ে একবার আল্‌তো করে হাত ছোঁয়াল।

'কোথা যাওয়া হবে?' রসিকলাল জিজ্ঞেস করল।

লোকটা জবাব দিল, 'কলকাতা।'

কলকাতা! রসিকলাল অবাক হলো। এই রাত্রে কলকাতা যাচ্ছে? অথচ লোকটা নির্বিকার। চোখে মুখে কোনো দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। সে বললো, 'কলকাতা পৌঁছাতেতো অনেক রাত হয়ে যাবে?'

'তা যাবেক বটে।' লোকটা বিড়িতে টান দিল, 'মা মোন্‌সার মর্জি, কি করব। বড় ভোগাস্তি হঁয়েইচে।'

মা মনসা? রসিকলাল ভুরু কুঁচকে লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা হলদে বড় বড় দাঁতে হাসল। হাঁড়িটা দেখিয়ে বলল, 'উয়ার ভিত্‌রে আছে। কালী গোখরো। বড় কষ্ট দিইচে। শালা সি দুফর থেক্যে লেগ্যে ছিলাম। জাত সাপ, বুঝেন ক্যানে। বিষে লক্‌লক্‌, লাতুন তেজী সাপ। সহজে কি ধরা দেয়? ছোট-খাটোটি লয়, এ্যাই এ্যাত্তখানি।' দু হাত ছড়িয়ে দেখাল।

'কালী গোখরো?' রসিকলাল হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে সভয়ে উচ্চারণ করল, 'তা ওটা নিয়ে এই রাতে কলকাতা কেন?'

লোকটা বলল, 'এক বাবুকে বিক্‌কির করতে যাইচ্চি। ডাক্তারবাবু, সাপ কেনেন। সাপের বিষ দিয়ে কী সব ওষুধবিষুধ বানান।'

রসিকলালের খোলা ঠোঁট, হা মুখ। কত রকমের কারবার আছে এই সংসারে। জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা দেবে?'

'তা ই কালী গোখরোর দাম ষাট সত্তর হবেক গা।' লোকটা বলল, 'খয়ে গোখরো, কেউটে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। বোড়ায় চল্লিশ। রাত ফুরালে গেলে হত্য বটে। তো ভাবলুং কি রাতটো হাওড়া ইষ্টিশানে থেক্যে যাব। ভোর ভোর দিয়ে আবার ফেরত আইসব। গরিব মানুষ, বুঝেন ক্যানে।' লোকটা হাসল, 'আপনি কুথা যাবেন?'

রসিকলাল বলল, 'তালিত।'

'কাছে বটে।' লোকটা বিড়িতে শেষ টান দিয়ে গাড়ির মেঝেয় ফেলে দিল।

বেশ মেজাজে আছে লোকটা। ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। কী

নিবি নে। হাঁড়ি নিবি? নে। ছিনতাই কর, তারপরে একেবারে যমের ঘর চলে যা। রসিকলালের মাথায় ঝংকার দিয়ে উঠল। এ লোকটাকে ভগবান পাঠিয়েছে। ছিনতাই পার্টি উঠলে, হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলে দিলেই হল। সে মনে মনে মতলব ভেজে ফেলল। পকেটে দু-তিনটে খুচরো টাকা আছে। খোশামুদি হেসে বলল, 'তা ভাই তোমার মা মনসাকে একবার দেখাবে?'

'দেইখবেন?' লোকটা হাড়িটার দিকে তাকিয়ে একটু যেন ইতস্তত করলো। অনিচ্ছার ভাব নিয়ে তাকাল রসিকলালের দিকে।

রসিকলাল বলল, 'বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। নাম কি ভাই তোমার?'

'বরজহরি।' লোকটি বলল। ঝোলায় হাত দিয়ে ছোট একটা কী-নিয়ে মুঠিতে পুরল। হাঁড়ির মুখ ঢাকা নতুন গামছাটা খুলল। গামছা ছাড়াও হাঁড়ির মুখে সরা ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ডান হাতে গুলতির মতো দু-মুখো সরু ডালটা তুলে নিল, 'জয় বাবা বিষহরি।' বাঁ হাতে সরা তুলল।

রসিকলালের বুক কাঁপিয়ে, ফোঁস করে যেন একটা আগুনের ঝলক দিয়ে দিয়ে হাউই উঠল। হাঁড়ির ভিতর থেকে সটান প্রায় এক হাত লম্বা। হাউয়ের ল্যাজে আগুন ছোঁয়ালে যেমন ফোঁস করে জ্বলে ওঠে তেমনি। মস্ত ফণা দেখে বুক কাঁপে। চেরা জিভ দেখে গায়ে কাঁটা দেয়। কেউটের তুলনায় রঙটা ঈষৎ কম কালো। ফণাটা বাঁ দিকে কাত করা। টিমটিমে আলোয় ধারাল ছুরির মতো ঝলক দিচ্ছে। ফণাটা একটু পেছনে নিল। রসিক গড়াই আঁতকে উঠে বলল, 'ঢাকা দাও বাবা, ঢাকা দাও।'

বরজ—ব্রজহরি ডান হাতের সরু ডালটা এগিয়ে নিয়ে গেল। ফণা গুটিয়ে গেল। ব্রজহরি সরা চাপা দিল।

রসিকলালের বুকের কাছে নিঃশ্বাস আটকেছিল। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ছাড়ল, শার্ট তুলে, ভিতরের ফতুয়ার পকেট থেকে এক টাকার নোট বের করল। এগিয়ে দিল ব্রজহরির দিকে, 'বড় জবর দেখিয়েছ হে। সাক্ষাৎ যম। এটা নাও।'

'ক্যানে বাবু, টাকা দিচ্ছেন ক্যানে?' ব্রজহরি হেসে গামছাটা হাঁড়ির মুখে বাঁধতে গেল।

রসিকলাল ব্যস্ত হয়ে বাধা দিল, 'উঁহু, না না, গামছাটা এখন থাক। সরা চাপা থাক্।'

'ক্যানে?' ব্রজহরি ছোট ছোট কালো ঝকঝকে চোখে, ভুরু কুঁচকে তাকাল।

রসিকলাল বললো, 'বলছি। টাকাটা ধর আগে।'

গাড়ির গতি কমে আসছে। ব্রজহরির চোখে মুখে দ্বিধা। টাকাটা নিল। মাঝি-মাঝিন বোধহয় উঠল। দেখা যাচ্ছে না। ওরা বোধহয় নেমে যাবে। রসিকলাল গলা নামিয়ে বলল, 'দিনকাল কী রকম বোঝ তো অঁা? ছিনতাইবাজ গুণ্ডারা যেখান সেখান থেকে উঠতে পারে। এইরকম খালি গাড়ি, লোকজন নেই। ব্যাটাদের এই তো মওকা। কিন্তু যদি আসে একবার সরাটা তুললেই হল। মা মনসাকে দেখেই শালারা দৌড় দেবে। বন্দুকের থেকে বড় অস্তর তোমার হাঁড়িতে রয়েছে।'

'অই, ই কথা! ব্রজহরি হাসল। নতুন গামছাটা সরার ওপরে ছড়িয়ে দিল। হাতের ডালটা রাখলো তার ওপরে। 'তা বাবু, উয়াদের হাতে বন্দুক থাকে। এক গুলিতে মা মনসাকে শেষ করে দিবেক।'

রসিকলাল হাত তুলে বলল, 'বন্দুক কি আর সকলের থাকে? ছোরা ভোজালি নিয়েও উঠতে পারে। তবু বলব, বন্দুক নিয়ে উঠলেও, তোমার হাঁড়ির মাকে দেখলে, উয়াদের হাত কেঁপে যাবে।' সে একটা বিড়ি এগিয়ে দিল ব্রজহরির দিকে।

গাড়িটা একটা ইষ্টিশনে দাঁড়াল। মাঝি মাঝিনের গলা শোনা গেল। ওরা ধুপধাপ শব্দে এগিয়ে গেল। দরজা খোলার শব্দ হল। রসিকলাল কান পেতে আছে। চোখ অন্ধকার প্ল্যাটফরমের দিকে। যাত্রীর ছোটাছুটি সাড়াশব্দ নেই। ব্রজহরি দাঁতে বিড়ি কামড়ে ধরে আছে। কালো চোখের তারা দুটো রসিকলালের দিকে। রসিকলাল দেশলাই জ্বালাতে পারছে না। গাড়িটা না ছাড়া পর্যন্ত দু'চারজন শুয়ে বসে আছে। ইষ্টিশনের ঘরে দু'এক বাবু। কথাবার্তা বলছে। এই ইষ্টিশনটাই যা একটু জমকালো। তারপরে অজয় পেরোলেই ভয়টা বেশি।

গাড়ি ছাড়ল। যেন নড়তে আর চায় না। কামরায় কেউ উঠলো না। রসিকলাল বিড়ি দাঁতে চেপে দেশলাই জ্বালল। ব্রজহরির আর নিজের বিড়ি ধরিয়ে নিল। ব্রজহরি বললো, 'বাবু দেখছি খুব ভয় পাইছেন।'

'তা-অঁা-হ, মিছে বলব না। ভয় আছে।' রসিকলাল হাসল। চোখের কোলে ভাঁজ, স্বর নিচু। অথচ কথা শোনবার দ্বিতীয় কেউ নেই, 'তোমাকে কথাটা বলা যায়। একটু আদায়ে বেরিয়েছিলাম। সঙ্গে কিছু টাকা রয়েছে। ঘড়িটাও হাত থেকে খুলে রেখেছি। আংটিটা খোলবার উপায় নেই, বিপত্তারণ মঙ্গলময়। এটাও বাঁচায় ত।'

ব্রজহরি মাথা ঝাঁকাল, 'হুঁ, ধারণ করেছেন, উ ত খোলা যায় না। বাবুর নাম কী?'

'রসিকলাল গড়াই।'

ব্রজহরির চোখের কালো তারায় ঝিলিক হানল। কালো কুচকুচে মুখের গালে কপালে কয়েকটা রেখা ফুটল।

'অই, আপনি সি গড়াই মশায় বটে।' হেসে কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে মাথা নোয়াল, 'মস্ত বড় লোক, নকুকির বরপুত্তুর বটে। জোতজমা মহাজনি উই বাপ্। বদ্ধোমান জেলায় আপনাকে কে না চিনে বটে? তা আদায়ে বার হুঁইচেন, আপনার লেঠেল খুনী লিয়ে বেরন নাই ক্যানে?'

'লেঠেল খুনী?' রসিকলালের স্বরে বিস্ময়, মুখে অস্বস্তি, 'লেঠেল খুনী কোথায়?'

ব্রজহরির গালে ভাঁজ, হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়ল, 'উ আমরা জানি বাবু। বইলতে হবে ক্যানে?'

'তা যদি বল—' রসিকলাল বিব্রত হেসে ঢোঁক গিললো, 'দিনকাল যা পড়েছে, সম্পত্তি রক্ষে করতে গেলে, ওসব রাখতে হয়। হ্যাঁ, মিছে বলব না, আছে। কিন্তু কী জান—তোমাকে বলতে পারি, নগদ টাকা কড়ির ব্যাপারে কারুকেও বিশ্বাস নেই। বুঝলে না? মানুষের মন, কিছু বলা যায় না, নিজের লোকই হয়তো মাথায় লাঠি বসিয়ে দিল। লোভ, বুঝলে? ভগবানের যে কী কল, লোভ বড় তাজ্জব জিনিস। একবার মাথায় চাপলে হল। নগদ টাকাকড়ির ব্যাপারে আমি কারুকে বিশ্বাস করি না। ওসব লেনদেন সব চুপচাপে, আড়ালে।'

গাড়ি ঝম্ ঝম্ করে অজয়ের পুল পেরিয়ে গেল। আবার ইস্টিশন। আবার রসিকলালের সেই উৎকণ্ঠা। তবে, আগের মতো তেমন অসহায় বোধ করছে না। হাঁড়িটার দিকে তাকাল। যেন মিষ্টির হাঁড়ি। কী বস্তু। কিন্তু কামরার দরজাটা খোলা। বিশ্রী আওয়াজ করছে। রসিকলাল উঠে দাঁড়ালো। 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।'

ব্রজহরি রসিকলালের দিকে তাকিয়ে বিড়ির টান দিল। গাড়ি ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে, আবার ছাড়ল। রসিকলাল নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসল। ব্রজহরি বলল, ভয় পাবেন না। ই গাড়ির আশা আজ আর কুনো ডাকাত ছেনতাই বাজের নাই। ই পিটির পিটির বিষ্টি, রাত হয়িং গেল্ছে, উপদেরও তো গতর আছে বটে?'

'না না, ওদের কোন বিশ্বাস নেই বাবা।' রসিকলাল চোখ বড করে মাথা নাড়লো, 'গতর তো তোমার আমারো আছে। তবু দেখ, দুজনে এই দুর্যোগে বেরিয়েছি। কারবারে লাগতে হলে, ওসব গতর-টতর কেউ মনে রাখে না। ওরাও রাখে না। এ-গাড়িটা তো ভাল না। অনেকবার এ-গাড়িতে ডাকাতি ছিনতাই হয়েছে। কোথায় ওঁৎ পেতে বসে আছে, বলা যায়? ঝাঁপিয়ে পডলেই হল। তবে—।' সে হাডিটার দিকে উজ্জ্বল চোখে হেসে তাকাল, 'আমাদেরো অস্তর আছে। ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছে হে রাখহরি। ভগবান পাঠিয়েছে।'

ব্রজহরির মুখের ভাঁজগুলো খাঁজকাটা কালো পাথরের মতো দেখাল। চোখের কালো তারা দুটো সাপের মতো স্থির। যেন গরগরে স্বরে বললো, 'আমার নাম বরজহরি গডাই মশায়। আমার ছোট ভাইটোর নাম ছিল রাখহরি। আমাদিগের ঘর শুঁডিচুয়া।'

'শুঁড়িচুয়া?' রসিকলাল চমকে উঠলো। স্খলিত স্বরে উচ্চারণ করল, 'শুঁডিচুয়ার রাখহরি!' তার মুখের হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। চোখের উজ্জ্বলে অস্বস্তি, জিজ্ঞাসায় অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণতা।

ব্রজহরি আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল, 'এঁজ্ঞে। জম্মে ইস্তক জোৎজমি দেখি নাই। পরের জমিতে খেটে খেইয়ে মানুষ। রাখা আমার ছোট ভাই ছিল। দুই সাল আগে, ললিতের পাহারার দলের সঙ্গে, বদ্‌খোমানে আপনার ধান জমি পাহারা দিতে গেল্‌ছিল। আমাদিগের টাকা নাই, ললিতের ছিল। চুক্তি মতন পাওনা লিয়ে, আপনার ঘরে ধান তুলে দিয়ে ঘরে ফিরে আইশত। তো সি দুই সাল আগে গেল্‌ছিল, রাখা আর ফিরে আসে নাই।'

রসিকলালের মুখে কথা নেই। চোখে ভীরু অনুসন্ধিৎসা। কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। ঢোঁক গিলল। ব্রজহরির মুখের ভাঁজ অনড়। খাজকাটা কালো পাথর। গলার স্বর সেইরকম গরগরে। দূর আকাশে বাজ বাজার মতো, 'রাখা চোর ছ্যাঁচড় ছিল নাই, বেইমান ছিল নাই। এগার আঁটি ধান চুরির দায়ে উয়াকে মাথা ফাটা কইরলে। ললিত অক্কে কইরতে পারে নাই, গডাই মশায়!' ফণার মতো ঘাড় কাত করল সে।

'আঁ?' রসিকলাল গোঙানো স্বরে আঁতকে উঠলো।

'আমার ভাইটো চুরি করে নাই।' ব্রজহরির মুখে কোন বিকৃতি নেই। গলার স্বর একরকম, 'আপনি বিশ্বাস কইরতে নাইরলেন। আপনার খুনী

লেঠেলরা ভাইটোকে আমার মাথা ফাটা করে মেরে ফেইল্যে দিলে। মারবার আগে দেখলেন নাই, চোরাই ধানের অঁাটি উয়ার পাওনার থাকে ছিল না। বিচার হল্য না, ফাঁসি হাঙ্গিং গেল।'

বড় জোতদারদের এই নিয়ম। ধান পাহারা দেওয়ার দল রাখা। খাই খরচ রাত জাগা তোমার। কেউ চুরি করতে এলে, মর বাঁচ, রফা করা তোমার দায়। বিঘাপিছু মাথা গুনতি পাঁচ অঁাটি ধান। একজন কারোকে পাহারার দল তৈরি করতে হয়। তার টাকা থাকা চাই। পাহারার লোকজনকে খাই খরচা যোগান তার দায়। পরে হিসাব মতো, সব বুঝে নেওয়া। ভূমিহীন কৃষকদের এটা একটা কাজ। কাজের শেষে খাওনা-থোয়া খারাপ না। সব ধান নিয়ে ফিরতে পারে না। জোতদারকেই কিছু বিক্রি করে দিয়ে যায়। বাকি যতটা পারে, ঘরে নিয়ে যায়। হিসাবের সময় গোলমাল হয়। গোলমাল মিটেও যায়। সকলের সামনে ভাগ বাটোয়ারা হয়। জোতদারের লোকের চোখ ফঁাকি দেওয়া সম্ভব না। লাঠি টাঙি নিয়ে সব ঘিরে থাকে।

রসিকলালের ভীরু অনুসন্ধিৎসু চোখে এখন উৎকণ্ঠা তীব্র। হঁাড়িটার দিকে একবার তাকাল। গোটা মুখটার চামড়া কেঁপে, বীজকুড়ি ফুটল। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'আমি জানতাম না হে বরজ।'

'জাইনতেন গড়াই মশায়।' দূর আকাশের বাজ বাজা কাছে নেমে এলো, 'জাইনতেন। আপনার চখের ইশারায় কী না হয়? মানুষকে বিশ্বাস যান না। রাখা আমার চেরকালের মুখচোরা ভাই। ঘরে উয়ার যোয়ান বউ, দুটা বিটি ছাওয়াল। উয়াকে পাহারার দলে দিয়ে আমি জন মজুরি কইরতাম—ঘর সোমসার দেখা শোনা—তা, হঁ ললিত আমাকে সব বুল্যেচে। পুলিশ এসেছিল। উসব তুক তাগ, বাগ আপনাদের জানা। রাখার মড়াটা চালান হয়্যা গেলছিল বদ্ধোমানের সদরে। বাড়ি মা'টো বুক্ক চাইপড়ে কেইন্দে পাগল। বউটো মাটিতে পড়ে দাপাদাপি, কপাল কুটে অক্ত মাখামাখি। রাখার লাশ আমরা পাই নাই। এগার অঁাটি ধানের লেগ্যে—কত্‌ত কর্যে ললিত বুল্যেছিল। শুইনলেন নাই। ভাইটো আমার চোর ছিল নাই।' সে হঁাড়ির ওপর থেকে সরু ডাল আর গামছাটা তুলে নিল। হঁাড়িটা রাখল রসিকলালের বেঞ্চিতে। তার পাশে।

রসিকলালের মুখে রক্ত নেই। ঠোঁট শুকিয়ে আমশি। হঁাড়ির দিকে তাকিয়ে তার মরণ দেখছে। আতঙ্কে চোখের ভাঁজ বড়। ঝটিতি উঠে দাঁড়াল। গাড়ি কোথায় থামলো, কখন ছাড়লো, হিসাব নেই। আর্তস্বরে

চিৎকার করল, 'বরজ!'

'ভগমান পাইঠেছেন আমাকে গড়াই মশায়। আপনি বুইস্‌লেন।' কালা পাথরে বাজ ডাকছে।

রসিকলাল জানালার গায়ে কোণঠাসা। এক হাতে বাংক খামচে ধরল। স্বরে আর্ত চিৎকার 'বরজ, বাঁচাও হে।'

'ক্যানে? আপনাকে বাঁচাব ক্যানে?' ব্রজহরির চোখের জলন্ত তারা দুটো রসিকলালের মুখে। কাত করা ঘাড় ফণার মতো উদ্যত, 'আপনার মতন পুলিশ্‌ হাত করবার তুক জানি না। আমার টাকা নাই। আপনাকে কালে খাবেক, কেউ জাইনতে লাইরবে। লোকে বুইলবে রসিক গড়াইকে সাপে খেঁইয়েছে।'

রসিক গড়াইয়ের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পা কাঁপছে। শার্ট ফতুয়া তুলে, এক টানে কোমরের কষি থেকে বের করল টাকার লম্বা সরু থলি। ব্রজহরির কোলের কাছে ছুঁড়ে দিল। আধবুড়ো ভোগী লোকটার গলায় প্রাণ ভিক্ষার কান্না, 'বরজ এই রাখ বাবা। এক হাজার তিনশ সাতষট্টি টাকা আছে ও'তে। তুমি নাও। বাঁচাও হে আমাকে।'

'আমি কি ছেনতাইবাজ বাবু? পেরানে বাঁইচতে টাকা দিচ্ছেন।' পাথরের মুখের খাঁজ ধারালো হয়ে উঠল। মাথার ওপরে নেমে আসা মেঘে বাজ বাজছে, 'আমার মা-টো বুক চাপড়ে গাঁয়ে কেইন্দে ঘুরে ঘুরে মল। রাখার কচি বউটোকে খেতে দিতে পারি নাই। আমার বউ আর চারটো বিটাবিটি। রাখার দুই বিটি। দু-ভাই সামাল দিতে মুখে গাঁজলা উইঠত। বাপ মরেছে সি কত্‌তকাল আগে। আমার পরে দুইটা ভাই মরে গেলছিল। উরাদের পরে আর একটা ভাই, থাকল নাই। ত, উয়ার পরে রাখা, জানে? না, বাঁচে না। তাই ছোট ভাইটার নাম রেখেছিল রাখহরি। রাখা গেল নাই। দিন মজুরি জুটে না, এক মাল ওস্তাদের সাগ্‌রেদি করে এখন সাপ ধরো বেড়াই। তা, আই কী কপাল, রাখার বউটোকে ঘরে ধরে রাইখতে লাইরলাম। পেটে খিদে, গতরে খিদে, কে মিটাবেক বটে। বিটি দুটাকে রেখো ঘর ছেড়ে গেল গা। আপনি টাকা দিচ্ছেন গড়াই মশয়? আমি ছেনতাইবাজ লয়। ভাইটো আমার আর ফিরে আসবে নাই।' সে ঝুঁকে পড়ল।

রসিকলালের সারা গা থরথর কাঁপছে। কোমরের কষির কাছ থেকে টাকার থলি টানতে গিয়ে ধুতির বাঁধন আলগা। কোঁচা খসে পড়ছে।

ঘামের ধারা মুখে। গলার শিরগুলো পাটের দড়ির মতো ফুটে উঠেছে। হা মুখের ফাঁকে জিভটা বেরিয়ে আসছে। তার নিজের উক্তি, 'সাক্ষাৎ যম'। সে যমের সামনে শেষবারের মতো ভাঙা গলায় বুক ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'পায়ে পড়ি হে বরজ, এবারের মতন বাঁচাও।'

'ইবার আর সিবার দুবার কে বাঁচে?' ব্রজহরি বাঁ হাতে সরু ডালটা বাগিয়ে ধরল, 'আমার ভাইটো একবার জইম্‌মেছিল, একবার মর্যোচে। আর ফিরবেক নাই। গড়াই মশায়, রাখা দেইখছে, আপনি উয়ার কাছে যাবেন। এগার আঁটি ধন—নলিত আমাকে সব বুলেছে—উ ধান আপনার লোকেরা চুরি করেছিল। অই কী গরম গ আপনার গড়াই মশায়, ধরা সরা একক্কার। বাঘ পুষে রাখেন। বিচার বিহিত নাই, বাঘের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেন। ভাইটো আমার চোর ছিল না। আপনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন? এই ল্যান, আপনার ট্যাকায় আমি মুতি।' ব্রজহরি তার নেংটির মাঝখানে হাত ঠেকাল। প্রস্রাব করার ভঙ্গি করে টাকার থলিতে থুথু ছিটিয়ে দিল, 'ল্যান, আপনাব টাকা ল্যান। আপনার টাকায় আমার ভাই ফিরে আসবেক নাই।' সে হাঁড়ির গায়ে একটা চাটি মারল। সদ্য-ধরা অতি বিষধর কালীগোখরোর দুরন্ত ফোঁসানি সরার ঢাকা ভেদ করে বেরিয়ে এলো!

রসিক গড়াইয়ের কষে গাঁজলা। যেন বিষের ছোবল আগেই খেয়েছে। হাঁড়ির দিকে অনড় চোখের তারা দুটো খসে পড়বার উপক্রম। কোঁচা গড়াগড়ি। বাংকে খামচে ধরা হাতের শক্তি নিঃশেষ। খসে পড়ছে। বাঁ হাতে বুকের জামা খামচে ধরা। থেকে-থেকে হাতে পায়ে খিচুনি লাগছে। লোকটার লম্বা দশাসাইর ভোগী শরীর আস্তে আস্তে নীচে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কথা শেষ, গলায় কেবল গোঙানির স্বর।

ব্রজহরির জ্বলন্ত কালো চোখের তারা রসিক গড়াইয়ের মুখের দিকে। সেই চোখে আস্তে আস্তে একটা উৎসুক অনুসন্ধিৎসা জাগছে। হুঁ, সাপে কাটলে লোকে ঐরকম করে মরে। মুখে গাঁজলা ওঠে। চোখ ঠিকরে বেরোয়। শরীর নিঝুম হয়ে পড়ে। হাতে-পায়ে খিচুনি লাগে। ব্রজহরির চোখে দেখা। রক্তে ছানা কাটে যে!

গাড়িটা কত জোরে ছুটছে বোঝা যায় না। কেবল মনে হয়, টিমটিমে আলোয় কাঁচা ঘরটা ঝড়ে দুলছে। ঝম্‌ঝম্‌ শব্দের সঙ্গে বাঁশের খুঁটি খচকাবার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। রসিক গড়াই পা ছড়িয়ে মেঝেয় পড়েছে।

পিঠ ঠেকে আছে গাড়ির গায়ে। মাথাটা তবু ঝুঁকে আছে সামনে। খসে পড়া চোখের তারা হাঁড়ির দিকে। হাঁ মুখের ফাঁকে মোটা জিভটা কাঁপছে। গাঁজলার ধারা কষে। ব্রজহরির চোখে অন্যমনস্কতা। মুখের কালো পাথরের খাঁজগুলোতে ঢেউ খেলছে। সে হাঁড়িটা তুলে এনে নিজের পাশে রাখল। রসিক গড়াইয়ের ঠিকরে পড়া চোখ দেখল। ব্রজহরি নতুন গামছা তুলে, হাঁড়ির মুখ জড়িয়ে বাঁধল। রসিক গড়াই ব্রজহরির দিকে তাকাল। ব্রজহরি কাগজের টাকা ভরা থলিটা রসিক গড়াইয়ের খোলা কোঁচার ওপর ছুঁড়ে দিল। ধুলা ঝাড়া দেবার মতো হাত ঝাড়া দিল। বুকের ভিতর থেকে চাপা হুংকার উঠে এল, 'যান যান গা।'

রসিক গড়াই যেমন পড়েছিল, তেমনি রইল। হা মুখ বন্ধ হল। আতঙ্ক-গ্রস্ত চোখে সন্দেহ। ফ্যাসফ্যাসে স্বরে উচ্চারণ করল, 'বরন হে!'

'আমার ভাইটোকে খুন কইরছেন। উয়ার মোকাবিলা ইরকম হবেক নাই।' ব্রজহরি অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে, যেন অন্য কারোর সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলছে। তারপরেই গলা ফাটিয়ে হেঁকে উঠল 'যান-যান গা।'

রসিকলাল একমুহূর্ত পাথর। তারপরেই ঝটিতি কোচা টাকার থালি হাতে উঠে দাঁড়াল। স্বর তেমনি ফ্যাসফ্যাসে 'বরন হে, কী দৈব!'

'দৈবের বিধান আমার হাথে নাই।' ব্রজহরির চিৎকারে গাড়ির কামরা কেঁপে উঠল, 'দৈবের হাথে বিচার নাই। দৈবে চাষ আবাদ হয় না, আপনার গোলা ভরে না গড়াই মশাই। দৈবে ই র‍্যালগাড়ি চলে না। আপনার লিদেন দৈবে নাই। যান—যান গা-আ-আ-আ...।'

ব্রজহরির আ-আ চিৎকারে রসিকলালের নতুন পাওয়া প্রাণ কেঁপে উঠল। কোচা টাকা মুঠি করে ধরে টলতে টলতে দৌড় দিল। গাড়িটা তখন একবার থেমে আবার নড়ে উঠছিল। রসিকলাল একটা বেসামাল হাতে কোনরকমে দরজা খুলল। ইষ্টিশন কিংবা মাঠ-বাদাড়, নজর নেই। লাফ দিয়ে নামল। মুখ থুবড়ে পড়ল। চোখের সামনে ভাসছে সেই কালো আগুনের শিখা। চেরা জিভ, বিশাল ফণা, নিশ্বাসের গর্জনে বিষ। দর্শনে অর্ধেক আয়ু শেষ। একবার ছোঁয়ালে?

রসিকলালের কানে বাজছে, 'যান গা-আ-আ-আ...।'

কেন? এ কি দৈব না? সে ভেজা মাটি থেকে মুখ তুলল। গাড়িটা চলে যাচ্ছে। পিছনে দুটো লাল বাতি জ্বলছে।

রসিকলালের গলার স্বর বদলায় নি। ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বলল, 'তোমার কথা কিছু বুঝতে পারলাম না হে বরন।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

ছোট বকুলপুরের যাত্রী

চিত্রনাট্য

পূর্ণেন্দু পত্রী

টাইটেলের আগে—

পর্দা জুড়ে একটা নারকেলের মালা। ভিতরে লাল রঙ। সম্ভবত আলতা। কার যেন একটা হাত সেই রঙে ডুবিয়ে পোস্টার লিখছে। আগেই সাদা কাগজে লেখা হয়ে গেছে দুটি অক্ষর। লাঙ্গ।

এবারে লেখা হয় ল।

রাস্তার ধারের কোনও একটা দেয়াল। পোস্টার অাঁটা।

লাঙ্গল যার

জমি তার।

ক্যামেরা ট্রলি করবে অন্য একটি রাজনৈতিক পোস্টারে!

এর ফাঁকে হেঁটে যাবে রাস্তার মানুষ।

ক্যামেরা আবার ট্রলি করে এগিয়ে যাবে অন্য একটি পোস্টারে।

পরে আবার একটি। এবং তার পরেরটিতে আমরা দেখতে পাব অবিকল রাজনৈতিক পোস্টারের ধরনেই দেয়ালে অাঁটা রয়েছে আরও একটি পোস্টার। লেখা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিবেদন।

ক্যামেরা ট্রলি করবে পরের পোস্টারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে।

পরের পোস্টারে—

ছোট বকুলপুরের যাত্রী।

এরপর অন্যান্য দরকারি পরিচয় লিপি।

সিকোয়েন্স। ১ দৃশ্য। ১

আম্মার শোবার ঘর। রাত্রি। হয়তো মাঝ রাত। আম্মা শুয়ে আছে বিছানায়। কিন্তু ক্যামেরা এত দূরে যে তাকে চেনা যাবে না। আমরা

শুধু শুনতে পাব তার ভারি নিঃশ্বাস এবং চাপা যন্ত্রণার শব্দ। তার পরেই হঠাৎ দেখতে পাব জনা তিনেক মিলিটারিকে একটা বুনো ক্যাকটাসের ঝাড়ের পাশ দিয়ে দৌড়ে যেতে।

ক্যামেরা এখন আন্নার একটু কাছে। তার শরীরের স্পন্দনটা দেখা যাচ্ছে।

এর পরেই দেখা যাবে একটা সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী দৌড়ে ঢুকছে একটা কৃষক এলাকার গ্রামে, হিংস্র তৎপরতায়।

ক্যামেরা আন্নার মুখের কাছে। তার কষ্ট। এখন বোঝা যাবে একটা ভয়ার্ত স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে সে।

আন্নার স্বপ্নে ছোট বকুলপুরের গ্রাম।

দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ল তিনজন সৈন্য। মৃত্যু অথবা অত্যাচারের ভয়ে অর্তনাদ করে উঠল চাষী-বৌ।

পর্দা জুড়ে তার বিশাল আর্তনাদময় মুখ।

পর্দা জুড়ে আন্নার মুখ। ঘর্মাক্ত, যেন স্বপ্নের অসহ্য ভারে ক্লান্তও।

অন্য একটা ঘর থেকে দুজন সৈন্য টেনে এনে দাওয়ায় আছড়ে ফেলল আন্নার মাকে। বুটের ধাক্কায় উলটে দিল তার শরীর। পর্দা জুড়ে আন্নার মায়ের মুখ। অত্যাচারের ভয়ে আশঙ্কিত।

স্বপ্নে আন্না ছুটে আসছে তার মাকে বাঁচাতে। দুদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলল সৈন্যদল।

দূরে দেখা যাচ্ছে অন্য একটা বাড়ি। একটা গর্ভবতী মহিলাকেও ঘর থেকে টেনে এনে আছড়ে ফেললে দাওয়ায়। মহিলার পেটে বুকে থেৎলানি। মহিলার যন্ত্রণাকাতর মুখ পর্দা জুড়ে। গর্ভের রক্তপাত।

একটা বন্য হাত ছিঁড়ে চলেছে নোংরা একটা বালিশ। সম্ভবত গুরুতর কোনো দলিল-দস্তাবেজের সন্ধানে। কাটা জন্তুর নাড়ি ভুঁড়ির মত সেগুলো দলা পাকাচ্ছে পর্দা জুড়ে।

ফাটা দেয়াল। গ্রামের অত্যাচারিত বৌ-ঝিরা। সামনে মুখোমুখি বন্দুক উঁচনো সৈন্যবাহিনী। ক্যাপটেন কি যেন প্রশ্ন করে। আন্নার মাকে এনে ছুঁড়ে দেওয়া হয় সেই দেয়ালে। সৈন্যবাহিনীর হিংস্র মুখের উপর দিয়ে ট্রলি করে চলেছে ক্যামেরা। কোথাও যেন একটা বাচ্চার গলা-ছেঁড়া কান্না।

আন্নার ঘুম ভেঙে যায়। সে উঠে বসে বিছানায়। বিছানায় বসে

কাঁদছে তারই বাচ্চা ছেলে। আন্না পিঠে চাপড় মেরে ঘুম পাড়ায় বাচ্চাকে। সেই সময়েই চোখে পড়ে বিছানার ফাঁকা অংশটা। আজ শনিবার। তার স্বামীর ফেরার দিন কারখানা থেকে। সে ঘুরে তাকায় চুপড়ি ঢাকা খাবারের দিকে। উঠে এসে ঢাকা খোলে। না, খায়নি কেউ।

কেরোসিনো-র কুপি হাতে আন্না বেরিয়ে আসে বাইরে। উদ্বিগ্ন চোখে তাকায় এদিক-ওদিক। এগিয়ে যায় রাস্তায়। শূন্য জনহীন পথ অন্ধকারে ঢাকা। আন্না ফিরে আসে। ঘরে না ঢুকে বসে পড়ে দাওয়ায়, অসহায়ের মতো।

দৃশ্য। ২

মফস্বলের ছোট্ট একটা দোকান। রাত্রি। ১৪-১৫ জন শ্রমিক গাদাগাদি করে শুয়ে আছে স্টেশনের ওয়েটিংরুমে। কেউ বেঞ্চে। কেউ মাটিতে। কেউ ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে। কারো চোখে ঘুম নেই। কেউ মশা মারে। কেউ জেগে ওঠে আচমকা ঘুম ভেঙে। কেউ বিড়ি ধরায়।

দৃশ্য। ৩

ভোর। আন্নার বাড়ির দাওয়া। গতরাত্রে ঠিক যেখানে সে বসেছিল, এখন স্টেশনে ঘুমিয়ে পড়েছে আঁচল বিছিয়ে।

দৃশ্য। ৪

ভোর। স্টেশন। ৮ জন শ্রমিক উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। এদিক-ওদিক দেখছে। কোথাও ট্রেন-চলাচলের কোনো সম্ভাবনা নেই যেন। শ্রমিক ৮ জন বিষণ্ণ মুখে হেঁটে চলেছে স্টেশন-সংলগ্ন বনাঞ্চলের পথ ধরে।

দৃশ্য। ৫

সকাল। দূর থেকে দেখা যায় আন্না আসছে একটা এঁদো পুকুরে এঁটো বাসন নিয়ে। বাসন ডোবায় জলে। ছাই দিয়ে দাঁত মাজে। এই সময়েই of found-এ শোনা যায় গ্রামের মানুষের দূরের চেঁচিয়ে-বলা কথাবার্তা।

আন্না দাঁত মাজা থামিয়ে কান পাতে কথায়।

—আরে বাসু-উ, অ বাসু, তদের বঙ্কিম ফিরেছে-এ?

—কে গ, সেজ জেঠা? না গ দাদা ফিরে নি।

—আরে কে কথা বলু? হারু নাকি? আরে মদের অধরও তো ফিরে নি।

—শনিবারের কেউই থালে ফিরে নি নাকি কাল?

—দিবাকর ফিরেছে ?

—আরে খারাপ-মন্দো কিছু ঘটল নাকি কোথায় ? হ্যাঁরে কাল রেতে টেরেনের শব্দ পেয়েছিলু কেউ ?

—না গ

টেরেনের শব্দো পাই নি একদম।

—একটা কিছু কাণ্ডো ঘটেছে থালে।

—পধ্যানের চালাই যাই চলো। সোবাই কে খবোর দিয়ে দাও গো-ও।

আন্নার মুখ। উৎকর্ণ। এই সব কথাবার্তা যেন নতুন এক ভয়ের সম্ভাবনা জাগায় তার মনে।

দৃশ্য। ৬

সকাল। স্টেশন-সংলগ্ন অঞ্চল। সবে খুলেছে একটা চায়ের দোকান। ৮ জন শ্রমিক সেখানে এসে চা খায়। আর সেই তাদের চোখে পড়ে কারা যেন দেয়ালে আঁটছে টাটকা পোস্টার।

হালোড়ের চটকলে শ্রমিক হত্যার তদন্ত চাই।

দৃশ্য। ৭

সকাল। ভিন্ন অঞ্চল। খালের বাঁধ দিয়ে চলেছে ৮ জন শ্রমিক। বনের ভিতর থেকে সামনে এগিয়ে আসছে তারা। এমন সময় দেখতে পায় একটা ফাঁকা লরি। দৌড়ে, প্রাণপণ চিৎকারে সেটাকে থামায়। নিজেদের অসুবিধের কথা জানায়। শেষ-মেশ রাজি হয় লরিওয়ালা। শ্রমিকরা লাফিয়ে ওঠে লরিতে। লরি দৌড়তে থাকে।

দৃশ্য। ৮

ঈষৎ বেলা বেড়েছে। অনেক উঁচু থেকে আমরা দেখতে পাই পধ্বানের উঠোন। অল্প কিছু গাঁয়ের মানুষ জড়ো হয়েছে সেখানে। দুজন চাষী চলেছে উঠোনের দিকে।

লরি। শ্রমিকরা চলেছে।

একটা ফাটা ভাঙা দেয়ালের উপর দিয়ে ট্রলি করে ক্যামেরা একটা জায়গায় এসে থামে। বিমর্ষ আন্না ছেলে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসে।

পধ্বানের উঠোনে লোক বাড়ে। ছেলে বুড়ো মহিলা। লরি ছুটে চলেছে। শ্রমিকদের মুখে কথা নেই। তারা যেন ঘরে ফেরার ভাবনাতেই মগ্ন।

আন্না বাঁশবনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছে সামনে।

পঞ্চায়েতের জমায়েতে অনেক লোক।

লরী চলেছে। আন্না একটা ভাঙা দেয়ালের সামনে দিয়ে এগিয়ে যায়। গ্রামের আরও কিছু মহিলা দাঁড়িয়েছে যেখানে' তাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। সকলের চোখই জমায়েতের দিকে। জমায়েতের অংশ। তাদের পিছন দিয়ে চলেছে একটা গরুর গাড়ি। গাড়ি দেখে কোনো খবর পাওয়ার জন্যেই ভিড় থেকে প্রশ্ন ওঠে—

—কোত্তোকে আসা হচ্ছে গ?

গাড়োয়ান জবাব দেয়—

—বাজার থিকেন।

—কিছু খপোর শুনলে?

—কিসের খপোর?

—এই কুনুদিকে কুনু রকম গণ্ডগোল-টণ্ডগোল হয়েছে কিনা?

—না, সে সব কিছু শুনিনি গ। তবে বাজারে চায়ের দোকানে কারা যেন বলাবলি করতেছিল কি সব।

—কি বলাবলি করতেছিল গ?

—কুন চটকলে নাকি গুলি চলেছে কাল বৈকালে। শ্রমিক মরেছে পাঁচ-ছ জনা। শ্রমিকরা টেরেন-ফেরেন সব বন্ধো করে দিয়েছে। কারফু হয়েছে।

আন্নার মুখ। দূরের কথোপকথনের শেষাংশ শুনছে সে।

—হ্যাঁ গ, কুন কারখানায় গুলি চলেছে জান কিছু?

—না গ, সে-সব কিছু জানি নি।

গাড়োয়ান চলে যায়।

বেদনা অথবা দুর্ভাবনার একটা নতুন মাত্রা যোগ হয় যেন এবার। ক্যামেরা ছুটে যায় বিভিন্ন মানুষের মুখে। ভেঙে পড়া মুখ। এরপর ক্যামেরা ম্যান উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ায় গ্রামের ভিতরে। ভেসে ওঠে বিপন্ন গ্রামের ছবি। অজস্র মুখ। শোকার্ত, চিন্তিত। ঘুঁটের দেয়াল। বাসি ভাতের হাঁড়ি। দোলায় ঘুমন্ত শিশু। স্বামীর জন্যে অপেক্ষমান বিষণ্ণ চাষী বৌ। ফাঁকা দেয়ালে টাঙানো ভাঙা হ্যারিকেন। একটা গরু। হয়তো ক্ষুধায়, নয়তো গৃহস্বামীর জন্যে ঘাড় উঁচিয়ে। মনমরা বালক। ন্যাংটো শিশু। নিঃস্পন্দ ছাগল। মানুষের মুখে আঁচড়কাটা বিষন্নতা। ছেঁড়া ছাকনি জাল গাছে টাঙানো। মরা গাছের ডালে শুকোতে দেওয়া ছেঁড়া

শাড়ি ওড়ে বাতাসে।

দৃশ্য। ৯

মাঠ। কয়েকজন চাষী কাজ করছে মাঠে। অনেক দূর থেকে লরির শব্দ পেয়ে একজন চাষী তাকায়। দেখা যায় একটা লরি থেকে কারা যেন নামছে। চাষীটি আরও নিবিষ্ট ভঙিতে তাকায়।

৮ জন শ্রমিক হেঁটে আসছে জমির আলপথে।

চাষীটির মুখ। আরো নিবিষ্ট তার দেখার ভঙি।

৮ জন শ্রমিক আসছে।

এবার সে চিনে ফেলতে পারে তাদের। চিৎকার করে ওঠে আনন্দে।

—আরে ঐ তো বঙ্কিম কাকা! ঐ তো দিবাকর দা।

অন্য একজন চাষীও চিনতে পারে এবার।

প্রথম চাষীটি কাস্তে হাতে দৌড়তে থাকে গ্রামের দিকে।

—সোবাই ফিরে এসতেছে গো। সোবাই ফিরে এসতেছে...এ।

ক্যামেরাও ছুটে চলে গ্রামের দিকে।

সিকোয়েন্স। ২ দৃশ্য। ১

দুপুর। আন্নার বাড়ির দাওয়ায়। উনোন। ভাতের হাঁড়ি। গনগনে আগুনের ফুলকি। off sound-এ শোনা যায় দিবাকরের কথা।

—এই কোরে তো কুনুমতে গাদাগাদি করে রাত কাটানু টেশনেই।

তারপতো ভোর হলো। তখনো দেখি রেলের চাকা বন্ধো। কি করি। তখন মোরা ঠিক করনু, মরি-বাঁচি যা হয় হবে, হেঁটেই ঘরে ফিরবো।

আন্নার মুখ। চিবুক ঠেকানো হাঁটুতে। স্বামীর কথা শুনছে। নিজের কিছু কথা টগবগিয়ে ফুটছে যেন। দিবাকর বলে যায়—

—তো হাটতেছি। হঠাৎ দেখি কি একটা লরি। সোবাই মিলে দৌড় দৌড়! অনেক কাকুতি-মিনতি করতে যাই হোক রাজি হলো। এই করে ফেরা। একটু জল দে।

এবার দেখা যায় গোটা দাওয়াটা দূর থেকে।

দিবাকর একটা ছেঁড়া দোলায় বসে। তাদের বাচ্চা মাটিতে বসে মুড়ি খাচ্ছে। উনোনের সামনে আন্না। একটু পরে আন্না উঠে উনোন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠি এনে দিবাকরের মুখের সামনে ধরে। দিবাকর বিড়ি ধরায়। আন্না কাঠিটা নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজার কাছে দেয়ালে

ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। কথা বলে চাপা অভিমানের সুরে—

—আমি যে কী করে রাত কাটাছু, সেটা তো শুদোলেনি এগবারও ?

আন্নার মুখ। সে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—ঘুমোই আর খারাপ খারাপ স্বপোন দেখি। কাল খুব খারাপ স্বপোন দেখেছি মোর মা-বাবাকে নিয়ে। আমি এগবার বাপের বাড়ি যাবো।

আন্না ও দিবাকর ঈষৎ দূর থেকে। দিবাকর বিড়িতে টান দিয়ে নেয়। আন্না ঘুরে তাকায় দিবাকরের দিকে।

—সকোলের মুখে শুনি ছোট বকুলপুরে হুলুস-থুলুস আন্দুলন চলতেছে। ধরপাকড় হতেছে। পুলিশ যা নয় তাই করতেছে। আমি এগবার যাবো।

দিবাকর যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ে।

—এখন ছুটি মাঙলে য়ুনিয়ন বলবে আন্দুলনের সময় ভেগে পড়তেছে, ই শালা মালিকের দালাল। তারপর শ্বশুরবাড়ি যে যাবো, টাকা-পয়সা লাগবে নি? কোম্পানির সঙ্গে আজ বাদে কাল লড়াই। এ্যাডভান্স মাঙলে বুড়ো আঙুলটি দেখিয়ে দেবে। বিপদ তো চারদিকে।

আন্না বিরক্ত।

—কথায় কথায় অত নড়াই নড়াই শুনিও নি তো। মোর মা-বাবা মরল কি বাঁচল, এগদিনের জন্যে হলেও দেখে এসবো আমি।

আন্না রাগের ভঙিতে দপদপিয়ে উঠে যায় সিঁড়ি দিয়ে। বাচ্চাটা তখন মাটিতে শুয়ে, উদাসীন ভঙিতে।

দৃশ্য। ২

রাত্রি। আন্নার শোবার ঘর।

দিবাকর ঘুমিয়ে। কিন্তু আন্না সম্ভবত জেগে। কেননা আমরা দেখতে পাই সে পা চুলকোচ্ছে পায়েরই নখে। একটু পরে ক্যামেরা প্যান করে এগিয়ে যায় তার মুখে। তখন দেখা যায় সত্যিই সে জেগে। কী যেন ভাবছে। যেন ভেবে কিনারায়ও পৌঁচেছে কোনও কিছুর। স্বামীর দিকে ঘোরে এইবার।

দুজনের মাঝখানে ওদের ছেলে। তাকে না জাগিয়েই সন্তর্পণে বিছানায় উঠে বসে আন্না। ঝুঁকে পড়ে দিবাকরের দিকে। বেশ কয়েকবার ঠেলা দিয়ে জাগাতে চেষ্টা করে। আরো জোরের ঠেলায় দিবাকর চিৎকার ওঠে—

—খবরদার।
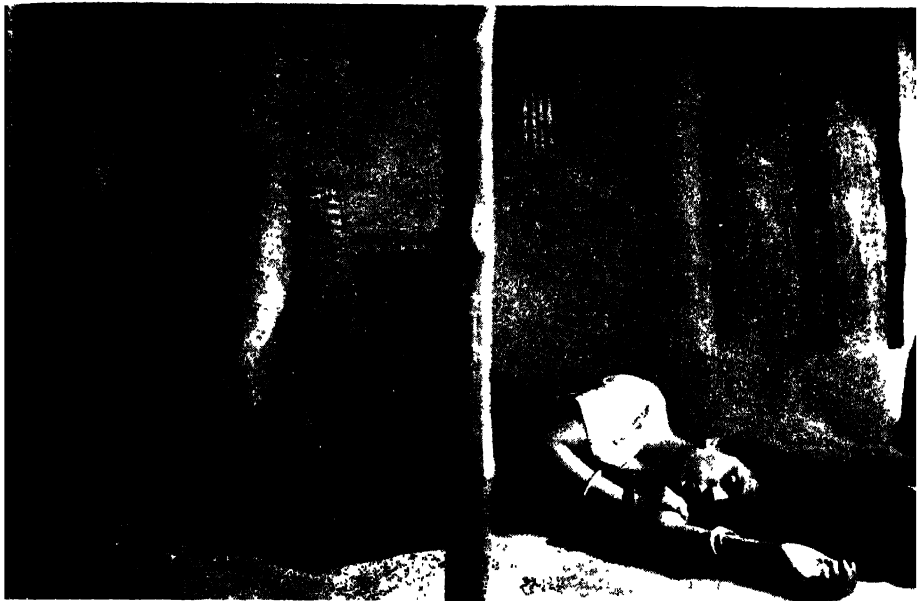
'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'

নিজের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় দিবাকরের। সে উঠে বসে বিছানায়। হাঁপাতে থাকে জোরে। আন্না প্রশ্ন করে,

—অমন চিচকার করে উঠলে যেন?

দিবাকর হাঁপাতে হাঁপাতেই উত্তর দেয়,

—স্বপ্নে দেখি কী, কারখানায় হরতাল। কোম্পানি ভাড়াটে গুণ্ডা এনে মোদের দিকে লেলিয়ে দিয়েছে। একটু জল দে।

আন্না উঠে যায়। দিবাকর নিজের উত্তেজনাকে সামলায়।

আন্না কুপি জ্বালে। জলের কলসির দিকে চলে যায়।

দিবাকর নিজের ঘর্মাক্ত মুখটা মোছে ধুতির খুঁটে।

আন্না কলসি থেকে জল গড়ায়।

একটু পরেই এগিয়ে আসে দিবাকরের কাছে। দিবাকর চকঢক করে জল খায়। গেলাসটা ফিরিয়ে দেয় আন্নার হাতে। আন্না এবার আসল প্রসঙ্গটা তোলে,

—তুমি তো ভোর হলেই চলে যাবে কারখানায়! কখন আর কথা বলব। একটা কথা ছিল।

—বল্।

—তখন টাকা-পয়সার কথা বলতেছিলে। আমি বলি কি, কুম্পানির কাছে হাত পাততে হবে নি। মোর হাতের রুপোর বালা দুগাছা···

দিবাকর নিজের হাত চাপা দেয় আন্নার মুখে। বকুনি দেয়

—তোর সব তাতেই এত ধড়ফড়ানি কেন বলতো? বাপের বাড়ি যাবি, কথাটা বলেছু, আমি পুরুষ মানুষ, আমাকে ভাবতে একটু সময় দিবি তো?

—তোমার ভাবনাতো। ভাবতে ভাবতেই দশমাস।

দিবাকর বিরক্ত।

—মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি ত। শুয়ে পড় দিকিনি, শুয়ে পড়।

দিবাকর জোর করে তার পাশে শুইয়ে দেয় আন্নাকে। একটু পরেই দিবাকরের ভালোবাসায়-ভরা মুখখানা নেমে আসে আন্নার দিকে। দিবাকরের হাত আন্নার চিবুকে। নিজের দিকে ঘোরায় তার মুখ! আন্নার মুখে এমন একটা চাপা তৃপ্তি যেন জানা হয়ে গেছে, তার বাপের বাড়ি যাওয়ার প্রার্থনা মঞ্জুর।

দৃশ্য। ৩

বেশ কিছুদিন পরের দুপুর।

ক্যামেরা প্যান করল ফাটা দেওয়ালের কাছ দিয়ে। সামনেই দেখা যাবে বাপের বাড়ি যাওয়ার সাজে আন্না আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সাজে, দিবাকর এগিয়ে আসছে। আন্নার কোলে বাচ্চা। দিবাকরের এক হাতে একটা টিনের সুটকেশ। অন্য হাতে একটা ঝোলানো হাঁড়ি। ভিতরে সিঙি মাছ।

আন্না ও দিবাকরকে দেখতে পাব গ্রামাঞ্চলের নানান পথ দিয়ে যেতে। কখনো আবার দেখা যায় দিবাকরের কাঁধে বাচ্চা। হাতে টিনের সুটকেশ।

দৃশ্য। ৪

বিকেল। মফস্বলের স্টেশন।

আন্না ও দিবাকর স্টেশনের এলাকায় পোঁছে গেছে এখন। ঝাঁকড়া একটা করবী ডালে ঝড়ের মতো হাওয়া। আন্না ছেলে কোলে নিয়ে বেঞ্চিতে বসে। দিবাকর টিকিট কেটে এনে পাশে বসে। ট্রেনের দেরি। ওরা বসে থাকে। বাচ্চার কান্না এবং খিদে সামলায়। দিবাকর বিড়ি ধরায়।

সেই সময় কানে আসে মিছিলের শব্দ। বিরাট একটা মিছিল এগিয়ে আসছে স্টেশনের দিকেই। মিছিলটাকে আমরা দেখতে পাই না। আন্না-দিবাকররাই দেখে কেবল। ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে মিছিলের শব্দ। এই সময়েই ট্রেন এসে যায় স্টেশনে। লাল পতাকাসহ বিরাট মিছিলটা গাড়িতে ওঠে। তার পাশের কামরায় উঠে পড়ে আন্না ও দিবাকর। ট্রেনের এঞ্জিন। আস্তে আস্তে চাকা ঘুরতে থাকে। সেই মুহূর্তেই আমরা শুনতে পেয়ে যাই একটা সমবেত সঙ্গীতের সুর।

—উঠ্ঠা হ্যায় তুফান, জমানা বদল গয়া।

অনুমানে বুঝতে পারি গাইছে মিছিলের মানুষরাই।

গাড়ির কামরায় আন্না ও দিবাকর। গাড়ির বাইরে পতপতিয়ে ওড়ে লাল পতাকা। আন্নার মুখের আদলে পাতলা একটা সুখ। বাপের বাড়ি আর অনেক দূর নয় ভেবেই হয়ত।

দৃশ্য। ৫

প্রায়-সন্ধে। অন্য একটা স্টেশন।

স্টেশনের ওভার-ব্রিজের এক ধারে তিনটি যুবক নিজেদের মধ্যে মারামারি করে চলেছে। ক্যামেরা ওদের কাছে গেলে আমরা দেখতে পাব, এই

অন্তর্কলহটা আসলে একটা মজার খেলা। মারামারির মধ্যেই মিশে আছে খিলখিল হাসি। খেলা থামে। এই সময়েই দূর থেকে শোনা যায় ট্রেনের অস্পষ্ট শব্দ। এবং সেই সঙ্গে আগের দৃশ্যের কোরাস।

যুবক তিনটি ওভারব্রিজের রেলিং ভর দিয়ে দাঁড়ায়। মুখে হৈ হৈ হাসি। যেন আক্রমণাত্মক এই খেলায় ভারি সুখ পেয়েছে ওরা। অথবা খেলার মধ্যে দিয়েই ওরা প্রস্তুত হতে শিখছে অন্য কোনো আক্রমণের জন্যে। ওদের পরনে সাদা খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি। দূরের ট্রেন এগিয়ে আসে কাছে। গানের জোরালো শব্দটা কানে আসে ওদের। ওরা দেখতে পায় দূরাগত ট্রেনটির সামনের কামরার দুপাশে উড়তে থাকা লাল পতাকা।

ওদের মুখ হিংস্র হয়ে ওঠে।

আমরা শব্দ শুনে বুঝতে পারি ট্রেনটি থামল। এবং চলে গেল। খুব নিচু থেকে এখন, দেখতে পাব ওভারব্রিজের সিঁড়ি। যুবক তিনটি প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ে ওভারব্রিজের সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামছে। ওরা যখন সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে সেই সময়ে আমরা দেখতে পাব আন্না ও দিবাকরকে। ওরা সিঁড়িতে উঠবে। যুবক তিনটি ওদের আটকায়। তবে আক্রমণের ভঙ্গিতে নয়। অনেকটা ঠাট্টা-ইয়ার্কির ধরনে।

—ওহে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

—ছোট বকুলপুর।

ছোট বকুলপুর নামটা শুনেই যুবক তিনটি দমকা হাসিতে ফেটে পড়ে।

—ছোট বকুলপুরে তোমার দরকার কি হে ?

—মোর শ্বশুরবাড়ি।

—শ্বশুরবাড়ি বলতে তো আমরা একটা জায়গাই জানি।

যুবক তিনটির দমকা হাসি।

এই সময় একজন যুবক মুখ থেকে পানের পিক ছিটোয় স্টেশনের জমিতে। দিবাকর তাকায়। দিবাকরের চোখে সেটা যেন এক দলা রক্ত।

—যাওয়া যে হচ্ছে, সেখানকার খপোর জানা আছে তো ?

—খবর জেনেই এয়েছি বাবু।

—প্যাদানির নাম বৃন্দাবন, সে খপোরটাও জানা আছে তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই জন্যেই যাচ্ছি। মার খেয়ে মানুষগুলো মরলো, না স্বাধীন হলো, তারই খবর নিতে চলেছি।

—তোমার তো খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হে ?

—না বাবু, গরিব মানুষ, কথা কোথা পাব ?

দিবাকর ওদের অগ্রাহ্য করেই ওভারব্রিজে ওঠার জন্যে পা বাড়ায়।

একজন যুবক জিজ্ঞেস করে—

—ওহে শোন শোন, টিকিট আছে।

দিবাকর টিকিট বের করে দেখায় পকেট থেকে।

যুবক তিনটি ঈষৎ অপ্রস্তুত যেন।

আন্না দিবাকর ওভারিব্রজে উঠতে থাকে।

সিকোয়েন্স। ৩ দৃশ্য।. ১

সন্ধে। স্টেশন সংলগ্ন দোকানবাজার।

ক্যামেরার সামনে এখন একটা গরুর গাড়ির চাকা। দূরে হ্যাজাক-আলান দোকান পাট। দূর থেকে এগিয়ে আসে আন্না ও দিবাকর, একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে পড়ে আন্না। দিবাকর হাঁক দেয়—কে যাবে গা ?

চায়ের দোকানের আবছা অন্ধকারে রাম গাড়োয়ান।

হাতে চায়ের কাপ। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়—

—যাবেন কোথা ?

—ছোট বকুলপুর।

এবার রাম গাড়োয়ানের গলার স্বরটা শক্ত।

—পারবনি বাবু।

—কেন ? পারবেনি কেন ?

—আরে বাবু। আপনারা ভিন গাঁয়ের লোক, তাই জানবেন কি করে ! সিখেনে সৈন্য-পুলিশ গ্রাম ঘিরে আছে। রীতিমতো লড়াই চলতেছে রোজ।

এবারে মুখ খোলে আন্না।

—আচ্ছা ওখানতক্ নাই গেলে বাবা, যদ্দূর যেতে চাও নিয়ে চলো, বাকিটা মোরা হেঁটেই যাবো।

—অত হাঙ্গামা পোষাবে নি দিদি। কি বল ঘোষের পো ?

রামের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আমরা পৌঁছে যাই গগন ঘোষের কাছে। সে বিড়ি ধরাতে ধরাতেই উত্তর দেয়

—হ্যাঁ, আপনারা অন্য গাড়ি দেখুন দিদি।

আন্নার যেন জেদ বাড়ে।

—তমরা পুরুষ মানুষ হয়ে ডরাচ্ছ ? আমি বাচ্চা কোলে মেয়ে মানুষ

যাব, আর তমাদের এত ডর ?

রাম বিব্রত ভঙ্গিতে গগন ঘোষের দিকে তাকায়। গগন ঘোষের বিবেকে ধাক্কা মেরেছে আন্নার যুক্তি। তাই সে বলে

—কমলতলি তক্ যেতে পারি ? হবে ?

আন্না রাজি হয়ে যায়।

গগন উঠে দাঁড়ায় বিড়িতে শেষ জোরালো টান দিয়ে।

দৃশ্য। ২

রাত বেড়েছে। গ্রাম্য সড়ক।

গগন ঘোষের গরুর গাড়ি। ভিতরে আন্না দিবাকর, তাদের ছেলে।

গাড়ির দুলুনিতে দুলছে তারা। গগন আপন মনে গেয়ে চলেছে একটা গান। দুলতে দুলতে, সারা দিনের হাঁটার ক্লান্তিতে, ঘুম এসে যায় আন্নার চোখে। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে। যেন পৌঁছে গেছে ছোট বকুলপুরে। যেন সে পায়ের ধুলো নিচ্ছে মায়ের। অনেকদিন পরে মেয়েকে কাছে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছে মা। মা-মেয়ে দুজনের মুখেই উচ্ছল হাসি। গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে যায় আন্নার। জেগে ওঠে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে দোলে। দিবাকরও। মনে যেন প্রশান্তি। আবার ঘুমিয়ে পড়ে আন্না। স্বপ্নে আবার সে ফিরে গেছে ছোট বকুলপুরে। এবারের স্বপ্নটা আগের স্বপ্নের বিপরীত। বিধবার বেশে তার মা। পরনে সাদা থান। সিঁথি সিঁদুরহীন। তারই পায়ের কাছে সাদা চাদরে ঢাকা বাবার মৃতদেহ। চাদরে রক্তের দাগ। আন্না হাঁটু মুড়ে বসে তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। ধীরে ধীরে চাদরটা সরায় বাবার মুখ থেকে। তারপর কান্নায় আছড়ে পড়ে মৃত বাবার উপর। ঠিক এই সময়েই তার ভয়াবহ দুঃস্বপ্নটা ভেঙে যায়।

দিবাকর ঠেলা দিয়ে ভাঙিয়ে দেয় তার ঘুম।

—এ্যাই, ওঠ, ওঠ, কমলতলি এসে গেছে।

আন্না ঘুম ভরা চোখে তাকায়। সম্বিৎ ফিরে পেতে সময় লাগে তার।

গাড়োয়ান নেমে যায় গাড়ি থেকে।

আন্না ও দিবাকর গাড়ি থেকে নামার জন্যে প্রস্তুত হয়।

দৃশ্য। ৩

কমলতলির বাজার। রাত্রি।

একটা মিষ্টির দোকান। দোকানদার টাকা গুনছে।

এই সময় তার যেন চোখ যায় দুজন যাত্রীর দিকে। দোকানদার সেদিকে ব্যগ্র তাকিয়ে আহ্বান জানায়।

—আসুন বাবু, আসুন। বসুন বাবু। বসুন মা।

আমরা দিবাকর বা আন্নাকে দেখতে পাইনা তখনও।

—কি খাবেন বলুন বাবু? কি দুবো?

দোকানদারের প্রশ্নে আমরা এবার ঘুরে তাকাতে দেখি দিবাকরকে আন্নার দিকে।

—কি খাবে?

আন্না উত্তর দেয় চাপা গলায়।

—হালুয়া থাকলে বলো না।

দিবাকর দোকানদারের দিকে ঘোরে।

—হালুয়া আছে?

এবারে আমরা দোকানটাকে দেখতে পাই অনেকটা দূর থেকে। ক্যামেরার সামনে গগন ঘোষের গরুর গাড়ি। সে গাড়িটাকে বা গরুটাকে দেখাশোনা করছে। আমরা দূর থেকে শুনতে পাই দোকানদারের উত্তর।

—হালুয়া কচুরি কি আর এত রেতে থাকে বাবু। উসব সকাল বেলায় হয়, সকাল বেলাই চেঁটে-পুঁটে বিক্রি হয়ে যায়। রসগোল্লা খান না। ল্যাংচা খান। আমার দোকানের ল্যাংচার খুব নাম। দুবো?

এই সময় গগন ঘোষ এগিয়ে যায় দোকানের দিকে। দোকানদার তাকে চেনে। তাদের মধ্যে, কি হে কেমন আছো, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে গাড়োয়ান জানায়

—এই সোয়ারি নিয়ে এলাম।

গগন ঘোষ দিবাকরদের পাশের বেঞ্চে বসে। এরই ফাঁকে দিবাকর দু প্লেট খাবারের অর্ডার দিয়েছিল। গগন ঘোষকে দেখে কিছু একটা মনে হয় যেন। গগন ঘোষের জন্যেও আর এক প্লেট খাবার দিতে বলে। গগন আপত্তি জানায়।

—মোকে? না বাবু, না। আপনারাই খান না, আপনারাই খান।

দিবাকর তার কৃতজ্ঞতা জানায় গগনকে।

—না গো বাবু, অনেক উপগার করেছো তুমি? এতটা পথ তুমি না নিয়ে এলে মোদের আসাই হতো নি।

দোকানদার প্লেটে মিষ্টি তুলতে তুলতে প্রশ্ন করে

—যাবেন কোথা ?

দিবাকর উত্তর দেয়

—ছোট বকুলপুর।

চমকে ওঠে দোকানদার।

—ছোট বকুলপুর ? এত রেতে ?

—কেন ?

—না মানে দিনকাল তো ভালো নয় সেখানে। সন্ত্রাসের রাজত্ব।

ওরে বাদলা, যা দিয়ে আয়।

এবার ক্যামেরা চলে আসে একটা পানের দোকানে। দিবাকরকে দেখতে পাই না আমরা। কিন্তু তারই গলায় শুনি

—বিড়ি দাও তো এক বাণ্ডিল। আর পান।

পানওয়ালা প্রশ্ন করে

—ক খিলি বাবু ?

—দু-খিলি, না তিন খিলি দাও।

পানওয়ালা পান সাজতে থাকে। ক্যামেরা ফিরে আসে মিষ্টির দোকানে। দিবাকর পানের মোড়ক হাতে নিয়ে দোকানের চত্বরে ঢুকে প্রথম খিলিটা দেয় আন্নাকে। পরেরটা দিতে এগিয়ে যায় গগন ঘোষকে। গগন বলে

—না বাবু, পান খাই না।

দিবাকর নিজে একটা পান খায়। তারপর হাতে সুটকেস ও শিঙি মাছের হাঁড়িটা নিয়ে আন্নাকে বলে

—চল।

ওরা এগিয়ে যায় দূরের দিকে। গগন দেখে। গগনের ঠিক ক্লোজ-আপ। তার চোখে-মুখে কী যেন ভাবনা। যেন দিবাকরের সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েই সে চিন্তা করছে কিছু। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায় দিবাকরদের দিকে।

—ও বাবু, বাবু-উ। দাঁড়াও গো, দাঁড়াও !

দিবাকররা থমকে দাঁড়ায়।

গগন তাদের সামনে আসে।

—এত রেতে দেড় কোশ যাবেন কি করে ? মরি-বাঁচি যা হয় হবে, চলো পৌঁছে দি।

দৃশ্য। ৪

গরুর গাড়ি চলেছে অন্ধকার পথে।

আন্নার পান-চিবনো মুখে চাপা খুশির ঝিলিক। আর একটু পরেই সে যেহেতু পৌঁছে যাবে তার গ্রামে। তার মা-বাবার কাছে। মনে মনে সেও বোধহয় কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছে গগনের প্রতি। তাই বলে

—মুখপোড়া ভগবান যে এক চোখা। নইলে তোমার নতুন গাড়ি হত বাবা। জোয়ান বলদ হত

গগন বলে

—গাড়োয়ান হলে কি হবে মা। মোরাও মানুষ। কিন্তু মানুষ হলে কি হবে, যা সব কাণ্ড চলতিছে, রাত-বিরেতে গাড়ি চালাতে ভয় করে।

গাড়ি চলতে থাকে। আন্না যেন একটু সাহস পেয়েই প্রশ্ন করে এবার

—মোদের গাঁয়ের ব্যাপার জান কিছু?

—ছোট বকুলপুরের? জানি গো মা সব জানি। কিন্তু বলার উপায় নেই। অন্ধকারেরও কান আছে।

—গাঁয়ের মানুষরা সব বেঁচে আছে তো?

গগনের যেন মনের গোপন দরজাটা ভেজিয়ে রাখতে পারে না আর।

—বেঁচে আছে বৈকি! নইলে লড়াই কিসের?

গাড়ি যায় একটুখানি। আবার কথা বলে গগন।

—গোড়ায় গাঁয়ের মানুষরা খুব মার খেয়েছিল। মার খেতে খেতে এখন এমন একজোট হয়েছে, উ চৌধুরীই বলো আর ঘোষই বলো, অমন দশটা জোতদার এলেও বাগ মানাতে পারবে নি।

গাড়ি যায়। আন্না দোলে, দিবাকরও। আবার কথা বলে গগন

—পুলিশ, মিলিটারি ইস্‌পাই কত রকমের কাণ্ড করতিছে। উ তিভাগার আন্দুলন তবু দমবার লয়।

গাড়ি চলে যায় দূরের দিকে। আমরা গগনের কথা শুনি।

—আর মিলিটারি এসে করবে টা কি? গাঁয়ে থাকে তো শুধু মেয়ামানুষ। পুরুষ মানুষরা যে কোথাকে গা ডুবিয়ে থাকে, মিলিটারির বাবাও খুঁজে বের করতে পারল নি এতদিনে।

গাড়ি চলে। আবার গগনের কণ্ঠস্বর

—আর গানও বেঁধেছি তেমনি সব, আন্দুলনের। এ্যাই

হেই সামালো ধান হো
কাস্তে দিও শান্ হো
    কত রকমের সব গান
উঠা হ্যায় তুফান জমানা বদল গয়া
কত সব গান।

দিবাকরের মুখ। গগনের কথা শোনা যাচ্ছে

—কলিযুগ শেষ হতেছে তো! রাজার প্রেজার এমন লড়াই বেঁধেছে তাই।

এইসব 'ঈস্' বলে একটা শব্দ করে আন্না।

দিবাকর ঘুরে তাকায়।

—কি হয়েছে?

—হেগেছে। একটু ধরতো।

দিবাকর, আন্না, বাচ্চা তিনজনকেই দেখতে পাচ্ছি এখন। দিবাকর বাচ্চাটাকে ধরে। আন্না মোছামুছি করছে। কাঁথার উপরে বাচ্চার পায়খানা। আন্না কাঁথাটাকে মোড়ে।

গাড়ি চলতে থাকে।

গাড়ি এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। হঠাৎ একটা চিৎকার ওঠে

—হল্ট।

চমকে ওঠে ওরা তিনজন।

আন্না, দিবাকর আর গগন। আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের মুখে এসে পড়ে টর্চের আলো।

প্রথমে ওরা দেখতে পায় এক সার মানুষ।

তারপর আলাদা আলাদা করে দেখে নেয় যেন।

মাঝখানে নেতা। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। হাতে প্লাস্টার। চোখে কালো গগলস্। ওদের চোখ মুখ থেকে নামলে দেখতে পাবে নেতার হাতে রিভলভার। এবার আমরা সমস্ত দৃশ্যটাকে দেখবো অনেক দূর থেকে। নেতার কণ্ঠে কর্কশ জোরালো প্রশ্ন

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

উত্তর দেবে গগন ঘোষ

—টেশনের টেরেনগাড়ির প্যাসেঞ্জার আজ্ঞা।

—শাট আপ। তোকে কে জিজ্ঞেস করছে? কি নাম

—গগন ঘোষ, আজ্ঞা।

—চোপ্‌। তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। কি নাম তোমার? তুমি হে, তুমি।

এবার দিবাকর মুখোমুখি হবে আক্রমণকারী নেতার।

—আমার? দিবাকর দাস।

—বাবার নাম?

—মনোহর দাস। তেনা সগ্‌গে গেছেন। তিপান্নের মন্বন্তরে। উপোস দিয়ে মিত্যু।

—এত কথা কিসের? যা জিজ্ঞেস করব, শুধু সেইটুকুর উত্তর দেবে। কি কর।

—মজুরি।

—কোথায়?

—ঘনশ্যাম বেটনেট কারখানায়।

—এদিকে এসেছ কিসের জন্যে?

আন্নার উৎকণ্ঠ মুখ। যেন আঁচ পাচ্ছে কোনো দুর্ঘটনার। তার মুখের উপরে শুনতে পাব দিবাকরের কথা।

—ইদিকে হাঙ্গামা হচ্ছে শুনন্থ। বৌ কাঁদতে লাগল। তার বাপ ভাই মরেছে না বেঁচে আছে।

ক্যামেরা এখন নেতার এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের পিছনে। দিবাকরের মুখে টর্চের আলো।

আন্না ঈষৎ অন্ধকারে। বাচ্চাটা ভয় পেয়ে কাঁদছে। দিবাকর শেষ করে তার কথা।

—তো মোদের কারখানায় তো স্ট্রাইক লেগে গেল। তাই—

দিবাকরের কথা শেষ হবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়বে নেতার প্রশ্ন

—সুটকেশে কি?

—আজ্ঞে, কাঁথা-কাপড়।

—হাঁড়িতে?

—সিঙি মাছ।

গগন ঘোষ এই সময় গাড়ি থেকে নামবে পালাবার মতলবে।

—বউ-এর চোয়া অম্বল। কোবরেজ খেতে বলেছে।

নেতার মুখ।

—এই তো বললে কারখানায় খেটে-খাও। তা কুলি-মজুরের বউ আবার কবে থেকে শিঙি মাছ খায় হে?

গগন ঘোষ পালাচ্ছে। তার পালানোর দৃশ্যের ভিতরেই আমরা শুনতে পাবো আক্রমণকারী এবং দিবাকরদের কথোপকথন। দিবাকর বলবে

—শিঙি মাছ খাওয়া মোদের বারণ আছে নাকি বাবু?

—শাট্ আপ, বেয়াদপ।

—আপনারা এমন ভয় দেখাচ্ছেন কেন? মারবেন নাকি?

—সে পরের কথা। কি মতলবে এখানে আসা হয়েছে সেটা জানতে হবে আগে।

দিবাকরের মুখ।

—যাতে জানা যায় তার একটা বিহিত করুন না।

আন্নার মুখ। প্রাথমিক ভয় কাটিয়ে উঠেছে সে।

—গাঁয়ের চাষা পাড়ার দশটা লোককে ডেকে পাঠাও না বাবুরা। মোকে দু-চারজন চিনবেই। এই গাঁয়ের মেয়া আমি।

নেতার মুখ। মুখে তেরচা হাসি।

—যাদের সঙ্গে যোগসাজস তারা তো না চিনলেও চিনবে।

দিবাকরের মুখ। তার বিব্রত মুখে চাপ বাঁধা বিরক্তি।

—গাঁয়ে যাওয়া মোদের বারণ আছে নাকি বাবু? একশো চুয়াল্লিশ রটিয়েছ?

নেতার হুঙ্কার শোনা যাবে দিবাকরের মুখের উপরেই।

—তামাশা হচ্ছে?

নেতার মুখ। ঘুরে তাকাল সাঙ্গ-পাঙ্গদের দিকে।

—সুটকেশটা খোল।

আন্নার মুখ। দপ্‌দপিয়ে উঠবে তার চোখ। প্রতিবাদে ফেটে পড়বে সে।

—না। সুটকেশে হাত দিবে নি। কেন, মোরা কি চোর না ডাকাত?

ক্যামেরা এখন গরুর গাড়ির পিছন দিকে। আক্রমণকারীরা আন্না এবং দিবাকরের বাধাকে মুচড়ে সুটকেশটা কেড়ে নেয়। এই সময় হাঁড়িটাও গড়িয়ে পড়ে ভেঙে যাবে। জ্যান্ত শিঙিমাছ গুলোর মধ্যেও যেন প্রাণের ভয়। তাদের ছটফটানি দেখে মনে হবে, তারাও বুঝি কোনো আক্রমণের মুখোমুখি। সুটকেশ খোলা হল। ভিতরের জিনিষপত্র তছনছ করে চলেছে ঘাঁটাঘাঁটি। মায়ের জন্যে আন্না কিনেছিল বা সংগ্রহ করেছিল ছোট ছোট

ঠোঙায় চিনি, সুজি, ময়দা। একটা টিনের কৌটোয় মুড়ির মোয়া। জামা, কাপড়, গামছা, তরল আলতা, দুধ-খাওয়ানোর ঝিনুক, কাজললতা সমস্তই তদন্তকারীর নিষ্ঠুর হাতে তছনছ হতে থাকবে। এবার নেতার মুখে ফিরে আসবে ক্যামেরা। আর নেতার কানের কাছে মুখ এনে অন্য একজন কী যেন বলবে। কোনো সুপরামর্শ হয়তো। পরামর্শটাকে নেতার মনে লাগবে। ক্যামেরা নেমে আসবে নেতার হাতের রিভলভারে। রিভলভার দিয়েই নেতা ইঙ্গিত করবে, দিবাকরকে গাড়ি থেকে নামাতে। ক্যামেরা আবার চলে এসেছে দূরে। আক্রমণকারীরা গায়ের জোরে গাড়ি থেকে টেনে নামাবে দিবাকরকে। দিবাকরকে দূরে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে আক্রমণকারীরা। আন্না জানে না কোথায়। সে গাড়ির পিছন দিকে এগিয়ে আসে হামাগুড়ি দিয়ে। ভাঙা সুটকেশের তছনছ জিনিসগুলোর দিকে তাকায়। ক্যামেরা এই সময় আন্নার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেখাবে সুটকেশের তছনছ হওয়া জিনিসগুলো।

আন্না এবার চোখ তুলে তাকাবে দূরের দিকে। যে দিকে তার স্বামীকে নিয়ে গেছে আক্রমণকারীরা। কিছুই দেখতে পাবে না সে। তার কোলের শিশুর আর্তনাদ। একটা পোড়ো-বাড়ির বারান্দা। দূর থেকে আক্রমণ-কারীরা দিবাকরকে নিয়ে আসছে। ক্যামেরার সামনে দিয়ে ওরা চলে যাবে। ওদের মধ্যে দুজনের হাতে মশাল। সকলের পিছনে নেতা। আন্নার অশ্রুভারাতুর মুখ। তখনও দূরের দিকে তাকিয়ে। একটা বাড়ির সাদা দেয়াল। দিবাকরকে দাঁড় করানো হয়েছে সেই সাদা দেয়ালে। আক্রমণকারীদের একজন সার্চ করছে তার পকেট। ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেরিয়ে পড়ল শার্টের একটা পকেট থেকে কাগজে মোড়া পানের খিলি। তদন্তকারীর হাত। মোড়কটা খুলছে। খুলতে-খুলতেই সে দেখতে পেল পান-মোড়া কাগজটা একটা রাজনৈতিক ইস্তেহার। ইস্তেহারের দিকে তাকিয়েই সে চিৎকার করে উঠল।

—ইস্তেহার!

তার চিৎকারে যেন কেঁপে উঠল গাছের শুকনো ডাল।

—ইস্তেহার?

হ্যাঁ, ইস্তেহার।

তদন্তকারী ঝুঁকে পড়েছে ইস্তেহারের উপর। সামনে মশালের আলো।

—ছোটো বোকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি

বন্দুগণ! ছোটো বোকুলপুরের রক্তখোয়ী সংগাম দ্বিতীয় বোৎসরে পোদাপোান করিতে চলিয়াছে। এই ঐতিহাসিক সংগামের ভিত যতোই শক্তো সবোল এবং সংঘোবদ্ধো হইয়া উঠিতেছে, পোরাজোর ভীতো পোতি-পোকখো ততোই এই আন্দোলনে ব্যাখ্যো এবং বিপোযোস্তো করার ওভি-প্যায়ে অত্যাচারের সীমা লোংঘন কেরিয়া চলিয়াছে……

নেতার নির্দেশে সে থামবে।

নেতার মুখ।

—এ ইস্তেহার কোথায় পেলে?

আন্নার মুখ। আন্না তাকিয়ে আছে দূরে।

ক্যামেরা এখন অল্প দূরে। দিবাকর দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। তাকে ঘিরে আছে আক্রমণকারীরা। দিবাকরের উত্তর

—ইস্তেহারের তো কিছু জানিনি বাবু।

—তোমার পকেটে এল কি করে?

—পান কিননু। দোকানদার কি দিয়ে জড়িয়ে দিল, কি করে জানব।

—জড়িয়ে দিল, না নিজেই ভেবেচিন্তে জড়িয়ে নিলে।

—তা কেন করতে যাব?

—অনেক ঢং হয়েছে। এবার আসল নামটা কি বল দেখি।

—দিবাকর দাস।

আচমকা একটা ঘুঁসিতে দিবাকর আছড়ে পড়ে মাটিতে।

আন্নার মুখ। তাকিয়ে আছে দূরে। বেদনা আর ক্রোধ একসঙ্গে মিশে আছে তার মুখের আদলে।

ক্যামেরা আবার ফিরে যাবে আগের জায়গায়।

আক্রমণকারীরা দিবাকরকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেবে। নেতার মুখে সেই একই প্রশ্ন।

—কি নাম।

দিবাকরের মুখে সেই একই উত্তর। তবে আগের চেয়ে বলিষ্ঠ তার উচ্চারণ।

—দিবাকর দাস।

দিবাকরের মুখে আবার ঘুঁসি। আবার সে পড়ে যাবে মাটিতে। পর্দা জুড়ে আন্নার মুখ। হিংস্র কোনো আবেগে ফুঁসছে যেন।

ক্যামেরা আবার ফিরে আসবে আগের দৃশ্যে। আক্রমণকারীরা

দিবাকরকে দাঁড় করিয়ে দেবে দেয়ালে।

নেতার মুখে সেই একই প্রশ্ন।

—কি নাম?

দিবাকরের যন্ত্রণাকাতর মুখে সেই একই বলিষ্ঠ উচ্চারণ

—দিবাকর দাস।

পর্দা জুড়ে দিবাকরের মুখ। কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

পর্দা জুড়ে তার রক্তাক্ত মুখ। এর সঙ্গে মিক্সড হবে ছবির বাকি টাইটেল।

ক বি তা গু চ্ছ

তাহলে

চিত্ত ঘোষ

স্বপ্নের শরীরে চাকা লাগিয়ে
কেউ যদি উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে দেয়
এবং সময়ের সেই খাড়া পাহাড়ের মাথায় উঠে
একটা ইয়েতি যদি নীচের দিকে ভীষণ ঝুঁকে পড়ে
ব্যাপারটা দেখতে চায়
আর তার ভারি পায়ের চাপে
বরফ-মাখা আলগা নুড়ি পাথর যদি
ঝুর ঝুর করে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে
কিংবা সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে
কোনো পর্বতারোহীর ক্যামেরা যদি
রহস্যময় পায়ের ছাপ তোলে
এবং কোনো দুর্গম হিমবাহের কাছে
তার আস্তানার সন্ধানে বেরিয়ে
দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা যদি না ফেরে—
কোনো ঠাণ্ডা সাদা তুষার প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে
তারা যদি বাতাসের গলায় লক্ষ লক্ষ বাঘের গর্জন শুনতে শুনতে
তুষারাবৃত ঘুমের মধ্যে প্রবেশ করে
এবং কোনো রৌদ্রোজ্জ্বল উপত্যকায় উষ্ণ প্রস্রবণের স্বপ্ন দেখে—
তাহলে…

পদাঙ্ক

হীরেন ভট্টাচার্য

ঘন বরষা। আমি তুলে নিলাম নৌকোবাইচি গানের নিনাদিত পদ।
পিছিল মাটি। ছায়া পড়া সূর্য। জনপদ জনের অন্যমন।
মেঘ-মাটি-জল লালিত স্থানিক সৃজন।

রাধিকা সুন্দরী মোর, পিছন দুয়ার থাকুক খোলা।
ডাল ভেঙে আনো ফুল, আজ রাত উৎকণ্ঠ কদমতল।
গাঢ় অন্ধকারে বন্দী সুপ্রাচীন যমুনার মোহন জল।

গান গায় কে, প্রসঙ্গান্তরের গো-চারণভূমির ঘনিষ্ঠতা।
জলবন্দী কবির বুকে তৎপর যুবক মেঘের সহজ সমারোহ।
প্রথম প্রেমের স্পর্শ, সর্বনাম-ভনিতা-বিশেষণ-ক্রিয়া নির্মোহ।

ভুল

সুনীলকুমার নন্দী

মনে পড়ে নাকি, মনে পড়ে সেই গ্রাম থেকে আসা
শহরে, আবার
শহরের থেকে গ্রামে ছুটে যাওয়া, পারাপার হওয়া
কতবার সাঁকো?

সে যেন আসছে, শহরে-না-গ্রামে, ভেবে চারিদিক
ভাসে, বুক ভাসে—
সে কে, যার নামে শিরায় শিরায় ফুলে-ফুলে ওঠে
সঘন শ্রাবণ
প্রতিটি পেশীতে এত মেঘস্বর, কাছে এলে, দেখি
এ কোন পুরুষ!

লোভাতুর চোখে তমসার ঘোর আদিম শরীর
বড় বেশি চেনা—
মেঘে ভুল? না, না, আমারই তো ভুল, সব ভরামেঘে
আগুন থাকে না।

রাসলীলা

তরুণ সান্যাল

সবাই শ্রীকৃষ্ণ পায়, সব সহচরী, মধ্যখানে
তোমাকে ঘিরেই সেই অজস্র যুগল নৃত্যপর,
সব শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশি, সব রাধা আলুলিত
সব জ্যোতির্ময়ী শিলা স্বরূপিণী আনন্দ আনন্দ
অথচ যুগল আছো পরম একাকী মধ্যখানে
সব বিযুক্তির মধ্যে তুমি কেন্দ্র অচ্ছিন্ন ও একা।
হে অস্তিত্ব তুমি পুত্র, তুমি পিতা, তুমি স্বামী, শত্রু ও স্বজন
তোমার যে কত ছবি যে পাত্র সে সেটুকুই ধরে
তবু তুমি উপছে যাও কিংবা আছ উচ্ছিষ্ট তলানি—
যে যেমন পাত্র সেও তেমনি ভরে নিতে পারে, নেয়,
অথচ এ-সবই একই পরম সৃষ্টির দায়ে আবদ্ধকেন্দ্রিণ,
বামে হেলে অর্ধনীল চাঁদ ছাঁদে মাথার মুকুটে
অরণ্যের ঝরা দীন পালক ও কণ্ঠে বনমালা,
শরীর আতুর করা মাটির আকুল গন্ধ উঠে
বুদ্বুদ ফাটিয়ে মণিহীন চোখ অতল কাদায়,
কিন্তু লেলিহান শিখা হাতের মুঠোর মতো খোলে
তালুর গোপন কোলে কৃষ্ণরাধা আছেন পঙ্কজে।
এমনি সব ফুলগুলি পাপড়ি খোলে, এই রাসলীলা
পাঁচ আঙুলের পাপড়ি খুলে ধরছে আ জ্যোৎস্নাপরাগ
ভ্রমর স্বয়ং কৃষ্ণ যিনি সেই পরাগেরই দেহ

কেবল অতৃপ্ত দুঃখ ফুল থেকে ফুলে তৃপা রাখে
ঘিরে ঘিরে গ্রহপুঞ্জ নক্ষত্র ও নীহারিকা শোভা
অণুতে জ্যোতির ঢেউ, ঢেউ উঠে ঢেউ ভেঙে যায়,
নক্ষত্রে স্পন্দন ওঠে স্পন্দনের আলোই রাধিকা
আর সেই কেন্দ্রমূলে হে পরম হে যুগল রূপ
আমার রক্তের মধ্যে যা খেলাও সে তো শুধু প্রেম,
কিন্তু তুমি বোধমাত্র, হঠাৎ হঠাৎ যেন দেখা
বৃষ্টি বিজড়িত পথে কচিৎ বিদ্যুতে, তারপর
শুধু অনুভব করা ঘিরে ঘিরে নিসর্গ, জীবন,
কিন্তু সে অচ্ছিন্নলোকে একা তুমি বিচ্ছেদের তুমি ॥

ভালো থেকো

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বহুযুগ বাদে এই বৃষ্টি ও মেঘের দিনে শান্তিনিকেতনে
আসা, ভালোবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ উধাও খোয়াই
এখনো বুকের কোনো গভীর প্রত্যন্তে দেয় টান
রক্তপাত হওয়া ছিল অনেক সহজ।

তার বদলে

যন্ত্রণাকাতর হয় চক্ষুদুটি, মাকড়শার জাল
পাতায় পাতায় বাঁধে, দমকা বাতাসে ছিঁড়ে যেতে।
অভ্যাস এমনই, ভেবে কষ্ট পাওয়া, স্বচ্ছ সুখ নয়…
নিশ্চিত নিভৃত দুঃখে ভেসে যাওয়া, নিরুদ্দেশ ভাসা
গোয়ালপাড়ার দিকে…

মনে পড়ে এখনো ঊর্মিলা ?

মন কি এখনো আছে ছাই-মাজা বাসনের মতো গভীর উজ্জ্বল ?
পিতল-বাসনে, জানো, কলঙ্কের নীল
তেঁতুলের ছোঁয়া ছাড়া নিষ্ক্রান্ত হবে না।

সমস্ত পুরনো কথা, জানা কথা—পুনরুক্তি তবু,
মাঝেমাঝে করে ফেলি—যদি ভুলে যাও।
মনীষাও ভুল করে, আমরা তুষি একাকী নির্বোধে।

থাক কুটকচাল আর মনে পড়াপড়ি।
পশ্চাদ্‌ভ্রমণে থাকে ঝুল-মাখা ঘরের বিলাস,
এবারের এলোমেলো থেকে ভাবছি দেব উপহার
কিছু কথা, অভিজ্ঞতা, ভালোলাগা ক্যানালের জল
ভালো হবে?

কিছুদিন ধরে এই রাঢ়মাটি আমাকে ছাড়ছে না
বিকেলে গা ধুয়ে এসে তুলে দেয় স্পষ্ট নিমন্ত্রণ
জঙ্গলের নীলাঞ্জনা···
সে যে কি রক্তের যুদ্ধ! তার উপর সূর্যের সিঁদুরে
ধুন্ধুমার কাণ্ড দেখে দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।
বিশ্বাসের অলিগলি উঠোন আঙিনা
দুহাতে দখল নেয় স্বপ্ন, অবিশ্বাস—
অমোঘ আমিষ গন্ধ ছড়ায় বাতাসে
কষ্ট হয়।
কষ্টের প্রকৃত শিক্ষা এখনো হলো না।
বিনি নিমন্ত্রণে আসে, কালের ইঙ্গিতে চলে যায়।

সে যাহোক, ভালো আছ?
বিবাহের পরে কিছু খুটিয়েছ বরের সংসারে?
বাতাসের হাতে ঝিলে জল-বুলি ছিল এক ঢাল
কোঁকড়া চুল, তাকে রাঙা ক'রে
জঙ্গলমহাল রাঢ় করে তুলেছ কি?
ইচ্ছে হয় দেখে আসি আমি অন্তত একবার, একঝলক।
তারপর মনে হয়, বৃষ্টি হবে, সব ধুয়ে যাবে
সর্বনাশা ছবি ভেঙে উঠে আসবে শান্ত পরিস্থিতি—
সোনার সংসার, সুখ, ঘরবর, সার্কাস, সিনেমা!

কিছুদিন ধরে এই রাঢ়মাটি আমাকে ছাড়ছে না।
পুড়িয়ে পাখির মতো টুকরো টুকরো করে হবে সান্ধ্য বনভোজন।
কোনোদিন মনে হয়।
যা হয় তা হোক
কিন্তু, তুমি ভালো থেক
তুমি ভালো থেক॥

প্রবাহে রোদ্দুরে উড়ে যাবে

আনন্দ ঘোষ হাজরা

অথচ তুমিও ভাবো অন্তত সাময়িকভাবে
প্রবাহ কি স্তব্ধ হয়ে যায়?
কত মৃত্যু দেখেছে গাছেরা বুনোলতা
অন্ধকারে আমাদের বনের আড়ালে নির্জনতা
কথকতা শুনেছে অনেক;
তারপর পুনরায় স্তব্ধতাকে ঘিরে
রাত্রির প্যাঁচারা নেমে মন্দিরের ফাঁক দিয়ে
ভিতরে ঢুকেছে।
তখনও জ্বলেছে শান্ত অনাবিল ঘৃতের প্রদীপ—
প্যাঁচারা নিভিয়ে গেছে বারবার
পুরোহিত আবার জ্বেলেছে।
কত মৃত্যু দেখেছে গাছেরা বুনোলতা
গাছের শাখার নীচে পাখিদের উদ্দাম সংসার
প্রতিটি মৃত্যুর পরে আরো এক রতি জ্ঞানী হয়ে
চেয়ে থাকে নিমেষবিহীন
প্রবাহে রোদ্দুরে উড়ে যাবে।

আলোকধেনু

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ঐ আল বেয়ে হেঁটে চলে গেছে
গোধূলি-পাগল রাখাল
দশ পা পিছনে রাত্রি,
তামাটে মানুষে মানুষে এখন বিশ গাঁ অন্ধকার।

সাপে ও ছায়ায়
ধীরে চেটে নিল শেষ প্রহরের জ্যোৎস্না,
কতদিন বুঝি দেখে নি রাখাল
পূর্ণ চাঁদের মায়া,
নেমে গেল শিরশির-শীতে তাই
ঠাণ্ডা জলের কুহকে।

দুগ্ধবরণ একফোঁটা পাখি
আহা একমুঠো ইচ্ছে,
উড়ে এসে বোসো দিঘির সজল শালুকে,
তোমাকে রাখব বুকের বাঁ পাশে
নাচাব তালুতে তালুতে;
প্রিয় পাখি,
তুমি একবার শুধু ভোর ক'রে দেয়া-ডাকে
গোধূলিপাগল রাখালকে হানো
আলোকধেনুর স্বপ্ন।

রজনি

শুভ বসু

রজনি, তোমার নখ আকাশকে চেরে, তাই
হিরণ্যশোণিত
তার গায়ে অগণন আকাশপ্রদীপ হয়ে ফোটে।

তোমাদের এরকম প্রেমের প্রহরে
আমাদেরও চোখে খুব নরম আবেশ
জমে, আচমকাই দু-এক কলিতে
ভাষা আর সুরে বেশ গভীর প্রণয় হয়ে যায়।

তোমারও কি মনে হয়, রজনি, এই যে
অগস্ত্যবেলার ছায়া পড়েছে আমার চোখেমুখে,
যার হিমে এতটুকু স্বপ্নের সান্ত্বনাও নেই, সেখানেও

ভালোবাসা প্রাসঙ্গিক, নিয়তিরই মতো ?

এমন তো নয়

অরুণাভ দাশগুপ্ত

এমন তো নয়
বর্ষণে ছিল প্রগল্‌ভতা
এমন তো নয়
বাতাসে তখন কুসুমোচ্ছ্বাস
শরতের বেলা যেরকম পড়ে
সেরকমই ছিল তোমার বিকেল
আমিই বরং একটু ক্লান্ত
এবং গুমোট সন্ধ্যা পেরিয়ে
কড়া নাড়তেই দোর খুলেছিল
দোর বলতে কি সবুজ নিশানা ?
যা দেখে কাস্তে
শান দেয় চাষী
সেরকম কোনো আগ্রাসী বোধে
উষ্ণ নিপুণ গোধূলি মায়ায়
স্বপ্নের মতো ছুঁয়েছি স্বর্গ
এমন তো নয়
ভুল হয়েছিল।

ভাটপাড়ার গঙ্গা

রবীন সুর

পশ্চিমদেশের লালমাটি পাহাড়ের ঢল নেমেছে।
আকাশ উপুড়করা মৌসুমী যৌতুক—
বৃষ্টি বৃষ্টি!

সমতলভূমির সমস্ত মরানদীর সোঁতায়
ছোপান সবুজে যৌবন ফিরেছে—
জল জল!

কিন্তু জলের গেরিমাটি রঙ,
আকাশের নীল সেই বিস্তীর্ণ দর্পণে,
বিকেলের রোদ এসে
ছুঁতে চায় একমাথা চুল।

গুঁড়ো গুঁড়ো কাঁকড়ায় বিজবিজ করছে নদী।
এমুড়ো ওমুড়ো জালবিছিয়ে
ইলিশধরা নৌকো,
বুড়ে যাওয়া চরের গাছপালা—
জেগে আছে দু'একটি পাতা,
থৈ-থৈ একগঙ্গা গেরুয়া জলের ওপর
ডানা নাড়ছে
হারানো শৈশবের ফড়িং।

ময়ূরের পেখম

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবার নৃত্যের শেষমুদ্রায় ছুটে আসে তৎপর তীর
তবু আবার দাঁড়ায় এসে আগন্তুক মেঘ
—বিক্ষত বুকে একি জলের আশ্বাস!

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে ময়ূর মেলে ধরে পেখম।
প্রিয় গাছ থেকে নেমে আসে ভয়াবহ ছায়া
প্রিয় নদী থেকে শ্বাপদের বিষদাঁত। এ বিচরণ ভূমি
ভরে আছে কাঁটা-আগাছায়।

তবু তার ঠোঁট নৃত্যসহচরীর শরীর থেকে
ভেঙে ফেলে ভয়, মিথ্যা সন্দেহ। মুগ্ধনৃত্যে যাবে বলে
আকাঙ্ক্ষায়-সতর্কতায় ছড়িয়ে দেয় সুদৃশ্য পেখম।

ভাত না পাথর

শুভ মুখোপাধ্যায়

তালবনে হুসুর মুসুর,
বাঁশবনে থানা—
মানুষ কিছু সরিয়ে পাথর,
কখন পাবে খানা?

কালকাসুন্দর বনে আছে,
বকনো সরা হাঁড়ি—
যা দিই তোকে ভাত না পাথর,
আমিই দিতে পারি।

উন্মোচন

হাফিজুর রহমান

করতল মেলে দিলে প্রতিটি রেখায় চোখে সূর্যালোক পড়ে
হেসে ওঠে রবি শুক্র মঙ্গলের দল
ভ্রূ কুঁচকে ক্রূর হাসে রুক্ষ রেখাবিদ
জন্মাবধি তাই আর মুঠিবদ্ধ হাত আমি কখনো খুলিনা;

জন্মমৃত্যু ভালোবাসা অন্তর্গত মুঠো পুরে রেখেছি ওখানে
নিজস্ব নিয়মে হোক আত্মার উত্থান,
যদি কেউ জ্যোৎস্নালোকে ছুঁয়েছে আঙুল
দীর্ণস্বরে বলি তারে, ভালোবাসা হাটু মুড়ে ঘুমিয়েছে জলে

পরাজয় একে বলে ? এই হলো জীবনের ব্যক্তিক নির্যাস ;
ঘাসের মহিমা দেখে আকাশে উদার
ইচ্ছে হয় ডেকে বলি, দেখে যা উল্লুক
আমাদের অনুকূলে এই ছাখ জ্যোৎস্নাটাকে ভাগ করে ফেলি

করতল মেলে ধরে অতলান্ত হেসে উঠি শূন্য দীর্ঘ হাসি
যেরকম কাঠ ফাড়ে বিনিদ্র করাত
চৌচির বিধ্বস্ত করি ভাগ্যশিলালিপি
দুই হাতে তাল তাল জ্যোৎস্নাখণ্ড নেচে ওঠে নতুন বিভায় !

অন্ধকার চেটেপুটে হুড়মুড় আলো ঢোকে বন্ধ করতলে
বাতাসেরা দল বেঁধে চুমু খায় খুব
সেই ফাঁকে দেখে নিই মুক্ত করতল
ঘাম আর অন্ধকার কতখানি লজ্জা তার করেছে নির্মূল !

জানালা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

'...যদি ওখানে মৃত্যুই, সে আসে পরে সবসময়
স্বাধীনতা, সবসময় সে-ই আসে প্রথমে।'

—ইয়ান্নিস রিতসস্

(জঁ্যা বাসু-কে)

পাল্টা হাওয়ার ঝাপটায় কোনো কোনোদিন আমার পুরানো
খাতার পাতাগুলো উলটে যায়। হঠাৎ যেন সবি পালটাতে শুরু
করে তখন। সামনেটা দেয়াল। স্ফীত সময়ের পায়ে পাথর।
হলদে পাতায় ছত্রভঙ্গ শব্দরা এলোমেলো ছড়িয়ে ছড়ানো
চটি জুতো ছেঁড়া শার্টের মতো। কোথায় কোথায় শুকিয়ে
যাওয়া কালির দাগ যেন ফিকে রক্তের ফোঁটা।

পা দুটো ক্ষতবিক্ষত। গলাটা তেতে অরো কাঠ। চিৎকারের
কোনো কোনো স্ফুলিঙ্গে কান-ফাটানো কাঁসরের ধাতব হাঁপর।
রক্ত চোঁয়ায় চিবুকে। চোখে ঘোলাটে নদী। পাতাল থেকে
হিঁচড়ে টেনে আনা কয়লার মতো চটা অক্ষরগুলো ক্ষত
বল্লমের খোঁচায় থেঁতলানো। তবু চোখের কোণে উড়ে আসা
চিকন বালির কণা। সমুদ্র। আকাশ, এই তো আমার জানালায়।

একবিন্দু

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

ছোট ও কঠিন এক ঝিনুকের ভিতর; কবিতা
লুকোনো; কঠিণতম প্রাণ কেঁপে ওঠে, আর নিরর্গল বাঁচা
লিখতে-পড়তে, ফের নিরক্ষর হতে চায় মুক্তোর মতন।

তুমি তো বলতে—অবিনশ্বর ; অনেক দূর অক্ষরজ্ঞান
যেই হবে শেষ, একা কবি এসে দেবেন অন্ত্যমিল ভেঙে,
তখন কি দরজা খোলা হবে, বন্ধ ঘরের জানলাটি ?

পাখিও স্বচ্ছন্দ আর নীল, গাছ নিষ্পত্র ; জলেরই মতন
শাদা, কবিতার ঐ সহজ-সুদূর-আবছা অবগুণ্ঠনের
চেয়ে বড় ; কত বড়, তা কি আর পাঠক, না-প'ড়ে জানতে পারে ?

না-প'ড়ে, অসামাজিক জন্ম হয়, দিনরাত মৃত্যু হতে থাকে ;
কত বাক্-ব্যবহার, নিরন্ন পাঠক, তুমি খেতে-পরতে ক্ষয়
ক'রে ফেল, ফলমূল শস্য কৃষিকাজ বল কবিকল্পনা !

হে দুরূহতম বাক্, তুমি হও অন্নজল, রক্ত ফোঁটাফোঁটা,
আজ একবিন্দু, কাল ফুরিয়ে না-যায় যদি—ঝিনুকপ্রতিমা

শীতল মাছের ঝাঁক

মৃণাল বসুচৌধুরী

কবিতার শরীর থেকে
কবিতাকে মুক্তি দিতে গেলে
কিছু ঠোঁট
সোনালী চুলের জট
থেকে যায়
বিষাদে আঙুল কাঁপে
অস্থির নখের মৃদু নির্যাতনে
দৃঢ় হয় পেশী
কবিতা লেখার আগে
শীতল মাছের ঝাঁক
জলপরী
প্রসূতিসদন
সব কিছু ভুলে যেতে চাই

ভুল নাটক

বাসুদেব দেব

কলম খুলে বসে আছেন প্রভু
মাথার ওপর টাকের মতো চাঁদ
পায়ের কাছে চটির মতো কুকুর

এমন সময় পাটভাঙা সেই নারী
ট্রের ওপর দুকাপ মাত্র চা
নারীর পায়ে কখ্খনো নয় নূপুর

টেবিল জুড়ে রাতের টেলিগ্রাম
দিল্লি থেকে পুরস্কারের চেক
ফুলদানিতে নীল ভেজানো ফুল

এমন সময় ঘন্টি বেজে ওঠে
সরস্বতী হয়তো এলেন স্বয়ং
দরজা খুলে জুলপি পাকা চুল

দাঁড়িয়ে থাকে উটকো সেই লোক
পায়ে দীর্ঘ পথের রুখু ধুলো
গর্জে ওঠে শেকল বাঁধা কুকুর

বাকি ছিল হয়তো বা এই টুকুর
'বেঁচে আছিস? বেঁচে আছিস আজো?'

মনে রেখ

রত্নেশ্বর হাজরা

কবি মারা গেলে আর কোনো গাছ বাঁচবে না   মনে রেখ
কোনো প্রজাতির কোনো পাখিও আসবে না
তখন সমস্ত রাস্তা বন্ধ-এর আওতার মধ্যে এসে পড়বে
বাসায় ফিরবে না আর ঈগল বাচ্চাও।
তখন উৎসের মুখে বরফে জমাট হয়ে পড়ে থাকবে নদী
এদিকে স্রোতের কোনো পাত্তা নেই
ওদিকে মাঝিও নিরুদ্দেশ—
তখন পাখির ডিম ভেঙে পড়ে নষ্ট হবে সমস্ত বিশ্রাম
মনে রেখ
সেদিন সমস্ত বাড়ি জল বন্ধ স্নান বন্ধ
পিপাসা পিপাসা শুধু চারদিকে পিপাসা—

কবি মারা গেলে কিন্তু বাতাস যাবে না ধানক্ষেতে
কোনো হাত ধরবে না কোনো রমণীর হাত, কোনো
গির্জায় বাজবে না ঘণ্টা মন্দিরে না, কোনো
ঠোঁটের উপর থেকে মধু নিয়ে উড়বে না মৌমাছি
মনে রেখ
কবি মারা গেলে সব আঙুর বিনষ্ট হবে
দুঃখ কিংবা অভিমান
কেউ আর কাউকে চিনবে না—

এই যে আমি

শংকর দে

এই যে আমি কবিতা লিখছি
কাগজ কালি জ্বালিয়ে দেখছি।
এই যে আমি আগুন দেখছি
মাটি না জল?   বিভেদ দেখছি।

এই যে আমি পাথর ভাঙছি
অস্ত্র দিয়ে মানুষ মারছি।
এই যে আমি শ্মশান দেখছি
কাঠের জীবন বাঁচিয়ে রাখছি।

এই যে আমি যন্ত্র দেখছি
শব্দ দিয়ে বাজিয়ে দেখছি।
এই যে আমি মূর্তি দেখছি
অশ্রু দিয়ে ভাসিয়ে দেখছি।

এই যে আমি হারিয়ে যাচ্ছি
নিজের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছি।
এই যে আমি একফোঁটা জল
জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি।

সব সময় অনিশ্চিত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সব সময় অনিশ্চিত পদক্ষেপের ভিতর দিয়ে
প্রহরগুলো কেটে যায়।
আজ কি কোথাও যাবার কথা ছিল?
আজ বাংলা মাসের ক' তারিখ?
স্কুল সার্টিফিকেটে যে জন্মসাল লেখা
সেটা কি নির্ভুল?

বিধানসভায় বাদ-প্রতিবাদ হৈ-হল্লার পর
বাইরে এসে একসঙ্গে ধূমপান;
প্রাথমিক শিক্ষা শুধুই মাতৃভাষায় হলে
কী এমন লাভ!
আপনি কি জানেন আগামীকাল
শহিদমিনারের পাদদেশে
কারা আসছেন?

আপনার এখন কোনদিকে যাবার কথা?
ঘর থেকে কখন বেরিয়েছেন?
আজ কি তিথি?
কাল মাইনের তারিখ,
ডি-এ বাড়ছে, ঘরে চাল বাড়ন্ত,
জিনিশপত্রের দাম বাড়ছে সেই সঙ্গে।

গুনে গুনে পা ফেলতে হয়
কেননা লোডশেডিংয়ের অন্ধকার
কালো পর্দায় সব দৃশ্য
একাকার ক'রে দিয়ে যায়॥

তাকে যদি না-ও দেখি

রাম বসু

আলোছায়ার ভগ্নস্তূপে পদাতিকের শিবির, উদ্ভিদের অভিজ্ঞতা
আঁধারের অস্পষ্ট জাফরির ভিতর থেকে দেখা নক্ষত্রের মুখের আদল
প্রেমিকার ওষ্ঠের চেয়েও জীবিত সময়ের ক্ষয়হীন উত্তাপ
তার পায়ের শব্দ শিকারী পাখির ডানার চেয়েও স্বাধীন, নির্ভীক
শিকড়ের সূক্ষ্ম জালের জটিলতার ভিতর থেকে তার মুখের আভাষ
যেন বন্দরের নিশ্চয়তায় ঝড়ে ঝঞ্ঝায় পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ জাহাজ
তার গায়ে হাঙরের দাঁত, তিমির গন্ধ, আনন্দের কঠিন মাধুর্য
শিরায় সমুদ্রের ব্যথিত গর্জন, জলস্তম্ভের আদিম সঙ্গীত
বুকের ভিতর ফেনার পাপড়ি ঢাকা রূপকথার রূপসী, যার চোখে
মৃত্যু মাড়িয়ে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রকে ভালোবাসার কুহকে ঢাকার ইচ্ছা
মাস্তুলে মেঘের উত্তরা অভিমন্যু, সমুদ্র পাখির আনন্দের চিৎকার
পুনরুত্থানের কাহিনীর পবিত্রতা
যন্ত্রণার পিঙ্গল প্রান্তরে নিঃসঙ্গ অনন্ত দেবতা
যার আঁজলায় নৈঃশব্দ্যের অপরিমেয়তা
আঁধারের অস্পষ্ট জাফরির ভিতর থেকে দেখা
পাথরে কোঁদা মুখ, মাটির কঠিন পেশী, চোখের গভীরে কবিতার মত্ততা
তার গলায় অগ্নিগিরির ফুটন্ত লাভার উল্লাস
কপালে মানুষের অমিত অভিযানের প্রশস্তির শিলালিপি
শিকড়ের সূক্ষ্ম জালের জটিলতার ভিতর দিয়ে যাকে দেখেছিলাম
তার আসার কথা ছিল
সে এল না।

ওয়াটগঞ্জ থেকে হাইড রোডের মুখে পড়তেই
সে আচমকা কাঁধে হাত রেখে বলেছিল ঃ
ছাখো, খুব শিগগির আসছি
কাকদ্বীপ থেকে ডুবেরভেরির দিকে পা বাড়াতেই
সে সোহাগ কেড়ে বলেছিল ঃ

দেখ, আমি এলাম বলে
আজ উত্তর-পঞ্চাশে দাঁড়িয়ে সেই সব কথা মনে হয় স্বপ্ন, মতিভ্রম
সে যদি আসেও আমি আর তাকে দেখে যাব না।

মানিকতলা খালের ধারে অপরাধের উর্বর নোংরায়
ধূর্তের হিংস্র রসিকতার চেয়েও তীব্র বনবিভাগের ইউকেলিপটাস
জং ধরা লোহার পাতে কর্মহীনের আক্রোশের মতো তীব্র জরদা রঙ আলো
কাঠের গুঁড়ি আর প্ল্যাসটিক-ছাওয়া খুপরির পাশে সবুজের হাত-সাফাই
যেন দ্রুত লুপ্ত মানবতার নিস্ফল উল্লাস
স-ডাস্টের স্তূপের পাশে মাকড়সার উজ্জ্বল জালে মোড়া সাট্টার আসর
দেশী মদের দোকানে ঘাম-ঘাম লালচে মুখে কম পাওয়ারের আলোর আর্তনাদ
হেভি ট্রাকের টপ গিয়ারে কালো টাকার দুর্ধর্ষ তীব্রতা
জিপের হেডলাইটের আলোয় চোরাচালানির নিরাপদ নিষ্ঠুরতা
স্টার্ট-দেওয়া ইঞ্জিনের মতো থরথর আত্মধ্বংসী উত্তেজনাভূক যুবক হৃদয়
বস্তির মুখে সিনেমা-শোভন নায়কের প্যান্ট-ঢাকা উরুর দোলানি
চকিত বোমার আওয়াজে ফ্লাড-গেট খুলে দেওয়া মুখের প্রবাহ
কান-ঢাকা চুল, হাতে বালা, বুকে চাকতি, চোখে হন্যে নেশা
করাত কলের ধারালো দাঁতে ফাল ফাল হয়ে যায় সময়
আমার ইতিহাস আর ধারাবাহিকতাকে অগোচরে কবর দেবার জন্য
তৎপর বুদ্ধিজীবীরা লেদ মেসিনের চেয়েও সহিষ্ণু, একাগ্র
আর আড়-হওয়া মহিষের মতো আবর্জনার দ্বীপের ওপর বক
যেন ঐকান্তিক প্যাথলজিস্ট স্লাইডে নিবদ্ধ ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা গণনায়
তার চারপাশে ঝিরঝিরে কুচকুচে জলে হাঁফানি রোগীর কলজের ওঠাপড়া
সেই জল, অনন্ত কালের সেই আদি জল, যেন শরশয্যায় ভীষ্ম
যার উজ্জ্বল উচ্চারণ, আজ মনে হয়, রক্তে ছড়িয়ে পড়ার আগেই গলা টেপা
ফোঁপানি

এই উত্তর-পঞ্চাশে মানিকতলা খালের ধারে দাঁড়িয়ে দেখলাম
বিপ্লবী শিখণ্ডীর আড়ালে মার্কিন জ্যাক বুট বুকের কাছে উদ্যত হতেই
রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর, অর্থময় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে
বিশ্ব ট্যাকে-গোঁজা তাত্ত্বিকের গাড়ির দরজায়
এক ঠ্যাং উঁচু করে পেচ্ছাব্ করে চলে গেল

যার আসার কথা ছিল সে আর এল না
সে যদিও আসে আমি আর তাকে দেখে যাব না

আজ এই জ্বরতপ্ত সন্ধ্যার অনুচ্চারিত-অবহেলায় অর্পিত আমি
আর কোথায় বা যেতে পারি ফসলের অমলিন উচ্চারণ শুনতে ?
তোমার কাছেই এলাম
তোমার কাছেই নিজেকে বয়ে এনেছি আমি
খাদ, নোংরা, গ্লানি আর সচেতন-অস্পষ্টতার ব্যূহ আলগা করার জন্য
জয় আর যশের শিবির থেকে হাজার যোজন দূরে
বরং অরণ্যের কৃষ্ণ নির্জনতায়
অন্ধকার আর রাত্রির গন্ধে ভরভর সোমত্ত মেয়ের মতো মাটির নিবিড়ে
শরীরের ভাঁজে নিয়ে পরাগরেণু আর কপালে এঁকে পিতৃকুলের দাসচিহ্ন
তোমার কাছেই এলাম ক্রম বিকশিত বিশ্বের নৈতিক আনন্ত্যে
আর কেউ না-জানুক তুমি তো জেনেছ
আমরা প্রতারিত করি নি ; হয়তো প্রতারিত হয়েছি
আমরা প্রতারিত করি নি ; চেষ্টা করেছি মাত্র
তাই তো কান ভরে শুনে গেলাম রক্তবর্ণ অশ্বের অজেয় হ্রেষা
এই পরিমিত গ্রহটার বুকের ওপর থেকে কুমিরের দাঁত খসে আসছে
কোথাও কোথাও রাহুমুক্ত মানুষ ঘরে ঘরে অভিযানের গল্প করে চলেছে
রাতভর
বুনো ঘাস আর সবুজ ফুলের মাদকতায় সমৃদ্ধ হয়েই চলেছে খণ্ডিত আকাশ
তাকে যদি নাও দেখি, ক্ষোভ নেই
মানিকতলার খালের জলে দুলছে জেলে ডিঙির মতো একাদশীর চাঁদ ।

তিনটে মুখোস পরা লোক কাল এসেছিল

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

তিনটে মুখোস পরা লোক কাল এসেছিল রাসবিহারী থেকে ।
আমিও মুখোস পরে তাদের সঙ্গেই খুব গল্প করে কাটিয়ে দিলুম ।

মুখোসের মুখে ছিল মুখোসের হাসি
মুখোসের চোখে ছিল মুখোসের চোখ,
মুখোসের কণ্ঠে ছিল মুখোসের ভালোবাসাবাসি,
মুখোসের বুকে ছিল মুখোসের বেদনা ও শোক।

একটা মুখোস বলল, এবারে চা হোক।
একটা মুখোস বলল, কফি।
একটা মুখোস বলল, যামিনী রায়ের ছবি ভালো।
একটা মুখোস বলল, বেঠোফেন, নবম সিম্ফনি।

মুখোসের সঙ্গে কাল কেটে গেল এইভাবে মুখোসের পুরো একদিন।

ফাঁকে ফাঁকে উঁচু পাহাড়ের গল্প, প্রমোশন, বিদেশ-ভ্রমণ,
ফাঁকে ফাঁকে জ্ঞানপীঠ, আকাদমি, শিক্ষার মাধ্যম।

হঠাৎ চমকে উঠে পিছু ফিরে তাকিয়েছি যেন কারু ডাকে।
যেন বা দেখেছি, মুখোসেরা তৈরি করছে মুখোসের পোষাক-আষাক,
মুখোসের ঘরবাড়ি, মুখোসের বারান্দা-উঠোন,
মুখোসেরই জন্যে শুধু মুখোসের বাংলো, রাস্তাঘাট।

মুখোসের ছেলেরা মুখোস, মুখোসের মেয়েরা মুখোস,
মুখোসের মা ও বাবা জন্ম দিচ্ছে কেবল মুখোস।

মুখোসের দেশে নেই জন্মনিয়ন্ত্রণবিধি পালনের কোনো প্রয়োজন।

ভ্রমণের ছল

শিবশম্ভু পাল

কোনোদিনও ওরা বলতে পারে না পড়া
আসেনাকো ইস্কুলে
ওরা চলে যায় মনোনীত গ্রামে সাইকেডেলিক ফুলে
গেঞ্জিতে আঁকা স্থায়ী ফেব্রিকে, ছবির বসুন্ধরায়।

দিন থেকে রাতে কুটিল পরম্পরা
ওদের বিলাসী চুলে
মাসে তিনদিনও আসেনাকো ইশকুলে,
ঘরের ভেতর পুঁথিপত্তর এককোণে ডাঁই করা।

শেখেনি কিছুই পথ-বিপথের বাঁক
শেখেনি সৃষ্টি-প্রলয়ের গুরুগম্ভীর পটভূমি
রক্তে গোঁয়ারতুমি…
ডিসকো ছন্দে নাজিয়া হাসানে ভেঙেচুরে মিশে
ভাইফোঁটা আর জন্মদিনের শাঁখ।
বনে থাকে বাঘ, জলের আড়ালে কুমির
এসব তত্ত্বে কে চায় মরতে, প্রকৃতিরও দুষ্টুমি:
মাঘের আকাশে আষাঢ় মেঘের হাঁক!

সেদিন হয়তো ভ্রমণেরই ছলে ওরা
এসেছিল খুব জমকালো সাজে, প্রমূর্ত উৎপাত
কে যে কার কাছে কতটা অকস্মাৎ…
'কিরীটী' বানান তোরা
কে জানিস বল? নীরবতা ঘর-জোড়া।
কেন এসেছিস? গর্জে উঠেও প্রহারোদ্যত হাত
উঠে নেমে এল, চক্ষে ওদের মৌন আর্তনাদ।
গেঞ্জিতে আঁকা, শুধু পটে লেখা, অশ্বমেধের ঘোড়া!

এই অসতর্ক মুহূর্তে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

সাধুরা যেখানে থামতে বাধ্য হন
শয়তান সেখান থেকে শুরু করে
না-শীত না-গ্রীষ্মের এই অসতর্ক মুহূর্তে
মানুষ পাঞ্জাবির বোতাম খুলে

বেরিয়ে পড়ে বিকেলের হাওয়ায়
গাছেরা পাতা ঝরাবার আসর সাজায়।

ভগ্নমনোরথ ঈশ্বরের দূতেরা
আশ্রমে ফিরে যান
অশুভ দিয়ে অশুভকে ধ্বংসের আশায়
শয়তানের মূর্তি গড়তে বসেন।

না-শীত না-গ্রীষ্মের এই অসতর্ক মুহূর্তে
চিমনির মাথায় মাথায় আকাশ ছেয়ে যায়
ভেতর থেকে কারখানার দরজা এঁটে
শয়তান ঈশ্বরের মূর্তি গড়তে বসে।

দুহাতে অতীত আর ভবিষ্যতের আরশি নিয়ে
মানুষ অনন্ত আগ্রহে ব'সে থাকে
ঈশ্বরের দূতের হাতে গড়া শয়তান
আর শয়তানের হাতে তৈরী ঈশ্বরকে দেখতে।

প্রিয় নেতাকে

অনন্ত দাশ

ভিজে রুমাল থেকে টিয়ারগ্যাসের গন্ধ কি পাও?
কিংবা পায়ের নীচে মিছিলের শব্দ?

আমি দীর্ঘদিন এই হাত আকাশের দিকে তুলে রেখে
নামিয়ে নিয়েছি তলপেটের নীচে
বহুদিন সহাবস্থান ক'রে ভুলে গেছি শোষণহীন সমাজ।

এখন মাইক্রোফোনে ভন্‌ভন্‌ ক'রে মাছি উড়ছে
বাতাসে গুলিয়ে উঠছে বাসি, পচা বক্তৃতা

আজ শহিদবেদির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে
নিরাপত্তার কথা ভাবি
এই শহরে আজও আমি নিরাশ্রিত আছি।

মাঝপথে ফিরে এসে

তুলসী মুখোপাধ্যায়

প্রতিশ্রুতির ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি
মাঝপথে ফিরে এসে
মজে আছি প্রফুল্ল আরামে
মহাজনী গদি থেকে
উড়ে আসে নোটের বাণ্ডিল
নোটের মহিমা ফুঁড়ে
ফুলের বাগানে ফোটে মায়াবী সুন্দর
প্রসিদ্ধ শিল্প ঝোলে ঘরের দেয়ালে
জ্যোৎস্নার রহস্যে ওড়ে সঙ্গীতের রেণু
যজ্ঞের আগুন নিভিয়ে
মজে আছি
শীততাপনিয়ন্ত্রিত আশ্চর্য খোঁয়াড়ে!

নিশির ডাকের মতো
একেকদিন তবু
প্রতিশ্রুতি ছুটে এসে কড়া নাড়ে সদর দরজায়
ব্যালকনি থেকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে
আমি তাকে কুকুর লেলিয়ে শাসাই।

স্বেচ্ছায় কে আর স্বর্গ থেকে নির্বাসন চায়!

প্রতিবন্ধীর জন্যে চার টুকরো

শুভাশিস্ গোস্বামী

১.

মানুষের মমতা নাকি নারীবর্ষ, শিশুবর্ষ পার হয়ে এসে
প্রতিবন্ধীবর্ষ ছুঁয়ে আছে।
আমার বুঝতে ভুল হয়ে যায় বারবার
প্রকৃতই প্রতিবন্ধী কারা।

২.

ফুটপাতে যশোদা মায়ের মজা স্তনে
মুখ নখ অমৃতসন্ধানী শিশু।
ঘরে ঘরে কানু-ভানু-মিনু-চিনুরা
স্বরবর্ণে-ব্যঞ্জনবর্ণে উঁকি-ঝুঁকি দিলে
গৃহিনী ঝাঁঝিয়ে ওঠে।
ছেলে-ভুলে স্কুল-বাসে উঠে যায় লরেটো-নন্দিনী।

অমূলতরুর পাতা ঝরে পড়ে আর
অনুষ্ঠান ক'রে আমরা বৃক্ষরোপণের গল্প করি।

৪

শিবঠাকুরের দেশে প্রতিবন্ধকতা কাকে বলে ?
কাদের জন্যে আজ বর্ষ যাপন করব বল ?

কুষ্ঠরোগীর কবিতা

নবারুণ ভট্টাচার্য

আমার এ কুষ্ঠরোগ
সারানো কি কলকাতা শহরের কাজ
যার হাইড্রেন্টে জল নেই।

তাই আমি অকুতোভয়ে
চেটে নিই তেজস্ক্রিয় ধুলো
জিভের ঝাড়নে
যাতে করে টেবিল
সব সময় ফিটফাট থাকে
বোঝা যায় না কিছুতে
এটা কুষ্ঠরোগীর টেবিল।

আমার সংগ্রহে আছে
অকিঞ্চিৎকর কিছু ছায়াপথ, তারা
সাইকেল-রিকশার ছেঁড়া চেনের চাবুক
যা আমার হৃদপিণ্ডে রক্তাক্ত আছড়ায়
এবং বিশেষ গোপন
কিছু ন্যাপথলিনের তৈরি চাঁদ
যা আমি প্রস্রাবাগার থেকে সংগ্রহ করে
আমার মেঘের পোষাকের ভাঁজে ভাঁজে
রেখে দিয়েছি।

অলৌকিক কোনো অতলস্পর্শে
আমার এ ব্যাধি সেরে গেলে
আমি গাছের আয়নায়
সবুজ ছায়া ফেলব মায়াময়
এবং সেই অরণ্যে
আমাকে চিতার মতো সুন্দর দেখাবে।

নির্বাসনে নয়

কৃষ্ণ ধর

ছাড়ুন মশাই ছাড়ুন, কলকাতা ছাড়ুন
এটা কি শহর, না হদ্দ পাড়াগাঁ ?
পাদানিতে পা, হাতের মুঠোয় জান নিয়ে
নিত্যি যাওয়া আসা
এর নাম বেঁচে থাকা ?

তার চেয়ে বরং চলুন সেই নতুন দ্বীপটায়
যেখানে হাড় হাভাতে মানুষজন এখনো গিয়ে জোটেনি
এন্তার খালি জমি মাগনাই মিলবে।

একটা রূপসী বাড়ি বানাবেন সেখানে
উঠোনের চারধারে লাগিয়ে দেবেন বেল যুঁই মাধবীলতা
মৌমাছিদের জন্যে বানিয়ে দিতে পারেন মৌ-ঘর
থাকবেন দিব্যি আরামে কলকাতাকে তুড়ি মেরে।

বাসের হাতল ধরে খাবি খেতে খেতে
ভ্যাপসা গরমে বিবাদীবাগ যেতে যেতে
দ্বীপের নির্জনবাসের আনন্দে মশগুল হয়ে পড়ি
ভিড়ের চাপটাকে খুবই মোলায়েম মনে হতে থাকে
আর কদিনই বা এই ভোগান্তি !
থাকব মাধবীলতা মৌমাছি আর
রাতের জোনাকিকে নিয়ে, খাসা !
ধ্যুস্ কলকাতা, একে কি বেঁচে থাকা বলে ?

ভিড়ের ভিতরেই আমি সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাই খুব আলতোভাবে
মনে হয় আমি যেন চলেছি কোনো স্পেসশিপে চড়ে

কলকাতার নাগালের বাইরে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে
অনন্তনক্ষত্রবীথি অন্ধকারে···
আমি একা চল্লিশলক্ষ মানুষমানুষীর পাগলপাগল ভিড় এড়িয়ে
আমিই যাত্রী আমিই পাইলট।

হঠাৎ স্বপ্নভাঙ্গে
আমি ঘামতে থাকি ভয়ে
নিঃসঙ্গতার ভয়াবহতা আমাকে জড়িয়ে ধরে অক্টোপাসের মতো
আমি মানুষজনের মুখ দেখতে না পেয়ে
কেমন জানি বোবা হয়ে যাই
ফিরে যেতে চাই আমি আমাদের মানুষের মাঝখানে
সুখের নির্জনতানির্বাসন থেকে ছিটকে বেরিয়ে
ধুলোমাটিনোংরা হল্লায় আক্রান্ত
আমার নিজের জায়গায়।

জননী

জিয়া হায়দার

তাঁর জীবনের শোকের মতন এই
সঘন আঁধার বিনিদ্র রজনীতে
মা আমার বুঝি এখন প্রদীপ জ্বেলে
নিমগ্ন পাঠে পবিত্র কুরআন।

আলগোছে তিনি উঠবেন পাঠ ছেড়ে
যাবেন আমার অগোছাল শয্যায়,
কোনো কথা নেই, চরণ শব্দহীন,
শিশুর আদরে রাখবেন স্নেহ-ছোঁয়া
শূন্য আমার শিয়রের উপাধানে।

হঠাৎ কখন চমকে যাবেন, যদি
দেখে ফেলে কেউ, অকারণ লজ্জায়
হাসবেন মৃদু, কল্যাণী আলো যেন ;
আসবেন ফিরে পবিত্র মাদুরেতে,
কণ্ঠ আবার করুণাময়ের নামে
রাতের শান্ত দিঘিতে তুলবে ঢেউ ।

হয়তো হঠাৎ আনমনা হয়ে গেলে
অশ্রুবিন্দু অজানিত উদ্বেগে
ম্লান করে দেবে নয়নের দীপ্তিকে ;

তখন বুঝিবা নির্ভয় বিশ্বাসে
দ্বন্দ্বমুক্ত আত্মসমর্পণে
জিজ্ঞাসাহীন শান্ত দু'হাত তুলে
স্বগত-কণ্ঠে জানাবেন প্রার্থনা ঃ
ফুল পারাবত এবং ধানের শিস ।

ব্যাপারটা

রণজিৎ সিংহ

ব্যাপারটা এই ঃ হাত পা ছড়িয়ে বাঁচা । ছকের মধ্যে থেকে ছককে ভাঙা । দুদ্দাড়
ছুটে ঘা দেওয়া এ দোরে সে দোরে । কোথাও অভ্যর্থনা কোথাও প্রত্যাখ্যান কোথাও না অভ্যর্থনা না প্রত্যাখ্যান । ফের সাধাসাধি, তোয়াজ, শেষে ফরমান, চলে এস । নইলে করে দেব খোঁড়া ওই ঠ্যাঙ ।

তারপর ঠেলে সরিয়ে দেওয়া চার দেওয়াল । ছাত উড়িয়ে টাঙিয়ে দেওয়া আকাশ । হাট করা দরজায় টেনে আনা ভাগীরথী ।

ঢিমে আঁচে সেদ্ধ হচ্ছে রিয়াজী খাঁসির চাঁপ। খুশবু ছড়াচ্ছে আদত মোগলাই খানা। চাও তো, দু ইটের তুরন্ত উনুনে ঝলসাবে, ভবঘুরে পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার, শিককাবাব।

আরে ভায়া, বোস। ঘড়ির কাঁটা ঘুরবে, জগৎসংসার চলবে, মানুষ জন্মাবে। আর হ্যাঁ, বিপ্লব হবে। পালটাবে আজকের দস্তুর। মানুষ নেবে তার অধিকার।

কিন্তু দোস্ত, এ সব তো ভবিষ্যৎ গণনা। তার আগে যে বর্তমান! আর বর্তমানই গড়ে ভবিষ্যৎ।

এই যে আমরা আছি! এই যে আষাঢ়ের মেঘ লুটোচ্ছে মাঠে মাঠে, গাছের পাতা বেয়ে ঝরছে জল, পুকুরে ঝিকোচ্ছে পুঁটির ঝাঁক, ঝোড়ো বাদলায় টুপ টাপ খসছে অজস্র কদম আর পৃথিবী গলছে ছুটছে পলির মস্তিতে উদ্দাম!

বল, কিছু কথা বল। সুরে অথবা বেসুরে। কবিতায় অথবা তর্কে। বল বাঁচার কথা। টেনে নাও কালিদাস বিদ্যাপতি মধুসূদন মহাপ্রাণ অথবা ভরাবাদলের পদ্মায় উতরোল রবীন্দ্রনাথ। কথায় কথায় ছাড়ানো যাক কথার সীমা।

এ তো ঠিক আমাদের অনেকে হারিয়ে গিয়েছে। আবার এও ঠিক আমাদের অনেকে আছে। আর আমরা তো আছি বেঁচে।

সেইসব বীভৎস রাত্রিগুলো

দিলীপ সেন

সেইসব বীভৎস রাত্রিগুলো যারা
অন্ধকারে নির্বাসিত
উন্মোচিত আলোর মঞ্চে
যেন না একবারও

বিচ্ছেদের নগ্ন ছায়ায় তোমাকে সংক্রামিত করে :
যেহেতু তোমাকে নিয়েই এই দেশের চারণভূমিতে
আমি সাজাতে চাই
সবুজ ঘাসপাতার এক সম্মিলিত শস্যের খামার
যেখানে বারোমাস
বছরের শেষতম ঋতুর গুঞ্জরণে
কচি কচি পাতার শাখায় গান গাইবে সারাক্ষণ
নীল ঘাঘরা জড়ানো রূপসী রৌদ্রের নদী।
তোমার আমার দুচোখের পাতায় পাতায়
পল্লবিত আগুনের সেই স্বপ্ন !
সেই অনাবিষ্কৃত অমিত বিশ্বাসের পৃথিবী
যার আকণ্ঠ তৃষ্ণার সূর্যালোকে
পর্যাপ্ত প্রাণের ফসলে এবং নিবিড়তম ভালোবাসায়
অজস্র প্রতিশ্রুতিতে তুমি এবং আমি
রক্তমাখা এই অনন্যা মাটির প্রত্যেকটি ফুলের
নাম রাখব স্বাধীনতা।

আবর্তিত সময়ের দুরন্ত শৈশবে
যখন তোমাকে নিয়েই অগ্নিগর্ভ দিনের মুঠো মুঠো প্রত্যাশায়
ঝড়ের মালা গাঁথব,
যখন শত্রুর নিশানায়—
রামধনু আকাশের দেয়ালে প্রোথিত করব নির্ভুল দুচোখ
তখন যেন না একবারও
সেইসব বীভৎস রাত্রিগুলো তোমাকে আচ্ছন্ন করে।

সংগ্রাম

কিরণশঙ্কর মৈত্র

আমার ঘরটা খুব মজবুত
দেয়াল ছাদ কংক্রিট পাথর,
চারিদিকে পাহারা প্রচুর
কাঁটাতারে ঘেরা,

পাতাটি খসে পড়তে শান্ত্রীরা সতর্ক—
শুধু ঘরের হৃদয়ে দোলা লাগায় না কখনও
হঠাৎ পাগলা ঝোড়ো হাওয়া।

মনে হয় একদিন ভেঙে পড়ে সব কিছু
মাথার উপরে আকাশ
সুরক্ষিত ঘর
সুসজ্জিত কামরা—

শুধু অমেয় আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত
আরেকটা জন্ম নেবার বাসনা
দুধেল ধান শিসের গন্ধে,
খরা-দুর্ভিক্ষ সেথায় নতজানু
নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনায়॥

যত দিন যাচ্ছে

মিহির ঘোষদস্তিদার

যত দিন যাচ্ছে
বাড়ছি
বাড়ছি

একটু বুড়ো-বুড়ো দেখায়
কি করব বল
সময়ের দাপট
কিংবা বলতে পার ঝড়ঝাপটার আঁচড়

এখন আর-একটা লেলিনগ্রাদ নয়
দশ-বিশটা নিয়ে যে পথ হাঁটছি।

মুখ কালো করে হা-হুতাশ
আমার কোনোকালেই সহ্য নয়,
আর এখন আমার
বাড়ন্ত বয়স
ফুসফুসে তেজী ঘোড়ার ছন্দ
শতাব্দীর লাগাম
আমার এই হাতের মুঠোয়

যতদিন যাচ্ছে
বাড়ছি
বাড়ছি ॥

অস্পৃশ্য নিবাস থেকে

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

এখানে সবাই যারা অস্পৃশ্যের ধৃত আবাসিক,
প্রত্যেকের একই আত্মকথা :
দুর্লভ মর্মর, ইট, অথবা আঁঠালো সেই মাটি—
সামর্থ্য যেমন যার, তা দিয়েই স্বর্গের সোপান
রচনায় ব্রত হয়ে কেউ কম, কেউ বেশি উচ্চভাগ থেকে
হঠাৎ পতিত হয়ে বিকলাঙ্গ হয়েছি সবাই।

তারপর একদা দৈবাৎ
শ্মশানে কবরে কিংবা শকুনের দীর্ঘায়ু উদরে
যদি যাও, কোনো খেদ নেই !
হয়তো কিছু ক্ষণবর্ষী করুণার শেষে কোনোদিন
লেখা হবে শুধু এক অপাঠ্য পাঁজিতে :
অকালপর্বেই নাকি তোমার নিয়তি ছিল বাম !
যদিও দেখনি সেই সুন্দরীকে এবং জান না
ভগবান কতদূরে আর তার পিতার কী নাম ॥

ফেরারী

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

হয়তো পথ ভুলে
কোকিলটা আশ্রয় নিয়েছে
সামনের কদমগাছে।

ও কাকে ডাকে ?

ঠিক এমনি করেই 'সুমন, সুমন' বলতে চিৎকার করতে কর...
নদীটা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল।

দূরে যখন আকাশ ডাকে
বাজপড়া গাছটাও তখন ঝিকিয়ে ওঠে
বিদ্যুতের আলোয়
আর আমরা ঘরের মধ্যে গোল হয়ে বসে
একটা গল্পের শরীরে রঙ মাখাই।

একটা আর্তস্বরে ডাকতে ডাকতে
এখন
কোকিলটার কণ্ঠ চিরে রক্ত ঝরছে

সুমন কিন্তু আজো ফেরেনি।

প্রতীক্ষায় ছিলাম

অজিত পান্ডে

দরজা জানলা হাট হাট খোলা
যদি সে আসে!
বিকেল এখন সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই

তার দেখা নেই—
বাইরে শিশুরা খেলছিল
এক্কা দোক্কা—
ঘরে ফেরার সময় তারা
হঠাৎই হুড়মুড় করে একেবারে
আমার বিছানায় চেয়ারে সোফায়—
বাইরে আকাশ ছাপিয়ে বৃষ্টি
আর আমার ঘরে তখন
চেনা অচেনা পাখিদের গান ॥

বড় ভয় করে

বিতোষ আচার্য

উথালপাথাল ঢেউ-এ
কারো গৃহ আকণ্ঠ প্লাবনে ভাসে, কারো ভিত ধ্বসে

সারারাত কল্লোলের শব্দ শুনি…
বড় ভয় করে

কমরেড, তুমি তো জানো কী নিবিড় পরিচর্যা দিয়ে
আশ্চর্য ভাস্কর্য এক গঠন করেছি :
কৃষ্ণশিলা কুরে কুরে অসাড় হয়েছে ঘাড়
হাত বারে বারে কেঁপে গেছে :
যাকে কাঁধে বয়ে রোদেজলে মিছিলে মিলেছি

অকস্মাৎ কী যে হল উদ্দাম হাওয়ায়
মায়াবী সড়ক ধরে ভ্রান্ত পথে চলে যাই :
গুহার ভিতরে দেখি অতিকায় দুজন মানব
প্রাণান্ত লড়াই-এ মত্ত
অসংখ্য মৃত মৃগশিশু কী করুণ চোখ মেলে
আগুনের পাশে পড়ে আছে

না না না, কমরেড, দিকদর্শনের কাঁটা
আবার সঠিক, অনিবার্য তেজী দিগন্তের দিকে স্থির চোখ

তবু, মধ্যরাতে দূরাগত কল্লোলের বল্গাহীন
শব্দ শুনে শুনে বড় ভয় করে ॥

কি, সে ভেবে পাই না

সত্য গুহ

খুব সম্ভব আমার বুক ব্যথা করছে, সম্ভবত
এখন রৌদ্রময় রাত ভেবেই বুকে ক্ষতওয়ালা ধোপদুরস্ত চাঁদ
আমাকে তার স্বাস্থ্যসংগ্রহের সঙ্গী চাইছে তুমুল কাশফুলের গা-লাগোয়া
অবাধ নীলে ; আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে এবং আয়নায় চাঁদের পরিবর্ত
তেমন ক্রম-উন্নয়নপ্রকল্পের কলকাতা · ·
(দাঁত ফেলে বাঁধানো দাঁতের বিজ্ঞাপন) এবং টেবিলে
গতকালের অর্ধসমাপ্ত কবিতা, তার শুরু
'প্রতিটি পরমাণুতে একটি করে ক্রুশ কাঠ এবং পেরেকে ভালোবাসার কাঙাল'

জ্যোৎস্না সরে যাওয়া চাঁদ, স্বাস্থ্য হাওয়ার তল্লাসে তল্লাসে এখন ব্যথাবিমূঢ়
তার আত্মখনন ; একটা ঠাণ্ডা রক্তস্রোত
মধ্যবিত্ত জ্যোৎস্নায় তাপ নেই···আলোতে রঙ চেনা যায় না
ভালোবাসার রক্ত না-থাকলে আত্মরতিই ভরসা
খুব সম্ভব আমার বুক ব্যথা করছে—না, ঘৃণা লাগছে জীবনে ··
ধোঁয়াশা কুয়াশা ভরা চাঁদের মৃদু স্বাস্থ্য পরিক্রমায় হাসি পায়···টেবিলে
অর্ধসমাপ্ত কবিতার শেষ চরণ বা অর্ধস্ফুট আর্তনাদ

'এই অবেলায় তবু ভালোবাসাই···যদি না···', কী আমি ভেবে পাইনা ॥

হিরোশিমা

অমিতাভ গুপ্ত

ছত্রিশ বছর ধরে হিরোশিমা জেগে আছে, ছত্রিশ বছর
খুব বেশি কিছু নয়—বালকের ইতিহাসবইয়ে
কয়েকটি লাইনমাত্র, অথবা অক্ষর

চিরদিন থাকো তুমি হিরোশিমা, ঘৃণা নিয়ে প্রতিরোধ নিয়ে।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য প্রেমচন্দ : দুঃখী হিন্দুস্থানের দরিদ্র লেখক

এক

প্রেমচন্দের শেষ অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'মঙ্গলসূত্রের' নায়ক দেবকুমারও লেখক ছিলেন। সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা সত্ত্বেও তিনি কখনও লেখা বন্ধ করেন নি। ষাট বছরে পা দেবার পর তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য এক বিরাট সভার আয়োজন করা হল। সেখানে সবাই মিলে লেখকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এই প্রশংসায় দেবকুমারের কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার বর্ণনা প্রেমচন্দ দিয়েছেন এই ভাবে, 'সভাস্থলে পৌঁছনোর পর সবাই তাঁকে স্বাগত জানাল, অভিনন্দন-সঙ্গীত গাওয়া হল, লেখকের সাহিত্যকৃতির নানা বিচার-বিশ্লেষণ হল। কিন্তু মাথায় ব্যথা হলে লোকের যে-রকম মানসিক অবস্থা হয় তাঁর অবস্থাও হয়েছিল অনেকটা সেই ধরনের। তাঁর কাছে যেন সেই মুহূর্তে প্রশংসা অপেক্ষা মাথা-ব্যথার ওষুধ অনেক বেশি দরকারি। এই সমস্ত বক্তারা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড বিদ্বান, কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই এমন ভাসা-ভাসা ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ বক্তব্য রেখে যাচ্ছেন যার কোন মানেই হয় না। এঁদের এই প্রশংসা ও যশোগাথা অন্ধভক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউই লেখককে বুঝতে পারেন নি। কিসের প্রেরণায় চল্লিশবছর ধরে তিনি সাহিত্য রচনা করে গেছেন অথবা তাঁর অন্তরে কোন আলোকশিখা অনির্বাণ হয়ে এতকাল জ্বলেছে তার খোঁজও কেউ রাখেন নি।'

প্রেমচন্দ যেন তাঁর নিজের সাহিত্য-জীবন সম্পর্কেও এই কথা বলতে পারতেন। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে (১৮৮০-১৯৩৬) তিনি অজস্র নিন্দা ও সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন, অনেক অবহেলাও সহ্য করেছেন। এই অবহেলার একটি চমকপ্রদ উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীশান্তিপ্রসাদ বর্মা।

একদিন প্রচণ্ড রোদের মধ্যে নাগপুর স্টেশনের ধারে তিনি প্রেমচন্দকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। ওখানে তখন একটি সাহিত্য সম্মেলন চলছিল। প্রেমচন্দও সেখানেই আমন্ত্রিত। রোদে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ হল প্রেমচন্দকে আলাদা একটা গাড়িতে নিয়ে গেলে উদ্যোক্তাদের খরচ পড়বে বেশি। আরও কয়েকজন জড় হলে সবাইকে এক গাড়িতেই নিয়ে যাওয়া লাভজনক।[১]

আরও একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এম. এ. ক্লাসের এক ছাত্র জনার্দন রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রেমচন্দ দুঃখ করে বলেছিলেন,—'হিন্দীতে লিখে আমি আজ না পাচ্ছি পয়সা, না পাচ্ছি যশ। এই সংসারে লেখককে কিছু পাওয়ার আশা ত্যাগ করেই লিখে যেতে হবে।'[২] অপরদিকে খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করবার পর অন্ধভক্তি এবং উচ্ছ্বাসেরও কম পরিচয় তিনি পান নি। বর্তমানে শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর সম্পর্কে যতটা আলোচনা হচ্ছে, তার সিকিভাগও আগে হয় নি। আর কিসের প্রেরণায় দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, রক্ষণশীলদের প্রতিরোধ এবং রাজরোষকে উপেক্ষা করে তিনি লেখনী চালনা করেছিলেন সেটা এখনও অনাবিষ্কৃত। তাই 'মঙ্গলসূত্রের' দেবকুমারের বেদনা তাঁর স্রষ্টা যে আজীবনই বহন করে গেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রেমচন্দের রচিত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা কিছু কম নয়। কিন্তু মূল বাংলা ভাষায় তার খুব কমই রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনূদিত হয় 'গো-দান'। ১৯৭৫ সালে প্রিয়রঞ্জন সেন ও স্বর্ণপ্রভা সেন গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। 'নির্মলা' উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন ডঃ চিত্রা দেব (১৯৭০)। এছাড়া বাংলায় তাঁর যে কটি গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে রাধাকৃষ্ণ সংকলিত ও প্রসূন মিত্র অনূদিত 'প্রেমচন্দের গল্পগুচ্ছ' (১৯৭৪)। এতে তাঁর বাইশটি বিখ্যাত গল্প রয়েছে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দেই বারিদ গোস্বামী 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' এবং আরও কয়েকটি গল্প অনুবাদ করেছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় অণু সেন সর্বপ্রথম প্রেমচন্দের বিখ্যাত 'মহাজনী সভ্যতা' প্রবন্ধটি অনুবাদ করেন।[৩] ইতস্তুতভাবে বাংলা ভাষায় তাঁর আরও কিছু গল্প সম্ভবত অনূদিত হয়েছে। কিন্তু তাতেও বাঙালিকে প্রেমচন্দ-সচেতন কিছুতেই বলা যাবে না। অবশ্য, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রেমচন্দের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনখণ্ডে প্রেমচন্দের সমগ্র রচনাবলি

প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিঃসন্দেহে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত বাঙালি লেখকদের কাছ থেকে প্রেমচন্দের প্রতিভা কিন্তু যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছিল। শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দকে প্রায় সমসাময়িকই বলা চলে। শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬, মৃত্যু ১৯৩৮। আর প্রেমচন্দের ১৮৮০ এবং মৃত্যু ১৯৩৬। বাংলায় শরৎচন্দ্র যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে, হিন্দীতে প্রেমচন্দও তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের সঙ্গে যে তাঁর পরিচয় ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। শরৎচন্দ্রের, 'ষোড়শী' গ্রন্থটি 'আউরত' নামে এবং 'শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড' 'মপেরান' নামে প্রেমচন্দ উর্দুতে ভাষান্তরিত করেন। শরৎচন্দ্রের রচনা তাঁর মতো প্রতিভাধরকে আকৃষ্ট না করলে তিনি নিশ্চয় অনুবাদে হাত দিতেন না। রাধাকৃষ্ণ 'প্রেমচন্দের গল্পগুচ্ছ'র ভূমিকায় লিখেছেন, "শুনতে পাই, প্রেমচন্দের নাকি ইচ্ছে ছিল যে তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ 'সপ্ত-সরোজের' ভূমিকা শরৎচন্দ্র লিখে দেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় গিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর গল্প পড়ে শোনান। গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে শরৎবাবু নাকি বলেছিলেন, বাংলা ভাষায় রবিবাবু বৈ এমন লেখা আর কেউ লিখতে পারবে না। আপনার গল্প সংগ্রহের ভূমিকা লেখার যোগ্যতা আর যারই থাক অন্তত আমার নেই।"[৪]

শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য তাঁর গভীর সাহিত্য বোধেরই পরিচায়ক। তাছাড়া, প্রেমচন্দের রচনার সঙ্গে কোথায় যেন তাঁর একটা মাধুর্যও রয়েছে। দুজনেই যেন এক অর্থে 'কলম-কা-সিপাহী'। দুজনেই সমস্ত রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখনীকে হাতিয়ার করে সারাজীবন লড়াই চালিয়ে গেছেন। কিন্তু যে-রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে শরৎচন্দ্র প্রেমচন্দের গল্পগুলির তুলনা করেছিলেন তাঁর এ সম্পর্কে মতামত কি ছিল? প্রেমচন্দের দেহাবসানের (৮ অক্টোবর, ১৯৩৬) সময় রবীন্দ্রনাথও প্রায় অস্তাচলের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তথাপি, উত্তর ভারতের এই মহান প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে তাঁর কোন অসুবিধেই হয় নি। প্রেমচন্দের কনিষ্ঠ-পুত্র এবং তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার অমৃত রায় 'প্রেমচন্দ: কলম কা সিপাহী' গ্রন্থের একেবারে সমাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক উপলব্ধির অতুলনীয় বর্ণনা দিয়েছেন, 'লামাহিতে খবর গেল। আত্মীয়-স্বজনেরা আসতে শুরু করল। এগারটা বাজতে-বাজতে জনা বিশ-পঁচিশ

লোক যেন এক অপরিচিত মানুষের শবদেহ নিয়ে মণিকর্ণিকার দিকে রওনা হল। রাস্তায় একে অপরকে জিজ্ঞাসা করল: কে গেল? জবাব এল: একজন মাস্টার চলে গেল।

'এদিকে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ ধীরকণ্ঠে বলে উঠলেন: তোমরা একটি রত্ন পেয়েছিলে, তাকে এবার হারালে।' যেখানে প্রেমচন্দের নিজের লোক-জনের কাছে ১৯৩৬ সালেও তিনি একজন মাস্টার মাত্র সেখানে রবীন্দ্রনাথের কিন্তু তাঁকে 'রত্ন' বলে চিনে নিতে কোন ভুল হয় নি।

পরবর্তীকালের বাঙালি লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রেমচন্দ সম্পর্কে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। 'প্রেমচন্দ সেই জাতের লেখক, যার কাছে এলে মনে হয় ভাষাগত বিভেদটা তুচ্ছ। এ জাতের লেখকরা নিজেদের দেশকাল অতিক্রম করে অখণ্ড মানবতাকে সৃষ্টি করেন। ...এঁরা গল্প বানান না। এঁরা যখন মানুষের কথা লেখেন, তখন সমস্ত মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, সমস্যা ও সম্বন্ধগত যেসব বাস্তব বিভাগ রয়েছে—তাকে অতিক্রম করে অখণ্ড মানবতার উদ্ভাবন মনের চোখে ভেসে ওঠে। এঁরা হলেন ক্ষণজন্মা লেখক—মানুষের ধারা পরিবর্তনের প্রবাহকে এঁরা বেগ ও তাৎপর্য দিয়ে যান।'[৫]

রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র হোন বা প্রেমেন্দ্র মিত্রই হোন, দেখা যাচ্ছে যে এঁরা কেউই প্রেমচন্দকে সাধারণ মাপের ভালো লেখক বলেন নি, মহৎ লেখকই বলেছেন। এই মহত্ত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর জীবনদর্শন ও রচনাশৈলীর সাহায্যে। নিজের জীবনদর্শনকে তিনি এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন, 'মানুষের মধ্যে যা কিছু সুন্দর, বিশাল, আদরণীয় এবং আনন্দপ্রদ সাহিত্য তারই প্রতীক। আর নিরাশ্রয়, অধঃপতিত এবং অবহেলিত মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল সাহিত্য।"[৬] একজন প্রকৃত মহৎ সাহিত্যিকের মধ্যেই নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষে প্রতি এই জাতীয় মমত্ববোধ থাকা স্বাভাবিক।

শুধু এখানেই নয়। বিভিন্ন লেখায় বা প্রবন্ধে, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথোপকথনে প্রেমচন্দ বারবার তিনি কোন শিবিরভুক্ত সে কথা জোর গলায় ঘোষণা করেছেন। অনেকেরই মতে প্রেমচন্দের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ হল তাঁর স্ত্রী শিবরাণী দেবীর রচনা, 'প্রেমচন্দ ঘর মেঁ।' উক্ত গ্রন্থ থেকেই স্বামী-স্ত্রীর একদিনের কথোপকথন উদ্ধৃত করা যাক। গোদান উপন্যাসের মিঃ খান্না একটি চিনিকলের মালিক। আর তাঁর

বন্ধু মিঃ মেহ্‌তা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। খান্নার চিনিকলে মজুরেরা ধর্মঘট সুরু করে দিলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তার বিরোধিতা করেন। কিন্তু মিঃ মেহ্‌তা ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানালেন। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেই শিবরাণী দেবী প্রেমচন্দকে বলেছিলেন যে পৃথিবীর সর্বত্রই সবল দুর্বলকে শোষণ করে চলেছে। প্রেমচন্দ তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বললেন, 'না, কেবল রুশ দেশ বাদে। সেখানে ধনীদের প্রায় সায়েস্তা করে আনা হয়েছে। সেখানে গরিবেরা এখন মহা আরামে দিন কাটাচ্ছে। ভারতবর্ষেও কিছুদিনের মধ্যেই সম্ভবত এই জাতীয় বিপ্লব দেখা দেবে।' শিবরাণী জানতে চাইলেন যে বিপ্লবের সূচনা হলে তিনি কোন পক্ষে থাকবেন? প্রেমচন্দের সাফ জবাব 'শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে। আমি তো প্রথমেই ঘোষণা করব যে আমি একজন শ্রমিক। তোমরা মেশিন চালাও, আমি কলম চালাই। আমরা দুজনেই তো এক।'[৭]

১৯১৯ সালে 'জমানা' পত্রিকায় প্রেমচন্দ ঘোষণা করেছিলেন, 'আগামী দিন হচ্ছে কৃষক এবং শ্রমিকের দিন। 'গান' উপন্যাসের দেবীদিনেরও ধারণা ছিল 'আনেওয়ালা জমানা অব কিসানো ঔর মজদুরেঁা কা হৈ।' অর্থাৎ ভবিষ্যৎটা হবে কৃষান এবং শ্রমিকের।[৮] আর বিখ্যাত 'গোদান' উপন্যাসে অধ্যাপক মেহ্‌তার কণ্ঠে প্রেমচন্দের জীবন-সায়াহ্নে যেন এক ঐতিহাসিক ঘোষণাই ধ্বণিত হল, 'জো অপনি জান খপাতে হৈ, উন্‌কা হক্ উন লোগো সে জ্যাদা হৈ, জো কেবল রূপয়া লগাতে হৈ।' 'যারা কেবল টাকা সুদে খাটিয়ে বেড়ায় তাদের তুলনায় যারা দিনরাত খাটে তাদের দাবি অনেক বেশি।' কিন্তু প্রেমচন্দ কি আকস্মিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন?

প্রেমচন্দের 'প্রেমাশ্রম' ঔপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। এর ঠিক আগের বছরই প্রেমচন্দ সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি গোরখপুর সরকারি নর্মাল স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে যোগ দেন। কিন্তু ক্রমশই সরকারি চাকরির প্রতি তাঁর বিরূপতা জমতে থাকে। তাই নর্মাল স্কুলে সরকারি উদ্যোগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যে বিজয়োৎসব পালিত হয় প্রেমচন্দ ইচ্ছে করেই তাতে যোগ দেন নি। এছাড়া কালেকটার সাহেবকে সেলাম না করার অপরাধে তার কাছে প্রেমচন্দ অত্যন্ত অপমানিত

হন। অবশ্য প্রেমচন্দ কালেকটারকে সহজে ছাড়েন নি। তার বিরুদ্ধে তিনি দেওয়ানি আদালতে মানহানির মামলা আনেন এবং শেষপর্যন্ত আপোষে এই মামলার নিষ্পত্তি ঘটে।

কিন্তু এই সমস্ত ঘটনায় অনিবার্যভাবেই প্রেমচন্দের মন ভেঙে যায়। এবং ১৯২১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি নর্মাল স্কুল ছাড়লেন। তারপর ১৯২২-এই কাশী বিদ্যাপাঠে তিনি যোগদান করলেন। কাশী বিদ্যাপীঠ তখনকার দিনে স্বদেশীদের একটি বিখ্যাত আশ্রয়স্থল ছিল। অতএব প্রেমচন্দ যে তাঁর যোগ্য জায়গাতেই গিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তখনও প্রেমচন্দ গান্ধীজির প্রবল ভক্ত। গান্ধীবাদই তখনও তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এর একটা যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত গান্ধীজির আহ্বানে সমস্ত দেশময় যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, জনগণ যেভাবে তাতে স্বত-স্ফূর্ত সাড়া দিয়েছিলেন তাতে তাঁকে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের একচ্ছত্র নেতা বলে মেনে নেওয়াটা প্রেমচন্দের পক্ষে মোটেই অযৌক্তিক হয় নি। তবে শুধু সেইজন্যেই নয়। সমাজ-সচেতন রাজনীতিবিদের চোখে এর অন্য-কারণও ধরা পড়েছিল। 'একথা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে কোনো কোন বিষয়ে প্রেমচন্দর ধারণা ছিল অস্বচ্ছ। তাঁর মতো বাস্তববাদীও কখনও কখনও অসহযোগ আন্দোলন, অহিংসা, পুনরুত্থানবাদ অথবা অধ্যাত্মবাদের পিছল পথে পা ফসকে পড়ে গিয়েছিলেন। অথচ এ সমস্তই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিস্ময়ের সম্পূর্ণ বিপরীত।'[৯] অপর একজন সাহিত্য-সমালোচক মনে করেছেন যে 'নিঃসন্দেহে প্রেমচন্দ গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রেমচন্দের দৃষ্টিতে গান্ধীজি ছিলেন এমন একজন রাজনৈতিক নেতা যিনি অগণিত ভারতবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন। এবং যাঁর আহ্বানে ভারতীয় জনসাধারণ অসংখ্য চিত্তে সাড়াও দিয়েছিলেন।'[১০] আর প্রেমচন্দ নিজেও বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্যিককে নিজের দেশ ও কালের প্রতিনিধিত্ব করতেই হবে। 'সাহিত্যিক নিজের দেশ ও কালের দ্বারা প্রভাবিত হন। যদি দেশের কোথাও কোন আলোড়ন দেখা দেয় তাহলে সাহিত্যিকের পক্ষে অবিচলিত থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।'[১১]

'প্রেমাশ্রম' উপন্যাসের কথাতেই আবার ফিরে আসা যাক। 'প্রেমাশ্রমে' প্রেমচন্দ সম্পূর্ণ গান্ধীবাদী। তখনও তিনি ভালো জমিদার বনাম খারাপ

জমিদারের তত্ত্বে আস্থাবান। তখনও তিনি হৃদয়ের পরিবর্তনের তত্ত্বে গভীর বিশ্বাস করেন। ব্রিটিশ-শাসিত আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক তৎকালীন সমাজব্যবস্থাই যে গ্রামীণ ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার মূলে এই সত্যটি তখনও তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। সাধারণের জন্য গ্রামের গোচারণভূমি ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ফলেই 'প্রেমাশ্রম' উপন্যাসে কৃষক, জমিদার ও সরকারি কর্মচারীর বিরোধ ঘনীভূত হয়। ইতিমধ্যে একজন কৃষক একজন সরকারি কর্মচারীকে হত্যা করে বসে। অপরদিকে মনোহর নামক একজন কৃষক অত্যাচারী জমিদার গউস খাঁকে হত্যা করে। কিন্তু হিংসার মাধ্যমে জমির সমস্যার যে সমাধান হবে না প্রেমচন্দ তখনও সেই তত্ত্বেই বিশ্বাসী। তাই এই সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি প্রেমশংকর নামক একজন সমাজ-সংস্কারকের চরিত্র সৃষ্টি করলেন। যে এমন এক প্রেমাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে যার উদ্দেশ্য হল প্রেমের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করা, আর্থিক বৈষম্য দূর করা এবং পরিণামে রামরাজ্য গড়ে তোলা। অর্থাৎ, আলোচ্য উপন্যাসের প্রতিটি স্তরেই গান্ধীবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব যে অনুভূত হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু জীবনের শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোদানে' প্রেমচন্দ এই প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন। এই উপন্যাসের নায়ক হরি একজন কৃষক। সে মাত্র পাঁচ বিঘে জমির মালিক এবং ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতির চিরন্তন ঐতিহ্য অনুযায়ী ঋণ, সুদ, খাজনা ইত্যাদির চাপে জর্জরিত। তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন—একটুকরো জমি এবং একটি গরু। এর জন্য যে সবকিছুর সঙ্গেই আপোষ করার চেষ্টা করে এবং অনিবার্যভাবেই জীবন-সায়াহ্নে তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি শিথিল হয়ে যায়। সারাজীবন চরম অভাব-অনটনের মধ্যেও যে মাথা উঁচু করে রেখেছিল তাকে শেষপর্যন্ত মহাজনের চাপে নিজের কন্যাকে একজন বৃদ্ধের কাছে প্রায় বিক্রি করেই দিতে হয়। হাত পেতে মহাজন দাতাদীনের কাছ থেকে দুশো টাকা নেওয়ার পর হরির মনে হল, 'গত ত্রিশ বছর ধরে জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আজ সে পরাস্ত হল। এই পরাজয়টা এমনই ধরনের যে তাকে যেন একটা শহরের প্রবেশ পথে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যে যাচ্ছে সেই তার মুখে থুথু ছিটিয়ে যাচ্ছে।' প্রেমের মাধ্যমে অত্যাচারী মানুষের হৃদয়-পরিবর্তনের দিন শেষ। গ্রামীণ ভারতবর্ষের অপরাজেয় কৃষকশ্রেণীর প্রতিনিধি হরি কারো কাছ থেকে কোন সহানুভূতিই পায় নি। সে একা লড়াই করতে করতেই আপাতদৃষ্টিতে

হেরে গেছে।

কিন্তু, হরি কি শেষপর্যন্ত সত্যিই হেরেছিল? লেখক উপন্যাসের একেবারে শেষে নিজেই এই প্রশ্নের জবাব খোঁজবার চেষ্টা করেছেন। 'জীবন কে সারে সঙ্কট, সারী নিরাশায়েঁ মানো উসকে চরণো পর লোট রহী থী। কৌন কহতা হৈ, জীবন-সংগ্রামমে উহ হারা হৈ? ইহ উল্লাস, ইহ গর্ব, ইহ পুলক, ক্যা হার কে লক্ষণ হৈ? ইন্‌হী হারোঁ মে উসকী বিজয় হৈ?'—'জীবনের সমস্ত সঙ্কট, সমস্ত নৈরাশ্য এই মুহূর্তে তাঁর পায়ে যেন লুটিয়ে পড়েছে। কে বলল যে জীবন-সংগ্রামে সে হেরে গেছে? এই উল্লাস, এই অহঙ্কার, এই আনন্দ—এসব কি পরাজয়ের লক্ষণ? এই পরাজয়ে প্রকৃতপক্ষে তার জয়ই হয়েছে।'

'প্রেমাশ্রম' থেকে 'গোদান'। হৃদয়-পরিবর্তনের স্তর থেকে কৃষকের জীবন-সংগ্রামের অংশীদার হওয়ার স্তরে উত্তরণ। এই উত্তরণের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। দুটি ঘটনাই ঘটে তাঁর মৃত্যুর বৎসর ১৯৩৬-এ। এর প্রথমটি হল লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে প্রেমচন্দের সভাপতিত্ব আর দ্বিতীয়টি হল তাঁর শেষ রচনা 'মহাজনী সভ্যতার' প্রকাশ।

৩

১৯৩৬ সালের ১০ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌ শহরে সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংঘের প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রগতিশীল লেখকেরা এক জায়গায় এসে জড়ো হলেন। এর ঠিক কিছুদিন পরেই ১৯৩৬ সালের ১৯ থেকে ২৩ জুন লণ্ডন শহরে আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনের সূচনা হয়। এই সম্মেলনে সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংঘের পক্ষ থেকে যে বার্তা পাঠানো হয় তাতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুন্সী প্রেমচন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জওহরলাল নেহরু, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'আজ বিশ্বযুদ্ধের প্রেতাত্মা যেন পৃথিবীকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র খাদ্যের বদলে বন্দুক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগের বদলে সাম্রাজ্য গড়ে তোলার লিপ্সার মাধ্যমে তাদের যুদ্ধসহ চেহারাটি সৃষ্ট করে তুলেছে।......আমাদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ থেকে

অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা একথা ঘোষণা করতে চাই যে আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং শপথ করে একথাও বলতে চাই যে যুদ্ধের প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণই নেই। আমরা ভারতবর্ষের যে কোন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশগ্রহণের তীব্র বিরোধী, কারণ আমরা জানি যে পরবর্তী যুদ্ধে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎই বিপন্ন হয়ে পড়বে।'[১২] এই বিবৃতিটিই রমঁ্যা রলঁ্যার আহ্বানে ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে প্রেরিত হয়।

এই পটভূমিকায় প্রগতিশীল লেখক সংঘের প্রথম অধিবেশনে প্রেমচন্দের সভাপতিত্বের গুরুত্ব বিচার করতে হবে। দরিদ্র ভারতবর্ষের ততোধিক দরিদ্র কৃষকের জীবনের রূপকার এতদিনে যেন বাইরের জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। দরিদ্র মানুষের প্রধান শত্রুর প্রতিও তাঁর দৃষ্টি এতদিনে সঠিকভাবেই নিবদ্ধ হল। সমকালীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে তিনিও সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের অংশীদার হলেন। তাঁর অভিভাষণের মধ্যেও এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির সুর স্পষ্ট, 'আমরা যেমন অপরের শ্রম ভাঙিয়ে খায় বলে একজন পুঁজিপতিকে লুণ্ঠনকারী ও শোষক হিসেবে দেখি তেমনি আমরা বুদ্ধিজীবী-পুঁজিপতিদেরও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করি। কারণ, তাঁরা সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা অর্জন করা সত্ত্বেও তা কেবল নিজেদেরই কাজে লাগায়। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এখন প্রধান কর্তব্য হল সমাজকে সমস্ত রকম উপায়ে সাহায্য করা।'[১৩]

প্রেমচন্দ সভাপতির পদ গ্রহণ করাতে প্রগতিশীল লেখকসংঘের মূল আদর্শ যে জয়যুক্ত হয়েছিল সংঘের প্রথম সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহীরের প্রারম্ভিক ভাষণে তার স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। 'প্রেমচন্দের মতো হিন্দী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্প লেখক এবং একজন মহান মানবতাবাদী যে আমাদের প্রথম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন এর দ্বারাই প্রমাণিত হল যে আমরা 'প্রগতিশীল' বলতে যা বুঝি তা মোটেই ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ অর্থে প্রযোজ্য নয়।'[১৪] প্রেমচন্দের মনের মধ্যে তাঁর সমকালীন দেশবাসীর অবহেলা বা নিন্দা যতটুকু গ্লানি সঞ্চারিত করেছিল জীবন-সায়াহ্নে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলনের পুরোধাদের কাছ থেকে এই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি নিশ্চয় সেই গ্লানি দূর করে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে জাতীয় পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছিল, পাল্টাচ্ছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। 'দুঃখী হিন্দুস্থানের দরিদ্র লেখক'[১৫] এতদিনে যেন সাধারণ

মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্যের মূল কারণের সন্ধান পেয়ে গেছেন। ১৯৩৬ সালের ৮ অক্টোবর বারাণসীতে তাঁর মহাপ্রয়াণ। আর তাঁর শেষ রচনা 'মহাজনী সভ্যতা' ঐ বৎসরেরই সেপ্টেম্বর মাসের 'হংস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে শোষণ, বৈষম্য, গ্লানি, মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনা—এ সমস্তই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অবদান। মানব-জাতিকে এই সভ্যতাই ধ্বংসের কিনারায় প্রায় ঠেলে এনেছে। আর এর পাশাপাশি এক নবীন সভ্যতার উদয় হয়েছে যার নাম সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা। এই সভ্যতা পুঁজিবাদের শেকড় উপড়ে ফেলে শ্রমজীবী মানুষকে তার ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছে। 'এই সভ্যতা ঐশ্বর্যসঞ্চয়ের ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে চলেছে, তাই সে ধন্য। আজই হোক, অথবা কালই হোক, সমস্ত পৃথিবীকেই একদিন একে অনুসরণ করতে হবে।··· একথা ঠিক যে মহাজনী সভ্যতা এবং তার অনুচরবৃন্দ যথাসাধ্য এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে, এর সম্পর্কে নানা মিথ্যা প্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করবে, তাদের চোখে ধুলো দেবে, কিন্তু যা সত্য একদিন না একদিন তার অবশ্যই জয় হবে।'[১৬]

পাঠকের কি ঠিক এই মুহূর্তে অপর একজন মহান মানব-প্রেমিক কবির 'সভ্যতার-সঙ্কটের' কথা মনে পড়ছে না? তাহলে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা অন্যায় হবে যে মহৎ লেখকেরা জীবন-সায়াহ্নে ঠিক একই জায়গায় এসে দাঁড়ান?

প্রেমচন্দকে একবার একজন পাঠক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি? প্রেমচন্দ জবাব দিয়েছিলেন, 'সেটি এখনও লেখা হয় নি।'[১৭] 'মহাজনী সভ্যতা' পড়লে বোঝা যায় যে সেই অলিখিত কাহিনীটির বিষয়বস্তু কি হতে পারত।

---

১. প্রেমচন্দ, উনকী কৃতিয়া ঔর কলা, ১৯৪৯, পৃ: ১৩৪।
২. 'হংস' পত্রিকা, প্রেমচন্দ স্মৃতি সংখ্যা, ১৯৩৭।
৩. প্রেমচন্দ: ভারতীয় ভাষায়ো মেঁ। অরুণ মহেশ্বরী। 'কলম' পত্রিকা। প্রেমচন্দ বিশেষ সংখ্যা, পৃঃ ১৪৭।
৪. 'প্রেমচন্দের গল্পগুচ্ছ' ভূমিকা, প্রসূন মিত্র অনূদিত, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।
৫. ভূমিকা পৃঃ XI-XII, প্রেমচন্দ শতবার্ষিকী সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংহতি পরিষদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, অন্বেষা।

৬. 'হংস' পত্রিকা মার্চ, ১৯৩২।
৭. 'প্রেমচন্দ ঘর মেঁ', দিল্লী, ১৯৫৬, পৃঃ ১১০।
৮. প্রেমচন্দ ঔর উনকা যুগ, রামবিলাস শর্মা, পৃঃ ১৭৪।
৯. বি. টি. রণদিভে : প্রেমচন্দ কা রাজনীতিক লেখন, কলম, প্রেমচন্দ সংখ্যা, পৃঃ ৩।
১০. ডঃ কুঁয়রলাল সিংহ : প্রেমচন্দ ঔর গান্ধীবাদ, ঐ, পৃঃ ৬১।
১১. 'হংস' পত্রিকা, এপ্রিল ১৯৩২, পৃঃ ৪০।
১২. Marxist Cultural Movement in India : Chronicles and Documents ; Complied and Edited by Sudhi Pradhan, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। 'Foreward' থেকে উদ্ধৃত।
১৩ মূল ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ থেকে তর্জমা, ঐ, পৃঃ ৫৭।
১৪. ঐ, পৃঃ ৫১।
১৫. রামবিলাস শর্মা : প্রেমচন্দ ঔর উনকা যুগ, পৃঃ ২৮।
১৬. 'মহাজনী সভ্যতা', অমৃতরায় সম্পাদিত 'প্রেমচন্দ-স্মৃতি', ১৯৫৯, পৃঃ ২৬৪।
১৭. রামবিলাস শর্মা : প্রেমচন্দ ঔর উনকা যুগ, পৃঃ ২৮।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার ধারা

অন্যান্য সাহিত্য শাখার মতো উপন্যাসও কল্পনাসম্ভব শিল্প—প্রভেদটা শুধু এই, উপন্যাস জীবনগত বাস্তবতার এত ঘনিষ্ঠ যে, বাস্তবতার আলোয় না-মেলে ধরলে উপন্যাসের শিল্প রহস্যের যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধিও সম্ভব নয়। এ-বিষয়ে সিনেমা ছাড়া উপন্যাসের আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই—বক্তব্য ও আঙ্গিকের অধিকাংশই এই দুই ক্ষেত্রে সংগৃহীত হয় বাস্তব সামাজিক 'ফেনোমেনা' বা প্রত্যক্ষ ঘটনা থেকে। কিন্তু এখানেই কথা ফুরিয়ে যায় না, এখান থেকে কথা শুরু হয়। কেননা, আমরা জানি সমাজতত্ত্ব দিয়ে শিল্প ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না—উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতা সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনার কালে আমাদের মনে রাখতে হয়—আমরা এখানে শিল্পকর্ম আলোচনা করছি, সমাজতত্ত্ব নয়। প্রুস্ত ছিলেন ফ্লবেয়ারের নিবিষ্ট পাঠক। ফ্লবেয়ার বালজাক্ পড়তেন মন দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র স্কট্ পড়তেন, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের উপন্যাস যেমন পড়েছেন, শরৎচন্দ্র তেমনই পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ; আবার তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতিভূষণকে প্রস্তুত হতে হয়েছে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পড়ে।

অর্থাৎ নিজনিজ বাস্তবতায় লগ্ন থেকেও শিল্পীদের সজাগ থাকতে হয়েছে পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে—শিল্পের ইতিহাসই শিল্প বিচারের মুখ্য। সুতরাং এখানে আমাদের ভাবনার বিষয় সমাজ-ইতিহাস যতটা, তার থেকে ঢের বেশি একটি বিশেষ শিল্পরূপ। তাই সামাজিক অভিব্যক্তি বা সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন হিসাবে উপন্যাসের একতরফা ডিক্রিলাভকে উপন্যাস শিল্পবাদীরা সুচক্ষে দেখেন না। পক্ষান্তরে সানুপুংখ সমাজ বাস্তবতার যাঁরা সন্ধিৎসু তাঁরা শিল্পবাদীদের বিশুদ্ধ ফর্মালিস্ট আখ্যা দিতে পশ্চাৎপদ নন। এখান থেকেই প্রশ্নটা ওঠে যে জীবন এবং সমাজেতিহাস কি কেবলমাত্র উপন্যাসের বক্তব্যের ক্ষেত্রেই প্রধান বিবেচনা সূত্র, না, বাস্তব সমাজে তার জটিলতার মধ্যে তার বিবর্তন ও রূপান্তরের ঘাতে অভিঘাতে রয়েছে উপন্যাসের আঙ্গিক বিবর্তনেরও

হেতুগত উপাদান? আধুনিক য়ুরোপীয় উপন্যাস সমালোচকের মতোই আধুনিক বাঙালি সমালোচককেও এই দুটি প্রশ্নের মোকাবেলা যখন তখন করতেই হয়—তার ফলে একটা ফল্‌স ডাইলেমার মধ্যেও যে পড়তে হয় না তা নয়।

the paradox of the novel is the paradox of all warks of art —যে বাস্তবতার অভিব্যক্তি হিসাবে এর জন্ম কেবলমাত্র সেই বাস্তবতার সূত্র ধরেই শিল্পকর্মটিকে সর্বতোভাবে জেনে নেওয়া যাবে না। সেই বাস্তবতায় আর তাকে ফেরৎ দেওয়াও সম্ভব নয়। আধা সমাজতাত্ত্বিক, আধা-শৈল্পিক দৃষ্টিতে উপন্যাস বিচার সে জন্যই ভ্রান্তিকর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কথা। এ-উপন্যাসটিকে আমরা সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক অথবা আধ্যাত্মিক যে কোন স্তর থেকেই ব্যাখ্যা করতে পারি। এমনকি সে ব্যাখ্যায় তার শিল্পসুষমার রহস্যও হৃদয়ঙ্গম করার পথে সাহায্য মেলে। কিন্তু 'চতুরঙ্গ'যেহেতু নানা স্তরকে অঙ্গীভূত করেও শেষ পর্যন্ত খুঁজেছে সমগ্রকে—শিল্প রসিককেও তেমনি খুঁজতে হয় ঐসব উপাদানগুলির সন্নিবেশে গঠিত শিল্পময় সমগ্রতাকে। আমাদের এই সামান্য ভূমিকাটুকুর দরকার হ'ল এ বিষয়ে প্রথম থেকে নিশ্চিত থাকতে যে, আমরা এখানে উপন্যাস বিচার করতে বসেছি। সামাজিক সূত্রাবলীর ঔপন্যাসিক প্রয়োগ-নিরীক্ষা আমাদের অন্তত আজকের আলোচনাসভার কাজ নয়।

দুই

চিত্রকলা আর উপন্যাস শিল্পের মধ্যে অমিল প্রচুর। কিন্তু এক জায়গায় মিল আছে। চিত্রশিল্পী আর ঔপন্যাসিক দুজনেরই কাজকর্ম বাস্তবকে ধরে—কিন্তু দুজনেরই শেষ তাৎপর্য বাস্তব থেকে কী তাঁরা নিষ্কাশিত করে নিলেন তার উপরে নির্ভরশীল। এক-একজন ঔপন্যাসিকের যে বাস্তব সম্বন্ধে এক এক পৃথক তত্ত্ব গড়ে ওঠে তার মূল কারণ কী নিষ্কাশন করে নিতে হবে অর্থাৎ content এবং কেমনভাবে নিষ্কাশন করতে হবে, অর্থাৎ টেকৃনিকের পৃথক চেতনা। গত শতকে আইভান টুর্গেনিভকে লেখা একটি চিঠিতে গুস্তাভ ফ্লবেয়ার রিয়্যালিজ্‌ম-এর উত্তরসাধক ন্যাচারালিজ্‌ম ও ইমপ্রেশনিজ্‌মকে খোঁচা দিতে গিয়ে রিয়্যালিস্টদেরই সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বলে—Reality,in my view ought to be no more than a Spring board. বাস্তবতা একজন চিত্রশিল্পী বা ঔপন্যাসিকের কাছে সমস্যার বিষয় নয়—সমস্যার

বিষয় নয়—সমস্যার বিষয় হল বাস্তবতার রূপভাষ্য। এই রূপভাষ্য বলতে বর্তমান বক্তা বোঝাতে চাইছেন ফর্ম এবং কনটেন্টের অন্বয় মূর্তি।

এই রূপভাষ্য নির্ভর করে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিস্বরূপ-চেতনার উপর। এই ব্যক্তিস্বরূপ, যা নাটকে প্রোটাগনিস্ট, মহাকাব্যে চরিত্র, তা উপন্যাসে লেখকের বাস্তব চেতনার মুখ্য প্রতিফলক। ব্যক্তিস্বরূপই উপন্যাসে সামাজিক মাত্রা বা Social dimension যোজনা করে, তাকে মুকুরিত করে। এই Social dimension-এর প্রভেদের জন্য উপন্যাস-তত্ত্ব কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। লরেন্স বলেছিলেন Thumbs off the scale—টুর্গেনিভ এবং ফ্লবেয়রের নৈর্ব্যক্তিকতার আরো প্রবলতর উত্তরসূরী হিসাবেই বলেছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল টুর্গেনিভ বা বালজাকের তুলনায় লরেন্সের লেখা মন্ময়ধর্মী এবং শিক্ষাত্মকও বটে। আবার লরেন্স যে মাদাম বোভারির আলোচনাকালে মন্তব্য করেছিলেন বাস্তবতা ট্র্যাজেডির ধারণাকে ব্যাহত করে, Realism impairs the sense of tragedy সে তত্ত্বও হয়তো শুধু মাদাম বোভারি প্রসঙ্গেই সত্য। সতীনাথ ভাদুড়ীর বিখ্যাত নায়ক ঢোঁড়াই অবশ্য সামান্য ব্যক্তি। কিন্তু তাকে প্রেক্ষণ-বিন্দু হিসাবে ব্যবহার করে ট্র্যাজিক হিরোর সংকল্পময় সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলা লেখকের পক্ষে অসম্ভব হয় নি। তার কারণ Comic concern about the society and tragic concern about the individual-এর সমন্বয় তিনি করতে চেয়েছিলেন।

আমি প্রথমেই 'সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার ধারা' আলোচনায় সতীনাথের কথা পাড়লাম কেন সে সম্বন্ধে সামান্য কৈফিয়ৎ প্রয়োজন। তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যে-ঐতিহ্য রচনা করলেন সতীনাথ তার মধ্যে তারাশঙ্করের উত্তরসাধক। তারাশঙ্করের সঙ্গে সতীনাথের বিস্তর অমিল সত্ত্বেও গভীর মিল এক জায়গায়—দুজনেই এক-একটা আঞ্চলিক জীবনযাত্রার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন স্বাধীনতার অব্যবহিত প্রাক্কালের ভারতীয় জনজীবনের পরিবর্তনের দ্রুত ছন্দ। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ও ঢোঁড়াই চরিত মানসের প্রসঙ্গে প্রকরণে প্রভূত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই সাদৃশ্যটি নজরে পড়তে দেরি হয় না। নিজ দিনলিপির খসড়ায় ঢোঁড়াই রচনার তত্ত্ব কাঠামোটি সম্বন্ধে লেখক লিখে রেখেছিলেন—'A story, the nerve of which is the tension of social upheaval.' স্পষ্ট করেই বলেছিলেন—'Society is accepted as something immediately

close, powerful and final, is now changing—(and swiftly changing)।' এই পরিবর্তমান রিয়্যালিটিকে তারাশঙ্করও ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু ধরতে চাওয়ার পদ্ধতিটা দুজনের দু-রকম। পরিবর্তমান জীবনস্রোতের যে অংশে নাটকীয় আবর্ত তারাশঙ্কর তাকে খোঁজেন। তাই তাঁর নায়ক করালী বস্তুত নায়ক হিসাবেই উপন্যাস ভূমিতে প্রবেশ করে। সতীনাথের ফ্রেম—যে অর্থে রামচরিতমানস ভারতীয় মহাকাব্য—সেই অর্থে মহাকাব্যের ফ্রেম। নায়ক—নাটকীয় অর্থে নায়ক হয়েই রঙ্গমঞ্চে হাজির হয় নি—রামচরিত মানসের নায়কের মতো তাকে ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হতে হয়েছে। অথচ ভূমি ব্যবস্থা, কৃষি অর্থনীতি, জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতায় দুই শিল্পীই সমান সমৃদ্ধ ছিলেন। তারাশঙ্কর যেটাকে দুই কালের দ্বন্দ্ব বলে চিহ্নিত করেন সেটা তাঁর মৌল ধারণা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল পুত্রের কাছে পিতার অপরাধী চেতনার এক বিশেষ জট। আখড়াইয়ের দীঘির গল্পে, পিতাপুত্র গল্পে এবং পঞ্চগ্রামে তার নবতর প্রয়োগে, অগ্রদানী গল্পে, অল্পবিস্তর ডাকহরকরা গল্পেও বটে তারাশঙ্কর পিতাপুত্র সম্পর্ককে পিতার অপরাধচেতনার আলোয় মেলে ধরতে চেয়েছেন। তারাশঙ্করের নৈতিক জগতের ভাঙ্গন পিতার হাতে যেমন ঘটেছে, তেমনি পিতার বিশ্বাসের জগতের ভাঙ্গন পুত্রের হাতেও ঘটেছে। এই দুই শ্রেণীর গল্পে পিতার অনিবার্য পরাজয় এসেছে নিয়তির কাছ থেকে—সে নিয়তি পিতারই নিজ কর্মফল। ভারতবর্ষের সেকাল-একালের দ্বন্দ্বে তারাশঙ্কর সেকালের মধ্যে কর্মফল জর্জর পিতৃরূপককে প্রত্যক্ষ করেছেন। করালী এবং বনোয়ারীর মধ্যে তারাশঙ্কর এম্‌ফ্যাসিস্‌টা দেন তাই বনোয়ারীর উপর। পক্ষান্তরে সতীনাথের এম্‌ফ্যাসিস্‌টাই নতুন কালের ব্যক্তি-স্বরূপের ওপর। জাগরীর গল্পে বিলু নীলু প্রাধান্য পায়—প্রাধান্য পায় নতুন কালের পলিটিক্যাল রিয়্যালিটি, মতাদর্শের সংঘাত; ঢোঁড়াইয়ের গল্পেও ঢোঁড়াইয়ের অভিজ্ঞতার জগৎটাই মুখ্য। ছোটগল্পের বেলাতেও দেখি 'আন্টাবাংলা' ধ্বসে যাচ্ছে দেখে তারাশঙ্করের জলসাঘরের মতো করুণ পঞ্চাঙ্কের শেষ দৃশ্যের আদল সতীনাথের মনে আসে না। নাটক যেমন তাঁর ত্রিকালদর্শী পূর্বসূরীর প্রিয় প্যাটার্নের উৎস, সাগা, বা টেল্‌ বা মহাকাব্য তেমনি সতীনাথের। দ্বন্দ্ব যেমন তারাশঙ্করের প্রধান অঙ্কনীয় বিষয়, সতীনাথ তেমন ব্যক্তি-স্বরূপের টেন্‌শন্‌কেই চরিত্রস্বরূপ বলে ধরেন।

তারাশঙ্করের মতোই সতীনাথও পট ও পটবিধৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে বাস্তব

সচেতন। 'প্রতিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু চরিত্রের মধ্যে দিতে হবে'—এ শুধু ঢোঁড়াই সম্বন্ধেই সতীনাথের লক্ষ্য নয়—সতীনাথ এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্করের বাস্তব চেতনার উত্তরাধিকারী। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে—এই বাস্তব জ্ঞান সতীনাথের সমস্ত রচনার দিশারি। তাঁর শিল্পরীতির ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ হয় এই আলোকে। সতীনাথ বলছেন—'একটি particular form—যা গরিব লোকদের নিয়ে বইয়ে সব চেয়ে বেশি প্রচলিত (বামপন্থী) সাহিত্যে—সেটা সাহিত্যের পক্ষে একটু স্থূল মনে হয়েছিল আমার।' অর্থাৎ সতীনাথ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার যে আন্দোলন তখনকার বাংলা সাহিত্যের একাংশকে প্রভাবিত করেছিল তার সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন, কিন্তু তার সাহিত্যিক নিদর্শন তাঁকে খুব প্রভাবিত করতে পারেনি। অথচ তিনি ফর্ম্ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ফর্মালিস্টদের ফতোয়া ধরে নয়—বিষয়ের বাস্তব গুরুত্ব বুঝেই—'Form is nothing but the power to extract the fullest from the material'—এ তো তাঁরই কথা। এই ফর্ম খুঁজতে গিয়ে তিনি জীবনকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। যেখানে বাঙালি বামপন্থী লেখকেরা খুঁজছিলেন 'an artistic method presupposing a truthful, historically concrete reflection of reality taken in its revolutionary development'—উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি গোপাল হালদারের ঊনপঞ্চাশী, পঞ্চাশের পথে, তেরশ পঞ্চাশ, মনোরঞ্জন হাজরার নোঙরহীন নৌকা, পলিমাটির ফসল, সুবোধ ঘোষের কর্ণফুলির ডাক গল্প প্রভৃতি—সতীনাথ সেখানে প্রতিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু ব্যবহার করে অন্তর্গূঢ় মানুষকে ধরতে চেয়েছেন। ঢোঁড়াই জন্মসূত্রে লব্ধ এক inner isolation তথা, নিগূঢ় বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে লড়াই করে। মনে হয় ব্যক্তির অন্তর্জগত বা অন্তর্গূঢ় রিয়্যালিটি আসলে ছিল সতীনাথের সন্ধেয়। তাই ঢোঁড়াইয়ের দাম্পত্য বিপর্যয় ঢোঁড়াইদের শ্রেণীর ছন্দে অনিবার্য ক্রম অনুসরণ করে বিচ্ছেদের মর্মান্তিকতায় পরিণতি পায়, সেখানে ঢোঁড়াইয়ের ঘটনাকে আবৃত করার কোনো মধ্যবিত্ত মুখোসের দরকার হয় না—এ সামাজিক বাস্তবতা সযত্নে রক্ষা করেন লেখক। আবার 'দিগভ্রান্ত' উপন্যাসে সুবোধবাবুর পারিবারিক ডিসগ্রেস-এর বুর্জোয়া ভীতি অঙ্কনে পারিবারিক বাস্তবতাও তিনি কদাচ ক্ষুণ্ণ হতে দেন না। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই তাঁর আসল লক্ষ্য থাকে অন্তর্গত টেন্‌শন্ বা নিগূঢ় বাস্তবতাকে মূর্ত করে তোলা। এটাই তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ সম্বন্ধে নিজস্ব ধ্যান। পরিবর্তমান

সোস্যাল রিয়্যালিটির মাঝখানেই সতীনাথ ক্রমশ উপলব্ধি করছিলেন ব্যক্তির inner isolation—ব্যক্তির একাকীত্ব। সে একাকীত্বকেও ধরতে হলে একটা সামাজিক ফ্রেম চাই। এই সামাজিক ফ্রেমের ব্যাপারে মাত্র সতীনাথ তারাশঙ্করের উত্তরসূরী।

তিন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যই স্বাধীনতা উত্তরবাংলা সাহিত্য; এই স্বাধীনতার গায়ে শুধু যে দেশভাগের দাগ, গৃহহারা বাস্তুহারা মানুষের অশ্রুর দাগ, ভ্রাতৃ হননের রক্তের দাগ তাই নয়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাগও প্রচুর। শুধু আলোর চোখই ঠুলি পরতে শেখে নি সেই যুদ্ধের দিনগুলিতে, আমাদের মূল্যবোধও ঠুলি পরতে শিখল। এক মহাযুদ্ধের অভিঘাতে জেগে উঠেছিল বাঙালির বিপ্লবের স্বপ্ন, তিরিশের বছরগুলিতে জাগ্রত হয়েছিল মধ্যবিত্তের সংকল্পময় নানা স্বপ্ন আরেক মহাযুদ্ধের পূর্বেই অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সেই স্বপ্নের জট ও ক্ষয়ের সাক্ষীদের দেখা পাওয়া যায়। মধ্যবিত্তের নিঃসঙ্গ মনঃসমুদ্রের নানা ছবিতে তার সমাসন্ন বিপন্নতার ইশারাও তিনি দিচ্ছিলেন। মহাযুদ্ধের আরেকটা ঝাপটে মধ্যবিত্তের অবশিষ্ট স্বর্ণ যুগের সম্পূর্ণ অবসান ঘটল। মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ গণবিক্ষোভ, দেশবিভাগ- এই শতাব্দীর চারের দশকে পাঁচ বছরের মধ্যে ঘটে গেছে ('৪২ থেকে '৪৭-এর মধ্যে)। তিরিশের উজ্জ্বল লেখকদের যে-অংশটি ছিলেন স্ক্যাণ্ডিনেভীয় ডিকেন্টারে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আসবপানে প্রমত্ত, তাঁরা কেউই বিশেষ এই শ্বাসরোধী বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস করেন নি। অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র—শৈলজানন্দ—সকলের উপন্যাস কীর্তির কথা মনে রেখেই কথাটা বলছি। প্রবোধ সান্যাল যিনি তিরিশের মন্থর দিনগুলিতে সব থেকে বেশি বোহেমিয়ান নায়ক সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি একটি বড় গল্পে কিন্তু আশ্চর্য ব্যতিক্রম পরিগণিত হলেন গল্পটির নাম 'অঙ্গার'। মহাযুদ্ধের নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে আমরা কত কী বিসর্জন দিলাম 'অঙ্গার' তার প্রমাণ। কিন্তু উপন্যাসে এই বাস্তবতার সামগ্রিক নিদর্শন কমই মিলেছে। দুর্ভিক্ষের এবং আগস্ট আন্দোলনের দিনগুলির পটভূমিতে লেখা তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' দুজনেরই দ্বিতীয় হাতের রচনা।

একটা ব্যাপারে অবাক না হয়ে পারি না যে, ছোটগল্পে, বা উপন্যাস অপেক্ষা ছোটমাপের রচনায় বরঞ্চ উল্লিখিত বাস্তবতার প্রতিফলন পড়েছে দ্রুত। তারাশঙ্করের 'বোবাকান্না', 'পৌষলক্ষ্মী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' অচিন্ত্যকুমারের 'কাঠখড' 'কেরোসিনের গল্প', প্রবোধ সান্যালের পূর্বকথিত 'অঙ্গার' প্রভৃতি গল্প আমাদের মনে পড়ে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী গণ-বিক্ষোভের দু-একটি দিন অবলম্বনে রচিত তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটমাপের দুটি লেখা 'ঝড় ও ঝরাপাতা' এবং 'চিহ্ন'—সবিনয়ে বলতে চাই দুই লেখকেরই বিক্ষুব্ধ বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি কর্তব্যপালন মাত্র। '৪২ থেকে '৪৭-এর মধ্যে সর্বাত্মক আলোড়ন এবং ভাঙচুর ঘটাতে পেরেছে এমন কোনো একটি বা দুটি ঘটনা নিয়েও তিরিশের ঔপন্যাসিকেরা কেউ বড় মাপের লেখা লিখলেন না। 'অশনি সঙ্কেত' বোধহয় একমাত্র বড মাপের বাংলা উপন্যাস যাতে গোটা দুর্ভিক্ষের দিনগুলি মানবিক বাস্তবতা সমেত চিত্রিত হয়েছে। বাস্তবতা নিয়ে বিভূতিভূষণের কোনো মুখর ঘোষণা ছিল না, পজিটিভ হিরো রচনা করার জন্য তিনি কোনো সমাজবাদী প্রত্যয়েও বশীভূত হন নি—কিন্তু দুর্ভিক্ষের দিনের বিশ্বস্ত আলেখ্য তিনিই এঁকে দিলেন। কাহিনীর বিবৃত সমাপ্তি বা আধুনিক উপন্যাস সমালোচনার ভাষায় যাকে open ending বলা হয়—সেটাও প্রমাণ করে বিভূতিভূষণের শান্ত বস্তুজ্ঞান। দুর্ভিক্ষ শেষ হল এবং তারপরে কাহিনী সাঙ্গ হল আশাবাদী ভবিষ্যবিজয়ের সংকল্প উচ্চারণ করে, 'নবান্ন' নাটকের এই সমাপ্তি রাজনৈতিক প্রাগ্‌মাটি-জম্-এর অনুকূল – পক্ষান্তরে বিভূতিভূষণ দুর্ভিক্ষ যখন সব থেকে ঘোরালো তখনই বই শেষ করেছেন। দুর্ভিক্ষ শেষ হল না, মানুষের সর্বপ্রকার বাঁচার লড়াইও শেষ হল না। এটা আরো বেশি moral awarness-এর সূচক বলে মনে করি। সে তুলনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্কসবাদী পর্যায়ের পজিটিভ হিরোরা কেজো ছকে বাঁধা। একটা ফ্রন্টে সামিল। তারা যেন সবরকম কথার উত্তরই জানে। কিছুর সামনেই তারা অসহায় নয়। ১৯৪২-এর ইয়েনান ফোরামে মাও-সেতুঙ যখন বলেন যে, শিল্পীও একটা সংগ্রামী ফ্রন্টের সদস্য তখন অবশ্যই আমরা সমাজ বিপ্লবের জন্য ব্যগ্র এবং তৎপর এক মহান বিপ্লবীকেই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো জটিল সামাজিক বাস্তবতার মাঝখানে, যেখানে ব্যক্তির নানাবিধ সংকল্প ও বাধা, পিছুটান ও সম্মুখের আহ্বান, সমষ্টিচেতনা এবং বিষণ্ণ একাকীত্ব পাশাপাশি কাটাকুটি খেলছে সেখানে মানিকবাবুর শশী বরঞ্চ মনোলৌল্যের মধ্য দিয়েও প্রতীকী

চরিত্র, কিন্তু তার পজিটিভ হিরোরা সকলেই বাইরের নির্দেশে চলে। মানিক-বাবুর দুই পর্যায়ের নায়কদের ঠিকভাবে ধরতে না চাওয়া এবং বিভূতিভূষণের 'অশনি সঙ্কেত' সম্বন্ধে নীরবতা—আমাদের মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনার দৈন্যের একটা নিদর্শন। তবে সে কথা বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে অবান্তর। পজিটিভ হিরো রচনার সংকল্পকে অবজ্ঞা করা আমার উদ্দেশ্য নয়—কিন্তু কোন্ বাস্তব পরিস্থিতির প্রাবল্যে পজিটিভ হিরোরা হারিয়ে গেল সেটাও বিবেচ্য। আমরা বুঝে নিতে পারি 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র করালীকে পজিটিভ হিরো বানাতে গেলে তারাশঙ্করকে পট ও প্রসঙ্গের অর্ধেকটাই বিসর্জন দিতে হত। বাস্তবের অনেকাংশ ছকে বেঁধে নিতে হত। আমাদের বাস্তবতা সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা কতদূর মোহাচ্ছন্ন ছিল তার একটা প্রমাণ হল আমরা একদা বলতে চেয়েছি 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র চেয়ে মানিক-বাবুর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' সত্যিকারের বাংলাদেশের মানুষের ইতিকথা। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র কাহারদের জীবন ভেঙ্গে শ্রমজীবী শ্রেণীতে মিশে যাবার কাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গ্রামবাংলার বাস্তব তথ্য। তারাশঙ্কর কেন তাকে tale-ধর্মী করে ফেলেছেন? না, বাস্তব তখন করুণ গল্পেরই পৃষ্ঠা সরবরাহ করতে পারে—সে-বাস্তবের ক্ষমতা ছিল না নাটকীয় অরণ্য বহ্নি হয়ে ওঠার সেটা হল তারাশঙ্করের হাতেই হল সত্তরের দশকে। তারাশঙ্কর তখনই জোর করে চাইলে সেটা প্রচারধর্মী রচনা হত। বরং তারাশঙ্করকে অন্যভাবে অভিযুক্ত করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বের দাঙ্গা বা পরের গ্রাম বাংলার অগ্নিগর্ভ কৃষক আন্দোলন তারাশঙ্করকে তেমনভাবে স্পর্শ করল না কেন? এ প্রশ্ন নিরর্থক হত যদি দেখা যেত 'সপ্তপদী', 'বিচারক', 'উত্তরায়ণ' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি যে নায়ক পরিকল্পনা করেছেন তা এক কৃত্রিম উজ্জ্বলতায়, এবং ভ্রান্ত দার্শনিকতায় আক্রান্ত নয়। শিবনাথ, অহীন দেবু এবং করালীও পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিল, হতে চেয়েছে স্রষ্টা। তাদের সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এটাই তাদের চলিষ্ণু সত্তার সার সত্য। কৃষ্ণেন্দু বা প্রবীর বা আরতির মধ্যে সেই বাস্তবকে ভেঙ্গে গড়ার সংকল্প নেই। একাকীত্ব নয়, এককত্বে তারা তাদের গৌরব খুঁজেছে। এই সমস্ত উপন্যাসে যে বাস্তবতার মূর্তি আমরা দেখেছি প্রকৃত প্রস্তাবে বাস্তবের দাবি ছিল তার থেকেও জটিলতর। এবং এ কথা না বললেও ভুল হবে যে, তিরিশের প্রোজ্জ্বল সাহিত্য পুরুষেরা সাড়া দিতে না পারলেও, তরুণতম, সবে উঠছেন এমন ঔপন্যাসিক কেউ-কেউ সেই অগ্নি-

গর্ভ, জটিল, দোমড়ানো-মোচড়ানো বিসম্বাদে বিমর্ষ কিন্তু উজ্জীবনের কথায় ভয় পায় না এমন মানব গোষ্ঠির এবং ব্যক্তি স্বরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সব থেকে স্বল্প পঠিত দুটি উপন্যাসের নাম করছি। যতদূর জানি দুখানিই দীর্ঘকাল বাজারে অমিল। একখানি গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার' আরেকখানি অসীম রায়ের 'একালের কথা'। 'একালের কথা'র বিষয় দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতার কয়েকটি যুবক-যুবতীর আত্মসচেতন পুরুষার্থ, যা সামাজিক তাৎপর্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাঙ্গাচোরা কলকাতার বুকের ওপর যারা হাঁটাচলা করছিল তারা রেমার্কীয় অবক্ষয় ও প্রেমের জের ধরা পাত্র-পাত্রী নয়। 'একালের কথা'র জগৎ চিত্রটি যেমন স্পষ্ট, তার পাত্র-পাত্রীরাও স্বসমুখ। গোপাল হালদার 'একদা' উপন্যাসে যে বাস্তবতাকে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন তা চৈতন্যের আলোড়নের বাস্তবতা। বাইরের ঘটনা নয়, মনস্তত্ত্বের গূঢ় জট নয়—অসীম রায়ও 'একালের কথা'য় সেই চৈতন্যের আলোড়নকেই গুরুত্ব দিলেন। এ ধরনের উপন্যাসে গল্প গোল হয়ে সমাপ্ত হয় না। সময়—সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর উদ্‌ভ্রান্ত সময়—কাকে কেমনভাবে স্পর্শ করেছে সেটাই এই উপন্যাসে মুখ্য কথা। ঘটনা যা আছে তা চরিত্র পাত্রগুলির বা আমি যাকে বলতে চাইছি ব্যক্তিস্বরূপ তাদের অন্তরে 'বিশেষাত্মিক প্রতিফলনে'—কথাটি ডঃ অমলেন্দু বসুর—মূল্য পেল। এই টেকনিকে তেভাগা আন্দোলনে চাষী—বিশেষ ভাগচাষী বাঙালির প্রথম নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টাকে ধরা যায় না। ঘটনা সেখানে প্রবল। গুণময় মান্নাও সে চেষ্টা করেন নি। 'লখীন্দর দিগার'-এর চরিত্রকল্পনা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তখনো পর্যন্ত অদ্বিতীয় চরিত্রকল্পনা। পজিটিভ হিরো যে তাত্ত্বিক উপলব্ধি মাত্র নয়, ব্যক্তির বাস্তবজগৎ যে সুগভীর অভিনিবেশ দাবী করে, এ-চরিত্রকল্পতা তার নিদর্শন। সাহিত্যে বাস্তবতার বিচারে 'লখীন্দর দিগার' ও 'একালের কথা' এই দুয়ের সীমাবদ্ধতার দিকটিও লক্ষণীয়। ঘটনাকে যথাযথ চিত্রিত করার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়েও দুটি রচনাই একই ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। বহির্বিশ্ব তথা বাইরের ঘটনা দুটি উপন্যাসেই প্রাধান্য পায় বটে—কিন্তু অন্তর্লোকের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে নেবার বিষয়ে ছন্দজ্ঞানে ব্যত্যয় ঘটেছে দুটি উপন্যাসেই দু-রকমভাবে। অসীম রায় প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছেন অন্তর্লোককে, গুণময় বহির্লোককে—এই দুয়ের মধ্যে অন্তর্বন্ধনকে নিগূঢ় ও ব্যক্তিস্বরূপের দিক দিয়ে অনিবার্য করে তোলার ব্যাপারে দুজনের কারো সাফল্যই বড়মাপের নয়। তথাপি

স্বাধীনতাউত্তর বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার ধারা বিশ্লেষণে এই দুটি গ্রন্থের কথা অবশ্য উল্লেখ্য।

চার

জর্জি লুকাচ্ য়ুরোপীয় রিয়ালিজম্ সংক্রান্ত আলোচনায় খুব সঠিকভাবে দেখিয়েছেন যে,প্রকৃত রিয়ালিজম কখনোই বহির্বাস্তবকে বিশ্বস্তরূপে প্রতিফলিত করেই কাজ শেষ হল ভাবে না। ব্যক্তিপাত্রগুলির অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে গ্রন্থিল বন্ধন গড়ে ওঠে তাকে দেখানোই তার কাজ। এ কাজটা করতে গেলে একদিকে যেমন নির্নিমেষ হতে হয়, বাস্তবের দিকে তাকিয়ে চোখ ধেঁধে গেলে যেমন চলে না, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বাস রাখতে হয় মানুষের আত্মস্থ বিশল্যকরণী ক্ষমতার সতত সক্রিয়তায়। বিপ্লবী দলের কার্যপদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ সহযোগী না হয়েও সেই লেখকই হতে পারেন সত্যিকারের বিপ্লবের দর্পণ। তলস্তয় বিপ্লবের কেউ নয় জেনেও তলস্তলকে লেনিন যে বিপ্লবের দর্পণ বলেছিলেন সে একারণে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর এক দশকে সামাজিক নৈতিক সর্বৈব বিশৃঙ্খলা এবং ভয়াবহ ভাঙনের জরিষ্ণু আঘাতে বাঙালি মানসের এক শতাব্দীর অর্জিত সমস্ত স্বপ্ন, বিশ্বাস ভীষণ ভাবে আঘাত পেল। খোলা বাংলা ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—আমরা যে-স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম আর যে-স্বাধীনতা আমরা পেলাম দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। যা পেলাম, আর, যে-ভাবে পেলাম, দুই আমাদের প্রচণ্ড আশাভঙ্গের কারণ হল। কোথায় একটা নৈতিক ব্ল্যাক আউট ঘটে গেল, মহাগুরু হনন সে অন্ধকারকে আরো বাড়িয়ে তুলল। আমরা যে-সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলাম তা এক তৎকালীন আধুনিক কবিতার ভাষায় বলতে গেলে—'সমুদ্রের আন্দোলন বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ।' বাঙালি ব্যাঙ্কগুলি অনেকে রাতারাতি দ্বার বন্ধ করল। যুদ্ধ দেশভাগ দুর্ভিক্ষ নারীর দৈহিক শুচিতার নৈতিক দুর্গকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করল—ঘটনার দ্রষ্টা যারা তারা সব থেকে বেশি নৈতিক পীড়া অনুভব করেছে—অনুপায় বর্তমানের এক দায়ভাগ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনীহা। বিষ্ণু দে-র ভাষায় বাস্তব পরিস্থিতি তখন এই রকম: 'বর্তমান যদি কিছুমাত্র সুস্থ হত, তাহলে হয়তো আমাদের স্বপ্নপ্রয়াণে সামঞ্জস্য থাকত! কিন্তু নানা লোভে ক্রূরতায় আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত। স্বেচ্ছাকৃত অভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধ্য রোগে, অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তাই ঐক্যতান ছিন্নভিন্ন

অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে।' সেদিনের সেই সর্বতোব্যাপী ছিন্নভিন্নতার মাঝখানে বাস্তবের সমগ্র ধ্যানের খেই হারিয়ে যাবারই কথা—নয়তো কাফ্‌কার তুল্য কোনো রূপকে বাস্তবের সার খুঁজতে চাইবার কথা। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়—এই সময়ের নিরাশ্বাস নির্নৈতিক বাস্তবের কাছ থেকে পলায়নের চেষ্টাই তখন লেখক-পাঠক মহলে মর্যাদা পেয়েছে। বাস্তবতা-বিমূঢ়, উদ্‌ভ্রান্ত অনাচারের মুখোমুখি না হয়ে বাঙালি ঔপন্যাসিক তখন দরিদ্র দ্রোণাচার্যের মতো দুধের বদলে পিটুলি গোলার আয়োজন করেছিলেন। ত্রিধা বিভক্ত সেই প্রতিক্রিয়ার একটি হল মহাযুদ্ধের কালে গজিয়ে ওঠা অস্বাস্থ্যকর সংবাদপিপাসা—'দৃষ্টিপাতে' যাযাবর রম্যরচনায় এটা শুরু করলেন, চাণক্য সেন 'মুখ্যমন্ত্রী', 'রাজপথ জনপথ' প্রভৃতি উপন্যাসে তাকে ঔপন্যাসিক পূর্ণতা দিলেন। দু-নম্বর হল পুরনো কালখণ্ড আশ্রয়ী উপন্যাস। তুলনামূলকভাবে বলতে পারি এ ঝোঁক ইংরাজি উপন্যাসেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে যে দেখা যায় নি তা নয়। Rex Warner তাঁর Aerodrome উপন্যাসের অতি-কাফ্‌কাসুলভ মেঘার্ততার পরে The young Caesar উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পিছিয়ে গেলেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ইছামতী'—কিন্তু বিভূতি ভূষণের যে নস্‌টাল্‌জিয়ার জগতে প্রত্যক্ষের ধুলো-কাদার জায়গা কোথায়? তিন নম্বর হল—অতি আঞ্চলিক উপন্যাস, যেখানে প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল আঞ্চলিকতার বিশিষ্ট আধারে চিরন্তন জীবন রস ততটা নয়—পাঠকের ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক অজ্ঞতাকে অপব্যবহার করা যতটা। এ শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে বিশেষভাবে এবং সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ্য অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। নদী প্রকৃতি ও জীবন স্বভাবের নিজস্ব সৌন্দর্য এখানে উপস্থিত বটে—একটা ঈস্‌থেটিক প্যাটার্নও সেখানে আস্বাদ্য নিশ্চয়। কিন্তু চরিত্র পাত্রসংক্রান্ত নিষ্প্রশ্ন মনোভাবের জন্য ঔপন্যাসিক অভিপ্রায় প্রথম থেকেই আত্মসমর্পিত। নদী সেখানে নিয়তি, মানুষ নিষ্ক্রিয়। ঠিক এমনি এক ডিটারমিনিজম্‌-এর দ্বারা অমিয়ভূষণের 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসের ব্যক্তি-স্বরূপ আচ্ছন্ন। বোঝা যায় এক ট্র্যাজিক সংকল্প নয়, মিথিক্যাল ডেস্টিনিই মুখ্যতা পাচ্ছে।

সেই কবি-কথিত ছিন্নভিন্ন ঐক্যতানের মধ্যে সুর বাঁধা খুবই শক্ত ছিল। আমাদের উদ্ধৃত গদ্যাংশের অব্যবহিত পরেই বিষ্ণু দে যখন বলেন—'কিন্তু জীবন তবু হার মানে না…বিসম্বাদের মধ্যেই উজ্জীবনের সমাধান হেঁকে যায়,

উদয়াচলে মেশে অস্তাচলের রক্তস্রোত, ভগ্নদূতের মুখে জাগে মিছিলের প্রবল আশা, প্রাণের কবি অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীকালের ভাষা!' —তখন সেটা মাত্র কবির সত্য হিসাবেই গ্রাহ্য। কবির স্বপ্নে চিরদিনই 'আগামীকাল ঝুঁকে তাকায়'—বর্তমান তার সর্বতোচারী অপরিপূর্ণতা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে কল্পবিহার করে। গদ্যময় উপন্যাস জগতে এমন কোনো জটিলতা-বিমোচক সমাধান সূত্র নেই। সেখানে রক্ত অত সহজে সিঁদুরে পরিণত হয় না—রক্ত আর পুঁজ সেখানে সহাবস্থায়ী। নায়ক সেখানে কবিতার নায়কের মতো চারিদিকের শুকনো হাহাকারের মধ্যে দুঃখ ক্লেশ গ্লানির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে না—'আমার স্বপ্নও অপরিসীম আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই।' তাই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার দুপুর'-এর নায়িকাকে বৃত্তবন্দী আশাবাদিনী করে তুললে বাস্তবতার প্রতি সুবিচার হত না। 'মীরার দুপুর' যখন লেখা হচ্ছে তখন শতাব্দীরও দুপুরবেলা—ছায়া নেই কোথাও। মীরার অসুস্থ স্বামী এবং তার সুস্থ জীবনের বিপরীত গতি —যেন বাস্তবতারই দুশ্ছেদ্য জটিলতায় আর্ত—একদিকে রুগ্নতা যা অনুকম্পার্হ, কিন্তু ক্ষমার্হ নয়, আর একদিকে সুস্থতা যা সহৃদয় হতে চায়, কিন্তু জীবনের নিজস্ব নিয়মেই নিষ্ঠুর! খাবার টেবিলে মীরা এবং মীরার স্বামীর আহার্যের এবং ক্ষুধার বৈপরীত্যের মতো প্রতীকী ঘটনা যেমন অন্তর্ভেদী তেমন নির্মম। সমাজ সম্বন্ধে বা সামাজিক বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনো মোটা তথ্য —ফ্রেস্ত-এর ভাষায় বলতে গেলে Gross dimentions of Social reality এখানে হাজির করা হয় নি। কারণ, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের তো বটেই তারাশঙ্কর বনফুলেরও জগৎ-শৃঙ্খলার ধারণা, বিশ্বতত্ত্ব, মূল্যের তরতম বোধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝাপটে ভগ্নপক্ষ হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছিল। নাগরিক বাঙালি মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের যা কিছু মাধুরী তার শেষ আলো ছড়িয়ে গেল বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর'-এ তারপরেই এল দ্বিপ্রহরে অন্ধকার—'মীরার দুপুর' তার সাক্ষ্য। মীরার স্বামীর আত্মহত্যা, এবং মীরার নৈতিক বিশূন্যতার পথে পা বাড়ানোর তাই কোনো ট্র্যাজিক মহিমা নেই। এমন কি কারো জন্য সহানুভূতির কোনো অশ্রুবিন্দু জমে উঠুক এ অভিপ্রায়ও এই উপন্যাসে নেই। শুধু অনিবার্য হয়ে ওঠে এই পর্যবেক্ষণ যে, নিঃসঙ্গ দুপুরে মীরাও কত একাকী। আত্মীয়স্বজন প্রতিবাসী সবই এদের কাছে কত নিরর্থক। 'বারো ঘর এক উঠান'-এও ব্যক্তিগুলির এই নিঃসহায় একাকীত্ব প্রধান কথা। তাদের নিম্নাবতরণ কত অপ্রতিরোধ্য সে কথাই সেখানে মুখ্য। পারিজাত

অথবা কে গুপ্ত শিবনাথ অথবা রুচি—ব্যক্তিগুলির ভাবপ্রতিমা আসলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সংগৃহীত জীবনার্থেরই প্রতিমা। সমাজ ও ব্যক্তির বিরোধিতার তত্ত্বে এই গোষ্ঠির লেখকেরা কেউ বিশ্বাসী নন। সমাজ ভেঙে গড়ার কথাও এঁরা কেউ বলেন না। কিন্তু বর্তমান পক্ষাঘাতগ্রস্থ সমাজের পঙ্গুতাকে এঁদের মতো করে কেউ ধরিয়ে দেন নি। 'বারোঘর এক উঠানে'র প্রধান ত্রুটি অন্ধকার এখানে এক লহমার জন্যও হালকা হয়ে ওঠে নি—বই যেখানে শেষ হয় সেখানে শিবনাথের স্ত্রী রুচির পরাভবে অন্ধকার কত অনপনেয় সে কথাই প্রমাণিত হয়। এই সময়ের অন্যান্য উপন্যাসেও, যেমন বুদ্ধদেব বসুর 'নির্জন স্বাক্ষর', নরেন্দ্র মিত্রের 'চেনা মহল'-এও এক প্রচণ্ড আত্মহননের ইতিবৃত্ত ঠাঁই পেয়েছে। চারিদিকে যে-ভগ্নমূর্তির সমারোহ তারই মাঝে দাঁড়িয়ে সন্তোষকুমার ঘোষের রাস্তার ছেলেরা বলে—'আমরাও ভদ্রলোকের ছেলে স্যার, বলেন তো সার্টিফিকেট এনে দেখাতে পারি।' লক্ষ্যণীয়, যে লেখকদের কথা বললাম, এঁরা যে সমাজ-চিত্র বা জগৎ-প্রতিমা তখন গড়ে তুলেছেন তার মূলে রয়েছে একটা ব্যাপার—তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তিসম্পর্কগুলি এবং লেখকদের মূল্যবোধসংক্রান্ত নিজ নিজ ধ্যান ধারণার মধ্যে প্রবল বিচ্ছেদ, খোলা বাংলায় অবনিবনা। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, নরেন্দ্রনাথ, কি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা এঁদের কেউই কি সেই সমাধান-বিহীন সংঘর্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেদের আকৈশোর অর্জিত মূল্যবোধকে জেরার সম্মুখস্থ করেছেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। এঁদের এই সব উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে আরো একটি কথা আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কি সন্তোষকুমার, কি নরেন্দ্রনাথ এমন কি পরবর্তী উপন্যাস ধরেও যদি বলি, তাহলে রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই' বা বিমল করের 'যদুবংশ' প্রভৃতি উপন্যাসে রিয়্যালিটি বা বাস্তব ব্যাখ্যার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? তার অবশ্য একটা উত্তর মেলে—স্বাতন্ত্র্য ফর্মের মধ্যে। বস্তুত এক-একজনের রিয়্যালিটি-ভাবনা এক-একরকম। সে হিসাবে বিচার করলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস-লভ্য রিয়্যালিটি মানে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবনার্থ। লেখকের দিক থেকে reality is meaning। তাঁর উপন্যাসের ফর্মটাও সেই রিয়্যালিটির অঙ্গ। সন্তোষকুমার যখন 'শ্রীচরণেষু মা'-কে রচনায় ফর্মের বিশিষ্টতা সম্পাদন করেন, সমরেশ বসু যখন 'বিবর'-এর ভাষারীতি উদ্ভাবন করেন, তখন তিনি ফর্ম আরোপ করেন না—ফর্মকে প্রকাশ করেন। আমি যে উপন্যাসগুলির কথা বলছি—এবং এই সময়ে যাদের কথা বলা বাহুল্য বলে বলছি না, তাঁরা

প্রত্যেকেই আসলে মধ্যবিত্তের একটা নিদারুণ নিঃসঙ্গতার চেতনাকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। সুতরাং ফর্ম এক অর্থে বাস্তবে যা আছে দুর্বোধ্য অথচ সম্ভাবিত তাকে transcribe করে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারোঘর এক উঠানে'র অন্তহীন অবক্ষয়ের চিত্রে সেই দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে প্রতিফলিত করা হয় নি। জীবন দণ্ডে দণ্ডিত, এবং আত্মসচেতন উদ্বেগে মথিত সন্তোষ কুমারের শ্রীচরণেষু যাকে উপন্যাসের ন্যারেশন এবং অন্তর্গত সংলাপের মাধ্যমেই কি তাকে ধরতে পারা গেল ?

পাঁচ

এদিকে বাস্তবের চাপ ক্রমশই বাড়ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর যুবক সমাজের চোখের সামনে দেখতে-দেখতে নগর জীবন আর গ্রাম জীবনের শ্রেণী বিন্যাসের পার্থক্য সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বিভেদ সমান হয়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে যেমন মুষ্টিমেয় বড চাষী চাষযোগ্য সমস্ত জমির একছত্র মালিক হয়ে বসল, নগরেও তেমনি পঁচাত্তরটি বিগবিজনেস হাউস ভারতীয় শিল্প জগতের প্রভু হয়ে বসল। In the wake of Naxalbari গ্রন্থে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার দেখিয়েছেন : The spoilt children of yesterday's colonialism and of today's national government never had it so good while about two-thirds of the urban population lived below the average of the urban consumption of Rs. 359 per annum, this section the U-sector foundever newer and newer avenues of expenditure to feed its voracious appetite for luxury goods. আর এর সঙ্গে যুক্ত ছিল এক দুর্নীতিগ্রস্ত দ্বিরাচরণ—অহিংসপন্থী শ্রমিক নেতা বিপক্ষের ইউনিয়ন ভাঙ্গার জন্য গুণ্ডাদল ভাড়া করেন, যিনি সকালবেলা রামধুন গেয়েছেন তালি বাজিয়ে। তিনি বিকেলবেলা ককটেল বারের উদ্বোধন করেছেন। ওদিকে নিস্তালিনী-করণের পর থেকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংহতিতে চিড় ধরেছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে মার্কসবাদ একটা স্ট্যাটাস সিম্বল-এ পরিণত হয়েছে। ক্রোধে হয়তো শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই সময়ের প্রতিক্রিয়ায় দু-একটা কবিতা লিখেছেন, কিন্তু শুধু ক্রোধে এত জটিল সময়ের ব্যাখ্যা হয় না।

এই সময়ের কয়েকটি প্রধান উপন্যাসে সময়ের ছবি ফুটেছে যুব-মানসের দর্পণে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ', 'যুবক যুবতী' শীর্ষেন্দু

মুখোপাধ্যায়ের ‘পারাপার’, ‘ঘুণপোকা’ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এক হিসাবে এ উপন্যাসগুলিও প্রতিবাদের সাহিত্য—তবে তা রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিবাদ নয়। প্রতিবাদটা মৌন হয়ে রয়েছে যুবকগুলির আত্মলীনতায়। তারা—সেই সব দিশাহারা এবং বহির্বাস্তবতা সম্বন্ধে বাধ্য হয় উদাসীন যুবকেরা, যেন তাদের আত্মলীনতার ভিতর দিয়ে মূর্ত করেছে এই উপলব্ধি যে বাস্তবের কাছে আশা করার কিছু নেই। আমি ‘আত্মপ্রকাশ’ ও ‘পারাপার’ এই দুই ভিন্নধর্মী উপন্যাসের দুই চরিত্রের আত্মকথনের অংশ উদ্ধৃত করে বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করছি :

> ‘বহরমপুরে থাকতে তেমন মনে পড়ে নি, কিন্তু কলকাতায় এসেই আমার প্রবলভাবে মনে পড়েছিল জন্মভূমি গ্রামের কথা, খেজুর রসের গন্ধ আর জলের স্রোতের শব্দ। সেসব হারাবার দুঃখেই আমি যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক কিছু হারাতে-হারাতে মানুষ এমন একটা জায়গায় আসে, যখন তাকে হারাবার নেশায় পেয়ে বসে। আমিও ঠিক করেছিলাম, আমি সবকিছু হারিয়ে ফেলব—ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, বিশ্বাস অবিশ্বাস। নতুন জায়গায় যখন একা নিজেকে বাঁচতে হবে—তখন আমি বাঁচব আমার নিজের তৈরি করা নিয়মে...’
> ‘আত্মপ্রকাশ’/৭৮ পৃষ্ঠা।

এর পাশাপাশি রাখা যাক ‘পারাপার’-এর আদিত্যের চিন্তা :

> ‘প্রকৃতি-টকৃতির মাঝখানে তিনমাস কাটিয়ে এলাম বুঝলি! একা থাকতুম একটা ডাকবাংলোয়। বাংলোর সামনেই একটা পিপুল গাছ—দুপুরে যখন হু-হু করে গরম বাতাস—তখন সেই গাছের ছায়ায় একটা চেয়ার নিয়ে বসতুম। বহুদূর পর্যন্ত ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যেত। জীবনে আমি এতদূর পর্যন্ত কমই দেখেছি। তাই নেশা লেগে যেত খুব। মাঝে-মাঝে দেখতুম সামনের তিরতিরে নদীটি হেঁটে পার হয়ে বিকেলের দিকে দেহাতী লোকরা দূরের হাটে যাচ্ছে। সঙ্গ ধরতাম তাদের। কিছুতেই কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছে করত না। ফেরার কথা ভাবলেই মনে হত সভ্য জগতে সম্পর্কগুলো বড় জটিল। ফিরলেই আবার সেই বনেদী বাড়ির কম্‌প্লেক্স চেপে ধরবে। চেপে ধরবে ব্যর্থতার সব বোধ, হতাশা।’

গ্রাম বা প্রকৃতি, যেখানে সময় স্থানু হয়ে আছে সেখানে অন্ততঃ অবসয়ের শান্তি মেলে। অ্যাকজিসটেনশিয়ালিস্টরাও তাই বড় বড় মেট্রোপলিসের উদ্দেশ্যহীনতায় বিমূঢ় ছিলেন, ছিলেন এ্যান্টি-আর্বান, কিছুটা বুঝি বা আর্কা-ডিয়ান। বর্তমান সভ্যতার জটিলতায় শ্রান্ত অস্তিত্ববাদীদের মতোই সুনীল-শীর্ষেন্দুর এইসব চরিত্রপাত্র বা ব্যক্তিস্বরূপ নাগরিক ব্যর্থতাবোধের শিকার। সুনীলের নায়ক কল্পনায় তাই আসে এক নিঃস্বতার চেতনা, শীর্ষেন্দুর চরিত্র-বলে ব্যর্থতার ভয়ের কথা। এক দিশাহারা সময়ের আঘাতে প্রহৃত, জর্জর যুবক গোষ্ঠির ছবি ফুটে ওঠে দুই ভিন্ন ক্যানভাসে, ভিন্ন তুলিতে—রঙে। কিন্তু এই সঙ্গে আরেকটা কথাও সত্য—দুজনেই এক নতুন জন্মের আকাঙ্ক্ষায় বিধুর—জীবনের সহজ স্বাদের জন্য আকুল। সুনীলের নবজাতক উপন্যাস স্মরণীয়। এক প্রতীকী ব্যাধিভারে শীর্ষেন্দুর 'পারাপার'-এর নায়ক এবং 'ঘুণপোকা'-র নায়ক পীড়িত। সুনীলের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' উপন্যাসের বহিঃস্তরে যাই থাক, তার অন্তঃস্তরে একটা ব্যাধিচেতনা ছিল—সত্যজিৎ রায় বইটির ফিল্ম্‌রূপে সেটিকে বার করে আনেন—ছোট ভাইটি সবসময় একটা ক্ষতকে লালন করছে। তথাপি এই ব্যাধিটাই সব নয়—ব্যাধিমুক্তির স্বপ্নও 'পারাপার'-এর নায়ক ললিত দেখে—'মৃত্যুর কথা ভাবলেই পৃথিবীর প্রতি মায়াদয়া বেড়ে যায়। অন্তরে-অন্তরে ললিত মানুষের প্রতি জীবজগৎ ও গাছপালার প্রতি এক দুর্বোধ্য ভালোবাসাকে অনুভব করে।' মায়ের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়—'যদি আরেকবার জন্মানো যেত!' সহজ জীবনের দিকে ফিরে যাবার কথা শীর্ষেন্দু 'কাগজের বউ', 'যাও পাখী' প্রভৃতি উপন্যাসেও বলেছেন। 'আধুনিক জীবন' নামক পীড়ায় পীড়িত-অস্তিত্বের জন্য এক মমতামেদুর মন নিয়ে শীর্ষেন্দু পৌঁছে গিয়েছেন এক আস্তিক্যে। সে আস্তিক্যে বস্তুধর্ম কিছুটা লঙ্ঘিত হলেও তাঁর আন্তরিকতায় আমাদের শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় নেই।

সুনীল-শীর্ষেন্দু-মতি অথবা শ্যামল, কী বরেন এই সব শক্তিমান তরুণেরা যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়াকে যতটা দেখালেন, যন্ত্রণার উৎসে ততটা যেতে পারলেন না। সে কাজটা করলেন একদিকে সমরেশ বসু, অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবী। সমরেশ বসুর 'বিবর' সেই যন্ত্রণার ঠিকানা জানিয়েছে মুক্ত হস্তে। বাঙালি মধ্যবিত্তের একশত বা দেড়শত বৎসরের সঞ্চয় কোন তলানিতে এসে পৌঁচেছে —তার সাক্ষী 'বিবর'-এর নামকরণের মধ্যে রয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রুদ্ধশ্বাস বন্দীত্বের যন্ত্রণা, এর মূল বক্তব্যবিন্দুই হল ছকবন্দী অস্তিত্বের

মাথা ঠোকা—স্বাধীনতার জন্য আকুতি। 'সবরকম স্বাধীনতাকে আমি ভয় পাই'—এ কার কণ্ঠস্বর? দুই শতাব্দীর ঔপনিবেশিক গঞ্জনা রক্তধারায় ঘুরে ঘুরে যাকে মূল্যহীন করে তুলেছে তার। ইচ্ছেগুলো ভীরু কুকুরের বাচ্চার মতো ভেতরে কেঁউ-কেঁউ করে মরছে, কারণ ইচ্ছে মানেই তো স্বাধীন, অথচ সেই স্বাধীনতাকে মেনে নিয়ে আচরণ করব সে সাহস নেই, স্বাধীনতাকে সকলের মতো আমিও ভয় পাই। আমি আমার গর্তের মধ্যে বেশ রসে-বশেই আছি।' গর্তের মধ্যের জীবনের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। যে-জীবন চাকুরীগত দুর্নীতিকে মেনে নেয় মসৃণ সুখদজীবনের লোভে, অথবা নীতার সঙ্গে যৌনজীবনকে যে মেনে নেয় দেহজসুখের প্রাত্যহিক টানে, সেই জীবনই গর্তের জীবন। সুখের গর্তে ধূর্ত মধ্যবিত্ত শিয়াল দুঃখের এক-আধটা ইঁদুরকেও ঢুকতে দেয় না। এই গর্তটাকে ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েই এই গল্প। যা কিছু সে করেছে তা এই গর্ত ভাঙ্গার জন্য করেছে। যে জায়গাটা সুনীল-শীর্ষেন্দু-মতি প্রভৃতি তরুণতর লেখকেদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল সমরেশ সেই জায়গাটা ধরে দেন—ভাঙ্গাটা জরুরি কেন। নীতাকে হত্যা প্রতীকী ঘটনা, অফিসে রিপোর্ট প্রত্যাহার না করা বাস্তব ঘটনা। কিন্তু একটার সঙ্গে একটা জড়িয়ে গিয়ে দুটোকে একই তাৎপর্যে বেঁধেছে। শুধু প্রতীকী ঘটনায় এ উপন্যাস দাঁড়াতে পারত না। ভাঙ্গাটা জরুরি—তা নইলে জীবনটা হয়ে যাচ্ছে জান্তব জীবন। তারই ছায়া পড়েছে আরণ্যক নানা ঘটনার চিত্রকল্পে। বার বার 'ভদ্রলোক'-জীবনের নানা অনুপুঙ্খকে তুলে তাকে আঘাত হানা হয়েছে। সে নায়ক বলতে চেয়েছে—এই খোল নলচে পুরো বাতিল করতে না পারলে অস্তিত্বের স্বাধীনতার ক্ষুধা পথ খুঁজে পাবে না। একথা 'বিবর' উপন্যাসে যখন বলা হয়েছে, তারই দু-বছর পরে নক্‌সাল আন্দোলন শুরু হয় (মে, ১৯৬৭)। মূর্তি ভাঙ্গা শুরু হয় আর কয়েকবছর বাদে। যে-ক্রোধে উদ্‌ভ্রান্ত এবং আত্মহারা বাঙালি যুবক মূর্তি ভাঙতে চেয়েছে তার একটি অন্যতর পটভূমি প্রথম প্রত্যক্ষ হয়েছে 'বিবর'-এ। এখানেও একটা ভাবমূর্তি ভাঙ্গবার অদম্য নেশা তার নায়ককে পেয়ে বসেছিল। পুরনো পরিবার-প্যাটার্ণ, সমাজ-প্যাটার্ণ, যৌন-প্যাটার্ণ, জীবিকা-প্যাটার্ণ ইত্যাদির যে-ভাবমূর্তি দীর্ঘ শতাব্দী ধরে ফুটে উঠেছে বাঙালি মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের নানা স্তরে—'বিবরে'র নায়ক তাদের ভাঙতে চেয়েছে। এখানে আমি একজন তরুণ সমালোচক—যিনি মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচকও বটে (শ্রীপার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করছি, 'সে (মানে ঐ নায়ক) আমাদের

মধ্যবিত্ত কাঠামোকে অস্ত্রোপচার—আপাতদৃষ্টিতে যাকে আমরা 'লম্পট' বলি, সেই লম্পটই খুলে দেয় আমাদের ভাণকে, আমাদের বহিরাবরণের ভদ্রতার মুখোসকে। আর এটা সে করে কখনো ঠাট্টার খোঁচায় কখনো বিদ্রূপের ছুরিতে। এই বিদ্রূপ থেকে সে নিজেকে ছাড়ে না। মদ্যপ, মেয়ে সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারী ঘুষখোর যুবকটির ইমেজে সমরেশ আক্রমণ করেন এই মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক মূল্যবোধ সমন্বিত সমাজকে—যেখানে কৃষক শ্রমিকও এ চরিত্রহীন মধ্যবিত্ত হতে চায় সন্তানকে স্কুলে কলেজে পাঠিয়ে। না খেয়ে না পরে টাই বেঁধে স্কুল বাসের সামনে ছেলেকে দাঁড করিয়ে।' এই উদ্ধৃতির সঙ্গে সর্বাংশে একমত না হয়েও একথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই যে, 'বিবর' আসলে বিবর ভাঙ্গার বাস্তব যে-আগ্রহ আর কিয়ৎকালের মধ্যেই বিস্ফোরিত হয়ে উঠবে তারই ধূমায়মান অনির্দিষ্ট উত্তাপের সাক্ষ্য বহন করেছে। একথা আগেই বলেছি উপন্যাসে টেক্‌নিক রিয়্যালিটিকে প্রকাশ করে। একটি দূরদর্শন সাক্ষাৎকারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'বিবর'-এর ভাষার লক্ষ্যভেদ ক্ষমতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এ ভাষা 'বিবরে'র নায়কের অভিজ্ঞতার ভাষা। সেই ভাষাও রিয়্যালিটিরই প্রতিনিধি। মধ্যবিত্ত শীলতা বা রুচির বাধ থেকে মুক্ত সে ভাষা। লক্ষণীয়, বাস্তবে যখন পোষাকে-পরিচ্ছদে, আচারে-আচরণে, নৈতিকতায় এবং জীবনার্থ নির্ণয়ে 'কনটিনিউটি' একেবারে ভেঙ্গে যেতে বসেছে, তখন এই ধরনের ভাষা এবং অভিজ্ঞতা এক হয়ে যেতে বাধ্য। অন্তর্গত একোক্তির চালে ফুটে ওঠে ব্যক্তিস্বরূপের চেতন-অচেতনের টানাপোড়েন।

বাস্তবতায় যে চাপের কথা বলা হচ্ছে, যা থেকে স্বাধীনতার জন্য ব্যকুলতা 'বিবরে'র নায়কের স্বগত চিন্তায় বারে বারে একাধিক চিত্রকল্পেও মূর্তি ধরেছে, সেই চাপ থেকেই কোনো-কোনো বাঙালি লেখক পৌঁছে গেছেন স্যুর-রিয়্যালিজম-এর অদ্ভুত জগতে। প্রসঙ্গত আমি লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'বাবু-ঘাটের কুমারী মাছ' উপন্যাসটির উল্লেখ করতে চাই। এ উপন্যাস 'বিবর'-এর অনেক পরে লেখা। কিন্তু একটা কল্পিত বন্দীশালার রুদ্ধকে যৌন সুখ-চাপিয়ে দেওয়া, অস্তিত্বের নিরর্থকতায় অভ্যস্ত এক জীবনের যন্ত্রণাকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনোদিক থেকেই 'বিবর' এবং 'বাবুঘাটের কুমারী মাছে'র তুলনা হয় না। সে তুলনা করা বর্তমান প্রবন্ধ পাঠকের উদ্দেশ্যও নয়। কিন্তু 'বাবুঘাটের কুমারী মাছে'-র গ্রোটেস্ক পরিবেশে যখন গর্ভের সন্তানকে হত্যার ঘটনা-প্রতীক ব্যবহৃত হতে দেখি, তখন আর একবার

সেই বাস্তব পরিস্থিতির কথাই বলতে ইচ্ছে করে যা ডাক দিচ্ছিল ভাঙতে।

ছয়

এই আলোচনা সভায় সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আমি আর সেসব কথার পুনরাবৃত্তি করব না। কিন্তু একটা কথা বলবো—বিমল কর যে-অন্তর্লীনতার অনিবার্য আকর্ষণের কথা বলেন, বাস্তব যে সেই অন্তর্লীনতার চর্চাকেও সুস্থির থাকতে দেবে না, তা তাঁর 'যদুবংশ' উপন্যাসেই বোঝা গেল, বোঝা গেল রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই' উপন্যাসে। আসলে বাস্তবতার প্রত্যক্ষের চাপের ফলেই অন্তর্লীনতা—এক inner reality বা অন্তর্গূঢ় বাস্তবতার সন্ধানকে—নিরুপদ্রব থাকতে দিল না। এদিকে ঘটনা তখন প্রবলতর। সত্তরের দশক এক বিস্ফোরণের দশক। এই দশকে রক্ত এবং প্রবল অপচয়ের ভিতর দিয়ে আমাদের জীবনের সামনে এমন অনেক ভাঙচুর ঘটে গেল যা এতদিন ছিল অবিশ্বাস্য। 'ধর্মতলায় হিসি-করতে চাওয়া অক্ষম ক্রোধ নয়'—(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)—যুবসমাজের অত্যন্ত কঠিন ক্রোধ বাংলাদেশের শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। এটা যেমন একদিকের চেহারা তেমনি জরুরি অবস্থার দারুণ দণ্ডবিধি নেমে এল সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে—লেখক সাংবাদিককেও কারাবন্দী হতে হল। একথা ঠিক যে কেউ-কেউ তখনো হৃদয় নিয়ে লীন থাকতে চেয়েছেন, মনোজ বসু বলতে চেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির কথা। কিন্তু অগ্নিগর্ভ বাস্তবতা দাবি করছিল নতুন পক্ষপাত বা কমিটমেন্ট। মধ্যবিত্তের শূন্যতা এবং নিঃস্বতা নিয়ে সমরেশ বসুর 'বিবর'-এর পরে উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ দেবেশ রায়-এর 'মানুষ খুন করে কেন' এও এক আত্মসুখসর্বস্ব প্রবঞ্চক স্বভাব মধ্যবিত্তের দর্পণ। কিন্তু পাশাপাশি অন্তত কয়েকজন লেখক এগিয়ে এলেন সেই আগুনের দিকে ধাবমান যুবক শ্রেণীর চিত্র-চরিত্র অঙ্কনে। এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন মহাশ্বেতা দেবী। মহাশ্বেতা নিজে তাঁর লেখাকে কী বলেন সে কথা এই প্রসঙ্গে একটু জেনে নেওয়া দরকার। তাঁর মতে, 'বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল বিবেকহীন বাস্তব বিমুখতার সাধনা চলছে।' তিনি বাংলা সাহিত্যের কোন্ অংশকে লক্ষ করে এসব বলেছেন তা স্পষ্ট করে বলেন নি। কিন্তু মনে হয় আত্মলীনতার যে ধারা তখনকার বাংলা সাহিত্যে একাংশে প্রধান হয়ে উঠেছিল, মহাশ্বেতার বিদ্রূপ ছিল তারই দিকে নিক্ষিপ্ত। মহাশ্বেতা বামপন্থীদের দ্বারা অভিনন্দিত না হয়েও তাঁদের থেকে অনেক বেশি সাহস করে এ কথাটা বললেন—'ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে

একজন দায়িত্ববান লেখককে কলম ধরতেই হয় শোষিতের সপক্ষে। অন্যথায় ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না।' কিন্তু মহাশ্বেতা নিজেকে চিহ্নিত-রাজনীতির লেখকও বলতে চান না। বস্তুত তিনি কোনো পলিটব্যুরো বা কেন্দ্রীয় কমিটির ইস্তাহার অনুযায়ী চরিত্র-পাত্র রচনা করেন না। তাঁর 'জল' গল্পের মাস্টার একজন কংগ্রেসী। 'এম ডব্লিউ বনাম লখিন্দ' গল্পের খেতমজুর আন্দোলন সি. পি. আই-এর আন্দোলন। বসাই টুডু গল্পের কালী সাঁতরা সি. পি. এম-এর লোক। কিন্তু বসাই টুডু নকশাল আন্দোলনকেও ছাড়িয়ে যায়। তাঁর বক্তব্য হল এই যে, শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই তাঁর লেখায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। মহাশ্বেতার 'অগ্নিগর্ভ' উপন্যাসের বসাই টুডু, যাকে বলা হয় সত্তরের দশকের বাস্তবতার প্রতিনিধি, আর সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসের রুইতন কুর্মি, যে সত্তরের দশকের ট্র্যাজেডির প্রতিনিধি—এই দুয়ের মধ্যে কে ভাবি ইতিহাসে গ্রাহ্য হবে? তখনই বোধহয় এই প্রশ্নের অনিবার্য উত্তরটি জিজ্ঞাসা-চিহ্নে সমাপ্ত হয়—কোন্ ইতিহাস? 'অন্যথায় ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না'—একথা বলতে গিয়ে মহাশ্বেতা যে ইতিহাসের কথা বলছেন সে তো রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস। কিন্তু শিল্পের ইতিহাসের প্রতি দায়িত্বও যে একটা রয়েছে, তার কী হবে? বস্তুত, এইখানেই সমস্যাটা এখনো জট পাকিয়ে আছে। ট্র্যাজিক ডেসটিনি, না মীথিক ডেস্টিনি—কাকে খুঁজবেন বাঙালি ঔপন্যাসিক? তিনি কি বাস্তবতা বা রিয়্যালিটিকে ব্যক্তির অন্তর্গূঢ় জগতেই ধরতে চাইবেন, না, বাস্তবতাকে তার দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা সমেত অভিব্যক্তি দেবেন? দুদিকেরই আতিশয্য ঘটতে পারে। অন্তর্লিন জগতের প্রতি অতিপক্ষপাতে সুব্রত সেন, রমানাথ রায়, বলরাম বসাকের মতো শাস্ত্রবিরোধী কথাকারদের পরাবাস্তবের জগৎ প্রাধান্য পায়। আবার বাস্তবতার অত্যাচারে কী হয় তার প্রমাণ রয়েছে মহাশ্বেতার গত বৎসর পুজাসংখ্যায় বসাই টুডু কাহিনীর অনুবৃত্তি রচনায়। বাঙালি ঔপন্যাসিকদের পরিশ্রমী এবং অন্তর্দৃষ্টিশীল অংশে চেষ্টা চলেছে এই দুইকে মিলিয়ে নেবার। আমরা তাদের দিকেই তাকিয়ে আছি।

বিশ্বভারতী বঙ্গবিভাগের পক্ষ থেকে ২২ ও ২৩শে আগস্ট 'বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার ধারা' বিষয়ে দুই দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন হয়েছিল। শেষতম প্রসঙ্গটি ছিল 'সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার ধারা'। এই বক্তৃতাটির শেষে নানা প্রশ্ন ওঠে। স্বভাবতই সে প্রশ্নের উত্তর এ প্রবন্ধে দেওয়া যায় নি। সুতরাং লেখক প্রবন্ধটির অপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন।

সুতপা ভট্টাচার্য

কবির চোখে কবি: বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিকে পিতা আর অন্যদিকে পুত্র, মাঝখানে অশ্বমেধের ঘোড়া। পুত্রের জয় হয় যুদ্ধে, কিন্তু যুদ্ধশেষে পুত্র পিতাকে ফিরিয়ে দেয় ঘোড়া, শ্রদ্ধায় আর ভালোবাসায়। যুদ্ধে পুত্রের জয় বলে এমন নয় যে পিতাকে পুত্র ছাড়িয়ে গেল বীরত্বে; রাম-লক্ষ্মণ কিংবা অর্জুনই বীরত্বের প্রতীক আজও, লবকুশ কিংবা বভ্রুবাহন নন। তাঁদের খ্যাতি বীর পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী রূপেই।

আজকের বাংলা কবিতার পুরাণ-পিতা যদি হন রবীন্দ্রনাথ, তবে বিষ্ণু দে তাঁর এমন একজন উত্তরাধিকারী, যিনি সবচেয়ে সচেতন ভাবে তাঁকে পিতার প্রাপ্য শ্রদ্ধা-ভালোবাসা দিয়েও অবরোধ করেছিলেন ঘোড়া। জীবনানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যেতে তিনি চানই নি, বিদ্রোহের প্রয়াস করেন নি বুদ্ধদেব বসুর মতো, বরং সরবে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর রবি-ভক্তের ভূমিকা। 'প্রগতি'-র নিয়মিত লেখকদের একজন হয়েও তিনি প্রতিবাদ করেছেন এর কোনো-কোনো লেখার রবীন্দ্রবিরূপ মনোভাবের, মনে করিয়ে দিয়েছেন: 'সাহিত্যেও অতীতের মর্যাদা আছে, জীবনে বাপ মা স্বীকার্য।' রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধটিকে আক্রমণ করে মন্মথনাথ ঘোষ 'প্রগতি'তে লিখলে, বিষ্ণু দে সুদীর্ঘ প্রবন্ধে পাল্টা জবাব দেন তার, লেখেন: 'আজও তাহাই ভাবিতেছি। সামনের বাড়িতে গ্রামোফোনে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' চলিতেছে। মৃদুস্বর—তাহাই শুনিতেছি আর ভাবিতেছি কিসের অভাবে মানুষ রবীন্দ্রনাথের ছাড়িয়া যতীন্দ্রনাথের কবিতায় pure poetic pleasure খুঁজিতে যায়। বর্ষার এই মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকাইয়া 'সোনার তরী' গুঞ্জন করিতেছি। হাতের পাশে বিপুল 'কাব্যগ্রন্থাবলী' রহিয়াছে···।' স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যায়

'চিত্রাঙ্গদা'-র কোনো বিরূপ সমালোচনারই প্রত্যুত্তরে বিষ্ণু দে-কে লিখতে হয়: 'সুনিপুণ রসবোধে একটি অতি সুকুমার জিনিস লইয়া কি অপূর্ব সাফল্যে উৎকৃষ্ট কাব্য লেখা যায়, 'চিত্রাঙ্গদা' তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিষয় নির্বাচন ও তাহার বিচার করিয়া তাহার পরিমার্জন, যাহা ত্যাজ্য তাহা বাদ দিয়া বস্তুটিকে রসরূপে মূর্তি দেওয়া কবির স্বাভাবিক সংস্কারেই এসব আপনা হইতে হইয়া যায়। এই সংস্কার যে পাঠকে নাই, যাহার স্থূলতার আবরণ 'চিত্রাঙ্গদা'র সূক্ষ্ম কলা ও সুকুমার রসের আবেদন ভেদ করিতে পারে না, এমন লোকও আছে।'

আশ্চর্য নয় যে, 'কি করে লেখক হলুম'-এর উত্তরে বিষ্ণু দে বলবেন প্রায় বালকবয়সে কবিজীবনের সূচনা-পর্বের রবীন্দ্র-প্রভাবের কথা: 'আর সব সময়েই তো রয়েছে সেই সুউচ্চ পাহাড় কিংবা বলা যায় মহাসমুদ্র, রবীন্দ্রনাথের অবিরল সক্রিয়তা এবং আমার মতো বাঙালির পক্ষেই বোঝা সম্ভব অদম্য গতিবান এই অভিজ্ঞতা এবং তার প্রভাবের কি মানে।'

আশ্চর্য এই যে এই 'রবিভক্তে'র প্রাথমিক কাব্য-প্রয়াসেও তেমন রবীন্দ্র-তন্ময়তার পরিচয় নেই, যেমন আছে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ, কিংবা অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়। পরবর্তীকালে বিষ্ণু দে নিজেই স্পষ্ট করেছিলেন রবীন্দ্রচিন্তায় তাঁর সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের কমবয়সের পার্থক্য: অন্যরা যখন 'রাবীন্দ্রিকপনার প্রতিক্রিয়ায়' 'প্রতিবাদ বা অস্বীকারে মেতে-ছিলেন এবং নিজেদেরই মনোলোকের রবীন্দ্রমূর্তি ভাঙতে গিয়েছিলেন গোবিন্দদাস বা যতীন্দ্রনাথকে টেনে এনে', তখন তাঁর নিজের ভূমিকা ছিল—বিষ্ণু দে পরোক্ষে হপকিন্স্-এর দৃষ্টান্ত টেনে বলেন—'তিনি মিলটন-ভক্ত কিছু কম নয় ব্রিজেসদের চেয়ে, কিন্তু তাঁর ভক্তি যাথার্থ্য পায় মিলটনের আলঙ্কারিক কৃত্রিমতায় ভারি ভাষা ও ছন্দরীতিতে লেখবার চেষ্টায় নয়, ভিন্নতায়, কবি হিসাবে স্বধর্মসাধনে।'

এই ভিন্নতায়, প্রধানত তিনি পথের দিশা পেয়েছিলেন যাঁর কাছ থেকে তাঁর নাম টি. এস. এলিয়ট। তাঁর ১৯২৫-এর কবিতাবলি আর 'সেকরেড উড' নিয়ে এলিয়ট বিষ্ণু দে-র 'নব আবিষ্কার', 'বিকাশের দ্বিতীয় পর্বে'। বিশেষ করে 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিক প্রতিভা' প্রবন্ধটি যে তাঁর 'বিকাশে সাহায্য করেছিল প্রচুর'—বিষ্ণু দে-ই জানিয়েছেন সে কথা। মনে হয়, এই প্রবন্ধ থেকেই বুঝেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাব্যিক সম্বন্ধের তাঁর নিজস্ব পথটি: 'ঐতিহ্যের ভূমি ছাড়া ঐতিহ্যকে রূপান্তরিত করা যায় না এবং

রূপান্তরিত না করতে পারলে রূপায়ণে স্বকীয় শক্তিবিকাশের উপায় নেই।' মনে রাখা উচিত, এলিয়ট শুধু পথই দেখাতে পারেন, দায় তাঁর নিজস্ব—ঐকাত্ম্য-সংকটের সেই দায়। সেই দায় ছিল বলেই এ বই-তে থেকে গেছে কিছু অপ্রয়োজনীয় ঝোঁক—প্রায় যেন খোঁচা খোঁচা হয়ে জেগে থাকা পাশ্চাত্য পুরাণের উল্লেখ, কিংবা পরবর্তী বই-এর অপ্রচলিত কিছু উৎকট শব্দ—শরীরের বেখাপ্পা পোষাকের মতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় হ্যারল্ড ব্লুমের প্রভাবতত্ত্বর কথা, জিওফ্রে হার্ট্‌ম্যানের সূত্র ধরে বলছেন তিনি : '...in a poem the identity quest always works as a formal device. This is part of the maker's agony, part of why influence is so deep an anxiety for the strong poet and compels him to an otherwise unnecessary inclination or bias in his work.'

তাই মনে হয়, 'হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্রঠাকুর—এর মতো পংক্তিও ততটা রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাব থেকে লেখা নয়। এখানেও লুকিয়ে আছে প্রভাবমুক্ত হবার তীব্র উৎকণ্ঠা—যে সুষমাময়তার প্রতীক তখন হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তার থেকে দূরে থাকার আশ্বাস তাঁকে এত স্পষ্টভাবেও প্রকাশ করতে হয়। রবীন্দ্রবিরোধিতার অভিপ্রায় 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ আদৌ থাকার কথা নয়, বরং সে কাব্যে আছে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে উত্তরণের প্রয়াস—কিছুটা যেন রবীন্দ্রকাব্যের 'ভ্রান্ত পাঠে'—ব্লুমের ভাষায়—যা তাঁর নিজের কাব্যে দেখা দেয় সংশোধনের প্রক্রিয়ায়। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কবিতার এই পংক্তিগুলি তার দৃষ্টান্ত : 'তবু তো আকাশে/ছুটে চলে শব্দময়ী অপ্সররমণী/ঝঞ্ঝামদর যে মত্ত শত বলাকার পক্ষধ্বনি।'—'বেলাকা'র পংক্তিগুলির নিছকই এলোমেলো ব্যবহার নয়; রবীন্দ্রনাথের চরণ কটিতে যদি প্রকাশ পেয়ে যাবে অমূর্ত একটি ভাবনা—স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করছে অপ্সররূপী শব্দ-বলাকার পক্ষধ্বনি, বিষ্ণু দে তবে মূর্ত করতে চাইলেন ছবিটিই—শত বলাকার ধ্বনিময় উড়ে যাওয়াই। 'অর্ধেক কল্পনা' কবিতাটির সঙ্গে 'চৈতালী'র 'মানসী' কবিতাটির যোগ কবি নামেই স্পষ্ট করেছেন; মনে হয় 'মানসী' কবিতার থীম যেন সংশোধন করে দিতে চান এখানে কবি—ঐ থীমেই কবিতা রচনা করে : 'পুরুষের সৃষ্টিস্বপ্নে ছিল নাকি তোমারই বৈভব'—বিষ্ণু দে জোর দিতে চান সৃষ্টির উপর, তাই তাঁর পুরুষ 'ভেদমুগ্ধ কম্পিত পুরুষ'—ভেদ-অভেদের দ্বন্দ্ব থেকে যায় ব্যঞ্জনায়।

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কবিতাটি চতুর্দশপদী, বিষ্ণু দে-র 'অর্ধেক কল্পনা'র

মিলবদ্ধ সনেটেরই অনুরূপ, কিন্তু এর ভাগ ৮-৫-এর, অর্থাৎ এটি ত্রয়োদশ-পদী। দেখা যাচ্ছে ফর্মের প্রথানুগত্য প্রথম কাব্যগ্রন্থেই কবি অস্বীকার করেছেন, সেইসঙ্গে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অভিনব সব মিলবদ্ধ দিয়ে নতুন নতুন স্তবকবন্ধও রচনা করেছেন। প্রবহমান মাত্রাবৃত্ত তো বিষ্ণু দে-ই প্রথম রচনা করেন 'উর্বশী ও আর্টেমিস্' থেকেই। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থটিতেও formal device-এর দিক থেকে নতুনত্বের বৈভব কিছু কম নয়।*

'মাত্রাছন্দের মতো রাবীন্দ্রিক যন্ত্রকে নিজের সুরে' বাজালেন বিষ্ণু দে—একই কবিতার মধ্যে স্তবকান্তরে ছন্দ বদল করে কিংবা সুদ বদল করে, মসৃণ সাঙ্গীতিকতাকে ভেঙে ভিন্নস্বরের সঙ্গতি সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির বহুল প্রয়োগও লক্ষ করা যায় 'চোরাবালি'তে—অবশ্যই অন্য অর্থে, রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে পৌঁছতে অপারগ—তাই যেন দেখাতে চান কবি। 'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতাটি এর সবচেয়ে উপযুক্ত নিদর্শন। পড়ে স্পষ্টই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' কাব্যের 'বঞ্চিত' আর 'অপর পক্ষ' নামে যুগ্ম কবিতা পড়ার প্রতিক্রিয়া থেকেই লেখা হয়েছে কবিতাটি ('টপ্পা-ঠুংরি'র রচনাকাল ১৯৩৫ হওয়া সেদিক থেকে অসম্ভব বলেই মনে হয়, মনে হয় এ তারিখ কোনো একটা ভুলের বশে ছাপা হয়েছে)। কবিতাটি যেখানে শেষ হয়—'আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব / কোন বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে? কোন ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায়?'—তা যেন 'শ্যামলী'র 'অপরপক্ষ'র শেষ অংশের সঙ্গে বিশেষভাবে বৈপরীত্য সৃষ্টি করার জন্যই: 'বাসের নিচে চাপা পড়ি নি নিতান্ত দৈবক্রমে / এই দয়াটুকুর জন্যে ইচ্ছে নেই দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।' 'শ্যামলী'-র পটভূমি যে সময়, তাতে এ অতিশয়োক্তি অবাস্তব বলেই হয়তো ভেবেছিলেন বিষ্ণু দে, আর তাই পুরো কবিতা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের পংক্তি ক্রমাগত ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন, যার পুরো ঝোঁক অমূর্তকে মূর্ত করায়, বাস্তবের সঙ্গে লগ্ন করায়। যেমন এই অংশটুকু: 'বাসের একি শিংভাঙা গোঁ! / যন্ত্রের একি খামখেয়াল / এদিকে আর পঁচিশ মিনিট / ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।'

বলা যায় 'চোরাবালি'তেই যেন ঘটে গেছে সেই যুদ্ধ, কবির ঐকাত্ম্য যেন অর্জিত হল। আশ্চর্য নয় যে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিহত করবে এই বই, এর

* কবিতার স্তবকবন্ধে ফরাসী কবিতার কোনো-কোনো ফর্ম গ্রহণ করেছেন বিষ্ণু দে প্রমথ চৌধুরীর অনুসরণে। এ বিষয়ে ভালো আলোচনা করেছেন অরুণ সেন, দ্রষ্টব্য—'বিষ্ণু দে: পটভূমি' ('পরিচয়', ডিসেম্বর ১৯৭৫)।

'ভাবেরও ভাষার শুভ মিলন'-টুকু বুঝে নেবার জন্য তাঁর প্রয়োজন হবে সুধীন্দ্রনাথের মিডিয়েশন।[১] 'চোরাবালি'র পর পিতাকে বিনম্র প্রণাম জানিয়ে পুত্রের নিজস্ব পথে যাত্রা। 'পূর্বলেখ' রবীন্দ্রনাথকে সেই প্রণামের মধ্যেই উৎসর্গ করা হয়েছে। উৎসর্গপত্রের অন্ত্যেষ্টির মন্ত্রটি নিছক বাহ্যিক-ভাবে রবীন্দ্রপ্রয়াণের স্মারকমাত্র নয়।

এ সময়ে বিষ্ণু দে-র নন্দন-ভাবনা রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ না হলেও রবীন্দ্রনাথ থেকে খুব দূরের যে নয়, তা মন্মথনাথ ঘোষকে আক্রমণ করে লেখা প্রবন্ধটি থেকেই বোঝা যায়। তার আধবছর পরে একটি গ্রন্থসমালোচনা সূত্রে তিনি যেভাবে নিজের নন্দনতত্ত্ব ব্যক্ত করেন, তার থেকেও তা স্পষ্ট হয়: 'কাব্যকে আমি মোঁর মতো, ক্রাই-এর মতো ধ্যান-ধারণার গোত্রেই ফেলি।...আজকের দিনে ক্যাম্বেলের চড়া গলায় তৃপ্তি পাই নে—বরং প্রেল্যুডে খুঁজতে যাই সেই গভীর আনন্দ, যাতে করে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতো অসতর্ক কবি, অপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আত্মীয় হয়ে ওঠেন।' বছর দুই পরে লেখা আরেকটি গ্রন্থসমালোচনাতেও ধ্যানধারণার পক্ষপাতী মনই ধরা পড়ে; সে লেখায় অডেন ম্যাকনীস স্পেণ্ডর প্রভৃতি কবিদের সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিকদের নানা অভিযোগকে বিদ্রূপ করেই লেখেন বিষ্ণু দে: 'ঐ নবীন কবিরা নাকি জনসমুদ্রে হাবুডুবু খান না অর্থাৎ সমাজসত্তার চৈতন্য তাঁদের অস্থিমজ্জায় নেই। এবং যেহেতু ঐ চৈতন্য না থাকলে ঐতিহাসিক দৃষ্টি হয় না আর যখন উক্ত দৃষ্টি না থাকলে একদিকে মার্কসকথিত সমাচার প্রচার সম্ভব নয় এবং অন্যপক্ষে প্রগতিবিরোধী ট্রাজেডি উপলব্ধি করা যায় না, সেই কারণে এই নালিশে আমার মতো কবিভক্তের মুস্কিল। এর আসান অবশ্য প্লেটোতে, কিন্তু এই বুর্জোয়া কলজে সেই সম্ভ্রান্ত প্রাজ্ঞকে টানতে সঙ্কোচ লাগে।' বিষ্ণু দে-র এই পর্বের নন্দনতত্ত্বে তিনি কবিতায় ধ্যানের পক্ষপাতী, কিন্তু সৌন্দর্যবাদের নয়, তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের কীট্‌স সমালোচনা সমর্থন করেন—'Keats-এর রচনায় যে decadence-এর পূর্বাভাস আছে, তাহা যাহারা কাব্য পড়ে ও বোঝে, তাহারা জানে এবং decadence যে রুগ্ন চিত্ততা তাহাও তাহারা জানে।' বিষ্ণু দে এমন কি পাউণ্ড-এর সমালোচনা করেন এই বলে: 'পাউণ্ডের সমস্ত রচনা পড়লে বোঝা যায় যে তিনি aesthete-দের শেষ বংশধর এবং টেকনিক বলতে তিনি অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ ও সজীব টেকনিক বোঝেন না। বোঝা যায় যে তিনি মানস-জীবন থেকে ছিন্ন pure art-এর টেকনিকে আস্থাবান।'

বোঝা যায়, কবিতার কোন টেকনিক বিষ্ণু দে-র অন্বিষ্ট—মানস-জীবনের সঙ্গে যুক্ত, অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবতা থেকে জন্ম নেয় সে টেকনিক, সে টেকনিক প্রয়োগ কবি আর পাঠক—উভয়কেই ভাবিত করবে, যার দৃষ্টান্ত তিনি পেয়েছিলেন এলিয়ট-এর কবিতায়: 'কাব্যের আবেদনে তাই আজ কবিকে ও পাঠককে ভাবিত করার প্রয়োজন। এলিয়টের মতো সত্য কবিকে তাই বিশেষজ্ঞ কবি হতে হয়েছে।' হৃদয় নয় মন, নির্বস্তু নয়, বস্তুনির্ভরতাই কাব্যের ভিত্তি বলে জেগেছিলেন বিষ্ণু দে তাঁর 'অতি তরুণ প্রারম্ভেই।'

২.

সর্বোপরি বিষ্ণু দে এলিয়টকে সহধর্মী পেয়েছিলেন তাঁর আত্মসচেতনতার বোধে—এলিয়ট নিছক আত্মসচেতন কবি নন তাঁর কাছে, 'আত্মসচেতনতা-র কবি'ই। বিষ্ণু দে-র প্রথম পর্বে সে আত্মসচেতনতা 'সম্বন্ধস্বীকারের গভীরতায় পৌঁছয় নি', তবুও এলিয়টের দান সার্থক ছিল 'রামমোহনেতর ঐতিহ্যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের অভিজ্ঞতা ও পুরুষার্থের গণ্ডীবিস্তারে' এবং তারই সঙ্গে বিশেষভাবে 'বিচ্ছিন্নতাবোধ তীব্রতর করায়···নিজেদের ও বিশ্বের বিষয়ে চৈতন্য ক্ষুরধার করায়'—সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ-এর তীব্রতা থেকেই উঠে এসেছিল 'চোরাবালি'র 'ঘোড়সওয়ার' কবিতা। আর সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে মুক্ত হবার আততিই পথ পেল মার্কসবাদের ব্যক্তি-বিশ্বের দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধের ধারণায়। তাই বিষ্ণু দে লিখতে পেরেছেন: 'অজ্ঞাতসারেই এলিয়ট-এর সমালোচনার সূত্রপাতে মার্কস অঙ্গীকৃত, তাঁর কাব্যের মুক্তিতে সাম্যবাদীর কাব্যচর্চা আরম্ভ, যদিও সে সত্য কবি জানেন না। বা মানেন না।' 'পূর্বলেখ' থেকেই বিষ্ণু দে-র এই পর্বান্তর, কিংবা পরিণতির পর্বের সূচনা। গৌণ হয়ে যায় পাশ্চাত্যের পুরাণ, পরবর্তী কাব্য-গ্রন্থগুলিতে বিষ্ণু দে হাত পাতেন লৌকিক ঐতিহ্যের দরজায়। সেই সঙ্গে এও তিনি বোঝেন 'সে ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় মেলে না, সে ঐতিহ্য-ব্যবহারের পথ আপাত সহজ নাও হতে পারে, এবং সে বিচারে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তুল্যমূল্যও নয়।' সেই লৌকিক ঐতিহ্যের খোঁজে বিষ্ণু দে-র কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল কিংবা দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ নন। এ সময়ের নানা লেখায় বারবার তাই রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য উপমা পায় হ্রদে, কিংবা সুউচ্চ শিখরে:

ক) 'রবীন্দ্রনাথ একান্ত ও প্রচণ্ডকীর্তি প্রভাব হলেও তিনি বাংলার

ঐতিহ্যে সাগরগামী নদী নন, বিশাল ও মনোরম হ্রদ, তা সে আমাদের দুর্বোধ্যতাবিলাসী বন্ধুরা যাই বলুন।'

খ) 'তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ ও কীর্তির তুলনা নদীর খেত ভাসানো স্রোত নয়, সংহতসত্তা এক হিমালয়ের হ্রদেই তাঁর উপমা।'

গ) 'অথবা বলা যায়, সে জলধারা লঘুবায় তুষার দেশের স্বচ্ছ নীল হ্রদে আত্মস্থ।'

ঘ) 'তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ নদীর মুখর স্রোত নয়, সংহতসত্তা হিমালয় নামে নগাধিরাজ যেন।'

'পূর্বলেখ'তে রবীন্দ্রউদ্ধৃতির ব্যবহার রবীন্দ্রলোকের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র কাব্যজগতের ব্যবধানের বিস্তৃতিই নির্দেশ করে :

'নীল নবঘনে গগনে সেই
আঁধার ঘনায়, বৃষ্টি ঝরে,
মাটির গন্ধে, ভিজে হাওয়ায়,
মজা পুকুরেই মজা করে,
মজা নদী সেই ঘুরে মরে।'

'বন্ধনহীন পথ বেঁধে দিল গ্রন্থি
ছিন্নকন্থা-দলেই ভেড়ে সামন্ত।'

'তোমাকে দেখেছি হে ভোজরাজের
পুতুল আমার রঞ্জনা!
গ্রামছাড়া পথে রাঙামাটি ঝামা
গোষ্পদ নদী অঞ্জনা।'

সময়ের নেতির দ্বন্দ্বে এভাবেই টুকরো হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যময় অস্তির বোধ। 'পূর্বলেখ'-র পরের দুটি কাব্যগ্রন্থ—'সাত ভাই চম্পা' আর 'সন্দ্বীপের চর' প্রকাশ করে বিষ্ণু দে-র 'নির্মাণের কর্মিষ্ঠ দিক'। 'সাত ভাই চম্পা'-র বেশ কিছু কবিতা ১৯৪২ সালে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংগ্রহ' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল '২২শে জুন' নামে। প্রকাশিত হয়েছিল লেনিন ও স্টালিনের যে দুটি উদ্ধৃতি নিয়ে, তাতে বোঝা যায় কবিচরিত্রের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনই ঘটাতে চাইছেন বিষ্ণু দে। এলিয়ট-এর পরিবর্তে কাব্যাদর্শের মিল পাচ্ছেন তিনি আরাগঁ কিংবা এলুয়ারের সঙ্গে।

সে কাব্যাদর্শে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অবান্তর হতে পারেন না, নিজের দেশের 'একটা গভীর অর্গানিক অনুভূতি' আয়ত্তে আনার প্রয়োজন যদি অনুভব করেন কবি। কিন্তু দূর থেকে আরো দূরে চলে যায় রাবীন্দ্রিক জগৎ —বিক্ষুব্ধ বর্তমানের আলোড়নে—যুদ্ধে আর দুর্ভিক্ষে, আতঙ্কে আর অভাবে, শোষণে আর পেষণে হাহাকারময় মানুষের, মানুষের আন্দোলনের বর্তমানের। বিষ্ণু দে হয়তো চেয়েছিলেন আরাগঁ-রই মতো—'নিরস্ত্র মানুষের একটা অস্ত্র' হয়ে উঠুক তাঁর গান—'কারণ সে মানুষেরই গান, যার পক্ষে জীবনই যথেষ্ট প্রেরণা।' 'I am Cinna the poet, Cinna the poet' নামে কবিতায় কাব্যের এই যুগবদলের কথা তুলে ধরেছেন কবি :

> 'আলগা মাটির হাল্‌কা হাওয়ায় কেটেছে অনেককাল
> মানসলোকের বাসিন্দা যত তন্দ্রাহীন গম্বুজে
> মরাল দীঘির পদ্মকাননে ঢোকে যে হাতীর পাল
> অর্থগৃধ্নু অশ্বগৃধিনী ছিঁড়ে খায় অম্বুজে।
> ভেঙেছে আসর, কুঞ্জ শূন্য, আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
> কাস্তে লাঙলে হাতুড়ি হাপরে তোমরা গড়েছ হাল।
> জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও, মৃত্যুঞ্জয় হাতে
> ভীরু হাত পাতি, মৈত্রীমুখর তোমরা যে মহাকাল।'

এ কাব্যদুটিতে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি বড় একটা প্রয়োজনে আসার কথা নয়। তবু অর্থ-অনুষঙ্গ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে একটি-দুটি পংক্তির ব্যবহার উল্লেখ করার মতো। 'যৌবনবেদনারসে উচ্ছল তোমার দিনগুলি'—মৃত্যুর দেবতার উদ্দেশে উচ্চারিত এই পংক্তি যখন মৃত্যুবরণে উদ্যত এক জঙ্গী মানুষের উদ্দেশে বলেন কবি, তখন দেবতা-মানুষ একাকার হয়ে যায়। 'সন্দ্বীপের চর'-এর নাম-কবিতাটিতে সমাজ-প্রগতির আশ্বাসের ছবিতে তিনি যোজনা করে দেন 'বলাকা'র গতিবাদের মাত্রা। রবীন্দ্রনাথের চোখে নদী কেবলই নটী কিংবা বৈরাগিনী, বিষ্ণু দে দেখেছেন তার 'সংসারের বেশ'ও। রবীন্দ্রনাথকে এলিয়ট পড়িয়েছিলেন বিষ্ণু দে, আর এলিয়টকে পড়াতে চেয়েছিলেন মার্কস। রবীন্দ্রনাথকে মার্কস পড়াতে না চাইলেও এঁদের পারস্পরিক অন্বয়বিধান করেছেন তিনি মার্কসীয় প্রগতির সঙ্গে রাবীন্দ্রিক গতিবাদ সম্বন্ধযুক্ত করে।

৩

'যান্ত্রিক বামপন্থী ব্যাখ্যা'র পক্ষপাতী কোনোদিনই ছিলেন না বিষ্ণু দে।

রজার গারোদির 'উর্দিহীন শিল্পী' তিনি যে অনুবাদ করেন—সে তাঁর নিজের মতো বলেই, আর তার প্রধান বাণীই তো এই যে 'কম্যুনিস্ট পার্টির কোনো শিল্পতত্ত্ব নেই।' বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকলেও তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে গৌণ হয়ে যান না। রবীন্দ্র ঐতিহ্যের সীমা নির্দেশ করলেও, সমসময়ের থেকে সেই বিরাট প্রতিভার দূরত্ব সম্বন্ধে সচেতন হলেও তার প্রাসঙ্গিকতার তাৎপর্যও বিষ্ণু দে-ই নির্দেশ করেন; দেখান যে রবীন্দ্রনাথই 'শেখালেন শালীনতা', 'প্রাদেশিকতা পুষ্ট বাংলায়' আনলেন 'বিশ্বের মানদণ্ড', আনলেন 'নিছক সৌন্দর্যের চেতনা'। 'কাব্যের ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস'—আরার্গ-র এ উক্তি বিষ্ণু দে আত্মস্থ করেছিলেন বলেই তিনি কখনো ভোলেন না—রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিটি বই টেকনিকের প্রগতিতে পদক্ষেপও বিষয়বস্তুর বাহুবিস্তার।' যামিনী রায়ের উক্তি অনুসরণ করে বিষ্ণু দে মনে রাখেন রবীন্দ্রনাথই 'আমাদের সাহিত্যিক পেশার দায়িত্বের প্রথম ও চরম উদাহরণ।' রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েই এখন তিনি সমর্থন করতে পারেন 'বুদ্ধদেবের বিদ্রোহী রবীন্দ্রবিরোধী আবেগ'-কেও।

সেই সময়ই বিষ্ণু দে-কে আক্রান্ত হতে হয় 'যান্ত্রিক বামপন্থী'র দ্বারা, এমন কি 'পরিচয়'-এর সঙ্গে দীর্ঘকালের সম্বন্ধই হয় ছিন্ন। ফলে নিজের নন্দনবোধ প্রতিষ্ঠার তাগিদেই যেন অল্পকালের মধ্যে নতুন পত্রিকা 'সাহিত্য-পত্র'-র জন্ম ঘটে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে আনুষ্ঠানিক বামপন্থার থেকে বিষ্ণু দে-র অপসরণ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মার্কসবাদ মহলে যখন বিতর্কের ঝড় উঠেছে, এরকম সময়েই 'সাহিত্যপত্র'র সূচনা। বিতর্কের মূলে ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির তথাকথিত 'তাত্ত্বিক', যাঁরা রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দেশ করেছিলেন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। ভিন্ন-ভিন্ন প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে এই অতিবামপন্থী—সাহিত্যবিচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন, অবশ্যই রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সীমা সম্বন্ধে সচেতন থেকে, যার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর **'an acre of green grass'**-এর সমালোচনা দিয়েই সাহিত্যপত্রের শুরু, যে সমালোচনায় 'শুদ্ধ' সাহিত্য-পন্থীদের এবং অতিবামপন্থীদের—দুই দলেরই গোঁড়ামির প্রতিবাদ করেছেন বিষ্ণু দে একই সঙ্গে। সে লেখায় বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রসমালোচনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন তিনি : 'বুদ্ধদেব বাবু চমৎকার বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের তৃপ্তিহীন প্রাণময়তার অশীতিবর্ষব্যাপী সমগ্রতা।' সেইসঙ্গে প্রকাশ করেন

তাঁর নিজের অভিমতও—'শেষটা তিনি চরম স্বচ্ছতায় তাঁর পটভূমি প্রায় পিছনে ফেলে আমাদের আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হয়ে উঠেছিলেন।' (এ অভিমত বিশদ করেন পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধে।) রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্বের প্রতি পক্ষপাত এই প্রথম প্রকাশ করলেন বিষ্ণু দে। সাহিত্যপত্রের একটি 'সম্পাদকীয়'-র সূত্রে, পরে যা 'বীরবল থেকে পরশুরাম' নামে গ্রন্থভুক্ত হয়, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কথা আবার এনেছেন তিনি: 'মাঝে-মাঝে সমাহিত একাত্মতা তাঁর ভেঙেছে, বহির্জগৎ এসে হানা দিয়েছে বসুন্ধরার দেশে, কন্যার বেশে—"যেতে নাহি দিব" বলে। শেষ বয়সের কবিতায় তিনি আবার রিক্ততার, ছলনার প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন রূপনারায়ণের কূলে, যেখানে ছলনাময়ীর মুখে মেলে না উত্তর।'

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ এ লেখায় অনেকখানি স্থান জোড়ে, আর তার প্রধান বিষয় হয় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধ। প্রকৃতিকে ভালোবাসাই, বিষ্ণু দে-র মতে রবীন্দ্রকাব্যের 'প্রিডমিনেটিং প্যাশন', আর একথা তিনি শুনেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই মুখে: 'শুধু সাহিত্যিক হলে হয় না, দাঁড়াতে হলে চাই আর কিছু আবেগ, একটা Predominating passion, আমি কবি হিসাবে দাঁড়িয়ে গেলুম প্রকৃতিকে ভালোবেসে, মানুষকেও আমি ভালোবেসেছি, কিন্তু প্রকৃতিই আমকে বাঁচিয়ে দিলে।' প্রকৃতি বিষয়ে এই আবেগ ভারতীয় সহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই দান বলে মনে করেন বিষ্ণু দে—'তাঁরই গানে কবিতায় গদ্যে প্রকৃতি এল আমাদের ইন্দ্রিয়বেদনে, নানারূপে, চোখে কানে হৃদয়ে চিন্তায়।' মানুষের শত্রু নয় এ প্রকৃতি মানুষের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি যখন চিনিয়ে দিতে চান বিষ্ণু দে, তখন তার অন্তরালে হয়তো মার্কসও থাকেন, প্রকৃতি-মানুষের নিত্য সাযুজ্যের ভাবনায়। মার্কস-এর চিন্তা চৈতন্যের গভীরে চারিয়ে দিতে তাঁকে সাহায্য করেছিল যে-সব বই, বিষ্ণু দে তার মধ্যে নাম করেছেন জ্যাক লিণ্ডসের লেখা 'শর্ট হিস্ট্রি অব কালচার', আর সে বই সার্থক আধুনিক কবিতা সেই কবিতাকে বলতে চায় যা '...a vanguard force in the human conquest of reality, the creative union of man and nature.'

এই অর্থেই কি বিষ্ণু দে বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে কখনো বা 'মার্কস্‌বাদীরও তো গুরু'? এর উত্তর নিশ্চিত করে দেওয়া শক্ত, কিন্তু এইখানেই বিষ্ণু দে-র কবিতায় একটা পালাবদল লক্ষ করা যায়। 'সন্দ্বীপের চরে'র সূচনায় প্রকৃতি আর মানব-সমাজের বৈপরীত্যের উপরই

ঝোঁক, কিন্তু 'অন্বিষ্ট' থেকে মোড় ঘুরে গেছে :

'শ্রাবণের মেঘে মেঘে আশ্বিনের পান্নায় নীলায়
হেমন্ত হাওয়ায়, শীতের স্ফটিক দিনে হীরক সন্ধ্যায়
ফাল্গুনের চঞ্চল আবেশে
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ভালো লেগে লেগে
আমারও অন্বিষ্ট তাই...'

কিন্তু জীবনে 'অন্বিষ্ট' সন্ধানের পথ তো সরলরেখায় নয়, সময়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সে পথ আঁকাবাঁকা। প্রকৃতির সঙ্গেও সেই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই 'অন্বিষ্ট'-তে মেলে। 'ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি / এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল / আমার চেতনায়'—রবীন্দ্রনাথের এ অনুভব বিষ্ণু দে'-র লভ্য নয়। তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতাও প্রকাশ করে :

'মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি আলোয়
চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবি-কে
অলখ সঙ্গীতের মন সুকুমার, দাঙ্গার কালোয়
হঠাৎ নিভন্ত শান্তিনিকেতন আমার বৌদিকে।

নিসর্গ বেসেছি ভালো নীল ঢেউ-এ পাহাড়ে তুষারে
তবুও চোরাই মুখে ছেয়ে গেলো আমার শহর ;
নিদ্রাহীন তাই আজ আমার সে স্বপ্নের প্রহর
মুষ্টি হানে কীটদষ্ট কুটরাষ্ট্র বাণিজ্যভূষাকে।'

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা থেকে উপরের উদ্ধৃতিটি নেওয়া, যার নাম '২২শে শ্রাবণ' ; এ গ্রন্থের শেষ কবিতাটির নাম '২৫শে বৈশাখ'। প্রকৃতি তথা রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যের অন্যতম থীম—এ রকম মনে করা যায় এর থেকে। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধী সম্বন্ধের কথা কখনো বলেন কবি : 'প্রেয়সী! দুর্লভ তুমি, হে প্রকৃতি দূর!' কিন্তু এই বিরোধকে এই দূরত্বকে অতিক্রম করাই মানুষের সাধনা—'অক্টোবর দিনগুলি' কবিতায় সেই আশাই ব্যক্ত করেন কবি।

'শহরে শহরে কোনোই আরাম নেই
গ্রামে মানুষের একটুকু দাম নেই।

কঠিন জীবন। তবুও প্রকৃতি তাকিয়ে প্রতীক্ষায়
তাই তো আমরা মিলেছি এ দীক্ষায়।'

আর, এদিক থেকেই তাৎপর্য পায় 'রবীন্দ্র-ব্যবসা'-র পরিবর্তে রবীন্দ্র-উত্তরাধিকারের বহমানতা :

'জঙ্গম সূর্যকে জানি আমাদের জঙ্গী প্রতিদিনে
অবিচ্ছিন্ন মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে যুগ যুগ ব্যেপে
প্রতিটি উষায় রাত্রে মধ্যাহ্নের বটে দগ্ধতৃণে
গলাপিচে বৈশাখীর ভবিষ্যতে ঝড়ে মেতে ক্ষেপে
প্রতিটি সূর্যাস্তে আর সূর্যোদয়ে চৈতালি নিদাঘে
আষাঢ়ে শ্রাবণে আর আশ্বিনে অঘ্রাণে হিম মাঘে।'

'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ?'—পরের কবিতারই-এর নামের এই জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথকে থীম হিসেবে গ্রহণ আরো স্পষ্ট করে। আর এই নাম কবিতায় রূপ দেয় বিষ্ণু দে-র রবীন্দ্রনাথকে :

'তুমি কি কেবলই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ্য, কবি ?

... ...

কোথায় সে প্রতিদিন রূপের রচনা,
সেই নিরন্তর সুন্দরের ধ্যানের উন্মেষ,
অনাত্মীকরণে সদা নিজেকে সে উত্তরণ,
নিরলস জ্ঞানের নিয়ম
কঠিন শিক্ষার শ্রম,
বুদ্ধির নির্ভয় শুভ্র আলোকে আলোকে,
আত্মস্থের স্তব্ধতায় শুদ্ধ অন্ধকারে
শূন্যে শূন্যে ব্যথাময়...'

এই 'অনাত্মীকরণে নিজের উত্তরণ'—বিষ্ণু দে একেই তো বলবেন আধুনিক কবির ঈপ্সিত অভিজ্ঞতা ; এবং জ্ঞানে শিক্ষায় বুদ্ধিতে অর্জিত রাবীন্দ্রিক আত্মস্থতাও আজকের কবির অন্বিষ্ট ছিল, যদিও আজকের ভাঙাচোরা সময়ে তা স্বপ্নমাত্র। বামপন্থী রাজনীতি যে সমাজ-পরিবেশে কিছুমাত্র পরিবর্তন আনতে পারল না, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের প্রবহমানতা সার্থক বলে তার দ্বারাও সে পরিবেশ কিছুটা সুস্থতা অর্জন করত ; সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতাই গৌণ মনে করেন না বিষ্ণু দে। আধুনিকতার নিরিখে শেষ পর্বের কবিতা অধিক মূল্যবান মনে করলেও সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথ যেখানে

শক্তির উৎস, সেখানে রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল—এ প্রশ্নের তাই উত্তর নেই :

'আমরা কেমন করে দূর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণি—
কোন রবিরশ্মি কোন বাঁশি কোন তূর্যের নির্ঘোষে
কবে বা কখন কিসে ক'রে দিলে রৌদ্রে রৌদ্রে ধনী!
আমাদের সূর্যদেখা সূর্যালোকে প্রত্যূষে প্রদোষে।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁকে 'রৌদ্রে রৌদ্রে ধনী' কর তোলে, রবীন্দ্রনাথের গান শুধু নান্দনিক সম্পদ নয় তাঁর কাছে, সেই গানেরই মিডিয়েশনে দেশের সত্তা 'চিরতরে মূর্তি' পায় :

'রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে গেল দেশ সারাদেশ
বিস্মৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।
সেই থেকে একা একা ভিড়ে অনুকূল হাওয়া ডাকে
আমাকেও, পরবাসী চলে এসো ঘরে।'

এইভাবে, সমাজে রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতা যত তীব্র হয়ে ওঠে, যত তছনছ হয় সংস্কৃতির জগৎ, তাই তার বৈপরীত্যে একটি সদর্থক মূল্যবোধরূপে বিষ্ণু দে-র নির্ভর হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। শতবার্ষিকীর আড়ম্বরের মধ্যে তাই তাঁর আক্ষেপ বাজে :

'ব্যথাময় পূরবীর অগ্নিবাষ্পে তৃষ্ণার্ত বাঙালি
এ বড়ো অদ্ভুত রাজ্য, ছাব্বিশে বৈশাখে মরুভূমি।
রবিশস্য দগ্ধস্তূপ, ঈশানে প্রস্তুতি নেই কি না।'

কিংবা

'হে বন্ধু তোমরা বলো কেন তবু বলিষ্ঠ মননে
আলোকিত নিত্যকর্মে আমরাও সৌন্দর্যে স্বাধীন
সর্বদা উদগ্রীব নই, লক্ষ লক্ষ চিত্ত সূর্যমুখী?'

৪

সেই সঙ্গে, শতবার্ষিকীর প্রায় সমসময় থেকেই, গদ্যপ্রবন্ধ আধুনিকতার মান ব্যক্ত করেন বিষ্ণু দে, আর সে নিরিখে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ও প্রধান আধুনিক বলেই পরিগণিত হন। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র ভূমিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব যে রবীন্দ্র বিরোধিতাকেই আধুনিক বাংলা কবিতার একটা লক্ষণ বলে ধরেছিলেন, বিষ্ণু দে-র বিচারে অন্তত তা গ্রাহ্য নয়। তাঁর সূচনাপর্বের

রবীন্দ্রভক্তি এভাবে এ পর্বের রাবীন্দ্রিকতায় পরিণতি পায়—রবীন্দ্রনাথ পরিগ্রহণের প্রতিমানের রূপান্তরে। ১৯৬২ সালে, বিষ্ণু দে-র সম্পাদনায় 'একালের কবিতা'র যে সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তারই ভূমিকা প্রবন্ধে বিষ্ণু দে আধুনিকতার স্বরূপ নির্দেশ করেন। আধুনিক মনকে বিষ্ণু দে এক কথায় বলবেন আত্মসচেতন মন। আত্মসচেতন মনই দীর্ণ হয় পরিপার্শ্বের সঙ্গে পুরুষার্থের দ্বন্দ্বে, দ্বন্দ্বের সংকটবোধ-এ। রবীন্দ্রনাথের একান্ত বালক-বয়সের কাব্য 'কবিকাহিনী' থেকেই প্রকাশ পেয়েছে আত্মপরিচয় সন্ধানের নিবিড় আকুতি। সেদিক থেকেই এ কাব্য আধুনিক মনের পরিচয় বহন করে, চণ্ডীমঙ্গল থেকে 'কবিকাহিনী' পৃথক হয়ে যায় এখানেই। আবার 'কবি-কাহিনী'র থেকে 'কড়ি ও কোমল' পৃথক, কেননা এ কাব্যে নির্বিশেষ আকুতি প্রকাশ পেয়েছে বিশেষের আততিতে—'রূপের বা কাব্যশরীরের সজ্ঞান নির্দিষ্টতায়।' আধুনিকতার এই আরেক মান। বিষ্ণু দে-র ভাবনায় আধুনিকতায় নিছক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য কিংবা উপাদান-নির্ভর নয়, আধুনিকতার সামগ্রিক স্বরূপটিই ধরতে চেয়েছেন তিনি। জীবনানন্দের মতো বিষ্ণু দে-ও কালের দিক থেকে আধুনিকতাকে চিহ্নিত করতে রাজি নন, কেন না সব কালেই মহৎ স্রষ্টামাত্রই আত্মসচেতন মনের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এও তিনি জানেন যে আজকের যুগেই আত্মসচেতন মানুষের চৈতন্য সবচেয়ে টানটান ; কেননা এই আত্মসচেতনতার মূলে আছে যে বিচ্ছিন্নতার বোধ তা সভ্যতার আদি-ইতিহাস থেকে মানুষের অঙ্গ হলেও আজকের যুগেই তা সবচেয়ে প্রবল : 'টেকনলজি ও বৃহৎ মূলধনের নতুন দাসযুগে মানুষের মনোবিচ্ছিন্নতা যেমন জটিল হয়েছে তেমনি নিয়েছে দুস্থতার কুটিলতার চেহারা।'

আধুনিকতার মান আরো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন বিষ্ণু দে ১৯৬৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায়, রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা নির্দেশ করার সূত্রেই। 'শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ' নামের এই প্রবন্ধটিতে এলিয়ট থেকেই পাওয়া আত্মসচেতনার প্রশ্নকে ইতিহাস আর মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝে নেওয়ার প্রয়াস আছে। 'শিল্পসাহিত্যের সমালোচনা মনোবিজ্ঞানও নয় ইতিহাসবিজ্ঞানও নয়, কিন্তু দুই সতীনের সঙ্গে তার হাত বাঁধা'—সমালোচনা সম্বন্ধে বিষ্ণু দে-র এই ভাবনাই তাঁর আলোচনাকে বিশিষ্ট করেছে। 'আততি' শব্দটি যদিও হিউমের অর্থে প্রয়োগ করেন বলেই আগে জানিয়েছেন বিষ্ণু দে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে

অন্বিত করায় শব্দটি তাঁর, এই লেখায় আরেক মাত্রা পেয়েছে। সংকটবোধের উত্তরণের পথে মানুষের মনের সঙ্গে ইতিহাসের দ্বন্দ্বময়তাকেই বিষ্ণু দে বলতে চান আধুনিকতার আততি। আর সেই মনই আত্মসচেতন যে জীবনের বিবিধ পর্বে বিভিন্ন ধরনের সংকট-যন্ত্রণা অতিক্রম করে আত্মপরিচয় লাভ করতে চায়, আত্মরক্ষার দায় বহন করে চিরজীবন। আত্মরক্ষার সেই প্রবল তাড়না থেকেই, মনোবৈজ্ঞানিক এরিক এরিকসনের সূত্র প্রয়োগ করে বিষ্ণু দে দেখান, রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-সংগঠন। রাবীন্দ্রিক তত্ত্ববিশ্ব আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে গ্রাহ্য না হলেও, মনে রাখা উচিত, ঐকাত্ম্যসংকটের আততিতেই তার উদ্ভব। এমন কি 'কবিকাহিনী'তেও এই তত্ত্ববিশ্ব রচনার বাল্যপ্রয়াস ধার তার মাধ্যমে সংকট থেকে উত্তরণের একটা বিন্যাসগঠন লক্ষ করার মতো। 'কবিকাহিনী' কিংবা 'ভগ্নহৃদয়' আজকের বিচারে অপরিণত রচনা মনে হতে পারে ; কিন্তু বিষ্ণু দে স্থানকালের বিবেচনায় তার 'অসামান্য স্বকীয়তা' মনে রাখেন, মনে রাখেন 'কড়ি ও কোমল'-এ মানবিক অভিজ্ঞতার প্রথম রূপায়ণের গুরুত্ব। এইভাবেই, ইতিহাসের প্রেক্ষিত স্মরণে রাখাতেই বিষ্ণু দে-র রবীন্দ্র-সমালোচনা যথেষ্ট তাৎপর্য পেয়ে যায়। আর, ইতিহাসের প্রেক্ষিত শুধু নয়, বিষ্ণু দে-র আলোচনায় ইতিহাসগত বিশ্লেষণও চলে আসে, সেদিক থেকেই তিনি দেখতে পান—পরাধীন দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর প্রয়োজনবাদের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে 'অনাবশ্যকতা'র এত প্রাধান্য, আধুনিকের চোখে যা ভিত্তিহীন বলে মনে হতে পারে।

অবশ্য, শিল্পে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথকে 'আধুনিকতার আর্কেটাইপ' উপলব্ধি করেও বিষ্ণু দে নির্দেশ করতে ভোলেন না আধুনিক মনন আর শিল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ ঘটছে কোনখানে। ইতিহাস-বোধ দিয়েই বিষ্ণু দে দেখতে চান রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধের আর সাহিত্যশিল্পের সীমার দিক—দেশকালের যে নির্দিষ্টতা মানুষমাত্রকেই বদ্ধ করে। একযুগের সাহিত্যিক প্রতিমান আরেক যুগে বদলে যায়। 'সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় যে ভঙ্গিতে কবিতা আলোচনা করেন, বিষ্ণু দে-র সাহিত্য-রুচিতে তা অবান্তর মনে হয়, তিনি কবিতার বিচার করতে চান 'দ্বন্দ্বময় অলঙ্কার প্রয়োগের কবিত্বময়তা' দিয়ে, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-আলোচনাতেই যা সচেতনভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তথ্যের সঙ্গে সত্যের, প্রয়োজনের সঙ্গে আনন্দের যে বিরোধের কথা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-তত্ত্বে বারবার উচ্চারিত, তার মূল রয়েছে সে-যুগের জ্ঞানচর্চার বিচ্ছিন্নতায়।

আধুনিক মন সে বিচ্ছিন্নতাকে চরম বলে মানে না, বরং বিচ্ছিন্নতাকে দূর করবারই সাধনা তার। অন্য দিকে আধুনিকের বিচ্ছিন্নতাবোধ 'আত্ম-সচেতনতায় তীব্র, হয়তো তির্যক, হয়তো ব্যঙ্গময়ভাবে গম্ভীর' বলেই আধুনিক সাহিত্যের রূপায়ণে ব্যাখ্যার বদলে ব্যঞ্জনা প্রাধান্য পায়, রূপকের বদলে প্রতীকেই রূপ নিতে চায় তার দ্বন্দ্বময় অভিজ্ঞতা, রূপ নেয় 'আইরনির উভবলি দ্বিধা'-য়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এ জাতীয় রূপায়ণ সাধারণত যে দেখা যায় না, তাঁর 'প্রতীকোৎসারী ধ্যান' প্রায়শই যে হয়ে ওঠে 'রূপকে ব্যক্ত ধারণা', কিংবা 'উৎপ্রেক্ষার ব্যঞ্জনা'র তুলনায় প্রাধান্য পায় উপমার ব্যাখ্যান—কবিতা ধরে আলোচনা করে বিষ্ণু দে তা দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গ-মার্কিন আধুনিক কবিতারসমালোচনাও কোনখানে কীভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়, বিষ্ণু দে যথেষ্ট বিস্তারিত ভাবে তার আলোচনা করেছেন। বিশ শতকের আধুনিকতাকে যেভাবে বুঝতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—'বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গত ভাবে দেখা'—প্রশ্ন থাকে সেখানেও। কেননা নৈর্ব্যক্তিক সাধনার বিষয়েও মানুষের থাকতে পারে ব্যক্তিগত আসক্তি। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি যখন নিষ্ক্রিয় নয় নিছক, যখন তা দেখার বিষয়টির মধ্যে পরিবর্তন আনতে চায়, তখন সে দৃষ্টি মমতাময় হয়ে উঠতে বাধ্য। আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির এই মমতার দিক, বেদনার দিক রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন নি। একটা 'আভ্যাসিক বাধা',—বিষ্ণু দে-র ভাষায়, রবীন্দ্রনাথ বোধ করতেন 'জটিল আধুনিক জীবনের জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পসাহিত্যের জগতের তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বময়তার নির্ভীক অন্তর্মুখিতা তথা বেশভূষাহীন দুঃসাহসিক বহির্মুখিতা পরিগ্রহণে'। এ বাক্যে লক্ষ করা উচিত, শুধু বহির্মুখিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের বাধা ছিল বিশ শতকের দ্বন্দ্বময় অন্তর্মুখিতার অনুধাবনেও; বিশ শতকের আধুনিকতায় রবীন্দ্রনাথ যে দেখেছিলেন 'বিষয়ের আত্মতা'—সে দেখার অসম্পূর্ণতা এইখানেই নির্দেশিত হয়।

এইভাবে, রবীন্দ্রনাথকে 'আধুনিকতার মৌলিক প্রতিনিধি' বলে জেনেও তাঁর নির্দিষ্টতার দিক নির্দেশ করতে বিষ্ণু দে রীতিমতো আগ্রহই বোধ করেন। তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র সম্বন্ধেরও একটা দ্বান্দ্বিক দিক আছে। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে এঁদের অগ্রজ কবি, আবার সতীর্থ কবিও। একদিকে এঁরা দেখেন শাশ্বত কবিকে, অন্যদিকে না দেখে পারেন না সাময়িক কবিকেও। পূর্বসূরী হিসেবে যে রবীন্দ্রনাথকে চিনেছেন

বিষ্ণু দে, তাঁকেই তিনি বরণ করেন 'আধুনিকতার অগ্রদূত' রূপে। কিন্তু সতীর্থ কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে বুঝলেন না তাঁদের, আধুনিক কবিদের মানস-জগতের সঙ্গে তাঁর যে রইল অনপেনয় ব্যবধান, সে সম্বন্ধেও স্বভাবতই সচেতন থাকেন বিষ্ণু দে। 'চণ্ডালিকা'তে প্রকৃতিকে তাঁর মা বলেছিল—'আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে'। বিষ্ণু দে সে কথাকেই একটু রূপান্তরিত করে লেখেন —'বাছারে, বুঝি না তোকে মেয়ে/আমাদের মাঝে যায় কোন নদী বেয়ে/ কালের পাহাড় তুলে ধয়ে।' রবীন্দ্রনাথ যে বিষ্ণু দে-র মতো আধুনিক কবির ভাষা বুঝতে পারেন নি, তার কারণ কি মাঝখানের ঐ অনুত্তীর্ণ নদী, কালের পাহাড়ই নয়? বিষ্ণু দে-র মতো রবিভক্তের রবীন্দ্রালোচনাতেও তাই দ্বিধার সুর জড়িয়ে থাকে, সাহিত্যের আধুনিকতার আলোচনায় বারবার রবীন্দ্রনাথের ছবির কথা বলতে হয়, বলতে হয় যে সাহিত্যের তুলনায় চিত্রশিল্পতেই 'রাবীন্দ্রিক আধুনিকতা'র পরিচয় স্পষ্ট।

এখানে অবশ্য লক্ষ করা উচিত, এলিয়ট কিংবা ভালেরি বা রিলকের মতো মালার্মেয়ানরাও বিষ্ণু দে-র বিচারে আধুনিক মনের সংকট-যন্ত্রণাকে ব্যক্তিসর্বস্বতার অতীত কোনো পরিণতি দিতে পারেন নি। পেরেছিলেন জার্মান দেশের কবি-নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট, আর 'রবীন্দ্রনাথের শিল্পী সাহিত্যিক মানবধর্ম বিচিত্র বহুরূপের জটিল বৃত্তের পূর্ণতা পেল এই কবিরই আধুনিকতায়।' বিষ্ণু দে-র এ অভিমত স্পষ্ট করে মার্কসীয় চেতনায় কোনখানে বরণীয় রবীন্দ্রনাথ। 'মানব ধর্ম' কীভাবে প্রবিষ্ট রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, 'মানবসমাজের বিশ্ব' কীভাবে 'করাঘাত করে চলে নলিনীর স্বপ্ন ভেঙে' —বিষ্ণু দে সেই নিরিখেই দেখতে চান রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর এই বীজগর্ভ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাবিচারের নতুন মান কিছু কিছু সূত্রাকারে রয়ে গেছে, যেমন : 'রবীন্দ্রনাথের মানসের নির্জন ও নিস্তব্ধ জায়গায় ব্যক্তি ও কবি অভিন্ন, যেমন অভিন্ন কবি ও কর্মী ও দেশসেবক,' এই সূত্রকে বিশদ করেন নি বিষ্ণু দে ; কিন্তু যদি কেউ এই সূত্র দিয়ে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে নতুনভাবে আলো ফেলতে পারেন, তবেই স্পষ্ট হবে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা কীভাবে পূর্ণতা পেতে পারে ব্রেশ্‌ট্‌-এর কাব্য-নাটকে মানুষের বিষঙ্গীকৃত সুখ-দুঃখের সার্থক প্রকাশে।

বিষ্ণু দে-র মনন মার্কস-এর দর্শন দ্বারা সেখানেই প্রভাবিত, যেখানে তা মানুষের সম্বন্ধসমূহ বুঝতে সাহায্য করে, কিংবা মানুষের শক্তির নির্দিষ্টতার দিক আর অসীম সম্ভাবনার দিক চেনাতে চায়। তাই আমাদের দেশের প্রধান প্রধান

বামপন্থীদের তথাকথিত 'মার্কসীয় বিতর্ক' থেকে অনেক দূরে থেকে মার্কসীয় চেতনায় রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ বুঝতে চাইলেন বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতাকে আজকের বাস্তবতায় যুক্ত করলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'বাম্নি' নামে যে ছোট মেয়েটি কবির দর্শনভাবনা উপস্থাপনার উপলক্ষ মাত্র, বিষ্ণু দে-র কবিতায় সে-ই হয়ে ওঠে কবির উৎকণ্ঠার লক্ষ্য ; রবীন্দ্রনাথের 'দামিনী'র 'মিটিল না সাধ'-এর আবেগ সঞ্চারিত হয়ে যায় বিষ্ণু দে-র কবিতায় শরীরী ভালোবাসার প্রাত্যাহিকতায়, রবীন্দ্রনাথের 'রাজার ছেলে রাজার মেয়ে'কে তাদের স্বপ্নমদির বিরহবিধুরতা থেকে বিষ্ণু দে নামিয়ে নিয়ে আসেন একেবারে মিছিলে-ধর্মঘটে, 'রাবীন্দ্রিক সুন্দরের সাধ'কে তিনি মেলাতে চান 'কৃষকের শ্রমসাধ্যে'।

একে বলব না রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা, এরই নাম ঐতিহ্যের রূপান্তর। আজকের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কি গ্রহণ করা যায় না ? 'হ্রদ'কে ভেঙে নামানো যায় না গঙ্গা ? যায়, যদি কোনো খণ্ড পরিচয়কে বড় না করে সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে পরিগ্রহণ করি, যদি শান্তি-উদ্গাতার পোষাকের পিছনকার শত অশান্তির আর্তনাদও শুনে নিতে পারি, যদি শুধু সুষমার স্রষ্টারূপেই তাঁকে না দেখে দেখি তাঁর রুদ্র রূপও :

> 'তেমনি একদা ভেবেছি যাঁকে অলৌকিক আকুতির অচিন্ত্য প্রতীক,
> অনেক গেয়েছি একবাক্যে সেই সুরে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে
> আজ দেখি সে প্রতিভা অপার্থিব ক্রন্দসী-নন্দিত, সেই জানে আনন্দ-ভৈরবী
> ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গায় পদ্মায় রুদ্র সাধনার মেঘ রৌদ্রে, হাঁকে ধিক ধিক।
> দিগ্বিদিক উন্মুখর বাংলার বা সভ্যতারই সংকটের মানবিক পরিত্রাণে
> ক্লান্তিহীন দীর্ঘায়ুর শ্রমোত্তীর্ণ গানে।'

বিষ্ণু দে-কেও বলা যায় অস্তিবাদেরই কবি ; যদিও রবীন্দ্রনাথের ধরনে, ততটা সরলরেখায় চলন নয় সে অস্তিবাদের ; সব কিছুই 'দূষিত ভঙ্গুর' বুঝে নিয়েই তিনি বলেন—'তবুও চঞ্চল দৃষ্টি, বাঁচি, সুদূরের তবুও পিয়াসী / অনাহত স্বস্তি খুঁজি !' তাই তাঁর আশা—'নৈরাশ্যের পারাপারে ক্ষয়হীন আশা'। একদিকে রণপা-র লাথি আর গুপ্তি হানা হিসাবে পণ্য বিকিয়ে যেতে দেখেন তিনি, সেইসঙ্গে অন্যদিকে—'অথচ প্রকৃতি রবিদীপ্ত স্বপ্ন গান জ্ঞান / চিরকাল যেন ঐ দুয়ারে বা বাগানে প্রস্তুত।' প্রকৃতি কিংবা রবীন্দ্রনাথকে ভর করেই

নিরাশ্বাস থেকে বাঁচতে চান এই কবি, কখনো বা তাঁর কাছে এক হয়ে যায় এই দুই-ই—'যেন বা আবিশ্ব এই প্রকৃতিই রবীন্দ্র-সাধনা'।

আর এইভাবে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে বিষ্ণু দে-র এই অঙ্গীকার—'জ্ঞানে-অজ্ঞানে চেতনার নীলে আমরা রাবীন্দ্রিক যে।'

১. 'এখন এর ভাবের ও ভাষার শুভমিলনটা ধরা পড়ল।' —এই লাইনটি ব্যবহার করা হয়তো বা আইনসঙ্গত নয়। কেননা 'গত'-র আলোচনা করে অমিয় চক্রবর্তীকে যে চিঠি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাতে লাইনটি লিখে তার উপর একটিমাত্র রেখা টেনে কেটে দিয়েছেন। চিঠিটি যখন 'প্রবাসী'তে ছাপা হল, তখন কিন্তু এই লাইনটিই বাদ গেলনা শুধু, রবীন্দ্রনাথের 'চোরাবালি' কবিতা বিষয়ে মন্তব্য আমূল বদলে গেল। কে করলেন এই বদল? রবীন্দ্রনাথ নিজেই? তবে তো রবীন্দ্রনাথের যে কোনো সাহিত্যিক মতামতই মূল্যহীন হয়ে পড়ে! পাণ্ডুলিপির অংশটুকু এরকম: 'যেমন বিষ্ণু দে-র চোরাবালি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য। ঐ বইটি এবং নামের কবিতাটি পড়েছি। ঠিক মতো বুঝতে পারি নি। কিন্তু নিজের মনের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে সুধীন্দ্রনাথের মতো অভিজ্ঞ সমজদারের প্রশস্তিবাদ উড়িয়ে দিতে পারিনি। মনে ভাবি তিনি এখনকার কালের যাচাইখানা থেকে যে কষ্টিপাথর পেয়েছেন সে আমার জানার মধ্যে নেই। তাঁর নির্দেশমতো বোঝাবার চেষ্টা করলুম, এবং বোধ করি বুঝেছি। [এখন এর ভাবের ও ভাষার শুভ মিলনটা ধরা পড়ল।] বিষ্ণু দে-র কবিতার সৌন্দর্য সুধীন্দ্র যথাযোগ্যভাবে দেখিয়েছেন...।' চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের ১১ নম্বর 'চিঠিপত্র'-র ১১১ সংখ্যক চিঠি।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯১৪-র একটি গল্প

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনায় 'নবজাগরণ' ধারণাটি, নিদেপক্ষে শব্দটি, যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যাঁরা এ ধারণার সমর্থক তাঁরা তো বটেই, যাঁরা মনে করেন, এ ধরণের ঘটনা আদৌ ঘটেনি, বরঞ্চ উল্টো প্রতিক্রিয়াই ঘটেছিল, তারাও এই ধারণার বৃত্তেই ঘুরপাক খান। সবরকম প্রচলিত ধারণার বাইরে এসে দেখবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা বোধহয় ভারতীয় অবসন্নতায় লুপ্ত। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে এ 'নবজাগরণের সর্বোত্তম ফসল বা সর্বাপেক্ষা খারাপ পরিণতি' এ কথাও স্বতসিদ্ধর মতোই দেখা যায়। অথচ শতাব্দী ব্যাপী ঔপনিবেশিক যে সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে ওঠে তবে এক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিরুদ্ধেই এক প্রথম প্রতিবাদ, আর যেহেতু ঐ সাংস্কৃতিক কাঠামোটি থেকে শিথিল হওয়া তো দূরের কথা, ১৯৪৭-এর পর আরও বদ্ধমূল হয়ে আমাদের অস্তিত্বে কেটে বসছে, সেহেতু যে কোনো দেশজ বৈপ্লবিক ভাবনার সূত্রপাতই যে কেবল তাঁর হওয়ার কথা তাই নয়, বিপ্লব পর্যন্ত তো বটেই তার পরেও তিনিই আমাদের পরম্পরার সর্বাপেক্ষা বড সহযোগী। আমাদের ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি কলকাতা, যৌবনেই রবীন্দ্রনাথ এ শহর ত্যাগ করেন, স্থায়ীভাবে আর আসেননি, যদিও এ শহরের তাঁর মৃত্যুটা প্রায় প্রতীকীই। পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক শিকড়ে, বীরভূমের শুষ্ক রাঢ়ভূমির বিপরীত প্রাকৃতিক ভিতেই বেঁধে নেন নিজের জীবনের লড়াইয়ের তারটিকে। প্রথমাবধিই এই লড়াইকে গ্রহণ করেন সচেতন আত্ম-আবিষ্কারের ক্ষুরধার পথ ধরে, আর লড়াইটা যেহেতু কোনো সক্রিয় ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন বা ভোটে জেতার ব্যাপার নয়, অর্থনীতি-রাজনীতির নাগপাশ থেকে জাত সমগ্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তাই তাঁর অগ্নিসংগ্রাম জটিল, বহুমাত্রিক। মহাশিল্পীর এ লড়াই ঈসথেটিক আপাদমস্তক : বাস্তবমাটিতে পা রেখে এই নান্দনিক লড়াই ক্রমপ্রসারমাণ ; যৌবনেই তিনি জেনে গিয়েছিলেন নিজ অস্তিত্বের

দেশের, সত্তার কোন পূর্বনির্মিত আদরা নেই—ধনতান্ত্রিক সমসাময়িক ইয়োরোপ, প্রাচীন ভারতবর্ষ কোনটাই আনতে পারবে না অবসন্ন ভারতীয়ের বিষাদ থেকে মুক্তি। এ বিষাদ এ যন্ত্রণা থেকেই তাঁর যাত্রারম্ভ, পূর্ববঙ্গে-বীরভূমে স্বেদাক্ত জীবনের মাঝখানে আসা; চতুর্দিকের পরিকীর্ণ অন্ধকারের দমবন্ধ হওয়া পরিবেশে নিজেকেই নিজে দাঁড় করান: তবু শূন্য, শূন্য নয়-এর প্রেম-প্রকৃতি-সমাজের বজ্রঘোষণায়—দ্বান্দ্বিক চৈতন্যের আকাশে নিজের লড়াইকে বাঁধতে পারে বলেই আত্মহত্যার ইচ্ছা, অন্ধকারের নির্মম উপলব্ধি সত্ত্বেও ঝড়কে অতিক্রম করতে চান, দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চান ঔপনিবেশিক কাঠামোর বাইরে। তাঁর জীবনেতিহাস এই লড়াইয়ের ইতিহাস: যে মূল্যবোধ অর্জিত হয়েছে ঔপনিবেশিক দেড় শতাব্দীতে, তার সবটিকেই চূড়ান্ত আঘাত হেনেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের সপ্তপর্বে। তাঁর ব্যক্তিগত উক্তিও এই সূত্রে বিবেচ্য, গানের অমর্ত্য সৌন্দর্যও চতুষ্পার্শ্বের ঔপনিবেশিক ক্লিন্নতার প্রতিবাদ, প্রবন্ধের যুক্তিও তাই, ছবির উল্লাস আলো-অন্ধকার অবসন্ন অস্তিত্বের পিঠে চাবুক, উপন্যাস-গল্পের সংযুতি বা স্ট্রাকচার ও আমাদের স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নেওয়া ঔপনিবেশিক মূল্যবোধগুলিকে চিরে চিরে দেখায়। যে সব বিষয়ে আমরা প্রশ্ন তুলি না, জীবনের অঙ্গ হিসাবে ধরে নিই, 'বাস্তববুদ্ধির' কাজ ভাবি, রবীন্দ্রনাথ দেখান প্রশ্নহীন এক সংস্কৃতি-জাত এরা; ১৯৮০-দশকেও এ মূল্যবোধ সমান দাপটে আছে। ব্যক্তি হিসাবে, সমূহর সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে এই কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই করা ও তার বাইরে বেরিয়ে আসার কথা, আবার না আসতে পারার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফিকশনাল জগতে এঁকেছেন। ব্যক্তির ওপর তাঁর গুরুত্ব দেওয়ার কারণ ছিল, সামূহিক উৎক্ষেপে এখানে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে কিন্তু তা বারবারই ঔপনিবেশিক কাঠামোতেই অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। মানুষ বা ব্যক্তি হতে পারে নি—এটি ইয়োরোপীয় বুর্জোয়া ধারণার ব্যক্তি নয়, এ ভারতীয়-বাস্তবের ইতিহাসের ব্যক্তি, প্রকৃতি-সমাজ-মানুষের ত্রিমাত্রিক সংযোগে ঐতিহাসিক।

এই ব্যক্তি হয়ে ওঠার 'গল্প' রবীন্দ্রনাথ অনেকবার বলেছেন, তারা আবার হতে পারল না, তাও দেখিয়েছেন। বাস্তবের অসম্ভব জটিলতার মর্মভেদী রূপায়ন এরা। ১৯১৪-র উপন্যাসে ও গল্পে এই থিম বারবার এলো: তারই একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ 'হালদার গোষ্ঠী'। প্রথম পাঠে মনে হতে পারে সামন্ত পারিবারিক বন্ধনের শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে বনোয়ারিলালের

প্রতিবাদই বুঝি গল্পটির বিষয়। মোটাদাগে গল্পটি তাই। কিন্তু গভীর স্তরে, লেখকের রেটরিকে-উপমায়, বনোয়ারিলালের চরিত্রকল্পনায়, সামগ্রিক-ভাবে গল্পটির সংযুক্তিতে আরও অনেক মাত্রা যুক্ত হয়।

লেনিনের তিনটি প্রবন্ধের ইউটোপিয়ার বিশ্লেষণীবর্গের সঙ্গে গ্রামসি হিগেমনি ধারণার সংশ্লেষণে ভারতীয় ঔপনিবেশিক ইতিহাসে জাতীয় প্রতিক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড অনুধাবনের এক কার্যকর আদরা নির্মাণের চেষ্টা কেউ-কেউ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি হয়ে এশীয় সমাজগুলির যে জাতীয় জাগরণ, আলোড়ন তা, লেনিনকে অনুসরণ করে দুই ইউটোপিয়ার দ্বন্দ্বের আলোকে দেখা যায়ঃ নারোদবাদী ও লিবারেল ইউটোপিয়ার এই সংঘাতে খানিকটা শ্রেণীসংগ্রামের ধরনও আসে। যথাযথ শ্রেণীসংগ্রাম এটি নয়, কারণ মূল শ্রেণীগুলির অসম্পূর্ণ গঠন। সাম্রাজ্যবাদ ও ভূস্বামীশ্রেণীর শক্তি ছাড়া কোন কিছুই পূর্ণভাবে বিকশিত হয় না এখানে। আবার এদেরও মৌল, বনিয়াদী শ্রেণী বলা যায় না, গ্রামসির অর্থ অনুযায়ী সিভিল সোসাইটির ওপর কোন হিগেমনি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা, এদের ছিল না। এই শক্তি দুটি কখনই সেই সামাজিক উৎপাদনপদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে নি। যা এদেশে উৎপাদনের শক্তিগুলির প্রসারনের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

লেনিন নারোদবাদী ও লিবারেল ইউটোপিয়ার ধারণার মধ্য দিয়ে বিশেষত রাশিয়া ও সাধারণভাবে এশিয়ায়, কৃষকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছেন। লিবারেল ইউটোপিয়ার বিশ্বাস উন্নতি ঘটান সম্ভব শান্তিপূর্ণভাবে কাউকে আঘাত না করে শ্রেণীসংগ্রাম ব্যতিরেকে। আর নারোদবাদী স্বপ্ন নারোদনিক বুদ্ধিজীবীদের, ট্রুডোভিক কৃষকদের, এঁরা বিশ্বাস করতেন ভূমির নতুন ন্যায্য বণ্টনে মূলধনের ক্ষমতা ও শাসন ধ্বংস করা সম্ভব, মজুরি দাসত্ব দূর করা সম্ভব। লিবারেলদের ইউটোপিয়া রাশিয়ার মুক্তি প্রসঙ্গে বন্ধ্যার ইউটোপিয়া, আত্ম-স্বার্থপূর্ণ টাকার থলির ইউটোপিয়া—এ ইউটোপিয়া গণতান্ত্রিকচৈতন্যকে নষ্ট করে, নারোদবাদী ইউটোপিয়া নিশ্চয়ই সমাজতান্ত্রিক চৈতন্যের পক্ষে ক্ষতি-কারকই। তথাপি কৃষকমুক্তির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকা তার আছে। রাশিয়ার ইতিহাস থেকে লেনিন এশিয়ার অন্যদেশের ইতিহাসে চলে যান, বিশেষত সান-ইয়াত-সেন-এর চীনে এশীয় বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা তখনও অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে

আছে, আর এদের প্রধান সামাজিক সমর্থক কৃষকেরা। চীনা নারোদবাদে মিলে যায় এক সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন, ধনতান্ত্রিক পথ পরিহারের চেষ্টা এবং আমূল কৃষিসংস্কারের পরিকল্পনা, কার্যসূচি।

আমাদের ইতিহাসেও এই দুই ইউটোপিয়ার উপস্থিতি দেশ-কালের বিশেষ চাপে বিশেষরূপে লক্ষণীয়। রামমোহন ও ব্রাহ্মধারা লিবারেল ইউটোপিয়ার ভারতীয় দৃষ্টান্ত: দেশবিচ্ছিন্ন যুক্তিবাদের চর্চায়, বৃটিশ উপ-নিবেশের কাঠামোয় তাঁদের দেশভাবনায় গণতান্ত্রিক চৈতন্যই ঢাকাই পড়ে, অন্যদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দদের প্রচেষ্টায় নারোদবাদী পেটিবুর্জোয়া স্বপ্ন থাকে। এখানে, যে কোনো ভাবেই হোক, সাধারণ মানুষ কৃষক সাধারণের সঙ্গে রেটরিকে, ভাষায়, এমনকি মুক্তি-কল্পনায় সংযোগরচনার চেতনার ক্রিয়াশীলতাই একদম যে নেই তা নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই উভয়বিধ ইউটোপিয়াই এড়াতে চান, তাঁর অল্পবয়সের সাধনার প্রবন্ধগুলোতেই যার প্রমাণ। বরঞ্চ চীনাদের মতো, সান ইয়াৎ সেনদের মতো এক সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন ও আমূল কৃষিসংস্কারের বাসনা তাঁর মধ্যে থেকেই যায়, জমিদারী ক্ষমতা হাতে পেয়ে হাতে কলমে যেটা করতেও চান। আর মাও-দে-জঙ্‌-এর নব্য গণতন্ত্রের প্রোগ্রামের ভিত্তি যে খোলাখুলিভাবে সানইয়াৎ সেনেরই তিন নীতির সংশ্লেষণ ও ধারাবাহিকতা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক পরিকল্পনা বা কর্মসূচির মতো করে নিশ্চয়ই বলেন নি; কিন্তু তাঁর ক্রমবিকাশে এই ভাবনাই যে ক্রমশ শিকড় ছড়াচ্ছিল তার প্রমাণ ১৯৩০-এর দশকের তাঁর স্পষ্ট উক্তিগুলি, রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় তাঁর উচ্ছ্বাস কোনো ক্ষণ-উত্তেজনা নয়, আজীবন অন্বিষ্টকে দেখতে পাওয়ার গভীর আলোড়ন। এর সঙ্গে আমাদের দেশে মৌলশ্রেণীগুলির বিকাশের অসম্পূর্ণতা, সিভিল সোসাইটির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার নির্দিষ্ট না-প্রচেষ্টারও প্রতিফলন প্রায় সচেতনভাবেই তিনি করেন তাঁর গল্পে, উপন্যাসে। শুধু যোগাযোগেই নয়, চার অধ্যায়ের সীমিত তীব্রতাতেই এই ঐতিহাসিক বোধ সক্রিয়, শ্রেণীর পঙ্গু বিকাশেই আসে সন্ত্রাসবাদের গলিপথ, সাহস ও আত্মোৎসর্গের স্মরণীয় দৃষ্টান্তও পথ হারায়।

'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে ইতিহাসের এই গভীর প্রক্রিয়ারই আভাস আসে নানা ভাবে। গল্পটির আরম্ভটি তাৎপর্যপূর্ণ: 'এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমে গোল বাধিবার কোনো সংগত কারণ ছিলনা। অবস্থাও স্বচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে। কিন্তু তবুও গোল বাধিলে।' পরিবারটির একক থেকেই

গল্পটি শুরু, মানুষগুলো মন্দ নয়, এ সংবাদে আয়রনি আছে : এই মন্দ না হওয়া, আমাদের মূল্যবোধে যাদের স্বতঃসিদ্ধভাবে ঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তাদের মানদণ্ডে। কারণ পঞ্চম অনুচ্ছেদেই এই পরিবারের মূর্তিমান 'অসংগতি' বনোয়ারিলালের পিতার পরিচয়ে লেখক এভাবে দিচ্ছেন : 'তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমানুষি চাল। যে সমাজ তাঁহার, সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং সমাজের হাতে-পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম করে চলে ফেরে, তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটির, কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া বিরাজ করেন।' গল্পের সাক্ষ্য অনুযায়ী মনোহরলাল ভূস্বামী ও মহাজন। এই শ্রেণীও যে নির্দিষ্ট কোনো হিগেমনি সৃষ্টি করতে অপরাগ এবং অনিচ্ছুক উপরের ছত্র কটিতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে—অথচ এ দেশীয় অন্যতম 'মৌর্যশ্রেণী' এরা। 'সমাজের হাতে-পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না' এই বাক্যে এই পঙ্গুতার কথাই, ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন না করার সত্যই ধ্বনিত। আর এই অষ্টাবক্র সমাজেই পাওয়া যায় এমন মানুষ যাদের সেবা করাই ধর্ম : 'তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষম মানুষকে চায় যে লোক নিজের ভার ষোল-আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের কাজে কোনো সুখ পায় না ;...ইহারা যেন একপ্রকারের পুরুষ মা ; তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের। মনোহরলালের যে চাকরটি আছে, রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহ রক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাবুর নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁপাইতে রাজি আছে।' বাইরের লোক অনেক সময়ভাবে, মনোহরলাল বুঝি তার সেবককে অনাবশ্যক খাটাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ অসম্পূর্ণ শ্রেণীগত বিন্যাসের ছবিটিকে আর-একভাবে এঁকেছেন—মনোহর-রামচরণের সম্পর্ক বাস্তবত শোষক-শোষিতের হলেও মানসিকভাবে নয়। মনোহর ছাড়া রামচরণের কোনো অস্তিত্ব নেই, আবার রামচরণ ছাড়া মনোহরের পরশ্রমজীবী অস্তিত্ব পঙ্গু। 'পুরুষ-মা' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ : মা-ছেলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন যুক্তি, নিপীড়ন, কষ্টর প্রসঙ্গ অর্থহীন, এ ক্ষেত্রেও তাই। আর মনোহররা রামচরণদের বাঁচাচ্ছে না, রামচরণরাই মনোহরদের ধরে রেখেছে : সমাজের এই স্থাপত্যটি রবীন্দ্রনাথ

ধরেন চমৎকার ভাবে। অন্যদিকে সম্পত্তি-রক্ষার জন্য আর এক সেবক তাঁর আছে নীলকণ্ঠ: 'বাবুর ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের দ্বারে সে মূর্তিমান দুর্ভিক্ষের মতো পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের, কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠের।' এই উদ্ধৃতিটির প্রথম বাক্যের উপমাটি তাৎপর্যপূর্ণ। নীলকণ্ঠের আব্রুহীন অস্থিকঙ্কালের দেহের সূত্রেই এই চিত্রকল্পটির লেখক আনেন, কিন্তু মনোহরলালদের বিষয় তো সারাদেশ দুর্ভিক্ষের মতোই পাহারা দেয়। 'মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে, নীলকণ্ঠ সুযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু, সেজন্য তাহার প্রতি তাঁহার কোন অশ্রদ্ধা নাই। কারণ, আবহমান কাল এমনিভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অনুচরগণের চুরির উচ্ছিষ্টেই তো চিরকাল বড়ঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই ; মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে।' তৃতীয় বাক্যটির মানদণ্ডেই মানুষগুলি মন্দ নয়। বাবু ও অনুগতর সম্পর্কের সূত্রে এই চুরি, দুর্নীতি, এতেই ব্যবস্থার মূল-চরিত্রটি স্পষ্ট : পুরুষ-মা রামচরণের নিঃস্বার্থ সেবার পাশে নীলকণ্ঠের সেবার বিরোধী দৃষ্টান্তে ভূস্বামী শ্রেণীর পঙ্গু বিকাশ, কর্তৃত্বসৃষ্টির অপারগতার তাৎপর্যের সঙ্গে আনেন লেখক।

এই কাঠামোর মধ্যেই আছে বনোয়ারিলালের ভাই বংশী। সে, 'যাহাকে বলে, অত্যন্ত ভালোবেসেছিল। এই পরিবারের মধ্যে সেই কেবল দুটো একজামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া তাহার অন্তরের কিছু জমা হইতেছে কিনা অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই। এই ফাল্গুনের সন্ধ্যায় তাহার ঘরে জানালা বন্ধ। ঋতুপরিবর্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র নাই।' দুটো পাস করে হালদার গোষ্ঠীর জীবনে নতুন কাজ বংশী করেছে, কিন্তু সে এই পরিবারের একাত্ম ঃ এর বিকার, দুর্নীতি, মূল্যবোধ সবকিছুই সে পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছে। পরীক্ষায় পাস কোন প্রশ্ন, কোন ব্যক্তিত্বর জন্ম দেয় নি। নীলকণ্ঠের হাতে বিষয়ের চাবি, তাকেই প্রসন্ন রাখা তার একান্ত দরকার। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় মেরুদণ্ডহীন ভালো ছেলেদের যে উদ্ভব, তাদেরই একটি দৃষ্টান্ত বংশী, যারা এখনও আমাদের সমাজের ভালো ছেলে, কূপমণ্ডুক কেরিয়ার তৈরির পঙ্কে নিমজ্জমান। দু-একটা পাশ করেও এর পরশ্রমজীবী অস্তিত্বের বাইরে আসে না।

এই সমগ্র পরিবেশেই মূর্তিমান অসঙ্গতি, মত্ত-হস্তী বনোয়ারিলাল। প্রচণ্ড প্রতিবাদও বটে। তার প্রধান শখ তিনটি: কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃতচর্চা। লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। হৃদয়টা তার বড় কোমল। 'তাহার হৃদয়ে যেন একটা লালন করিবার ক্ষুধা আছে'—এই বাক্যটিতে ক্ষুধা ও লালন শব্দ দুটি গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষুধা না থাকলে বনোয়ারির মতন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে না। তার তিনটি শব্দের কোনটাই বিষয়বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। দৈহিক শক্তির আধারেই শিকারের অ্যাডভেঞ্চারেরই ঝুঁকিতেই আসে সৌন্দর্যময় জীবনের উপলব্ধি। লালন করার ক্ষুধার অর্থই, নিজস্ব হিগেমনি রচনার আকাঙ্ক্ষা: মনোহরলালের সম্পূর্ণ বিপরীত এই মানসিকতা। রামচরণ ও নীলকণ্ঠর দুটো থামের ওপর তার অস্তিত্বের বাড়িটি দাঁড়িয়ে নেই। শক্ত হাতে সে চুরমার করে, বাধাকে পেরিয়ে সে এগোতে চায়। শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠীর সীমা ভেঙ্গে সে প্রায় নিরুদ্দেশই হয়ে যায়, এই ভেঙ্গে বেরিয়ে পডাটাই গল্প। লড়াইটাই বিষয়।

বনোয়ারির এই লড়াই ও লালনেচ্ছা পরিবারের মধ্য থেকেই আরম্ভ হয়। মনে রাখতে হবে ১৯১৪-তেই রবীন্দ্রনাথ 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র', 'বোষ্টমী'র মতো গল্প লেখেন। হালদার গোষ্ঠীতে 'স্ত্রীর পত্র'রই থিম—'স্ত্রীর পত্রে' মেজ বৌ মৃণালের ব্যক্তি হয়ে ওঠার বিষয়টি, পুরনো অভিজ্ঞতার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বাহিনী বিবৃত; এখানে হালদার গোষ্ঠীর বড় ছেলে বনোয়ারিলালের ব্যক্তি হওয়া, নিজ সত্তায় স্থিত হবার চেষ্টার কথা। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কাছে নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতা বিশেষ নারীঅর্থে আসে নি, ব্যক্তির সামগ্রিক সত্তা আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা লাভের প্রশ্নটিই বড় ছিল।, 'তোমার চরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল'-এর মাঝখানের শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। বনোয়ারিলালও হালদার গোষ্ঠীর পরম্পরাগত পারিবারিক আশ্রয় অভিজ্ঞান ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। 'এইবার মরেছে মেজো বউ'—এই ঐতিহাসিক বাক্যটিতে এক যুগান্তরের ইঙ্গিতই বাজে, বনোয়ারির গৃহত্যাগেও তাই। আবার বনোয়ারির বিপরীত চরিত্র হৈমন্তীর 'আমি'। রবীন্দ্রনাথ জীবনের, ইতিহাস সমাজের জটিলতাকে এড়িয়ে যান না কখনোই—১৯১৫-র 'চতুরঙ্গে'ই ননিবালার এপিসোডে যেখান রহস্যময় জীবনে মুক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্ন বড়ই গূঢ়, বাইরের সংস্কারপ্রচেষ্টা অসহায়, অর্থহীন। সেই রকমই 'স্ত্রীর পত্র'-রচনার এক বছরেই হালদার গোষ্ঠীর কিরণ লথার চরিত্রটি অনেক, যে স্বাধীন অভিজ্ঞান চায় না,

হালদারগোষ্ঠীর বউ হয়েই থাকতে দেয়, স্বামীর প্রচণ্ড বিদ্রোহে ব্যক্তিক উৎক্ষেপে সঙ্গী হতে পারে না। আর বনোয়ারির জীবনের পরীক্ষা এই কিরণলেখাকে দিয়েই শুরু।

উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সৌন্দর্যবোধের নন্দনতত্ত্বেরও এক পরীক্ষা এটা। বনোয়ারির ব্যক্তি হয়ে ওঠার কাহিনী সমগ্র ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বিরোধী : এই সংস্কৃতি জীবনমুখী সৌন্দর্যকে চুরমার করে। বনোয়ারি শুরু করে এই সৌন্দর্যের সাধনা থেকেই। সবশুদ্ধ জড়িয়ে বড় স্বল্প কিরণলেখা। 'বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যখন তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত পরমাণু। রসায়ন শাস্ত্রে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন, বিশ্বঘটনায় অণুপরমাণুগুলির শক্তি বড়ো কম নয়।' পরমাণুর এই উপমায় বনোয়ারি ভালোবাসা ও সৌন্দর্যবোধের শক্তির কথা বোঝা এ-ঠিক ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তর দুর্বল প্রেম-বিভাব নয়, এ প্রচণ্ড এক পুরুষের সৌন্দর্য আবিষ্কার, যা আসলে চতুর্দিকের পরিকীর্ণ তুচ্ছতার প্রতিবাদ। 'কিরণের যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু পুরুষের তো এমন সহজ সুযোগ নয়, পৌরুষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাঁহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুষের ভালবাসা ম্লান হইয়া থাকে। আর ধন একটা শক্তির নিদর্শন, হালদার গোষ্ঠীর বিষয়ের পাহারাদার নীলকণ্ঠ এখানেই বনোয়ারিকে বাদ সাধে।' হয়তো একদিন ধনসম্পদ তার কাছে অবাধ হবে—'কিন্তু যৌবন কি চিরদিন থাকিবে?' বস্তুর এই জীবনকে উপভোগ করার উত্তপ্তবাসনা কিন্তু 'ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ, তাহা এককে বহু করিবার আনন্দ।' কিরণলেখার সূত্রেই এই জীবন রচনা করা শেষ পর্যন্ত এক সমাজ রচনার লড়াইয়ের ব্যক্তিগত প্রয়াসে পরিণত পায়, বলিষ্ঠ বাহুতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার আবেগ জাগে।

আর একটা প্রায় আকস্মিক কিন্তু নির্মম সত্য ঘটনার মধ্যদিয়ে বনোয়ারি হালদারগোষ্ঠীর সীমার বাইরে আসে। লিবারেল ও নারোদবাদ ইউটোপিয়ার বাইরে রবীন্দ্রনাথ যেতে চান—পারিবারিক ও সমাজের স্তরগত ধারায় রবীন্দ্রনাথ লিবারেল ইউটোপিয়ারই কাছাকাছি বরং নারোদবাদী ইউটোপিয়া থেকে দূরে। তিনি দেখেছিলেন নিজের মতো করে, এই দুটিই অবাস্তব শুধু নয়, ক্ষতিকারকও। নিজ অভিজ্ঞতায় কৃষকদের জীবন গভীর-

ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। কোন শর্টকাট সরলীকরণে যে মুক্তি আসবে না, একেবারে মূলে নির্মাণ কার্যের চেতনায় যে এগোতে হবে, এ বোধ তিনি অর্জন করেন প্রথমেই। বিমূর্ততত্ত্ব নয়, মহৎশিল্পীর অভিজ্ঞতায় সৌন্দর্যভাবনায় মূর্ত মানুষ অন্বেষণের অভিযানে তাই তাঁকে বারবার সরে আসতে হয়েছে ঔপনিবেশিক বাস্তব থেকে, রাজনীতিনামক উত্তেজনার আগুন পোহানো থেকে, যেখানে কৃষকনামক বিরাট বাস্তবটি অপাংক্তের। বনোয়ারিলালের লড়াইটাও আসে বাস্তব একটা ঘটনার ধাক্কায় প্রায় একই সময়ে লেখা 'ঘরে-বাইরে'র পঞ্চুর এপিসোডের স্মৃতিবাহী এই ঘটনা, অবশ্যই ধরন-ধারন সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু মধু কৈবর্তর ঘটনাটি সত্ত্বেও বনোয়ারিলালের গৃহত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি আসে অন্য উপলব্ধি থেকে: 'তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, সেই তন্বী এখন তো তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হাল্‌দারগোষ্ঠীর বড়ো বউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলোও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভাল।' যে কিরণকে সে আনন্দে নির্মাণ করতে চেয়েছিল। সেই বিবরে বিন্যস্ত হল: হালদার-গোষ্ঠীর বড় বউ হয়ে উঠল। 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণালের বিপরীত ক্রিয়া। এই চূড়ান্ত আঘাতের সঙ্গেই যুক্ত আর এক নির্মাণের ব্যর্থতা—অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মধু কৈবর্তদের দাঁড় করানোর অসাফল্য। এই দুটিই এক সূত্রে বাঁধা—রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্ত সৌন্দর্যচেতনার একই প্রসঙ্গ এরা। মধু কৈবর্তকে মানুষের মর্যাদায় ভূষিত করা স্থূল সমাজ রাজনীতির ব্যাপার নয় শুধু, জীবনের সুন্দর নির্মাণও বটে। ঈসথেটিক স্ট্রাকচার অর্থে রবীন্দ্রনাথ এটাই গ্রহণ করেছিলেন: জীবনের লড়াইও সুন্দরের নির্মাণের লড়াই।*

ঋণের হালে বিপন্ন মধু কৈবর্তের পক্ষে দাঁড়িয়ে বনোয়ারিলাল প্রায় ভূমিকম্প ঘটিয়ে দিল হালদারের গোষ্ঠীতে মধুর স্ত্রী সুখদাকে কিরণলেখা যখন প্রতিকারের অক্ষমতার কথা জানাচ্ছিল তখন 'বনোয়ারীর বুকে শেলের মতো বিঁধলো' মাঘীপূর্ণিমা ফাল্গুণের সন্ধ্যাও বৃথা গেল—মধুকে বাঁচাবার এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করল বনোয়ারি। 'মধু কৈবর্তের দুঃখ দূর করিবার

*আর এই দিকটা না থাকলেই, আসে সঙ্কীর্ণ চরিত্রহীন ক্ষমতার ছেঁড়াছেঁড়ি. মার্কসীয় প্র্যাকসিসের আকাশও কোন ছ্যাঁচড়ামিতে পর্যবসিত হয় তার প্রমান তো আমাদের দেশে বহু।

ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের'—এই চিন্তা তাকে পাগল করে তুলল নীলকণ্ঠ পাকা গোমস্তা। সে মধু কৈবর্তদের শায়েস্তা করতে জানে আর "মধুকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিস্তর টাকা বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে।' বনোয়ারির পক্ষে কেউই নয়, না বংশী না মনোহরলাল। একক ব্যক্তির প্রবল বিস্ফোরণে প্রায় সবকিছু পণ করে বনোয়ারিলাল মধুকে বাঁচাতে এগিয়ে এল—সেই লালনেচ্ছা, নির্মাণ করবার প্রবল বাসনা পথ খুঁজে পেল। মধু কৈবর্ত শোষিতসাধারণের প্রত্ন প্রতিমা, বনোয়ারির চেষ্টায় "অ্যপাস্ত মধু বাঁচিয়া গেল' ও 'নীলকণ্ঠের জেল হইল।' বনোয়ারির চেষ্টাতেই যে এটা হল, কারুরই বুঝতে অসুবিধা হল না। রবীন্দ্রনাথ এখানে, বনোয়ারিকে একেবারে ভারতীয় বাস্তবের প্রত্যক্ষর কাছে নিয়ে যান। তার প্রথম রচনা করার আধার কিরণ 'তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক। এ কী কাণ্ড! বাড়ির বড়োবাবু—বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ। তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া! তাও এই এক সামান্য মধুকৈবর্তকে লইয়া।' এ বংশে নীলকণ্ঠরা বিষয়ব্যবস্থার দায় নেয় আর বড়বাবু নিশ্চেষ্ট হয়ে বংশ-গৌরব রক্ষা করে—বনোয়ারির বিদ্রোহে, নিজ পৌরুষের স্বাবলম্বনে এর বিপরীত ঘটল। বংশ-গৌরব নয়, তুচ্ছ মধুকৈবর্ত তার কাছে বড় হয়ে উঠল। কিরণের কাছে এটা পাগলামি, সে সংসারের আর সকলের সঙ্গে যুক্ত—বনোয়ারির প্রথম পরাজয় এখানেই ঘটল। পুরুষের শক্তির এই পরাজয়ই মধু কৈবর্তর ব্যাপারে তার অসহায় পরাজয়ের ভূমিকা নির্মাণ করে: ভবনে-ভুবনে তার পরাজয়। নীলকণ্ঠ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সবদিক বজায় রাখতে মধুকে কাশী পাঠায়; রটিয়ে দেয় তাকে পরিবার সমেত বলি দিয়ে গঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধরণের শ্রদ্ধা পূর্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।' মধুও নিরুপায় হয়ে এটা মেনে নিল; বনোয়ারির ধাক্কায় সে অনেকদূর এগিয়েছিল, কিন্তু সেটা নিজের দিক থেকে নয়। 'ঘরে বাইরের' পঞ্চুর অসহায় তা এখানেও স্পষ্ট। একক ব্যক্তির প্রবল সাহায্যে যুগান্তব্যাপী শোষণ অত্যাচারের জাল ছেঁড়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এটা বুঝেছিলেন: আর যাদের সাহায্য করা হয়, তারাও এক ব্যবস্থার আধার, আত্মসচেতনই নয়। বনোয়ারির সব প্রচেষ্টাই শেষে

ব্যর্থ হল। বস্তুত এর পর বনোয়ারির হালদার গোষ্ঠীর অন্তর্গত আর থাকে না, সে 'দেখিল, বংশী তাহার কেহনহে, সে হালদার গোষ্ঠীর। আর তাহার কিরণ···সেও হালদার গোষ্ঠীর।' এই তাহার ও হালদার গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের নিবাকরণ হয় না। বনোয়ারিকে তার বাবা সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করল। জীবন বয়ে যায়, কিন্তু অর্থহীন। বংশীর স্ত্রীর সন্তানকে সে ভালবাসে, 'যাহা কিছু ছোটো, অক্ষম, সুকুমার তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করুণা।' ওদিকে বংশী মারা গেল—বনোয়ারির উদ্দাম ভালবাসার হাত থেকে বংশের একমাত্র কুলপ্রদীপ বংশীর ছেলেকে রক্ষায় সকলে ব্যস্ত। অথচ বনোয়ারি তাকে পৌরুষদীপ্ত করে তুলতে চায়। মনোহরলাল মৃত্যুর সময় বংশীর ছেলেকেই সমুদায় সম্পত্তি দিয়ে গেল। নীলকণ্ঠর দয়ায় বনোয়ারি বাঁচতে চাইল না: দলিল চুরি করল, কিন্তু তাও বিধবার কুটিরের আগুন নেবাতে ফেলে গেল। ফিরে বংশীর ছেলের কাছ থেকে সেগুলি পেয়ে, তাকেই দিয়েছিল। তারপরই তাঁর গৃহত্যাগ, 'কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল। বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিল না। দেশশুদ্ধ লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক্‌ধিক্ করিতে লাগিল।'

১৯১৪-য় যখন ভারতবর্ষ ক্রমশ এক ক্রান্তিকালের সম্মুখীন হচ্ছে, তখন হালদার গোষ্ঠীর বড়বাবুর এই নিরুদ্দেশ যাত্রা, এই বনোয়ারিলাল হয়ে ওঠা, ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অসম্পূর্ণ শ্রেণীবিকাশের পটভূমিকায় দুই ইউটোপিয়ার কাটাকুটি খেলায় এই ব্যক্তির জেগে ওঠা, নিজের সত্তাকে চেনাই, আনতে পারে যথার্থ রিসরজিমেন্টার উল্লাসকে, নচেৎ আসন্ন ভারতীয় বিষাদ ক্রমশই গ্রাস করবে আমাদের, যেমন এখন করছে, রেনেশাস নামক এক মিথ্যা মরীচিকার স্বপক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিবিস্তার তারই এক লক্ষণ। মধু কৈবর্তদের বাইরে রেখে পাত্রাধার তৈলতৈলাধার পাত্রে সূক্ষ্ম তর্ক ভীষণ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের দেশে মধ্যবিত্ত শিকড়-হীন বিলাস—মার্কসবাদী ও অমার্কস-বাদী সবই এখানে এক নৌকায়। তাই প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের স্বেদাক্ত সৌন্দর্যের বোধ।

দাম ঃ বারো টাকা

পরিচয়

শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

পূর্ণ বিকশিত মানুষ

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই সব চির পঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কি করে ? ...আমাদের শিক্ষালয়ের নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগের হাওয়া রয়েছে যদি দেখতে পাই, তাহলে বুঝবো দেশের লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চললো।" কার্ল মার্কসের কথায়, ভবিষ্যতে শিক্ষার অঙ্কুর নিহিত রয়েছে সেই শিক্ষার মধ্যে, যে শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট বয়সের প্রতিটি শিশুর কাছে উৎপাদনী শ্রম, পঠন-পাঠন এবং শরীর চর্চাকে সংযুক্ত করবে, উৎপাদনে দক্ষতার বৃদ্ধির একটি উপায় হিসেবেই কেবলমাত্র নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে বিকশিত মানব সৃষ্টির একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে।

এ যুগে ইউনেস্কোর শিক্ষা কমিশনের বক্তব্য হল শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বসর্ত। কোঠারী কমিশনের মতে শিক্ষা সমাজ-পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। তাই, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার—

(১) সকলকে শিক্ষিত করার জন্য ;

(২) বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য ;

(৩) শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশকে সংযুক্ত করার জন্য ;

(৪) শারীর শিক্ষা, সৃজনাত্মক কাজ ও পঠন-পাঠনের সমন্বয় সাধনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ২৪৮০২ ( )। ৮১

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

এই সংখ্যার কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখনই একেবারে হঠাৎ গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের মৃত্যুর খবর এলো। সুবর্ণজয়ন্তীর এই পরিপূরক সংখ্যাটির প্রথম লেখাটিই তাঁর। মে-মাস নাগাদ এই লেখাটি মুখে মুখে বলে লেখাতে-লেখাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর আত্মীয়জন আমাদের জানিয়েছিলেন—এই রচনাটির শেষ তিন পৃষ্ঠা তিনি মুখেও আর বলতে পারেন নি, তাঁর কাছে শুনে রাখার স্মৃতি থেকেই কেউ লিখে নিয়েছেন। সম্ভবত সেই অসুস্থতাই মৃত্যুতে ঠেকল।

'পরিচয়' সম্পর্কে গিরিজাপতি বাবুর আত্মীয়তাবোধ ছিল প্রায় তুলনাহীন। যে-কাগজের সঙ্গে জন্মসূত্রে তাঁর সম্বন্ধ তার প্রতিটি পর্বে ও পর্বান্তরে তিনি ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে গেছেন। সে-সংযোগ শুধু আনুষ্ঠানিকতামাত্রই ছিল না। এমন-কি কখনো-কখনো ছিল প্রকাশ্য মতবিরোধিতাতেও প্রাণময়।

তাঁর জীবনে বৈষয়িক ব্যস্ততা ও সাফল্য আর সামাজিক স্বীকৃতি তো প্রথম থেকেই ছিল। যখন স্বাদেশিকতার সাধনা শিল্পোদ্যোগে সার্থক হতে চাইছিল সেই সময় তিনি তাঁর রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিলেন দৈনন্দিন প্রয়োজনের নানা দ্রব্য নির্মাণে। সেই উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের জন্যে তিনি বিদেশেও গেছেন। রবীন্দ্রসাহচর্যধন্য তাঁর সেই বিদেশবাস বাস্তব অর্থেই সার্থক হয়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে।

স্বদেশী কর্মোদ্যোগের যে-আবেগ তরুণ গিরিজাপতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল তারই আর-এক প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর মননকর্মে। বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ও অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের বন্ধু হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তিনি 'পরিচয়' প্রকাশের উদ্যোগ নেন ত্রিশের দশকের গোড়াতেই। তাঁর হাতে আঁকা 'পরিচয়' শিরোনামটি অনেকদিন ব্যবহৃত হয়েছে।

গত দু-তিন বছরে কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা তৈরির কাজে 'পরিচয়'-এর পুরনো সব কপি ভালো করে দেখা ও পড়ার সুযোগে গিরিজাপতিবাবুর প্রকৃত ভূমিকা 'পরিচয়'-এ কী ছিল তা যেন পরিষ্কার হল।

তখনকার সমকালীন বাংলা গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধের প্রায় একমাত্র সমালোচক ছিলেন গিরিজাপতিবাবু। প্রধানত ইংরেজি বইয়ের সমালোচনাপ্রবণ 'পরিচয়'-এ গিরিজাপতিবাবু ছিলেন উদ্যোগীদের মধ্যে প্রায় একক যিনি তাঁর সমালোচনা ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছিলেন মাতৃভাষায় রচিত সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বিচারে। সেদিনকার 'পরিচয়'-এ সেই সমালোচনাগুলি নিশ্চয়ই প্রধান রচনার মর্যাদা পায় নি। কিন্তু আজ পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে আমরা যখন সমগ্রতায় বিচার করতে বসি তখন হয়ত দেখি চাঞ্চল্যকর ইংরেজি বইয়ের মৌলিক সমালোচনাও নেহাতই কালক্রমে অবান্তর হয়ে গেছে কিন্তু সমকালীন সাহিত্য প্রসঙ্গে সেদিনের সেই আলোচনাগুলি আজও ঐতিহাসিক ও নান্দনিক কারণে প্রাসঙ্গিক। গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যায় ও সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত গিরিজাপতিবাবুর দুটি রচনাতেই আমাদের বক্তব্যের সাক্ষাত প্রমাণ হয়ত পাঠকরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন।

কিছুদিন আগে গিরিজাপতিবাবুর আত্মীয়জনেরা তাঁর রচনাগুলির একটি সংকলন প্রকাশের ইচ্ছে জানিয়েছিলেন। সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় সংকলিত পুস্তক-পরিচয়-এর বিবরণে তাঁর বহু লেখার হদিশও মিলল। শুধু তাঁর স্মৃতিরক্ষার কারণে নয়, আত্মীয়ের কর্তব্য বলেও নয়, বাংলা সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সমকালীন সমালোচনার ইতিহাস হিসেবেই গিরিজাপতিবাবুর রচনা-সংকলন প্রকাশ করা প্রয়োজন। এই সংকলন তৈরিতে 'পরিচয়'-ও তার সাধ্যমতো কাজ করে দিতে চায়।

গিরিজাপতিবাবুর মৃত্যুতে 'পরিচয়'-এর জীবন্ত ধারাবাহিকতার একটা বড় অংশ ইতিহাসে পর্যবসিত হল। তাঁর পরবর্তী যে-সহকর্মীরা 'পরিচয়'-এর দায়িত্বে আছেন ও থাকবেন সেই ইতিহাসকে জীবনের ধারাবাহিকতায় বহতা রাখার দায় তাঁদের ওপর বর্তাবে।

সম্পাদক, পরিচয়

নভেম্বর ১৯৮১, কার্তিক ১৩৮৮

স্বর্ণ জয়ন্তী পরিপূরক সংখ্যা

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

পরিচয় এর-পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য 'পরিচয়'-এর শৈশব

পরিচয়ের পূর্বতন সম্পাদক আমাদের স্নেহভাজন দীপেন্দ্রনাথ তার অকালমৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন পরিচয়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কিছু পরামর্শ ও একটি লেখা পাঠাবার জন্য। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে আমার সে উদ্যম চাপা পড়েছিল। বর্তমান সম্পাদকের অনুরোধে আবার সে চেষ্টায় উদ্যোগী হয়ে দেখছি আমার দীর্ঘদিনের অসুস্থতা ও অক্ষমতা সে প্রচেষ্টার পথে বড় অন্তরায়।

আমাদের প্রতিষ্ঠিত পরিচয়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যুগপৎ গর্ব ও আনন্দ বোধ করছি। স্বাভাবিক ভাবেই এ সময়ে পরিচয় প্রকাশের সূত্রপাত-কাহিনী ও তার সঙ্গে জড়িত বন্ধুদের কথা (যাঁরা অনেকেই আজ নেই) বিশেষ করে মনে পড়ছে।

আমার কিছু রচনায় তার বিবরণ থাকলেও এখানে তার পুনরুল্লেখ বর্তমান যুগের পাঠকদের কাছে বোধহয় অবান্তর হবে না।

১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন আমি এন্ডেয়ার দত্ত কোম্পানিতে আমার কামরায় বসে কাজ করছি। এমন সময় বন্ধুবর আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু একটি অসামান্য প্রিয়দর্শন যুবককে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন ও বললেন, 'গিরিজা, এর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। ইনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—কবি। বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ের বড় ছেলে। তোমার অপিস ঘরের পাশেই এর অপিস ঘর—লাইট অব এশিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানি। তোমার মতো ইনিও রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে সম্প্রতি য়ুরোপ ঘুরে এসেছেন। তোমার মতো কবিগুরুর ভক্ত ও একজন সাহিত্যরসিক। তোমাদের জমবে ভালো।' সত্যেন চলে গেলেন, সুধীন্দ্র নিজের অপিসে ফিরে গেলেন এই বলে, অপিস ছুটির পরে আসবেন ও একত্রে আমার গাড়িতে বাড়ি ফিরবেন। অপিস ছুটির অনেক আগেই তিনি এসে আমার ওঠার অপেক্ষায় বসে রইলেন ও পরে তাঁদের কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর

বসার ঘরে বসালেন। সুধীন্দ্র তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ও সদ্যক্রীত পারকোলেটার-এ তৈরি কফি পান করালেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অতীব সুন্দরী। স্বামী-স্ত্রী যেন যুগলবন্দী।

পরদিন থেকে শুরু হল তাঁর বাড়িতে সন্ধ্যাযাপন, বিশ্রম্ভালাপ, সাহিত্য আলোচনা ও ফটোগ্রাফি চর্চা। একদিন সুধীন্দ্র তাঁর নতুন রচনা 'অর্কেস্ট্রা' থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন। আমার মনে হল কবিতাগুলিতে আছে নতুন আস্বাদ। তাঁর কবিতার গাঢ়বদ্ধতা ও কঠিন সৌন্দর্য সহজেই আমাকে বিমুগ্ধ করল—মনে হল রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথের অনুবর্তন হলেও নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন এই কবি।

পরদিনের সান্ধ্য আসরে আমার 'প্যারিসে' বসে লেখা 'নৌকাডুবির প্লট' (রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র সমালোচনা, প্রবাসী ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়) পড়ে শোনালাম। তিনি বললেন, আপনার লেখা খুব ভালো হয়েছে; রবীন্দ্রনাথও আপনার লেখার তারিফ করেছেন। এরপরে তিনি একটি নতুন ধরনের পত্রিকা বার করবার প্রস্তাব করলেন এবং আমাকে তার সম্পাদনার ভার নিতে বললেন। আর বললেন আপনাদের সোসাইটিতে অ্যাংলো-গ্যালিক লেখকদলের কাছে এই নতুন কাগজের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিছুদিন পূর্বে ফ্রান্স-প্রত্যাগত এবং ফরাসি ভাষা ও শিল্পকলায় অনুরক্ত কয়েকজনকে নিয়ে এই সভা স্থাপিত হয়েছিল—যশোধন্য প্রমথ চৌধুরী ও ডক্টর প্রবোধ বাগচীর উদ্যোগে। এই সভা তখন ভেঙে গিয়েছিল। এছাড়া সুধীন্দ্র প্রস্তাব করেছিলেন, আমার বাল্যবন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায়কে আহ্বান জানাতে পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে অংশীদার হবার জন্য।

প্রথমেই আমি সুধীন্দ্রের সঙ্গে নীরেন্দ্রের যোগাযোগ করিয়ে দিলাম। নীরেন তখন বঙ্গবাসী কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক। তাঁর এমন খ্যাতি হয়েছিল যে অন্য কলেজের ছাত্ররাও তাঁর অধ্যাপনা শুনতে আসত। ক'দিনের মধ্যেই নীরেন হিরণকুমার সান্যাল বা হাবুলকে নিয়ে এসে হাজির করলেন। এছাড়া তিনি আনেন শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, বিষ্ণু দে প্রভৃতিকে। একে একে ডক্টর প্রবোধ বাগচী, ডক্টর সুবোধ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, হরিশ সিংহ, দাদা পশুপতি ভট্টাচার্য ও লক্ষ্ণৌ-এর ধূর্জটিপ্রসাদকে ডেকে আনলাম। যোগ দিলেন বুদ্ধদেব বসু, সুশোভন সরকার প্রমুখ। 'পরিচয়' প্রকাশের কিছুদিন পরে যোগ দেন আমার প্যারিসের বন্ধু মাহমুদ সুহ্‌রাবার্দি—কবি, নাট্যক ও আর্ট সমালোচক। কিছু পরের দিকে যোগ দেন হরীতকৃষ্ণ দেব।

কিছুদিন জল্পনা-কল্পনার পর নীরেন একদিন প্রস্তাব করেন, পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক করার এবং তিনি এর নাম দিতে চান 'পরিচয়'—নতুন নাম, যে নাম উপস্থিত সকলে গ্রহণ করলেন সানন্দে। (অনেকে বলেন 'পরিচয়' নামটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিবারের কারুর দেওয়া। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। 'পরিচয়' নাম নীরেন-এরই দেওয়া।)

সুধীন্দ্র প্রতি শুক্রবার তাঁর বাড়িতে পরিচয়ের বৈঠক ডাকতেন। বৈঠকের আগন্তুক সংখ্যা যখন বেড়ে গেল, তখন সুধীন্দ্রের বাবা বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায় নিজের বড় বসবার ঘরটি 'পরিচয়'-এর বৈঠকের জন্য ছেড়ে দিলেন ও পত্রিকা পরিচালনার ব্যয়ভার গ্রহণ করলেন।

সুধীনের যোগ্য সম্পাদনায়, সকলের ঐকান্তিক প্রয়াসে ও আমারই আঁকা প্রচ্ছদপটে শোভিত হয়ে পরিচয় আত্মপ্রকাশ করল ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে। দুর্ভাগ্যবশে পরিচয়ের প্রথম প্রকাশের সময় আমি দারুণ সংকটময় ব্যাধিতে শয্যাগত ছিলাম।

পরিচয়ের প্রথম সম্পাদকীয়, যেটি কোন নাম না দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তা নীরেনের লেখা। ঐই অতীব চমৎকার রচনাটির মধ্যে পরিচয়ের আদর্শ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছিল। আমি মনে করি পরিচয়ের শৈশবাবস্থা থেকে তার বর্তমান পর্যায়ে অনেক মৌলিক পরিবর্তন এলেও তার অন্তরে এখনও সেই সুর বর্তমান। সেই সম্পাদকীয়ের শেষাংশের কিছুটা তুলে দিচ্ছি:

'শুভদিনের আবির্ভাবকে ত্বরিত করিতে হইলে আজ মানুষের প্রধান কাজ—ভাষা-সংকটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগযুগ সঞ্চিত পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন-পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণ চিত্ততার বদ্ধগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ।

বাংলাদেশে 'পরিচয়' আজ এই ভারই লইতে চাহে। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী, কখনো মূলভাষার অনুসরণে আলোচনা করিয়া, কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া; কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া, কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ করিয়া। এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকেও 'পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া রাখিবে। কবিতা, কথা-শিল্প, নাটক, কলানুশীলন,

ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব—পরিশীলনের সকল বিভাগগুলিই যাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে, এ-বিষয়ে 'পরিচয়' সাধ্যমত চেষ্টা করিবে।...ইহাকে লালনের ভার পড়িল তাঁহাদের উপর—বাংলা ভাষার অতীতকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, বর্তমানকে দরদ দিয়া দেখেন ও ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসার সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশ্বাস অকুণ্ঠ।'

হীরেন্দ্রনাথ দত্তর লেখা 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ', বাংলাভাষায় সত্যেন বোসের প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানের সঙ্কট', সুশোভন সরকারের 'রুষ বিপ্লবের পটভূমিকা', বীরবলের লেখা 'পত্র', সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি', প্রবোধ বাগচীর 'বৌদ্ধ ধর্মের দান', সুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'শিল্পীর ব্যথা', ধূর্জটিপ্রসাদের 'প্রেমপত্র', হেমেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধীরকুমার চৌধুরীর কবিতাগুচ্ছ এবং নানা সমালোচনাতে পুষ্ট প্রথম সংখ্যা 'পরিচয়' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশিষ্ট পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নীরেন পরিকল্পনা করেছিলেন যে প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা থাকবে না। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর সুধীন্দ্র কবির কাছে এককপি নিয়ে যাবেন। পরিকল্পনাটি খুব সফল হয়েছিল। কবি নিজে থেকেই দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য সুধীন্দ্রকে লেখা একটি বড চিঠি পাঠিয়ে দেন। এছাড়াও এই সংখ্যায় কবিকৃত একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়—জগদীশ গুপ্ত প্রণীত ও যতীন্দ্র রায় প্রকাশিত 'লঘুগুরু' পুস্তকটির। পরেও একাধিকবার কবি পরিচয়ের জন্য রচনা পাঠিয়েছেন।

শীঘ্রই পরিচয় মননশীল পাঠক মহলে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করল। 'সবুজ পত্রে'র সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে যে নবযুগ শুরু হয়েছিল পরিচয়কে অনেকটা তার উত্তর সূরী বলা যায়। তবু সবুজপত্রের সঙ্গে পরিচয়ের পার্থক্য ছিল। পরিচয় উঠতি লেখকদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল। নতুন লেখকরা—যাঁরা মননশীল জনমানসের চোখে আসতে চাইতেন—তাঁরা অনেকেই পরিচয়ের শরণার্থী হয়েছিলেন।

এই সময়ের পরিচয়ে পুস্তক সমালোচনা একটি প্রধান অংশ নিত। পুস্তক সমালোচনা যে পত্রিকার একটি বৃহদাংশ জুড়ে থাকত কেবল তাই নয়—এর বিষয় বৈচিত্র্যও ছিল তেমনি বিস্তৃত। তখনকার আর কোনো পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা ঠিক এই ধরনের প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি। সমালোচনাগুলিতে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থাকত। অনেক নতুন লেখকের (যাঁরা পরে

সুবিখ্যাত হয়ে উঠেছেন) লেখা, দেশ-বিদেশের অনেক রচনা আমাদের সমালোচনায় যেমন উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে, তেমনি আমাদের সমালোচনার ঝাঁঝও বড় কম ছিল না। প্রথম সংখ্যায় নীরেন রায়ের শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নে'র সমালোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কঠোর সমালোচনার জন্য শরৎচন্দ্র কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছিলেন এবং পরিচয়ে কোনদিন কোন রচনা পাঠান নি।

পরিচয়ের প্রথম সংখ্যায় আমি বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' এবং 'বন্দীর বন্দনা' নামক একটি কাব্য পুস্তক—এই দুটির সমালোচনা করি। তখন থেকেই বুদ্ধদেবকে আমার অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিবান লেখক বলে মনে হয়েছিল। পরেও আমি এঁর রচনার সমালোচনা করেছি। এই সময়ে ছোটগল্পে এবং বিশেষ করে কবিতায় তাঁর মুন্সিয়ানা আমার চোখে পড়েছিল। প্রথম তিন বৎসর এই ত্রৈমাসিকে প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই আমি পুস্তক সমালোচনার কাজে যুক্ত ছিলাম। বুদ্ধদেব ছাড়া আমার সমালোচনার বিষয়বস্তু ছিল অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, বিভূতি ভূষণ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখের রচনা। মনে পড়ছে ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর 'হয়্যার ইজ সায়েন্স গোয়িং' বইটির সমালোচনা করেছিলাম। বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সমালোচনার ভার মোটামুটি আমার ওপরেই ন্যস্ত ছিল।

পুস্তক পরিচয়ে সুধীন্দ্র, নীরেন এবং হিরণকুমারের নিয়মিত উপস্থিতি ছাড়াও শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ধূর্জটিপ্রসাদ, প্রবোধ বাগচী, চারুচন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্রলাল বসু প্রভৃতিরাও থাকতেন।

পরিচয়ের শৈশবে সুধীন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন ও নিষ্ঠাসহকারে সম্পাদনার সকল কাজ করতেন। নিজে সমস্ত লেখা কপি করে তবেই ছাপাখানায় পাঠাতেন। মনে পড়ে আমার সমালোচনার কোনো মতের সঙ্গে তাঁর গরমিল হলে সেটুকু শুধু মুখে আমাকে বলতেন। লেখা পরিবর্তন করার অধিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁর থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন আমার লেখার উপরে তিনি কলম চালান নি—এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সুধীন্দ্রর এই নিষ্ঠা ও শ্রমের আড়ালে নীরেন সর্বদা তাঁকে মনে-প্রাণে সাহায্য করেছেন। প্রতিটি লেখা যত্ন সহকারে পড়া, বাছাই করা, সাজানো ইত্যাদি কাজে তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে উদ্যোগী না হলে পরিচয়ের পূর্ণতা অসম্ভব ছিল। সুধীন্দ্র তাঁকে যুগ্ম সম্পাদক হবার আহ্বান জানালেও নীরেন

সে নাম গ্রহণ করতে বিরত হন। যদিও তিনি সর্বদাই সমতুল দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

এই সময়ের একজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে, তিনি চারুচন্দ্র দত্ত। একজন পদচ্যুত আই.সি.এস। তাঁর স্বদেশপ্রীতি তীব্র ছিল বলে তাঁর চাকুরির মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই ইংরেজ সরকার তাঁর পদচ্যুতি ঘটায়। চারুদার উৎসাহ ও উদ্যম বিনা পরিচয় প্রকাশ হতো কিনা সন্দেহ। তিনি বড় সুন্দর গল্প লিখতেন। তাঁর 'পুরানো কথা' সকলকেই মুগ্ধ করেছিল।

পরিচয়ের শুক্রবারের মিটিং বা ছোটখাটো সভাগুলি ক্রমেই একটা স্বকীয়তা ও খ্যাতিলাভ করল। এখানে যাঁরা আসতেন তাঁরা যে সবাই পরিচয়ের লেখক তা নয়। অনেকে এই সভায় নিজ খ্যাতির বলেই আসতেন। দু-একজনের নাম বলি—যেমন তুলসী গোঁসাই। তাঁর নিখুঁত অক্সফোর্ড উচ্চারণে উপস্থিত সকলকে তাক লাগিয়ে দিতেন। তাঁর সৌজন্যও ছিল অসামান্য। অক্সফোর্ডের ডীন বসন্ত মল্লিক—আমাদের মল্লিকদা হলেন আর একজন। তাঁর একটা নিজকৃত কষ্টিপাথর ছিল, যাতে তিনি প্রত্যেক তর্ক-আলোচনা কষে দেখতেন। একটা কথা সভার মধ্যে পড়লেই হল, অমনি মল্লিকদা তাঁর যাচাই করার প্রক্রিয়া নিয়ে হাজির। বলাই বাহুল্য যেসব তর্ক এইভাবে উত্থাপিত হতো শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসাই হতো না তাদের। আমার একটি বিশেষ লাভ হয়েছিল মল্লিকদার কাছ থেকে। তাঁর সঙ্গে গড়ের মাঠে গিয়ে গলফ্‌ খেলতাম। অক্সফোর্ডের আরও দু-একজন প্রথিতনামা ব্যক্তি আমাদের এই সভায় এসেছিলেন।

একদিন এলেন সরোজিনী নাইডু, ভারতের নাইটিঙ্গেল। এটি হিরণ-কুমারের কীর্তি। ওদের মধ্যে কি একটা পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল। সেদিন নাইটিঙ্গেলের স্বররাগিনী বা কাব্যরস কিছুই আমরা উপভোগ করবার সুযোগ পাইনি। কিন্তু সেদিন তাঁর মাধুর্য্য-প্লাবিত পরিহাসবাক্য উপস্থিত সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল।

এই রকম অনেক স্মৃতিই আজ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তখনকার পরিচয়ের সভার সেই সদস্যদের অনেকেই আজ নেই, অনেকের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর সাক্ষাৎ হয়নি—তাঁদের সবাইকার সম্পর্কে স্পষ্ট করে আলাদা করে বলা আজ বড়ই কঠিন। আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থা ও দীর্ঘ-দিনের অসুস্থতা আমার স্মৃতিশক্তিকে আরও ঝাপসা করে দিয়েছে।

ছোটবড় অনেক তথ্য হয়ত আজ মন থেকে মুছে গেছে, অনেক যোগ্য ব্যক্তির নাম হয়ত আমার উল্লেখ করা হল না। তবু আমার জীবনের অত্যন্ত প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়ের কথাগুলি যেটুকু মনে এল বললাম।

কামনা করি আমাদের 'পরিচয়' সুবর্ণজয়ন্তী থেকে শতবার্ষিকীর পথে সদর্পে ও স্বকীয়তায় এগিয়ে চলুক। [illegible]

শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ 'পরিচয়'-এর প্রথম যুগ

হিরণকুমার সান্যাল বলেছিলেন, নীরেন হচ্ছে পাকা ছেলেধরা—ছেলেদের ধরে ধরে মানুষ করে তোলা হচ্ছে তাঁর নেশা আর পেশা তো বটেই। আমি নিজের বেলায় বলতে পারি যে যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও রেহাই পাই নি। 'পরিচয়' গোষ্ঠীতে এনে ফেলবার বেশ কিছু আগে থাকতে তাঁর তালিম দেওয়া শুরু হয়ে যায়।

আমি পূর্ব আফ্রিকায় থাকতে বিদ্বজ্জনের কাছাকাছি আসবার সুযোগ পাইনি আর দেশে এসে দু-চার মাসের মধ্যে এক ধাতুপাথর-সন্ধানী ব্রিটিশ সংস্থার কাজে বহাল হয়ে উড়িষ্যার গহন বনে চলে যাই। প্রথম বার ফিরে আসি জ্বরে অচেতন অবস্থায়। তারপর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যে ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকি তিনি ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। চিকিৎসক গৃহিণী সম্পর্কে হতেন আমার মামাতো ভগিনী। আরোগ্যলাভ পর্যন্ত তাঁদের শ্যামা পুকুর লেনের বাড়িতে থেকে যাই। নীরেনবাবুরা থাকতেন ফড়িয়া পুকুরের রাধাকান্ত জিয়ু স্ট্রিটে—মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। দুই পরিবারের মধ্যে নিত্যই যাওয়া আসা ছিল। আমি আড়াল থেকে দেখতাম।

নীরেনবাবু তাঁর মায়ের দেওয়া ননী নামে পরিচিত ছিলেন। সে বাড়িতে আরও যেসব বন্ধুদের যাওয়া আসা ছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হারীত কৃষ্ণ দেব, হরিশচন্দ্র সিংহ, দিলীপকুমার রায় ও হিরণকুমার সান্যাল। শেষের দুজনকে নীরেনবাবু নিয়ে আসেন চিকিৎসক কালীপদ ঘোষের শিশুকন্যা ইলাকে গান শেখাতে ও তার সুকণ্ঠে গান শোনাতে।

তাঁরা সকলেই ছিলেন আমার চেয়ে বেশ খানিকটা বয়োজ্যেষ্ঠ। তাছাড়া তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত চটুল ভাষার প্রবাহে থই পাবো না, ভয় ছিল। তফাতে থাকতাম।

যিনি উপস্থিত না থেকেও সকলের আলাপ আলোচনায় সর্বাগ্রে এসে পড়তেন তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি তখন বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি কুড়িয়ে কিছুকাল ফ্রান্স ও জার্মানিতে কাটিয়ে ঢাকায় ফিরে গেছেন।

নীরেনবাবু ভক্তিভরে তাঁকে দাদা ডাকতেন। বয়সে খুব বেশি তফাৎ ছিল না, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়ায় ও পরীক্ষার পাঠে সাহায্য নিয়ে এসেছেন। সত্যেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কতকগুলি আড্ডা জমে উঠেছিল এবং আমার দেখা বন্ধুরা হেদুয়া পার্কের সঙ্গীত ও কাব্য চর্চার আসর ও গিরিজা ও তাঁর অগ্রজ ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যর বাড়ির ছাদের আড্ডার সভ্য ছিলেন। সত্যেনবাবুকে কেন্দ্র করেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সকলেই ছিলেন তাঁর ভক্ত।

নীরেনবাবুকে যখন প্রথম দেখি তখন তিনি হাতে-কাটা মোটা সুতোর খদ্দর পরতেন। তখনও তাঁর ওপর সুভাষ বোসের প্রভাব চলেছিল। শুনেছিলাম, কিছুকাল আগেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছিলেন। তারপর যখন সুভাষ বর্মার জেলে অনশন করছেন আর গান্ধী কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন নীরেনবাবু সাহিত্যের মধ্যে ডুবে থাকতে চেষ্টা করেছেন।

আমার আশ্রয়দাতা ভগিনীপতির কাছে শুনি, তাঁর বন্ধু এখন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ, কিন্তু তবু আমি কাছে যেতে সাহস করতাম না, পাছে আমার আফ্রিকা থেকে আনা পুঁজি দু-জোড়া স্যুটের ওপর টান পড়ে।

শরীরে কিছুটা শক্তি পাবার পরেই আমি জঙ্গলে ফিরে গেলাম। তারপর কয়েক মাস পরে কলকাতার সদর অফিসে বদলি হয়ে সেই চিকিৎসকের বাড়িতেই অতিথি হয়ে থাকতে হল। তখন শীতের মরসুম শুরু হয়েছে। একদিন আমার বোনের কাছে শুনলাম, ননীবাবু (নীরেন রায়) বলে গেছেন তিনি আমার বন্য প্রকৃতি ও জীবনী শক্তির প্রাচুর্যে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং মনস্থ করেছেন যে আমাকে পরিশীলিত করে তুলে সমাজ কল্যাণের কোনো কাজে লাগাবেন। প্রমাদ গুণলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আরও কাছের একজন প্রতিবেশী, রামধন মিত্র লেনের দুঃখীরামবাবু কোথা থেকে খবর পেয়ে এসে ধরলেন যে এরিয়ান্স ক্লাবের ক্রিকেট জুটিতে খেলতে হবে—তাঁদের উইকেট-কিপার দরকার হয়ে পড়েছে। আমার দক্ষতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার সময় ছিল না। পরে শুনি পাটুবাবুর (উত্তর কালের বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে মনোমালিন্য চলেছিল এবং বিকল্প ব্যবস্থা জরুরি হয়ে পড়ে।

যাই হোক আমি মাস কয়েক ছুটির দিন হলেই মাঠে মাঠে কাটাবার সুযোগ পেলাম। তারপরে একদিন কোনো একটা পূজা পার্বণ উপলক্ষে গিরিজাপতি ও তাঁর সহধর্মিনী অদিতি দেবী এসে মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। আমি তখন পরিবারভুক্ত হয়ে গেছি। অগত্যা যেতেই হল। নিমন্ত্রিত বন্ধুদের মধ্যে আমার সমবয়স্ক কেউ ছিলেন না বলে বসতে ইতস্তত করছিলাম, কিন্তু নীরেনবাবু হাত ধরে নিয়ে এসে পাশে বসালেন।

গিরিজাবাবুর অগ্রজ ডক্টর পশুপতি ভট্টাচার্যও উপস্থিত ছিলেন। অন্যও কেউ কেউ বিদ্বজ্জন ছিলেন, যাঁদের আমি আগেই নেপথ্যে থেকে দেখেছি। এখন শুনলাম জোর আলোচনা হচ্ছে দেশুয়া পাক, গিরিজাবাবুদের বাড়ির ছাদ ইত্যাদি অনেক ছোট বড় আড্ডা ও তার মধ্যমণি সত্যেন্দ্রনাথ বোসের একজন মানুষের মধ্যে এমন অপর্যাপ্ত জ্ঞান ও গুণের সমাবেশ নানা ধারায় উপচে উঠে কেমন করে আপ্লুত করে দিত সৌভাগ্যবান আড্ডাধারীদের, সে কথা অনেকে বললেন নিজের নিজের মতো করে। নীরেনবাবু সব আসরেই তাঁর এই বিস্ময়কর দাদার লেজুড় হয়ে হাজির হতেন। তিনি বললেন, তাঁর নিজের চরিত্র গঠনে দাদার অবদানের কথা। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এই বৈজ্ঞানিকের উৎসাহে। আমার কাছে সবই বিস্ময়কর। সেদিন বোধ করি আমার প্রথম প্রত্যয় হয় যে জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকারভেদে বিভাজিত হয় না।

আহারপর্ব শেষ হলে নীরেনবাবু আমাকে গিরিজাবাবুর বাড়ি থেকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। একটা হাত আমার কাঁধের ওপর রেখে আরও অনেক হাঁটিয়েছেন সহরের পথে পথে। সে অভ্যাসও নাকি তাঁর সেই দাদার কাছে পাওয়া। এই দুই পরিবারের (সত্যেন্দ্র ও নীরেন্দ্র) মধ্যে সম্বন্ধ নিকট আত্মীয়ের মতো হলেও কোনো কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল না। শুনেছিলাম সারা ব্রিজ নির্মাণের সময় ছেলেবেলা থেকে তাঁরা এক ক্যাম্প থেকে স্কুল কলেজ করেন এবং একজনের ওপর আর-একজন একান্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

একদিন দেশবন্ধু পার্কে শুনেছিলাম স্থানীয় কংগ্রেসনেত্রী নিস্তারিণী দেবীর অগ্নিময় বক্তৃতা। বাড়ির পরিবেশে তাঁকে মনে হলো ভিন্ন মানুষ। পায়ে হাত দেওয়ামাত্র বুকে টেনে নিয়ে সস্নেহে বললেন, আমার কথা

সবই শুনেছেন—ছেলেবেলায় বিদেশে বাবা মারা যাবার পরে রোজগারের চেষ্টায় লেখাপড়া করবার সুযোগ পাইনি, তারপর মাকেও হারিয়েছি। অশ্রুবর্ষণের উপক্রম হতে নীরেনবাবু আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন একতলায় নিজের ঘরে। তিন দেওয়ালের তাক আলমারি জুড়ে বই। রাস্তার দিকে লোহার গরাদ দেওয়া বড় বড় জানালা ও মধ্যে একটি প্রশস্ত তক্তাপোশ। তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বয়স ও বিদ্যাবুদ্ধির পার্থক্যের কথা ভুলে গিয়ে নিজের মনের সবটাই অনাবৃত করলেন।

সুভাষ জেলে। গান্ধীর সদাচারী কথার বাগাডম্বরে তিনি বীতশ্রদ্ধ। রাজনীতির ক্ষেত্র নৈরাশ্যময়। দিলীপ পণ্ডিচেরী গিয়ে শান্তি পেয়েছে। সে তাঁকে ডাকছে। শ্রীঅরবিন্দর সব লেখাই তিনি পড়েছেন, অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। সাধনার মাধ্যমে ঊর্ধ্বলোকের চেতনাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভব, সে দাবি মেনে নিয়েই নিশ্চিত ছিলেন যে, দিলীপের গুরু কখনো কোনো সাহিত্যের বিচারে ভুল করতে পারেন না। কিন্তু সম্প্রতি দিলীপ তার একটি কবিতা শ্রীঅরবিন্দর টীকা সহ পাঠিয়েছে এবং তিনি দেখছেন একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাকে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

একটানা এত কথা বলে তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, যাকগে আমার নিজের সমস্যার কথা—এবার বলি শুনুন, অধ্যাপক মনমোহন ঘোষের কথা। শ্রীঅরবিন্দর দাদা আজীবন ইংরিজি সাহিত্যের সাধনা করে এসেছেন। তাঁর কাছে আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর রচিত কবিতার ব্যাখ্যাও তাঁর নিজের কণ্ঠে শুনেছি। এমন খাঁটি মানুষ অধ্যাপকদের মধ্যে দেখিনি। ভাষার মধ্যে নিহিত মাধুর্য ও শক্তিকে তাঁর মতো করে স্বচ্ছন্দে ছেঁকে তুলে শিক্ষার্থীদের মন ভরিয়ে দিতে আর কেউ পারত না। তাঁর কাছে যে ভালবাসা পেয়েছি তা ভোলবার নয়। জীবনের শেষের কটা দিন তাঁর মেয়ে লতিকার সঙ্গে ভাগাভাগি করে সেবা করবার সুযোগ পাই। সে গল্প পরে কোনো দিন করব।

আর একজন অধ্যাপক যাঁর কাছে আমি ঋণী তিনি হচ্ছেন প্রফুল্ল ঘোষ। এখনও পড়াচ্ছেন। তাঁর মতো শেকস্পিয়ারের নাটক আর কেউ পড়াতে পারেন না। আমি চেষ্টা করি।

আমাকে দুবার বলতে হল না। ছুটির দিন আবার হাজির হতে তিনি 'এনসেন্ট মেরিনার' ও কুবলাই খাঁ পড়ে শোনালেন। সেদিন তাঁর বাড়িতে দুজন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হল। একজন ঢাকা ইন্টার-

মিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও আর একজন বিষ্ণু দে।

মৈত্র মহাশয় প্রবীণ কবি। কেশশূন্য মাথা। বোধকরি ঢাকার কাজ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় বসবাস করবেন স্থির করেছেন। নীরেনবাবুকে বললেন, 'দেখ নীরেন, আমরা সরকারী কাজ করেছি বলে বাতিল হয়ে যাইনি। আমরা হচ্ছি একই টিমের খেলোয়াড়—তোমরা হচ্ছো ফরওয়ার্ড, কেউ উইং, কেউ সেণ্টার; আমরা হচ্ছি ব্যাক্।'

মজার লাগছিল মিহি গলায় যুক্তি শুনে। তারপর আসবার আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়ল। তিনি সলজ্জভাবে পকেট থেকে একটি কবিতা বের করে শোনালেন। একটি ইংরিজি কবিতার অনুবাদ। নীরেনবাবুর অনুমোদন পেয়ে তিনি খুশি হয়ে বিদায় নিতে তাঁর ছাত্র বিষ্ণু দে তাঁর সদ্য-রচিত একটি কবিতা পড়ে শোনালেন।

আমার বয়স তখন বছর একুশ-বাইশ হবে এবং বিষ্ণু আমার চেয়ে অন্তত বছর তিনেক ছোট। সুতরাং তিনি তখন খুবই তরুণ। তাঁর লেখনী দিয়ে কঠিন কঠিন শব্দের শ্রুতিমধুর ঝঙ্কার নিসৃত হয়েছে শুনে আমি তো হতবাক। তারপর বাক্যের সাংকেতিক অর্থ নিয়ে আলোচনা আদপেই বোধগম্য হল না।

বাড়ি ফিরিয়ে দেবার সময় নীরেনবাবু আমাকে সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো কথা না বলে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান লেখক জোহান বেয়ের-এর 'পাওয়ার অফ এ লাই' বইখানা পড়তে দিলেন।

এরপর আমি আরও কিছু সময় জঙ্গলে কাটিয়ে ফিরে এসে ব্যক্তিগত কারণে চিকিৎসক পরিবারের আশ্রয় ছেড়ে বাদুড় বাগানের একটি মেসে উঠে যাই। তখন থেকে নীরেনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগও ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯২৮ সালের ১৪ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ) বিবাহ করে বিদ্যাসাগর স্ট্রিট ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মাঝে একটি গলির মধ্যে বাড়ি ভাড়া করে এক রকম আত্মগোপন করেই ছিলাম।

একদিন নীরেনবাবু হাজির হলেন ঝড়ের মতো বেগে। দেখি খদ্দর ত্যাগ করে মিলের জামা-কাপড় পরেছেন। বললেন, অনেকদিন পরে রাধারমণ মিত্রকে পেয়ে নতুন করে পড়া শুরু করে পর্যন্ত সামাজিক কর্তব্য পালনে অসমর্থ হয়ে পড়েন। এখনও পড়া চলছে। আপাতত একটা কাজে এসেছেন। কাজটা হল, সুষমা সেনগুপ্তা ও তটিনী দাসের যুগ্ম পরিচালনায় নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে একজন অবৈতনিক শিক্ষিকার দরকার।

প্রথম শ্রেণীতে এম এ পাস করা এক মহিলাকে দিয়ে হাঁড়ি ঠেলিয়ে আর বাসন মাজিয়ে আমি ঘোরতর সমাজবিরোধী কাজ করছি। সেই অপরাধে মাসিক পাঁচ টাকা করে চাঁদাও দিতে হবে। তাছাড়া এ বাড়ি ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় উঠে যেতে হবে।

আমার গৃহিনী সংসার চালনা ছাড়া যে একেবারেই নিষ্কর্মা ছিলেন সে কথা ঠিক নয়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় ইতিহাসের খাতা দেখতেন। তবু আমরা নীরেনবাবুর নির্দেশ মতো ম্যারকুস্ স্কোয়ারের দক্ষিণে পালিত স্ট্রিটে একটি বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেলাম। ততদিনে মনে হয় নীরেনবাবুও বালিগঞ্জ প্লেসে উঠে এসেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীর স্বামীদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে নতুন বন্ধুত্ব হল তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক ক্ষেত্রমোহন পুরোকায়স্থ ও কলকাতা পৌর সঙ্ঘের প্রধান হিসাব রক্ষক নরেন্দ্রনাথ সরকার। অধ্যাপক সরোজ দাসও আসতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন কাজের মানুষ—নিছক আড্ডা তাঁর ধাতে সইত না। আর পুরনো বন্ধু যাঁরা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আড্ডা দিতে আসতেন তাঁদের চারজনই ছিলেন অবিবাহিত। নীরেনবাবু নিজে একজন, এবং তাঁর ছাত্র জীবনের বন্ধু জীবনময় রায় ওরফে কবি দিলদার হুসেন আর একজন। হিরণকুমার স্যান্যাল এবং পণ্ডিচেরী আশ্রমের প্রথম যুগের একজন প্রাক্তন শিষ্য ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত নিয়মিত আসতেন।

আমরা দুজন ছাড়া হিরণকুমার ছিলেন সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ। ক্ষিতীশ বাবুকে আমরা দুলোদা ডাকতাম। সম্পর্কে আত্মীয়তার সুবাদে কিন্তু জীবনময় রায়কে দাদা ডাকতাম, আরও অনেক নিজের লোকের বোধে। সেটা তাঁর নিজের স্বভাবের গুণে। এতখানি স্নেহশীল, সরস, স্নিগ্ধ, সেবা-পরায়ণ মানুষ আর একটিও দেখিনি। দুলোদা ও জীবনদা বোধকরি কাছাকাছি বয়সের ছিলেন, কিন্তু স্বভাবে বিপরীত।

দুলোদা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে পড়তে কোনো এক দুর্ঘটনার ফলে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সরাসরি শ্রীঅরবিন্দর কাছে চলে যান। তখন আশ্রম ঋষির সঙ্গ সহজলভ্য ছিল এবং তাঁর ও আশ্রম মাতার পরিচালনায় যে আলোচনা সভায় যোগ দেবার সুযোগ ঘটে তাতে জ্ঞানের পরিধি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। বিশেষ করে ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে য়ুরোপীয় সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের অনুশীলন সহজ হয়ে যায়। অথচ সেই সঙ্গে সংস্কৃতের চর্চা অব্যাহত থাকে।

আমরা তাঁর বিভার সংগ্রহে যতনা চমৎকৃত হতাম—তার চেয়ে আশ্চর্য হই তাঁর আরামপ্রিয়তা ও আত্মভক্তিতার বহর দেখে।

জীবনদা ছিলেন ঠিক উল্টো স্বভাবের লোক। তাঁর মন শিক্ষিত ও পরিশীলিত হলেও শিক্ষার দিক থেকে কিছু কিছু বিষয়ে সঙ্কীর্ণতা পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি সেবা করবার সুযোগ পেলে সব সংস্কার, বিরূপতা তখনকার মতো মন থেকে মুছে ফেলে কাজে লেগে যেতেন। স্বাধীন থেকে কৃচ্ছ্র সাধনা ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র।

নীরেনবাবু আর হিরণের মধ্যেও একটা মানসিক বিরোধিতা মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং তর্ক-বিতর্কের বিরাম ছিল না। কিন্তু তথাপি এই চার জন আর পূর্বোক্ত দুই বন্ধু একত্রিত না হলে মনে হতো কোথায় যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

এই বাড়ির আড্ডায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নীরব থেকে সানন্দ চিত্তে চা জলখাবার সরবরাহ করা ছাড়া আমাদের দুজনের কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না। পাশের বাড়িতে নীরেনবাবুর পুরনো বন্ধু ও সত্যেন্দ্রনাথ বোসের প্রিয় শিষ্য হরিশ্চন্দ্র সিংহ থাকতেন। একবার ছুটিতে ঢাকা থেকে তাঁর অগ্রজ অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র এলেন। তাঁদের আহ্বানে এলেন সত্যেন্দ্রনাথ। সেখান থেকে আমাদের কাছে। মামার বাড়ির সম্পর্কে আমার জামাইবাবু হতেন। পরিচয় দিতে হল না। ছাদের ওপর মাদুর পাতাই ছিল। শুয়ে পড়লেন। তারা ভরা আকাশ। গৃহিনীকে যেন বহুকাল চেনেন তেমনি সহজ ভাবে কি খাবেন জানিয়ে দিলেন। নীরেনবাবু, হিরণ একে একে এসে ঢুকলেন। সত্যেনবাবু আমার হাতটা টেনে নিলেন। বুঝলাম নীরেনবাবুর এই স্বভাবটিও তার দাদার কাছে পাওয়া।

আর একদিন রাধারমণবাবুর গল্প শুনলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় আরও কিছু পরে। নীরেনবাবুর মার্ক্সবাদ অধ্যয়ন চলেছিল। দিলীপ সম্বন্ধে অভিমান অভিযোগ বিস্মৃত হয়ে থাকবেন। তাঁর স্মরণে আর উষ্মা দেখি না। বরং দিলীপের গানে নতুন ধরনের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ পাচ্ছে বলে জানিয়ে এলেন একদিন।

আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বুক কোম্পানির গিরীনবাবু ও তাঁর অনুজের সঙ্গে আলাপ করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 'ক্রাইটেরিয়ান' ও 'নিউ স্টেটসম্যান' ও 'নেশান' পত্রিকার গ্রাহক করে দিলেন।

ইতিমধ্যে ইডেন কলেজের ইতিহাস অধ্যাপনার কাজ নিয়ে গৃহিণীকে ভৃত্যের হেপাজতে সংসার ফেলে ঢাকাতে চলে যেতে হল।

বোধকরি নীরেনবাবুর নেপথ্য প্রভাবে স্থির করলাম, বিদেশী ভাষায় পত্রালাপ চলবে না। সেই আমার প্রথম বাংলা লেখার চেষ্টা, আর সেই প্রথম প্রেমপত্রের মধ্যে বড় করে নির্দেশ এল, যেন কালবিলম্ব না করে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বর্ণপরিচয় দুটি কণ্ঠস্থ করে বানান সমস্যাকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে চেষ্টা করি।

তারপর একদিন নীরেনবাবু ব্যস্তসমস্ত ভাবে এসে খবর দিলেন যে একটি উচ্চাঙ্গের বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। তখন ১৯৩১ সালের গ্রীষ্মের ছুটি। ঢাকা থেকে এসেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস ও সুশোভনচন্দ্র সরকার। লাক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের সঙ্গে গিরিজাপতি ভট্টাচার্য আর সত্যেন্দ্রনাথের প্যারিসের বন্ধু প্রবোধ চন্দ্র বাগচী আর হাতিবাগানের সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মিলিত হয়ে মোটামুটি একটি খসড়া ঠিক করে ফেলেছেন। সম্পাদক হবেন সুধীন্দ্রনাথ আর প্রবোধচন্দ্র। তাঁর দাদা সত্যেনবাবুর নির্দেশে নীরেনবাবু লেখক সংগ্রহ করবেন ও নিজেও গ্রন্থ সমালোচনা করবেন। তাঁকে প্রথম সংখ্যার ভূমিকা লিখতে হবে। তাছাড়া অনেক কাজ।

আমাকে বললেন, আপনার এনার্জিও কাজে লাগাতে পারি সে জন্যে প্রস্তুত থাকবেন। গৃহিনী তখনও ঢাকায় ফিরে যান নি। তিনি তো হেসেই অস্থির 'বাংলা পত্রিকায় উনি আবার কী কোরতে যাবেন?'

নীরেনবাবু বললেন, তাঁরা অবশ্য বিজ্ঞাপন দিয়ে পাতা ভরাবার চেষ্টা করবেন না, কিন্তু আরও অনেক রকম কাজ থাকতে পারে। পত্রিকার জন্যে গ্রাহক সংগ্রহ, হিসাবপত্র রাখা কত কি কাজ থাকতে পারে।

সেই যে ডুব মারলেন তারপর আর দেখা নেই। তখন অবশ্য বাড়ির কোনো আকর্ষণ নেই। গৃহিনী ঢাকায়, আমি ফুটবল ম্যাচ খেলে দেখি করে ফিরি।

মধ্যে একদিন সকালের দিকে নীরেনবাবু পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে গেলেন। তার আগে গ্রাহক করে চাঁদা নিয়ে গিয়েছিলেন। এবার বললেন, সুধীন্দ্রর সঙ্গে কথা হয়েছে, আপনাকে বুধবারে একটি 'পরামর্শ' চক্রে যোগ দিতে হবে। গিয়ে দেখলাম আমার উপস্থিতি অনাবশ্যক, তবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সঙ্গে আলাপ হল। আমি ডালহাউসি রোডে কাজে

যাই শুনে সুধীন্দ্র মিষ্টি করে হেসে বললেন, নীরেনবাবু বলছেন আপনার বাংলায় লেখা অভ্যাস নেই—নাই বা লিখলেন, আমাদের অনেক রকম সাহায্যের দরকার হতে পারে—একদিন অফিসের পরে স্টিফেন হাউসে 'লাইট অফ এশিয়া' বীমা কোম্পানির দপ্তরে চলে আসুন না।

শুনেছিলাম সুধীন্দ্রবাবুর মামা রাজা সুবোধ মল্লিক বীমা কোম্পানিতে অনেক টাকা নিয়োগ করে তাঁর ভাগনেকে সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করেন। গিয়ে দেখি মস্ত একটা ঘরে বিরাট আকারের টেবিলের এক পাশে বসে তিনি চিঠি পড়ছেন। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে চেয়ারে বসালেন। কাছ থেকে দেখলাম বাংলায় লেখা চিঠি। বুঝলাম পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি পড়ে অনেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি ছিল কিনা জানি না। তবে সুধীন্দ্রকে খুব খুশি মনে হল।

আমাকে বললেন, 'ছাপা, বাঁধাই, বিলি ইত্যাদি সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনি কি ভাবে সাহায্য করতে পারেন সেকথা পরে ভেবে দেখা যাবে। এখন থেকে আপনি আমাদের শুক্রবারের আসরে আসুন। সকলের সঙ্গে দেখা হবে। সকলে লেখক নন। আপাতত চলুন এই বিল্ডিঙেই গিরিজাপতি ভট্টাচার্যর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।'

তাঁর সঙ্গে যে অনেকদিনের আলাপ সে কথা বললাম না। তিনি সুধীন্দ্র দত্তর সঙ্গে আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, 'শ্যামলবাবু হচ্ছেন আমার বন্ধুর শ্যালক—'

সুধীন্দ্র বললেন, 'ভালো কথা, ওঁকে শুক্রবারের আসরে আসতে বলেছি।'

গিরিজাবাবু খুশি হলেন বলে মনে হল। বললেন, 'আফ্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা হলে উনি বিশেষজ্ঞর মত দিতে পারবেন।'

প্রথম প্রথম আসর বসত সুধীন্দ্রবাবুর পড়ার ঘরে। ছোট হলেও আমরা জনাপঁচিশত্রিশ লোক ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে যেতাম। তখনও তুলসী গোঁসাই, অপূর্বচন্দ্র, বসন্ত মল্লিক, সাহেদ সুরাওয়ার্দি, অবনী বাঁড়ুজ্যে ইত্যাদি অক্স-ফোর্ডের শিক্ষিত বন্ধুরা আসতে শুরু করেছেন বলে মনে হয় না। হীরেণ মুকুজ্জে আসেন হুমায়ুন কবীরের চেয়েও পরে। সুশোভন সরকার ঢাকায় ফিরে গেছেন।

সে বছরের ডায়েরি রাজনৈতিক কারণে পুড়িয়ে ফেলতে হয়েছিল তবে স্মরণে আছে আড্ডা জমাট হতো। সে সময় কল্লোল যুগের তরুণ লেখকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন মিত্র, অজিত দত্ত প্রভৃতি

লেখকরা আসতেন। মনীশ ঘটকও আসতেন, কিন্তু তিনি অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ছিলেন এবং তরুণদের মতো অভিমান করে চলে যান নি। অজিত দত্তও থেকে যান।

তরুণদের ক্ষোভের কারণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কবিতার বই 'প্রথমা' সমালোচনা করতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব, কিন্তু 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক মনে করেন বন্ধুর মূল্যায়ন একদেশদর্শী হতে পারে, সুতরাং গিরিজাপতির মতো নিরপেক্ষ অথচ দরদী লেখককে দিলে ভালো হয়। সে অবশ্য মাস ছয়েক পরের কথা। ইতিমধ্যে আমি অনেকবার উত্তর কলকাতায় হাতিবাগানে সুধীন্দ্রবাবুর বাড়ির আসরের পরে দ্বিতল বাসে করে বুদ্ধদেব অথবা বিষ্ণু দের সঙ্গে বাড়ি ফিরেছি। তাঁরা দুজনেই আমার কাছে মন খুলে কথা বলতেন।

কল্লোল যুগের তরুণ লেখকেরা ছাড়াও যাঁরা পরিচয়ের শুক্রবারীয় বৈঠকের প্রথম দিকে আসতেন এবং নানা কারণে আসা বন্ধ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধীরকুমার চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (উত্তরা), অবনী রায় (মিরাট)।

দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দাদের সুবিধার জন্যে মাসের মধ্যে একদিন করে আড্ডা বসত ডক্টর প্রবোধকুমার বাগচীর বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে।

আমি তখনও পর্যন্ত নিজে কিছু লিখতে চেষ্টা করব বলে ভাবিনি। একদিন সুধীন্দ্রনাথের বাড়ির বৈঠকে সরোজিনী নাইডুকে নিয়ে এলেন তাঁর ভ্রাতৃজায়া উষা দেবীর বোন পো হিরণকুমার সান্যাল। হিরণ-এর উপস্থিতিতে আসরের মেজাজ প্রফুল্ল হয়ে উঠত। কারণ হাস্যরসের সৃষ্টিতে তাঁর মতো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিরল ছিল। সেদিন তিনি এমন মানুষকে হাজির করলেন যাঁর প্রতিটি বাক্যই উপভোগ্য। সুধীন্দ্রর পাশে জুলিয়ান হাকস্‌লি রচিত 'আফ্রিকা ভিউ' বইখানা দেখিয়ে মিসেস নাইডু জানতে চাইলেন ওটা কি সমালোচনা করা হবে? তারপর তিনি সুধীন্দ্রর মতামত জানতে চাইলেন।

বইখানা সুধীন্দ্র আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন এবং আমি সেদিনই ফিরিয়ে দি। জানতাম বছর দুই আগে শ্রীমতী নাইডু পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসে সভানেত্রীত্ব করে এসেছিলেন এবং সেখানকার সমস্যাগুলি তাঁর জানা।

সুধীন্দ্র যখন বললেন, আমিই একমাত্র পূর্ব আফ্রিকা সম্বন্ধে জানি তখন আমি বলি, বৈজ্ঞানিক, তা সে যত বড়ই নিরাসক্ত বিজ্ঞানবিদ্ হোন না কেন, গভর্নমেন্ট হাউসে থেকে শ্বেতাঙ্গ আমলাদের চক্ষু দিয়ে দেখলে কখনই প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে না। আমি অবশ্য পূর্ব আফ্রিকার উপজাতিদের সমস্যার

কথা বলছিলাম না—আমি ভারতীয় ঔপনিবেশিক সম্বন্ধে হাক্সলির অযথা বিদ্বেষ পূর্ণ উক্তির প্রতিবাদ করছিলাম।

সরোজিনী সুধীন্দ্রকে বললেন, 'বইখানা ওকে সমালোচনা করিয়ে নাও না কেন?'

সুধীন্দ্র বলেন, 'উনি বাংলায় লেখা অভ্যাস করেন নি। আমরা অনুবাদ ছাপাই না।'

তিনি তখন প্রশ্ন করেন পূর্ব আফ্রিকা চেনে আর ভালো বাংলা জানে এমন কেউ আছে নাকি?

সুধীন্দ্রকে কবুল করতে হয় কেউ নেই।

এবার মিসেস্ নাইডু একটু ঝাঁঝ দিয়ে বলেন, 'ওকে দিয়ে লিখিয়ে অনুবাদ করিয়ে নাও।'

হিরণ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে লিখতে আরম্ভ করেন। বিশ্বপতি চৌধুরীর 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকের আট পাতা সমালোচনা দিয়ে তাঁর বহু প্রশংসিত গদ্য রচনা শুরু হয়। তাছাড়া সেই সংখ্যায় শেলি ও এ-ই-র দুটি কবিতার দুটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, চারুচন্দ্র দত্ত, দিলীপকুমার রায়, অর্দ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেক খ্যাতনামা লেখকের রচনা দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রকাশ হতে শুরু হয়। কিন্তু প্রথম সংখ্যার মুখবন্ধ থেকে শুরু করে পাঠকগোষ্ঠীর তরফ থেকে বীরবলের পত্র পর্যন্ত প্রতিটি রচনা ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিক্রিয়া শুক্রবারের আসরগুলিকে অনেক দিন পর্যন্ত সরগরম করে রেখেছিল। বুদ্ধদেব বসুর প্রাণখোলা উচ্চ হাসি এখনও কানে বাজে। নীরেনবাবুর 'শেষ প্রশ্ন' গ্রন্থের কঠোর বিরূপ সমালোচনায় শরৎচন্দ্রের নানা জনের কাছে নানা ভাবে ক্ষোভ প্রকাশের গল্প, মুখবন্ধে 'করকম্পন' শব্দ ব্যবহারে 'শনিবারের চিঠি'র শ্লেষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে গৃহবন্দী করে রেখে লেখা আদায়, ধূর্জটিপ্রসাদের ছোট গল্প, হেমেন্দ্রলাল রায়ের হিন্দুস্থানী ও বাংলা গান সম্বন্ধে নিবন্ধ, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুর মত তরুণ কবিদের আবেগ পূর্ণ কাব্য রচনার সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় ও সুধীন্দ্র কুমার রায়ের কবিতার মিশ্রণ।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের অনবদ্য ভাষায় বুদ্ধদেব বসুর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা আর বিশেষ করে ডিয়ুাই, ড্রাইসার, বারবুসের রাশিয়া সম্বন্ধে বইয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র সংকলন গ্রন্থের বিশদ পরিচয়

আমার কাছে যত না মুদ্রিত অবস্থায় প্রণিধানযোগ্য হয় তার চেয়ে আড্ডার টীকা-টিপ্পনীগুলি ঢের বেশি শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আমি সেই জন্যে পারত-পক্ষে কোনো বৈঠকেই অনুপস্থিত থাকতাম না, অন্তত না থাকার চেষ্টা করতাম।

ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ধীরেসুস্থে লেখাঁ সম্ভব হত। জুলিয়ান হাক্স্‌লির 'আফ্রিকা ভিয়্যু' বইটির ইংরেজি ভাষায় লেখা সমালোচনা সুধীন্দ্রকে না দিয়ে আমি আমার গৃহিনীকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিলাম। তিনি ততদিনে ঢাকার সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছেন। সম্পাদককে নিশ্চয় অনেক কলম চালাতে হয়, কিন্তু সেই প্রথম মাতৃভাষায় আমার নাম স্বাক্ষরিত একটি রচনা প্রকাশিত হল পরিচয় পত্রিকার প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায়। সেটা ছিল ১৩৩৯ সালের বৈশাখ মাস।

পরের বই সমালোচনার জন্যে পেলাম বার্ণাৎ শ-এর 'দি এ্যাডভেঞ্চারস্‌ অফ দি ব্ল্যাক গার্ল ইন সার্চ অফ্‌ গড্‌'। আমার মনে হয় এই পুস্তকটির পরিচয় দেবার ভার আমাকে দেওয়া হয়, যে-হেতু আমি ছিলাম শ-এর পরিকল্পিত সংস্কারমুক্ত, সংসার-অনভিজ্ঞ নির্ভীক কাফ্রি মেয়েটির মতোই সরল, হয়ত আমার মনের প্রতিক্রিয়া সোজা কথায় ব্যক্ত করতে পারব—নচেৎ বাতিল করার বিশেষ অধিকার তো সম্পাদকের আছেই।

সুধীন্দ্রবাবু যেটা জানতেন না সেটা হচ্ছে আমি ইতিমধ্যে সরাসরি বাংলায় ছাড়া লিখব না সঙ্কল্প করে বসে আছি। সমালোচনাটি লিখে ফেলতে সময় লাগে প্রায় দু-মাস। কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য নিই নি। কিন্তু শেষ খশড়াটির বানান সংশোধন করে দেন নীরেনবাবু। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গুরুচণ্ডালি সত্ত্বেও তিনি রচনাটিকে গুরুত্ব দিলেন। ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসে সমালোচনাটি প্রকাশ হবার পরে শান্তিনিকেতনে কবির কাছে যাই। কবি জানতে চাইলেন, এ ভাষা তুমি কোথায় পেলে? আমার ছেলেবেলার কথা জানতে চাইলেন—বিশেষ করে মায়ের কথা। সব শুনে বলেন, লিখে যাও—তুমি পারবে।

কবির আশীর্বাদ শিরোধার্য করে কলকাতায় ফিরে যাই।

সেদিন হিরণ সান্যাল এগিয়ে না দিলে তাঁকে একান্তে পাবার সৌভাগ্য হত না।

ইতিমধ্যে পরিচয়-এর শুক্রবারীয় আসরের প্রকৃতি একেবারে পাল্টে গেছে। সুধীন্দ্রবাবু তাঁর বাবার বড় ঘরটি দখল করে নিয়েছেন। গা ছড়িয়ে আরাম করে বসবার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডাধারীদের মেজাজও যেন বদলে গেছে।

সেটা বোধকরি কাকতালীয়। আসলে পুরানো কথার প্রণেতা চারুচন্দ্র দত্ত মাঝে মাঝে এসে অথবা তাঁর নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে অপূর্ব মজলিসি গল্প শোনাতেন। ধূর্জটিপ্রসাদ কলকাতায় এলে ভয়াবহ ভূতের গল্প বলতেন। আমি আসরের কর্ণধার বসন্তকুমার মল্লিকের (সকলের মল্লিকদা) উৎসাহ পেয়ে আফ্রিকার বিচিত্র অলৌকিক ঘটনাবলী শোনাতাম।

'পরিচয়' আসরের কিছু কথা সংক্ষেপে বলতে গেলে ডায়ারি সরিয়ে রেখে স্মৃতির ওপর নির্ভর করলে ভালো হয়। কিছু ভুলভ্রান্তি হতে পারে। এক শুক্রবার সুধীন্দ্রর বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি তাঁর বাবার বড় বসবার ঘরটি দখল করে নিয়ে আসর বসাবার ব্যবস্থা করেছেন। পুরু গদি-অাঁটা সোফা-সেটগুলি জুড়ে আমরা আরামে বসে ছোট ছোট চক্র রচনা করে আলাপ জমিয়েছিলাম। এক কোণা থেকে মল্লিকদার নির্দেশ এল, অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে তাঁর কিংবা আইয়ুবের তোলা একটি দার্শনিক হেঁয়ালির মীমাংসা করে দিতে হবে। বাদানুবাদ চলতে থাকে যুক্তিসংগত ভাবে—না হলে তিনি, 'please, please get to the point' বলে আলোচনা চালিয়ে যান। আমরা যুক্তির প্রহেলিকা শুনি কেউ মুগ্ধ হয়ে নীরবে, কেউ ছটফট করে মাঝে মাঝে মজার মজার মন্তব্য প্রকাশ করে—কেউ অনর্থক উচ্চ হেসে কেউ-বা বিদ্রূপাত্মক কথা বলে। কিন্তু মল্লিকদা যখন আসরের কর্ণধার তখন ছত্রভঙ্গ হবার উপায় থাকে না। বিরক্তি প্রকাশ করেন না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে অল্পক্ষণ বিরতি দিয়ে বিতর্ক চালিয়ে যান। অনেক সময় বিরুদ্ধ বক্তাকে তার নিজের কথার প্যাঁচে ফেলে নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন।

একবার রবাহুত হয়ে আসে অক্সফোর্ড মরালরিআর্মামেন্ট গোষ্ঠীর কয়েক-জন ইংরেজ বাক্যবাগীশ। তারা জানত না যে ধুতি-পাঞ্জাবি ভূষিত কৃষ্ণ-কায় ব্যক্তিটি বারো বছর অক্সফোর্ডে অধ্যাপনাকালে সেখানকার বহু নাম করা বিদ্বজ্জনদের কথাযুদ্ধে পরাস্ত করে এসেছেন। খুবই নিরীহ ভাবে এক ঝুড়ি নৈতিক উপদেশ শোনার পরে মল্লিকদা নির্মম ভাবে যুক্তির অসঙ্গতি-গুলিকে একে একে তুলে ধরে তাদের অপ্রতিভ করে দেন।

অথচ এই একই মল্লিকদা ভূতের গল্প শোনাবার জন্যে বালকের মতো উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। তখন যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতেন।

চারু দত্ত মহাশয় মাঝে মাঝে নিজের বাড়িতে আসর ডাকতেন। তার মজলিসি গল্প আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। যাঁরা তাঁর পুরানো কথা বই পড়েছেন তাঁরা জানেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তাঁরও সিভিলিয়ান জীবনের

অনেকখানি কেটেছিল ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে। সেখানকার বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প করতে করতে চারুবাবু অলৌকিক ঘটনায় এসে যেতেন অতর্কিত ভাবে। পরিবেশ তৈরি করে নেবার চেষ্টা ছিল না।

ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন পাকা গল্প-বানিয়ে। তাঁর কাহিনীতে প্রেত-প্রেতিনীদের আবির্ভাব ঘটত রীতিমতো জানান দিয়ে। তিনি বেশ রসিয়ে রসিয়ে ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি করে নিতেন।

আমার গল্পে পূর্ব আফ্রিকার পর্বতাঞ্চলের নৈসর্গিক প্রভাব প্রাধান্য পেত।

অবশ্য আসরে গল্পের চেয়ে আলোচনাই বেশি হত। দার্শনিক বাদানুবাদ ছাড়া দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে বিচার বিবেচনা কিছু কম হত না, তবে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ বা গ্রন্থ-সমালোচনার পর্যালোচনা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। বড় জোর পাঠকবর্গের মন্তব্য অথবা 'শনিবারের চিঠি'র মতো ছিদ্রান্বেষী পত্রিকার ব্যঙ্গোক্তি উল্লেখ করা হত। মনে আছে প্রথম সংখ্যায় শরৎচন্দ্রর 'শেষপ্রশ্ন' গ্রন্থের প্রতিকূল সমালোচনার জন্যে নীরেনবাবুর প্রতি যে অভিসম্পাত বর্ষণ হত তার কিছু কিছু আসরে পৌঁছে যেত।

কোনো কোনো সময়—বিশেষ করে ঢাকা থেকে সত্যেনবাবু এলে আলোচনা ম্যারাথন রূপ নিয়ে শেষ পর্যন্ত মুলতবি রাখা হত। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্গে থাকলে মল্লিকদার উৎসাহ বেড়ে যেত—বৈজ্ঞানিক তর্কের নিয়মকানুন মেনে চলতেন। শেষ পর্যন্ত হয়ত 'বিজ্ঞান ও দর্শনের' মধ্যে সীমারেখা বিলুপ্ত হয়ে যেত। সত্যেনবাবু মাঝে মাঝে উশকে দেওয়া ছাড়া বাদানুবাদে অংশ নিতেন না।

তখনকার গোড়ার দিকে কী একটা কথায় তুলসী গোঁসাই বলেন, ইংরিজি ফিলসফি শব্দটির অনুবাদ হওয়া উচিত 'বিজ্ঞান', 'দর্শন' নয়।

বাংলা ও ইংরিজি দুই ভাষার মিশ্রণে আসরের আলোচনা চলত কিন্তু যখন থেকে ম্যালকম মাগারিজ, স্টিফেন, ব্ল্যাকডেন প্রভৃতি কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক, প্রকাশক আসতে আরম্ভ করেন তখন ইংরিজি প্রাধান্য পায়।

সাহেদ সুরাওয়ার্দি, সরোজিনী নাইডু ও বনার্জি পরিবারের প্রতাপ ও তাঁর তিন ভগ্নী মিনি, শীলা, আইলিন বাঙালি হয়েও মাতৃভাষা জানতেন না। আইয়ুব বিহারী হয়ে বেশি বয়সে বাংলা শিখে বাংলা উচ্চারণ করতেন

আমাদের অনেকের চেয়ে ভালো। অবশ্য ইংরিজিতে অসুবিধা ছিল না। য়ুরোপীয়রা ছাড়া অনেক অবাঙালিও আসতেন। তাঁদের মধ্যে মৃদুলা ও ভারতী সারাবাঈ, ডক্টর সুবারায়ন, ডক্টর মামুদ প্রভৃতি অনেকের কথা মনে পড়ে।

ত্রিশ দশকের প্রথমার্ধে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই নৈরাশ্যজনক। তুলসী গোঁসাই মহাশয় গান্ধিজীর পশ্চাদপসরণ নীতিতে মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ। সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র সুশোভনচন্দ্র সরকার ছাড়া য়ুরোপে কী হচ্ছে সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করবার প্রয়োজনবোধও ছিল বলে মনে হতো না। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশের পরেও সুধীন্দ্রর মতো রবীন্দ্রভক্তও আঁদ্রে জিদ-এর সোভিয়েট রুশ বিদ্বেষের প্রভাব মুক্ত হতে পারেন নি। নীরেনবাবুর সাম্যতন্ত্রে বিশ্বাস এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পেত যে অনেকে আলোচনা থেকে বিরত থাকতেন।

১৯৩৬/৩৭ সালে বড় রকম পরিবর্তন এসে যায়। ছত্রিশ সালের প্রথম দিকে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন গোঁসাই আসরে যোগ দিলে নীরেনবাবুকে আর কোণঠাসা হয়ে থাকতে হয় নি। তাঁরা দুজন এসে বৈঠকের অভিজাত প্রকৃতিকে বদলে দেবার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু কয়েকটি রুদ্ধ জানালা খুলে দেন। নিখিল ভারত কংগ্রেসের বামপন্থী দলের সঙ্গে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের যে যোগাযোগ ছিল সে-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হল। সে বছর 'পরিচয়' পত্রিকা ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে পরিণত হয়। সে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একডালিয়া রোডে ধূর্জটীপ্রসাদের নতুন বাড়িতে। সে শুক্রবারে তিনি আসর ডাকেন। সেই সময় বরাবর সুশোভনবাবুও চক্রবেড়ে থেকে ঐ একই রাস্তায় হিরণ-এর বাড়ির দোতলায় উঠে আসেন। গিরিজাপতি বাগবাজার থেকে একডালিয়া রোডে বাড়ি করে উঠে আসেন আরও আগে।

একদিন সুশোভনবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের নবনিযুক্ত ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপক হামফ্রে হাউসকে আসরে নিয়ে এলেন। তাঁদের সঙ্গে আসেন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

মল্লিকদা ভারতবর্ষ ছেড়ে য়ুরোপে ফিরে যান ৩৭ সালের মাঝামাঝি কোনো সময়ে। কলকাতা থেকেই জাহাজে ওঠেন। তাঁর যাওয়াতে আসরের প্রকৃতি অনেকখানি বদলে যায়। আমরা যারা তাঁর বিশেষ

স্নেহভাজন হয়ে পড়ি তাঁদের ব্যক্তিগত অভাববোধের কথা ছেড়ে দিয়েও আমার মনে হয় আসরের একটা বড় রকম অঙ্গহানি হয়।

আমাদের আড্ডায় গল্প হত বলেছি, কিন্তু গল্প ছাড়াও এমন অনেক প্রসঙ্গ নিয়ে কথা কাটাকাটি হত যা তাঁর অধীত বিদ্যার বাইরে—সে ক্ষেত্রে তিনি আমারই মতো নীরব একাগ্রতায় শুনে যেতেন আর বিতর্ক যুক্তির বাইরে যাবার উপক্রম হলে আসরে নেমে পড়তেন। হিরণকে বলতে শুনেছি, 'দেখ হাবল, এরা তর্ক করতে জানে না, প্রতিপক্ষকে অনেক সময় তথ্য আর কথা জুটিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ তর্ক হচ্ছে একটা আর্ট, মল্ল যুদ্ধ নয়।'

মল্লিকদা চলে যাবার পরে অথবা দু-চার মাস আগে আমাদের আসরে একজন নতুন লোক এলেন—স্যার আবদার রহিমের ছেলে মজিদ রহিম আই. সি. এস। কলকাতার শুল্ক বিভাগের উচ্চ পদস্থ অফিসার—চমৎকার লোক, কিন্তু যেমন একরোখা তেমনি অসহিষ্ণু। তাঁর গৃহিনী জার্মান। দু-জনেই হিটলারের একনিষ্ঠ ভক্ত।

এদিকে স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে আসর সরগরম হয়ে উঠেছিল। হীরেনবাবু আর সুরেন গোঁসাই কথা বলতেন কম। তাঁদের কাজ ছিল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ফাসিস্ট-বিরোধী দলগুলিকে কাছাকাছি নিয়ে আসা। আমার কাছ থেকে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করতেন। সুধীন্দ্রকে ইস্তাহার পৌঁছে দিতেন, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁকে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন হামফ্রে হাউস ও তাঁর উদ্বেগের কারণ ঘটে যখন জনপ্রিয় ফরাসী রাষ্ট্র স্পেনের জনসাধারণের নির্বাচিত শাসকদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। ফ্র্যাঙ্কোর সমর্থনে নাৎসি জার্মানি ও মুসোলিনির ফাসিস্ট শক্তির যুক্ত প্রয়োগে মজিদ রহিম খোলাখুলি ভাবে তাঁর উল্লাস প্রকাশ করতেন। গরম গরম তর্ক বাধত কিন্তু কখনও অপ্রীতিকর কিছু ঘটে নি।

আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক অবস্থা তখন দ্রুত অবনতির দিকে চলেছিল। অনেক দিন তিন বন্ধু—তুলসী গোঁসাই, সাহেদ সুরাওয়ার্দি ও অপূর্ব চন্দ, পূর্বের কোনো তর্কের ধুয়া ধরে উত্তপ্ত অবস্থায় আসরে প্রবেশ করে মুসলিম লিগ, সরকারের ধামাধারক হিন্দু জমিদার অথবা কৃষক প্রজা পার্টির বিশেষ-বিশেষ সভ্যের নাম করে মজার মজার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিতেন। তুলসী গোঁসাই অবশ্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম করে আক্রমণ করতেন না। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৌরসভা ইত্যাদি

প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কংগ্রেসি প্রভাব অপসারণের ষড়যন্ত্রে মুসলিম-য়ুরোপীয় যুক্ত প্রয়াসের প্রতিবাদে শক্তি-পরীক্ষার হুমকি দিতেন। সাহেদ বিদ্রূপ করতেন কৃষক-প্রজা পার্টির সভ্যদের এবং বিশেষ করে হুমায়ুন কবিরের নাম করে। চন্দ সাহেব শ্বেতাঙ্গ আমলাদের কূট-কৌশলের অনেক উপাদেয় খবর দিতেন।

রবীন্দ্রনাথ শুক্রবারের আসরের কথা জানতেন এবং তাঁর কিছু পড়ে শোনাবার থাকলে আমদের সেই দিনই সদলবলে ডেকে পাঠাতেন। অবশ্য নিমন্ত্রিতের মধ্যে আরও অনেকে থাকতেন। মনে আছে ৩৬ সালের গ্রীষ্মের ছুটির সময় তিনি সম্প্রতি-রচিত কয়েকটি গদ্য কবিতা শুনিয়ে ('বসুন্ধরা', 'ব্রাত্য', 'ময়ূরাক্ষী', 'কোপাই') আমাদের একটি মনোজ্ঞ ভাষণে তাঁর কাব্য-ধারা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।

'পরিচয়'-এর আসরের প্রথম দিকের বিবৃতি সংক্ষেপে দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। অনেকের কথা বাদ পড়ে গেল। বটকৃষ্ণ ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রভৃতি পণ্ডিতদের আলোচনা আমার ডায়রিতেও ধরে রাখতে পারি নি যেহেতু বোধগম্য হত না, এবং স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ‘পরিচয়’-এ বিশ বছর

কোথা থেকে শুরু করি ভেবে পাচ্ছি না। কেননা যে-দুবার কিছুকাল ধরে ‘পরিচয়’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে আমি সহযোগিতা করেছি তা আমার পক্ষে বিচ্ছিন্ন কোনো সাহিত্যকর্ম ছিল না, তা ছিল সেই সুদূর ১৯৪৪ সাল থেকে ‘পরিচয়’-এর সম্পাদনা-বিভাগের কর্মী হিসেবে এবং ফাসিস্ত বিরোধী ও প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কর্মী ও সম্পাদক হিসেবে আমার কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত। আর এই সবকিছুই ছিল সাহিত্যকর্মীর স্বরূপে আমার কমিউনিস্ট হয়ে ওঠার প্রয়াসের অন্তর্গত।

১৯৪৩-১৯৪৪ সালে প্রথম বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রধানত তর্জমার মধ্যস্থতায় মার্কসবাদী বুনিয়াদি সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমার অন্তর-জগতে এত বড় বিপর্যয় তার আগে আর কখনও ঘটে নি। বলা যেতে পারে জীবনদৃষ্টিতে একটা বিপ্লবই ঘটে গেল। চোখের সামনে থেকে একটা পরদা সরে গেল যেন। মামুলি মধ্যবিত্ত মানসের যে-চোখ দিয়ে তার আগে আশপাশের মানুষজন, সমাজ ও জগতকে দেখছিলুম, সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিচার করছিলুম, একেবারে তার ঠুলি খুলে দিল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সব কিছুকে ফিরে-ফিরতি নতুন করে দেখতে ও বিচার করতে প্রবৃত্ত হলুম। বস্তুত আমার জীবনে আর-কোনো জীবনতত্ত্বকে এত নতুন, এত অভিনব ঠেকে নি। মনে পড়ে, কী এক অনাস্বাদ মোহের ঘোরে নেশাগ্রস্তের মতো জীবন কাটাচ্ছিলুম তখন। কিংবা বলা যায় মধ্যবিত্ত মোহেই প্রচণ্ড ঘা পড়ল একটা, মানস-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল। কিন্তু তত্ত্বকথা যতই অনাস্বাদিতপূর্ব কিংবা জীবন-আলোড়ক হোক না কেন, প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় প্রযুক্ত না হলে তা বন্ধ্যা থেকে যায়। বিশেষ করে মার্কসবাদের ক্ষেত্রে এটা সত্যি, কেন-না মার্কসবাদ হল প্রধানত কর্মজীবনের চালকশক্তি। আমার ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই মুহূর্তেই সুভাষ (মুখোপাধ্যায়)-এর মধ্যস্থতায় ‘পরিচয়’-এর সম্পাদনা-

বিভাগে কর্মী হিসেবে অবৈতনিক কাজ জুটে গেল। সেই বছরেই 'পরিচয়'-এর পরিচালনভার কবি সুধীন্দ্রনাথের হাত থেকে নিয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা। তবে প্রত্যক্ষ পরিচালনভার ছিল প্রগতি লেখক সঙ্ঘের হাতে এবং ঐ সঙ্ঘের তরফে সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন সর্বশ্রী গোপাল হালদার ও হিরণকুমার সান্যাল।

সেই প্রথম কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে এলুম। প্রথমেই মনে হল মধ্যবিত্ত মানসের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করতে হলে স্বশ্রেণী থেকে উত্তরণ, অথবা মার্কসীয় পরিভাষায় যাকে 'শ্রেণীচ্যুতি' বলে তা-ই ঘটানো দরকার। আর আমার মনে হয়েছিল বাস্তবে এই উত্তরণ সম্ভব করে তোলার পন্থা ছিল আজন্ম অভ্যস্ত জীবনচর্যায় বড় রকমের একটা পরিবর্তনসাধন এবং কায়িক শ্রমকে আমাদের আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-মধ্যবিত্ত হেয়বোধ থেকে উদ্ধার করে তাকে যথাযথ মর্যাদাদান। 'পরিচয়'-এর জন্যে নিজে লেখা ও অন্যের লেখার সম্পাদনা ছাড়াও লেখকদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে লেখা সংগ্রহ, ছাপাখানায় বসে 'পরিচয়'-এর আদ্যন্ত প্রুফ সংশোধন, লেখক সঙ্ঘের ঘর ঝাঁট দেয়া, সভার অনুষ্ঠানে সতরঞ্চি-চাদর পাতা, 'নবান্ন' নাটকের অনুষ্ঠানে তৎকালীন 'শ্রীরঙ্গম' থিয়েটারে দর্শকদের বসবার জায়গা দেখানো, নাটকের বই ও অনুষ্ঠানসূচি বিক্রি করা, ইত্যাদি যে-সব কাজ আমার তৎকালীন উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের আশ্রয়পুষ্ট মনে গতরে খাটার কাজ হিসেবে 'ইতর'জনের করণীয় মনে হত প্রাণপণে তা-ই করে যেতে লাগলুম কায়িক শ্রমকে মর্যাদাদানের জন্যে। কিন্তু অভ্যস্ত জীবনযাত্রার রীতিতে পরিবর্তন ঘটানো বিশেষ সম্ভব হল না। একটু-আধটু লেখার হাত ছিল বলে লেখক ফ্রন্টেই আমি সবচেয়ে বেশি কাজে লাগব মনে করে আমাকে রেখে দেয়া হল 'পরিচয়' ও প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কাজে। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে কাজ করার এবং শিল্প-শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশার ও প্রত্যক্ষ শ্রেণী-সংগ্রামের কিছুটা অংশভাক হওয়ার সুযোগ থেকে এইভাবে বঞ্চিত হলুম। এটি যে আখেরে আমার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে তা-ই নয়, অপরাপর প্রতিটি প্রগতিশীল সংস্কৃতি-কর্মীর পক্ষেই এ-ব্যাপারটি তাঁর শ্রেণী থেকে উত্তরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধানত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকদের সংস্পর্শে আবদ্ধ থাকায় মধ্যবিত্ত জীবনধারার গণ্ডি অতিক্রমণের সুযোগ-সুবিধে বিশেষ রইল না আমাদের। ফলত মার্কসবাদ যতটা মননগ্রাহ্য হয়ে রইল ততটা শ্রেণী-সংগ্রামের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার

সহযোগে সত্তায় জারিত হয়ে সত্যিকার জীবন দর্শন হয়ে উঠতে পারল না। অবশ্য ভারতের মতো একদা-উপনিবেশ ও অনুন্নত দেশ এবং পরবর্তীকালে উন্নয়নকামী প্রধানত কৃষিজীবী দেশে বৃহৎ শিল্প-প্রকল্প ও সংগঠিত শ্রমিকের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাল্পতার কারণে এ-দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেও যে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, এটা বোধহয় ঐতিহাসিক দিক থেকে বোধগম্য। কিন্তু সমগ্র ভাবে মধ্যবিত্ত কমিউনিস্ট কর্মীদের, বিশেষত সংস্কৃতি-কর্মীদের মধ্যে স্বশ্রেণী থেকে উত্তরণের সংগঠিত প্রয়াস কিংবা তার ব্যবস্থা না থাকায় আমরা নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর বঞ্চনাজাত ক্ষোভ ও অসূয়ার বিকল্পকেই প্রোলেতারিতের শ্রেণীশোষণসঞ্জাত ক্রোধ হিসেবে গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি। কিন্তু সেকথা থাক।

১৯৪৪ সাল থেকে 'পরিচয়' পত্রিকা নিছক কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক মুখপত্র ছিল না, ছিল বৃহত্তর ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ও পরে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের মুখপত্র। ফলে তার লেখক গোষ্ঠীও কেবল পার্টির লেখকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা উন্মুক্ত ছিল পার্টি-বহির্ভূত ব্যাপ্ত লেখকমণ্ডলীর মধ্যে। চল্লিশ দশকের ঐ সময়টাও ছিল সমগ্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টি, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ও 'পরিচয়' পত্রিকার এক মস্ত রমরমার যুগ। রাজশেখর বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ ও বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঃ সুশোভন সরকার, আবু সয়ীদ আইয়ুব, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, বিজন ভট্টাচার্য, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও চিন্মোহন সেহানবীশ থেকে শুরু করে এক বিপুল সংখ্যক খ্যাত, স্বল্পখ্যাত ও উঠতি লেখকের সমাবেশ ঘটেছিল সেদিন প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ও 'পরিচয়' পত্রিকাকে ঘিরে। এছাড়া 'পরিচয়'-এর দুই সম্পাদক গোপাল হালদার ও হিরণকুমার সান্যাল তো বটেই, নীরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শ্যামলকুমার ঘোষ প্রমুখ প্রাক্তন 'পরিচয়' গোষ্ঠীর লেখকরাও ছিলেন এই লেখকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। 'পরিচয়'-এ তখন সরাসরি ফরমায়েশ করা ও সংগ্রহ-করে-আনা লেখাই ছাপা হত না, লেখক সঙ্ঘে যে-সমস্ত সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা ও বিতর্ক চলত সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্কের জন্যে পত্রিকার দরজাও দেয়া হত খুলে। মনে আছে সম্পাদকীয় দপ্তরে জমা-পড়া লেখাগুলির মধ্যে থেকে প্রকাশিতব্য লেখা নির্বাচনের জন্যে লেখাগুলি

বণ্টন করে দেয়া হত সম্পাদক-মণ্ডলী ও সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের মধ্যে। তারপর নির্বাচন শেষে প্রধান-প্রধান রচনা পড়ে সবাইকে শোনানো হত সম্পাদকীয় আসরে। আর সেখানে কত যত্ন নিয়ে লেখাগুলির সমনোযোগ বিচার-বিশ্লেষণ করতেন সবাই। সাহিত্য তখনও এদেশে বাণিজ্যের পণ্য হয়ে ওঠে নি, সাহিত্য আলোচনায় তাই কঠোর নিরপেক্ষতা, বিষয়মুখিনতা ও সমনোযোগ নিষ্ঠার অবকাশ ছিল অনেকখানি। আর ছিল পার্টির বাইরের লেখকদের প্রতি সূক্ষ্ম সৌজন্যবোধের পরিচয়, তাঁরা যাতে কোনো কারণে ক্ষুণ্ণ না হন, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি। কখনও কখনও এ-ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়িও যে ঘটত না এমন নয়। যেমন, একবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযান' নামের উপন্যাসটির (উপন্যাসটি মাসিক কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে সে সময়ে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হচ্ছিল) কয়েকটি জায়গায় মোটর গাড়ি ফার্স্ট গিয়ারে বায়ুবেগে ছুটল বলে উল্লেখ ছিল। সম্পাদকীয় সভায় যখন বলা হল যে ফার্স্ট গিয়ারে নয় একমাত্র থার্ড বা টপ গিয়ারেই মোটর গাড়ি পূর্ণ বেগে ছুটতে পারে, তখন সম্পাদকের নির্দেশে লেখকের অনুমোদন সাপেক্ষে ওই ফার্স্ট গিয়ারকে থার্ড গিয়ারে পরিবর্তনের জন্যে সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সম্পাদকীয় এই ব্যবস্থাটা বহাল ছিল ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের কিছুদিন পর্যন্ত।

১৯৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে উগ্র বামপন্থী ও সংকীর্ণতাবাদী পার্টিনীতি গৃহীত হবার পর 'পরিচয়' পরিচালনার ক্ষেত্রে তার ধাক্কা পুরোপুরি এসে পৌঁছয় ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি নাগাদ। ফলে পত্রিকার পরিচালন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় ও পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ থাকে মাস ছয়েক। ছমাস বাদে ১৯৫০ সালের প্রথম চার মাসে 'নব পর্যায়' পরিচয়ের চারখানি সংখ্যা প্রকাশিত হয় নতুন পরিচালন-ব্যবস্থায় গোলাম কুদ্দুস ও সরোজকুমার দত্তের যুগ্ম-সম্পাদনায়। অতঃপর ফের পার্টি নীতির পরিবর্তন ঘটে ও 'পরিচয়'-এর প্রকাশ বন্ধ থাকে ফের কয়েক মাস। ১৯৫০ সালের শেষার্ধে যখন নতুন করে আবার 'পরিচয়' প্রকাশিত হল, তখন পত্রিকার সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হল কথা-সাহিত্যিক সুশীল জানা ও আমার ওপর। এই ব্যবস্থাটা তখন কায়েম ছিল মাস-ছয়েক। এই ছটা মাস ছিল কঠিন ও প্রায়-একক পরিশ্রমের কাল। 'পরিচয়'-এর সম্পাদক মণ্ডলীর অনেক সদস্য, লেখক ও কর্মী তখন জেলখানায় আটক। গোটা কমিউনিস্ট পার্টিই প্রায়

ছত্রভঙ্গ অবস্থায়। এই পরিস্থিতিতে সর্বক্ষণের কর্মী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যতম সম্পাদক হিসেবে পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কাজ করতে হত একা আমাকে। বিশেষ করে প্রতিবার কাগজ ছাপাখানায় যাওয়ার পর বিবেকানন্দ রোডের সেই ছোট্ট প্রেসের ম্যানেজারের ঘরে বসে আমি সম্পাদকীয় দপ্তরের যাবতীয় কাজ ও প্রুফ সংশোধন করে যেতুম সকাল নটা থেকে সন্ধে সাতটা-আটটা পর্যন্ত। এই সমগ্র কাজটিকে আমি কমিউনিস্ট কর্মীর প্রশিক্ষণের অঙ্গ বলেই গ্রহণ করেছিলুম ও যথাসাধ্য নিষ্ঠার সঙ্গে তা নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করতুম।

'পরিচয়'-এর এই তৃতীয় পর্যায়ে আমি একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার প্রয়াস পেয়েছিলুম। তা হল, সম্পাদকীয় দপ্তরে প্রেরিত প্রতিটি রচনা সম্পাদক-মণ্ডলীর সভায় সকলকে পড়ে শোনানো ও সকলের মতামত নিয়ে রচনা-নির্বাচন সমাধা করা। কিন্তু এতে গোল বাধল গল্প-কবিতার নির্বাচন নিয়ে। দেখা গেল, অন্তত এক্ষেত্রে ব্যষ্টির বোধ ও বিচার ক্ষমতা অনেক সময়ই সমষ্টির বোধ ও বিচার শক্তির চেয়ে নির্ভুলতর হয়ে থাকে। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার অপছন্দ একটি কবিতা মিঠে-মিষ্টি শব্দ ও ছন্দের নাচুনির দৌলতে সম্পাদক-মণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যের মনোনয়ন পেয়ে গেল ও নিজেরই তৈরি নিয়মের শৃঙ্খলে আটকা পড়ে সে-লেখা ছাপতেও হল আমায়। এ থেকে আমার আরও একটি যা অভিজ্ঞতা হল তা এই: শিল্প-সংস্কৃতির কারবারি আমাদের উচ্চশিক্ষিত মানুষজনের মধ্যেও নব্বই শতাংশ কি তারও বেশি আসলে কবিতা বোঝেন না। এঁরা সচরাচর পরের মুখে ঝাল খেতে অভ্যস্ত। কাব্য-সমালোচকদের মধ্যে মহাজন বলে যাঁরা গণ্য তাঁদের সার্টিফিকেট-পাওয়া কবি ছাড়া অন্যদের বিচারের ব্যাপারে এঁরা অন্ধ-নাচার কিংবা একেবারে শিশুর মতো অনভিজ্ঞ। কবিতার বিচার যে কত কঠিন ব্যাপার এটা তখনই বুঝেছিলুম।

আগেই বলেছি 'পরিচয়'-এর এই তৃতীয় পর্যায়ের আয়ুষ্কাল ছিল মাস ছয়েক। এর পর নতুন সম্পাদক মনোনীত হলেন প্রখ্যাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। যতদূর মনে পড়ে এঁদেরও যুগ্ম-সম্পাদনার আয়ুষ্কাল ছিল বছর-খানেক। তারপর সম্ভবত ১৯৫২ সালের কোনো-এক সময় থেকে 'পরিচয়' সম্পাদনার ভার পান ননী ভৌমিক—প্রথমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ও পরে গোপাল হালদারের সঙ্গে যৌথ

ভাবে। ১৯৫৬ সালের শেষে ননী ভৌমিক 'পরিচয়' ছেড়ে মস্কো অভিমুখ হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলুম আমি। অতঃপর ঐ পদে প্রায় ন-বছর বহাল ছিলুম। এর মধ্যে প্রথম চার বছর 'পরিচয়' সম্পাদনার কাজে যথেষ্ট সক্রিয় ভাবেই নিযুক্ত থেকেছি, কিন্তু পরে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ায় আর এদিকে ততটা সক্রিয় থাকতে পারি নি। কিন্তু এ-সময়ে সৌভাগ্যবশত এমন কয়েকজন সাহিত্যিককে পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলুম যাদের আনুকূল্যে আমার শ্রমের বহু পরিমাণ লাঘব ঘটেছিল। এই সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন প্রদ্যোৎ গুহ, অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, চিত্ত ঘোষ, মতি নন্দী ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখক। 'পরিচয়'-এর প্রতিটি সংখ্যার লেখকসূচির পরিকল্পনা. লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও রচনা-সংগ্রহ, রচনা-নির্বাচন ও প্রয়োজন মতো সেগুলির সংশোধন, ছাপাখানার সঙ্গে সংযোগ রাখা ও প্রুফ সংশোধন, ইত্যাদি পত্রিকা-সম্পাদন ও প্রকাশনার বিভিন্ন কাজে এঁদের নিরলস পরিশ্রম ও সহযোগিতা শুধু যে সম্পাদক হিসেবে আমার শ্রমলাঘব ঘটিয়েছিল তা-ই নয়, পত্রিকা হিসেবে 'পরিচয়'-এর মানের সমৃদ্ধিও ঘটিয়েছিল অনেকখানি। এই সম্মিলিত প্রয়াসে 'পরিচয়' হয়ত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার পুরনো মর্যাদা ও প্রভাবও ফিরে পেত, যদি-না ইতিমধ্যে আমাদের দেশে বড় রকমের একটি যুগ-পরিবর্তন সাধিত হোত।

যুগের এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল ১৯৫৫ সাল বা কমবেশি ঐ সময় থেকে। অর্থাৎ, মোটামুটি পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি কোনো একটা সময় থেকেই। স্বাধীন ভারতে প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন ও তার ফলাফল তখন সবে প্রত্যক্ষ হতে শুরু করেছে নতুন-নতুন ক্ষেত্রে, শ্রমশিল্পের বিস্তার ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রসার আরম্ভ হয়েছে, ব্যবসায়িক সাফল্য এবং নতুন-নতুন চাকরি ও ফলত সমৃদ্ধির দৌলতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এমন কি দক্ষ শ্রমজীবী মহলের মানসিকতায়ও আভাসিত হয়েছে পরিবর্তন। দুশো বছরের পরাধীনতা ও শাসক-শাসিত সম্পর্কের গ্লানি ও ক্ষোভ তখনই ভুলতে শুরু করেছি আমরা, আর নিজেদের ভাবতে আরম্ভ করেছি 'সমৃদ্ধ' পশ্চিম ইউরোপীয়. সমাজের এশীয় অংশী হিসেবে। যদিও উন্নত, 'সমৃদ্ধ' পশ্চিম কিন্তু প্রাক্তন কলোনিগুলির সঙ্গে তাদের বৈষম্য ও শোষক-শোষিত সম্পর্কের স্বর্ণযুগের কথা ভুলতে একান্ত নারাজ, এবং সে-যুগের জের না মেটাতে

বদ্ধপরিকর ছিল, তবু। যদিও এর প্রতিপক্ষে আমাদের ও সকল উন্নয়নকামী দেশের মিত্ররাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাশিস্ত জাপানি সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করে ও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে ভাঙন ধরিয়ে প্রাক্তন কলোনিগুলির মুক্তি অর্জনের পথ বিষয়-মুখভাবে প্রশস্ত করেছিল, যদিও স্বাধীন ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ও স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সে-দেশ তুলনারহিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহায়তাদান শুরু করেছিল তখনই, তবু পশ্চিমা সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলির একতরফা সংবাদ ও ভাষ্য পরিবেশনের একচেটিয়া অধিকারের দৌলতে আমাদের গোটা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক মগজধোলাইয়ের কাজটি তখনই এমন সর্বাঙ্গীণ ও সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়ে চলেছিল যে, সোভিয়েতকে পরক ও স্বার্থলিপ্স 'অতি-বৃহৎ শক্তি'র অন্যতম জ্ঞান করা এবং নিজেদের 'সমৃদ্ধ' পশ্চিমা সমাজের এশীয় কুটুম্ব গণ্য করার আগুনে তা শুরু করেছিল ঘৃতাহুতি যোগাতে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের দেশাত্মবোধ ও জাতীয় মর্যাদাবোধের অবক্ষয়ের সূচনা এই সময় থেকে। আর এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মূল্য-বোধের মূল্যহ্রাসের সূচনাও। প্রায় ঐ সময়েই (১৯৫৫-১৯৬০ সালের মধ্যে) দেশীয় পুঁজির একাংশ পরিণত হয়েছে একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিতে, একচেটিয়া পুঁজির থাবার বিস্তার ঘটেছে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রেও। আর সাহিত্যকে তা ক্রমে ক্রমে পরিণত করেছে বাজারিয়া পণ্যে। পণ্যতন্ত্রই সেই থেকে সাহিত্যের নিয়ন্ত্রা। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সমাজ-মানসিক এইসব পরিবর্তন অবশ্য স্পষ্ট ও পূর্ণতর রূপ নিয়েছে ষাটের দশকের সূচনা থেকেই। যাই হোক, এর ফলে কর্মীদের অক্লান্ত প্রয়াস সত্ত্বেও 'পরিচয়' তার পূর্বতন ভূমিকা ও প্রভাব হারিয়ে অনিবার্যভাবে ক্রমে পরিণত হয়েছে একটি 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন'-এ।

এটা বোধহয় ছিল 'পরিচয়' ও 'পরিচয়'-এর যুগের ভবিতব্য।

আমার কথাটি ফুরল। পরিশেষে বলি, অল্প কয়েকবছর সম্পাদক হিসেবে কাজ করা ছাড়াও সম্পাদনা-বিভাগের কর্মী ও সম্পাদক-মণ্ডলীর একজন হিসেবে সেই ১৯৪৪ সালের শেষ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রায় আগাগোড়া 'পরিচয়' পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলুম আমি। এই একুশ বছরের অধিকাংশ সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে একজন সাধারণ পার্টি-কর্মী হিসেবে আমি যে 'পরিচয়'-এর সম্পাদনা ও প্রকাশনার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে গেছি তা-ই নয়, 'পরিচয়'-এর ভালোমন্দের সঙ্গে, 'পরিচয়'-এর সঙ্গে

একাত্ম হয়ে থেকেছি। তাই আজও 'পরিচয়'-এর অস্তিত্ব আমারই অস্তিত্বের প্রতিরূপ মনে করি। পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের দীর্ঘ জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনার—কখনও মজার, কখনও বা দুঃখের ঘটনার—সম্মুখীন হতে হয়েছে। মফস্বলের সাহিত্যযশঃপ্রার্থীর কাছ থেকে এই অভিযোগ নিয়ে চিঠি এসেছে যে আমি নাকি আমার 'আত্মীয়স্বজনের' লেখা দিয়ে পত্রিকার পাতা ভরাচ্ছি—অর্থাৎ, তাঁকে জায়গা দিচ্ছি না। পার্টি-সদস্য লেখকের কাছ থেকে অনুযোগ এসেছে, আমি তাঁর বা তাঁদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছি না। জনৈক পত্রলেখক আমার একটি কবিতার ক্রুদ্ধ প্যারডি রচনা করে পাঠিয়েছেন এবং 'পরিচয়'-এর চিঠিপত্রের স্তম্ভে তা-ও ছাপা হয়েছে। তৎকালীন পার্টি-নেতৃত্বের একাংশ 'পরিচয়'-এ পার্টির বাইরের নানা লেখকের বিভিন্ন রচনার বক্তব্য সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েছেন, এমন কি এ-অভিযোগও এনেছেন যে আমি নাকি পত্রিকা-পরিচালনার ক্ষেত্রে 'পার্টি-বিরোধী' নীতি গ্রহণ করেছি। যাই হোক, এ-সমস্ত সত্ত্বেও সাধ্য মতো আমি পত্রিকা সম্পাদনার কাজে কড়াকড়ি বিষয়মুখ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের প্রয়াস পেয়েছি। আগেই বলেছি, আমাদের সেই যুগ ছিল সাহিত্যে একচেটিয়া বণিকতন্ত্রের আগের সময়। সাহিত্য নিয়ে বাণিজ্য করা, খ্যাতির দাসত্ব স্বীকার করা, পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবে নিজের আখের গুছিয়ে নেয়া, এসব আমাদের চিন্তার অতীত ছিল তখন। সাহিত্য-বিচারে তাই আমি যেমন আত্মমুখ খেয়ালখুশি ও লাভালাভ এবং পরের মনোরঞ্জনকে প্রশ্রয় দিই নি, বরং জোর দিয়েছি বিষয়মুখ বিচারের ওপর, তেমনই আবার রাজনৈতিক কর্মীর দলীয় সংকীর্ণতাকে পরিহার করে চলার চেষ্টা করেছি সাধ্যমতো। তবু তা সত্ত্বেও সাহিত্য-বিচারে অনেক ত্রুটি ঘটেছে নিশ্চয়ই, সীমিত ব্যক্তিগত ক্ষমতা কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সাংবাদিকশোভন পারঙ্গমতায় খাদ থেকে গেছে অনেক, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যাতে কমিউনিস্ট-কর্মীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায় অন্তত ঘাটতি না থেকে যায়।

মার্কসবাদ একদা আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল, তাই সাহিত্যক্ষেত্রেও মার্কসবাদকে অবলম্বন করে চলতে চেয়েছি।

এই রচনার একটি তথ্যে কিছু বিভ্রান্তি ঘটতে পারে বলে জানানো দরকার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম সম্পাদক হিসেবে 'পরিচয়'-এ কখনও ছাপা হয় নি। স. প.

মলয় দাশগুপ্ত

‘পরিচয়’-এ নাট্যসমালোচনা

পরিচয়ের ২৪ বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় ১৩৬১-র শ্রাবণ মাসে বহুরূপীর রক্তকরবী প্রযোজনার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনা করেন হিরণকুমার সান্যাল। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত পরিচয়ে প্রকাশিত নাট্যসমালোচনার একটি সংক্ষিপ্ত চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে এ-নিবন্ধে। প্রকৃত পক্ষে ১৩৫৮ থেকে আজ পর্যন্ত এই ৩০ বছরের পরিচয়ের নাট্যসমালোচনাকেই আমাদের পর্যালোচনার আওতায় আনা হয়েছে। সকলেই জানেন বোধহয়, যে, প্রথম যুগে প্রায় দশ বছরেরও বেশি পরিচয় একান্তই সাহিত্যপত্র ছিল। মৌলিক সাহিত্য এবং পুস্তক-সমালোচনার মধ্যেই এর বিশিষ্টতা বিকশিত হচ্ছিল। পরবর্তীকালে সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য প্রসঙ্গও ধীরে ধীরে পরিচয়ে স্থান করে নিতে থাকে। কলকাতার নাট্যানুষ্ঠানের আলোচনা ও পরিচিতি দান এই অন্যবিধ প্রসঙ্গের একটি। কিন্তু নাট্যসমালোচনার এই বিভাগটিও প্রায় কোনও সময়ই নিয়মিত হয়নি। তালিকা নং ১ দেখলেই বোঝা যাবে এই অনিয়মের বহরটা কোন সময়ে কতটা ব্যাপকতা পেয়েছিল। এটা বোঝার সুবিধার জন্য তালিকা নং ১-ক সংযোজিত হল। এ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত ৩০ বছরে মোট ৫১টি সংখ্যায় নাট্যানুষ্ঠান সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে এবং মঞ্চস্থ মোট ৭০টি নাটকের সমালোচনা করা হয়েছে এই সময়কালের মধ্যে। এই ৭০টি সমালোচনার আকৃতিগত বৈষম্য যেমন আছে তেমনি আছে গুণগত বিভিন্নতাও।

আসলে দীর্ঘ এই ৩০ বছরের নাট্যসমালোচনার চেহারা দেখে এই বিভাগ সম্পর্কে সম্পাদকমণ্ডলী বা পরিচালকমণ্ডলীর পরিকল্পনাহীনতাই বেশি করে চোখে পড়েছে। এই যে ৫১টি সংখ্যায় নাট্যবিষয়ক আলোচনা বেরল তা কিন্তু বিভিন্ন সময়ে মোট ৩৬ জন লেখকের রচনার ফল (২ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। সমালোচকদের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে যে এঁদের মধ্যে শতকরা সত্তরজনই নিতান্ত সাময়িক (casual)। ২৪জন সমালোচক এক-

বারের বেশি সমালোচনার কলম হাতে নেন নি, মাত্র দু-টি করে সমালোচনা করেছেন তিনজন। বাদবাকি ৯ জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যিনি লিখেছেন (স্বনাম ও বেনাম মিলিয়ে) তাঁর সংখ্যা ৭। ৫টি করে সমালোচনা লিখেছেন ২ জন, ১জন ৪টি এবং ৩জন ৩টি করে সমালোচনা লিখেছেন। সংখ্যার এই চিত্র পরিকল্পিত কোনও কর্মধারার হদিশ দেয় না।

এ-পর্যন্ত যা বলা হল তাতে মনে হতে পারে যে, অপরিকল্পিত সমালোচনার দরুন তিরিশটা বছর ধরেই বোধ হয় পরিচয়ের পাতায় নাট্যসমালোচনার নামে দায়সারা কিছু লেখা মুদ্রিত হয়েছে। ঘটনা আদৌ তা নয়। তালিকাগুলি অনুধাবন করলেই অন্তত পরিচয় পত্রিকার পাঠক বুঝতে পারবেন যে নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্রে পরিচয়ে একটা বিশেষ মাপকাঠি কাজ করেছে, কাজ করেছে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। 'গ্রুপ থিয়েটার' বা 'অন্য থিয়েটার' কিংবা অনেকে যাকে 'নব-নাট্য' বলেন, তার আলোচনাতেই সমালোচনা সীমিত রাখা হয়েছে। আবার ৩ নং তালিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কলকাতার প্রথম পংক্তির নাট্যগোষ্ঠীগুলির প্রযোজনাই আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে পরিচয়ের পাঠক যে-সব নাট্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন তা বাংলা থিয়েটারের সেরা প্রযোজনা। যদিও সমালোচনা নিয়মিত না হওয়ার দরুন প্রধান গোষ্ঠীগুলির বেশ উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাও বাদ পড়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাংলা থিয়েটারের উত্তম প্রযোজনার একটা ধারা খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। নিয়মিত সমালোচনার পরিকল্পনা থাকলে অবশ্য আলোচিত নাটকগুলির সঙ্গে অন্য সব প্রধান ও স্বনিষ্ঠ অপ্রধান নাট্যানুষ্ঠান মিলে বাংলা থিয়েটারের পুরো চেহারাটা ফুটে উঠত। আর তাতে সমালোচনার শূন্যস্থানগুলিও ভরাট হতে পারত। দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো চলে, বহুরূপী এবং লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপের পাশে বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের অভিনয় যে ভিন্ন স্বাদের খবর দেয়, তার যথার্থ চিত্র পরিচয়ে পাওয়া গেল না। কিংবা বাংলা নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে শৌভনিকের যথার্থ্য এখানে ধরা পড়েনি। নান্দীকারের প্রযোজনার সমকালে বা একটু এদিক-ওদিকে মনোজ মিত্র বা মোহিত চট্টোপাধ্যায় যে দুরারোহ অভিযাত্রা চালিয়েছেন, পরিচয়ে তার অনুপস্থিতি কেবল আংশিকতা দোষে দুষ্ট নয়—মনে হয় এর পিছনে কিছুটা উন্নাসিকতাও কাজ করে থাকতে পারে। এই সম্প্রতি বছর পাঁচ-সাতের মধ্যে থিয়েটার কমিউন,

চেতনার প্রযোজনার সম্যক মূল্যায়নের অভাব কি আংশিকতার প্রশ্নকে বাড়িয়ে দেয় না ?

পরিচয়ের নাট্যসমালোচনায় এমনকি বহুরূপীর প্রযোজনার অর্ধেকও স্থান পায়নি। রক্তকরবীর পরে বহুরূপী যেসব নাটক করেছে তারমধ্যে পুতুল খেলা, বিসর্জন, রাজা, কাঞ্চনরঙ্গ, প্রলাপ, বর্বর বাঁশী, ত্রিংশ শতাব্দী, গণ্ডার, ঘরে বাইরে, অপরাজিতা, যদি একদিন, গালিলেও এবং পুনঃপ্রযোজিত দশচক্র ও চার অধ্যায়ের সমালোচনা পরিচয়ে নেই। লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপেরই সবচেয়ে বেশি নাটক সমালোচিত হয়েছে এখানে। এই গ্রুপটি এ্যামেচার শেকস্পীরিয়ান নামে শেকস্পীয়রের একাধিক নাটকের ইংরাজি ভাষাতেই অভিনয় করে। পরে ক্লিফর্ড ও' ডেট্‌স্-এর ওয়েটিং ফর লেফ্‌টি-র অভিনয় করার সময় লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ নাম নেয়। এরপরও এরা ইংরাজি ভাষায় তিনখানি নাটকের অভিনয় করে। ১৩৫৯-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এদের আর্মস্ এ্যাণ্ড দি ম্যান নাট্যাভিনয়ের সমালোচনা পরিচয়ে বেরোয়, সমালোচক রবীন্দ্র মজুমদার। ১৯৫৩-র জুলাই মাসে অর্থাৎ ১৩৬০-এর শ্রাবণে এরা রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন মঞ্চস্থ করে। এ সময় থেকে যেসব নাটক এই গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করেছে তারমধ্যে পরিচয়ে সমালোচিত হয়নি অচলায়তন, কালের যাত্রা, তপতী, ছায়ানট, ওথেলো, তীর। মিনার্ভায় এদের নিয়মিত অভিনয় শুরু ১৯৫৯-এর জুন মাসে এবং তীর নাটকের পরেই এ গোষ্ঠী মিনার্ভা ছেড়ে দেয় ও নাম পাল্টে পিপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল্ থিয়েটার নাম নেয়।

'নান্দীকার' তার ২১ বছরের জীবনে যেসব নাটক অভিনয় করে তারমধ্যে পরিচয়ে আলোচিত হয়নি যখন একা, হে সময় উত্তাল সময়, বীতংস, অগ্নি বিষয়ক সতর্কতা ও গৌতম, শাহীসংবাদ, ভালমানুষ, আন্তিগোনে, সওদাগরের নৌকা, হে সিন্ধু সারস, ব্যতিক্রম।

পরিচয় শৌভনিক প্রযোজিত মাত্র দু-খানি নাটকের সমালোচনা করেছে। অথচ সাফল্য-অসাফল্য মিলিয়ে এই নাট্যগোষ্ঠীর দান বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মোটেই কম নয়। এঁদের প্রায় কোনও নাট্য-প্রযোজনাই পরিচয়ের নাট্য-সমালোকদের কেন যে আকৃষ্ট করতে পারে নি, জানি না। ১৯৬০ অর্থাৎ ১৩৬৭-তে মুক্ত-অঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হয় এই নাট্যগোষ্ঠীরই উদ্যোগে, এখানেই এদের সব নাটক অভিনীত হয়েছে। পরিচয়ে অন্তত যে সব নাটকের সমালোচনা থাকতে পারত, অথচ নেই, তার একটি তালিকা দেবার চেষ্টা

করছি : মা (গর্কির উপন্যাস অবলম্বনে), মা হিংসী, ইব্সেনের গোস্টস, গোরা, বাঁশরী, মুক্তির উপায়, রাজা, রাজা ও রাণী, যা নয় তাই, এবং ইন্দ্রজিৎ, ছুটির ফাঁদে, বি টি রোডের ধারে, ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র, এক দুই তিন, কেন্দ্রবিন্দু, ঘুঘু।

ক্যালকাটা থিয়েটারে এবং পরবর্তীকালে কবচকুণ্ডল গোষ্ঠীতে বিজন ভট্টাচার্য স্মরণীয় কটি অভিনয় করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যে মৌলিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশেষ স্থান যে থাকবে এ-মত নিয়ে বিতর্কের অবকাশও বোধহয় সীমিত। নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তাঁর বিশিষ্টতা ছিল। পরিচয়ের নাট্যসমালোচনা বিভাগে কিন্তু একালের শক্তিমান এই নট-নাট্যকারের সম্যক মূল্যায়ন প্রতিফলিত হয় নি। তাঁর যেসব নাট্য-প্রযোজনা সমালোচিত হয়নি তারমধ্যে আছে : কলঙ্ক, মরাচাঁদ, গোত্রান্তর, গর্ভবতী জননী, চলো সাগরে (লাশ ঘুইর‍্যা থাউক), আজ বসন্ত, কৃষ্ণ পক্ষ।

তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। তবু এই সময়কালের মধ্যে যেসব প্রযোজনার সমালোচনা না থাকায় অসম্পূর্ণতা দেখা দিয়েছে তার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। সুন্দরম্-এর সাজানো বাগান, মেঘ ও রাক্ষস, চেতনার হারাণের নাত-জামাই, স্পার্টাকাস, রামযাত্রা, মারীচ সংবাদ, ভালমানুষের পালা ; থিয়েটার ওয়ার্কশপের রাজরক্ত ; থিয়েটার কমিউন-এর বিভুর বাঘ, পরবর্তী বিমান আক্রমণ, কিং কিং ; গন্ধর্বর মধুচক্র, বদনাম ; নাট্যায়নের হীরা স্বদেশ, মানুষরতন, গুপী গাইন বাঘা বাইন, গরম ভাত ; নক্ষত্রর লম্বকর্ণ পালা, রূপকারের চলচিত্ত চঞ্চরী, লালন ফকির ; চার্বাক-এর গদ্য পদ্য প্রবন্ধ ইত্যাদি।

সংখ্যা ও তথ্যের চিত্রটি সামনে রেখে এবার পরিচয়ের নাট্যসমালোচনা-গুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যাক। তালিকা থেকেই পাঠক বুঝতে পারছেন যে সমালোচকরা ব্যক্তিগতভাবে সকলেই মননশীলতা ও বুদ্ধি-জীবিতার দিক থেকে বিশিষ্ট। মনন ও বুদ্ধির মাত্রা বিষয়ে এঁদের মধ্যে হেরফের থাকতে পারে, কিন্তু সামান্যজনের তুলনায় তা নিঃসন্দেহে উন্নত পর্যায়ের। পরিচয়ের পাঠক সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে স্বখ্যাত বলে জানেন যে এ-জন্যই এঁদের লেখার মধ্যে অনায়াসে একটা নির্দিষ্ট মান বজায় থেকেছে, যাকে যে কোনও সমালোচনার নিরিখেই উন্নত বলা চলে। কয়েকজনের রচনাশৈলী তো বারংবার পাঠের উৎসাহ যোগায়। গোপাল

হালদার পাঁচটি নাট্যানুষ্ঠানের পরিচয় দিতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরেও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা অনেক দিন মনে রাখার মতো। হিরণকুমার সান্যালের রচনায় একটি তির্যক ভঙ্গি পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না। কৌতুক মিশ্রিত এই ভঙ্গির জন্যই তাঁর লেখা সুখপাঠ্য হয়েছে। একালের দুই বিশিষ্ট কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং সিদ্ধেশ্বর সেন বহুরূপীর দু'টি প্রযোজনার আলোচনা করেছেন, মঙ্গলাচরণ ১৩৬৪-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ডাকঘর নাটকের এবং সিদ্ধেশ্বর সেন ১৯৮০-র এপ্রিল সংখ্যায় মৃচ্ছকটিকের। সমালোচক হিসাবে এঁদের এই একবার করেই পাই। ১৩৬৪-র পরে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় আর সমালোচকের কলম ধরেন নি, ১৯৮০-র আগে সিদ্ধেশ্বর সেনের কাছ থেকে আমরা কোনও সমালোচনা পাই নি। এই দুই সমালোচনাই দুই কবির মেজাজের স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিফলিত করেছে। নতুনভাবে এঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। কেয়া চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায় এবং উষা গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ও হিন্দী নাটকের এই তিন বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীর মূল্যায়নও বিশেষ অভিজ্ঞতা দিয়েছে। অরুণা দেবী (হালদার), অরুণ সেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী কুশারী ডাইসন প্রমুখ অন্যতর ক্ষেত্রে কৃতী লেখকের সমালোচনার বৈচিত্র্য পাঠক হিসাবে আমাদের ঔৎসুক্য বাড়িয়েছে। তেমনি অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য এবং শৈবাল চট্টোপাধ্যায় নাট্যকার হিসাবেই পরিচিত, এঁদের সমালোচনারও তাই বিশেষ দিক নজর এড়ায় না। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিতি অবশ্যই নাট্যসমালোচক হিসাবে নয়, তবু এঁদের কাছ থেকে আমরা দুটি লেখা পেয়েছি, যার উল্লেখ অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বাকি যাঁরা রইলেন তাঁদের মধ্যে ধ্রুব গুপ্ত এবং শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তথা অজিষ্ণু ভট্টাচার্য নাট্যসমালোক হিসাবেই খ্যাত। তাই এঁদের লেখার বিষয়ে পাঠককে একেবারেই ভিন্নতর প্রস্তুতি নিয়ে পড়তে হবে। শুভ বসু ও শুভাশিস্ গোস্বামীর পরিচিতি নাট্যসমালোচক হিসাবে ততটা নয়, যতটা কবি হিসাবে।

সাহিত্যের অন্য ক্ষেত্রে কৃতী হলেই তিনি নাট্যসমালোচক হতে পারবেন না, এমন মূঢ় উপপাদ্যে পৌঁছানো আমার লক্ষ্য নয়। তবে সমালোচক আর বিদগ্ধ দর্শক অবশ্যই এক হতে পারেন না। সমালোচককে অনেক সময়ই, অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও, 'মাংস-কৃমি খুঁটতে' হয়। দর্শক ভালোলাগা বা মন্দ-

লাগার কথা জানান। কিন্তু সমালোচককে কেন ভালো বা কেন মন্দ সেকথা যুক্তি দিয়ে বোঝাতেই হয়, এমন কি সম্ভব হলে কি হলে ভালো হতো তার ইঙ্গিতও তাকে দিতে হয়। সমালোচনার জন্য তাই বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকে, কবি বা ঔপন্যাসিক কিংবা প্রবন্ধকারকে যেমন নিরন্তর অনুশীলনে নিজেকে গড়তে হয়। যেমন নিজের বোধ ও বুদ্ধিকে, আবেগকে বিকশিত করার জন্য অনলস অভিযান চালাতে হয়, সমালোচককেও তেমনি তাঁর বিষয়কে অনুপুঙ্খভাবে অধিগত করতে হয়। লিখতে লিখতে যেমন লেখক হয়, সমালোচকের ক্ষেত্রেও তেমনি সমালোচনা করতে করতেই ভালো সমালোচক হন। তাছাড়া সমালোচকের নিরপেক্ষতা, নৈর্ব্যক্তিকতা একটা বড় কথা। আমাদের দেশে এই নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জন করা খুব সহজ নয়। অনেক সময়ই অভিনেতা বা পরিচালক বা সংগঠকদের সঙ্গে সমালোচকের প্রত্যক্ষ একটা সম্পর্ক থেকে যায়। ফলে সমালোচনা কখনও প্রশস্তি হয়ে দাঁড়ায়, কখনও বা আক্রমণে পর্যবসিত।

১৩৬৭-র বৈশাখ সংখ্যা পরিচয়ে সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর লেখা বাংলা নাটকের রূপ ও রীতি প্রবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রবন্ধকার লিখছেন: 'নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা দেখতে পাই। ভাল অভিনয়ের গুণে সমালোচকের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়, নাটকের ত্রুটি সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকা পড়ে যায়। তেমনি অভিনয়ের দোষে ভাল নাটক কদর্য লাগে। এ ছাড়া আঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নাট্যশৈলী এবং অভিনয় ধারার নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনাও প্রয়োজন। নাটকের বক্তব্য-বিচার, সুষ্ঠু নাট্য সমালোচনার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলা বাহুল্য। এত প্রচুর বক্তব্যবিহীন নাটক সমালোচকদের দেখতে হয় যে ক্লান্ত হয়ে পড়া বিচিত্র নয়।'

পরিচয়েরই ১৩৭২, শ্রাবণ সংখ্যায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর নাট্যসমালোচনার মান শীর্ষক নিবন্ধে সমালোচকদের প্রতি উল্লেখিত সহমর্মিতার দেখা মেলে না। তাঁর নিবন্ধর শুরু এভাবে, '১৮৭২ সালে বাঙালি পরিচালিত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ১৯৬৫ সাল। এই দীর্ঘ ৯০ বছরেও বাঙলা ভাষায় থিয়েটার সমালোচনার কোনও মান তৈরি হয় নি।' এই নিবন্ধেই লেখক এক জায়গায় বলছেন, 'যোগ্যতা বা সততা দুয়েরই অভাব বাঙলাদেশের থিয়েটার সমালোচনায় প্রকট।'

পরিচয়ের ৭০টি নাট্যসমালোচনা পড়লে রুদ্রবাবুর প্রথম কথাটি মেনে

নিতে হয়, বাস্তবিকই সমালোচনার ধারাবাহিক নির্দিষ্ট কোনও মান গড়ে ওঠে নি। কিন্তু একই সঙ্গে দ্বিতীয় কথাটির প্রতিবাদ করতেই হয়, অন্তত পরিচয়ের অনেকগুলি লেখাতেই 'যোগ্যতা ও সততার' অভাব চোখে পড়ে নি। পরিচয়ের সমালোচনায় যেটি প্রধান অভাব বলে চোখে পড়ে তা এর নিরবচ্ছিন্নতার অভাব, ধারাবাহিকতার অভাব। এ-পত্রিকার প্রত্যেক সমালোচকেরই সমালোচনা বিষয়ে নিষ্ঠার হদিশ মেলে, কিন্তু নিজেকে সমালোচক হিসাবে গড়ে তোলা বা বিকশিত করার ইচ্ছার অভাব রয়েছে।

ধ্রুব গুপ্ত পরিচয়ে তিনটি মাত্র সমালোচনা লিখেছেন, ব্রিস্টল ওল্ড ভিকের অভিনয় (ফাল্গুন, ১৩৬৯), তিতাস একটি নদীর নাম (চৈত্র, ১৩৬৯), এবং নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র (আষাঢ়, ১৩৭১)। এর মধ্যে প্রথম দুটি সমালোচনা নিঃসন্দেহে বাংলার থিয়েটার সমালোচনার উন্নত মানকে প্রতিফলিত করে। প্রকৃতপক্ষে নাট্যসমালোচনা কি হওয়া উচিত, সমালোচকের আলোচনায় ভারসাম্য কতটা থাকা দরকার তা এই সমালোচনা দুটি পড়লে বোঝা যাবে। এই দুটি সমালোচনাকে বাংলা নাট্য সমালোচনার সম্পদ বললে অত্যুক্তির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়। প্রথম সমালোচনাটিতে ধ্রুববাবু সঙ্গতভাবেই 'অ্যাকাডেমিক' আলোচনার পরে এ দলের তিনটি নাট্য প্রযোজনার সমালোচনা করেছেন। এই প্রযোজনার ত্রুটি যেমন তিনি দেখিয়েছেন, তেমনি এদের গুণগুলিরও উল্লেখ করেছেন। তিতাস একটি নদীর নাম সমালোচনায়ও একই ধারা তিনি বজায় রেখেছেন। এটিও যথার্থ ভালো সমালোচনা। সমালোচনাটির কিছু অংশের উদ্ধৃতি আমার বক্তব্যকে বুঝতে সাহায্য করবে : 'জাপানী কাবুকী মঞ্চের আদর্শে মঞ্চের সামনের করিডোরে পাটাতন ফেলে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে পথ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। প্রস্থান ও প্রবেশ পথ হিসাবে দর্শকদের প্রবেশ পথকে ব্যবহার করার ফলে এবং ঐ পাটাতনের ওপর অভিনয়ের ফলে ড্রামাটিক অ্যাকশনের ক্ষেত্র মঞ্চের সীমাকে অতিক্রম করে দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগকে অনেকে যাত্রার পুনর্জন্ম ভেবে তুষ্ট হয়েছেন, অনেকে আবার বিরক্ত বোধও করেছেন। কিন্তু এ পদ্ধতির পূর্বতন আদর্শ যাই হোক না কেন, সুপ্রশস্ত নাট্যভূমি হিসাবে এই পথ অবলম্বন অপ্রযুক্ত নয়। মঞ্চের অভ্যন্তরে স্থাপত্যের দিক থেকে বিশেষ সরলতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বাঁশ ও খড়ের সাহায্যে রামকেশবের ঘর ও আঙিনায় সাঁকো তৈরি হয়েছে মোটামুটি ন্যাচারালিস্টিক আদর্শে।

পশ্চাৎপটে সাদা পর্দায় তাপস সেনের আলোক সম্পাতে নদীতীরের ও আকাশের সৃষ্টি হয়েছে, মেলার দৃশ্যে এবং পাগল কিশোরের স্মৃতি ফেরাবার চেষ্টার দৃশ্যে আলো আঁধারির মায়ার সৃষ্টি আমার কাছে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বলে মনে হয় নি। রামধনুর দৃশ্যটিতে একটু খেলোমির ছাপ আছে।' ধ্রুব গুপ্তর তৃতীয় সমালোচনাটিতে নাট্যকার হিসাবে পিরানদেল্লোর এবং তাঁর নাট্য বৈশিষ্ট্যের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। তার সঙ্গেই আমাদের দেশ ও সমাজে 'নাট্যকারের সন্ধানে…'র প্রাসঙ্গিকতা সমর্থন করেছেন লেখক। চার পৃষ্ঠার এই সমালোচনায় প্রায় আধ পৃষ্ঠার একটি প্যারাগ্রাফ-এ নাট্য প্রযোজনার কথা বলা হয়েছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ পাঠের স্বাদ পাওয়া গেলেও যথার্থ সমালোচনা একে বলা চলে না। একেবারে আনকোরা একটি উদ্যমী দলের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেবার জন্যই সম্ভবত সমালোচক বিশ্লিষ্ট সমালোচনায় যান নি। তবু, তিনি যখন বলেন, 'পিরানদেল্লোর **cerebral** নাটককে বাংলাতে যথেষ্ট পরিমাণে **emotional experience**'-এর বাহন করে তোলা হয়েছে। অথবা দেখান, 'ব্যক্তিগত অভিনয়ে কিছু কিছু ত্রুটি আছে। **Stylisation** সর্বত্রই সার্থক হয় নি—কারো কারো উচ্চারণে দোষ আছে।' তখন বোঝা যায় যে এ নাটকের সমালোচনা করার মতো রসদ তাঁর হাতে ছিল। হয়ত স্নেহ এসে পথ আগলেছে। সমালোচক হিসাবে স্নেহের দাবি মেনে নেওয়াও দুর্বলতার পংক্তিতেই পড়ে।

গোপাল হালদারের বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যই তাঁকে নাটকের অন্তর্নিহিত বিষয়টি ধরতে সাহায্য করেছে। তিনি মোট পাঁচটি নাট্য প্রযোজনা বিষয়ে লিখেছেন। কোনওটিই খুব বড় লেখা নয়, রঙ্গমঞ্চে পাবলবের প্রয়োগ (বৈশাখ, ১৩৬৬)-কে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্রাট নাটকের পরিচিতি বলা যেতে পারে—প্রসঙ্গত পাভলভ পরিচিতিও। মিনার্ভার অবদান শিরোনামে (অগ্রহায়ণ ১৩৬৬)-তে বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, নিচের মহল এবং ওথেলোর এবং ১৩৬৭-র আষাঢ় সংখ্যায় অঙ্গারের শততম অভিনয় শীর্ষক রচনায় অঙ্গার প্রযোজনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন; কোনটিই পূর্ণ সমালোচনা নয়—পরিসরের দিক থেকেও বটে, আলোচনার সংক্ষিপ্ততা হেতুও বটে। তবু ঘননিবদ্ধ এই আলোচনায় গোপাল হালদার নির্দ্বিধ মন্তব্য করতে কসুর করেন নি। নাটক বোঝা বা তার সমালোচনা করার ব্যাপারে তাঁর যে ষোল আনা দক্ষতা আছে

তা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তিনি বাংলা থিয়েটার সমালোচনার আদলটি তুলে ধরা সত্ত্বেও একে পুষ্ট করার দিকে মন দিলেন না।

(১) 'এর মধ্যে নিচের মহল বোধহয় সর্বাধিক সার্থক, ওথেলোও তদ্রূপ। নিচের মহলের অভিনয়কালে তথাপি লক্ষ্য করেছি প্রেক্ষাগৃহে সকল দর্শক-দর্শিকা তা সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারছেন না। দোষ অভিনয়ের নয়, বিষয়টি বাঙালি দর্শকদের অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। অথচ নিচের মহল আমাদের বিবেচনায় সার্থক অভিনীত নাটক।' (২) 'সূত্রধার দিয়ে পরিচয় করানো অভিনয়ের প্রথম ত্রুটি। ...অভিনয়ের দ্বিতীয় ত্রুটি সেদিনের প্রহসনের অনেক কথা ও ব্যাপার স্থূল ঠেকে। কাজেই অভিনয়ার্থ শেক্‌সপীয়রও যদি মার্জিত হয়, মধুসূদনকেও তা করলে অন্যায় হত না। না করলেই কেমন বাধে। তৃতীয়ত অভিনয়ে বাহুল্য প্রচুর।' এবং (৩) 'অঙ্গারে এ সন্ধান বহন করে এনেছে দুটি বস্তু—এক, মজুরজীবনের কঠিনতম বাস্তবতা ও নীরন্ধ্র অমানুষিকতা আমাদের রঙ্গমঞ্চে এভাবে উত্থাপিত হল এই প্রথম। দুই, তার প্রযোজনার দিক, এমন অদ্ভুত প্রযোজনা আলোকশিল্পের এই সার্থক প্রসারের পূর্বে অগোচর ছিল। এই প্রসঙ্গেই তাই বলা যেতে পারে—অঙ্গারের প্রধান রচয়িতা আলোক-শিল্পী তাপস সেন—নাট্যকার নন, অভিনেতারাও নন। তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা পালনে কার্পণ্য করেন নি, কিন্তু আলোকশিল্পই তাঁদের প্রধান নির্ভর।' এই তিনটি উদ্ধৃতিই আমার বক্তব্য বিষয়কে সমর্থন করবে।

রাজা অয়দিপাউস (ভাদ্র, ১৩৭১)-এর সমালোচনায় শ্রীহালদারের গবেষক মন বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। তাই বোধহয় এই লেখাটিতে গ্রীক নাটক, গ্রীক স্থাপত্য ও সমাজ ব্যবস্থা বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য আহরণ ও তা বিতরণেই তিনি সার্থকতা পেয়েছেন। নাট্য-প্রযোজনার অংশটি স্বভাবতই এখানে হ্রস্বতর।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় মাত্র একটি সমালোচনা লিখেছেন। তাঁর সমালোচনায় 'সততা ও যোগ্যতার' অভাব ঘটে নি। বহুরূপীর ডাকঘর প্রযোজনার (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩) এই সমালোচনাটি স্মরণীয় হয়ে থাকার পর্যায়ে পড়ে। আমাদের দুর্ভাগ্য দ্বিতীয়বার তিনি নাট্যসমালোচকের কলম ধরেন নি। নাতিদীর্ঘ এই সমালোচনায় বহুরূপীর প্রযোজনা বিষয়ে যথার্থই তিনি বলেন, 'অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আবহ কল্পনা এবং সবকিছু মিলিয়ে

নাট্যরুচির ক্ষেত্রে এঁরা স্বদেশে একটি নতুন মান স্থাপন করেছেন।

তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় 'ডাকঘর' অভিনয় এঁদের পূর্বকৃতির মান রেখেছে। এতে প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই সুঅভিনীত, বিশেষ করে শিশু চরিত্র ক-টি। ...এ ছাড়া 'ডাকঘরে'র মঞ্চসজ্জা, আবহ-সঙ্গীত ও আলোকসম্পাত 'কুশীলবদের' প্রার্থিত সাহায্যই দিয়েছে।

তবে অভিনয় দেখতে দেখতে এক-আধটা কথা যে মনে হয় না তা নয়। যেমন অমলের অভিনয় খানিকটা ভঙ্গিপ্রধান লাগে। মৃত্যুর দৃশ্যে আলোক-সম্পাতের সাহায্যে করুণরস জমানো নজরে না পড়ে পারে না।

কিন্তু মনে হয় এসব নিছক মঞ্চ অভিনয়ের ত্রুটি নয়। এর আলোচনা হয়তো অনেকখানিই মঞ্চের এক্তিয়ার ছাড়িয়ে। অর্থাৎ, মূল নাটকের তত্ত্ব ও তাৎপর্যের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।' বহুরূপীর প্রয়োজনায় অমলেব মৃত্যুদৃশ্যকে আলো, অভিনয় ও আবহে করুণরসে আপ্লুত করা হয়েছে এবং তা রসাভাস ঘটিয়েছে, এমন সমালোচনা করে মঙ্গলাচরণবাবু যথার্থই বলেছেন: 'আর মৃত্যু আর মুক্তি যখন সমার্থক হয়, তখন সে মৃত্যু অপ্রাপ্তিতে শূন্য নয়, চরিতার্থতায় পূর্ণ। করুণ নয়, সে মৃত্যু তখন শান্ত রসের দ্যোতক।' মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের এই সমালোচনাটি অনেকদিন মনে রাখার মতো।

অজিষ্ণু ভট্টাচার্য পরিচয়ে সবচেয়ে বেশি নাটকের সমালোচনা করেছেন। নাট্যসমালোচনা হিসাবে সবগুলি মনে রাখার মতো না হলেও তাঁর লেখায় একটা ধারা প্রবর্তনের নিষ্ঠা স্পষ্ট, তাঁর যোগ্যতা বিষয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে না। তথ্য ও তত্ত্ব সন্ধানে এবং তা পরিবেশনে তাঁর পরিশ্রম প্রশংসনীয়। কিন্তু সমালোচক হিসাবে সর্বত্র তিনি সমান সাফল্য পান না, ভারসাম্য রক্ষিত হয় না। মঞ্জরী আমের মঞ্জরী (বৈশাখ, ১৩৭২)-র সমালোচনাটি ৮ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তি জুড়ে আছে। এর মূল্যবান অংশ লালমোহন চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় নৈপুণ্যের চমৎকার বিশ্লেষণ। সমালোচনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্বও এই যথার্থ মূল্যদানে। নইলে চেখভ, স্তানিশ্লাভস্কি—বিষয়ে তথ্য ও গবেষণামূলক আলোচনা এবং অজিতেশ ও চেখভের নাটকে সংলাপের তুলনামূলক বিচারেই সমালোচনাটির তিন চতুর্থাংশেরও বেশি ব্যয়িত হয়েছে। একটি নাট্য প্রযোজনার সমালোচনা হিসাবে এই ভারসাম্যহীনতা অবশ্যই অভিপ্রেত নয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ হিসাবে এর মূল্য হয়তো আছে, কিন্তু নাট্য-সমালোচকের কাছ থেকে প্রযোজনার সমালোচনাই অধিক কাম্য।

এই সমালোচকেরই বাংলায় আর্থার মিলার—চতুর্মুখ-এর জনৈকের মৃত্যু (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৭২)-র সমালোচনায়ও অনুরূপ ভারসাম্যহীনতার দেখা মেলে। পাঁচ পৃষ্ঠার এই সমালোচনার প্রথম পৃষ্ঠায় আছে 'নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে নাট্যকার-পরিচালক এল্‌মার রাইস্ তাঁর ছাত্রদের কোন এক কাল্পনিক রেপার্টরি থিয়েটারের জন্য নাটক নির্বাচনের দায়িত্ব' দেওয়ার ফলে যা ঘটেছিল তার বিবরণ, এবং সমালোচকের মন্তব্য 'সেই নাটক বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনে এসে পৌঁছল দেখে আনন্দ হয়।' এই পৃষ্ঠাতেই সমালোচক 'মিলারের নাট্যচিন্তার আসল তত্ত্বটা' আলোচনা শুরু করে ডেথ অব এ সেল্‌স্‌ম্যান এবং জনৈকের মৃত্যু নাটকের রচনাগত তুলনা করেছেন পুরো দ্বিতীয় পৃষ্ঠা জুড়ে। তৃতীয় পৃষ্ঠায় ১৯৪৮-এ ব্রডওয়ে প্রযোজনায় এবং ১৯৪৯-এ লণ্ডনে ফিনিক্স-এ পল মুনি অভিনীত প্রযোজনায় মঞ্চ স্থাপত্যের বিবরণ দিয়েছেন। এই পৃষ্ঠাতেই ১৯৫৬ সালে 'অ্যাটলান্টিক মান্থলি' পত্রিকার এক প্রবন্ধে নাট্যকার মিলার এই নাটকের 'অভীষ্ট অভিনয় রীতির' কি আভাস দিয়েছিলেন তার বিশদ উদ্ধৃতি আছে। চতুর্থ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্রাভিনেতার অভিনয়ের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা। পঞ্চম পৃষ্ঠায় আবার ১৯৬০ সালে 'এ ভিউ ফ্রম দ্য ব্রিজ নাটকের মুখবন্ধে মিলারের বক্তব্যের উদ্ধৃতি এবং ১৯৬০—এই 'হার্পার্স ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত মিলারের আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে সমালোচনার শেষ। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের নাট্যসমালোচনা হয়তো পাঠককে জ্ঞানবান করে, তথ্য যোগায় কিন্তু প্রযোজনা বিষয়ে ছিন্ন টুকরো মন্তব্য ছাড়া আর কিছু দেয় না। সমালোচকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না।

অগ্নিষ্ণু ভট্টাচার্যই ঋতায়ণের মৃত্যুর চোখে জল (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৭২) ও তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়া তার: বহুরূপীর পুনঃ প্রযোজনা (বৈশাখ, ১৩৭৩)-তে সংক্ষিপ্ত পরিসরে মোটামুটি ভালো সমালোচনা করেছেন।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচয়ে একটিমাত্র নাট্য সমালোচনা আছে। বাদল সরকারের বাকি ইতিহাস—বহুরূপী প্রযোজনা (আষাঢ়, ১৩৭৪)। ৬ পৃষ্ঠার এই সমালোচনায় অগ্নিষ্ণু ভট্টাচার্যের ভারসাম্যহীনতা নেই। সমালোচনাটি যথার্থই সুলিখিত। কিন্তু দীর্ঘ এই সমালোচনা পড়লেই বোঝা যায় শমীকবাবু বাদলবাবু ও বহুরূপীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতায়

আত্মীয়তা কাটাতে পারেন নি। ফলে সমালোচনার মাঝে মধ্যেই কাল্পনিক প্রতিপক্ষ খাড়া করে তিনি নাট্যকারের হয়ে লড়ে গেছেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষকে স্বল্প বুদ্ধি ও অল্প মেধার মানুষ বলে ইঙ্গিত করতেও ছাড়েন নি। আর এই জন্যই, এই পক্ষপাতিত্বের দায় বহন করার জন্যই সমালোচনাটি সম-আলোচনা হতে পারে নি। গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৭৪-এর শ্রাবণ সংখ্যায় এই সমালোচনার ঝাঁঝাল প্রতিবাদ করে 'নাট্য সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি' নামে যে লেখাটি লিখেছেন তার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদলবাবুকে সমর্থন করতে গিয়ে আত্মহত্যার সামাজিক ও অস্তিত্ববাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সার্ত্র-এর সঙ্গে বাদলবাবুর সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করেছেন। এ প্রসঙ্গে গীতা বন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি চমৎকার: 'ও প্রান্তে একদল বেশি খেয়ে ঢেঁকুর তুলছে বলে খালি পেটে ওদের দেখাদেখি আমাদেরও ঢেঁকুর তোলা সাজে না।'

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবের সন্ধানে নাট্যকার: লিট্‌ল্ থিয়েটারের কল্লোল (আষাঢ়, ১৩৭২) সমালোচনা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। সরাসরি রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণের নিরিখে নাট্যকার-প্রযোজক উৎপল দত্তের কল্লোলকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেখিয়েছেন সুব্রতবাবু। পরিচয়ে প্রকাশিত সমালোচনাগুলির মধ্যে দীর্ঘতম (৯ পৃষ্ঠারও বেশি) এই রচনাটিতে তিনি একটি রাজনৈতিক প্রবণতার সময়োচিত স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এমন সরাসরি রাজনৈতিক সমালোচনা পরিচয়ের নাট্য সমালোচনা বিভাগে দ্বিতীয়টি আর হয় নি। লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ-এরই আর একটি প্রযোজনা অজেয় ভিয়েতনাম (মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭৩)-এ অজিষ্ণু ভট্টাচার্য রাজনৈতিক দিকটি সমালোচনার সুযোগ পেয়েও এড়িয়ে গেছেন। অথচ সে নাটকে রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা কল্লোলের তুলনায় বেশি ছাড়া কম ছিল না। কল্লোলের এ-সমালোচনা এই অর্থে ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে।

নাট্যকার উৎপল দত্ত যে কল্লোল নাটকে ইতিহাস থেকে বারবার বিচ্যুত হয়েছেন এবং খেয়ালখুশি মতো এমন কি জনগণের সংগ্রামকেও খাটো করেছেন, তথ্য তুলে তুলে সমালোচক তা প্রতিপন্ন করেছেন। উৎপল দত্ত ঐতিহাসিক নাটক রচনা ও প্রযোজনায় হোকুথ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং নাট্য রীতিতে ব্রেখ্‌ট্‌কে মেনে চলেছেন বলে যে প্রচার তিনি চালাচ্ছিলেন তা খণ্ডন করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমালোচনায় লিখেছেন,

'হোকুথের নাট্যাদর্শের অনুকরণে শ্রীদত্তও তাঁর নাটকের সঙ্গে একটি টীকা সংযোজন করেছেন 'নৌ-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক পটভূমিকা'। কিন্তু ঐ উচ্চাদর্শ বিস্মৃত হয়ে শ্রীদত্ত ইতিহাসের সেই সব ঘটনাই উল্লেখ করেছেন যা তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে। হোকুথের নাট্যাদর্শের উল্লেখ করে শ্রীদত্ত নিজেকে বাস্তবিক হাস্যাস্পদ করেছেন।'...'শ্রীদত্ত দাবি করে থাকেন যে তিনি ব্রেশ্‌ট্-এর নাট্যাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। ব্রেশ্‌ট্-এর alienation বা বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বের প্রয়োগ হিসাবেই বোধহয় সূত্রধারের বিচার করা দরকার। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। যখন মঞ্চের ঘটনাবলী দর্শকের মনকে নাটকের সঙ্গে একাত্মতায় বাঁধতে অক্ষম হচ্ছে, তখনই সূত্রধার গরম গরম বক্তৃতার জোরে কৃত্রিমভাবে সেই একাত্মবোধ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে।'

কল্লোল নাটকে উৎপল দত্তর রাজনৈতিক মতবাদেরও সুন্দর বিশ্লেষণ আছে এ সমালোচনায়: 'এটি একটি অত্যন্ত মারাত্মক রাজনৈতিক মতবাদের প্রকাশ। শ্রীদত্তর বিপ্লব চিন্তায় শ্রমিক শ্রেণীর কোনো ভূমিকা নেই, তারা কেবল মুষ্টিমেয় সংগ্রামী বীর বিপ্লবীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ধর্মঘট করতে পারে। শ্রীদত্তর মতে বিপ্লবী গণসংগ্রামের চেয়ে মুষ্টিমেয় কিছু বীর বিপ্লবীর শহীদ হওয়া ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বের কোনো প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র কিছু বিপ্লবীর দ্বারাই যেন বিপ্লব সম্ভব। তাঁর বিচারে প্রয়োজন আসলে elite বা বাছাই করা কিছু ব্যক্তির।

বিপ্লবের এই মধ্যবিত্তসুলভ চিন্তাধারা বহুকাল আগেই ইতিহাসের আবর্জনা স্তূপে স্থান পেয়েছে।'

সমালোচক তাঁর সমালোচনা শেষ করেছেন এই ভাবে: 'শেষ পর্যন্ত একটা প্রশ্নের মীমাংসা হল না। শ্রীউৎপল দত্ত কি সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়ার এই বিপজ্জনক খেলায় যোগ দিয়েছেন, না এটা তাঁর ইয়াগো-সুলভ 'motiveless malignity' বা উদ্দেশ্যহীন বিদ্বেষের প্রকাশ?'

পরিচয়ে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে যে কজন নাট্য সমালোচক এসেছেন তাঁদের মধ্যে অরুণ সেন ও ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের সমালোচনাকে প্রকৃত ভালো সমালোচনার পর্যায়ে ফেলা চলে। অরুণ সেনের সমালোচনার ভঙ্গিতে একটু ব্যক্তিগতভাব ফুটে উঠলেও (এবং বোধহয় এ জন্য পড়তে ভাল লাগে) নাট্যসমালোচনার সামগ্রিকতার দেখা পাওয়া যায়, তাঁর লেখায় সমালোচকের নির্দ্বিধাও লক্ষণীয়। জ্বালা, বিধি ও ব্যতিক্রম (এপ্রিল, ১৩৭৯), পাপপুণ্য, (পৌষ, ১৩৮৫) আমার বক্তব্যকে সমর্থন করবে। পাপপুণ্য-র

সমালোচনায় নাট্য প্রযোজনা বিষয়ে আর একটু বিশদ হলে ভালো হত, তবু এটি নিঃসন্দেহে 'সৎ ও যোগ্য' ব্যক্তির উৎকৃষ্ট এক সমালোচনা।

উষা গঙ্গোপাধ্যায় ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা, নয়াদিল্লীর চারটি হিন্দী নাটকের সমালোচনা করেছেন। নাট্য প্রযোজনার এমন নিখুঁত সমালোচনা ধ্রুব গুপ্তর সমালোচনাকে মনে পড়িয়ে দেয়। উষার লেখায় পণ্ডিতি ভাবটা নেই কিন্তু নাট্য প্রযোজনা বিষয়ে কিভাবে লিখতে হয় তা তাঁর আয়ত্তে আছে।

অশোক মুখোপাধ্যায় নিজে অভিনেতা। তিনি বিভিন্ন সময়ে পরিচয়ে তিনটি প্রযোজনার সমালোচনা লিখেছেন। এর মধ্যে রঙ্গিনী (শ্রাবণ, ১৩৭৪)-র সমালোচনাটি, অসম্পৃক্তি থাকার দরুনই বোধহয়, যথার্থ সমালোচনা হতে পেরেছে। তাঁর দানসাগর, জগন্নাথ (কার্তিক, ১৩৮৪)-ও লেখা হিসাবে খুবই ভালো লেখা। নাটকের প্রযোজনাগত দিকের সমালোচনাটি ভারি সুন্দর এসেছে। কিন্তু এই দুই নাটকের সমালোচনায় অশোকবাবু ঠিক সমালোচক থাকতে পারেন নি, বা চান নি। গ্রুপ থিয়েটারের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক মমত্ব সমগ্র রচনাটিতেই প্রকাশ পেয়েছে। এর প্রথম অংশের গ্রুপ থিয়েটারের সমস্যা এবং থিয়েটার কমিউন ও চেতনার পরিচিতির অংশটি পৃথক নিবন্ধে স্থান পেলেই মানায় ভালো। তাছাড়া এই পরিচিতি অংশে লেখকের ব্যক্তিগত সম্পৃক্তি তাঁর সম্পর্কে নির্দিষ্ট একটি ধারণা জন্মে দেয়, ফলে পাঠক আর নিরপেক্ষতা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ থাকতে পারেন না। সেজন্যই এমন ভালো সমালোচনাও স্নেহের আধিক্যহেতু শেষ রক্ষা করতে পারে না। বহুরূপীর পাগলা ঘোড়া (কার্তিক, ১৩৭৮) মূলত নাট্যকার বাদল সরকারের মূল্যায়ন। প্রযোজনার সঙ্গে একাত্ম ভাবটা বাদ দিতে পারলে অশোকবাবুর মধ্যে সত্যিকারের একজন সমালোচককে আমরা পেতে পারি।

শুভ বসু যখন লেখেন, 'রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর ভক্ত আমি বহু দিনের' নান্দীকারের ফুটবল (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪), বা 'তাপস সেনের আলো, অতএব, এখন তা সাধারণ নিন্দা-প্রশংসার অতীত নিশ্চয়' চাকভাঙা মধু (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭৯), তখন নাট্য সমালোচক হিসাবে তাঁর অসুবিধার জায়গাটা বুঝতে আমাদেরও অসুবিধা হয় না। আর এজন্যই, নিষ্ঠা ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও ভালো লেখাও সমালোচনায় পৌঁছয় না। অমলেন্দু চক্রবর্তীর খড়ির গণ্ডি (কার্তিক, ১৩৮৫) সমালোচনায়ও 'কুশীলবদের

পোশাকে রঙের সঙ্গতি এনেছেন রঘুনাথ গোস্বামী, মঞ্চ পরিকল্পনায় কুমার রায়। দুজনেই শ্রদ্ধেয় শিল্পী।' হঠাৎ বেখাপ্পা ঠেকে। কিন্তু নাট্য-সমালোচনায়, নান্দীকার তথা রুদ্রপ্রসাদকে বাহবা দানের ভঙ্গিটি থাকলেও, অমলেন্দুবাবু চোখ-কান-মস্তিষ্ক খোলা রেখে যথার্থতায় পৌঁছতে চেয়েছেন, পেরেছেনও বোধহয়।

তিরিশ বছরের প্রায় ৭৫টি নাটকের সমালোচনা ঘেঁটে এই যে বেশ কটি ভালো সমালোচনার দেখা পাওয়া গেল তাই বা কম কিসে? এদের বাইরেও পরিচয়ে সময়ে-অসময়ে অনেক সমালোচনা লেখা হয়েছে। আগেও বলেছি, আবারও বলি, সেগুলিও রচনা হিসাবে সাধারণ মানের উপরেই। কিন্তু অনুশীলন ও প্রস্তুতির অভাবে উচ্চমানে পৌঁছতে পারে নি। অনেকগুলিতেই সমালোচনার নামে কেবল প্রশস্তি বা কেবল নিন্দা, কোথাও বা শুধু নাটকটির সাহিত্যগত মূল্যায়ন যা পুস্তক সমালোচনাতেই মানায়, কোথাও সমালোচক নিছক নিজের ভালো লাগার তাগিদে নেহাৎ ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কেউ বা বৈঠকি মেজাজে স্রেফ বাহবা দিয়ে গেছেন। বস্তুত এসব ভালো সমালোচনার স্তরে পৌঁছয় না।

কেতকী কুশারী ডাইসন-এর ভোমা : একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা (আষাঢ়, ১৩৮৪)-র শিরোনামই বুঝিয়ে দেয় লেখিকা প্রশস্তি গড়ার জন্য তৈরি হয়ে কলম ধরেছেন। তারপর তাঁর লেখা যত এগিয়েছে ততই ব্যক্তিগত আবেগ, উচ্ছ্বাস ও মুগ্ধতার বান ডেকেছে। বস্তুত এ ধরনের রচনা, যাতে 'তাঁর এক-একটি বক্তব্য বিস্ফোরণের মতো আমাদের সামনে ফেটে পড়তে থাকে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে এমনই তাঁর বক্তব্য উপস্থানের শিল্প সচেতন কমিক চাতুর্য যে না হেসে পারছিলাম না।। আমি অনেক হেসেছি, এবং অন্যান্য দর্শকেরা যে কি করে গম্ভীর গম্ভীর মুখে বসেছিলেন সেটাই আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকছিল।' থাকে, শুধু আবেগ আতিশয্যের মন্তব্য—বক্তব্য বিষয়কে যুক্তিসহ করার কোনই প্রয়াসই যে রচনায় নেই তাকে সমালোচনা বলে মেনে নেয়া যায় কি?

বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় আজকের প্রহসন (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯) শিরোনামে রূপকারের ব্যাপিকা বিদায়-এর সমালোচনা লিখতে গিয়ে নাটক দেখার বিমুগ্ধতা কাটাতে পারেন নি। লেখা শুরু করেন, 'আশ্চর্য হতে হয়, অভিনয় ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের এই পরাকাষ্ঠায়। শ্রীসবিতাব্রত দত্তের পরিচালনায় অমৃতলাল বসু রচিত রূপকার সম্প্রদায়ের ব্যাপিকা বিদায় মনে রাখার

মতো।' সুলিখিত বৈদগ্ধপূর্ণ লেখাটি আগাগোড়াই অভিভূত প্রশস্তি, সমালোচনা নয়।

অরুণা দেবী (হালদার) মুদ্রারাক্ষস (অগাস্ট-অক্টোবর ১৯৭৯)-এ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য বিষয় চমৎকার নিবন্ধ লিখেছেন। সঙ্গে নান্দীকার গোষ্ঠী বিশেষত শম্ভু মিত্রের নিরঙ্কুশ প্রশংসা। ফলে পাঠকের কাছে লেখাটির অন্যতর মূল্য থাকলেও একে নাট্যসমালোচনা হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না। তবে, এই সমালোচনা বিষয়ে অগ্রহায়ণ, ১৪৮৬ সংখ্যায় রুশতী সেন যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাতে একটি ভ্রম সংশোধিত হলেও, তাঁর লেখাটিও কিছু পক্ষপাত দুষ্ট।

কেয়া চক্রবর্তীর দেবীগর্জনের (ভাদ্র, ১৩৭৩) শুরুটা এ রকম: 'নিজের দেশ ও সমাজকে বাদ দিয়ে বানিয়ে তোলা বিদেশী নাটক দেখে দেখে আমরা অনেকেই যখন ক্লান্ত—ক্লান্ত-ক্লান্ত, তখন বহুদিন পরে একটু অন্য হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া গেল। আমরা তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমাদের গ্রামীণ মৃত্তিকার একটা দেশ আছে এবং সেটার আয়তন ও সমস্যা কম নয়। হঠাৎ সে মৃত্তিকার দেখা পাওয়া গেল এ নাটকে।' সমালোচনাটিতে এই সৎ-আবেগের জের টানা হয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর সেন মৃচ্ছকটিকের (চৈত্র, ১৩৮৬) সমালোচনাতেও সংস্কৃত নাটক তথা শূদ্রকের নাট্যনৈপুণ্য বিষয়ে বাস্তবিক সুচারু শৈলীতে রচনা করেছেন, যা পড়তে ও জানতে ভালো লাগে। এতে বহুরূপী ঘরানা সম্পর্কে বিমুগ্ধতার প্রকাশ ঘটেছে।

এছাড়া অজিত গঙ্গোপাধ্যায় নাট্যসমালোচনার নামে পুস্তক সমালোচনা করেছেন, অমিতাভ দাশগুপ্তের লেখায় অমনস্কতা বড় বেশি প্রকট হয়েছে, অরুণ সেন ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় একই নাটকের (তিন পয়সার পালা) সমালোচনা করতে গিয়ে ব্রেখ্‌ট্‌ রীতি সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন।

হিরণকুমার সান্যালের রক্তকরবীর সমালোচনার উল্লেখ দিয়ে এ নিবন্ধের আরম্ভ হয়েছিল। তাঁকে দিয়েই শেষ করা যাক। নাট্যসমালোচনা ক্ষেত্রে তিনি একেবারেই একক, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়েছে আমার। লেখন শৈলীতে প্রচণ্ড 'হিউমারের' স্পর্শ পাঠককে যেমন সজীব রাখে, তেমনি তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে ভাবায়—বিতর্কের সৃষ্টি করে। এমন জোরের সঙ্গে তিনি যুক্তিসহ মন্তব্য করেন যে বিতর্কের অবকাশ আছে

জেনেই যেন প্রতিপক্ষকে জবাব দেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন এমন একটা প্রতীতি জন্মায়। সমালোচকের এই ভাবনা সৃষ্টি করা বা বিতর্ক গড়ে তোলার গুণটি তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। এবং বাংলা নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্রে লুপ্ত একটি ধারার সন্ধানও দিয়েছে। হিরণকুমার সান্যালের সমালোচনার দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের পর্যালোচনা শেষ করছি ; (১) 'গুরুতর ত্রুটি বলছি এই কারণে যে গলদ একেবারে গোড়ায়, অর্থাৎ নায়িকা নন্দিনীর ভূমিকায়। বহুরূপী যে নন্দিনীর সৃষ্টি করেছেন, সে রবীন্দ্রনাথের নান্দনী নয়। আমি বলছি না যে বহুরূপীর নন্দিনী মনকে স্পর্শ করে না, কিন্তু আরো বেশি করত যদি রবীন্দ্রনাথের নন্দিনীর সঙ্গে কোনও দিন পরিচয় না থাকত।...অবশ্য নন্দিনীর ডাকে রাজা ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হয়ে যান, তাঁর পৌরুষ টলমল করে। কেননা রাজার মধ্যে রয়েছে গুরুতর অন্তর্বিরোধ ; এই অন্তর্বিরোধের উৎস স্রষ্টার মনে। কিন্তু এ অন্তর্বিরোধ ফোটাতে হবে কি গলায় গিটকিরি দিয়ে ? আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের বাণী আরও রাবীন্দ্রিক করে উচ্চারণের চেষ্টা শম্ভু মিত্রের মুদ্রাদোষ দাঁড়িয়েছে। তাই তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বা পদ্যের আবৃত্তি অত কানে লাগে।' (রক্তকরবী, শ্রাবণ ১৩৬১)। (২) শেষ দৃশ্যে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া গরিবের ঘরের আবদারে ছেলে ঘরে ফিরে দেখল, যে-দাদা তাঁকে বুকে করে মানুষ করেছিল ভাইয়ের শোকে সে গিয়েছে মারা। অতঃপর দাদা-দাদা বলে ছেলেটি এমন কাঁদল যে আমরাও দাদা-দাদা বলে কাঁদতে-কাঁদতে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে রক্ষা পেলাম। এক্ষেত্রে হাঁপ কথাটির পারিভাষিক অর্থ ইংরাজিতে যাকে বলে 'টেনশন'। (পণরক্ষা, শ্রাবণ, ১৩৬২)।

তালিকা নং ১

২৪ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬১ : বহুরূপীর রক্তকরবী—হিরণকুমার সান্যাল।

২৪ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬১ : থর্নডাইক দম্পতি—সুনীল চট্টোপাধ্যায় ; তরঙ্গ / দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত—হিরণকুমার সান্যাল।

২৪ বর্ষ একাদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬২ : নৃত্যনাট্য, মায়ার খেলা ও চিত্রাঙ্গদা—হিরণকুমার সান্যাল।

২৫ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬২ : দক্ষিণী সম্প্রদায়ের পণরক্ষা—হিরণকুমার সান্যাল।

২৫ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬২ : চণ্ডালিকা, তাসের দেশ—হিরণকুমার সান্যাল।

২৫ বর্ষ নবম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬২ : কলকাতায় দ্বিতীয় নাট্যোৎসব—অমরেন্দ্র পাঠক।

২৬ বর্ষ একাদশ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ : বহুরূপী ও ডাকঘর—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

২৮ বর্ষ দশম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৬ : রঙ্গমঞ্চে পাবলবের প্রয়োগ—গোপাল হালদার।

২৮ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৬ : রঙ্গজীবনের নবসংগঠন—গোপাল হালদার।

২৯ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ : মিনার্ভার অবদান—গোপাল হালদার।

২৯ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৭ : অজারের শততম অভিনয়—গোপাল হালদার।

৩১ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬৮ : *কয়েকটি অভিনয়—অজিত গঙ্গোপাধ্যায়।

৩২ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৯ : লিটল থিয়েটার : রূপকারের তিলতর্পন—অলক চট্টোপাধ্যায়।

৩২ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬৯ : ব্রিস্টল ওল্ড ভিকের অভিনয়—ধ্রুব গুপ্ত।

৩২ বর্ষ নবম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৯ : তিতাস একটি নদীর নাম—ধ্রুব গুপ্ত।

৩২ বর্ষ একাদশ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ : ***আজকের প্রহসন—বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়।

৩৪ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭১ : রাজা অয়দিপাউস—গোপাল হালদার।

৩৪ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭১ : নান্দীকার প্রযোজিত নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র—ধ্রুব গুপ্ত।

৩৪ বর্ষ দশম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭২ : বাঙলায় চেহভ / নান্দীকারের মঞ্জরী আমের মঞ্জরী—অজিষ্ণু ভট্টাচার্য।

৩৪ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭২ : বিপ্লবের সন্ধানে নাট্যকার / লিট্‌ল্‌ থিয়েটারের কল্লোল—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ; শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের মায়ার খেলা—অপ্রতিম বসু ; কলকাতায় এমলিন উইলিয়ামস—শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৫ বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ যুগ্ম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭২ : বাঙলায় আর্থার মিলার / চতুর্মুখ-এর জনৈকের মৃত্যু—অঞ্জিষ্ণু ভট্টাচার্য ; ঋতায়নের মৃত্যুর চোখে জল—অঞ্জিষ্ণু ভট্টাচার্য।

৩৫ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭২ : মঞ্চপ্রভা-র জনক জননী—অঞ্জিষ্ণু ভট্টাচার্য ; কলকাতায় হিন্দী নাটক / অনামিকার কাঞ্চনরঙ্গ—হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়।

৩৫ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা, মাঘ ১৩৭২ : কলকাতায় সোভিয়েত ব্যালে—অঞ্জিষ্ণু ভট্টাচার্য।

৩৫ বর্ষ দশম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৩ : তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়া তার/ বহুরূপীর পুনঃপ্রযোজনা—অঞ্জিষ্ণু ভট্টাচার্য।

৩৬ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭৩ : দেবী গর্জন—কেয়া চক্রবর্তী।

৩৭ বর্ষ সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৩ : **কলকাতা থিয়েটার : গত এক বছর—অঞ্জিষ্ণু ভট্টাচার্য।

৩৬ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৪ : বাদল সরকারের বাকী ইতিহাস/ বহুরূপী প্রযোজনা—শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৭ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭৪ : পেশাদারি গড্ডলিকায়—অশোক মুখোপাধ্যায়।

৩৭ বর্ষ অষ্টম ও নবম যুগ্ম সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৪ : চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড—নাট্যসমালোচক।

৩৮ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৭৫ : গন্ধর্ব-র একা.নয়।

৩৮ বর্ষ নবম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৫ : শৌভনিকের আন্তিগোনে—স্বর্ণেন্দু রায়চৌধুরী।

৩৮ বর্ষ দশম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৬ : অনামিকা-র এবম্‌ ইন্দ্রজিৎ—উমানাথ ভট্টাচার্য।

৩৯ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭৬ : থিয়েটার ইউনিটের জন্মভূমি—স্বর্ণেন্দু রায়চৌধুরী ; তরুণ অপেরার লেনিন পালা—অহীন ভৌমিক।

৩৯ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৭৬ : নান্দীকারের নাটক তিন পয়সার পালা—তরুণ সেন।

৪০ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৭৭ : নান্দীকারের তিন পয়সার পালা—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪১ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭৮ : বহুরূপীর পাগলা ঘোড়া—অশোক মুখোপাধ্যায় ; রাহুমুক্ত রাশিয়া—অমর গঙ্গোপাধ্যায় ; সূত্রধারের দু'টি একাঙ্ক—ভাস্কর বসু।

৪১ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ : ক্যাপটেন হুররা—অমর গঙ্গোপাধ্যায়।

৪২ বর্ষ ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা. পৌষ-মাঘ ১৩৭৯ : টিনের তলোয়ার : পিপ্‌লস থিয়েটার—তরুণ সেন।

৪২ বর্ষ সপ্তম-অষ্টম যুগ্ম সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৯ : ঝোড়ো সময়ে বিদ্যুৎ চমকের দৃশ্য—শুভ বসু।

৪৬ বর্ষ একাদশ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ : নান্দীকারের ফুটবল / টোটেম ব্যাধির নামচা - শুভ বসু।

৪৬ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮৪ : নরকগুলজার—শৈবাল চট্টোপাধ্যায় ; ভোমা / একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা—কেতকী কুশারী ডাইসন।

৪৭ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৮৪ : দানসাগর : জগন্নাথ— অশোক মুখোপাধ্যায়।

৪৭ বর্ষ দশম-একাদশ সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ : বহুরূপীর ত্রিশ বছর—অমলেন্দু চক্রবর্তী।

৪৭ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮৫ : অমিতাক্ষর শূদ্রক / অমিতাভ দাশগুপ্ত।

৪৮ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৮৫ : খড়ির গণ্ডি / নান্দীকার—অমলেন্দু চক্রবর্তী।

৪৮ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৫ : পাপপুণ্য / নান্দীমুখ—অরুণ সেন : মহাকালীর বাচ্চা / থিয়েটার ওয়ার্কশপ—জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় : নামজীবন / কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ—শুভাশিস্ গোস্বামী ; তুঘলক, বেগম কা তাকিয়া, আধে আধুরে, মুখ্যমন্ত্রী—উষা গাঙ্গুলী।

৪৮ বর্ষ নবম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৭৯ : আলা, বিধি ও ব্যতিক্রম—

অরুণ সেন ; রঙ্গকর্মী-র পরিচয়—অমিতাভ দাশগুপ্ত ; থ্রুতি-র আত্মজা—শুভ বসু।

৪৯ বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ : মুদ্রারাক্ষস—অরুণাদেবী (হালদার)।

৪৯ বর্ষ নবম সংখ্যা, ১৯৮০ : মৃচ্ছকটিক—সিদ্ধেশ্বর সেন।

৫০ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮০ : বেনেভিৎজ-এর গালিলেও—অরুণ সেন।

৫০ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা, মার্চ ১৯৮১ : ম্যাকবেথ (হিন্দী)—শুভ বসু।

*কয়েকটি অভিনয় শিরোনামে দশরূপ সম্প্রদায়ের কালপুরী, সুন্দরম সম্প্রদায়ের ফিঙ্গার প্রিন্ট, গণনাট্য সঙ্ঘ প্রান্তিক শাখার নৌকাডুবি, ক্যালকাটা থিয়েটারের ছায়াপথ, শৌভনিকের ল'ল'না, সংবর্ত গোষ্ঠীর দুটি একাঙ্কিকার আলোচনা করা হয়েছে।

**গত এক বছর শিরোনামে রূপকারের অচলায়তন, লিটল থিয়েটারের অজেয় ভিয়েতনাম, নান্দীকারের শের আফগান, থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর ললিতার আলোচনা করা হয়েছে।

***আজকের প্রহসনে রূপকারের ব্যাপিকা বিদায় এর সমালোচনা।

তালিকা নং ২

১। হিরণকুমার সান্যাল (৫) ২। সুনীল চট্টোপাধ্যায় (১) ৩। অমরেন্দ্র পাঠক (১) ৪। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১) ৫। গোপাল হালদার (৫) ৬। অলক চট্টোপাধ্যায় (১) ৭। ধ্রুব গুপ্ত (৩) ৮। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় (১) ৯। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (১) ১০। নাট্যসমালোচক (১) ১১। বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় (১) ২। অজিষ্ণু ভট্টাচার্য (৬) ১৩। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (১) ১৪। অপ্রতিম বসু (১) ১৫। হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় (১) ১৬। কেয়া চক্রবর্তী (১) ১৭। অশোক মুখোপাধ্যায় (৩) ১৮। নাট্য-সমালোচক (১) ১৯। স্বর্ণেন্দু রায়চৌধুরী (২) ২০। উমানাথ ভট্টাচার্য (১) ২১। অহীন ভৌমিক (১) ২২। তরুণ সেন (২) ২৩। অজিত বন্দ্যো-পাধ্যায় (১) ২৪। অমর গঙ্গোপাধ্যায় (২) ২৫। ভাস্কর বসু (১) ২৬। শুভ বসু (৪) ২৭। শৈবাল চট্টোপাধ্যায় (১) ২৮। কেতকী কুশারী ডাইসন (১) ২৯। অমলেন্দু চক্রবর্তী (১) ৩০। অমিতাভ দাশগুপ্ত (২) ৩১। অরুণ

সেন (৩) ৩২। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় (১) ৩৩। শুভাশিস্ গোস্বামী (১) ৩৪। উষা গাঙ্গুলী (১) ৩৫। অরুণ দেবী (হালদার) (১) ৩৬। সিদ্ধেশ্বর সেন (১)।

বন্ধনীর মধ্যে সমালোচনার সংখ্যা দেওয়া হোল।

তালিকা নং ৩

বহুরূপী: রক্তকরবী, ডাকঘর, রাজা অয়দিপাউস, ছেঁড়া তার, বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া, মৃচ্ছকটিক।

লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ: বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, নীচের মহল, হ্যামলেট, অঙ্গার, ম্যাকবেথ (ইংরেজি), কল্লোল, তিতাস একটি নদীর নাম, অজেয় ভিয়েতনাম, টিনের তলোয়ার।

নান্দীকার: নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, শের আফগান, তিন পয়সার পালা (দু-বার), ফুটবল, খড়ির গণ্ডি, মুদ্রারাক্ষস।

রূপকার: তিলতর্পণ, ব্যাপিকা বিদায়, অচলায়তন।

ক্যালকাটা থিয়েটার—ছায়াপথ, দেবীগর্জন।

নক্ষত্র—চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড।

থিয়েটার ওয়ার্কশপ—ললিতা, চাক ভাঙা মধু, নরক গুলজার, মহাকালীর বাচ্চা।

শৌভনিক—ল'ল'না, আস্তিগোনে।

নান্দীমুখ—পাপপুণ্য।

চতুর্মুখ—জনৈকের মৃত্যু।

ঋতায়ণ—মৃত্যুর চোখে জল।

থিয়েটার কমিউন—দানসাগর।

চেতনা—জগন্নাথ।

থিয়েটার ইউনিট—জন্মভূমি।

সুন্দরম—ফিঙ্গার প্রিন্ট।

গন্ধর্ব—একা নয়।

স্মৃতি—আত্মজা।

হিন্দি নাটক :

অনামিকা—কাঞ্চন রঙ্গ, এবম্ ইন্দ্রজিৎ।

রঙ্গকর্মী—পরিচয়।

তালিকা নং—১ক

বর্ষ	সমালোচনার সংখ্যা	সমালোচিত নাটকের সংখ্যা
২২	১	১
২৩	০	০
২৪	৩	৩
২৫	৩	৩
২৬	১	১
২৭	০	০
২৮	১	২
২৯	২	৪
৩০	০	০
৩১	১	৬
৩২	৪	৭
৩৩	০	০
৩৪	৪	৫
৩৭	২	২
৩৮	৩	৩
৩৯	২	৩
৪০	১	১
৪১	২	৪
৪২	২	২

আশীষ মজুমদার

‘পরিচয়’-এর উপন্যাস

বঙ্গদর্শনে ‘বিষবৃক্ষ’ প্রকাশের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলা সাময়িকপত্রের সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের সম্পর্ক নানাকারণেই খুব নিবিড়। ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত ‘পরিচয়’ পত্রিকার উদ্যোগ ও প্রথমযুগের কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে মনে হয়—উপন্যাস-প্রকাশের ব্যাপার এ পত্রিকার প্রথম কয়েক বছরের আয়োজনে বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। ‘পরিচয়’-এর সেই প্রথম উদ্যোগ বিষয়ে (সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রসঙ্গে) স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, এ পত্রিকা-প্রকাশের অন্যতম উদ্যোগীপুরুষ শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য লিখেছেন, প্রকাশের সময় এ-পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে : ‘গল্পকবিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও প্রবন্ধাদি আঙ্গিক ছাড়া তার বৈশিষ্ট্য হবে সমালোচনার গুরুত্ব ও পুস্তক-পরিচয়।’ শ্রীহিরণকুমার সান্যালের কুড়ি বছরের স্মৃতিচারণেও উপন্যাস বিষয়ে উল্লেখ চোখে পড়ে না।

সম্ভবত ত্রৈমাসিক পত্রে উপন্যাস প্রকাশ কতদূর সঙ্গত সে বিষয়ে সংশয় ছিল। কিংবা একথাও ভাবা যেতে পারে যে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘কাব্যের মুক্তি’ প্রবন্ধে কবিতা বিষয়ে যে মনোযোগ, গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই মনোযোগের ঝোঁক ছিল না, ধূর্জটিপ্রসাদের ‘প্রেমপত্র’ ও প্রমথ চৌধুরীর ‘নীললোহিতের গল্প’ প্রকাশ সত্ত্বেও। শোনা যায়, কুন্দভূষণ ভাদুড়ীর পরামর্শেই সুধীন্দ্রনাথ উপন্যাস প্রকাশের ব্যাপারে ভেবে দেখেন। ইতিমধ্যে ষষ্ঠবর্ষে (১৩৪৪) ‘পরিচয়’ মাসিকপত্রে পরিণত হয়। তার আগে ধূর্জটিপ্রসাদ ১৩৪০ সালের মাঘ সংখ্যায় যুধিষ্ঠীর দাস ছদ্মনামে ‘এই জীবন’ গল্পটি প্রকাশ করেন। এই গল্পের উপন্যাস-সম্ভাবনা পরবর্তীকালে ‘অন্তঃশীলা’ উপন্যাসে পরিণতি পায়। ১৩৪৩-এর মাঘ সংখ্যা থেকে ১৩৪৪-এর শ্রাবণ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় ‘আবর্ত্ত’। ‘মোহানা’র প্রকাশ ১৩৪৮-৪৯। ‘আবর্ত্ত’-কে ‘পরিচয়’ পত্রিকার প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এবং ধূর্জটিপ্রসাদকেই এ-পত্রিকার প্রথম ঔপন্যাসিক হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়।

গল্প-উপন্যাস প্রকাশের ব্যাপারে 'পরিচয়' পত্রিকায় একটা অন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাও ছিল। এই পত্রিকা প্রকাশের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে এ দেশীয় পাঠকদের পরিচয় স্থাপন। সেই উদ্দেশ্যে ফরাসি-ইংরেজি উপন্যাসের সমালোচনা বহুলসংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছিল পুস্তকপরিচয় বিভাগে। আলোচিত হচ্ছিলেন মালরো-জীদ, হাক্সলি কিংবা ভার্জিনিয়া উল্ফ। সে-সব আলোচনায় উপন্যাস-গল্পের যে উৎকর্ষের ধারণা প্রশ্রয় পাচ্ছিল বাংলাসাহিত্যের সেই প্রবাসী-কল্লোল যুগের উপন্যাস-চর্চায় তার হদিশ ছিল না। কাব্য-ভাবনায় যে সচেতনতার চর্চা চলছিল, তাকে সৃষ্টিতে আকীর্ণ করছিলেন সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-সমর সেন প্রভৃতি কবিগণ। কিন্তু যোগ্য ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস মেলা শক্ত ছিল। চিরকালই অবশ্য এটা একটা সমস্যাই হয়ে থাকে 'পরিচয়'-এর মতো পত্রিকার। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে সেই সমস্যার সমাধান করতে করতে এগনোর চিহ্নই লক্ষণায় হয়ে ওঠে। 'অন্তঃশীলা'-'আবর্ত' থেকে 'মহিষকুড়ার উপকথা' 'নবাব ক্লাইভ' পর্যন্ত 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত উপন্যাস কিংবা উপন্যাসোপম বড় গল্পে লক্ষণীয় হয়ে আছে একটা সচেতনতারই বৈশিষ্ট্য, ফর্মে-কনটেন্টে। বাজার-প্রচলিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস গল্প থেকে আলাদা হয়ে আছে এর রচনাগুলো—কখনও তীক্ষ্ণ সমাজপরিবেশসচেতনতায়, কখনও 'বিশুদ্ধ নভেল' চর্চার নির্মিতিতে, কখনও-বা প্রত্যক্ষ রাজনীতিরই সংস্পর্শে দেশকালইতিহাসে মানুষের সম্ভাবনাময় দ্বন্দ্বকে তুলে ধরার যোগ্য প্রয়াসে। পঞ্চাশ বছরের ১৯টি মৌলিক ও ২টি অনুবাদ উপন্যাসে কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম ঘটে।

'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম যুগে, পুস্তকপরিচয় বিভাগে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র উদ্ধৃত করছিলেন লেসিং প্রসঙ্গে টমাস মানের উক্তি: 'কবির বাস্তদৃষ্টির পেছনে কোনো বিতর্ক বা অন্তর্বিরোধ থাকবে না বহির্লোকের সঙ্গে। সমস্ত কিছুকেই কবি গ্রহণ করবেন শান্ত মনে বিনা বিতর্কে, অবিকৃতভাবে। তারপর তাঁর কাব্যমণ্ডলের ওপর কবির জয়-পরাজয়। এ মহৎ দায়িত্ব কবির। এবং যেখানেই তিনি বিচলিত হয়েছেন বহির্লোকের সংঘাতে, সেখানেই তাঁর অপমান' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪)।

হিরণকুমার সান্যাল লিখছিলেন উলফের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এই বিবর্তন ধারার সহিত সমসাময়িক কালের কি সম্বন্ধ—অর্থাৎ যুগপরিবেশে এই উপন্যাস-বর্ণিত নর-নারীর জীবন কিভাবে ফুটিয়া উঠে তাহার আনুপূর্বিক

বর্ণনার দায়িত্ব লেখিকা ছাড়া আর কাহারও হইতে পারে না।'

ধূর্জটিপ্রসাদের নায়ক খগেনবাবু (যাঁকে লেখক তাঁর মনটা ধার দিয়েছিলেন বলে স্বীকার করেন 'অন্তঃশীলা'র ভূমিকায়) বলেছিলেন: 'সত্যিকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়তো কোনো সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের negative capability থাকবে।... তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে। অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হল pure নভেল। জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাঁটা, কখনও বা বান ডাকে, বন্যা আসে। চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘূর্ণি, কোথায় ঢেউ, কোথাও বা গর্ত, এই তো জীবন। এর প্রতিচ্ছবি—না প্রতিচ্ছবি ঠিক নয়, এরই বিচার ও মূল্য নির্ধারণই আর্টিস্টের কাজ—অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার তাৎপর্য গ্রহণ ও প্রকাশ।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ ১৩৪৭ সালে 'পরিচয়ে' লিখেছিলেন: 'প্রধানত নাটকের পরিসর সঙ্কীর্ণ বলেই চাপ প্রভাব প্রভৃতি সূক্ষ্ম অথচ ব্যাপক দ্বন্দ্ব ভালো খোলে না। যেটা ওতঃপ্রোত তার জন্য স্থান হওয়া চাই প্রশস্ত।...নভেলের কিন্তু ঐ ধরনের সীমা নেই, তাই নভেলে চাপটা দেখান যায় ভালো। এই হিসেবে হেনরি জেমস বর্তমানের শ্রেষ্ঠ নভেলিস্ট। তিনি প্রভাবের আর্টিস্ট, যে প্রভাব হাওয়ায় থাকে, অজানিতে অথচ সুনিশ্চিতভাবে অপরের জীবনে ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়, যার ফলে ব্যক্তিগত চরিত্রের কোণ যায় খসে, সোজা কাঁধ যায় বেঁকে, বাঁকা কাঁধ হয় সোজা, দৃষ্টি হয় উজ্জ্বল কিংবা ক্ষীণ স্বর হয় মিষ্টি কিংবা রুক্ষ। এই প্রকার সামান্য ও তুচ্ছ পরিবর্তনের সমষ্টিই পরিণতির পরিচয়।...বিশেষত যখন এই পদ্ধতিতে লেখকের মনে কোনো প্রকার বাঁধাধরা প্ল্যান থাকে না, তার উপর আবার তুচ্ছ ঘটনার সঙ্গে কাল্পনিক পরিপূর্ণতার যোগস্থাপন করা—এতটা বুদ্ধি সাধনার প্রয়োজন বোধহয় অন্য কোনো রচনা-পদ্ধতিতে নেই! প্রতি মুহূর্তেই লেখক মনকে সতর্ক রাখবেন, নচেৎ সব এলোমেলো হবে—গল্প একটা সময়ের পর নিজের তাগিতে চলতে চায়, তাকে স্বাধীনতাও দিতে হবে, না হলে গতি মন্দা হবে, আবার নাগাল বেশি ছাড়লেও চলবে না, পাগলের খেয়াল উঠবে। এই প্রকার নানা বিপদ কাটাবার জন্য একমাত্র মার্জিত সচেতনতাই সাহায্য করতে পারে। অতটা মনোযোগ জনসাধারণের

পক্ষে অসম্ভব, তাই এইসব নভেল বুদ্ধিসর্বস্ব, উঁচুকপালে দুর্নাম অর্জন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভাবধর্মী নভেলই বর্তমান যুগের উপযোগী।'

এইসব আলোচনা ও প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল এবং গড়ে উঠছিল 'পরিচয়' পত্রিকারই উপন্যাস-ভাবনা—খুব এলোমেলো ভাবেই হয়তো। কিন্তু তার মধ্যেও সূত্র একটা ছিল, এই আর্টফর্মটার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন-বোধে। তাই আক্রান্ত হচ্ছিল শরৎচন্দ্রের বাস্তবতাবোধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, কল্লোলের অর্ধচেতন পশ্চিমাবিলাস। কারণ রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে যে-ধারার সূত্রপাত, সচরাচর বাংলা উপন্যাস চর্চায় তার প্রতি লক্ষ্য ও মনোযোগ ছিল না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা এই ত্রয়ী উপন্যাসের জন্য। আর এই ত্রয়ী উপন্যাস প্রকাশের মধ্যে দিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকার উপন্যাসের গোড়াপত্তন। পরবর্তীকালেও 'পরিচয়ে' প্রকাশিত উপন্যাসে মননধর্ম ও সচেতনতার সেই গোড়ার স্বাতন্ত্র্য কদাচিৎ ক্ষুণ্ণ হয়। কবিতার পরোক্ষতায় সেই বৈদগ্ধ্যচর্চা হয়তো খানিকটা স্বাভাবিক, যেজন্য বাজারি পত্রিকার কবিতাতেও সচেতনতার একটা ভঙ্গিও অন্তত স্বীকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু উপন্যাসের প্রত্যক্ষ জীবন-চিত্রণে, গল্পের ঔৎসুক্য-নিবারণী সহজ পথের মোহ ছেড়ে এই শিল্পবোধের চর্চা—দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে—চতুষ্পার্শ্বস্থ রুচিবিকারের নানান ডামাডোলে, বিস্মিত শ্রদ্ধা না জাগিয়ে পারে না।

'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৪০ সালের মাঘ সংখ্যায় 'এই জীবন' নাম দিয়ে যে কাহিনীর সূত্রপাত—পরবর্তীকালে সেটাই 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে পরিণতি পায় এবং 'আবর্ত্ত' ও 'মোহানা' আরও দুই পর্বে এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়। এই তিনটি খণ্ডেই লক্ষণীয় হয়ে আছে উপন্যাসের রূপকল্প সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা কবিতার দিগদর্শনের চিহ্ন যেমন ছিল এলিঅটের সাহচর্যে, আত্মসচেতনতার শিক্ষায় আর তাই এদেশেরই বাস্তবে। তেমনি ধূর্জটিপ্রসাদ এ-উপন্যাসে বপন করেন সেই আত্মসচেতনতারই বীজ আধুনিকতার যা মৌল লক্ষণ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন 'আসলে অর্জিত বিদ্যায় যদিও তিনি বৈদেশিক, তবু তাঁর প্রবৃত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বিশুদ্ধ স্বদেশী।' প্রুস্ত, জয়েস, উলফ ইত্যাদি অন্তর্মুখীন ঔপন্যাসিকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা উল্লেখ করে সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তথাচ অন্তঃশীলা বাঙলা উপন্যাস।'

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের নতুন ভূমিকায় ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছিলেন: 'একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া। কিন্তু পলায়ন অসম্ভব। নিজের অজ্ঞাতে খগেনবাবুর রমলাদেবীর প্রতি আকর্ষণ হল অন্তঃশীলার বিষয়। খগেনবাবুর ক্রমবিকাশ এখানেই শেষ হয়নি। আবর্ত ও মোহানায় সেই ধারা চলেছে।

অন্তঃশীলার ভাষাকে বীরবলী ও তার ভঙ্গিকে ফ্রেস্তিয়ান বলা ঠিক চলে না। মনের যদি অন্তত পক্ষে দুটি স্তর থাকে—একটিতে শিক্ষার্জিত ধ্যানধারণা প্রতিজ্ঞা-প্রত্যয়, আর অন্যটিতে জৈব প্রবৃত্তিগুলির প্রভাব যদি বেশি হয়, এবং যদি একই মানুষের পক্ষে দুটি স্তরকে পৃথক রাখা অসম্ভব হয়, তবে ভাষা ও ভঙ্গি কিছু ভিন্ন হবেই। সেই সঙ্গে ইনটেলেকচুয়ালিজমের অসার্থকতা অবাস্তবতা সব কিছুই প্রমাণিত হয়ে যায়।'

'অন্তঃশীলা'য় প্রাধান্য পায় চিন্তাবৈচিত্র্য। সংঘাতও মূলত চৈতন্যে ও চিন্তায়—যে-চিন্তা ঠিক ধারাবাহিকভাবে এগোয় না, সব কিছুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও যুক্ত বলেই মাঝে মাঝে ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। লেখকও ঘটনাজালে জড়িয়ে পড়েন না, কাহিনীর অগ্রসৃতিকে মর্যাদা দেন ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট সীমায় তাকে আবদ্ধ রাখেন। তাই শুরু করেন সেখান থেকে অন্য ঔপন্যাসিক যেখানে নিটোল গল্পের সমাপ্তি ঘটাতেন। খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রীদেবীর আত্মহত্যার আঘাত দিয়ে উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটে। অতঃপর রমলাদেবীর সঙ্গে খগেনবাবুর সম্পর্কের বিবর্তনে, কলকাতা থেকে কাশী, কাশী থেকে লক্ষ্ণৌ-কানপুরের পরিবেশ-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে খগেনবাবু আসলে বেরিয়ে আসেন আপন আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিচর্চার খোলস ছেড়ে—সম্বন্ধ স্থাপনে। এমন কি গার্হস্থ্য ছেড়ে কর্মময় জীবনের বিস্তারে।

ভিড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে যিনি উৎসুক ছিলেন তিনিই ক্রমশ মৈত্রীর অর্থ গ্রহণে সক্ষম হন, অন্তর্মুখী হওয়ার চেয়ে বাইরে আসাই ভালো। 'দেহেই সকল চিত্ত সঞ্চারিত হোক' এমন ভাবনা নিয়ে 'আবর্ত' অংশে রমলাদেবীর সঙ্গে সংলগ্নতা ঘনিয়ে ওঠে। যদিও সেখানে কাশীর সানাইয়ের সুরে পুরিয়ার আবহ আসে কখনও, কখনও-বা রমলাদেবীর হাতকাটা ব্লাউজের থেকে বেরিয়ে আসা পাউডার-মাখা বাহুটাকে মনে হয় দোকানে ঝোলানো মাংস, গঙ্গার ঘাটে ভালোবাসার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তেই ভেসে আসে শব-দাহের অবশেষ।

'আবর্তে'র শেষে মাসীমার মৃত্যুর পর 'মোহানা'য় খগেনবাবু ও রমলা দেবী একত্র বসবাস শুরু করেন। খগেনবাবু তখন কানপুরকে বেছে নিয়েছেন আবাসস্থল হিসেবে—'কাশীর পালা সাঙ্গ। এখানে জীবনের নতুন বীজ পড়েছে, তোমার আমার এই হল প্রকৃত পরিবেশ।'

তখন লক্ষ্ণৌ-কানপুরে ধর্মঘটের চাঞ্চল্য, উনাওয়ের দাওরা মীরাটের মেথর সমস্যা, গোরখপুর জেলার মহারাজগঞ্জের কৃষক আন্দোলন—এই জীবন খগেনবাবুকে টেনে নিল। সফীকের সংস্পর্শে এগিয়ে যান শ্রমিক আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে বুদ্ধিজীবীর নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে। অন্যদিকে রমলাদেবী সর্বত্র হতাশ হয়ে অভিমানে সরে যান, হাল্কা প্রেমের গড্ডলিকায় গা ভাসান। খগেনবাবু চললেন মিথ্যে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার সফীককে মুক্ত করার কাজে। রাজনৈতিক পার্টি সম্পর্কে তাঁর ধারণা : 'চৈতন্য যতই উন্নত হোক না কেন, একজন দুজন তিনজন পুরুষের চৈতন্য অসম্পূর্ণ, এখানেই পার্টির সার্থকতা।'

এখানেই 'মোহানা'র শেষ। ধূর্জটিপ্রসাদ যাকে অন্যত্র বলেন 'ব্যক্তি' থেকে 'পুরুষে'।

এ উপন্যাসের আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'তাঁর কর্তব্য স্বসমুত্থ পাত্র-পাত্রীর বিবর্তনের ছবি আঁকা।' বিষ্ণু দে লেখেন 'পাত্র-পাত্রী-চরিত্র উপন্যাসে আসলে একটা স্বসমুত্থ বা ইমার্জেন্ট ব্যাপার।' গল্পে নয়, পরিবেশ-প্রভাবে চরিত্রের বিবর্তনই এ উপন্যাসে প্রধান হয়। এছাড়া, উল্লেখ করতেই হয়, উপন্যাস ত্রয়ীর উন্নিদ্র চৈতন্যের আধার এর গদ্যভঙ্গির কথা। যদিও কখনও তার অভীষ্ট ছন্দে পতনও আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে ঋজু তাক্ষ্ণতা তার সম্পদ।

এ উপন্যাসের কথা আজ বিস্মৃতপ্রায়। অথচ ধূর্জটিপ্রসাদের এই সচেতনতার চর্চা, উপন্যাসে সেই বিপ্রদাস-কল্লোলের যুগে, স্মরণীয় শুধু নয়, বহুকারণে আজকেও প্রাসঙ্গিক। ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে চিঠি 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথকে বলতে দেখা যায় : 'দাড়িমের শক্ত খোলার মধ্যে শত শত দানা, এবং প্রত্যেক দানার মধ্যে একটি করে বীজ। তোমার অন্তঃশীলা সেই দাড়িম জাতীয় বই।'

১৩৪৪-৪৫ সালে সরোজ রায়চৌধুরীর 'সোমলতা' প্রকাশিত হয়। ময়ূরাক্ষী-গৃহকপোতী-সোমলতা এ তিনে মিলে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ত্রয়ী উপন্যাস একত্রে 'নতুন ফসল' নামে পরিচিত। এ উপন্যাসে নায়িকা

বিনোদিনীরই প্রাধান্য। তার অভিজ্ঞতার ও বিবর্তনের তাৎপর্য সন্ধানই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনের বহমান স্রোতের রহস্যকে কখনও ঘটনায় কখনও ব্যঞ্জনায় উন্মোচিত করার কৃতিত্ব সরোজ-কুমারের উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ। সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতিকে খানিকটা প্রচ্ছন্ন গৌণতায় রেখে বিচিত্র ঘটনার সংঘাতে 'মানব মনের অপরূপ প্রকাশ'-কেই তিনি অভীষ্ট জ্ঞান করেন।

হারাণ-বিনোদিনীর গার্হস্থ্যে কেন্দ্রাতিগ বৈরাগ্যের বাতাস নিয়ে এসেছিল বৈষ্ণব আখড়ার চঞ্চল হৃদয়বান মানুষগুলো। 'ময়ূরাক্ষী'র শেষে বিনোদিনী ঘর ছাড়ে, 'গৃহকপোতী' পর্যায় পেরিয়ে 'সোমলতা'য় ভ্রাতৃগৃহে থাকাকালীন প্রাক্তন প্রেমিক গৌরহরির সঙ্গে সম্পর্কে বিনোদিনীর সঙ্কট গড়ে ওঠে—শেষ পর্যন্ত বিনোদিনী অবশ্য স্বামীগৃহে ফিরে যায়—হারাণ মেনী হাবল সহ বিনোদিনীর এ যাত্রায় সরোজকুমার আনেন বসুন্ধরার প্রসঙ্গ, যে মাটিতে নতুন বীজ উপ্ত হবে আবার। 'ময়ূরাক্ষী'র শেষে বিনোদিনী নদীরই গতি নিয়েছিল, 'সোমলতা'য় সে বসুন্ধরায় পরিণতি পায়।

'পরিচয়ে'র পাতায় এ উপন্যাসের সমালোচনায় 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব, 'দৃষ্টি-প্রদীপ' ও 'রাইকমলে'র তুলনায় 'সোমলতা'কেই তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট বলেছিলেন চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। যদিও এ অভিযোগ তিনি তুলেছিলেন যে, বিনোদিনীর সঙ্গে কমললতার ('শ্রীকান্ত') অথবা মালতীর ('দৃষ্টিপ্রদীপ') সঙ্গে তমাললতার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। আর বলেছিলেন, 'একটানা গল্প বলার মধ্যে একটা দুঃসাহসিক ক্ষমতা থাকতে পারে—এমন কি শ্রুতিমধুরও হয়তো হবে, কিন্তু এই মননহীন মিষ্টত্বই শেষপর্যন্ত পাঠকের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।' কিন্তু 'সোমলতা'কে মিষ্টি গল্প বলার প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলাটা সঙ্গত নয়। গল্পের ঝোঁকেও সরোজকুমার পরিমিতি হারান না। একটা সহজ জীবনবোধে গল্পে তাৎপর্যও নিয়ে আসেন। খুব জটিল হতে চান নি কোনো সময়েই, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতি অনুসন্ধিৎসাবশতই কল্লোলী হয়েও আলাদা হয়ে যান। গ্রামীণ জীবনের উৎসব-ব্যসন-কর্মের ছবিতে যে জীবনাসক্তি ফোটে, সেটুকুতেই অন্তত বিরক্তির প্রশ্ন ওঠে না, মহত্ত্বও আসে না সম্ভবত।

১৩৪৫-এ ৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'শিখসম্রাট ও সতীর অভিশাপ' নামক একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। এ উপন্যাস সম্পর্কে জানানো হয়: 'এর লেখক আশৈশব পঞ্জাবে মানুষ হইয়াছিলেন। বালক

অবস্থায় তিনি একদিন সন্ধ্যায় লাহোরের বাদশাহি মসজিদের এক মিনারের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নের দৃশ্য দেখিতেছিলেন। লেখকের পার্শ্বে ছিলেন তাঁহাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সর্দার কুমেদান শিবসিংহ। ইনি মহারাজ রণজিতের প্রিয় সহচর ছিলেন, বহু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারা পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছেন। ...(লেখক) সর্দার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি করিয়া ইংরাজদের কাছে আপনারা হারিলেন।' সজলকণ্ঠে সর্দারজী উত্তর দিলেন 'ইংরাজ ফৌজ নহে, এক সতীনারীর অভিশাপ আমাদের সর্বনাশ করিয়াছিল।'

এই সতীনারী হচ্ছেন কমলা। রণজিত পুত্র কুঁয়র যাকে বিমাতা মহারাণী জীন্দার অমতে বিবাহ করেছিল। শেষপর্যন্ত জীন্দা কমলার গর্ভজাত সন্তানকে হত্যা করে কমলাকে অভিশাপ দিতে প্ররোচিত করে। রচনাটি উপন্যাস হিসাবে অকিঞ্চিৎকর, যদিও শিখ জীবন ও আচারের দলিল হিসাবে বাঙলা ভাষায় অনন্য। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুসরণে রচিত বলে এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিকতা আছে, যা প্রায় প্রাণহীন বর্ণনায় পরিণত। ভাষাভঙ্গিতে সচেতনতা লক্ষণীয়।

১৩৪৫ সালে নীরেন্দ্রনাথ রায় রচিত 'দাবী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসের নায়ক অসিত তার পিতা বিনয়কৃষ্ণের স্নেহের দাবির বন্ধনে আবদ্ধ। সহপাঠী অনিলের বোন পূর্ণিমার সঙ্গে তার হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু পূর্ণিমা যেহেতু নৃপেশনাথ ও সুনয়নীর 'নীতিবিরুদ্ধ ব্যভিচারের ফল' তাই বিনয়কৃষ্ণ অসিতের বধূ রূপে তাকে গ্রহণ করেন না। অসিত গৃহত্যাগী হয়ে বিজয়ের আনুগত্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। শেষে হত্যাপরিকল্পনায় বাধা দিতে গিয়ে আহত হয় ও ধরা পড়ে। অসিতের বক্তব্য ছিল 'বিপ্লববাদের মানে যদি এই হয় যে প্রভুত্বের অবসান, সর্বমানবের পূর্ণ স্বাধীনতা তাহলে আমি সর্বান্তকরণে মানি। কিন্তু যদি এর মানে হয় গুপ্তহত্যা, তবে বলব ক্ষমা চাই আমি।' জেল থেকে বেরিয়ে অসিত দেখে পূর্ণিমা তার জন্যই অপেক্ষমান। কিন্তু অসিত এখন মুক্তি চায়। জীবন থেকে সমস্ত বন্ধন খুলে গেছে তার। দলের মোহ কাজের মোহ ঘুচে গিয়ে সে এখন একাকীত্বের সাধনা করতে চায়, আত্মোপলব্ধির সাধনা। 'তোমার শেষ দাবিটা তুমি নিজের হাতে খুলে নাও।' 'পূর্ণিমা এখন নিজের নারীত্বকে তাহার প্রেমাস্পদের অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে।' ফলে দুজনের পথ দুদিকে।

উপন্যাসের শেষার্ধ উপন্যাসটার ক্ষতি করেছে। রোম্যান্টিক প্রেমের

সমস্যার সঙ্গে রাজনীতি সমাজনীতির প্রসঙ্গ আনার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু গ্রথিত হয়নি। পরিণতিও জটিলতাহীন, আকস্মিক। 'পরিচয়'-এর পাতায় এর সমালোচনায় কিরণ সান্যাল ন্যায্যতই চরিত্রগুলোর শেষদিকে রক্তমাংস-হীন টাইপে পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। বলেন, বৃহৎ আকারের উপন্যাসের উপকরণ ছিল র নাটায়, কিন্তু লেখক উপন্যাস রচনার ধৈর্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। কেবল জোরালো ভাষার ঐশ্বর্যেই উপন্যাসটি পড়া যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অহিংসা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৫ ১৩৪৭ পর্যন্ত।

অহিংসা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত বিতর্কিত উপন্যাস। ১৩৬৩ সালে অচ্যুত গোস্বামী 'পরিচয়'-এর পাতায় এ উপন্যাস প্রসঙ্গে লিখেছিলেন 'আমাদের দেশে শুধু যে সাধু সন্ন্যাসীই অনেক তাই নয়, সাধু সন্ন্যাসীকে ঘিরে যে ভক্তবৃন্দ তাদের মনোভাবের মধ্যেও কতকগুলো অস্বাস্থ্যকর বিশেষত্ব আছে। প্রশ্নটা শুধু সাধু সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের দেশের আত্মনিগ্রহমূলক মনোবৃত্তির ফলে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সন্ন্যাসীর ভেক না নিলেও মূলত সমস্ত পারিবারিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে বাস করেন। এদের সকলের প্রতিনিধি এই সাধুটি। সাধু এবং তার ভক্তবৃন্দের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রতারণা এবং অন্ধ জবরদস্তিমূলক বিশ্বাসের অদ্ভুত সমন্বয়দ্বারা গঠিত। লেখক অত্যন্ত নিপুণতায় এই সম্পর্কের মর্ম দেখেন এবং দেখান যে, অবরুদ্ধ যৌন কামনা আমাদের এই অসুস্থ সম্পর্কটিরও মূলীভূত শক্তি।' ঐ রচনাতেই কিছু পূর্বে লিখেছেন 'অহিংসার সাধু, শহরতলীর যশোদা, জীয়ন্তের পাকা— এ জাতীয় চরিত্ররাও সমাজের ব্যতিক্রম বলে মানিকবাবুর কাছে মূল্য পায় নি, পেয়েছে বিপরীত কারণে।' বিপরীত কারণ বলতে তিনি বোঝান—এই চরিত্রগুলি সমাজের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা বা পরিবেশের ওপর আলোকপাত করে বলে।

অহিংসা উপন্যাসের ভূমিকায় ঔপন্যাসিক লিখেছিলেন 'নীতি বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করেও সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং এই সাধারণ-মানুষকে নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়'—অহিংসা তারই চেষ্টা।

ধর্মব্যবসায় আক্রান্ত হয়েছে সন্দেহ নেই—কিন্তু সেই ব্যাখ্যাটুকুতেই কিংবা হিংসা-অহিংসার জয়পরাজয়ের প্রসঙ্গেই কি আবদ্ধ থাকে এই উপন্যাস? আখ্যান বিশ্লেষণের সরলীকরণে বক্তব্য আবিষ্কার চেষ্টায় সাধারণত যেসব সরল সিদ্ধান্তে আসা হয় এই উপন্যাস প্রসঙ্গে, তাতে সদানন্দ বা মহেশ

চৌধুরীর আত্মচিন্তা, মাধবীলতার জটিল আচরণ, আচরণের আকস্মিকতা, কাহিনী অতিক্রমকারী সমস্যার সমাবেশ ও লেখকের বন্ধনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ ব্যাখ্যাত হয় না। লেখক বলেন 'মোটকথা মহেশ চৌধুরীর মনে হইয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অনেকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছে।' কিন্তু কেন লেখক এভাবে সেকথা জানান? 'আলপিন ফুটাইয়া খাঁড়ার পরিচয় দেওয়ার চেয়ে মন্তব্যের এই ভোঁতা ছুরি বেশি কাজে লাগিবে মনে হয়।' ধূর্জটিপ্রসাদ পদ্ধতিটাকে দৌর্বল্য বলেই উল্লেখ করেন তাঁর আলোচনায়। বাস্তবের যে-অন্তঃসার, জীবনরহস্যের জটিলতার যে-সন্ধান মানিকবাবুর উপন্যাসের লক্ষ্য ছিল 'অহিংসা' উপন্যাসে তাকে ধরার চেষ্টায় চরিত্রগুলো ও তাদের বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যেতে হচ্ছিল। অহিংসার রূপকল্পে ও বক্তব্যে তাই প্রবল অস্থিরতা। একটা জটিল পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতাসম্পন্ন মানুষকে আবিষ্কার করতে চাইছিলেন উপন্যাসে। কিন্তু পাচ্ছিলেন না কোনো সঙ্গতির সূত্র, যাতে 'মানুষের মুক্তি'র ভাবনা একটা গতিভঙ্গি পায়। "মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের নিজেকে জানিবার, নিজের আর বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়ার, একটা উপায়ের কথা যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মহেশ চৌধুরী তাহা জানে আমিও জানি। তবে, শুধু লেখা আছে, ঐটুকুই আমরা জানি।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীয়ন্ত উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৩৫৪-৫৫।

এই উপন্যাসের নায়ক পাকা (প্রকাশ)-র আত্মানুন্ধান প্রাধান্য পেলেও, শেষপর্যন্ত তাকে ব্যক্তিতে আবদ্ধ না রেখে পরিবেশগত তাৎপর্য দিতে চান। —কাহিনীর শেষাংশে চাষীর ছেলে পাঁচুর পেশল কর্মের সাযুজ্যে সেই আত্মসন্ধানের সার্থক গতি নির্দেশ করতে চান যেন।

সব কিছুর পেছনে 'কেন'র উত্তর খোঁজা: 'কোথায় রহস্য আছে, রোমাঞ্চ আছে, আছে জীবনের নিষিদ্ধ অসঙ্গত প্রকাশ—খুঁজে বার করো ছাখো, জানো, বোঝো, ভয় করুক, গায়ে কাঁটা দিক অদ্ভুত উল্লাসে ভরে যাক হৃদয় মন।' জীবনরহস্যের প্রতি এই বৈজ্ঞানিক, বিপদ তুচ্ছ-করা-কৌতূহল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব দৃষ্টিরই প্রক্ষেপ। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পটভূমিতে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আবহাওয়ায় কালীনাথ-নারাণ-অমিতাভদের স্বদেশী ডাকাতি, গুপ্ত সাধনা, শরীরচর্চার উন্মাদনার মাঝখানে পাকা এক মূর্তিমান প্রশ্ন। পাকার পারিবারিক ইতিহাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধরে দেন তার উৎকেন্দ্রিকতার উৎস। যৌন বিষয়ে মন্তব্য করেন ফ্রয়েডীয়

অপব্যাখ্যার বদলে সামাজিক মানে খুঁজলে ভদ্রসমাজকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হত।' পাকা ভাবে 'এমন দুঃসহ তার জীবন যে 'জীবনের এই আদিম নিঃস্বতার (চামার বস্তি) মধ্যে এসে তাকে হাঁফ ছাড়তে হয়।' নতুন মামীর সঙ্গেও গড়ে ওঠে তার জটিল এক সম্পর্ক।

পাকা, ঔৎসুক্যবশত, বেশ্যাপাড়ায় গিয়ে বিতাড়িত হয় সেই ছোট শহরের স্বদেশী কর্মযজ্ঞ থেকে—প্রচণ্ড অভিমান ও আঘাত তাকে নাড়া দিয়েছিল, কারণ কোথাও এই বীর মানুষদের প্রতি তার আনুগত্য ছিল। শেষপর্যন্ত শুধু ঔৎসুক্যেই সে জড়িয়ে পড়ে, ধরা পড়ে, অত্যাচারের মুখেও চূড়ান্ত বীরত্বের পরিচয়ও দেয়, প্রমাণ করে তার চারিত্র্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার নিরালম্ব আত্মসন্ধান 'আত্মহত্যা'র প্রবণতায় হারিয়ে যায়। নতুন মামীর সঙ্গে সম্পর্কের স্বীকারে কিংবা বাবার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীকে 'মা' বলেও অস্থিরতা মেটে না। অন্য কোনো সংলগ্নতা বুঝি তার প্রয়োজন ছিল।

এ উপন্যাসের শেষাংশে প্রাধান্য পায় পাঁচু আর তার কাকা জ্ঞানদাস। চাষী পরিবারের মানুষ। পাঁচু পাকার সহপাঠী, জ্ঞানদাসের কাছ থেকে সে পেয়েছে মাটির কঠিনতায় পা রেখে প্রতিবাদের জোর, একরোখা সাহস, অন্যদিকে শ্যামলের কাছ থেকে শুনে নেয় জীবনেরই মহত্ত্ব। আবছা খবর আসে রুশ বিপ্লবের। পৌরুষের চিহ্ন রাখে দু উচ্চবিত্তের লালসা থেকে দুকলিকে উদ্ধার করে। অতঃপর একুশ সালের গ্রাম-জ্বালানোর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জ্ঞানদাস দুকলি ও পাঁচুকে নিয়ে আঁটুলি গাঁ ছেড়ে যায়।

কিন্তু পাকার সমস্যাই 'জীয়ন্ত' উপন্যাসের সমস্যা। নিজের বিপরীত অভিমানে গড়া নিদারুণ এক আত্মিক নির্যাতনের কবল থেকে মুক্তির চেষ্টায় 'ভদ্র জীবনের বিজাতীয় আত্মবিরোধিতা থেকে মুক্তিলাভের ছটফটানি অত সরল প্রক্রিয়া নয় যে, ভদ্রজীবনকে সোজাসুজি ঘৃণা করে অভদ্র অসভ্য জীবনকে ভালবেসে ফেললাম।' তার জীবনীশক্তি তাই এ জটিলতার সমাধানে অপারগ হয়ে বিচারবুদ্ধিগত বিদ্রোহ থেকে ভাবগত বিকারে পৌঁছয়। সে কেন মানবে 'চাঁদকে না পাওয়ার পরাজয়, জ্যোৎস্না দিয়ে ক্ষতিপূরণের ধাপ্পা। স্বপ্নকে সে চেয়েই যাবে বাস্তব পাওয়ার মধ্যে তার জন্মগত দাবির মত, না পেয়ে বেড়েই যাবে তার রাগ অভিমানের জ্বালা, ভেঙে সে চুরমার করে দিতে চাইবে তার জগৎকে আঘাত হেনে হেনে।' 'ভরা পেটের মনের খিদে কি করে মেটাবে পেটের খিদেয় ভরা জীবনের মন।' এই জটিলতার চেতনা থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বাস্তবকে

অঙ্গীকার করেও বাস্তবাতিশায়ী হয়ে যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ উপন্যাসে 'পাকা' ও পাঁচু আলাদা হয়েই থাকে। আত্মসচেতনতা কর্মের সংলগ্নতা পায় না, পাকার সমাজে পরিবারে দেশে কালে তার সন্ধানও ছিল না। পাকা চরিত্রটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞ চরিত্রের মিছিলে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র, উপন্যাসের ঘটনাবলিও আলাদা। স্বদেশীদের কর্মকলাপের চাঞ্চল্য বা পাকা চরিত্রের অস্থির গমনাগমন বর্ণনায় গদ্যভঙ্গিরও স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে 'পরিচয়'-এ লিখেছিলেন: 'কেবল তর্কনীতির দিক থেকে বাঙলাসাহিত্যে আমরা প্রভাবধর্মের প্রসার আশা করতে পারি।...কিন্তু বাঙলা দেশে যা আশা করা যায় তা ফলে না। প্রতিবেশী ঘটনার কিংবা চরিত্রের আবহাওয়া ওতঃপ্রোতভাবে নভেলের ঘটনা কিংবা চরিত্রকে ধীরে ধীরে চাপ দিচ্ছে, ও তারই জোরে পরিবর্তিত হচ্ছে এমন কোনো সার্থক দৃষ্টান্ত নজরে পড়ে নি।...যে কাজ শৈলজানন্দ পারেনি সে কাজে মানিকলাল অপেক্ষাকৃত সফল হয়েছেন। আজকালকার বাঙলাসাহিত্যে তিনিই একমাত্র প্রভাব ও চাপের লেখক। এইভাবে দেখলে মানিকলালের কৃতিত্ব ধরা পড়ে, তাঁর দোষেরও স্খালন হয়।'

১৩৫০-৫১ সালে শৈলেন্দ্র ঘোষ রচিত 'লক্ষ্মীছাড়ী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়—চাঁপা নামক গ্রামীণ একটি মেয়ে এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার কৈশোর ও বিধবা জীবনের কাহিনী তাৎপর্যহীনভাবে বর্ণিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযান' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫২-৫৩ সালে। তৎকালীন সম্পাদক গোপাল হালদারের সাক্ষ্যে জানা যায়—'"পরিচয়ের জন্য একটা উপন্যাস লিখব" নিজ থেকেই তিনি জানান। আমাদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না—যখন মাসের পর মাস 'অভিযান' তার পৃষ্ঠায় ছাপা হতে থাকে। 'অভিযান' (সত্যজিৎ রায়ের কল্যাণে বহু সহস্র লোকের এখন দেখা বই) লেখা শেষ হলে সেই কৃতজ্ঞতায় ঠিক করলাম—সাধ্যাতীত হলেও যা পারি কিছু মর্যাদাসূচক (টোকেন) প্রণামী দেব, মাত্র তিন বা চারশ' টাকা। কথাটা সংকোচে পাড়লাম। তারাশঙ্কর বললেন—টাকাটা রাখুন। ওটা আমার হয়ে 'পরিচয়ে' জমা দেবেন—পত্রিকাটা ভাল করে চালান।'

এ উপন্যাসের নায়ক নরসিং ঠিক করেছিল 'লিখাপড়া' শিখবে, কিন্তু

ঘটে ওঠে নি। 'গিরিবরজার বর্কআন্দাজ গিরিধারী সিংয়ের বংশের ছেলেরা লক্ষ্মী হারিয়ে পুরুষে পুরুষে ছোট কাজ-কাম করে পাল্টে যেমন আজ দারোয়ান আর চাষাতে দাঁড়িয়েছে—সেও তেমনি মোটর ড্রাইভারি করতে করতে পাল্টে পাল্টে আজকের এই খাঁটি মোটর ড্রাইভার হয়ে দাঁড়িয়েছে।' নরসিং-এর চরিত্রটা তারাশঙ্করের উপন্যাসের জগতেই একটা স্বতন্ত্র চরিত্র। এ উপন্যাসের নরসিং ট্যাক্সির মালিক ও চালক। তার জীবনে নীলিমা ও ফট্‌কির দ্বন্দ্ব। মার্জিত শিক্ষিকা নীলিমা তার আকাশকুসুম আর অন্যদিকে ফট্‌কির প্রবল উত্তেজক আকর্ষণ—এরই মধ্যে ছায়া পড়ে মৃতা স্ত্রী জানকীর। যার সংস্পর্শ থেকে সে একটা চরিত্রের জোর পেয়েছিল। নারীশরীরের ব্যবসায়, স্থূল লোলুপতায় তার তীব্র বিরাগ—কারণ তার সম্পদ তার পৌরুষ। তার জোরেই সে সমস্ত হীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে। নরসিং-এর চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে তার কর্মের প্রতি ভালোবাসায়—গাড়ির এঞ্জিন, গাড়ি চলার রাস্তার প্রতি মমত্ববোধে। খেটে খাওয়া মানুষের প্রগত পরিণতিই ফোটে শেষপর্যন্ত। উচ্চবিত্তের নানা চক্রান্তে মার খেয়েও সে হাসতে পারে হার-না মানা হাসি। পণ্য স্ত্রী ফট্‌কিকে বরণ করে নিতে পারে সিঁদুর পরিয়ে—চলে যেতে পারে নতুন জীবিকার সন্ধানে, মুর্শিদাবাদ ছেড়ে অণ্ডালের কয়লাখনির অঞ্চলে।

এ উপন্যাসে তারাশঙ্কর পরিবর্তমান জীবনে শ্রমশীল মানুষের জয়যাত্রাই আঁকেন, হয়তো একটু নাটকীয়তায়, ভাবগতির ঝোঁকে। নরসিং-এর ওপরে ওঠার লোভ আর মোহভঙ্গের আন্তরিক জটিলতা ন্যায্য মনোযোগ পায়না হয়ত। কিন্তু অন্যদিক থেকে এ উপন্যাসের তাৎপর্য সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াটা আশ্চর্যের।

তারাশঙ্কর এ উপন্যাসের বিন্যাসেও যেন স্বতন্ত্ররীতি অনুসরণ করেন। নরসিং-এর চিন্তাস্রোতে রেন অতীতকে ফলে ঘটনাগুলো চিন্তার সাযুজ্যে তাৎপর্য পায়। অতীতকে নরসিং-এর দৃষ্টিতে দেখেন বলে, দীর্ঘশ্বাসও কম। উপন্যাসের শেষে নরসিং-এর উপলব্ধিতে পরিবর্তমান বিশ্বে মানুষের ভূমিকা স্পষ্ট হয় 'কেয়াবাৎ দেশ! আজব কারখানার নতুন দেশ তৈরি করছে মানুষ এখানে। বিলকুল নতুন দুনিয়া। তার পূর্বপুরুষ গিরধারী সিংয়ের আমলে এ দুনিয়া ছিল না। গিরধারী সিং এসে বনের মধ্যে আড্ডা গেড়ে বন কেটে চাষী ক্ষেত গড়েছিল। সে চলেছে একালের এই নতুন দুনিয়ায়।'

সমরেশ বসুর 'নয়ন পুরের মাটি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৭-৫৮ সালে।

প্রকাশনা মধ্যপথে থেমে যায়, ১৩৫৯-এ সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছিলেন নয়নপুরের মাটি তাঁর প্রথম উপন্যাস।

এ উপন্যাসের নায়ক মহিম মৃৎশিল্পী—বংশানুক্রমিক ধারায় নয়, আপন প্রাণের তাগিদে। গ্রাম্য সমাজে সে-একটু ব্যতিক্রম। বৌদি অহল্যার সঙ্গে তার সম্পর্কের জটিলতা আর জমিদার বাড়ির শিক্ষিতা বধূ উমার আকর্ষণের টানাপোড়েনে শেষপর্যন্ত সে বেছে নেয় অহল্যাকে আর তাকে ঘিরে যে-গ্রামজীবন তাকেই। কলকাতা না গিয়ে সে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেই প্রত্যাখ্যান করে। কারণ যে-মহিম দেবমূর্তিগড়া কুমোরদের কাছে কাজ শিখেছিল, সে তখন গড়তে শুরু করেছে মৃত মহিষের ওপর উপুড় হয়ে পড়া মানুষের মূর্তি কিংবা জমিদারের চক্রান্তে খুন হওয়া গ্রামের বিদ্রোহী হরে-রামদার মুখ 'চাষীমনিষরে চেরকাল মুই এ মূর্তি দেখিয়ে বেড়াব।' ফলে, ভিটে থেকে উচ্ছেদ হয় তবু আপোষে আসে না জমিদারের চাকরি কিংবা জমিদার পুত্রবধূর খেয়ালি ভালবাসার লোভের হাতছানির সঙ্গে। তার শিল্পীসত্তা অন্য লোভ জয় করে। যদিও অহল্যার প্রভাবের ওপরই জোর পড়ে যায় অন্য চাপ বা প্রভাবের চেয়ে। অন্য চরিত্রগুলো জোর পায় না। কোন প্রভাবে গ্রাম্য শিল্পী মহিম এমন চারিত্র অর্জন করে তার ব্যাখ্যায়—কেবলই অহল্যার গূঢ় টান! অহল্যার চরিত্রেও এত ভার সয় না বলেই যেন রোম্যান্টিকতাই প্রশ্রয় পায়। কিন্তু তবু সমরেশ বসু এ প্রথম উপন্যাসেই সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছিলেন কোথাও কোথাও তারাশঙ্করের অচল প্রভাব সত্ত্বেও। আঁকাড়া জীবন ও তার মধ্যে মনুষ্যত্বের জয়ের সাধনার সন্ধানে তিনি যে ব্যাপৃত থাকবেন সে-আশ্বাস এ উপন্যাসে ছিল।

প্রথম গল্প ও উপন্যাস প্রকাশের সূত্রে সমরেশ বসু 'পরিচয়'কে তাঁর 'আতুড় ঘর' বলেন। ১৩৬৫ সালে তাঁর 'অচিনপুরের কথকতা'র প্রকাশ শুরু হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ হয় না। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসটির ভূমিকায় জানান যে, 'পরিচয়'-এ যে-আদি রূপ ছিল তা থেকে বহুদূরে চলে এসেছে তার পরিণত রূপ। ফলে আদি রূপের আলোচনা, যা-নাকি অসম্পূর্ণও, অর্থহীন। আর পরিণত রূপ এ আলোচনার এক্তিয়ারের বাইরে।

২.

পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৩৬০ সাল থেকে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত উপন্যাসগুলির একটা সাধারণ লক্ষণ স্পষ্টতই চোখে পড়ে যে লক্ষণকে বলা যায় রাজনীতি-

চেতনা। অবশ্য ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসত্রয়ীতেও রাজনীতির ভূমিকা ছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীয়ন্তেতেও। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের নায়কের আত্ম-সচেতনতার সার্থক পরিণতি হিসাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গুরুত্ব পায়, জীয়ন্তেতেও লক্ষ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, যতটা রাজনৈতিক কর্মী।

ননী ভৌমিকের 'ধুলোমাটি' উপন্যাস থেকে পরবর্তীকালে প্রকাশিত উপন্যাসগুলো কখনও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, কখনও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাঙাগড়া ব্যক্তিজীবনে অনেক বেশি গুরুত্ব পায়—প্রায় কেন্দ্রে চলে আসে। 'ধুলোমাটি', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোলাপ হয়ে ফুটবে', আশীষ বর্মণের 'যবনিকার আগে' প্রত্যক্ষতই রাজনীতিকেন্দ্রিক। দেবেশ রায়ের 'যযাতি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিকে আশ্রয় না করেও আশ্চর্যভাবে পরবর্তী সত্তরের দশকের যৌবনের ক্ষিপ্ত-হতাশা-ছিন্নমস্তা নৈতিক-রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোর মূলে পৌঁছে যায়।

সেদিক থেকে 'পরিচয়'-এর এসব উপন্যাসের, অন্য বিচারের সার্থকতা ব্যর্থতার সত্ত্বেও একটা সাধারণ গুরুত্ব অনস্বীকার্যভাবে থেকে যায়। ব্যক্তি-মানুষকে জাতীয় মুক্তি ও শ্রেণীসংগ্রামের লড়াই-এর বৃহত্তর ও তাৎপর্যপূর্ণ পটভূমিকায় স্থাপন করে, ইতিহাস ও ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে বুঝে নেওয়ার আন্তরিক চেষ্টায় এসব উপন্যাস অন্তত অকিঞ্চিৎকরতাকে অতিক্রম করে যায়—হাজার পাঁচ-পয়জার সত্ত্বেও সমসাময়িক বাজারি উপন্যাসগুলো যে রোগে রক্তশূন্য ও তাৎপর্যহীন। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এই জোরে, শুধু এরই জোরে, বক্ষ্যমান উপন্যাসগুলো মহত্ত্বের দাবি করতে পারে—কিন্তু তুচ্ছতার অগৌরব এদের স্পর্শ করে না, অন্যান্য নানান ব্যর্থতার চিহ্ন কেউ যদি খুঁজেও পান, তৎসত্ত্বেও। 'ধুলোমাটি' এরই জোরে হয়ে ওঠে ভীষণভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক উপন্যাস—তিন প্রজন্মকে ছুঁয়ে, এক মহাযুদ্ধ থেকে অন্য মহাযুদ্ধের ইতিহাসে কম্পমান এর অভিজ্ঞতা-র পৃথিবী। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকেই শেষপর্যন্ত জাহাজি শ্রমিক ইয়াসিনের হাত ধরে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তো কমিউনিস্ট আন্দোলনের বে-আইনি যুগের বাস্তবতাকেই কেন্দ্র করে লেখেন 'গোলাপ হয়ে ফুটবে।' একান্তভাবে সাম্যবাদী আন্দোলনের বিশেষ যুগের শ্বাসরোধ-কারী জটিলতা ও সমস্যাকেন্দ্রিক উপন্যাসে ব্যক্তি চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের মানবিক দিক তাৎপর্যময় আনন্দ ও যন্ত্রণায় আক্রান্ত হতে পারে—ঐ আন্দোলনের মুক্তিস্বপ্নেরই নন্দিত স্পর্শে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতভেদ

ও তার পরিণতির বীজকে তিনি ধরতে চান সেই বে-আইনি যুগে। রচনাকালে (১৩৭০-৭১) এরও গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আশীষবর্মণ সমকালকে ধরতে চান যবনিকার আগে উপন্যাসে, বিক্ষত সত্তরের দশকের শেষ দিকটাকে, সে-দশকের রাজনীতির গোলমাল ও পরিণতি যখন স্পষ্ট হতে শুরু করেছে ঠিক তখনই—হয়তো বিশেষ মতামতের চাপে একটু দ্রুত চলেন তিনি, কিন্তু খুঁজতে চান, বলতে চান মানুষের মুক্তি আন্দোলনে মানুষেরই ভূমিকার জটিলতা তার বিভ্রান্তি ও হতাশা। কিন্তু শামুকের নয়, রাজনৈতিক প্রাণী মানুষের।

'মহিষকুড়ার উপকথা'য় অমিয়ভূষণ দেখিয়েছেন—এ-সমাজে দরিদ্র মজুরের জননক্ষমতায় জাত পুত্র, অক্ষম ধনীর সন্তান পরিচয় লাভ করে। যে-অক্ষম, কিন্তু চতুর ধনী একালেও পঞ্চায়েত প্রধান হয়ে যায়।

ননী ভৌমিকের ধুলোমাটি প্রকাশিত হয় ১৩৬০-১৩৬২ সালে। কিঞ্চিদোধিক চারশো পৃষ্ঠার এই উপন্যাসের পটভূমি প্রায় তিন প্রজন্মকে ছুঁয়ে আছে। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রামচন্দ্র চৌধুরী-পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী-শিবেন্দ্র-বীরেন্দ্র চৌধুরীর মফস্বল শহরাশ্রিত জীবনের বিবর্তন এ-উপন্যাসের কেন্দ্রবস্তু। সময়টাও বাঙলাদেশের বহু ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষী—আন্দোলনের আশা-হতাশার। ঔপন্যাসিক দায় পালন করেছিলেন অত্যন্ত দক্ষতায় অথচ পরবর্তীকালের অনেক সিরিয়াস আলোচনাতেও বইটির প্রতি যোগ্য মর্যাদার অভাব লক্ষ্য করে আশ্চর্য হতে হয়।

সন্ত্রাসবাদী শিবেন্দ্র, পূর্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র এ-উপন্যাসের নায়ক নয়, নায়ক কনিষ্ঠ বীরু। একজন স্পর্শকাতর কিন্তু নিষ্ক্রিয় অথচ গ্রহণক্ষম কিশোরের এই যুগপরিবেশের অভিজ্ঞতা তাৎপর্য পেয়েছে এই উপন্যাসে। অজস্র চরিত্র—সামন্তযুগের ধনী. আধুনিক ধনী থেকে বাগদী, জাহাজী ইয়াসিন ও তার ছেলে আবদুল, এদের সংস্পর্শে এই মধ্যবিত্ত কিশোরের জগৎ গড়ে উঠেছে। উপন্যাসটার সূত্রপাত ঘটেছে উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত রামচন্দ্র চৌধুরীর স্বপ্ন দেখা দিয়ে, এই নবীন মধ্যবিত্তের স্বপ্ন কিন্তু ভেঙে যায় কলোনির জীবনের রূঢ় বাস্তবে। তার পুত্র পূর্ণচন্দ্র মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তারই কাঙাল হয়ে পড়েন। রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের দাম্পত্য জীবনেও যুগপরিবর্তনের আভাস। তৃতীয় পুরুষ শিবু-বীরু কিন্তু বিদ্রোহী মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে মধ্যবিত্তের চাকুরে নিরাপত্তার স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে আসে। সন্ত্রাস-বাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়, কংগ্রেসী রাজনীতির ফাঁকি ধরা পড়তে থাকে,

সত্যবাবুদের মতো সে-রাজনীতিতেই বিশ্বাসী, আত্মত্যাগী মানুষদের কাছেও। অগণ্য চরিত্রের বিকাশ ও বিবর্তনে ফুটে ওঠে ভারতবর্ষের জটিল বাস্তব-স্বরূপ। তাই রমেশবাবু সন্ত্রাসবাদী স্বদেশীর দীর্ঘপথ পরিক্রমার শেষে এসে বসেন কমিউনিজম অধ্যয়নের ক্লাসে। রামচন্দ্র চৌধুরীর নানা আত্মনির্ভরতার প্রয়াস, যন্ত্রযুগ আনার প্রয়াস ব্যর্থ হতে হতে উপন্যাসের শেষে লাল কার্পাস হয়ে ফুটে ওঠার মিথ্যে সান্ত্বনায় একেবারে শেষ হয়ে যায়। বীরু, নানা অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া, আর তাই সংকীর্ণতাহীন জাহাজী শ্রমিক ইয়াসিনের সঙ্গ নিয়ে কলকাতার পথে বড়দের জগতে পা বাড়ায়।

একজন কিশোরেরই বড় হয়ে ওঠার কাহিনী—কিন্তু স্বপ্নালুতার পয়ারে নয়, দেশকালগত রূঢ় বাস্তবের অমিত্রাক্ষরে। চল্লিশের দশকে বাংলা উপন্যাসে বাস্তব ও দেশকালবিধৃত মানবস্বীকৃতির যে-জীবন বিশ্বাসী ধারা স্থিতিলাভ করছিল, 'ধুলোমাটি' তারই ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচয়। গদ্যভঙ্গিতে সেই বাস্তবকে ধরার যোগ্যতা থাকে বাক্য ও শব্দ বিন্যাসের সচেতনতায়।

১৩৭০-৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গোলাপ হয় ফুটবে'।

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশেষ একটি সঙ্কটময় সময়কে ঔপন্যাসিক ধরার চেষ্টা করেছেন—১৯৪৮-৪৯ খৃস্টাব্দের বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির যুগ, উপন্যাসের শেষে বেআইনি যুগ শেষ হয়ে আসছে। ফলে, সাম্যবাদী রাজনীতির তত্ত্ব ও কর্মপদ্ধতির প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে উপন্যাসটায় প্রাধান্য পায়। কিন্তু সরোজবাবুর কৃতিত্ব এখানেই যে তাকে তিনি শিল্পরূপে বিধৃত করতে পারেন সুব্রত-রুচি-শান্তনু প্রভৃতি ব্যক্তি-চরিত্রের রক্তমাংসের আধারে, পারস্পরিক সম্পর্কে ছন্দে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮-৪৯-এর দিনগুলোকেই নিয়ে আসেন। উদ্বাস্তু কলোনি, মফস্বল নৈহাটির পরিবেশ, বানেভাসা শহিদপুর কলোনি, এ-উপন্যাসের বাস্তবভূমি। তারই মধ্যে সুব্রতর অনুজ প্রিয়ব্রত তার স্ত্রী নন্দিনীর সাংসারিক দ্বন্দ্বে-মিলনে, সুব্রতর সঙ্গে প্রিয়ব্রত-মানবদের চারিত্রিক বৈপরীত্যে, ফর এ হ্যাপি ইউথ ইন ফ্রি ইণ্ডিয়া লেখা ফেস্টুনে, দাউ দাউ জ্বলা মোকামা এক্সপ্রেসের বিপ্লবী আন্দোলনের স্মৃতিতে, গ্যাব্রিয়েল পেরীর উক্তির উদ্ধৃতিতে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মজুর এলাকায় বস্তির আগুনে ফুটে ওঠে এ-দেশের জটিল এক বাস্তব। আর তারই মাঝখানে ছিন্ন-ভিন্ন বাঙলাদেশে 'স্বাধীনতা'কাঙ্খী কয়েকটি মানুষের কর্মকলাপ তাৎপর্য পায়।

কিন্তু, রাজনৈতিক বিভ্রান্তি, রমেন বা শান্তনুর মৃত্যু বা হতাশা কিং বা সুব্রতর পাপবোধ যেমন বস্তুভূমি পায়, তেমনি তাকে অতিক্রম করে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষঙ্গে সমস্ত ব্যথা রঙীন গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠার বোধ অমোঘ হয়ে ওঠে—তত্ত্বে নয়, কর্মের বাস্তবে। সব ছাপিয়ে মনে থেকে যায় বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির রিলিফ ওয়ার্কের ছবি—'আকাশে ঝলসানো বিদ্যুতের চমকানিতে ওরা দেখতে পেল মানুষগুলোও ওদের দেখতে পেয়েছে। শুনতে পেয়েছে। সুব্রত অনেকদিনের পুরোনো ইমোশানটা আবার নতুন করে বুকে টেনে নিল। লাল ঝাণ্ডা এসে গেছে ভয় নেই। এমনি করেই এই ভাবেই বারে বারে পৌঁছেছে ওরা তেভাগার মাঠে, মাঠের কারখানায় দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে এদেশে ওদেশে সর্বত্র।'

যে সময়টাকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে ধরেন, তখনকার পরিচয়ের (১৩৫৪ ফাল্গুন) পাতায় ঘোষণা ছিল—'পরিচয়' সম্পাদক গোপাল হালদার বন্দী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বন্দী, গণশক্তি প্রেস বন্ধ।

দেবেশ রায়ের যযাতি উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৩৭১-৭৫

এ-উপন্যাসের সূত্রপাত উপন্যাসটার মূল ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। গিরিজা-মোহনের পুত্র খোকা গৃহত্যাগী হয়ে যাওয়ার পর। গিরিজামোহন, তাঁর স্ত্রী রেণু ও তাঁদের পুত্র খোকা এই তিনটি চরিত্র সে-ঘটনার পর্যালোচনা করছে এটাই এই উপন্যাসের বিশিষ্ট রীতি। ফলে, দেবেশ রায় অর্জন করে নেন এই আঙ্গিক বা টেকনিকের জোরেই ঘটনাজালে জড়িয়ে না পড়ার ঔপন্যাসিক স্বাধীনতা। অর্জন করে নেন একটা বাস্তবকে তার সামগ্রিকতায় ধরার সুযোগ, একটা সঙ্কটকে তিনটে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আবিষ্কার করার নৈর্ব্যক্তিকতা।

যে-সঙ্কট খোকা তৈরি করে, বা যেভাবে সে সঙ্কট উত্তরণে প্রয়াস পায় তাতে ফোটে প্রজন্মগত ব্যবধান বা অনন্বয়ের যন্ত্রণা। তাকে দেশকালগত পটভূমি দিয়ে লেখক করে তোলেন এদেশেরই বাস্তব। তিনটে চরিত্রের অবস্থান এত সচেতন বিন্যাসে ধরেন যে, সে অনুপুঙ্খ বাস্তবে, পরিসর ছোট হলেও ফোটে বিস্তারের মাত্রা। প্রতিটি ডিটেল কিন্তু উপন্যাসের বিন্যাসের সঙ্গে অন্বিত হয়—দেহদানের সময়ে বেশ্যার ভঙ্গিও।

এ কাজে সব থেকে সহায় হয় তাঁর গদ্য। বাস্তবতাকে আবিষ্কার করতে করতে তার ছাঁচকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টায় তিনি ব্যগ্র, তাঁর উচ্ছ্বাসহীন, কিন্তু নিরাবেগ নয়—এমন জটিল গদ্যে। যযাতি ১৯৬৮তে শেষ

হয়েছিল। সত্তরের দশকের ছেঁড়াখোড়া যৌবনের অস্থিরতার সময়গুলোর সঙ্গে কোথায় যেন এ-উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। একটা পারিবারিক ইতিহাসের বাস্তবতাকে খনন করে তিনি যে হীরকখণ্ড তুলে আনেন তার কোনো কোনো তলে ধরা পড়ে যায় ভবিষ্যতের প্রতিরূপ। যৌবনকে অস্বীকারের, তার মুক্তি স্বপ্নকে শ্বাসরোধ করার দায়িত্ব ছিল গোটা সমাজের ফাঁপা এস্টাব্লিশমন্টের,—সত্তরের ক্ষিপ্ত তারুণ্য যে হননে ও আত্ম-হননে মেতেছিল তার গভীরতর মনস্তত্ত্ব যযাতি উপন্যাসের পিতাপুত্র সম্পর্কে বেশ কিছু পূর্বেই উপলব্ধ হয়েছিল বলেই বর্তমান আলোচকের ধারণা।

আশীষ বর্মণের 'যবনিকার আগে' প্রকাশিত হয় ১৩৮৫-৮৬ সালে।

আশীষ বর্মণ তাঁর উপন্যাসে রচনার সমকালকে আশ্রয় করেছেন—সত্তরের আন্দোলনের পরবর্তী নিবে যাওয়া অথচ ইতস্তত আগুনের দাগ লেগে থাকা কলকাতার দরিদ্র শিক্ষিত যুবক বাদল এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার আত্মকথনে এ-উপন্যাসের অগ্রসৃতি।

বাদলের বন্ধু সুকু ও পলটু। সুকুর বাবা, বাদলের বিবরণে যিনি গগন জ্যাঠা বলে উল্লিখিত, তিনি রাজনীতি করা মানুষ। বাদলেরা বোমা মেরে তাঁর হাত উড়িয়ে দিয়েছিল। গগন জ্যাঠা কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন শ্রেণী বিশ্লেষণের এই তত্ত্ব থেকে 'আমি ভেবেছি কংগ্রেস পেটি বুর্জোয়া পার্টি...বুর্জোয়ারা না করেছে জাতীয় আন্দোলন, না বসেছে গদীতে ...ওরা বিশ্বধনতন্ত্রের দালাল ছিল আজও আছে...।' এই পেটি বুর্জোয়া পার্টির ভেতরে ও বাইরে বামপন্থী চাপ থাকলে হয়ত সাম্যবাদ আনার কাজে এগোতে পারে। বাদল শুনে বলেছিল 'বোগাস' 'দালালির তত্ত্ব'। তার ক'মাস পরে বাদলদের দলের একটি ছেলে, শ্রেণীশত্রু জ্ঞানে বোমায় ওর হাত উড়িয়ে দিয়েছিল। কনুই থেকে কাটা হাত নিয়ে ভিড় ট্রাম-বাসেই ওর যাতায়াত। অথচ কংগ্রেসই করেন, কিন্তু গুছিয়ে নেন নি। তাঁর বিশ্বাস ডান-বাম রাজনীতিতে রক্ষণশীল ও মুক্ত মননসম্পন্ন মধ্যবিত্তেরই প্রাধান্য, 'মধ্যশ্রেণীর ক্ষমতার এই আপেক্ষিক স্থায়িত্ব জনগণের সংগঠন ও শক্তি ইতিমধ্যে গড়ে না উঠলে রক্ষণশীলতার দিকে ঝোঁকার সমূহ সম্ভাবনা।'

বাদলের জবানবন্দী: 'এসব কথা যখন আমি শুনেছি তখন অন্তরে ছিল শুধু শ্লেষ ও নির্বিচার আক্রোশ। আজ আরও দেখেশুনে, মর্মান্তিক ঘা খেয়ে, যখন ভূতপূর্ব নকশালী নেতারাও অনেকে নির্বাচনে নামেন, গণতন্ত্রের সম্প্রসারণে প্রয়াস পান, শুধু নয়,সি পি এম-ও তথাকথিত বুর্জোয়া জমিদারদের

পার্টিগুলোতে প্রগতিপন্থী খুঁজে পান, তখন আমি আর আগের নিশ্চিতি খুঁজে পাই নে। আগের প্রত্যয় অথবা অন্ধ বিশ্বাস. নির্বিচার উত্তেজনা আপাতত আমার অনায়ত্ত।'

এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত, উপন্যাসটার চরিত্রগুলোর সম্পর্ককে দেশ-কালগত তাৎপর্য দেয়। সত্তরের প্রারম্ভের উত্তেজনার শেষে, সত্তরের অন্তিমের রাজনৈতিক বন্ধ্যাদশা, চতুর্দিকের ক্লৈব্যের আড়ালে যুব চরিত্রগুলোর গুছিয়ে নেওয়ার, মূল্যবোধহীন আচার আচরণ অর্থময় হয়ে ওঠে—তারই মধ্যে ঔপন্যাসিক গগন জ্যাঠার চরিত্রটাকে পরোক্ষ রেখেও প্রাধান্য দেন—পজিটিভ করে তোলেন।

অন্য পক্ষে বোঝাই যায়, আশীষ বর্মণ বাদল সুকু পলটুর সম্পর্কে নিয়ে আসেন মানবিক মূল্যবোধের স্পর্শ—যেখানে তাদের সাযুজ্য, তাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদল একা হয়ে যায়—জীবিকার ও জীবনের একেলে চতুর চক্রান্তে। অরাজনৈতিক পলটু বাবার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তুখোড রোজগেরে হয়ে যায়। সুকু যুব কংগ্রেসী নেতার তদ্বিরে চাকরি পেয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কুন্তলার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যায়।

ব্যক্তিচরিত্র ও ঘটনার টানাপোড়োনে অভিজ্ঞতাকে তাৎপর্য দেওয়ার চেষ্টা থাকে—খুব সাবলীলতায়। এদিক থেকে আশীষ বর্মণ সমকালীন অনেকের থেকেই আলাদা চারিত্র্য পান। খুব স্বচ্ছন্দে, একটু স্মিত ভঙ্গিতে—হাল্কা কথাবার্তায় চরিত্রগুলোকে হাজির করেন—কিন্তু জটিল পরিস্থিতির গভীরতা ক্ষুণ্ণ না করেই। দৈনন্দিনের তুচ্ছ ঘটনাই কিন্তু হয়ে ওঠে তাঁর উপলব্ধির আশ্রয়। ইদানীংকার রাজনীতি-সমন্বিত উপন্যাসে যে-দৈনন্দিন অস্বীকৃত হয়ে, উপন্যাসকে রোমান্টিকতার উন্মার্গে ছোটায়।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের মহিষকুড়ার উপকথা ১৩৮৬-র শারদীয়ায় বড় গল্প হিসেবে প্রকাশিত হয়।

এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আসফাক—গ্রামীণ সর্বহারা। আসফাকের বর্তমান পরিচয় সে জোত-খামারের মালিক জাফরুল্লার বাড়ির চাকর। মাইনে পায় না, খেতে পরতে পায়, গোরু বলদের দেখাশুনা করে। জাফরুল্লা শহরে গেলে সমস্ত বাড়ির দায়িত্বই থাকে তার ওপর। চার বিবির খোঁজখবরও নেয়। কমরুণ জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি। আসফাকই খুঁজে পেয়েছিল সাত বছর আগে, বসন্ত রোগে মৃত স্বামী কোলে বেদের দলের

পরিত্যক্ত কমরুণ বসেছিল। তারপর পাকেচক্রে এই মহিষকুড়ায় পৌঁছে, আসফাক জাফরুল্লার জমিতে কাজ পায়—কমরুণ ঘরে। তারপর একদিন এক বর্ষার দিনে, কমরুণ বিবি হয়ে যায়, আসফাক এখনও চাকর। চার বিবির মধ্যে কমরুণেরই বাচ্চা হয়—সুতরাং একমাত্র উত্তরাধিকারী মুন্নাফ। আসফাক পাকেচক্রে জেনেই ফেলে কেন কমরুণ মুন্নাফকে আসফাকের নাম না ধরে মিঞা বলতে শিখিয়েছে। জাফরুল্লা কমরুণকে খুঁজেও পায় নি, তার সন্তানের জনকও নয়—কিন্তু সে বিত্তবান, ফলে, আসফাকের কমরুণ ও মুন্নাফ তারই হয়ে যায়।

কাহিনীর শেষে জাফরুল্লা হাজির হয় ট্রাক নিয়ে—বহু মহিষের সমান একটা ট্রাক। শোনা যায় জাফর 'পঞ্চায়েত পিধান' হয়েছে। 'কথাটা তার অজানা নয়। ভোটবাবুরা এমন কি সেই হাকিমও আশ্বাস দিয়েছিল এই নির্বাচন হলে গ্রামে আর জমিজিরেত নিয়ে অন্যায় থাকবে না।

আসফাক ট্রাকের আড়ালে হেসে ফেলবে যেন। দেখ কাণ্ড সেই জাফরই হল পঞ্চায়েত পিধান যার নামে সে হাকিমকে নালিশ করতে গিয়েছিল।···

এ তো বোঝাই যাচ্ছে শহরের রাজারা, যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ-না-মানা কোনো মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছেমতো বনে চরতে আর কোনো-দিনই দেবে না। যদিও হঠাৎ তোমার রক্তের মধ্যে এক বুনো বাইশন আঁ-আঁ-আঁড় করে ডেকে ওঠে।'

এখানেই গল্পের শেষ। কিন্তু এখানে পৌঁছতে হয় আসফাকের জীবনের বাস্তবতার গভীর পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে। মহিষকুড়ার অল্পকটা চরিত্রের জীবনযাপনে গ্রামীণ অসহায়তা, সঙ্কীর্ণ জীবনজাত সঙ্কীর্ণ বোধবুদ্ধি, হীনমন্যতা ফোটে। স্বাধীনতা, যুক্তফ্রন্ট, কৃষিবিপ্লব, বামফ্রন্টের ইতিহাসের পরেও আজ এই সময়ে গ্রামীণ জীবনের এই সত্যকে আশ্রয় করার গুরুত্ব উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তার জন্য যে সততাটা জরুরি, সে বিষয়ে অমিয়-ভূষণের যোগ্যতার তুলনা কম।

কেননা, অমিয়ভূষণ গ্রামীণ জীবনকে চেনেন খুব প্রত্যক্ষভাবে—তাকে অর্থময় সমগ্রতাও দিতে পারেন নিরাসক্ত দেখার শান্ত ধৈর্যে, গদ্যভঙ্গির সাবলীল বিন্যাসে। আঞ্চলিক উপকথা শুধু ঔৎসুক্য নিবারণী টোট্‌কা না হয়ে ভারতের বাস্তবতার স্বরূপ হয়ে ওঠে। অমিয়ভূষণও নেমে আসেন এখানে, নিচুতলার চরিত্রের বাস্তবে। কাহিনীর অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গটা, অমিয়ভূষণের

প্রায়-রাবীন্দ্রিক ভাষায় তীব্রতা পায় না, আর সেই কারণেই হয়ত গভীরে ছড়িয়ে যেতে পারে।

১৩৮৭ সালের শারদীয়ায় বেরিয়েছিল অসীম রায় রচিত 'নবাব ক্লাইভ'।

লেখকের পরবর্তী চিঠিপত্রে জানা গেছে 'নবাব ক্লাইভ' একটি বড় উপন্যাসের শেষাংশ যে জন্য তার সম্পর্কে মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে বোঝাই যায় যে, ইতিহাসের পাতায় আর অয়েল পেন্টিং-এ যেসব রাজা-মহারাজা-শেঠ-লর্ডেরা রঙিন বিশাল, তাঁদের সেই বেলুন তিনি চুপসে দিতে চান। ইতিহাসের বর্ণবিহ্বলতাটুকু পুঁজি করে, এই বিশ শতকের শেষেও যে বেসাতি চলেছে উপন্যাসের বাজারে, তার পাশে এ একটা ক্ষমতাবান প্রতিবাদ। তার পাশে তিনি সংগ্রামী মানুষের জীবনের তাৎপর্যকেই প্রাধান্য দিতে চান—'বারোমাস' পত্রিকায় প্রকাশিত নবাব-বাঁদীর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে সেটা স্পষ্ট হয়। কোনো উপন্যাসের অংশ সম্পর্কে এর বেশি মন্তব্য ন্যায্যতা-বিরুদ্ধ হবে।

শিল্পীমাত্রকেই তোরেয়াদর হিসাবে কল্পনা করেছিলেন বিষ্ণু দে। এক-দিকে বাস্তবতার চাপ অন্যদিকে তাকে শিল্পরূপ দেওয়ার দায়—এই উভয়ের সম্মুখীন হওয়ার গুরুত্ব বোঝাতে। উপন্যাসে এ-দায় বুঝি সর্বাধিক প্রকট—বিশেষত ১৯৩০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত বাংলাদেশের সচেতন ঔপন্যাসিকদের বেলায়। অহিংস-সহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়, গূঢ় কিন্তু বাস্তব শ্রেণীসংগ্রাম, মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, প্রত্যাশা, শ্রেণী-বিরোধ, হতাশা, সাম্যবাদী আন্দোলনে বিভেদ, যুক্তফ্রন্ট, সত্তরের অস্থিরতা, বামফ্রন্ট—এই ইতিহাসের অর্ধশতাব্দী জুড়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় সামাজিক জীবনের ঔপন্যাসিক ভাষ্য রচনার ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে স্পষ্টই চোখে পড়ে, দেশকালগত জীবনের, অসম্পূর্ণ বিকাশে অস্পষ্ট, কিন্তু নানা পরিবর্তনে অস্থির ও আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল, চেহারাটাকে শিল্পরূপ দেওয়ার সেই উভবল দুরূহ চেষ্টার চিহ্ন। চালু ফ্যাশান, স্টক রেসপন্সের চর্চার সহজ পদ্ধতিতে জন-প্রিয়তার লোভ প্রবল পৌরুষে, জীবন ও শিল্পের প্রতি সততায়, এড়িয়ে, গভীর জীবনদৃষ্টির সংলগ্নতায় সাংবাদিক তথ্যকে তাৎপর্য দেওয়ার সাধনা করে যান এই সব উপন্যাসের লেখকেরা।

আর স্থিতাবস্থায় নয়, জীবনের পরিবর্তমান বাস্তবে মানুষের ভূমিকায় যেহেতু প্রগত সমাজদর্শনেরই উৎসাহ, তাই বাস্তব শিল্পেরই প্রয়োজনে এসব

উপন্যাসের অনেকগুলিতেই প্রাধান্য পায় সাম্যবাদী চিন্তার ও মানুষের ভূমিকা। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকতায় নয়, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব বিস্তারেই তাঁদের উৎসাহ—সমাজবাস্তবের জটিলতায় ব্যক্তির স্বাধীন ভাবনার উদ্বোধনের দায়ে।

ফলে আদি থেকে অদ্যাবধি পরিচয়ের উপন্যাসগুলো হয়ে থাকে সচেতন মনেরই খোরাক।

পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের বিবর্তনের ছায়া ধরা পড়ে বিষয় ও রূপের বৈচিত্র্যে। স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রাপ্তির সময়ের নায়কদের আশাবাদী পৌরুষ ইদানিংকালের নিষ্ক্রিয় কিংবা ক্ষুব্ধ বা ব্যঙ্গপ্রবণ নায়কে বিবর্তিত হয়। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের বাস্তবভুবন সৃষ্টির চেষ্টা থেকে জটিলতর এই সমকালো বাস্তবাতিশায়ী স্তরকে সংলগ্ন করার চেষ্টায় পৌঁছে যাই।

তবু এ-বৈচিত্র্য ও বিবর্তনেও একটা ঐক্যসূত্র থাকে—বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রগত ও নতুন মানুষকে কেন্দ্রে আনার ধারাবাহিক চেষ্টায়। তাই তারাশঙ্করও ‘পরিচয়’ পত্রিকায় ‘অভিযান’ লেখার সময়ে নিজস্ব কক্ষ থেকে একটু সরেই আসেন যেন, নরসিং-কে তার পরিণতিতে আঁকতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তারাই ‘জীয়ন্ত’,—‘ধুলোমাটি’তে সেই নতুন মানুষকেই ইয়াসিনের সঙ্গ নিতে দেখি, ‘গোলাপ হয়ে ফুটবে’ সেইসব মানুষেরই সাধনার জটিলতা। ‘যযাতি’ বা ‘যবনিকার আগে’র বাস্তবতায় তারা হয়তো অস্থির বা একাকী, ‘মহিষকুড়ায়’ বঞ্চিত কিন্তু কোথায় যেন সচেতন। কিন্তু সেই নতুন মানুষজনই কেন্দ্রে দাঁড়ায়—কারণ পরিচয়ের ঔপন্যাসিকরা জানেন যে, নতুন মানুষ ছাড়া নতুন শিল্প হয় না।

‘পরিচয়’-এ প্রকাশিত উপন্যাসের তালিকা

	নাম	লেখক	প্রকাশারম্ভ
১।	এই জীবন (অন্তঃশীলার সূত্রপাত)	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৩৪০
২।	আবর্ত	ঐ	১৩৪৩
৩।	সোমলতা	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	১৩৪৪
৪।	সিখসম্রাট ও সতীর অভিশাপ	৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (প্রকাশকালে লেখক মৃত)	১৩৪৫

৫।	দাবী	নীরেন্দ্রনাথ রায়	১৩৪৫
৬।	অহিংসা	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৪৫
৭।	মোহানা	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৩৪৮
৮।	লক্ষ্মীছাড়ী	শৈলেন্দ্র ঘোষ	১৩৫০
৯।	অভিযান	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৫২
১০।	জীয়ন্ত	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৫৪
১১।	নয়নপুরের মাটি	সমরেশ বসু	১৩৫৭
১২।	ধুলোমাটি	ননী ভৌমিক	১৩৬০
১৩।	অচিনপুরের কথকতা	সমরেশ বসু	১৩৬৪
১৪।	গোলাপ হয়ে ফুটবে	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৭০
১৫।	যযাতি	দেবেশ রায়	১৩৭১
১৬।	উদয়পুরের উপকথা	ভবানী সেন (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)	১৩৭৯
১৭।	যবনিকার আগে	আশীষ বর্মণ	১৩৮৫
১৮।	মহিষকুড়ার উপকথা	অমিয়ভূষণ মজুমদার	১৩৮৬
১৯।	নবাব ক্লাইভ	অসীম রায়	১৩৮৭

অনুবাদ-উপন্যাস

	নাম	লেখক	প্রকাশারম্ভ
১।	ভারতপথে (এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া)	ই. এম. ফর্স্টার সারানুবাদ : হিরণ সান্যাল	১৩৪৪
২।	সাফো	আলফাস দোদে অনুবাদ : বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়	১৩৪৭
৩।	মৃত্যুহীন (রাজন্যম)	আলেকসান্দর ফাদাইয়েভ অনুবাদ : সোমনাথ লাহিড়ী	১৩৬১

অভ্র ঘোষ

তর্ক-বিতর্কে দুই দশকের ‘পরিচয়’

বোধহয় ‘পরিচয়’ সেই বিরলতম সাময়িকপত্র যা তার পঞ্চাশ বছরের জীবনে প্রায় সর্বদাই ‘সতর্ক’—অথচ ‘পরিচয়’-এর পরিচালক ও লেখক সমাজের ভিতর এক আদর্শ ও চিন্তাগত মিল সবসময়ই ছিল সক্রিয়। সেই তত্ত্ব ও চিন্তা—কী তার প্রাক্-মার্কসীয় আদিপর্বে আর কী তার মার্কসীয় উত্তরপর্বে—গভীর আত্মসচেতনতার সাধনারই অংশ। আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টিশীল চর্চা ও আধুনিক আলোচনার মান আবিষ্কার—এই দুই-ই ছিল হয়ত ‘পরিচয়’-এর লেখকদের লক্ষ্য। তাই ‘সম্মতি’ নয়, বিতর্কই চিরকাল ‘পরিচয়’-এর প্রাণ।

এই নিবন্ধে সেই বিতর্কগুলির মাত্র কয়েকটির বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করা হবে ১৯৩১ থেকে ৪৭/৪৮ এই সময়সীমার মধ্যে।

প্রগতিশীল সাহিত্যের সংজ্ঞা ও বিচার নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির ওতপ্রোত যে-বিতর্ক বছর দুয়েক ‘পরিচয়’-এর পাতায় ঘটেছিল—তা এই নিবন্ধে আলোচিত হবে না। আমাদের মনে হয়—ঐ বিতর্ক কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির অংশ মাত্র, আর তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই বিতর্কটিকে অত্যধিক মূল্য দেয়া হয় শত্রু-মিত্র দুই মহলেই। আমরা তা থেকে বিরত থাকছি।

১.

প্রবীণদের মহলে কেউ কেউ এ-রকম নাকি বলেন যে অভিজাত সাহিত্য-পত্র ‘পরিচয়’ সুধীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে যেমন ছিল তেমন মান আর বজায় রাখতে পারে নি মার্কসবাদীদের আমলে। অভিজাত্যের বহর অনেকটাই খাটো হয়ে গিয়েছে তার। হয়তো কিছু সত্যতা আছে এই ধারণায়, আবার নেই-ও তা অন্য কোনো যুক্তির বিচারে—দৃষ্টিভঙ্গির তফাতে। কী অর্থে প্রথমোক্তের সত্যতাটুকু স্বীকার্য, আর কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে তা নিতান্তই বিভ্রান্তি, পঞ্চাশ বছরের পুরনো এই পত্রিকার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেই তা বোধহয় ধরা পড়বে।

এ-কথা সকলেরই জানা যে ১৯৩১-এ সুধীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজাত গুণী শিল্পরসিক সাহিত্যিক বন্ধুদের সাহচর্যে নতুন এক সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশ করে। দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার কথাই ভেবেছিলেন তাঁরা। নামকরণও হয়েছিল পত্রিকার 'পরিচয়'।

পূর্বসূরী হলেও ভারতী, সবুজপত্র, বিচিত্রা-র ধারা অব্যাহত রাখার কথা সচেতনভাবে ভাবেন নি 'পরিচয়'-এর উদ্যোক্তারা, কল্লোল, কালিকলম তো নয়ই। এমন কি রবীন্দ্রনাথ থেকেও একটু দূরে দূরে থাকতে পারলেই যেন ভাল। যদিও পারেন নি তা পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী সচেতন থাকা সত্ত্বেও— '...প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের রচনা, অন্তত সংক্ষিপ্ত একটি বাণী বহন করে পরিচয় পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলে প্রচলিত প্রথা বজায় থাকত। তা যে থাকে নি তার কারণ সুধীন দত্ত ও তাঁর সহযোগিবৃন্দ সংকল্প করেছিলেন যে সম্পাদকীয় ভিক্ষাপাত্র হাতে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হবেন না। অন্তত প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময়ে তাঁরা এই সংকল্প পালন করে-ছিলেন। ..কিন্তু রবীন্দ্র-বর্জিত প্রথম সংখ্যা দেখে রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের উৎসাহ দিলেন, তখন আমরা বুঝলাম যে পরিচয় সম্পূর্ণ স্বকীয় শক্তিতে সমুত্থ, অতএব রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা দাবি করতে আর কোন দ্বিধার কারণ থাকতে পারে না।' (পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র : হিরণ কুমার সান্যাল)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু রবীন্দ্রনাথই নয়, তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু লেখকের রচনা নিয়েই 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ হতো। পত্রিকার প্রথম কয়েক বছরের সূচী লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতিধারার এক উন্নত ছবিই যেন স্পষ্ট হয়ে ক্রমশ ফুটে উঠছে। সে-ধারা ছিল মোটের ওপর গতানুগতিক ধারাই। ব্যতিক্রম একটি ক্ষেত্রেই অনুভূত হতো, তা হল পুস্তক সমালোচনার বিভাগটিতে। প্রায় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার লক্ষণ ধরা পড়ে এই বিভাগেই। স্বদেশের ও বিদেশের সমসাময়িক সাহিত্যান্দোলনের পরিচয় ঘটিয়ে দিত তো মূলত পত্রিকার পুস্তক-সমালোচনার এই বিস্তৃত বিভাগটিই এই বিভাগের পরিকল্পনায় যেমন ছিল নতুনত্বের স্বাদ, তেমনিই সমালোচকদের চিন্তার বৈচিত্র্যও পাঠকের চৈতন্যে তীব্র সাড়া জাগাত।

সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, অন্নদাশঙ্কর রায় (যিনি লীলাময় রায়—এই ছদ্ম নামেও লিখতেন), চারুচন্দ্র

দত্ত, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জাতীয় আরও বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত রসজ্ঞ ব্যক্তির লেখা প্রবন্ধ দেখা যেত 'পরিচয়'-এর আদিযুগের পৃষ্ঠায়। সে-যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ছিলেন এঁরাই, ঐতিহ্যানুসারী গতানুগতিক রচনাশৈলীর ধারা প্রকাশিত হয়েছে এঁদের মাধ্যমেই 'পরিচয়' পত্রিকায়। বহু জটিল, পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক সাহিত্যিক প্রবন্ধের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ ঘটত মূলত এসব লেখার মধ্য দিয়েই। কিন্তু যাকে বলে আধুনিক ধারার ধার চকচকে রচনা, চিন্তার নতুন বাঁক যাতে ধরা পড়ে মুহুর্মুহু, তা বোধহয় ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারার রচনায় তেমন ফুটে উঠত না। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ নিজেও লিখেছেন বেশ কিছু প্রবন্ধ, 'ঐতিহ্য ও এলিয়ট' কিংবা 'কাব্যের মুক্তি' তো আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল, হিরণকুমার সান্যালের ভাষায় 'বাংলা গদ্যকে মোড় ফেরাবার চেষ্টার নমুনা'। আবু সয়ীদ আয়ুবের লেখাগুলির মধ্যেও নতুন সাহিত্যবীক্ষা, নতুন ঢঙ্ দেখতে পাওয়া যায়। আর গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল কিংবা অপেক্ষাকৃত তরুণ বিষ্ণু দে তো ছিলেনই। আর যে সমালোচকের প্রখর ব্যক্তিত্বের ছাপ সে-যুগের 'পরিচয়' বহন করছে, তিনি ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু এতেও বোধহয় 'পরিচয়'-এর বিশিষ্টতা সম্পূর্ণ ধরা পড়ল না—এ-সবেরই পাশাপাশি অস্ফুট হলেও গড়ে উঠেছিল 'পরিচয়'-এর আরেক ধারা যা বাংলা সাহিত্যে ও সমাজ-সাহিত্য ভাবনায় নতুন এক দিগন্ত তৈরি করে দিয়েছিল পরবর্তীকালে। তা হল মার্কসবাদী চিন্তাধারা। বিশের দশকে 'লাঙল', 'গণবাণী', 'সংহতি', 'ধূমকেতু' ইত্যাদি কিছু কিছু পত্রিকায় প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্ত একটা আলোড়ন দেখা গিয়েছিল। এর পিছনে ছিল মার্কসবাদী দর্শনের খানিক অস্পষ্ট ছাপ আর সদ্য ঘটে-যাওয়া রুশ বিপ্লবের রোমাণ্টিক প্রেরণা। বিশেষত নজরুল ইসলামের এ-সময়কার লেখাতেও টের পাওয়া যায় মার্কসবাদের অস্পষ্ট আভাস—খানিকটা তো মুজাফ্ফর আহমেদের প্রত্যক্ষ প্রেরণার ফলও বটে—কিন্তু তেমন কোনো স্পষ্ট অবয়ব, অন্তত চিন্তার ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে নি তখনও তাঁর বক্তব্যে। নৈরাজ্যবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের অবাঞ্ছিত জড়াজড়িই যেন ধরা পড়ে তাতে। চিন্তার মুক্তি ঘটে নি তখনও, লক্ষণ টের পাওয়া গেছে, এই মাত্র বলা যায়।

'পরিচয়'-এর পুস্তক পরিচয় অংশে এই চিন্তারই ক্রমপরিস্ফুটন যেন ঘটতে শুরু করে। সুধীন্দ্রনাথের সহচর সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে এবং কিছু পরে নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণ-কুমার সান্যালের সমালোচনাগুলি পড়লেই একথা বেশ বোঝা যায়। সুধীন্দ্র-নাথের মতের মিল ছিল না এঁদের এই ভঙ্গির সঙ্গে—সে অর্থে 'পরিচয়' পত্রিকার মতও হয় তো সবটুকু এঁদের মত ছিল না—কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-এর পক্ষে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন তরুণ এই লেখককুলের বৈদগ্ধ্য ও বিচক্ষণতা। আর সেই সঙ্গে এই বিচক্ষণ রচনাগুলি পাঠকদের পরিচিতির দিগন্ত বিস্তৃত করে দিচ্ছিল, চিন্তার মুক্তি ঘটানোর আয়োজন করছিল। আর এই কারণে অর্থাৎ মার্কসবাদী চিন্তাবিদ্দের জন্মাবধি 'পরিচয়'-এর সঙ্গে আশ্লিষ্ট থাকার ইতিহাসে অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত হয় না যে ১৯৪৩-এ 'পরিচয়' হস্তান্তরিত হওয়ার সময় কেন তা মার্কসবাদীদের হাতেই আসে, অন্য হাতে না গিয়ে।

আরেকটি কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। সেটা হল এই যে বাংলা সাহিত্যের পত্র-পত্রিকার জগতে, এক অর্থে, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে সমালো-চনার প্রচেষ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপও এই পত্রিকা। হিরণকুমার সান্যালও বলেছেন সেই কথা, 'বাংলা দেশে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সাহিত্যবিচারের এই চেষ্টা পরিচয়-এর আগে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধকল সইতে হয়েছিল সম্পূর্ণ তাঁদের নিজেদের। 'ভাণ্ডার', 'ভারতী', 'সাধনা' পত্রিকায় যে-সব অল-জলে লেখা ছাপা হতো, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা রবীন্দ্রনাথ আমূল সংশোধন করে দিতেন। এমন-কি, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের শুধু প্রভাব নয়, কলমের আঁচড় প্রায় সর্বাঙ্গে ছড়ানো।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

এই গোষ্ঠীবদ্ধতার স্বরূপ 'পরিচয়'-এর প্রথম দশ বছরে যেমন ছিল, মার্কসবাদী আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে চারিত্রিক বদল ঘট্‌লেও তা আরও জোরদার হয়েছিল। প্রথম পর্বে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যবোধ ও সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে একান্ত নিজস্বতা বজায় রাখলেও 'পরিচয়'-এর অন্য লেখকের বক্তব্যপ্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ান নি। বরং আধুনিকতার আবাহনে মননশীল একদল বুদ্ধিজীবীর স্বাধীন চিন্তার চর্চার ক্ষেত্রই হয়ে উঠেছিল 'পরিচয়'। কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তির প্রভাব বা কোনো এক বিশেষ সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব গোষ্ঠীবদ্ধতার পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে নি। এমন কি, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকর্মও এর প্রতিবন্ধক হয় নি। এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধূর্জটিপ্রসাদের একটি মন্তব্যও ব্যবহার করা যেতে পারে—

'পরিচয়গোষ্ঠীর প্রত্যেকের স্টাণ্ডর্ড ছিল, কিন্তু গোষ্ঠী হিসেবে তার কোনো ইডিয়লজি ছিল না, যদিও প্রত্যেকে আইডিয়ার ব্যবসায়ী ছিল। ঐ সাধারণ স্টাণ্ডার্ড-এর ওপর ভর করেই কাজ চালানো গিয়েছিল। সুধীন্দ্রের স্টাণ্ডার্ডই ছিল সবচেয়ে উঁচু, আমাদের কারুরই স্টাণ্ডার্ড নিচু ছিল না; কিন্তু আমরা জ্ঞানত অজ্ঞানত সুধীন্দ্রের স্টাণ্ডার্ড বজায় রাখতে চেষ্টা করতাম। এক দিনও সে সম্পাদকী কর্তৃত্ব ফলায় নি; আমরাও কোনোদিন আচারে-ব্যবহারে তাকে জানবার অবসর দিইনি যে সেই সম্পাদক। অথচ, বহু রচনার সম্পাদন সে করেছে।...আমি প্রথম চৌধুরীর সম্পাদনা-প্রক্রিয়া কি ছিল জানি; কিন্তু পরিচয়ের সম্পাদনায় সম্পাদকের 'হাত' ছিল সকলের জানা উচিত, কেবল সে হাত কেউ টের পেত না।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

দ্বিতীয় পর্বের 'পরিচয়'-এর গোষ্ঠীবদ্ধতা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের, ইডিয়লজি বা মতাদর্শই সেখানে প্রধান বিবেচ্য হয়েছিল। তবে তা সত্ত্বেও, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধ হলেও আপন আপন রুচি ও মত প্রকাশে 'পরিচয়'-এর লেখক গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য হারাতে চাইতেন না সাধারণ-ভাবে। এ নিয়ে দু-একবার যে গোলযোগের সূচনাও হয় নি এমন নয়। যেমন, সম্পাদক হিরণকুমার সান্যালের অস্বাক্ষরিত একটি রচনা ('নবান্ন' নাটক) নিয়েই প্রবল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল যে, তা 'পরিচয়' গোষ্ঠীর মতামত ছিল কি না। হিরণকুমার সান্যাল লিখেছিলেন, '...'পরিচয়' এর পাঠকগণকে এই কথা জানানো দরকার যে কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'নবান্ন' সম্বন্ধে মন্তব্য বিনা স্বাক্ষরে ছাপা হলেও প্রকৃতপক্ষে 'পরিচয়' কর্তৃপক্ষের সরকারী অভিমত নয়। এই অভিমতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার একলার। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের আরও জানানো দরকার যে সাহিত্য বা সংস্কৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে 'পরিচয়ে'র সম্পাদকদ্বয় যে সব সময়ে একমত হবেন একথা ধরে নেওয়ার কোনো হেতু নাই; অনেক সময়ে হয়ত দুই সম্পাদকের মত এক হবে, কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মত একেবারে ভিন্ন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

'তার কারণ এই যে যদিও মোটামুটি ভাবে 'পরিচয়' পত্রিকা একটি বিশেষ দার্শনিক, দৃষ্টিভঙ্গির দাবি রাখে, সাহিত্য ক্ষেত্রে এই মনোবৃত্তির পরিচায়ক এমন কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো আজ পর্যন্ত রচিত হয় নি যাতে ব্যক্তিগত মতামত পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। অবশ্য এই মতও সম্পূর্ণ আমার স্বকীয়।' (পরিচয়, পৌষ, ১৩৫১)

২

প্রথম পর্বের 'পরিচয়'-এ পুস্তক সমালোচনা বিভাগে বিদেশী গ্রন্থের সমালোচনার প্রাচুর্য থাকলেও সমকালীন বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়নেও 'পরিচয়' পত্রিকার সমালোচকেরা পিছিয়ে ছিলেন না। খুবই তীক্ষ্ণ ছিল সেসব সমালোচনা—কোনো দ্বিধা, সংশয় তাতে আঁচড় কাটতে পারে নি। নীরেন্দ্রনাথ রায় কিংবা জীবনময় রায় যেমন শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন শানিত ভাষায় আধুনিকতার নব্য ধারার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র জাতীয় কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের কাব্য-উপন্যাসের ভাবগম্ভীর আলোচনার পথও প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন গিরিজাপতি ভাট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, সুধীরকুমার চৌধুরীর মতো আরও কেউ কেউ। এসব সমালোচনা বিতর্কও যে উস্কে দিত না তা নয়, তবে তা জমে উঠত ভিন্ন ভিন্ন বিদগ্ধ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আড্ডায়, 'পরিচয়'-এর পাতায় তা কখনও ধরা পড়ে নি।

সম্ভবত 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম সাহিত্য-বিতর্ক ছন্দ প্রসঙ্গে। বিতর্ক ব্যাপারটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় জমানো খানিকটা মুশকিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তর্ক জমে উঠেছিল পত্রিকার জন্মের সূচনাতেই। 'পরিচয়'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত শেলির 'ওয়ান ওয়ার্ড ইন টু অফেন প্রোফেন্‌ড' কবিতাটির দুটি অনুবাদ ছাপা হয়েছিল। একটি রবীন্দ্রনাথের, অপরটি নীরেন্দ্রনাথ রায়ের। ওই অনুবাদটিকে ঘিরেই বিতর্কটি শুরু। রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদটির কোনো একটি শব্দের ছন্দ বিষয়ে আপত্তি তুললেন দিলীপকুমার রায় 'উত্তরা' কাগজে। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধটি 'পরিচয়'-এ (মাঘ, ১৩৩৮)। তার উত্তরে দিলীপকুমার রায় 'পাঠকগোষ্ঠী' বিভাগে (বৈশাখ ১৩৩৯) তাঁর মত ব্যক্ত করলেন কবির বক্তব্যের বিরুদ্ধে। আর সে প্রবন্ধে আহ্বান জানালেন সমসাময়িক কবি মোহিতলাল, বুদ্ধদেব, যতীন্দ্র-মোহন বাগচী, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও কালিদাস রায়কে 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি' গানটির ছন্দ বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য। 'পরিচয়' সম্পাদক অবশ্য দিলীপকুমারের সে প্রস্তাবে স্বাগত জানালেন না আর কোনো কবিকে। পরের সংখ্যায় শুধু বেরুল 'ছন্দ বিতর্ক' নামে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি প্রবন্ধ। এবং তারপরের সংখ্যাতে (কার্তিক, ১৩৩৯) কবি লিখলেন 'নবছন্দ' নামে তৃতীয় প্রবন্ধ। শেষোক্ত প্রবন্ধে ব্যক্ত বক্তব্যের বিরুদ্ধে নতুন আরেক তর্ক জুড়লেন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'নয় মাত্রার ছন্দ'

(কার্তিক, ১৩৪০) প্রবন্ধে। ১৩৩৯-এর মাঘ সংখ্যাতে অবশ্য গদ্যছন্দ নিয়ে তাঁর আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়'-এ। আর ১৩৩৯-এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রবোধচন্দ্র সেনের 'বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ' প্রবন্ধটিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। দিলীপকুমার রায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের এই বিতর্কের বিস্তৃত বিবরণ হিরণকুমার সান্যালের গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তাই বিষয় বিশ্লেষণের বোধহয় আর কোনো প্রয়োজন নেই।

এর তিন বছর পর কবিতার ছন্দ ও গদ্য কবিতা বিষয়ে ১৯৪৩-এর কার্তিকের 'পরিচয়'-এ হিরণকুমার সান্যাল খানিকটা উগ্রভাবেই লিখেছিলেন যে, আধুনিকদের গদ্য কবিতার বিস্তার কচুরিপানার বংশবৃদ্ধির মতোই এবং একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কলমে গদ্য কবিতা সাহিত্যিক উৎপাত হয়ে ওঠে নি। লিখেছিলেন এসব কথা রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' ও 'পত্রপুট' কাব্য গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে। বুদ্ধদেব বসু এর জবাব দিলেন আরও উগ্রভাবে তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়। 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর' গ্রন্থে হিরণবাবু লিখেছেন এই প্রসঙ্গে, 'আমার ঐ মন্তব্য পড়ে অগ্নিশর্মা হয়ে বুদ্ধদেববাবু 'কবিতা' কাগজে যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে উল্লেখ ছিল 'হিজ মাস্টারস্ ভয়েস্'-এর। শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে আমার নামের সঙ্গে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাভলভ-এর নাম জড়িয়ে আমাকে তিনি গৌরবান্বিত করেছিলন, কেন-না পাভলভ গবেষণা করেছিলেন কুকুর নিয়ে।'

'বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা' নামে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল 'পরিচয়'-এর ১৩৩৯-এর কার্তিক সংখ্যায়। লেখক ছিলেন হুমায়ুন কবির। তাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অবাস্তবতাবোধ প্রতিপন্ন করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে সাতশ বছর ধরে হিন্দু মুসলমান পারস্পরিক সহাবস্থান করছে, সামাজিক জীবনযাপনে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে রয়েছে অথচ বাংলা সাহিত্যে এর কোনো প্রভাব চোখে পড়ে না। হুমায়ুন কবির যে ভাষায় এ কথাগুলি ব্যক্ত করেছিলেন তার খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক—'দুঃখে-সুখে, শান্তি অশান্তিতে, কলহকোন্দলে, বন্ধুত্বমিলনে তাদের সম্বন্ধ কি কখনো রাঙিয়ে ওঠে নাই? বন্ধুত্ব-শত্রুতা জাতিধর্ম মেনে চলে না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কাউকে আমরা ভালবাসি, কাউকে হিংসা করি, কাউকে ঘৃণা করি। কারু সঙ্গে শৈশবের পরিচয় যৌবনের বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। কারু সঙ্গে জাতিধর্ম ভেদের পার্থক্যের সঙ্গে বিভিন্ন-স্বার্থ মিলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কিন্তু সন্ধির পথেই হোক আর দ্বন্দ্বের পথেই হোক, জীবনে কেবলমাত্র হিন্দু বা কেবল-

মাত্র মুসলমানের ছায়া পড়েছে এমন লোক বাংলাদেশে নাই।...কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কোথাও কি ছায়াটুকু পড়েছে?...বাংলা সাহিত্য বাংলার জাতীয় জীবনের এ বৈচিত্র্যকে রূপ দিতে পারে নাই, তাই জীবনের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যে বাংলা সাহিত্য আজও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নাই।' আপাতদৃষ্টিতে, খানিকটা সঙ্গত ছিল হয়তো কবিরের এই ক্ষোভ। কিন্তু যে ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক কারণে বাংলাসাহিত্যে এই 'বাস্তবতার অভাব' দেখা দিয়েছিল কবিরসাহেব তা বোঝার চেষ্টা করেন নি, দোষ চাপিয়েছেন হিন্দু সাহিত্যিকের ঘাড়ে। বিতর্ক তুলবার পক্ষে প্রশস্ত ছিল এই রচনা, কিন্তু তা হয়নি তখন। বহুকাল পর হিরণকুমার সান্যাল তাঁর গ্রন্থে যুৎসই জবাব দিয়েছিলেন, 'কবির লিখেছেন, বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে একই আবহাওয়া, একই-খাল-বিল-নদীর পরিবেশে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সমাজ কবে এক হয়েছে? সমাজের যে-স্তর থেকে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব সেই স্তরে, হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক যোগাযোগ কোনদিনই হয়নি। এর জন্যে সমাজ ও ধর্মের অন্ধ সংস্কার অনেকটা দায়ী। এই গোঁড়ামি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, একে ঘা দেওয়া সাহিত্যিকের অবশ্যকর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তা করেছেন—শুধু হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে নয়, সাধারণভাবে। ...হিন্দু-মুসলমানের মিলন পুরোপুরি কোনদিন হয়নি। শুধু ধার্মিক ও সামাজিক গোঁড়ামির জন্যে নয়—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে। এই রাজনীতির প্রবর্তক ব্রিটিশ-রাজ। তারই প্রত্যক্ষ ফল আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, পরোক্ষ ফল আমাদের সমাজ ও সাহিত্য। হিন্দু-জমিদার সরকারের গোলাম, গোলামের গোলাম মুসলমান ও হিন্দু প্রজা। বাংলাসাহিত্য গড়ে উঠেছে প্রধানত মধ্যবিত্ত লেখকদের হাতে। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর সুখদুঃখ তাঁদের রচনায় আর কতটা ফুটতে পারে?

মূল সমস্যা সাম্প্রদায়িক নয়, শ্রেণীগত বিরোধ। কবির এ-বিষয়ে মোটেই সচেতন নন।'

হুমায়ুন কবিরের প্রবন্ধ নিয়ে কোনো উত্তপ্ত বিতর্ক না হলেও চৈত্র, ১৩৪৫ এর 'পরিচয়'-এ আশানন্দ নাগের 'অহিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজ' প্রবন্ধ কিছু উত্তাপ সঞ্চার করল। 'পরিচয়' তখন ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত। আশানন্দ নাগ লিখেছিলেন, 'সাধারণ-হিন্দু হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দুকৃষ্টিকে ভালবাসেন কিন্তু ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শেখেননি...জাতীয়তা-বাদ যতখানি পবন্ত হিন্দুয়ানির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে, ততটা পর্যন্তই

সাধারণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থন করেন। তার বেশি এগুতে সাহস করেন না।' হিন্দু জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা দেখাতে চেয়েছিলেন আশানন্দ নাগ, এবং নিশ্চয়ই তা অমূলক ছিল না। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র বাগচী বিনা খোঁচায় ছেড়ে দিলেন না এই প্রবন্ধের বক্তব্য। ১৩৪৬-এর জ্যৈষ্ঠে লিখলেন 'হিন্দুর দৃষ্টিতে অহিন্দু সমাজ'। আর যেহেতু আশানন্দ ছিলেন ধর্মে খ্রীস্টান, তাই বোধহয় লিখলেন চীন-জাপানে বৌদ্ধ ও খ্রীস্টধর্মের সংঘাতের বৃত্তান্ত। আশানন্দ উত্তর দিলেন পরের সংখ্যাতেই 'সুদূর প্রাচ্যে খ্রীস্টধর্ম' নামক যুক্তিঠাসা প্রবন্ধে। ইতিহাস সচেতন মন নিয়ে স্বীকার করলেন 'ইউরোপের রাজনৈতিক প্রতাপ ঈশার ধর্মের পরিপন্থী। এজন্যই খৃষ্ট বিভীষিকা ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে উৎকৃষ্ট আকারে দেখা দিয়েছে'।

ইতিমধ্যে 'পরিচয়'-এর গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে এবং অন্যান্য কিছু কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধে সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, বিষ্ণু দে প্রমুখের রচনায় প্রধান হয়ে উঠছিল মার্কসবাদের প্রভাব। আগেই উল্লেখ করেছি যে এই পর্বে 'পরিচয়'-এর উদ্দিষ্ট যদিও ছিল না তা, কিন্তু বিদগ্ধজনের মতামতকে সুধীন্দ্রনাথ ঠেলে সরিয়েও রাখেননি কখনও। ফলে 'পরিচয়'-এর পাঠকেরা নতুন এক জগতের সন্ধান পাচ্ছিলেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর রূপে। আর ছিল ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঝকঝকে রচনা। হিরণবাবু লিখেছেন, 'পরিচয়'-এর পাতায় 'লাল রঙ প্রথম ফুটিয়েছিলেন ধূর্জটিবাবু তা ভুললে অন্যায় হবে'। 'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যাতেই এর কিঞ্চিৎ প্রমাণ মেলে। ডিউই, বার্বুসের গ্রন্থ আর রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র সমালোচনাতেই ধূর্জটিপ্রসাদ সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। যদিও একথা সকলেরই জানা যে ধূর্জটিপ্রসাদ সম্পূর্ণ মার্কসপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না। মার্ক্সোলজিস্ট হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। তবে মার্কসপন্থায় পুরো আস্থা না থাকলেও সমাজতন্ত্রে তাঁর নিষ্ঠা অবিসংবাদিত। 'পরিচয়'-এ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাঁর বহু চিন্তা এই কথার সাক্ষ্যই বহন করছে। তাঁর বিশ্বাস ও রুচির ঈষৎ পরিচয় বোধহয় দেওয়া যাবে ১৩৪৫-এর কার্তিকে একটি গ্রন্থসমালোচনার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করলে। গ্রন্থটি ছিল পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিক সোরোকিনের 'Social and Cultural Dynamics'। ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছিলেন, 'তাঁর (সোরোকিনের) পদ্ধতি বিচার করতে

গেলে হেগেল, কার্ল মার্কস প্রভৃতি ইতিহাসের দার্শনিকবৃন্দের কথা ওঠে। ঐতিহাসিক নিয়ম আবিষ্কারে হেগেল যেসব দোষ করেছিলেন তার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবহেলাটাই বোধহয় সর্বপ্রধান। কার্ল মার্কস তাই হেগেলের অবাস্তবিকতা দূর করতে তৎপর হন। তিনি তাঁর সময়কার অবস্থান বুঝে একটা ব্যাখ্যা বার করলেন যেটা সর্বব্যাপী না হলেও বর্তমান যুগের পক্ষে যথার্থ। কিন্তু যাঁদের কার্ল মার্কসের রচনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে তাঁরাই বলবেন যে তাঁর বিশ্লেষণ অদ্ভুত রকমের সূক্ষ্ম হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক গবেষণার অপূর্ণতার জন্য ও তখনও সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব হয় নি বলে সেটি বিচিত্র ঘটনার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান সমাজশক্তির জের এখনও মেটেনি, তাই মার্কসের ঐতিহাসিক নিয়ম এখনও খাটছে, এবং খুব সম্ভব এখনও খাটবে; কিন্তু তাই বলে তাঁর আবিষ্কৃত নিয়মের সাহায্যে পৃথিবীর আদিম, মধ্যযুগীয় এবং যাবতীয় সমাজ-সংস্থান ও বিবর্তনের ব্যাখ্যা করা সেন্ট পিটারের চাবি দিয়ে স্বর্গের দ্বার খোলার মতন গোঁড়ামি মাত্র। অর্থাৎ মার্কসীয় ব্যাখ্যার সাহায্যে এই যুগের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভবপর হলেও সর্বপ্রকার ও সর্বকালীন সামাজিক নক্সার ধীর বিবর্তনের প্রকৃত ব্যাখ্যা তাতে পাওয়া যায় না।'

ধূর্জটিপ্রসাদের এই বক্তব্য নিশ্চয়ই 'পরিচয়'-এর অন্যান্য প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর পছন্দসই ছিল না। নীরেন্দ্রনাথ, সুশোভন সরকার কিংবা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জাতীয় অন্যান্যরা বিশ্ববীক্ষা হিসেবেই মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের সর্ববিধ প্রশ্নের মোকাবিলা করতে মার্কসবাদকেই স্থির দর্শন হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।

৩

বলতে কোন দ্বিধা নেই যে সাহিত্য সমালোচনায়, দর্শনচর্চায়, রাজনীতিক আলোচনায় এবং সৃষ্টিশীল শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পরিচয়'-এর দ্বিতীয় পর্ব নতুন যুগের সূচনা করেছিল। চিন্তার মুক্তি ঘটিয়ে দেওয়ার আয়োজন করেছিল। শুধুমাত্র ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই এ-পর্বে 'পরিচয়'-এর নতুন চেহারা তা নয়। সংকীর্ণ রাজনীতিকে চাপিয়ে, আরও বৃহত্তর অর্থে, নতুন সমাজ-সাহিত্যবোধ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারেই 'পরিচয়' বিশেষ স্থান করে নিতে পেরেছে বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে। মুদ্রণ প্রমাদহীন, ঝকঝকে ছাপা, সুবিন্যস্ত চেহারা নিয়ে হয়তো এ-পর্যায়ের 'পরিচয়'

সব সময়ে আত্মপ্রকাশ করত না, কিন্তু বিষয়গুণে, সমৃদ্ধ চেতনার জোরে, প্রগতিশীলতার প্রকৃষ্ট বাহন হিসেবে 'পরিচয়' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত রুচিবান পাঠককে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। এই কারণেই দ্বিতীয় পর্বের 'পরিচয়' গোষ্ঠীবদ্ধ 'পরিচয়'। প্রগতিবাদীদের মুখপত্র 'পরিচয়' মানে নিচু, বহরে খাটো ভাববার যুক্তিসঙ্গত কারণ বোধহয় কিছু নেই। উৎকর্ষ বিচার করতে গিয়ে এসব কথা বলার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে প্রগতিশীল মার্কসবাদী সাময়িকপত্র হিসেবে 'পরিচয়'ই সে-যুগের একমাত্র ও প্রথম সাহিত্যপত্র। দ্বিতীয় পর্বের 'পরিচয়' আত্মপ্রকাশ করার বহু আগেই অগ্রণী, অরণি কিংবা ঢাকা থেকে প্রতিরোধ, ক্রান্তি প্রভৃতি মার্কসবাদী পত্রিকাগুলি প্রগতিবাদীদের চিন্তা প্রকাশের অন্যতম বাহন ছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকেরা সাম্যবাদী বলে সব বিষয়েই যে ঐক্যমত পোষণ করতেন তা নয়। স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন সুর, ভিন্ন রুচির প্রকাশ ঘটত। নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি, সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ সবক্ষেত্রেই বিতর্ক ছিল প্রগতিশীলতার প্রাণ, কিন্তু সেই বিতর্কের চেহারা যে আবার সবসময়েই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর রূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছে তাও বলা যায় না। মতান্তর মনান্তরও ঘটাত মাঝেমধ্যে। কট্টরপন্থী, চরমপন্থী, মধ্যপন্থী নানা অবস্থানও তৈরি হয়ে যেত বিভিন্ন সময়ে কোনো বিশেষ বিতর্ককে কেন্দ্র করে, আর 'পরিচয়' পত্রিকাতেও তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটত।

১৯৪০ সালে বিনয় ঘোষের 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে প্রবল বিতর্কের ঢেউ উঠল মার্কসবাদী ও অমার্কসবাদী উভয় শিবিরেই। এই গ্রন্থে অন্য আরও নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করলেন গ্রন্থকার, মার্কসবাদী বিচারের নামে। ১৯৪১-এ এর বিরুদ্ধে প্রকাশিত হল প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ অমল হোমের 'কেরাণী রবীন্দ্রনাথ' অমার্কসবাদী-দের তরফ থেকে। আর 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হল ঐ সময়েই (১৩৪৮, অগ্রহায়ণ) সুশোভন সরকারের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি'। অমল হোম ও বিনয় ঘোষের বিরুদ্ধ দুই বিপরীত মেরুর চিন্তার কোনটিকেই স্বীকার না করে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে প্রগতিবিরোধী ধারণার অসদ্ভাব' না থাকলেও সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথ অগ্র-গতির বিরুদ্ধ শক্তি ছিলেন না। বলা বাহুল্য, ঐ সময়ে ও পরবর্তীকালে সব সময়েই রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী মহলে এক তীব্র বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছেন।

যাই হোক, 'পরিচয়' হস্তান্তরিত হবার পর ১৩৫১ সালের কার্তিক সংখ্যায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের সূচনা হল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটককে কেন্দ্র করে। 'পরিচয়'-এর 'সংস্কৃতি বিভাগে' 'নবান্ন' প্রসঙ্গে অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধে বলা হল, 'নাটক হিসাবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না' যদিও মঞ্চস্থ নাটকটিতে অভিনয়গুণ অসাধারণ। অগ্রহায়ণ, ১৩৫১-র 'পরিচয়'-এর 'পাঠকগোষ্ঠি'তে প্রকাশিত হল স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের ক্ষুব্ধ মন্তব্য, '...একখানা মোটেই সক্ষম নয় নাটককে আশ্রয় করে এতখানি ভাল অভিনয় হতে পারে বলে সহজ বুদ্ধি মানতে চায় না। অবশ্য মানতে পারি, যদি সমস্ত ব্যাপারটাকে আগাগোড়া একটা ভোজবাজি বলে বিশ্বাস করা যায়। অনেকটা সক্ষম, কিছু-সক্ষম, আধা-সক্ষম, সিকি-সক্ষম—এমন একটা বিশেষণও কি 'নবান্ন'-র প্রাপ্য নয়? 'মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না' কি সম্পাদকের অনবধানতা প্রসূত মন্তব্য?' অস্বাক্ষরিত যে-সমালোচনাকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের সূচনা তা ছিল স্বয়ং সম্পাদক হিরণকুমার সান্যালের লেখা। পৌষ সংখ্যায় সম্পাদক বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে লিখলেন কেন তিনি 'নবান্ন'কে দুর্বল রচনা বলে মনে করেন, তবে ভুল বোঝার অবকাশ না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একথাও লিখলেন, 'সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ঘটনা-সমাবেশে, বিজনবাবুর কলম ও কল্পনা এতদূর এগিয়েছে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ও বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন হাওয়া এনেছেন এই কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে।' বস্তুত, মঞ্চসফল নাটক মাত্রেই যে নাটক হিসেবে উৎকৃষ্ট হয় না, একথাই বলতে চেয়েছিলেন হিরণকুমার সান্যাল। এবং 'নবান্ন' ঐতিহাসিক দিক থেকে বাংলা নাট্যান্দোলনে একটি চূড়ান্ত সফল প্রযোজনা হলেও, নাটক হিসেবে যে তার বহু বিচ্যুতি ছিল নির্মোহ দৃষ্টিতে সে কথা বলা বোধ হয় অন্যায়ও ছিল না।

ঐ একই সংখ্যায় কালিদাস রায় এবং চৈত্র সংখ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'নবান্ন' সম্পর্কে তাঁদের মুগ্ধতার কথা লিখেছিলেন। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যও প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছিলেন ১৩৫২-র বৈশাখ সংখ্যায়। আর চৈত্র সংখ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতের মর্মবাণী' সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করে ওই প্রবন্ধের শেষেই 'নবান্ন' সম্পর্কে উল্লেখ করে গণনাট্য সংঘের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা লিখলেন, 'পাঠক সাধারণকে একটু বেশিরকম ভোঁতা ও একগুঁয়ে মনে করার প্রতিক্রিয়ায় অনেক লেখকের রচনাতেই কতগুলি অনাবশ্যক সতর্কতা হয়ে দেখা দেয় নানা ভাবে, সমস্ত রচনাটিকে

প্রভাবান্বিত করে। লেখকের ভীরুতাই এজন্য দায়ী। সঙ্ঘের অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যে রকম উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে আমরাই, লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতগুলি সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তাঁরা আমাদের সব রকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।'

'নবান্ন' প্রসঙ্গে এই বিতর্কের আগে ১৩৫১-এর শ্রাবণ সংখ্যায় গোপাল হালদার একটি মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন 'ঔপনিবেশিক সমাজ ও উপন্যাসের যুগ'।

১৩৫২-র শ্রাবণে হিরণকুমার সান্যাল বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা সম্পর্কে যে মন্তব্য করলেন 'পরিচয়'-এর 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ' বিভাগে তা নতুন আরেক তর্কের সূচনা করল। সমালোচক লিখলেন, '…'কবিতা' সুপ্রতিষ্ঠিত কাগজ হলেও উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা কিনা তাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে, এর দায়িত্ব সম্পাদকের নয়; কেননা 'কবিতা'র খোরাক যাঁরা যোগান, উচ্চশ্রেণীর কবিতা তাঁরা যদি কদাচিৎ রচনা করেন বুদ্ধদেব বসুকে তার জন্যে দোষী করা সঙ্গত হবে না।…'

'এই প্রসঙ্গে এই কথাও স্মরণীয় যে বুদ্ধদেববাবু স্বয়ং এই সাম্প্রতিক কবিদের অন্যতম ও একদা তিনি প্রাণপণ প্রয়াস করেছিলেন সাম্প্রতিক সাহিত্যে বিশেষ একটি ধারা প্রবর্তন করতে। এই প্রয়াসের অত্যন্ত প্রকট ও সমারোহসহকারে ব্যক্ত উদ্দেশ্য ছিল রোমান্টিক রবীন্দ্রযুগ থেকে রিয়্যালিস্ট রবীন্দ্রোত্তর যুগে উত্তীর্ণ হওয়া। দুঃখের বিষয়, অভীপ্সিত রিয়্যালিজম-এর সন্ধানে তখনকার 'অতি আধুনিক' নামে পরিচিত লেখক সম্প্রদায় সাহিত্যের রাজপথ ছেড়ে অলিতে গলিতে কিশোরসুলভ যৌন বোধের উগ্র প্রেরণায় এমনই দিশেহারা হয়ে পড়লেন যে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রকাশ্যে তাঁদের তীব্র তিরস্কার না করে পারেন নি।'

শুধু 'কবিতা' প্রসঙ্গে নয়, হিরণকুমার সান্যাল কবি-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচর্চা বিষয়েও তীক্ষ্ণ কয়েকটি মন্তব্য ছুঁড়লেন, 'সাহিত্যের অলিগলিতে অনির্দিষ্ট ভাগ্যান্বেষণের রোমাঞ্চকর চেষ্টা তিনি বহুদিন ছেড়ে দিয়েছেন— বাইরের চাপে না, সম্পূর্ণ নিজের তাগিদে। এই তাগিদেই তিনি আশ্রয়

নিয়েছেন সাহিত্যের রাজপথে বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায়, অর্থাৎ যে রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে একদিন তিনি স্ব-সমুখ শক্তিতে উদ্যত হয়েছিলেন সাহিত্যজগতে নব নবতর রাজ্যখণ্ড জয় করতে, সেই রবীন্দ্রনাথেরই কাব্যের আওতায়। এই নিরাপদ আশ্রয়ে তিনি আজ প্রায় স্থাণু হয়ে বসেছেন।

'ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বুদ্ধদেববাবু সযত্নে এই হাওয়া থেকে গা-বাঁচিয়ে প্রচার করেছেন শিল্পসৃষ্টির অনাদি ও অকৃত্রিম চিরন্তনতা। কিন্তু তবু এই হাওয়ায় যারা আলোড়িত হয়ে নতুন ছাঁদের রচনায় উৎসাহিত হয়েছে তাদের তিনি অবহেলা করেন নি, বরঞ্চ উৎসাহই দিয়েছেন, এমন কি মাঝে মাঝে তাদের আঙ্গিক পর্যন্ত কিছু কিছু আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছেন—চিরন্তনী ভাবধারার কাঠামোর মধ্যে যতটা সম্ভব।...বুদ্ধদেববাবু সম্বন্ধে বরঞ্চ এই কথা বলা চলে যে উনি জনৈক অতি সাবধানী ক্রিশ্চান পাদরির মতন পণ করেছেন I will tread the narrow path betwixt vice and virtue. প্রগতিকে উনি খুব উৎসাহের সঙ্গে বরণ করতে পারেন নি, কিন্তু প্রতিক্রিয়াকেও উনি কখনও আমল দেন নি। এই জন্য বুদ্ধদেববাবুর কাছে আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতার এমন কি শক্তি আছে যে বুদ্ধদেব বাবুকে বাংলা সাহিত্যে সম্মানের আসন দিতে পারে? ইতিহাসকে যারা উপেক্ষা করে ইতিহাস তাদের মনে রাখে না।'

দীর্ঘ এই উদ্ধৃতির প্রয়োজন সমালোচকের তির্যক তীক্ষ্ণ মন্তব্যের পরিমাণ বোঝানোর জন্যেই। স্বভাবতই হিরণবাবুর এই সমালোচনা তুমুল ঝড় তুলল! ১৩৫২-এর পৌষ সংখ্যায় অরুণকুমার সরকার বুদ্ধদেবের পক্ষ নিয়ে লিখলেন, রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুকরণীয় হিরণকুমার সান্যালের কাছে আর কিছুই নেই! 'এ কথা বলার অর্থ কি এই নয় যে, রবীন্দ্রসাহিত্য মৃত ও প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে?'

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যকৃতির স্বকীয়তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পত্রপ্রেরক লিখলেন, 'বুদ্ধদেব বসুর রচিত রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত কবিতার সংখ্যা অজস্র এবং সেগুলি স্বকীয় সার্থকতায় সমুজ্জ্বল। 'কঙ্কাবতী' ও 'দময়ন্তী'র কবি আপন বৈশিষ্ট্যের জোরেই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, হিরণবাবুর 'কৃতজ্ঞতার' অপেক্ষা না রেখেই।...বুদ্ধদেবের দু'একটি সাম্প্রতিক কবিতায় যদি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এসে পড়ে, তা হলে বুঝতে হবে যে তিনি সজ্ঞানেই রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। এই করাটা যে মোটেই দোষনীয় নয়, বরং

রবীন্দ্র প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—সাহিত্যরসিক মাত্রেই তা স্বীকার করবেন।

'বুদ্ধদেব বসু যে ইতিহাসকে উপেক্ষা করেন না, 'পশ্চিম' কবিতাটিই (হিরণবাবু তাঁর আলোচনায় এই কবিতাটিকেই আক্রমণ করেছিলেন দৃষ্টান্ত হিসেবে) তার জলজ্যান্ত প্রমাণ নয় কী?...রাজনৈতিক মতবাদের দাঁড়ি পাল্লায় কাব্যকে যাচাই করতে যাওয়া সব সময় সম্ভব নয়। যারা রাজনৈতিক কবিতা লিখে থাকেন, সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করেন, দলবিশেষের হয়ে দালালি করেন—একমাত্র তাঁদের কবিতাকেই রাজনীতির কষ্টিপাথরে যাচাই করা যায়। আমি অন্তত এমন কয়েকজন শিক্ষিত কাব্যামোদী ভদ্রলোককে জানি যাঁরা 'পশ্চিম' কবিতাটিতে যথার্থ রসের সন্ধান পেয়েছেন।...বুদ্ধদেব ইতিহাসকে উপেক্ষা করেন নি বলেই তাঁর পাঠশালায় আজকালকার অনেক মুখর প্রগতিবাদী কবির হাতেখড়ি হয়েছে।'

কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্ব বাদ দিয়ে একটু বেশি রকমের উগ্র এই বিতর্কে আরও কিছু চিঠিপত্র প্রকাশিত হল ১৩৫২-এর মাঘ সংখ্যায়। লিখেছিলেন হিরণকুমার সান্যালের বক্তব্য সমর্থন করে সাহিত্যভবনের পক্ষে পরিমল বসু এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রভাতকুমার দত্ত, অজিতকুমার রাহা ও চিদানন্দ দাশগুপ্ত। আর লিখেছিলেন অমল চট্টোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে দু-একটি মূল্যবান কথা, '...কবিত্বের বিচারে শেষ কথা হচ্ছে রুচি' আর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ছিল—'রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত অথবা যুক্ত বলতে সুস্পষ্ট কিছুই বোঝায় না। রবীন্দ্রনাথ একটা যুগ। একটা যুগকে, বিশেষ করে ঠিক আগের যুগকে বর্জন করা কোনো লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সকল লেখকের ব্যাকগ্রাউণ্ড।'

১৩৫২ সালের পৌষ সংখ্যায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "কাব্যদৃষ্টি ও সমর সেনের 'তিন পুরুষ'"সেই সময়কার 'পরিচয়'-এর কাব্য সমালোচনার আরেকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ। মঙ্গলাচরণ লিখেছিলেন, "রাজনীতির 'ভাবলোকের' বিশুদ্ধ 'প্রেরণা' কাব্যচেষ্টারও প্রেরণার ভিত্তিতে যদি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাস্তব ক্ষেত্রটি না থাকে বা ক্রমশ না গড়ে ওঠে, তবে একদিন সেই ছিন্নমূল প্রেরণা তার আকাশবাসরের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে গিয়েই অকালে প্রাণ হারাবে। এ-প্রসঙ্গে সমর সেনের ব্যক্তিগত সাহিত্যিক ইতিহাসও বিশেষভাবে স্মরণীয়। সমরবাবু একজন শক্তিমান আধুনিক কবি এবং তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, ১৯৪০ এ প্রকাশিত 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা'র রচনাকাল থেকে 'রাজনীতি'র

(মার্কসীয় রাজনীতির) ও 'ভাবলোকের' (মূল দার্শনিক মতবাদের এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বহুমুখী ব্যাখ্যার) 'প্রেরণায়' আস্থাও তাঁর অকৃত্রিম, অথচ ১৯৪৪-এ প্রকাশিত তাঁর আধুনিকতম কবিতার বই 'তিন পুরুষ' পড়তে গিয়ে এই কথাটাই বারবার মনে হলো যে 'রাজনীতির' 'ভাবলোকের' বিশুদ্ধ 'প্রেরণা', গত চার-পাঁচ বছরে কবির ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমষ্টি চেতনার সমীকরণের কাছে তাঁকে একতিলও অগ্রসর হতে সাহায্য করে নি !' সমষ্টি-চেতনা ও ব্যক্তিচেতনার একাত্মসাধনের ক্ষেত্রে 'সক্রিয় কর্মলোকে'র কথা এরপরেও বহুবার শোনা গেছে কাব্যবিচারের প্রশ্নে। শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই বা কেন সাহিত্যকর্মের যে-কোন শাখার ক্ষেত্রেই এ-প্রশ্ন বারবার উঠেছে মার্কসবাদী আন্দোলনে। কিন্তু এই সমীকরণের স্বরূপ নির্ধারণে কোনো স্বীকৃত মানদণ্ড এখনও কি গড়ে উঠেছে ? ফলে বিতর্ক অনিবার্য, আর সেই বিরোধের ইতিহাসে যান্ত্রিক সরল দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়েছেন অনেকেই, আর এ-যুগে যে তা বিরল, তাও তো বলা যায় না। তবে সময় বিচারে, যুগ-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধ যে গুরুত্বপূর্ণ তা বলা বাহুল্যমাত্র।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়'-এ সুপণ্ডিত ভাষাতাত্ত্বিক বটকৃষ্ণ ঘোষ বহু দুরূহ বিষয়ে মনোগ্রাহী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 'পরিচয়' যখন মার্কসবাদীদের মুখপত্র, তখন হিরণকুমারের ভাষায়, 'তাঁর নাম নতুন করে দেখা দিল পরিচয়ের পাতায়—লেখক হিসাবে নয়, বিষয় হিসাবে'। মার্কসবাদের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ নিয়ে বটকৃষ্ণ ঘোষ চতুরঙ্গ (১৩৫১, পৌষ) শনিবারের চিঠি-তে (শ্রাবণ ও কার্তিক, ১৩৫২-এর দুই সংখ্যায়) যথাক্রমে 'মার্কসীয় জড়বাদ ও সমাজতন্ত্র', 'অভিব্যক্তি, প্রগতি ও বিপ্লব' ও 'সাম্য ও স্বাধীনতা' নামে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মার্কসপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মার্কস-বাদের এই কদর্থের সমুচিত জবাব দিলেন 'পরিচয়' পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৫২) সরোজ আচার্যের বিখ্যাত 'মার্কসবাদ ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধের মাধ্যমে। সরোজ আচার্যের এই প্রবন্ধ সে-যুগের মার্কসীয় বিতর্কের ভাণ্ডারে একটি অসাধারণ সংযোজন। এই রচনার তীক্ষ্ণ সুরটির সামান্য পরিচয় পাওয়া যেতে পারে উদ্ধৃত এই অংশে—'মার্কসবাদ মরিয়াছে। কিন্তু 'সমাজতন্ত্র' সকলেরই ঘাড়ে চাপিতেছে। উহা কেহই ছাড়িতে চাহেন না। স্বয়ং হিটলারও ছাড়িতে চাহেন নাই—তিনিও তাঁহার দলটির নাম রাখিয়াছিলেন, 'জাতীয় সমাজতন্ত্রী' আমাদের জাতীয়তাবাদী মহলেও এই বিজাতীয় জিনিসটির খুবই আদর কিন্তু

জিনিসটাকে আরও একটু 'ভদ্র' না করিলে চলে না। তাই কেহ 'হিন্দু সোস্যালিজম্', কেহ 'ইসলামিক সোস্যালিজম্,' কেহ বা 'গান্ধী সোস্যালিজম্' চান—শুধু 'হিন্দুত্ব', শুধু 'ইস্‌লাম্', শুধু 'গান্ধীবাদ' বলিলে যেন আর মাল কাটে না। 'সোস্যালিজম্'-এর মতই এদেশে ইতিমধ্যে আরও দুই-একটি জিনিসের বেশ বাজারসিদ্ধ নামডাক হইয়াছে—একটি 'বিপ্লব' আর একটি 'প্রগতি'। রাজনীতিক কর্মীরা প্রথমটি লইয়া মাতেন, তাঁদের সভাপণ্ডিতেরা দ্বিতীয়টিকে ছাড়িতে চাহেন না। তাই পণ্ডিত মহাশয়েরা 'প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রে'র একটা জ্ঞানকাণ্ড আবিষ্কার করিতেছেন। এই আবিষ্কারের 'ঘোষণা' পাওয়া যাইতেছে, অক্লান্ত গবেষক ডাক্তার বটকৃষ্ণ ঘোষের মারফৎ।...'

১৩৫২-র ফাল্গুনের 'পরিচয়'-এ নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখলেন 'সাম্প্রতিক বিচারে সেকসপীয়র' প্রবন্ধটি থিয়োডোর স্পেস্পারের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধতা করে নীরেন্দ্রনাথ কডওয়েলের দৃষ্টি অনুসরণ করেছিলেন এই প্রবন্ধে। শ্রেণী-দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কাব্যবিচারের আরেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল ১৩৫৩-এর শারদীয় সংখ্যায়। মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' ও রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'উর্ব্বশী' কবিতার ব্যাখ্যা করে তিনি লিখলেন 'কবিতায় বক্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধ। আর সমসাময়িক উপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'-র সমালোচনায় (ভাদ্র, ১৩৫৩) নীরেন্দ্রনাথ লিখলেন, 'দুটি বিরোধী মতবাদকে সমদৃষ্টিতে দেখাইবার উদারতা গ্রন্থকারের না থাকায় উপন্যাসটির উৎকর্ষ শেষ পর্যন্ত বহুল পরিমাণে ম্লান হইয়াছে। ট্রাজেডীর ঘন করুণ রস ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়োজন হয় সত্যের সহিত সত্যের সংঘাত, সত্যের সহিত মিথ্যার নহে। গ্রন্থকারের চিত্রনে বিলুর চরিত্র যে পরিমাণে সত্য, নিলুর নহে। সি. এস. পি. ছাড়িয়া সে যে-দলে প্রবেশ করিল তাহার কোন সংজ্ঞা গ্রন্থকার দেন নাই। আভাসে ইঙ্গিতে মনে হয় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, কারণ, একথা আজ সকলেই জানে যে এদেশে ফ্যাসী-বিরোধী পার্টিগুলির মধ্যে ইহাই সবচেয়ে সক্রিয় ও প্রভাবশীল। নিজের নিরপেক্ষতার দাবী বজায় রাখার জন্য গ্রন্থকার সুচতুরভাবে গ্রন্থের মধ্যে অন্যত্র কমিউনিস্টদের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নিলুর বেলায় চাপিয়া গিয়াছেন। দাদার বিরুদ্ধে নিলু যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, গ্রন্থকার ইহাও বলিয়াছেন, তাহা স্থানীয় পার্টি নেতাদের মনঃপূত ছিল না। কিন্তু এইরূপ একটি গুরুতর বিষয়ে নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করা কোনো কমিউনিস্ট সভ্যের পক্ষে সম্ভব কিনা, কমিউনিস্ট পার্টিতে

কি ভাবে সমবেত আলোচনায় ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয়, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার নীরব থাকিয়া নিলুর প্রতি ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি গুরুতর অবিচার করিয়াছেন।

'...গ্রন্থকারের মতে বিলু মার্কসবাদ এত ভালো করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিল যে সে ক্লাস করিয়া অন্যদের পড়াইত। গ্রন্থকারের কি জানা নাই যে প্রকৃত মার্কসবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতা পরস্পরবিরোধী, তাদের একত্র অবস্থান অসম্ভব। বিলুর মত স্থিতধী ব্যক্তি মার্কসবাদ পরিপূর্ণ আয়ত্ত করার পরও এমন আত্মকেন্দ্রিক রহিল কি করিয়া? নিলুর আচরণের প্রতি তাহার যে অনুকম্পা, সে ত আনুষ্ঠানিক গান্ধীবাদের খানিকটা সচেতন খানিকটা অচেতন বাহ্য বিনয়ের নামান্তর। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট হওয়ায় এই ধরনের ত্রুটি সম্ভব হইয়াছে।'

এই আপত্তি সত্ত্বেও নীরেন্দ্রনাথ কিন্তু 'জাগরী'র গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে বাংলা সাহিত্যে যে সতীনাথ ভাদুড়ীর এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক সে কথাও স্পষ্ট করেই বলেছিলেন। 'শিল্পকুশলতার কঠিন পরীক্ষায়' এই নতুন ঔপন্যাসিক যে সসম্মানে উত্তীর্ণ তাও বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করেছিলেন। ঐ একই বছরে গোপাল হালদারও 'জাগরী'র মূল্যায়ন করে লেখকের অসামান্য নৈপুণ্যকে সংবর্ধিত করেছিলেন। গোপাল হালদারের রচনাটি অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল অন্যত্র। বস্তুত 'জাগরী' প্রসঙ্গে 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সমালোচকদের এই রচনাগুলি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সম্পূর্ণ অখ্যাত সতীনাথকে প্রতিষ্ঠা যেমন দিয়েছিল তাঁর প্রথম এই উপন্যাস 'জাগরী', তেমনি সমালোচকদের অকৃত্রিম অভ্যর্থনা ও সহৃদয় ভর্ৎসনা চিনিয়ে দিয়েছিল তাঁকে নানা রুচির পাঠকের সঙ্গে।

একালের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষও বেশ কিছু প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখেছিলেন এই সময়ে। ১৩৫২-র শ্রাবণে প্রকাশিত হয় তাঁর 'আধুনিক রূপবিদ্যার একদিক' নামে নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ। ১৩৫৩-এর বৈশাখে নৃতাত্ত্বিক ম্যালিনউস্কির গ্রন্থ 'A Scientific Theory of Culture and Other Essays'-এর সমালোচনা করে লিখলেন গুরুত্বপূর্ণ 'সংস্কৃতির তত্ত্ব-বিচার' প্রবন্ধটি। আর ঐ বছরের শারদীয় সংখ্যাতে তাঁর লেখা 'আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য' বিতর্ক সৃষ্টি করল।

উক্ত প্রবন্ধে বিনয় ঘোষের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আক্রমণ করে পৌষ সংখ্যায় বিষ্ণুকুমার মুখোপাধ্যায় লিখলেন, 'উপন্যাস new tools সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা new tools of production-এর সঙ্গে এমন একটা যান্ত্রিক ঐক্যে বন্দী হয়ে গেছে যে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে, বিজ্ঞানের জীবন-দর্শনের সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের new tools-এর প্রশ্নটি যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তা তিনি দেখতে পান নি। কারণ হল তাঁর যান্ত্রিক চিন্তার ফল'।

মার্কসবাদ-বিরোধী শিবিরের বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী যখন মার্কসবাদী শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃজনশীল সাহিত্য সম্পর্কে ফতোয়া জারি করছেন যে এসব নিছকই প্রচারবাদী অসাহিত্য (যার প্রকাশ অজিত দত্ত সম্পাদিত বার্ষিক সংকলন 'দিগন্ত'-এ প্রকাশিত অতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধেও ঘটেছিল), সেই সময় 'পরিচয়'-এ (আষাঢ়, ১৩৫৩) চিদানন্দ দাশগুপ্ত লিখলেন 'প্রচারবাদী সাহিত্য'। এই প্রবন্ধে তিনি জানালেন, 'কমিউনিস্ট কবিতা কেবল 'রাজনৈতিক প্রচারের' কবিতা নয়, নতুন পৃথিবীর কবিতা। অতীতে খ্রীষ্টধর্ম যেমন খ্রীষ্টীয় সভ্যতাকে সৃষ্টি করেছে, বৌদ্ধধর্ম বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করেছে, তেমনি আজ কমিউনিজম জন্ম দিচ্ছে কমিউনিস্ট সভ্যতার'। জর্জ টম্পসনের 'মার্কসইজম এণ্ড পয়েট্রি'-র সমালোচনা (ভাদ্র, ১৩৫৩) প্রসঙ্গেও তিনি জানালেন, 'আজকের বুর্জোয়া জীবনের পুঞ্জীভূত অন্যান্য প্রশ্নের মত সাহিত্যের তীব্রতম প্রশ্নের উত্তর মার্কসবাদ দিতে সক্ষম'।

সাহিত্য ছাড়াও মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি রাজনীতিক বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ এসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বর্ষীয়ান পণ্ডিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস' 'পরিচয়' পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৫১-এর শ্রাবণ থেকে ১৩৫২-এর আষাঢ় পর্যন্ত এক বছর-কাল অবশ্য এর প্রকাশ বন্ধ ছিল। ১৩৫২-এর আশ্বিনে এডগার স্নো'-র 'রেড স্টার ওভার চায়না' প্রসঙ্গে সুধাংশু দাশগুপ্তের নিবন্ধ কিংবা ঐ একই সংখ্যাতে রাধারমণ মিত্রের লেখা ভূপেন্দ্রনাথের 'স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান সোস্যাল পলিটি' গ্রন্থের ওপর বিস্তৃত সমালোচনা প্রবন্ধ 'জাতি সমস্যার বিচার' উল্লেখযোগ্য। ১৩৫৩-এর জ্যৈষ্ঠ ও পৌষের সংখ্যায় অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র যথাক্রমে 'কেইনসীয় অর্থনীতি' ও 'পুস্তক পরিচয়'

বিভাগে লিয়নটিয়েভের গ্রন্থ সমালোচনা করে মার্কসীয় অর্থনীতি প্রসঙ্গে দুটি খুব দামি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আর ১৩৫৩-এর আষাঢ় সংখ্যায় আলেকজাণ্ডার গ্রে-র 'The Socialist Tradition' (Moses to Lenin) শীর্ষক গ্রন্থে মার্কসবাদ ও মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত জেহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

১৩৫৩-এর শ্রাবণ সংখ্যায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'হিন্দু ও মুসলিম' ধারাবাহিকভাবে বেরুতে শুরু করে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সে সময়কার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক পরিচয়ও বহন করে সুলিখিত এই প্রবন্ধটি। বস্তুত কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে গিয়ে লীগপন্থীদের সম্পর্কে একটু যেন নরম ভাব, যা সে সময়কার কমিউনিস্ট পার্টির মনোভঙ্গি ছিল, তা প্রকাশ পায় এ-প্রবন্ধেও।

উনিশ শতকের বাংলার রেনেশাঁস আন্দোলন কিংবা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন শুরু হবার অব্যবহিত আগে ও পরে এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে রক্ষণশীল 'শনিবারের চিঠি'র গবেষকমহল যে উদ্যমের পরিচয় দিয়েছিলেন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ১৯৪৮ সালের আগে কিন্তু সে-রকম কোনো সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় নি। একমাত্র পার্টির এককালীন সম্পাদক পি. সি. যোশীর উৎসাহে সুশোভন সরকার 'নোটস অন বেঙ্গল রেনাসান্স' নামে নাতিদীর্ঘ একটি আলোচনা গ্রন্থ লিখেছিলেন আর সংস্কৃতির ইতিহাস লিখেছিলেন গোপাল হালদার মার্কসীয় দৃষ্টি কোণের পরিচয় দিয়ে। ১৯৪৮ সালে একক প্রচেষ্টায় এই কাজ বেশ কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিলেন বিনয় ঘোষ 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

তবে 'পরিচয়' পত্রিকায় 'বাংলার নবজাগৃতি' বেরুবার আগেই উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ নিয়ে বেশ কিছু টুকরো প্রবন্ধ লিখেছিলেন নরহরি কবিরাজ। তাঁর 'ঊনবিংশ শতকের শ্রেণীবিন্যাস' (বৈশাখ, ১৩৫৩) 'উনিশ শতকে ইয়ং বেঙ্গল' (পৌষ ১৩৫৩), 'স্বদেশপ্রেমিক শিবনাথ' (ফাল্গুন, ১৩৫৩), 'বাঙলায় রেনেশাঁস আন্দোলন ও মুসলমান' (ভাদ্র, ১৩৫৪) এবং ১৩৫৩-এর চৈত্রে যোগেশচন্দ্র বাগল, যোগানন্দ দাশ ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলির ওপর সমালোচনা প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত হলেও এই প্রবন্ধগুলিতে বিবৃত নরহরি কবিরাজের বক্তব্যে বেশ কিছু ফাঁক ধরা পড়ে, যদিও

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার বা যোগানন্দ দাশের সনাতনী হিন্দু দৃষ্টিকোণ বা ব্রাহ্ম দৃষ্টিভঙ্গির আবেগপ্রবণ উচ্ছ্বাসের তুলনায় সে লেখাগুলি ছিল অনেক বেশি স্পষ্ট ও বিজ্ঞান চেতনায় সমৃদ্ধ। এর কিছুদিন বাদেই ১৩৫৫ সালের কার্তিকে লেখা তাঁর 'বিবেকানন্দের মত ও পথ' বিতর্কের সম্মুখীন হল, বে-আইনি পার্টির যুগে ১৯৪৯-এ প্রকাশিত 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় (৪র্থ সংকলন, প্রকাশ রায়ের প্রবন্ধে) যার পরিচয় মেলে। ১৩৫৫-এর মাঘ সংখ্যায় বিনয় ঘোষের 'বাংলার নবজাগৃতি'র সমালোচনাও লিখলেন নরহরি কবিরাজ। বিনয় ঘোষকে সমালোচনা করে পরিণত বোধ নিয়ে লিখলেন, 'বৃটিশ পুঁজিপতি শ্রেণীর একাধিপত্যের জন্য এবং ঔপনিবেশিক শোষণনীতির ফলে বাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণীর যে স্বাভাবিক বিকাশ হয় নি—সে সম্পর্কেও তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে যথোচিত গুরুত্ব লেখক দেন নি। ইউরোপের বুর্জোয়া জীবনদৃষ্টির গতিশীলতার সঙ্গে বাঙালী বুর্জোয়াদের গতিশীলতার সামঞ্জস্য খোঁজার আগ্রহে তিনি ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর গতিশীলতার ইতিহাস পাতার পর পাতা লিখে গিয়েছেন, কিন্তু কোথায় এর সঙ্গে মূলগত পার্থক্য সে সম্বন্ধে পাঠকদের সতর্ক করেন নি প্রয়োজনানুসারে।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে আরও দুটি প্রবন্ধের কথা। একটি হল 'ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলন' (১৩৫৩, চৈত্র)। লিখেছিলেন গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয়টি 'বাংলার নবযুগ' (মোহিতলাল মজুমদার) গ্রন্থটির প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের সমালোচনায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪) লিখেছিলেন, সমাজে প্রগতিবাদ আছে, প্রতিক্রিয়ার বিবাদও থামে নি। তারই প্রমাণ 'বাংলার নবযুগ'। জীবনে বা সাহিত্যে প্রগতির স্বরূপ যাঁরা জানতে চান বা মানতে রাজি, কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁদের ক্ষমা করতে পারেন না। কারণ তিনি শুধু প্রগতি-বিরোধী নন। তিনি প্রতিক্রিয়ার প্রতিভূ।

৪

১৩৫৩-এর পৌষের 'পরিচয়'-এ শুরু হল আরেকটি বিখ্যাত বিতর্ক। এই বিতর্কের মূল যে প্রবন্ধ তা অবশ্য 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয় নি। প্রকাশিত হয়েছিল পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায়। তাতে সুবোধ দাশগুপ্ত 'নূতন সাহিত্য' নামে এক প্রবন্ধে লিখলেন, প্রগতির ছাপ মারা সাহিত্যিকেরা যে-সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন তার সঙ্গে 'প্রগতিবিরোধী

সাহিত্যের মূলগত প্রভেদ' না থাকায় তিনি বিচলিত। তাঁর মতে, প্রগতি-শীল সমালোচনার দুটি মূল নীতি একান্ত আবশ্যিক। এক, বস্তুবাদকে চরম সত্য বলে মেনে নিতে হবে এবং যে সাহিত্যে ঈশ্বরকে মেনে নেওয়া হয়েছে তার নির্মম সমালোচনা করতে হবে। দুই, সমস্ত রকম প্রভুত্ব—তা আইন, নীতি বা ধর্ম, যারই হোক না কেন অস্বীকার করতে হবে অর্থাৎ সাহিত্য হবে মূলত প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নেতিবাদী ও প্রতিবাদী। সুবোধবাবুর আরেক বক্তব্য এই যে, 'প্রগতির নোট বুক মুখস্ত' ক'রে প্রগতিশীল হওয়া যায় না, লেখকেরা প্রগতিকে দেখেন দূর থেকে অতএব তারা বিপ্লবী নন।

স্বভাবতই এই বক্তব্য প্রবল ঝড় তুলল। হিরণকুমার সান্যাল খুব গুরুত্ব দিয়ে সুবোধবাবুর বক্তব্য বিচার করলেন 'পরিচয়' পত্রিকায়। লিখলেন, 'সুবোধবাবু তথাকথিত প্রগতিবাদীদের অবাস্তবতার প্রতিবাদে নিজেও অবাস্তবতার মোহে ভারসাম্য হারিয়েছেন' আর নতুন প্রগতিবাদী সাহিত্য রচনার আন্দোলনে পাঠকের রুচি বদলে দিতে '...প্রগতির ছাপ মারা সাহিত্যিকরা, অর্থাৎ ধরে নিতে হবে, প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট, তাঁরা এমন কি অপরাধ করেছেন? তাঁদের সকলের—এমন কি বেশির ভাগের—রচনাতেই কি প্রগতিবিরোধী সাহিত্যের সঙ্গে মূলগত ঐক্য দেখা যায়? যদি এই অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে নিশ্চয়ই বিচলিত হবার কারণ আছে। কিন্তু যদি ঐ সংঘভুক্ত দু-চারজন লেখক এখনো সত্যি মনে প্রাণে প্রগতিশীল না হয়ে থাকেন--তার প্রতিকার কি? আমি বলব, তার প্রতিকার 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্র গ্রহণ।'

সুবোধ দাশগুপ্তের বক্তব্যের পক্ষে বিপক্ষে আরও কিছু মত পাওয়া গেল মাঘের 'পরিচয়'-এ ধীরেন্দ্র রায় ও প্রভাত কুমার দত্তের চিঠির মাধ্যমে। আর চৈত্রে বেরুল বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক নৃপেন্দ্র গোস্বামীর মতামত 'অনিলা গোস্বামী'র ছদ্ম নামে। বিস্তৃত পরিসরে তিনি সুবোধবাবুর বিভ্রান্তি দেখিয়ে লিখলেন নেতিবাদী সমালোচনার পরিবর্তে আজকের সাহিত্যে প্রয়োজন 'পথ নির্দেশক আলোচনা'। আর মেকি প্রগতিবাদীদের মুখোস খুলতে গিয়ে সুবোধবাবু যে ক্রমে সংকীর্ণ ছকে গোটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনটিকে নিয়ে যেতে চাইছেন তা নেহাতি আত্মঘাতী। আরও লিখলেন যে, সাহিত্য সমালোচনার যে মাপকাঠি সুবোধবাবু স্থির করেছেন তাতে পূর্বসূরী মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেই হবেন বাতিল, প্রগতিবাদীদের অচ্ছুৎ—বস্তুত শিল্পীসাহিত্যিক-সমালোচককে যে তাঁদের নির্দিষ্ট যুগের মাপকাঠিতে

বিচার না করলে বিভ্রান্তির শিকার হতে হয় তাও গুলিয়ে ফেলেছেন সুবোধ বাবু। আর সাহিত্যে সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করার ঝোঁক যে নিতান্তই বামপন্থী বিচ্যুতি, সেকথাও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন নৃপেন্দ্র গোস্বামী তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে।

সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনে মধ্যবিত্তসুলভ অতিবাম বিচ্যুতির লক্ষণ কেবলমাত্র সুবোধ দাশগুপ্তের চিন্তাতেই প্রকাশিত হয়েছিল ঐ সময়ে, তা বলা যায় না। অল্প-বিস্তর এই ঝোঁক বহু আগে থেকেই প্রকাশ পেয়েছে নানান প্রবন্ধ-নিবন্ধে, বিতর্কগুলির মধ্যে। তবে কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনি যুগে, রণদিভের হঠকারি অতি বামপন্থার যুগে এবং বিশেষ করে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির শিল্পসাহিত্যে নীতি-বিষয়ে মুখপাত্র জ দানভের পার্টির সাহিত্য নীতি (সেপ্টেম্বর ১৯৪৬-এর বক্তৃতা) এ-দেশের সাহিত্যিক মহলে ছড়িয়ে পড়ার পর এই রোগ যেন পেয়ে বসল অল্প বিস্তর প্রায় সবাইকেই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসন্ন—তত্ত্বের এই ঝোঁক বাস্তব সামাজিক অবস্থার বোধ থেকে সরিয়ে নিল যেন সংস্কৃতি কর্মীদেরও। সাহিত্যিক দিক্‌পালেরা খানিকটা লাগাম ছাড়া কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা কিংবা বিপ্লবী সাহিত্যের যান্ত্রিক চেতনা স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়ে কবি-সাহিত্যিক-সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করেছিল বেশ ব্যাপক পরিমাণেই।

তিক্ত বিতর্ক শুরু হয় বোধহয় ১৩৫৪-এর আশ্বিনে প্রকাশিত বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধ 'গল্প উপন্যাসে সাবালক বাংলা' কে ঘিরে। তবে এর আগেই সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতাবোধের অতি উল্লাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারা-শঙ্করের গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকদের উচ্ছ্বাস ও আক্রমণ বেশ জোরদার ছিল।

১৩৫৪-এর আষাঢ়ের 'পরিচয়'-এ রণারমণ মিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চিহ্ন' প্রসঙ্গে লিখলেন, 'প্রকৃত সৃজনী শক্তির সঙ্গে নতুন সমাজের চেতনার সংযোগ হলে তার ফল কি বিস্ময়কর হতে পারে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে মাণিকবাবুর এই সম্প্রতি-প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি'; এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি অহেতুকভাবে আর যা লিখলেন তা হল এই, '...কি অসম্ভব পরিবর্তন মাণিকবাবুর নিজের দৃষ্টি ও চিন্তার মধ্যে! তিনিই না একদিন 'পুতুল নাচের ইতিকথা' লিখেছিলেন? সেদিন সাধারণ মানুষগুলো ছিল তাঁর কাছে পুতুলের মত, কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের নাড়াতো, চালাতো পল্লীগ্রামের গরীব ভদ্রলোকদের মধ্যে বা আধা-

ভদ্র আধা-চাষীদের মধ্যে সত্যই তিনি সেদিন সে 'মানুষ' দেখেন নি যাকে পরে দেখতে পেয়েছেন কলকাতার রাস্তায়, ফুটপাতে, বস্তিতে। সেদিন তাই লিখেছিলেন 'ইতিকথা'—আজ লিখলেন 'ইতিহাস'; সেদিন অবস্থার দাস পুতুলের, আজ অবস্থা-জয়ী মানুষের।'

আর এই মনোভঙ্গিরই আরেক যান্ত্রিক দিক প্রকাশ পেল ঐ বছরের শ্রাবণ সংখ্যায় শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের সমালোচনায় ('সমুদ্রের স্বাদ', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়), 'মানিকবাবু বলেছেন যে স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের এই সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।

'অত্যন্ত সত্য কথা! কিন্তু কোন গল্পের মধ্যেই তার ইঙ্গিত নাই। আছে শুধু ভাঙনের জরা ও বিশৃঙ্খলতার এক দেশদর্শী বর্ণনা।...আক্ষেপের কথা সেই অফুরন্ত সম্ভাবনা মানিকবাবুর সচেতন মনে প্রতিভাত হয়েও সাহিত্যে প্রসারিত হয় নি।'

এর কয়েকমাস বাদেই পৌষের 'পরিচয়'-এ হিরণকুমার সান্যালও 'বাস্তবতার' সরল দৃষ্টিতে আক্রমণ করলেন তারাশঙ্করের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' কে। রমেশচন্দ্র সেনের 'কুরপালা'-র সঙ্গে তুলনাত্মক আলোচনা করে সমালোচক লিখলেন, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা একেবারে ভানুমতির ভেলকি। এর ঘরবাড়ি যেন চলচ্চিত্রের ক্ষণস্থায়ী তোড়জোড। কোপাইয়ের স্রোতে আলোছায়ার আল্পনার মতন এখানকার মেয়ে-পুরুষের হাসি কান্না। সবই অলীক—অবাস্তব। অসাধারণ মুন্সিয়ানার জোরে যে-উপকথা বিস্তৃত হয়েছে দীর্ঘ চারশো পাতা ধরে, শেষ পর্যন্ত তা উপকথাই থেকে গেল, জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি বহন করে তা উচ্চস্তরের কথা সাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে পারল না।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 'মার্কসবাদী' পত্রিকার (যে পত্রিকা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত অতিবাম প্রস্তাবাবলীর ভিত্তিতে তাত্ত্বিক নীতি প্রকাশের মুখপত্র) প্রথম সংখ্যায় ভবানী সেন (বীরেন পালের ছদ্মনামে) সমর্থন করেছিলেন হিরণকুমারের এই সমালোচনা।

এরই পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রকৃতি নির্ধারণ করে আরও কিছু লেখা বেরিয়েছিল 'পরিচয়'-এ। কিন্তু তা ছাড়াও আর দু-একটি আপাত-গৌণ লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে যাতে খানিকটা সংযম বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এরকম একটি রচনা চিদানন্দ দাশগুপ্তর 'ফিল্মে বাস্তববাদ

মঁসিয়ে ভেড্‌’ নামক প্রবন্ধ (মাঘ, ১৩৫৪)। চিদানন্দ লিখেছিলেন এই প্রবন্ধেই তৎকালীন অতি সংবর্ধিত বাংলা একটি ছবি ‘অভিযাত্রী’ সম্পর্কে, ‘…এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের দেশে যখনই প্রগতিশীল বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা দেখা দিয়েছে তখনই তার অবশ্যম্ভাবী বাহন হয়েছে বাহ্য, প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। ‘অভিযাত্রী’ ফিল্ম প্রগতিশীল হয়েও সাধারণের সমাদর কেন লাভ করে নি সেটা এই প্রসঙ্গে বিচার্য (যদিও সেখানে আঙ্গিকের অকৃতকার্যতা রসকে ক্ষুণ্ণ করেছে)। সংগ্রামের আহ্বান জানাবার অতিরিক্ত ব্যগ্রতা এদেশের প্রগতিশীল কাহিনীমাত্রেই প্রকট। সরাসরি লড়াই-এর ডাক না দিয়েও দর্শকের মনে এমন আবেগভূমি সৃষ্টি করা সম্ভব যাতে আবেগের কর্মরূপ দেবার তাগিদ দর্শকের চিত্তে স্বতই জাগ্রত হয়।’

১৩৫৪-এর শারদীয়তে তাঁর ‘গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা’ নামে পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন বিষ্ণু দে।

‘…প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের স্বচ্ছ করুণা, বুদ্ধদেবের বিদ্রোহী রবীন্দ্র বিরোধী আবেগ, শৈলজানন্দের বীরভূমের নিসর্গের মতো ঋজু কঠিন কথকতা, অচিন্ত্যকুমারের ক্লান্তিহীন বিষয় অনুসন্ধিৎসা ও রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এসবেরই কাছে বাংলা সাহিত্য ঋণী। লুই আরাগঁ ঠিকই বলেছেন, সাহিত্যের ইতিহাস, টেকনিকেরই ইতিহাস, অতীতের রাজনৈতিক প্যারালেলে তার সংজ্ঞা মেলে না।

‘অন্তত প্রারম্ভিকে এবং মুখ্যত। তারই নিকষে দেখি আজকে তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক প্রতিভার মহৎ ও নব নব প্রসার, মনস্তাত্ত্বিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম চিত্রাবলী। কারণ এঁরাও আরম্ভ করেন সেই সকালে। …সেকালে যার মিশ্র সূচনা, আজ দেখা যায় তার বহুধা কিন্তু স্পষ্টতর পরিণতি। অবশ্য পরিণতি বলতে বাংলা সাহিত্যের পটে এবং বাংলার জীবনের বাস্তব নিকষেই বিশ্বসাহিত্যের পুরুষার্থে সিদ্ধিলাভ বুঝি। তাছাড়া নিজের দেশের সীমায় নিজের সাহিত্য শ্রদ্ধা না করে নঙর্থক সমালোচনায় রুশ সাহিত্যের তুলনায় সবই নস্যাৎ করা সাহিত্য তথা রাজনীতি—দুদিক দিয়েই ভুল।

‘তাই মানিকবাবুর অস্থির কৌতূহল, জীবনের নানাস্তরের তথ্যজ্ঞান, থেকে তাঁর গভীর ও সংবেদ্য অন্তর্দৃষ্টির ঝলকানি, সেটাই আমাকে শ্রদ্ধানত করে! তাই তারাশঙ্করবাবুর কাঠামোর ব্যাপ্তি আমাকে অভিভূত করে—’

আপন সাহিত্যবোধ, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিচয় দেওয়ার সূত্রেই

বিষ্ণু দে প্রসঙ্গক্রমে আসেন অচিন্ত্যকুমারের রচনা প্রসঙ্গে, '...তাঁর পরিণতির সার্থকতা ঐতিহাসিক তুলনা জাগায় হেমিংওয়ের সঙ্গে।...তাঁর ভাষার আততি অচিন্ত্যকুমারকে দিয়েছে সস্তা কারুণ্য থেকে মুক্তি। আবার তাঁর বিষয়ানুগ মানবিকতা তাঁকে দিয়েছে তথাকথিত সহজ মানুষের সুখ-দুঃখের সহজ সাধারণ রূপ থেকে না পালানোর সাহস। মনে হয় আমাদের এই সব লেখকেরা সিদ্ধির সেই স্তরে পৌঁছেছেন যেখানে সেন্টিমেন্টালিসমের সহজ অভিযোগ বা ন্যাচারালিসমের অশ্লীলতার নালিশ তাদের শিল্পসমাধি তথা জীবনদর্শন ব্যাহত করতে অপারগ। তাঁর গল্পের জীবন জীবনেরই মতো বিচিত্র, তিক্ত, মধুর বিস্ময়কর ও মিশ্রাবেগ।'

বিষ্ণু দে লিখিত প্রবন্ধের এই শেষোক্ত মন্তব্যটিকে খোঁচা দিয়েই অগ্রহায়ন, ১৩৫৪-এর 'পরিচয়'-এ নীহার দাশগুপ্ত তাঁর 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোট গল্প' শীর্ষক পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধে লিখলেন, 'অচিন্ত্যবাবুর তীক্ষ্ণধার ভাষা ও গল্প বলার কায়দার জোরে গল্পগুলি সুপাঠ্য হয়ে উঠলেও কোন এক কবি-সমালোচকের মত তাঁকে হেমিংওয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারব না। বলতে পারব না, তাঁর গল্পের জীবন, জীবনেরই মত বিচিত্র, তিক্ত, মধুর, বিস্ময়কর মিশ্রাবেগ।' বস্তুত এই আলোচনায় নীহার দাশগুপ্তের অভিপ্রায় ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গায়েন' গল্পটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা অচিন্ত্য-কুমারের 'মুচিবায়েন'-এর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে।

পৌষ সংখ্যার 'পরিচয়'-এ বিষ্ণু দে নীহার দাশগুপ্তের এই নিবন্ধটিকে তীব্রভাবে এবং বলা যেতে পারে সংযমের বাঁধ না মেনেই আক্রমণ করে নীহারবাবুর 'ট্রটস্কি-মার্কা প্রতিক্রিয়াশীলতা'র স্বরূপ উন্মোচন করে লিখলেন, '...এই কি প্রগতিশীল সমালোচনা? সংগ্রামী বাঙালীর এই কি সংস্কৃতির লাল রাস্তা? নাকি রাস্তা তৈরী এ নয়, এ শুধু তরল দীপ্তির চটুল আগুনে সমাজচেতনার ফুলঝুরি? কিম্বা এক সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের খেলা?'

পরের সংখ্যায় (মাঘ, ১৩৫৪) নীহার দাশগুপ্ত প্রত্যুত্তরে আরও উগ্রভাবে আক্রমণ শানালেন এই বলে, 'বিষ্ণুবাবু আমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর অজস্র ব্যক্তি-গত কটাক্ষ করেছেন। 'পরিচয়'-এর সম্পাদকরাও বাদ যান নি। বুদ্ধি-বিলাসীর আত্মাভিমানে যখন আঘাত লাগে, তখন তাঁর তথাকথিত ভদ্রতার মুখোস খুলে পড়ে, প্রতিপক্ষের গায়ে কাদা ছিটানো ছাড়া তাঁর আর কোনো গত্যন্তর থাকে না।'

ঐ সংখ্যাতেই এই বিতর্কে আরও একজন যোগদান করেছিলেন। তাঁর

নাম অনিলকুমার সিংহ। নীহার দাশগুপ্ত বা বিষ্ণু দে কারুর পক্ষে সমর্থন না করে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন ক'রে লিখলেন, '...অচিন্ত্যকুমারের হালের সাহিত্যকে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল বলব—এ দুঃসাহস আমার নেই। অচিন্ত্য-বাবু প্রগতিশীল আন্দোলনের পরিপন্থী ডজনখানেক গল্প লিখেছেন বলেই তাঁর সাহিত্যকে চট করে প্রতিক্রিয়াশীল বলা চলে না, কারণ তাঁর সাহিত্য তো ঐটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়—আরও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত তাঁর সাহিত্য। আসলে গোল বেধেছে বিষ্ণুবাবুর মহানুভবতার আধিক্য ও নীহারবাবুর কার্পণ্যের ফলে। বিষ্ণুবাবু অচিন্ত্যকুমারকে তাঁর প্রাপ্যের অনেক বেশী দেবার জন্য ব্যগ্র, অন্যদিকে নীহারবাবু তাঁর প্রাপ্যটুকুও পুরোপুরি দিতে চান না।'

ঠিক পরের সংখ্যাতেই কলম ধরলেন এই বিতর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফাল্গুনের 'পরিচয়'-এ লিখলেন, বিতর্কিত মূল প্রবন্ধে নীহার দাশগুপ্ত বিষ্ণু দে সম্পর্কে এমন কিছু বলেন নি যে তাতে বিষ্ণু দে এতখানি বিচলিত হতে পারেন। এবং এর পরেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণু দের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করলেন, 'বিষ্ণুবাবুর মার্কসিস্ট জ্ঞান যে কতোদূর অপরিচ্ছন্ন তার আবেক প্রমাণ লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুক্তির মধ্যে পাই'। আর সাহিত্য বিচারে 'দলগত মনোভাব' 'স্বজাতিপ্রীতি' ইত্যাদি বিষ্ণু দের অভিযোগের উত্তরে সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, 'দুটো দল হয়ে গেছে, উপায় কি। ব্যক্তিগতদের ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতিপ্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।' অনতিবিলম্বে বা হয়ত তখনই এই সাহিত্য বিতর্ক কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক লাইনে চলে গেল। তাতে সাহিত্য প্রসঙ্গ প্রায় অবান্তর। সুতরাং এ-আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়।

ঐ একই সময়ে ১৩৫৪, পৌষ সংখ্যায় মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আরেকটি বিতর্কের খোরাক যোগাল আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' প্রবন্ধটি। অবশ্য এই বিতর্কটিতে মার্কসীয় নন্দন তত্ত্ব ও সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই হয়েছিল, আলোচনায় ব্যক্তিবিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে নি।

আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর এই প্রবন্ধে যুক্তি পরম্পরায় প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের প্রয়োজনে সাহিত্য-শিল্পকে ব্যবহার করার তাগিদ নেহাৎই সাহিত্যের 'উপকরণ মূল্য' সৃষ্টি করে। এবং নিতান্তই তা সাহিত্যের 'ফলিত' রূপ। মার্কসবাদীরা তাই নিয়েই মশগুল থাকেন আর

সাহিত্যের যে চরম মূল্য 'সত্য, শিব, সুন্দর' তা এঁদের কাছে উপেক্ষিত। তাই আইয়ুবের প্রশ্ন, 'সত্য-শিব-সুন্দরের পরিপূর্ণ বিকাশ ও বিকিরণই যখন সামাজিক উন্নতির আদর্শ, তখন রাষ্ট্রিক বিপ্লব বা অর্থ নৈতিক ব্যবস্থান্তর ঘটানর ধারালো অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়াকেই শিল্পসাহিত্যের চরম সার্থকতা বলে নির্দেশ করা, Nonparty লেখকদের ধ্বংস কামনা করা, ঘোষণা করা যে সাহিত্যকে সুনিয়ন্ত্রিত সুসংবদ্ধ বিপ্লবী দলের অংশ বিশেষ হতেই হবে—এসব কি চরম উদ্দেশ্যকে উপস্থিত উপায়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলার মত উলটো-বুদ্ধির লক্ষণ নয়?' এই যুক্তি শানিয়েই তিনি আরেক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, 'তবে কেন আমরা ভাবি যে এরেনবুর্গের কীর্তির কাছে টমাস মানের প্রতিভা ম্লান হয়ে গিয়েছে, কেন লুই আরাগোঁর জয়গান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা ভুলে যাই, কিম্বা ভুলে না গেলেও তার তিন হাজার কবিতার মধ্যে যে আধা ডজন তথাকথিত প্রগতিশীল কবিতা আছে সেগুলির কথাই স্মরণ করি?' অতএব আইয়ুব সিদ্ধান্ত করলেন, সাহিত্য 'সাম্যবাদী বিপ্লবীদলের integral part হোক, তাঁদের হাতে 'keen weapon' হবার গৌরব অর্জন করুক—মানব-দরদী কোন সাহিত্যরসিক তাতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে বিপ্লব যে-লক্ষ্যের দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সেখানেও সাহিত্যের স্বকীয় এবং সর্বোচ্চ স্থান। ফলিত সাহিত্যের ভূয়সী প্রচারকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাব, কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতি আমাদের যে অন্তরতম অনুরাগ আছে সেটাকে যেন ব্যাহত হতে না দিই।'

মাঘের 'পরিচয়'-এ অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র আয়ুবের এই বক্তব্যের মধ্যে 'ফলিত' ও 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের বিভাজনকে যান্ত্রিক দৃষ্টির প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করলেন। সোভিয়েট সমাজ ও সাহিত্যের বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করে তিনি মার্কসবাদ-বিরোধী এই সমালোচকের যুক্তির ফাঁক ধরিয়ে দিয়ে লিখলেন, 'বিপ্লবকে সফল করে তোলার জন্য একটা সঙ্কীর্ণ ফলিত সাহিত্যের প্রয়োজন মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের জন্য ও উচ্চতম সাংস্কৃতিক মূল্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রয়োজন, মার্কসিস্ট সাহিত্য সম্বন্ধে আইয়ুব সাহেবের এই আধা-স্বীকৃতি সম্পূর্ণ অস্বীকৃতিরই সামিল। আইয়ুব সাহেবের মূলগত ভ্রান্তি হল বিপ্লবকে শুধু আর্থিক ব্যবস্থা চালু করার মেকানিজম হিসাবে কল্পনা করা। কাজেই বিপ্লবী সাহিত্যকে বা ফলিত সাহিত্যকে তিনি মার্কসিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর একটা তালিকা হিসাবে দেখেছেন। এই দেখাটা

সম্পূর্ণ ভুল দেখা। মার্কসিস্ট লেখক যে সাহিত্য রচনা করেন বা করতে চান। বিপ্লবের আগেই হোক বা পরেই হোক, সেটা আদৌ ফলিত সাহিত্য নয়। সেটা শুধুই সাহিত্য, শিল্পধর্মী ও প্রগতিশীল'। অমরেন্দ্রপ্রসাদ ঐ প্রবন্ধে আরও বলেছিলেন, '…মার্কসবাদ শুধু লেখককে সচেতন করে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে। বহু পেটিবুর্জোয়া বামপন্থী লেখক নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হলেও বুর্জোয়া ব্যক্তি-চৈতন্যের খোলস ভেদ করে বের হয়ে আসতে পারেন না। Abstract relation বা বস্তুবিশিষ্ট আইডিয়াল সম্পর্ক, absolute value বা চরম মূল্য, form বা আঙ্গিকের মধ্যেই শিল্পের আসল সত্তার কল্পনা—এই সব বিভ্রান্তি তাঁদের দূর হয় না বলেই তাঁরা পার্টির বিরুদ্ধে প্রথমে বিক্ষুব্ধ ও পরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁরা ও যাঁরা সরাসরি দক্ষিণপন্থী সাহিত্যিক উভয়েই হয়ে ওঠেন শ্রমিকবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল কুসাহিত্যিক।

এই বিতর্ক এর পরেও কিছুদিন চলেছিল। ফাল্গুন সংখ্যায় আয়ুবের বক্তব্যের বিরুদ্ধে শীতাংশু মৈত্রও বিস্তৃত করে মার্কসীয় সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন। চৈত্র সংখ্যায় আইয়ুব প্রত্যুত্তরে তাঁর বক্তব্য অর্থাৎ 'বিশুদ্ধ' ও 'ফলিত' সাহিত্য বলতে তিনি কী বোঝেন তা আরও স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করেছিলেন।

এর কয়েক সংখ্যা বাদেই ১৩৫৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ় যুগ্ম সংখ্যায় বেরুল নীরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ 'সাহিত্যবিচারে মার্কসবাদ'। এই প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করেই বললেন, 'সাহিত্য সমাজ-মানসের ভাষাগত প্রকাশ' আর 'মানুষের মনে সৌন্দর্য অনুভূতির বিকাশ হয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাবে, উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা যে পরিমাণে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিতে পারিয়াছি সেই অনুসারে আমাদের সৌন্দর্য-বোধও বিবর্তিত হইয়াছে'। আবু সয়ীদ আইয়ুব, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, শীতাংশু মৈত্রের বিতর্কের অব্যবহিত পরেই এই প্রবন্ধে হীরেন্দ্রনাথ যে আইয়ুবের বক্তব্যের বিরোধিতা করে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য-বিচারের নমুনা দেখাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যদিও প্রত্যক্ষত তিনি আইয়ুবের প্রবন্ধের কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি।

১৩৫৫-এর পৌষের 'পরিচয়'-এ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ডাইসন কার্টারের একটি গ্রন্থ 'Sin and Society'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে আইয়ুব সাহেবের

প্রবন্ধের একটি মন্তব্য সম্পর্কে খুবই তীক্ষ্ণ আরেক আক্রমণ শানিয়েছিলেন। মাঘের সংখ্যায় আবু সয়ীদ আইয়ুব তার উত্তরও দিয়েছিলেন এবং দেবীপ্রসাদের আক্রমণে খানিকটা ব্যক্তিগত দ্বেষ প্রকাশ হয়েছে বলে ঐ একই সংখ্যায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর উত্তরে যথাবিহিত সম্ভ্রম প্রকাশ করেছিলেন। এর কিছুদিন পর আরেকবারও আবু সয়ীদ আইয়ুব 'পরিচয়'-এর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালের ১০ এপ্রিল স্টেটসম্যান পত্রিকায় তাঁর 'ডায়ালেকটিস অব দি অ্যাটলান্টিক প্যাক্ট' রচনার প্রতিবাদে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র অনিমেষ রায়ের ছদ্মনামে সঙ্গত উত্তর দিয়েছিলেন 'বুদ্ধিবিলাসীর ডায়ালেকটিস' শীর্ষক প্রবন্ধে (বৈশাখ, ১৩৫৬)।

৫

এই নিবন্ধের সূত্রপাতে যে-প্রসঙ্গ তোলা হয়েছিল যে মার্কসবাদী 'পরিচয়' প্রথম পর্বের তুলনায় নিষ্প্রভ কিনা, বহরে খাটো কিনা—তার উত্তরে বোধহয় এবার স্পষ্ট করেই কিছু বলা যেতে পারে।

মার্কসবাদ 'পরিচয়'-এর মান উন্নত করেছিল। সাহিত্য-সংস্কৃতির চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে নতুন জীবনবোধ—মার্কসবাদই, 'পরিচয়'-এর নতুন যুগ সৃষ্টি করতে পেরেছিল, গতানুগতিক শিল্পচর্চার বৃত্ত থেকে মুক্ত করেছিল। চিন্তার জগতে, সৃজনশীল রচনায় সে এক মহা আলোড়ন। যুগোপযুগীও বলা যেতে পারে তাকে। তবে চল্লিশের দশকের শেষার্ধে যে মতান্ধতা পেয়ে বসেছিল মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের অনেককেই—'পরিচয়' পত্রিকাতেও সে ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, চোরাবালির সন্ধানও যে মেলে নি তাও নয়। কিন্তু সে তো স্বাভাবিক। মার্কসবাদী শিল্প সাহিত্যের আন্দোলন ঋজু সরলরেখায় অভ্রান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে তা আশা করাও তো মূঢ়তার লক্ষণ। অতএব সাময়িক ভ্রান্তির ছিদ্রপথে ডামাডোল তো ঘটতেই পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই ডামাডোলের বাজারে পার্টির সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লেখক-শিল্পী-সমালোচক যে বিনা দ্বিধায় মস্তক খোয়াতে রাজি ছিলেন না, তাঁদেরও যে শিল্পীসুলভ স্বকীয় ব্যক্তিত্ব আছে, শিল্পের নিজস্ব প্রাণ আছে—মার্কসবাদের বিরোধিতা না করে তার বেশ কিছু প্রমাণও তো এই 'পরিচয়' পত্রিকাই। অতএব দ্বিধার কোনো কারণ নেই একথা বলতে যে 'পরিচয়, তার দ্বিতীয় দশকে স্বকীয়তায়, দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতায় বাংলা সাময়িক পত্র জগতে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সংযোজন

"'পরিচয়'-এ নাট্য-সমালোচনা" প্রবন্ধটির শেষে তালিকা নং—১ক-এর সঙ্গে নীচের অংশটি যুক্ত হবে।

বর্ষ	সমালোচনার সংখ্যা	সমালোচিত নাটকের সংখ্যা
৪৩	০	০
৪৪	০	০
৪৫	০	০
৪৬	২	৩
৪৭	৩	৩
৪৮	৩	১২
৪৯	২	২
৫০	২	২

PARICHAYA November '81 WB/NC-173

গ্রাহক সংক্রান্ত

ডাকখরচ বাদে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : কুড়ি টাকা
ডাকখরচ সহ বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা : তেইশ টাকা
ডাকখরচ সহ আজীবন গ্রাহকচাঁদা : দুইশ টাকা

বর্ধিত মূল্যে বছরে অন্তত তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়
গ্রাহকদের সেজন্য কোনো অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না
বছরের যে-কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়

এজেন্সি সংক্রান্ত

অন্তত ৫ কপি নিতে হয়
কমিশন শতকরা ২৫ টাকা
পত্রিকা ভি পি-তে পাঠানো হয়। ডাকব্যয় আমাদের।

কর্মাধ্যক্ষ 'পরিচয়'
ব্যবস্থাপনা দপ্তর
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩

দুই টাকা

পরিচয়

পরিচয়

ডিসেম্বর ১৯৮১ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ ৫১ বর্ষ ৫ সংখ্যা

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

পরিচয় এর-পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়; ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

রুশতী সেন

কোথায় স্বর্গের রাস্তা

'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।' এই নির্মম, ভয়ানক পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ 'জীবিত ও মৃত' শেষ করেছিলেন ১২৯৯-এর শ্রাবণ মাসে। কাহিনী জুড়ে মৃত্যুর অমোঘ অভিজ্ঞতা হাহাকার করে ; এ-আর্তস্বর এমন-এক জীবিতের, যার পৃথিবী তাকে মরণে মিলিয়ে দিয়েছে। রাণীহাট জমিদারবাড়ির বিধবা বউ কাদম্বিনী মরে নি, '...—হঠাৎ কী কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।' যখন চৈতন্য ফিরে আসে, শববাহকেরা মৃতদেহে জীবিতের লক্ষণ অনুভব করে আধিভৌতিকের কল্পনায় ভয়ে শ্মশানঘাট ছেড়ে পালিয়েছে। একমুহূর্ত কাদম্বিনী ভেবেছিল এই বুঝি মৃত্যু ; কিন্তু পরক্ষণেই পৃথিবীর নিকটস্পর্শ সে অনুভব করে, মনে আসে আলোকিত জমিদারগৃহে চেতনা হারাবার মুহূর্ত, পূর্বস্মৃতিও স্মরণে এল। শ্মশানের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছেড়ে, মাঠঘাট, ধানখেত, জল পেরিয়ে কাদম্বিনী হাঁটে। কিন্তু যে মুহূর্তে লোকালয়ে প্রবেশ করে, ভয় পায় সে। 'পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছু জানে না।...দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে ; মৃত্যুনদীর দুইপারে দুইজনের বাস।' কাদম্বিনীর মনে তখন সংশয়, সে জীবিত, না কি মৃত ! এই সংশয়ে আচ্ছন্ন মনে সে এমন এক গন্তব্য স্থির করে, যেখানে তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছয় নি, পৌঁছনোর কথাও নয়।

বাল্যসখী যোগমায়ার বাড়িতে কাদম্বিনী জীবিতের আমন্ত্রণই পেয়েছিল। কিন্তু তা গ্রহণ করবার মতো মানসিক ভারসাম্য তার কোথায় ? মৃত্যুনদীর দুইপার থেকে একই সঙ্গে টানাপোড়েন চলছে তার মনের উপরে। তার বড় ভয়। কখনো একা ঘরের মধ্যে অন্ধকারে চিৎকার করে ওঠে, যোগমায়ার শয়নঘরের দরজায় এসে বলে '...তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো ! আমাকে একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।' আবার বলে বসে '...বুঝিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন। তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি

অমঙ্গল আনি—আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তোমাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক।...' বাল্যসখীর ব্যবহারে যোগমায়া স্তম্ভিত, এবং ক্রমে বিরক্ত। স্ত্রীর তাড়নায় স্বামী শ্রীপতিচরণ রানীহাটে খোঁজ করেন, কেন কাদম্বিনী শ্বশুরবাড়ি ফিরতে চায় না। ফলে আনেন কাদম্বিনীর মৃত্যু সংবাদ—শববাহকরা ফিরে গিয়ে সম্পূর্ণ অন্ত্যেষ্টির গল্পই বলেছিল। যোগমায়া চোখের সামনে বাল্যসখীকে দেখছে, সে স্বামীর কথা মানবে কেমন করে! স্বামী-স্ত্রীর তর্কযুদ্ধের মধ্যে কাদম্বিনী নিজেই আসে মীমাংসা করে দিতে 'সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি।...কিন্তু মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই—ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।'

কোথায় যাবে, সে যাওয়ার উপায় কী, কাদম্বিনী নিজেই তা খুঁজতে বেরোয়। সই-এর বাড়িতে তাকে আর পাওয়া গেল না। কোনো ভাবে সে রানীহাটে ফেরে। সারাদিন ভাঙা মন্দিরে লুকিয়ে থেকে রাত্রির অন্ধকারে জমিদারবাড়ির শয়নঘরে প্রবেশ করে। সে ঘরে তখন একলা শুয়ে ঘুমোচ্ছে কাদম্বিনীর বিগতজীবনের একমাত্র স্নেহবন্ধন, তার শিশু ভাসুরপোটি। কাকীমার স্নেহে অভ্যস্ত খোকা এ ক-মাসে তাকে ভুলতে পারে নি। জ্বরের ঘোরে, ঘুমের মধ্যে বলে ওঠে বালক, 'কাকিমা, জল দে।' তাকে জল খাওয়াতে খাওয়াতে কাদম্বিনী তার চিরপরিচিত জীবনের অনুভব ফিরে পায়, '...সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্ত ভাবেই আছে...। সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে; খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকিমা তো একতিলও মরে নাই।' কিন্তু ততক্ষণে খোকার মা এবং পরিচারিকা কাদম্বিনীকে সশরীরে দেখে মূর্চ্ছিতা এবং খোকার বাবা জমিদার শারদাশংকর কাতর অনুনয়প্রার্থী '...তুমি যাওয়ার পর হইতে...উহার (খোকার) ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল 'কাকিমা' 'কাকিমা' করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও—আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব।' কাদম্বিনীর প্রাণ-মন তখন বলছে, সে মরবার অপরাধটুকুও করে নি, সে মরে নি। জীবন থেকে যে নির্বাসন তাকে সবাই দিয়েছে, তার যন্ত্রণায়, অসহায় আর্তনাদে ভেঙে পড়ে সে, 'ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি

নাই—'তারপর ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্তঃপুরের পুকুরে ; মরে প্রমাণ করে যে সে বেঁচেছিল।

আশ্চর্য মহিমায় মৃত্যুকে দেখেন রবীন্দ্রনাথ। অমোঘ নিষ্ঠুরতা এই মৃত্যুর বোধে, যা শূন্যতায়, হতাশায়, অনিশ্চয়ে মানুষকে পাগল করতে পারে। নির্মম বিভীষিকা এই মরণ, যা মানুষের অযাচিত বাঁচার ইচ্ছাকেও পরোয়া করে না। আশ্চর্য শান্তি এই মরণ, যা জীবিত-মৃতের দ্বন্দ্বে সংশয়াকুল প্রাণকে সব যন্ত্রণাবোধ থেকে মুক্তি দেয়, শান্তি দেয়। তিনরূপেই মৃত্যু আসে কাদাম্বিনীর কাছে। অবশেষে জীবনকে প্রমাণ করতে মরণ অনিবার্য হল।

জীবনের ঐশ্বর্যকে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব না করলে মরণের কঠিন অনিবার্য চেহারা এমন ভাবে দেখা বুঝি অসম্ভব। জীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রেম ছিল অন্তহীন ; তাই তার কাছে শিল্পীর দাবিও থাকবে অনেক, এ তো স্বাভাবিক। ছিলও তাই। সেই দাবিতেই জীবনকে তিনি সর্বদা প্রসাদে ভরাট দেখতে চেয়েছেন। জীবন যখন নিজের ইচ্ছাকে পূরণ করতে অপারক, মানুষ যেখানে সহজাত সৌন্দর্য আর মানবিক বৃত্তিগুলো নিয়ে পদে পদে পরাজিত, সেই দুঃসহ, ক্লিষ্ট বেঁচে থাকাকে লেখক মানতে পারেন না। এ জীবনের চেয়ে মরণ সুখের,: এই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ। কাদাম্বিনীর জীবন যখন তার বেঁচে থাকার তীব্র বাসনাকে মর্যাদা দিতে পারে না, সে মরে প্রমাণ করে তার বাঁচাকে। যে কোনো নেতির সঙ্গে জীবনের আপসে বড় বিড়ম্বিত লেখক। বাঁচার গৌরব যখন ক্ষুণ্ণ হয়েছে, জীবনের একমাত্র আশ্রয় মরণে, সে মৃত্যু যত কঠিন, যত যন্ত্রণারই হোক না কেন। তাই কাদম্বিনীর মৃত্যুর নির্মম পরিণতি কত কাহিনীর কত স্তরে নানা রূপে ফিরে ফিরে আসে। অনাহত বাল্যের অনন্ত মুক্তি পিপাসাকে, শিশুর নিশ্চিত দৃষ্টি আর উদার অনুভবকে যে-জীবন শিকল দিয়ে বাঁধে, মৃত্যু আসে তার প্রতিবাদের স্বরূপে, ফিরিয়ে দেয় বুঝি বালকের সেই অগাধ নিশ্চিতি। প্রাণ ভরা সততা নিয়ে সমদর্শী মানুষ ব্যর্থ হয় শুভ ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠা করতে ; অন্তরে-বাইরে তার যে অতুল্য মানবিক সম্পদ, জীবন তাকে কোনো সমর্থন দেয় না, মূল্যও নয়। রবীন্দ্রনাথ আবার তাই চলে যান মরণের মহিমায় ; মৃত্যুই পারে এমন জীবনের সব দেনা শোধ করে দিতে। মনের সব মাধুর্য কল্পনা নিয়েও শিল্পীকে যখন নিজের শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য নামতে হয় বাক্‌যুদ্ধে, জীবনের দীনতায় অস্থির লেখক মরণেই উত্তর খোঁজেন। প্রেমিক তার ভালোবাসায় বিস্তীর্ণ মন উজাড় করে দেয়, কামনা করে প্রেমের প্রকৃত

অনুভব। তবু তার অভিজ্ঞতায় থাকে শুধু শূন্যতার হাহাকার, নিষ্ফল আকুলতার বেদনা। এ জীবনকেও মরণে জয় করতে চান রবীন্দ্রনাথ। সত্যের অঙ্গিকারে অবিচল সাধকও যদি জীবনের প্রতিকূলতার শিকার হয়, বাঁচার সেই গ্লানি, সেই অব্যক্ত, অসহায় বেদনাকে তিনি অপরাজেয় অসীম মৃত্যুতেই একাকার করতে চান। যে জীবনে অনাহত বাল্যের অবাধ গতি রুদ্ধ, সততা যেখানে মূল্যহীন, কল্পনা পরাজিত, একনিষ্ঠ প্রেম যখন নিঃসঙ্গ, অঙ্গিকার যখন নিরাশ্রয়, মৃত্যুই পারে জীবনের এই নেতির বোঝা ম্লান করে দিতে।

মৃত্যুকে নিজের কীর্তিতে জয় করবে, এমন জীবনেরই স্বপ্ন ছিল রবীন্দ্রনাথের ; কিন্তু প্রতি পদে মরণের নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক, অথচ নিশ্চিত শক্তিশালী রূপটাও তাঁর অজানা নয়। মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনের আর্তিকে তিনি বিভিন্ন মাত্রায়, নানা বৈচিত্র্যে নিয়ে যেতে চান অসীম আকাশের বিস্তারে, যে আকাশ 'পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ।' রবীন্দ্রনাথের সে-আকাশে উড়ে বেড়ায় এমনই সব ইচ্ছে, জীবনের কল্পনায় যা ভরাট, অথচ মেটা-না-মেটার অনিশ্চয়তায় যা দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

গ্রামে ছেলেদের সর্দার যে ফটিক, তার হৃদয়টা এমন নানা ইচ্ছায় ভরা ছিল। বিধবা মায়ের বড় ছেলে ফটিক ; ছোট ভাই মাখন, যেমন শান্ত, পড়াশোনায় তেমনি মনোযোগী। ফটিক ঠিক তার বিপরীত। বিদ্যায় তার বিরাগ, খেলাধুলোকে ভালোবেসেই সে বাঁচে। মাঝেমধ্যে মাখনকে মারধোর করার অভিযোগে মা-র কাছে জোটে বকুনি, চড়চাপড়ও। ফটিকের মামা বিশ্বম্ভরবাবু প্রস্তাব করলেন, ফটিককে কলকাতায় নিজের কাছে রেখে শিক্ষা দেবেন। ফটিকের বড় উৎসাহ নতুন জায়গা দেখবার। 'কবে যাবে' 'কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল ; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।'

কলকাতার অভিজ্ঞতা ফটিকের ভালো হল না। মামী তার আকস্মিক আগমনে খুশি নন। ফটিকের যা বয়স, তাতে শৈশবের শোভাও চলে যায়, আবার যৌবনের শ্রীও তখনো আসে না। বয়সের এই বিষম বালাই-এর উপরে ছিল মামীর তিনটি সন্তান-সম্মিলিত নিয়মের সংসারে সংখ্যাবৃদ্ধির অসুবিধা। ফটিক বোঝে, মামীর স্নেহ সে পাবে না। স্কুলেও সে এক নরক-যন্ত্রণা ; তার অমনোযোগে, নির্বুদ্ধিতে শিক্ষকরা বিরক্ত, মামাতো ভাইরা লজ্জিত। একটা আপদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক তারা অস্বীকার করতে চায় ; ফটিকের শাস্তিতে, অপমানে তারাই আমোদ দেখাতে সবচেয়ে বেশি

সচেষ্ট হয়। এমন সময়, একদিন মামার কাছে ফটিক গ্রামে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে মায়ের কাছে যাবে। মামা বলেন 'স্কুলের ছুটি হোক।' ফটিকের বই হারিয়ে গেলে মামী বলেন, মাসের মধ্যে পাঁচবার বই কিনে দেওয়া সম্ভব নয়। নিজের হীনতা অনুভব করে ফটিক, সে পরের পয়সা নষ্ট করছে।

রাত্রে সেদিন ফটিকের মাথা ধরে, গা সিরসির করে, জ্বর আসে। অসুখ নিয়ে মামীর উপর উপদ্রব করতে তার লজ্জা হল। পরদিন সকালে ফটিককে মামাবাড়িতে আর দেখা গেল না। শ্রাবণের অবিরাম বর্ষার মধ্যে পুলিশ যখন সন্ধ্যায় সর্বশরীর জলে কাদায় মাখা, চোখ-মুখ রক্তবর্ণ ফটিককে মামার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়, মামী বলেন 'কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ।...'. ফটিক কেঁদে ফেলে 'আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।' জ্বর বাড়ে ফটিকের, সারারাত সে প্রলাপ বকে। বিশ্বম্ভরবাবু লোক পাঠিয়েছেন ফটিকের মাকে আনতে ; আরো একদিন কেটে যায়। মা এসে পৌঁছনোর পরে আর বেশিক্ষণ ফটিকের জ্ঞান ছিল না।

এ-বালক বড় ছুটির পিয়াসী। কলকাতার স্নেহহীন দেওয়ালের রুদ্ধতার মধ্যে 'প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দলবল উপদ্রব স্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।' শিক্ষকদের শাসনে কলকাতার স্কুলে বেশিরভাগ দিনই খেলার ছুটি পেত না ফটিক। মার খেত। 'ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত ; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।' মৃত্যুর আগে মার কণ্ঠস্বর শুনে শেষ কথা সে বলে 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

অনুভবের প্রাচুর্যে ফটিক ভরপুর, সে নির্বোধ নয় ; তার শুধু প্রকাশের ভাষার অভাব। সে ভাষা যদি থাকত, তবে জীবন আর কল্পনায় পরিপূর্ণ আরেক বালকের মতো সেও বলতে পারত '...পুজোর ছুটির দিনে যেদিন

সকালে দশটা বাজবে, কাউকে ইস্কুলে যেতে হবে না, ছেলেরা সবাই যেদিন গেছে রথতলার মাঠে ব্যাটবল খেলতে, সেইদিন আমি খেলার মতো করেই মিলিয়ে যাব আকাশে, ছুটির দিনের রোদ্দুরে।' কিন্তু ফটিকের এই অব্যক্ত ইচ্ছে দীর্ঘনিঃশ্বাসই থেকে যায়। তার মৃত্যুর দিনটি শ্রাবণের অবিরাম বর্ষায় বিষণ্ণ; আর কার্তিকের সেই ঝলমলে পুজো, যে ছুটিতে ফটিকের বাড়ি যাওয়ার কথা, তাও তার নাগালের বাইরে।

মৃত্যুর বিশ্বপ্রাকৃতিক ব্যাখ্যায় ফটিকের পরিণাম যে বিস্তার লাভ করে, তা অসাধারণ। ফটিক প্রলাপের মধ্যে সুর করে বলে, "এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে-এ-এ না।' কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টিমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।" অসীম আকাশ অথবা কূল ছাপানো দিগন্ত ছোঁওয়া জলের ব্যাপ্তি—কোনো এক অতলান্তেই তো একাকার করতে হবে প্রাণে ভরপুর বালকের এই অকালমৃত্যু। যে জীবন ফটিক চেয়েছিল, সে জীবন সে পায় নি। যে ছুটি তার জীবনে হল না, মরণে সে ছুটিই বুঝি আসে বিশ্বব্যাপী রূপ নিয়ে। তবু মৃত্যু তো মৃত্যুই; একদিকে তা যেমন ক্লিষ্ট রুদ্ধ জীবনের একমাত্র নিষ্পত্তি, অন্যদিকে আকাঙ্ক্ষিত জীবনের অস্বীকৃতিও বটে। তাই ফটিকের অকূল সমুদ্রযাত্রা গৌণ জীবন ফেলে রেখে পরম ব্রহ্মের কাছাকাছি যাওয়া, এ ধারণায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শন সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। মনে পড়ে 'সে'-র প্রৌঢ় দাদামশাই আদরের নাতি ধীরুর মৃত্যু দেখছে সাতদিন সাতরাত ধরে। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মহিমায় চলে যান, 'ওগো শান্তি, ওগো রাত্রি, তুমি আমার দিদি, আমার অনাদিকালের দিদি, দিন অবসানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার বুকের কাছে আমার ধীরু ভাইকে, তার সকল জ্বালা যাক্ জুড়িয়ে একেবারে।' কিন্তু যে রাত্রির দিকে তাকিয়ে এ-কথা বলতে পারেন দাদামশাই, সে স্নিগ্ধ, কালো, স্তব্ধ রূপের কাছে পৌঁছনো যায় এমন-এক দিন পেরিয়ে, যেদিন 'ছিল অত্যন্ত গরম, রৌদ্র প্রখর। দূরে একটা কুকুর করুণ সুরে আর্তনাদ করে উঠছিল—শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। বিকেলে রোদ পড়ে আসছে, পশ্চিম দিক থেকে ডুমুর গাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার উপরে। পাড়ার গয়লানী এসে জিগেস করলে, তোমাদের খোকাবাবু কেমন আছে গা। আমি বললুম, মাথার কষ্ট

গা জ্বালা আজ কমেছে। যারা সেবা করছিল তারা আজ কেউ কেউ ছুটি নেবার অবকাশ পেলে। দুজন ডাক্তার রুগী দেখে বেরিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে কি পরামর্শ করলে, বুঝলেম আশার লক্ষণ নয়। চুপ করে বসে রইলুম, মনে হল, কি হবে শুনে।'

আটপৌরে বাস্তবের পার্থিব, কঠিন চেহারাটা মনের গভীরতায় অনুভব করে, তবেই রবীন্দ্রনাথ সেই রাত্রির কাছে যান। অন্ধকারের কাছে অন্তিম নিবেদনের আগে পাড়ার গয়লানীর যে সরল প্রশ্নের মুখোমুখি হন ধীরুর দাদামশাই, তা যেন জীবন-মরণের আরেক স্তর আমাদের চেনাল। এ দর্শনের মনন যাঁর আছে, তাঁর কাছে মৃত্যু কেমন করে শুধু পরমব্রহ্মে বিলীন হওয়ার অর্থ পায়? ফটিকের মতো শিশু-মনের 'তাইরে নাইরে নাইরে না' সুরটি রবি ঠাকুরের অজানা ছিল না। সে-সুর যাতে চার দেয়ালের রুদ্ধ পরাধীন শিক্ষায় বেসুরের কাছে হার না মানে, তার প্রচেষ্টাও তিনি করেছেন। অসামান্য কবি-প্রতিভা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ কত বাধা-বিপর্যয় তুচ্ছ করে বিশ্বভারতী গড়তে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শন ব্যাখ্যায় ইহলোকের গৌণতা, পরলোকের উৎকর্ষে জোর পড়েছে বারবার; ভাবা হয় নি জীবনের কাছে এতখানি প্রত্যাশা, নির্মাণের এই সাহসী ইচ্ছা যাঁর, তিনি আজীবন জীবনকে গৌণ ভাববেন, একি সম্ভব! রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য, সংগীতের বিরাট অংশে, ব্রহ্মোপাসনার মতো কিছু প্রবন্ধে সমসাময়িক এবং পরবর্তীদের এই ব্রহ্মচিন্তায় সুবিধা করে দেন; কিন্তু এ তো তাঁর বিরাট কীর্তির অংশমাত্র।

জীবনভোর রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, শান্তিনিকেতনের প্রসাদেও ফটিকদের অনেককেই বাঁচানো গেল না। সমাজপরিপার্শ্ব বাধ সাধল। এ এমনই সমাজ, যেখানে সৎ, শুভ, হিতাকাঙ্ক্ষী মনের পরাজয় অনিবার্য; এ এমনই সমাজ, যেখানে মানুষ আদর্শ বা সত্যকে স্বীকৃতি দিতে একা একা মরে, তবু বুঝি জীবন সেই মানুষকে স্বীকৃতি দেয় না। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ এমন মানুষের চরিত্র কল্পনা করেছেন। দেখেছেন তাদের মৃত্যুও। ফটিকের মতো বালকের মৃত্যুকে বিশ্বপ্রকৃতির উপমায় অসীম করে দিতে সহায়ক হয় বালকের অনাহত বাল্য, তার পরম জিজ্ঞাসায় ভরা মন। কিন্তু যে মন সত্যবাদিতা, অথবা সততার অপরাধে ক্লান্ত, জর্জরিত, যে জীবনের অভিজ্ঞতায় আছে সমাজ-সংসারের সীমা, তার ক্লেদ আর মিথ্যা, তার মৃত্যু জীবনের নিষ্পত্তি, না কি জীবনের অস্বীকৃতি, এ

প্রশ্নের মীমাংসা আরো জটিল। এ জটিলতাকে লেখক অস্বীকার করেন না। তাই 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' (১২৯৮ ?) এবং 'দান-প্রতিদান' (চৈত্র, ১২৯৯) গল্পে মৃত্যু আরেক মাত্রা পেল।

ফটিকের গল্প 'ছুটি'র (পৌষ, ১২৯৯) কিছু আগে পরে এ-কাহিনী দুটির রচনা। দুটি কাহিনীবিন্যাসে মিল আছে, সাদৃশ্য আছে দুটি মৃত্যুতেও। রামকানাই এবং শশিভূষণ, উভয়ের কাছেই মরণ আসে প্রায় ইচ্ছামৃত্যুর মতো। রামকানাইয়ের পরিণাম অবশ্য বেশি নিষ্ঠুর, শশিভূষণের মৃত্যুতে তবু প্রসাদ ছিল।

রামকানাইয়ের দাদা গুরুচরণ মৃত্যুকালে সব সম্পত্তি উইলে নিজের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বরদাসুন্দরীকে দিয়ে যান। উল্লেখযোগ্য এ-উইলের লেখক এবং একমাত্র সাক্ষী ছিলেন রামকানাই। রামকানাইয়ের স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র নবদ্বীপের ধারণা ছিল, অপুত্রক গুরুচরণ সম্পত্তি ভাইপোকে দিয়ে যাবেন। তাঁরা আশাহত, নির্লজ্জরকম বিরক্ত ; নবদ্বীপ তো বলে বসল, জ্যাঠার মুখাগ্নি সে করবে না। নবদ্বীপের মা স্বামীকে বলেন …'তুমি বড় ভালো মানুষ, তুমি কিছু বোঝ না ; দাদা বললেন "লেখো', ভাই অমনি লিখে গেলেন।…" রামকানাই যথাসম্ভব ধীরস্থিরভাবে উইলটি বৌদিকে দিয়ে এলেন। বন্ধুর পরামর্শে, যার সাহায্যে নবদ্বীপ কিছুকালের জন্য বাপকে কাশীতে পাঠাল—তাতে নাকি হারানো সম্পত্তি ফিরে পেতে সুবিধা হবে। যখন বরদাসুন্দরী ও নবদ্বীপ পরস্পরের নামে উইল জালের মামলা আনল, স্ত্রী স্বামীকে কাশী থেকে ফিরতে আদেশ দেন। বরদাসুন্দরীর পক্ষে একমাত্র সাক্ষী নবদ্বীপের বাপ। সে উইলে গুরুচরণের সই কারো বুঝবার সাধ্য নেই। নবদ্বীপের উইলে হস্তাক্ষরে অসত্য প্রমাণের কোনো উপায় নেই ; থাকবার মধ্যে আছে বরদার এক মামাতো ভাই, যে সাক্ষ্য দেবার আশ্বাস দিদিকে দিয়েছে। রামকানাই ফিরে এসে, সব দেখে শুনে হাহাকার করে ওঠেন 'তোরা এ কী সর্বনাশা করিয়াছিস্।' কিন্তু তাঁর স্ত্রীর যুক্তি অকাট্য '…এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক-কথায় ছেড়ে দেবে!' রামকানাই আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন।

মোকদ্দমার দিন, দেখা গেল, বরদাসুন্দরীর সেই ভাইটিকে নবদ্বীপ ভয় ও প্রলোভনে বশীভূত করেছে ; সে দিদির বিপক্ষে সাক্ষী। শীর্ণ বৃদ্ধ রামকানাই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন '…আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল

করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।' স্বাক্ষীর কাঠগড়াতেই রামকানাই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। চতুর ব্যারিস্টার দাবি করে, তার অসাধারণ জেরাতেই বৃদ্ধ স্পষ্ট উত্তর দিতে বাধ্য হলো। বরদা ভায়ের কাছে শোনে, রামকানাই সব মাটি করেছিল, সেই সাক্ষ্য দিয়ে দিদির সম্পত্তি রক্ষা করেছে। বরদা ভাবে, মানুষ চেনা বড় কঠিন, বুড়োকে সে ভালো বলে জানত। নবদ্বীপ জেলে যায়। আদালত থেকে বাড়ি ফিরে রামকানাই জ্বরবিকারে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মৃত্যুর আগে প্রলাপে সে পুত্রের নামই করেছিল। তার মৃত্যুতে 'আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল, "আর কিছুদিন পূর্বে গেলেই ভালো হইত"—কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।'

কাহিনীর শেষ পংক্তিতে পরিণামের অসহনীয় নিষ্ঠুর রূপ ধরা পড়ে। সেই নিষ্ঠুরতার মধ্যেও কিন্তু রামকানাই আর করুণার পাত্র নয়। গল্পের বুনোটে তার নিরীহ চরিত্রে পাঠকের অনুকম্পা হবে। বরদাসুন্দরী যখন উইল হাতে বিলাপ করেছিল '...ওগো আমি কেন আগে গেলুম না গো—আমি কেন বেঁচে রইলুম।' রামকানাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভেবেছিল 'সে আমাদের কপালের দোষ।' অর্থের প্রয়োজন রামকানাইও বোঝে। নিজের স্ত্রীর সামনে তো তাকে দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন বলে বোধ হয়। আদালতে সত্য ভাষণের পরে এ-হেন রামকানাই পরিপার্শ্বের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কামনাই করতে পারে—নিজের মৃত্যুকামনা। কিন্তু মরেও সে জীবিতের উষ্মা থেকে মুক্তি পায় না। নিন্দা থেকেও নয়। কেউ বুঝল না, কতখানি কঠিন কাজ সে করেছিল। তবু তার সত্যভাষণ ও তার মৃত্যু তাকে করুণার চেয়ে অনেক বড় সম্মান দেয়। মরণকে প্রশান্ত মুক্তিতে পায় নি রামকানাই; তবে যন্ত্রণার যে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ সহ্য করে জীবন থেকে মরণে পৌঁছলো মানুষটা, তাতে সে সত্য করে তোলে এ কাহিনীকারেরই শেষ-জীবনের কয়েকটি পংক্তি, 'লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত / সত্যেরে সে পায় / [illegible] আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে। / কিছুতে পারে না তারে [illegible]কতে, / শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে / আপন ভাণ্ডারে।'

শশিভূষণের জীবনে প্রসাদ এর চেয়ে বেশি ছিল। যদিও শশিভূষণের স্ত্রী ব্রজসুন্দরী রাধামুকুন্দর স্ত্রী রাসমণিকে খোঁটা দিতে ছাড়েন না, যে তাঁর স্বামীর রোজগারেই সংসার চলছে। ব্রজসুন্দরীর রাগের অনেক কারণ;

তাঁর স্বামী গ্রাম সম্পর্কিত ভাই রাধামুকুন্দকে সহোদরেরও বেশি মর্যাদা দেন, যে কোনো কাজেই পরামর্শ চান ভাইয়ের, দেওয়া থোওয়ার ব্যাপারে যে জিনিসটা একজোড়া মেলে না সেটা স্ত্রীকে বঞ্চিত করে রাসমণিকেই দিয়ে থাকেন। বড় জা'র ব্যবহারে রাসমণি অপমানিত, তার কান্নায় স্বামীর নিদ্রায় ব্যাঘাত হয়। রাধামুকুন্দ দাদাকে বলে, ভিন্ন সংসারে যাবে। দাদা বলেন, ভাইকে ছেড়ে তাঁর কোনো শান্তি নেই। ঢিলে-ঢালা মানুষ শশিভূষণ রাধামুকুন্দকেই সব কাজকর্ম দেখাশুনোর ভার দিয়েছিলেন। ব্রজসুন্দরীর ধারণা, নিরীহ দাদার টাকা ভাই অপব্যবহার করে ; এ ধারণার পক্ষে প্রমাণ না পেয়ে তাঁর আক্রোশ ও বাক্যবাণ বেড়েই চলে। রাসমণি তো বটেই, অমন যে শান্ত প্রকৃতি রাধামুকুন্দ, তারও মাঝে-মধ্যে অসহ্য ঠেকে।

একদিন শশিভূষণের একমাত্র জমিদারি পরগনা এনাৎশাহী খাজনার দায়ে নিলেম হয়ে গেল। রাধামুকুন্দ খাজনার টাকা ঠিকই পাঠিয়েছিল, পথে ডাকাত তা লুটে নেয়। ভাই বলে তারই দোষে সম্পত্তি গেল, দাদা প্রতিবাদ করেন। রাধামুকুন্দ নিকটবর্তী শহরে মোক্তারি শুরু করল, কিছুদিনের মধ্যে পসার জমে গেল তার। সংসারের খরচ এখন সেই বহন করে ; সব টাকা তুলে দেয় ব্রজসুন্দরীর হাতে। দশবছর পরে রাধামুকুন্দ দাদার সেই হারানো সম্পত্তি আবার ফিরিয়ে আনে। এই দীর্ঘ সময় ধরে দাদার শারীরিক অবনতি, মানসিক বিষাদ তার নজর এড়ায় নি ; বার বার সে সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের আশ্বাস দিয়েছে। আজ যখন সত্যিই হারানো ধন ফিরে পাওয়া গেল, গ্রামের লোক আনন্দের সঙ্গে শশিভূষণের কাছে একটা ভোজ চেয়ে বসে। তিন-চারদিনব্যাপী সমস্ত গ্রামবাসী পরিতৃপ্তি করে খেয়ে গেল, কাঙালিরা কাপড়-পয়সা পেল। আর রাধামুকুন্দর দাদা এ ক-দিনের পরিশ্রমে, অনিয়মে শয্যা নিলেন। অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে প্রবল জ্বর।

রাধামুকুন্দ সম্পত্তির ভাগবণ্টন নিয়ে দাদার পরামর্শ চাইল। দাদা বলেন '...আমার কি আছে যে কাহাকে দিব।...এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।' রাধামুকুন্দ সেই প্রথম স্বীকার করল দাদার কাছে, সদর-খাজনা লুট করিয়ে সে নিজেই দাদার সম্পত্তি নিলেম করিয়েছিল। ধনী-দরিদ্রের যে ভেদাভেদ দু-ভায়ের আন্তরিক মিলকে বারবার ক্লিষ্ট করছিল সংসারের অসংগতিতে, তা যেন চিরতরে লুপ্ত হয়, দাদার সঙ্গে যেন তার বিচ্ছেদ না ঘটে এই ছিল তার উদ্দেশ্য। দাদা বলেন 'ভাই, ভালোই করিয়াছিলে। কিন্তু যে জন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল। কাছে কি

রাখিতে পারিলে।...' ডাক্তার যে তখন প্রায় জবাব দিয়ে গেছে, শশিভূষণের ব্যামো বড় শক্ত। কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনায় আকুল হয়ে ওঠে রাধামুকুন্দ। শশিভূষণের তখন বাক্‌রোধের পূর্বমুহূর্ত ; কোনোমতে বলেন যে, প্রথমদিন থেকেই তিনি সব জানতেন, যাদের সঙ্গে রাধামুকুন্দ ষড়যন্ত্র করেছিল, তারাই শশিভূষণকে বলে দেয় ; সেইদিন থেকেই দাদা ভাইকে ক্ষমা করেছেন। ভাই কেঁদে বলে, ক্ষমা যদি করেছেন, তবে যেন সম্পত্তি গ্রহণ করেন তিনি, রাগ করে ফিরিয়ে না দেন। 'শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না— ... রাধামুকুন্দের মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণহস্ত তুলিলেন। তাহাতে কি বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবে।'

রাধামুকুন্দ যা করেছিল, সংসারে তাতে শান্তি এসেছিল ঠিকই। কিন্তু সেই সম্পত্তি নিলেম হওয়া থেকে শশিভূষণের সদাপ্রশান্ত হাসির আড়ালে যে বিষাদ থাকত, তার কারণ জানা গেল একেবারে শেষে। রাধামুকুন্দর বহু বিনিদ্র রাতের অস্থিরতাও বুঝি এখানেই শেষ—তার স্বীকারোক্তিতে। এ স্বীকারোক্তির জন্য দাদার মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। মুমূর্ষু শশিভূষণের নির্বাক প্রস্তুতি রাধামুকুন্দকে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। অন্যদিকে ভাইয়ের সঙ্গে সেই সনাতন সম্পর্কে ফিরে যাওয়া অসম্ভব বুঝেছিলেন দাদা। রাধামুকুন্দর কৃতকর্মের কথা জেনে ক্ষমা তিনি ঠিকই করেছিলেন ; তবু সে ক্ষমার অনুভবে একাকার হয়েছিল এক অমোঘ যন্ত্রণাবোধ—ভাইয়ের মুখ থেকে সব কথা শুনবার অপূর্ণ আশা। শশিভূষণের মৃত্যুশয্যায় রাধামুকুন্দ নিজেকে প্রকাশ করে ; সেই সনাতন ভাই যেন ফিরে আসে দাদার কণ্ঠরুদ্ধ কথাটিরও অর্থ বুঝে নিতে। 'দানপ্রতিদান'-এর পরিণাম তাই পরিণত মৃত্যুর প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয় না।

রামকানাই অথবা শশিভূষণের পরিণাম রবি ঠাকুরের ইচ্ছে ভরা আকাশে যে সুর যোজনা করল, দীর্ঘনিঃশ্বাসেই তার বিস্তার। এ নিঃশ্বাস না মেটা স্বপ্নের জন্য হাহাকার নয়। তিক্ততা আর ক্লেদকে বয়ে বেড়ানোর গ্লানি, সারাজীবন সে গ্লানির সঙ্গে বোঝাপড়ার অনিশ্চয় আর ক্লান্তি—এ-সব পেরিয়ে ওই দীর্ঘনিঃশ্বাসে পৌঁছতে পারে মানুষ। শিল্প ও জীবনের দর্পণে বাঁচামরার এই চেহারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন লেখক, তাই হয়তো লিখেছিলেন, 'মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা তো নেই।' [চিঠিপত্র-১, পৃঃ ১৯]

সম্পত্তির মূল মানবিক অসংগতির চেহারা লেখকের কাছে অস্পষ্ট নয়।

তাই সম্পত্তি থাকা-না-থাকার দ্বন্দ্বকে মানবিক সম্পর্কের দর্পণে দেখার যন্ত্রণা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। জীবনে এ যন্ত্রণার কোনো উপশম তাঁর জানা ছিল না। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত যে-সব শ্রেণী-সচেতন তত্ত্ব শ্রেণীমুক্ত হওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছে, তারাই কি পারে সবসময় জীবনে এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে? তেমন কোনো তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তাতীত ছিল। কিন্তু যে সামাজিক, মানবিক বোধে তাঁর গভীর অনুভূতি সমৃদ্ধ, তাতে যন্ত্রণার ওই ক্রূর অথচ করুণ চেহারা যে তাঁকে আকুল করবে, এ স্বাভাবিক। তাই বুঝি অনেক পরবর্তী গল্প 'ভাইফোঁটা' [১৩২১]-র শেষে লিখতে পেরেছিলেন সেই মর্মান্তিক কথা, 'কিন্তু টাকায় তো মানুষ বাঁচে না।' মনের এই তীব্র অনুভবেরই প্রকাশ 'রামকানাইয়ের নিবু‌র্দ্ধিতা' অথবা 'দানপ্রতিদান' এর মতো কাহিনী। নিদারুণ যন্ত্রণার একমাত্র নিরাময় আসে মৃত্যুতে। জীবনে সম্পত্তি ও সম্পর্কের জটিল বিরোধ এতখানি কঠোর বাস্তবতায় গ্রথিত করেন রবীন্দ্রনাথ, যে, রামকানাই অথবা শশিভূষণের মৃত্যুর অমোঘ বর্ণনায় তিনি পলাতক নন, বরং অকপট এক প্রশ্নকার। নবদ্বীপের বাপ, রাধামুকুন্দর দাদা মরণে যে শান্তি পেয়েছিল সে নিশ্চয়তার কি মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পথ আছে? এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর তো আজও আমাদের জানা নেই।

কাছাকাছি সময়েরই গল্প 'জয়পরাজয়' (কার্তিক, ১২৯৯), যেখানে দেখি স্বভাবকবির সহজাত কল্পনা আর মাধুর্য জ্ঞানীর অধীত জ্ঞানের কাছে পরাজিত, অপমানিত। রাজা উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর যে কাব্য রচনা করত, তাতে হৃদয় ছিল, আবেগ ছিল, সারল্য ছিল, বিমূঢ়তা, প্রেম, ভক্তি, সবই ছিল। শেখর রাজসভায় এমন কণ্ঠে কবিতা পড়ত, যাতে উপরিতলের প্রাসাদে রাজকন্যা অপরাজিতার কানে সে সুর পৌঁছয়। অপরাজিতাকে কবি চোখে দেখেন নি, ছায়ায় ধ্বনিতে মেশানো এক কল্পনার মতো অনুভব করেছেন। কবির সঙ্গে চাক্ষুষ সম্পর্ক ছিল রাজকন্যার দাসী মঞ্জরীর, শেখরের কাছে যে 'বসন্তমঞ্জরী', বসন্ত বর্ণনার কাব্যে যার আভাস থাকত 'মঞ্জুলবঞ্জুলমঞ্জরী'তে। শেখরের কাব্যে রাজা-প্রজা সবাই মুগ্ধ, তার মঞ্জরীপ্রীতিতে দেশের লোক, এমন কি রাজারও আমোদ।

এমন সময় দেশে এলেন ভুবনবিজয়ী জ্ঞানী কবি পুণ্ডরীক; রাজার সভাকবিকে আহ্বান করলেন কাব্যযুদ্ধে। রাজসম্মান রক্ষায় এ-যুদ্ধে শেখরকে লড়তেই হবে। কিন্তু স্বভাবকবি শেখর আজ পর্যন্ত শুধু অপরাজিতার প্রাসাদের দিকে চেয়ে, মঞ্জরীর সান্নিধ্য পেয়ে, রাজা-প্রজার

মনোরঞ্জন করতে গান বেঁধেছে, কাব্যযুদ্ধ কাকে বলে, সে জানে না। পুণ্ডরীক রাজার স্তবগান করে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে অসামান্য জ্ঞানের প্রসাদে ; শেখরের পুঁজি শুধু ভক্তি আর স্বভাবকবির মাধুর্য। ভক্তি ও যুক্তির এই বিতর্ক, কল্পনা ও জ্ঞানের এই বিরোধ চলে তিনদিন ধরে। শেষদিন ক্লান্ত শেখর বলে ওঠে 'বীণাপাণি শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী তাহাদের কি গতি হইবে।' পুণ্ডরীক শেখর শব্দের শেষ দুটি অক্ষর ব্যবহার করেন জবাবে 'পদ্মবনের সহিত ঘরের কী সম্পর্ক এবং সংগীতের বিস্তর চর্চা সত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফললাভ করিয়াছে। আর, সরস্বতীর অধিষ্ঠান তো পুণ্ডরীকেই, মহারাজের অধিকারে তিনি কী অপরাধ করিয়াছিলেন যে এ দেশে তাঁহাকে খরবাহন করিয়া অপমান করা হইতেছে।' পুণ্ডরীকের জ্ঞানে, শেখরের অজ্ঞতায় পণ্ডিতেরা বিমূঢ়, প্রফুল্ল। সবাই বোঝে, শেখরের কবিতা কাব্যই নয়, তা যে কেউ লিখতে পারে। আর মহারাজ উদয়নারায়ণ পুণ্ডরীকের শেষ জবাবে শেখরকে নিরুত্তর দেখে গলার মুক্তাহার পরিয়ে দেন জ্ঞানী কবির কণ্ঠে।

সে রাত্রে নিজের এতদিনের লেখা কাব্যগ্রন্থসমূহ শেখর আগুনে নিক্ষেপ করে। প্রিয় ফুল দিয়ে রচনা করেছে সে নিজের শয্যা; শুয়ে পড়ে। রাত্রির অন্ধকারে রাজকন্যা অপরাজিতা এসে কবিকে নিজের গলার ফুলের মালা পরিয়ে দেন, 'রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।' মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়ে গেলেন।

শেখরের সৃষ্টির সবকটি আশ্রয় আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তার আবেগ পরাভূত, কল্পনা অপমানিত, সমগ্র শিল্পীসত্তা অনিশ্চিত। এই মুহূর্তে মৃত্যু ছাড়া কবির সামনে আর কোনো পথই খোলা থাকে না। শেখরের পরিণামের এই ব্যাখ্যা গল্পের গতিতেই ব্যাহত; বীণাপাণির বন্দনা করতে করতে শেখরের মনে হয় 'যেন শ্বেতভুজা বীণাপাণি নত নয়নে রাজান্তঃপুরের জালায়ন-সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।' তবে কি শেখরের কল্পনায় অপরাজিতা ছিলেন দেবী বীনাপাণিরই স্বরূপ? তবে রাজকন্যা যখন কবিকে কণ্ঠহারে ভূষিত করলেন, তা কি শুধু শেখরের অপরাজয় বোঝালো? অথচ কৃষ্ণের বাঁশির গান গাইতেও তো শেখরের অনুভবে আসে এক জ্যোতির্ময়ী মানসীমূর্তি, কমলচরণের নূপুরধ্বনি। অদেখা, অচেনাকে

বঞ্চনা করবার যে ছবি রবীন্দ্রসাহিত্যের এক অন্তরঙ্গ অধ্যায়, 'জয়পরাজয়' গল্পে তার প্রকাশ কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। পুরো কাহিনীতে কবির বসন্তমঞ্জরীর অংশটিও তো অস্পষ্ট থেকে গেল। মঞ্জরীর এই অস্পষ্ট অস্তিত্ব এবং বিশেষত রাজকন্যা অপরাজিতার বিন্যাস এবং শেষে আগমন কাহিনীর পরিণতির পথে বাধা। অপরাজিতা এবং মৃত্যু এ দুয়ের প্রায় একই সঙ্গে আসা গল্পের সম্ভাব্য তাৎপর্য বিব্রত করে। লেখক যদি শুধু মৃত্যুকে বেছে নিতেন, অর্থের ব্যঞ্জনায় নিশ্চিতি থাকত।

'জয়পরাজয়' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয় তার (শেখরের) বিয়ে হত, কিন্তু তার পূর্বেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার অত্যন্ত ভুল হয়েছিল, কিন্তু সে আর এখন শোধরাবার উপায় নেই। যে-খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম করে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার হয়েছিল' [ভানুসিংহের পত্রাবলী, পৃঃ ৭]। এ উক্তির দুটি ভিন্ন তাৎপর্য হতে পারে। প্রথমত, শেখরের মৃত্যুকে যদি-বা লেখক অস্বীকার করেন, রাজকন্যা অপরাজিতা সর্বদাই তার প্রেমময় অস্তিত্ব নিয়ে স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, জীবনের প্রতি অশেষ ভালোবাসার দাবিতে হয়তো রবীন্দ্রনাথ এমন বাঁচাকে মূল্যহীন ভেবেছিলেন, যেখানে কবি তার কবিত্বের গভীরতা নিয়েও শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করতে বিপর্যস্ত। মরণ সেখানে জীবনের চেয়ে সম্মানের। রাজকন্যার অস্তিত্বটা হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। উক্তিটির প্রথম অংশে প্রথম বিকল্পটি মনে আসে। কিন্তু গোটা উক্তিতে, বিশেষত শেষ পংক্তির নির্মম বিদ্রূপে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও স্পষ্ট হয়। ভাববাদের আড়াল যদি কাহিনীর অর্থে অস্পষ্টতা রেখে দেয়, লেখক গল্পটির প্রতি অবিচার করেন। 'জয়-পরাজয়' প্রসঙ্গে এ-কথা অনস্বীকার্য। মরণকে প্রত্যক্ষ করায় লেখকের যে গভীর অনুভবের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তা থেকে রবীন্দ্রনাথের বিচ্যুতি ঘটে এই গল্পে। এ-বিচ্যুতির মূলে, বোধ করি, রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ।

গল্পগুচ্ছে মৃত্যুকে এমন ভাবেও দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, যে মরণ শুধু এক রোমান্টিক গল্পের বিয়োগান্তক পরিণতি মাত্র। যে শ্বাসরুদ্ধকর অসহ্য নীরবতায়, কিংবা তীব্র হাহাকারে তিনি মৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে দেখান, তা আশ্চর্য রকম অনুপস্থিত সেখানে। সদ্য পাশ করা কলকাতার ডাক্তার যতীন বড় লাজুক, আবাল্য গম্ভীর; তার প্রায় সমবয়সী জ্যাঠতুতো দিদি পটল, স্বভাবে যে যতীনের একেবারে বিপরীত, পশ্চিমে থাকার সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত একটি মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছিল—কুড়ানি। পটলের বাক্যবাণে জর্জরিত

যতীন বলে, এর পর যে মেয়েকে চোখে দেখবে, তার গলাতেই মালা দেবে। পরিহাস ছলে পটল হাজির করল কুড়ানিকে। কুড়ানি নির্বোধ, কৈশোর যৌবনের স্বাভাবিক লজ্জাবোধ থেকে বঞ্চিত। তার মুখ হরিণীর কথা মনে আনে। কুড়ানি ঠাট্টাকে ঠাট্টা বলে নিতে জানে না, লজ্জা পেতে জানে না। যতীনের উপর পটল উপদ্রব শুরু করল। কুড়ানিকে শুধোয়, যতীনকে সে বিয়ে করতে রাজি কিনা, কুড়ানি গম্ভীরভাবে সম্মতি দেয়। যতীনের খাওয়ার সময়, কুড়ানিকে পাখা হাতে মাছি তাড়াতে পাঠিয়ে, বিকেলে কুড়ানির হাতে তাকে চা পাঠিয়ে পটল মজা দেখে। সরল সে, কোনোদিন তার কৌতুকপ্রিয়তাকে কেউ হাসিঠাট্টার উপরে জায়গা দেয় নি ; পটল তেমন কিছু দাবিও করে নি। বোঝেনি সে, কুড়ানি তার অজ্ঞানতার গভীরে এ খেলাকে সত্য বলে ভাববে।

কিন্তু কুড়ানি ভুল করে বসে। যেদিন কুড়ানিকে একটি বকুলের মালা হাতে পটল যতীনের ঘরে পাঠায়, মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে তার বুদ্ধিহীনতাকে বেশি তিরস্কার করতে পারে না যতীন। কিন্তু দিদির বাড়ি ছেড়ে পালায়। যতীন বুঝেছিল, কাজটা ঠিক হচ্ছে না, পটলকেও বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছু গম্ভীরকে বুঝতে পটলের চিরদিনই ভীষণ আপত্তি। যখন যতীনের নিঃশব্দ পলায়নের একদিন পরে কুড়ানিকেও আর তার পটলদিদির বাড়িতে দেখা গেল না, দেরিতে হলেও, পটল বুঝল।

কলকাতায় প্লেগ হাসপাতালে যতীন কাজ নিয়েছিল। সেখানে প্লেগ সন্দেহে কুড়ানিকে পথ থেকে কুড়িয়ে আনা হয়। বহু চেষ্টা করেও পটল কুড়ানির কোনো খোঁজ পায় নি এতদিন। যতীন তাকে খবর দেয়। অনেক কষ্টে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মত করিয়ে নিয়ে আসে কুড়ানিকে সে নিজের বাড়িতে। কুড়ানির গলায় তার বহুদিন আগের গাঁথা শুকনো বকুলের মালা। দুর্ভিক্ষের পর থেকেই মেয়েটির পেটে শূলবেদনা হত ; এখন তার নাড়ির যা অবস্থা, বাঁচবার আশা নেই। যতীনের মুখে ভালোবাসার স্বীকারোক্তি শুনে, তার গলায় বকুলের শুকনো মালা পরিয়ে কুড়ানি মারা যায় রাত্রি ভোর না হতেই। ভোরের আলোয় তার 'শান্ত স্নিগ্ধ মৃত্যুছবি'র দিকে তাকিয়ে যতীনের মনে হয় যাঁহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।'

আশ্চর্য অবাস্তব কাহিনী এই 'মাল্যদান' (চৈত্র, ১৩০৯)। একটি রোগক্লিষ্ট, অসহায় মেয়ে মরতে চলেছে ; সেই সময় পটল, যে তাকে পরম স্নেহ করত, আর যতীন, 'যার মমতাও কিছু কম ছিল না, কেমন করে ওই

মাল্যদানের অনুষ্ঠানটি বেছে নেয়? অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণার মুখোমুখি গোটা ব্যাপারটা বড় বেশি সাজানো আর সহজ ঠেকে। যতীন একদিন ভেবেছিল 'যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। এই নিদারুণ ব্যপোরে সে কতবড়ো হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে লইয়া কি কৌতুক করা যায়। বিধাতা দয়া করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন—এই আবরণ যদি উঠিয়া যায় তবে অদৃষ্টে রুদ্রলীলার কী ভীষণ চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে।' কুড়ানির কথা ভাবতে ভাবতে, ফাল্গুনের কূজন-গুঞ্জন-মর্মরের চেয়ে জটিল ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখ কঠিন পৃথিবীর কথাই সেদিন যতীনের মনে হয়েছিল। দুর্ভিক্ষাক্লিষ্ট, অভিজ্ঞ মেয়েটি তো সত্যিই বড় হলো, যতীনের আশঙ্কাকে সত্যি করে। তার বোধ, অনুভব, যন্ত্রণা সবই দেখা দিল প্রকট হয়ে। সেই তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতে কুড়ানির মৃত্যু কেমন করে 'শান্ত স্নিগ্ধ মৃত্যুছবি'র চেহারা পাবে? দুঃখকঠিন জগতের বাসিন্দা কুড়ানি কি কেবল যতীনকে বকুলের মালা পরিয়েই শান্ত হতে পারে? এ যে শিল্প-মাধুর্যের আড়ালমাত্র। কুড়ানির মৃত্যুযন্ত্রণা অনেক কিছু না পাওয়ার হতাশায়, অনেক না মেটা ক্ষুধার হাহাকারে অসহনীয় হওয়ার কথা। সে হাহাকারের কোনো সরব অথবা নীরব অভিব্যক্তি 'মাল্যদান'-এ নেই। কুড়ানির ভিতর-বাইরের সৌন্দর্যকে রবীন্দ্রনাথ ফুলের আনত্যতা ছাড়া কোনো উপমায় মেলাতে পারেন নি। তাই যে কঠিন যন্ত্রণার বোধ ব্যাপ্ত হওয়ার কথা এ মৃত্যুতে, তা গল্পের নাগালের বাইরে থাকল; আর যতীন, যে সব থেকে গভীর ভাবে চিন্তা করেছিল কুড়ানির কথা, তার কাছেও এ-মৃত্যু শান্তস্নিগ্ধ মৃত্যু-ছবির রূপ পায়; নিজেকে ভাগ্যবান্ মানে সে, মৃত্যুপথযাত্রী কুড়ানিকে লাভ করার প্রসাদে।

ইচ্ছাপূরণের রূপকথা দিয়ে শেষ করলেন লেখক। কঠিনের মোকাবিলায় ফাঁক থেকে গেল। ইচ্ছে ভরা আকাশের সুরে 'মাল্যদান' তাই বেসুর ঠেকে। অথচ এ-কাহিনী যখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর জীবনের এক কঠোরতম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা তখন প্রায় সদ্য-স্মৃত। 'মাল্যদান'-এর সময় দেখি ১৩০৯-এর চৈত্র; সে বছরেরই অগ্রহায়ণ মাসে মারা গেছেন মৃণালিনী দেবী। তবে কি সদ্য-দেখা মৃত্যুর কঠিন চেহারা, আর তার মর্মন্তুদ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যুঝতে রবীন্দ্রনাথকেও পালাতে হয় 'মাল্যদান'-এর অবাস্তবে? জীবনে মৃত্যুর অতলান্ত শূন্যতা মর্মে মর্মে অনুভব করে অব্যক্ত যন্ত্রণার উপশমেই কি

মৃত্যুছবির শান্তস্নিগ্ধরূপে আশ্রয় চান লেখক? তবু কাহিনীতে অসঙ্গতির দায় কাহিনীকারেরই। প্রত্যক্ষ জীবনের দুঃখ-কঠিন সত্যকে যদি শিল্পে ইচ্ছাপূরণের সরলীকরণে ভুলে থাকতে চেয়ে থাকেন, প্রকৃত শিল্পীর কর্ম তো অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। অবশ্য এ এক অনুমিতিমাত্র। হতেই পারে, জীবনের কঠোর সেই অভিজ্ঞতা, আর কলমের এই সরল গল্প ছিল একেবারেই সম্বন্ধবিহীন।

অকালমৃত্যুর মর্মান্তিক প্রকাশই আবার রবীন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে দেয় সেই আকাশের বিস্তার। 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহ প্রশ্ন করেছিল 'জান কি একেলা কারে বলে।' উত্তরে অপর্ণা বলল 'জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে / দিতে চাই নিতে কেহ নাই।' এমনই একা ছিল 'শেষের রাত্রি' (আশ্বিন ১৩২১)-র মুমূর্ষু মানুষটি। ভালোবাসার অনুভবে পরিপূর্ণ মন নিয়ে সে মণির ভালোবাসা চেয়েছে। যতীন বিশ্বাস করত, প্রেমে কোনো জোর খাটে না। তাই বর্ষার জলে বারান্দা ভিজে গেলেও রাত্রির পর রাত্রি ঘরে না গিয়ে সেই বারান্দাতেই কাটিয়েছে যতীন। কত একাকী সন্ধ্যায় সে বিছানায় শুয়ে মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, কপালে মণির হাতের একটু স্পর্শ তার একান্ত কামনা। কিন্তু মণি তখন সঙ্গিনীদের সঙ্গে দল বেঁধে থিয়েটারে যাওয়ার আয়োজন করছে। যতীনের সঙ্গেই মণির যত কথার অভাব। বন্ধুদের সঙ্গে তার হাসি কথা তো ফুরোতেই চায় না। যতীন ভাবে, তারই দোষ, নিজের চাওয়ার ভুলে সে মণির মন পায় না।

যতীনের এই অব্যক্ত বেদনা আর কেউ না বুঝলেও, মাসি দেখেছেন। আজীবন তিনি যতীনকে পরম স্নেহে লালন করেছেন। আজ যতীনের মৃত্যু-শয্যার পাশে বসে মাসি মিথ্যের স্বর্গ রচনা করে যান। বলেন, মণিই দূর থেকে স্বামীর সেবাশুশ্রূষার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করছে। ডাক্তার তাকে এ ঘরে আসতে দেয় না—নরম মন তার, যতীনের কষ্ট দেখলে দুদিনে ভেঙে পড়বে। আসলে মাসির কথা অমান্য করে মণি তখন গেছে বাপের বাড়ি ছোট বোনের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে। যতীন যখন মণিকে একবার দেখার জন্য, একটি কথা বলার জন্য অস্থির হয়, মাসি তাকে নানা ছলছুতোয় ভুলিয়ে রাখেন। অন্ধকারে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে, যতীন তা দেখতে পায় না।

মাসির মুখে যে মিথ্যের স্বর্গ রচিত হয়, তা যতীন বিশ্বাস করছিল; মনে হচ্ছিল তার এতদিনের প্রতীক্ষা আজ সার্থক। অন্ধকার আকাশে দেখে যতীন '...তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।...

তাহাদের দুজনের মাথার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে।' মাসিকে যতীন বলে, '...আমাকে ভালো করে জেগে থাকতে দাও।...বৈশাখ দ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল—কাল সেই দ্বাদশী আসছে—কাল সেইদিনকার রাত্রের সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণির বোধহয় মনে নেই—আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে দিতে চাই; কেবল তাকে তুমি দু-মিনিটের জন্যে ডেকে দাও।...' মাসি উঠে যান মণির শোওয়ার ঘরে, ডাকেন, 'ওরে, আয়—একবার আয়—আয় রে রাক্ষসী, যে তোকে তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্—সে মরতে বসেছে, তাকে আর মারিস নে।'

অনেকক্ষণ পরে মাসি যখন ঘরে ফিরে আসেন, যতীন ইতিমধ্যে বাড়ির ভৃত্যটির কাছে শুনে ফেলেছে মণির বাপের বাড়ি যাওয়ার খবর। মাসিকে সে বলে, তার এক স্বপ্নের কথা; মণি যেন তার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দরজা ঠেলছিল; কিন্তু দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না। মণি তাই বাইরেই রইল। যতীনের অনেক ডাকেও এ ঘরের ভিতরে তার জায়গা হল না। অস্বাভাবিক জোর পায় যতীন, বলে 'মাসি, তুমি আমাকে দুর্বল মনে কর?—আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও?...এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেলুম না।...আসছে বারে মানুষ যে কী পারে তা আমি দেখাব।...আমি সেই জিনিস চেয়েছিলুম যার উপরে কারও স্বত্ব নেই—সমস্ত জীবন হাতজোড় করে অপেক্ষাই করলুম; মিথ্যাকে চাই নি বলেই এতদিন এমন করে বসে থাকতে হল—এইবার সত্য হয়তো দয়া করবেন।'...যতীনের পণ, সে কিছুতেই ঘুমোবে না; যদি এ ঘুম আর না ভাঙে। তার জেগে থাকা দরকার, মাসিকে সে বলে '...তুমি শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? ঐ যে আসছে! এখনই আসবে।'

এমন করেই রাজার আগমন অনুভব করেছিল অমল, বলেছিল '...ফকির, তাঁর বাজনা বাজছে, শুনতে পাচ্ছ না।' ভেবেছিল, রাজার কাছে অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটিকে চিনে নেবে। আর যতীন চেয়েছিল বৈশাখ-দ্বাদশীর তারায় ভরা আকাশের রূপ মণিকে নিজের চোখ দিয়ে দেখাতে, মণির চোখ দিয়ে নিজে দেখতে। মণি যখন সত্যিই ঘরে আসে, যতীন তখন সেই ঘুমের কিনারে যে ঘুম আর ভাঙে না। সে শুধু বলতে পারে, 'মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে।' যতীনের সব বাসনা, বেদনা, অঙ্গীকার

পৌঁছয় পথের শেষে ; সেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছয়। সেখানে বৈশাখ-দ্বাদশীর তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি উৎসব।

প্রেমের আকুতি রবীন্দ্রশিল্পের অনেকখানি জুড়ে আছে। যতীনকে দেখি, তার ভালোবাসা নিয়ে মৃত্যুশয্যাতেও অপেক্ষা করে। আজীবন সে ভালোবাসার প্রকৃত অনুভবে বিশ্বাসী ; স্বামীর অধিকার খাটিয়ে জোর দেখিয়ে মণির কাছ থেকে কিছু আদায় করতে চায় নি। তাই আজ জীবনের শেষেও অপূর্ণ প্রেমের স্মৃতিতে যতীন অস্থির, কিন্তু অবুঝ নয়। মাসির রূপকথার স্বর্গকে যে মুহূর্তে ইচ্ছেপূরণের গল্প বলে চিনতে পারে, এ জীবনে ভালোবাসা পাওয়ার আশা তার মিথ্যে হয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে দুটি সত্য —তার সারা জীবনের পথ-চাওয়া, ভালোবাসা আর তার আসন্ন মৃত্যু। ভালোবাসা না পাওয়ার যন্ত্রণাকে সে মেনে নেয়, কিন্তু মিথ্যেকে বরণ করে না। এখানেই 'শেষের রাত্রি' বিশিষ্ট। এ বৈশিষ্ট্যে সহায়তা করে গল্পের ধরতাই ; যা কোনো কাহিনী বিন্যাসে বা ঘটনাবলিতে বাঁধা নয়। শুধু একনিষ্ঠ এক প্রেমিক, নিজের নিঃসঙ্গ প্রেম নিয়ে জীবনের শেষ কথাগুলো বলছে। যতীনের জীবন ব্যেপে যে প্রশ্ন, মৃত্যু ছাড়া তার কোনো নিষ্পত্তি নেই ; লেখকও বেছে নিয়েছেন যতীনের মৃত্যুর সেই প্রহর। সেখানে 'শেষের রাত্রি' আর শুধু প্রেমের আকুতিতে সীমাবদ্ধ নয় ; একটি মৃত্যুই এখানে হয়ে ওঠে একটি কাহিনী। বড় কঠিন মৃত্যু যতীনের ; একদিকে তা যেমন না-মেটা সব ইচ্ছার যন্ত্রণায় একাকার, অন্যদিকে আবার প্রেমহীন এই জীবন থেকে মুক্তির প্রশান্তিতে পূর্ণ। দীর্ঘনিশ্বাসের যে আকাশে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় খোঁজেন মৃত্যুর উপমাতে, 'শেষের রাত্রি'র অভিজ্ঞতা তাকে আরো বিস্তার দিল।

মৃত্যুর শান্তি আর যন্ত্রণা একাকার করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'শেষের রাত্রি'র অনেক আগে লেখা একটি নির্মল আলেখ্য 'মাস্টারমশায়' (আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩১৪)-তে। অমোঘ যন্ত্রণা যখন অনির্বাণ বেদনায় রূপান্তরিত হয়, তখন মৃত্যুর উপমায় আকাশের বিস্তার সম্ভব। বিরাট বড়লোক অধর মজুমদারের একমাত্র পুত্র বেণুগোপাল ; বেণুগোপালের মাস্টারমশাই হরলালের মৃত্যুতে যে কঠিন সুর যোজনা করেন লেখক, তা বেয়ে যন্ত্রণা থেকে বেদনায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ নয়।

হরলালের বিধবা মা পরের বাড়িতে রেঁধে ধান ভেনে ছেলেকে মফস্বল স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করিয়েছিল। কলকাতায় কলেজে পড়বে, এই

প্রতিজ্ঞা নিয়ে হরলাল শহরে আসে। অধর মজুমদারের বিশাল বাড়ির এককোণে আশ্রয় পায় সে; পাঁচ টাকা মাইনেতে বেণুগোপালকে সে পড়াবে। বেণু বড় সহজ ছেলে নয়। আগে বহু পাশ করা, অভিজ্ঞ শিক্ষক এই সাত বছরের ছেলেটিকে বশে আনতে পারেন নি। কিন্তু হরলালের সঙ্গে বেণুর বেজায় জমে গেল। মাস্টারমশাই বলতে বেণু অজ্ঞান; হরলালের সঙ্কুচিত জীবনে এই প্রথম প্রাণভরে ভালোবাসার শক্তি আসে। কলেজের পাঁচজন বন্ধুর চেয়ে অনেক উপরে সে জায়গা দেয় এই অসমবয়সী ছাত্রবন্ধুটিকে। কিন্তু একান্ত দরিদ্র, অসহায় ঐ মাস্টারের প্রতি বেণুর এতটা টান বেণুর মা ননীবালার সহ্য হল না। আশ্রিতদের পীড়ন করে আরাম পায় যে রতিকান্ত, সে তো প্রথম থেকেই হরলালকে সুনজরে দেখে নি। ক্রমে হরলাল বোঝে '...বড়োমানুষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে...।' ছাত্রের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, তার সঙ্গে গল্প করা, তাদের দুজনের তৈরি ছোট বাগানটির পরিচর্যা করা—সবই হরলাল ছেড়ে দিল। এ ত্যাগস্বীকারে বেদনা যথেষ্ট। বেণুরও অভিমানের সীমা নেই।

ইতিমধ্যে বাড়িতে একটা চুরি হল। পুলিশি তল্লাসিতে হরলালের বাক্সেও হাত পড়ল। রতিকান্ত বলল, জিনিস যে নিয়েছে, সে তো আর বাক্সে রেখে দেয় নি। অধরবাবু বললেন, আর কাউকে আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দু-টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবেন, হরলাল যেন দু বেলা এসে বেণুকে পড়িয়ে যায়। এইবার হরলাল মাস্টার, অতি ক্ষুদ্র হরলাল—তার মধ্যে জেগে ওঠে সেই মানুষটা, প্রথম দিনের সূর্যের কাছে সত্তার অঙ্গীকার যে কিছুতেই শিথিল হতে দেবে না। অধরবাবুকে সে জানায়, বেণুকে আর-পড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের ঘরের টেবিলে বেণুর জন্য কিছু উপহার রেখে জীর্ণ পেঁটরাসহ সে পথে বেরোয়। পরদিন সকালে দারোয়ান চন্দ্রভানকে সঙ্গে নিয়ে বেণু হরলালের জীর্ণ মেসে এসে হাজির। বেণুর তাড়নায় হরলালের পেঁটরাবাহক মুটের কাছ থেকে চন্দ্রভান এই ঠিকানা জোগাড় করেছে। বেণু বলে 'মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।' এ অনুরোধ রাখা যে কেন অসম্ভব, বেণুকে বুঝিয়ে বলতে পারে না হরলাল; যেতেও পারে না। বেণুর এই কথাটির স্মৃতি কত বিনিদ্র রাতে তার নিশ্বাস রুদ্ধ করে দেয় পরে। কিন্তু তাও সব চুকে-বুকে যায়।

বেণুর স্মৃতির যে বেদনা, তার তীব্রতা কমতে থাকে।

তবু গত চারবছরে হরলাল যা শিখেছে, বুঝেছে, সেই অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি মানতে পারে না, সে নিজের প্রতি আস্থা হারায়, অমনোযোগী হয়। জীবনপণ করেও কলকাতার কলেজে পড়বার মন নিয়ে যে ছেলেটি একদিন জীর্ণ পোশাকে শহরে এসেছিল, আজ সে পড়া ছেড়ে চাকরি খুঁজে বেড়ায়। কোন এক বড় ইংরেজ সদাগরের আপিসে বড়সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি মুখ দেখে লোক চিনতে পারেন। হরলালকে তাঁর মনে ধরে যায়। পঁচিশ টাকার চাকরিতে বহাল হয় হরলাল। ভূতের খাটুনি খেটে কিছুদিনের মধ্যেই কাজ শিখে ফেলে। যখন তার মাইনে চল্লিশ টাকা, দেশ থেকে মাকে এনে ছোট এক বাসা ভাড়া করে সে। হরলালের মুখে ছাত্র বেণুগোপালের গল্প মা অনেক শুনেছেন। ছেলেকে বলেন, বেণুকে একদিন নেমন্তন্ন করতে। আর-একটু বড় বাসা নিলে, নিশ্চয় একদিন পুরনো ছাত্রকে ডাকবে, হরলাল মাকে এমন আশ্বাস দিল।

বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হরলালের বাসাবদল পালাও চলতে থাকে। বেণুকে নেমন্তন্ন করতে তার সংকোচ আর কাটে না। ইতিমধ্যে খবর পায়, বেণুর মা মারা গেছেন। বহুদিন বাদে আবার সেই অসমবয়সী বন্ধুটির বাড়ি যায় হরলাল। অশৌচ কেটে যাওয়ার পরেও হরলালের মজুমদারবাড়িতে আসা বন্ধ হয় না। তবু সে বোঝে, যে-বেণু একদিন তাকে বাড়ি আসতে অনুরোধ করেছিল, সে বেণুও নেই, সে বাড়িও নেই। সমবয়সী বন্ধু আজ বেণুগোপালের অনেক; বাপের সম্পত্তিতে অধিকারের বোধও সে অর্জন করেছে। পড়াশুনোতে হয়েছে অমনোযোগী, বছরের পর বছর পড়ে আছে একই ক্লাসে। হরলাল মাস্টার আজ নিষ্প্রয়োজন। তবু মার অনুরোধে একদিন বেণুকে খেতে বলে। বেণু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলে মা রূপবান যুবকটিকে দেখে মুগ্ধ হন। বেণু অবশ্য আহার সেরেই সোনার ঘড়িতে সময় দেখে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, বন্ধুদের আসার কথা বাড়িতে। বিশাল জুড়িগাড়িতে চড়ে সে বিদায় নেয়। হরলালের মা ছেলেকে বলেন, মাতৃহীন ছেলেটিকে আবার ডেকে আনতে। মাস্টারমশাই ভাবে '...আর-কখনও ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে—কিন্তু, আমি সামান্য হরলাল মাত্র।'

ডাকতে হয় না, বেণু নিজেই আসে। বছরের পর বছর সে এক ক্লাসে

আটকে আছে। ইচ্ছা, বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসার। কিন্তু পাশ না করলে বাবা বিলেত যেতে দেবেন না। বাপের সঙ্গে রাগারাগি করে সে চলে এসেছে, আজ মাস্টারমশায়ের কাছে থাকবে। হরলাল বোঝাতে চেষ্টা করে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। বেণুকে সে বাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু বাড়ি বেণু কিছুতেই ফিরবে না। অবশ্য মাস্টার-মশায়ের অসুবিধা হলে অন্য কোনো বন্ধুর বাড়ি গিয়ে থাকতে পারে। যে মুহূর্তে বেণুর বাবা এসে তাকে বাড়ি ফিরতে হুকুম দেন, হরলালকে বলেন, সে বেণুকে বশ করে তার ঘাড় ভেঙে খেতে চায়, বিনা প্রতিবাদে বেণুগোপাল গিয়ে গাড়িতে ওঠে। কিন্তু আবারও আসে। এবারের সংবাদ, অধর মজুমদার আবার বিয়ে করছেন। বেণু আর বাড়িতে থাকতে চায় না। বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হতে না পারলে তার পরিত্রাণ নেই। মাস্টারমশায় কি টাকা ধারের কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

শেষ যেদিন বেণু হরলালের কাছে আসে, সেদিন শুক্রবার। তখন হরলালদের আপিস কোনো কারণে মফস্বল থেকে প্রচুর চালডাল খরিদ করত। হরলালের ওপর দায়িত্ব ছিল, প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় টাকা এনে নিজের কাছে গুণে রাখা, এবং শনিবার সকালে টাকা মফস্বলে নিয়ে যাওয়া। সাহেবি পোষাকে সজ্জিত বেণুগোপাল খবর দেয়, একদিন পরে তার বাবার বিয়ে, বেণু বাগানে যাচ্ছে. সেখানেই থাকবে ক-দিন। ফেরার ইচ্ছে নেই, সাহস থাকলে গঙ্গায় ডুবে মরত। হরলাল তখন টাকা গুণছিল। বাগানে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় বলে, বেণু নিজের ঘড়ি, আংটি একটি চামড়ার ব্যাগে মাস্টারমশায়ের কাছে রেখে, হরলালের মার আশীর্বাদ নিয়ে বাগানে যায়। রাত্রির বিক্ষিপ্ত ঘুমের পর ভোরবেলা হরলাল আবিষ্কার করে আপিসের টাকা কম পড়ছে। টাকার যে থলিগুলো খালি, তার একটিতে বেণুর লেখা দুটি চিঠি। হরলালকে সে লিখেছে, তিনহাজার টাকা নিয়ে বিলেত রওনা হল জাহাজে। অধরবাবুকে সে লিখেছে, এ ঋণ শোধ করে দিতে ; যদি তিনি দেরি করেন, চামড়ার ব্যাগে বেণুর মার সব গয়না আছে, বেচে হরলাল যেন টাকা যোগাড় করে। অন্য চিঠিটি বেণু লিখেছে তার বাপের কাছে।

হরলাল ছোটে গঙ্গার ঘাটে, বেণুর জাহাজ তখন ছেড়ে গেছে। ব্যাগে গয়না ছিল ঠিকই, কিন্তু এ তো চুরির জিনিশ। গয়নার ব্যাগ ও অধরবাবুর

চিঠিসহ সে পুরনো মনিববাড়ি যায়। সেখানে তখন অধরের বিয়ের সানাই বাজছে। অধরবাবু বলেন চোরাই মাল বেচলে ধরা পড়বে বলে হরলাল ফেরত দিতে এসেছে ; আর কি প্রমাণ, যে সে বেণুকে পাঁচশ টাকা দিয়ে তিনহাজার লিখিয়ে নেয় নি। রতিকান্ত যোগ করে, ধার দেওয়ার অত টাকা হরলাল কি একসঙ্গে দেখেছে কখনো। হরলাল বলে ধার সে দেয় নি ; অধরবাবু ক্ষেপে যান, বেণু কি তবে চুরি করেছে। গয়না চুরির মীমাংসার সঙ্গে-সঙ্গে বেণুর বিলেত পালানো নিয়ে হুলস্থূল বাধে। হরলাল মাস্টার একেবারে বাতিল।

বড়সাহেব বলেন, পুরো একদিন সময় দিচ্ছেন, তার মধ্যে যদি হরলাল সামান্য তিনহাজার টাকা এনে দিতে পারে, চাকরি তার থাকবে, কেউ কিছু জানবে না। তিনি বিনা জামিনে হরলালকে এ কাজের ভার দিয়েছিলেন, হরলাল তাঁকে বড় লজ্জায় ফেলল।

টাকা খুঁজতে হরলাল পথে বেরোয়। প্রথমে উপায় ভাবতে-ভাবতে, তারপর উপায় না ভেবেই সে রোদে হাঁটে। সারাদিন ধরে একটু একটু করে সে মরে। কাল যখন বেণুকে ঘরে বসিয়ে রেখে সে খেতে গিয়েছিল, তখনই বেণু এই কাজ করেছে। খেয়ে আসার পর, বেণুগোপাল, তার মাস্টারমশায় আর হরলালের মায়ে মিলে চারদিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে বসে বেণুর ছোটবেলার সব গল্প হচ্ছিল ; মাস্টারমশায়কে জড়িয়ে বেণুর কত স্মৃতি! গতকালের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ হরলালকে শহরে আসা গ্রামের ছেলে রাসকলাল অথবা কালিপদর মতোই পরাজিত, করুণার পাত্র বোধ হয় ; কলকাতার ফাঁসকলে যেন সে আটক। কিন্তু, জীবনে অন্তত তিনবার রসিকলাল কিংবা কালিপদকে হরলাল পেরিয়ে গিয়েছিল ; যখন সে বেণুকে পড়ানোর কাজে ইস্তফা দেয়, যেদিন বেণুকে নিজের বাড়িতে রাখতে আপত্তি করে, আর আজ সকালে যখন আসন্ন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও গয়নার ব্যাগটা অধরবাবুর কাছে নিয়ে যেতে পারে। এ কাজ সে করতে পারে, কারণ তার শানিয়াড়ির বংশ পরিচয় নেই, তাঁতির ছেলে বলে কোনো জানকী নন্দীর সান্নিধ্যও সে পায় নি। হরলালের একমাত্র আত্মপরিচয় তার সেই প্রথম দিনের অঙ্গীকারে। তাই হরলাল অসহনীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর অসাধারণ মুক্তির দিকে এগোয়। মৃত্যু আসছে তার মায়ের রূপ ধরে।

'তাহার কপালের শিরা দব্‌দব্‌ করিতেছে ; মাথা যেন ফাটিয়া

যাইতেছে ; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে ; পা আর চলে না। …রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া বসিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পর ঘুম যেন আর না ভাঙে!' যে গভীর অন্ধকারকে কামনা করে হরলাল, তার অনুভব আমাদেরও সমস্ত শরীর মনকে আবৃত করে দেয়। সে নিশ্চিত অন্ধকারের কাছে আমাদেরও নিবেদন, 'ওগো শান্তি, ওগো রাত্রি, তুমি আমার দিদি, আমার অনাদিকালের দিদি, দিন অবসানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার বুকের কাছে' এই মানুষটাকে, 'তার সকল জ্বালা যাক জুড়িয়ে একেবারে।' যে হরলাল মাস্টার বেণুকে পরম ভালোবেসেছিল, আজ সকালেও যে পুলিশের কাছে না গিয়ে যায় জাহাজঘাটায়, মরতে সে বাধ্য। একমাত্র মৃত্যুই তাকে প্রশান্তিতে একাকার করতে পারবে। মরণ আসেও তেমন নিশ্চিতরূপে ; 'যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। …যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাঘাট বাড়িঘর দোকান বাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল—হরলালের শরীরমনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা, তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্‌বুদ্‌ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।'

রবীন্দ্রনাথ যখন হরলালের জন্য এই পরিপূর্ণতার পরিণাম রচনা করেন, পাঠক তো ভুলতে পারে না, যে মাতৃরূপে আজ মরণ এসেছে, সেই মায়ের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছেলে যতীনের মাসির তো তবু প্রস্তুতি ছিল ; চোখের সামনে পরম স্নেহভাজনের জীবনযন্ত্রণায় তিনি বলেছেন 'ওরে বাপ রে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ। পাপের যে শেষ নেই—আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।' অথবা সর্বংসহা হয়ে উঠেছেন পুত্রসমের মৃত্যুর মুখোমুখি, 'দিয়েছিস যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শূন্য ঘর ভরেছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন তো বুক ভরে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো নালিশ করব না।…'

হরলালের মা যে আজ ভোরেই স্বপ্ন দেখেছেন ছেলে তাঁর বউ আনতে যাচ্ছে। ভোরের স্বপ্ন নাকি মিথ্যে হয় না। সকালে যখন আপিসের সাহেবের সঙ্গে হরলাল বেরিয়ে আসছে, তিনি হাহাকার করে উঠেছিলেন 'সাহেব, আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে। আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কখনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।' এ আর্তনাদকে শান্তির প্রসাদে ম্লান করে দেবে এমন শক্তি কোথায়? মৃত্যুর সমগ্র কঠিনতা তাই 'মাস্টারমশায়' গল্পের মর্মে-মর্মে গ্রথিত। একদিকে অভুক্ত ছেলের মা মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ে থাকে, অন্যদিকে 'কোথায় যাইতে হইবে' গাড়ির গাড়োয়ানের এ প্রশ্নের জবাব আর হরলালের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। এ কঠিন পরিণাম সেই অনিবার্য সত্যেরই নামান্তর যে 'বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।' ইশারার শেষ এক চরম প্রশ্নে 'পথ কি নিজের শেষকে জানে।'

এই চরম প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। এই যে হরলাল মাস্টার, সমগ্র পরিপার্শ্ব তাকে লোভ, ফাঁকি আর মিথ্যের জালে জড়াতে চায়। তবু হরলাল কিছুতেই এ ফাঁদে পা দেবে না। সমাজ সংসার হরলালের এ অঙ্গীকার মানবে কেমন করে? গরিবের ছেলে লোভের ফাঁদে পা দেবে না, এর চেয়ে দুর্বিনীত দুঃসাহস আর-কি আছে? পারিপার্শ্বিকের মারে হরলাল প্রায় মৃত, কিন্তু নত নয়। সত্যের প্রতিজ্ঞায় সে অটল। তাই মৃত্যুর যে রূপ সে দেখে, সেখানে কোনো ভয়ের মুখোশ নেই। মরণেই হরলালের মতো জীবনের মহিমা—এ এক অনিবার্য সত্য। তবু তো পিছনে পড়ে থাকে হরলালের মায়ের হাহাকার। অধর মজুমদারের ছেলে বেণুগোপাল বিলেত থেকে ফেরে। একদিন সেই গাড়িটিতে সে চড়ে, যে-গাড়িতে হরলালের মৃত্যু হয়েছিল। আমরা দেখি হরলালের আবছা স্মৃতি বেণুর বড়জোর একরাত্রির ঘুম নষ্ট করতে পারে। একদিকে মৃত্যু যেমন জীবনের স্বীকৃতি, অন্যদিকে জীবনের প্রতিকূলতা থেকে সত্যনিষ্ঠ মানুষের শেষ নিষ্কৃতিও বটে। এই চরম প্রশ্নের ব্যঞ্জনায় আমরা উত্তরহীনতার মুখোমুখি দাঁড়াই। যে-মৃত্যুতে বাড়ল বাঁচার মহিমা, তা কি সত্যিই কোনো নিষ্পত্তি? না কি এ শুধু একটি প্রশ্নের সামনে আরেক প্রশ্নের উত্থাপন! সমাজসংসারের প্রকৃত চেহারা, আর তার ভিত্তিতে জীবনের আলেখ্য অসামান্য বাস্তবতায় রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ করেন। জীবনকে যেন মিলিয়ে দেন

আমাদের দৈনন্দিনে। জীবনের শেষ পরিণামের অমোঘ সত্যকে ব্রহ্মলাভে উপমা দিলে, আমরা এড়িয়ে যাব ঐ চরম প্রশ্নের কঠোরতা।

যে-প্রশ্নের মোকাবিলায় নিরুদ্দেশ শূণ্যের সামনে দাঁড়িয়ে হাহাকার করেছিল কাদম্বিনী '...ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব', ফটিক জানত, কোথায় যাবে, কিন্তু যাওয়ার পথ ছিল অজানা ; ফটিকের অবারিত মন পরিপার্শ্বের বন্ধনে ক্লিষ্ট হয়, সেই অনাহত বাল্য, ফেলে আসা গ্রামের সর্বব্যাপী মুক্তির মধ্যে পুরনো বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মৃত্যুর উপমা পেয়ে যায়। বিশ্বপ্রকৃতির আশ্রয়ে ফটিকের মৃত্যু ছুটির আকাশের ঝলমলে রোদ্দুরে মিশে যায়। আরও সাবালক যন্ত্রণার জটিল, শ্বাসরুদ্ধকর চেহারা দেখি যতীন অথবা হরলালের পরিণামে। আকাশের সেই ঝলমলে আলো তখন নিভে গেছে। সামাজিক অসঙ্গতি সম্পত্তির কর্তৃত্ব সত্যের প্রসাদে ভরাট জীবনের মৃত্যুকে করেছে অনিবার্য ; একদিকে স্বল্পবাক রামকানাই, অন্যদিকে সহিষ্ণু শশিভূষণের পরিণামে মৃত্যুর আরেক স্তর চেনা হয়ে গেছে। 'জয়পরাজয়'-এর অস্পষ্টতা, 'দালাদান'-এর অবাস্তবও আজ অতীত। জীবন-মরণের কঠিনতম রূপকে প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ রাত্রির অপার মহিমায় ভরা অন্ধকার আকাশে আজ আশ্রয় খোঁজেন ; খোঁজেন সেই জটিলতম প্রশ্নের উত্তর।

আগেই বলেছি, জীবনের প্রতি পরম প্রেমে, সীমাহীন দাবিতে রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রতিকূলতায় আপস করতে পারেন না। জীবনে যখন প্রকৃত সম্মান নেই, যেখানে মানুষ তার মুক্তির আনন্দে বঞ্চিত, মানুষের সভ্যতাকে যখন সমাজ স্বীকার করে না, কল্পনা যখন বাঁচার জন্যে যুদ্ধে নামে, সেখানে মৃত্যুই তাঁর প্রতিবাদ ; ভালোবাসা যেখানে অবহেলিত, সত্য যেখানে অসহায়, মরণই আসে জীবনের সব নেতিকে যুঝতে। অন্ধকারে মৃত্যুতে পরিপূর্ণতার পরিণাম খুঁজতে-খুঁজতে এ-বোধও যেন পরিষ্কার হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে—মৃত্যু আসলে কোনো নিষ্পত্তি নয়। তাই মুমূর্ষু যতীনের প্রেমের আর্তি, যার একমাত্র সমাধান বুঝি মরণে, আর মাসির স্থৈর্যের অব্যক্ত বেদনা একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাহিনী গড়ে। সারা-দিনের ক্লান্তি, অপমান, হারজিতের শেষে হরলাল যখন মরণের নিশ্চিন্তিতে শান্ত, গাড়ির গাড়োয়ান তাকে ক্রমাগত শুধিয়ে যায় যে কোথায় যেতে হবে। মনে পড়ে আজকের দিন শুরু হয়েছিল হরলালের মায়ের মর্মভেদী আর্তনাদে। মৃত্যু তার সব মহিমা নিয়েও জীবনের উত্তর হয় না। বাঁচার

আকাঙ্ক্ষায় জলে মরেছিল কাদম্বিনী ; সেই নির্মম পরিণাম থেকে হরলালের অপরাজেয় মৃত্যু, যতীনের অগাধ প্রশান্তি মিলে যায় এক মা-মরা বালকের অনন্ত প্রশ্নে। তার বাপ শ্মশান থেকে ফিরে এসে বলে, মা স্বর্গে গেছে। সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ যখন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠছে, উলঙ্গগাঁয়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

"তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করচে 'কোথায় স্বর্গের রাস্তা ?'

আকাশে তার কোনো সাড়া নেই ;"

সাড়া নেই, কারণ, জানাও তো নেই মৃত্যুর কোনো নিশ্চিত ব্যাখ্যা। সে কি জীবনের স্বীকৃতি, না কি শুধুই নিষ্কৃতি। এ কঠিন জিজ্ঞাসাকে শিল্পের বৈচিত্র্যে নানা মাত্রায় দেখেন রবীন্দ্রনাথ। সমাজ সংসার, প্রাত্যহিকের স্তরে-স্তরে উত্তরহীন এই প্রশ্নের জটিলতা ব্যক্ত করেন। বিশ্বপ্রাকৃতিক বিস্তারেও তার কঠোরতা লাঘব হলো না, প্রশ্ন শুধু অন্তহীন প্রশ্নই রইল। আকাশে তাই কোনো সাড়া এল না। নিরুত্তর শূন্যতাকে ভরিয়ে দিল 'কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।'

সাধন চট্টোপাধ্যায়

লুণ্ঠন

অমৃত মাকালের শেষ কিস্তির পাট চলেছে দিঘড়া হাটে। এই মালঞ্চ গাঁ থেকে বেশ কয়েক কোশ পথ। আশ্বিনের সকাল; নীল আকাশের গায়ে বর্ষণমুক্ত দু-চার টুকরো শাদা মেঘের কুণ্ডলি। পথের কাদায় টান ধরলেও মাঝে মাঝে গাড়ির চাকা গভীর দাগ কেটে চলছিল। আম, বাঁশ, তেঁতুল পাতার জাল ভেদ করে সাতসকালেই ঝলমলে রোদ লুটোচ্ছে বাগানে, চালায় বা উন্মুক্ত মাঠে ফলন্ত ধানের শিষে শিষে।

পথে জিয়াত আলি দেখে হাসল। চাপা ঠোঁটের ভাঁজে বাঁকা হাসির টান। খাড়া, বড়শি-নাকের দুপাশ বেয়ে নেমে আসা বলিরেখা গভীর হয়ে ওঠে এবং লোমশ ভুরুর তলায় ইঁদুরের চোখ দুটো মুহূর্তের ঝিলিকে চকচক করে। কাঁচা-পাকা ছাঁটা দাড়ি তার মুখটা বেড় দিয়ে আছে। ফুটিফাটা কপালটা টান-টান—গরুর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে সে মৃদু মাথা তোলাতে থাকে। অনেক কিছু অনুমান করতে করতে বিড়ি টানা কালো ঠোঁটজোড়া ক্রুর, চাপা হাসিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

—ক-মণ রেখেছিলিরে অমেত্তো?

-- ছাই। আশ্বিনে আর চাষীর ঘরে পাট থাকে?

—থাকেরে, থাকে। এ কি আশমান ফুঁড়ে এল?—জিয়াতের কানের পাশের রগটা কেঁচোর মতো এঁকে-বেঁকে ফুলে ওঠে। অমৃত যেন তার শ্যেনদৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে বেআইনি কিছু করে ফেলেছে।

—ক-মণ আছে?

—মণ টাক!

—উঁহু, চার মণের কমতি না। কোন হাটে চললি?

অমোত্তো বাঁকা চাউনি দেয়। হেসে বলে, শনিবার যেন দশটা হাট হয়? বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস পড়তে জিয়াতের হাসি মিলিয়ে যায়।

পাটের গাঁটগুলোর দিকে ফাঁকা দৃষ্টি বুলিয়ে সে পা বাড়াতে চায়। এই সাতসকালে, গাঁয়ের মুখে পচা পচা নেশাধরানো পাটের গন্ধে সে চমকে তাকিয়েছিল। চেনা, অতি পরিচিত সোঁদা গন্ধ! ভাদ্রের মাঝামাঝির পর এ গরিব গাঁয়ে এক আঁশ পাট থাকে না আর এখন আশ্বিনের শেষে হিমহিমে সকালে পচাপচা সোঁদাগন্ধ! কি ভেবে জিরাত গাঁটগুলোর মধ্যে হাত চালিয়ে দেয়। পানিবিহীন, ফুরফুরে মিঠা পাট! একটু কটা রং আছে বটে, মাল মন্দ না।

অমেত্তো রুগ্ন বলদের ল্যাজ মোচড়া দিয়ে ঠকাস্ ঠকাস্ আওয়াজ দিতে কাঁচ-কোঁচ শব্দে ফের চাকা দুটো এগোতে থাকে। জিরাত লুঙির খুটটা তুলে চলে যায়। সস্তা, সাদা রবার পাম্পশুতে ঢাকা গোড়ালি দুটো অমেত্তোর দৃষ্টির সামনে ওঠা-নামা করতে-করতে ক্রমশ এগিয়ে গেল। 'সুমুন্দির পুত!' মস্ত আক্রোশে অমেত্তো বিড বিড় করে ওঠে।

অমেত্তোর সারা মুখে ঘন কালো দাড়ির কাঁটা। লাল ছিটছিটে ঠোঁটে গোঁজা বিড়িটা হাতের আড়ালে নিবিষ্টে ধরাতে গাল দুটো খোদলে বসে গেল। এক ঝলক ধোঁয়ায় চোখ দুটো ছোট হয় তার। বেশ খুশি খুশি লাগে। যাক, না হয় দিন পনের আগেই বার করেছে পাট, বৌটার সঙ্গে মিছা যাবাৎ (ঝগড়া) না করলেই হতো।

শেষ কিস্তির পাট এত সহজে সে বার করত না। শ্রাবণের মাঝামাঝি মোট সাড়ে চার মণ পাট পেয়েছিল। সার, নিড়ানি, বীজ এবং পচাইয়ের খরচ নিয়ে দেনা কম হয় নি। পোকা মারার তেল আর নিজের গতরের হিসেবটা না হয় বাদই দেয়া গেল। ভগবান খাটার জন্যিই তো গতরটা দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম কিস্তির আধ মণ পাট হাটে নিয়ে সে বেওয়াকুফ হয়ে ফিরে এসেছিল।

—চল্লিশ ট্যাহা! অমেত্তোর চোখ দুটো পিট পিট করতে-করতে ঠোঁট জোড়া ঝুলে পড়েছিল। তিন বাঁশের কাটার ওপাশে ছোট্ট খাতা হাতে জিরাত। ভাবলেশহীন চোখে মাথা দুলিয়ে বলেছিল—গাঁয়ের লোক বলে দু ট্যাহা বাড়ালাম। হাটে আটত্রিশ ট্যাহা দর। অমেত্তো নামাবে কি নামাবে না ভাবছিল কিন্তু লাভ নেই। সব শিয়ালের এক রা। হাটের মধ্যে সার সার কাটা নিয়ে বসে থাকা ফড়েদের সে চেনে।

থপাস করে কাটার উপর গাট্টি ফেলতেই, জিরাত হাত ঢুকিয়ে বলেছিল —পানির দর কিন্তু চল্লিশ না। আড়াই সের কাটা যাবে।

—পানি ? রা কাটলেই হলো ?

—দুধ ঢেলেছ ? জিরাত হাসে।

অমেত্তো জিরাতের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টি গেঁথে দেয়। চোখের কালো তারা দুটো চিকচিক করে যেন রাগের শুকনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নাকের পেটি দুটো ঘনঘন ওঠা-নামা করছিল।

—কি মাকালের পো ? বেচবে ?

—তামাসা করতে এয়েছি ?

জিরাত হালকা হাসিতে গাঁট মেপে, পানির দরুন আড়াই সের কেটে, ফোলা বুক-পকেট থেকে টাকা বার করে দিয়েছিল। কাঁপা হাতে গুনে ছেঁড়া হাফশার্টের ভেতরের পকেটে রাখতে-রাখতে দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল অমেত্তোর। আর না! বাপের কিরা! আশ্বিন-কার্তিকে দর যখন হু হু করে বাড়বে, তখন সে শোধ নেবে এর। মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিয়েই ফিরেছিল সে। চাষের দেনা শোধ ? সে ধান বেচে শোধা যাবে। ঝাল, নুন, তেল, বীজ আগুন হবে, আর চাষির জিনিস মিঠা লাগে, না ? দর ওঠেই না।

প্রতিজ্ঞাটা পুরোপুরি রাখতে পারে নি। ভাদ্দরের মাঝামাঝি জিরাত গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে পাটের সন্ধানে বার-কয়েক অমেত্তোর দাওয়ায় হানা দিয়েছিল। বিশেষ ফল হয় নি। পরে সাত দিনের জলে, বীজ ধান বেচার উপক্রমে, জিরাত যখন গরিব-গুরবোদের শেষ আশাটুকুও হাতিয়ে কিনে নিয়ে গেছে, অমেত্তো দ্বিতীয় কিস্তির আধ মণ বেচেছিল। দর উঠেছিল তখন ষাট। অমেত্তো মনে মনে হুঁ হুঁ করে। একশো টাকায় উঠবে। সস্তা সময়ে লুঠপাট করে নিলি, আশ্বিন-কাত্তিকে চড়া দরে কলা চুষব ?

—আর নাই গো, মাকাল ?

—না, না।···আমি কি নৃপেনবাবু ? গত মাসে আধ মণ বেচলুম না ?

ধূর্ত জিরাত হেসেছিল। ভিজা দাওয়ায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে অমেত্তোর বিড়িটা জালিয়ে দিতে-দিতে বলেছিল—কেমন যেন গন্ধ পাই ঘরে ?

অমেত্তো গুরুত্ব দেয় নি। জিরাতের ফাঁদ সে চেনে। সমস্ত প্রলোভন এবং প্রয়োজনকে জয় করে যক্ষের ধনের মতো সাড়ে তিন মণ পাট জমিয়েছিল চড়া বাজারের আশায়। আজ সেই শেষ কিস্তি হাটে চলেছে।

বেশ কিছু ল্যাজ মোচড়, পাঁজরায় বাঁশের চ্যাচারির আঘাত এবং অশ্রাব্য গালাগালিতে বলদ দুটো অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে। বারোটার মধ্যে দিঘড়া না পৌঁছলে কখন ফিরবে অমেত্তো ? বন-বাদাড় ছাড়িয়ে সূর্য বেশ

কিছুটা উঠে গেছে। কে বলে চাষা-ভুষোর সময়ের দাম নেই? কত কাজ! জীবনে কি কাজের শেষ আছে গাঁয়ে? এখনো কুঠির মোড এলো না। নেমে যতীনের দোকানে এটু চা খেতে হবে। সকালে তাও জোটে নি। বউটার সময় নেই। কাজের হুদ্দ-মুদ্দ হবে আজ। পেছন ফিরে সে দূরে নিজের গাঁয়ের দিকে তাকাল। উঁচু অশ্বত্থ গাছটার ডগা দেখা যায়। এখন নিশ্চয়ই বউটা ওখানে হাজির হয়েছে। পেঁচো ঠাকুরের থান! শিশু-রক্ষক ও মারক, আর অতি ক্রুদ্ধ দেবতা। রং কালো, মাথায় জটা ঝুঁটি করে বাঁধা। নির্জন, পরিত্যক্ত পল্লীপ্রান্তে দীঘির ধারে ঐ প্রাচীন অশ্বত্থের কোলে তার থান। গোলাকার, লালচে দুটো চোখ। কপালে তিলক, দন্ত বিকশিত, পরনে একখণ্ড কাপড়। সন্ধ্যা বা নির্জন দুপুরে এখানে গা ছমছম করে। পাশেই চিতি গাছের একটা ঝোপ। অনেকগুলো ঢিল বাঁধা আছে। ওর একটা ঢিল মানদার। এই তিন তিনটে বছর, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় মনস্কামনার স্পর্শ নিয়ে উন্মুক্ত এই প্রান্তরে ঝুলে আছে। তার একমাত্র ছেলে তারকনাথের নামে মানত। পুঁয়ে-পাওয়া ছেলেটার হাড়-চাম এক হয়ে যাচ্ছিল। গাঁয়ের ডাক্তার, হেল্‌থ সেন্টারে কম ঘোরাঘুরি করেছে অমেত্তো আর মানদা! ডাক্তারবাবু বলে রিকেট। সহজে সারবার নয়। অবশেষে তিন বছর আগে পেঁচো ঠাকুরের থানে মানত ধরেছিল মানদা। জাগ্রত দেবতা, দেখতে-দেখতে তারকনাথ এখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তাই আজ মানতের পুজো। গাঁয়ের সাইকেল-চড়া হোমিওপ্যাথ হিমাংশু ডাক্তার বলে—ও ফুলো ভালো নয় অমেত্ত। দেহে সোত ধরেছে। শহরে নিয়ে যা।

গত রাতে মানদা খিট খিট করে উঠেছিলো—পালা-পাব্বোন তো উঠে গেছে, পুজোর জিনিস হেঁটে আসবে ঘরে?

—কেন, মুদা বাঁধিস নি?

—মুদা বাঁধিস নি?—মানদা ভ্যাংচায়। কত পয়সা দাও রোজ, যে মুদা বাঁধব!

অমেত্তো চুপ করেছিল। সত্যি, কোত্থেকে বউটা, অল্প অল্প করে পয়সা সঞ্চয় করবে? তাই 'মুদা বাঁধা' সম্ভব নয়। কিন্তু অমেত্তো কি করবে? তারকনাথ বাপ-মায়ের ঝগড়ায় হাঁ করে থাকে। মানতের চুল জট পাকিয়ে গেছে—কাল থানে কামিয়ে দেয়া হবে। তারপর অনেক খরচ। গাঁয়ের দু-চার জনকে না খাওয়ালে চলে? চিড়া, গুড়, কলা, দই, বাতাসা—একগাদা পয়সার দরকার।

সারারাত ভেবে অমেত্তো ঠিক করেছিল শেষ কিস্তির পাট বার করবে। যাক, দিন পনেরো আগেই হয়ে গেল, তা হোক!

আরও হাত দেড়েক সূর্যটা ওঠার পর অমেত্তো কুটির মোড়ে যতীনের চায়ের দোকানের সামনে গাড়িটা থামিয়ে দিল। পাটের আঁশ লেগে আছে তার মাথায়। জামায় মুখের ঘাম মুছে দাঁড়াল সে বাখারির বেঞ্চের সামনে। দেখতে পেল বাঁক কাঁধে হাট ভেঙে ভেঙে চলেছে যাত্রীরা। এ-সময় পথিকের জিজ্ঞাসাবাদে জবাব দেয় না তারা। সেলাম আলে কোম! বেঞ্চিতে শওকত অমেত্তোকে সম্মান জানায়। খালি গায়ে কালো ছিপ-ছিপে চেহারাটা নিয়ে উটকো মানুষের মতো বেঞ্চির এককোণে আশ্রয় নিয়েছে। শীতের পূর্বেই দেহে তার খড়ি উঠে গেছে।

—সেলামের গুষ্ঠি মারা গেছে। আমেত্তো হাসতে হাসতে পাশে বসে। বাখারির বেঞ্চ একটু দেবে যায় ঘুণকাটা শব্দে। মাঠে মাঠে ফসল চুরি করা এই ছিচকে চোরটাকে চেনে সবাই। একবার কুমড়ো চুরি করতে গিয়ে প্রাণ যাওয়ার মুখে অমেত্তো দয়া করে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বলে, আজও পথে ঘাটে সম্মান করে চলে। স্বভাব অবিশ্যি পাল্টায় নি।

যতীন যাত্রাদলের মতো একঘাড় বাবরি চুল নিয়ে চা বানাচ্ছিল। আজ একটু ব্যস্ত সে। তবুও নেভা বিড়িটা ঠোঁটে নিয়েই বাঁকা চাউনিতে গরুর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে—কি মাকালের পো, বাবু বনে গেলে? পাট জমিয়ে রেখেছো যে! দোকানের অন্যান্য চাষিরা মাথা নাড়ায়। এরই মধ্যে ঐশ্বর্যের গন্ধ খুঁজে পাচ্ছে তারা। পাটের জন্য তাদের ঈর্ষাও কম নয়। অমেত্তো অশ্বস্তি বোধ করল।

—না গো, আমাদের বাবুর কি কপাল! ভাদ্দরে খুব ভুগলুম তো, হাটে নিয়ে যায় কে? চাষের দেনা গুঁতো মারছে, তাই বের হলেম।...এইতো সাকুল্যে পাট। তার আবার জমানো!

—তুমি তো সাপের ঘরে ব্যাঙ পুষেছ। জিরাত টের পায়নি? হাটে তোমায় নিতে হবে কেন?

অমেত্তো বুঝল যতীন বিশ্বাস করছে না। না করুক, রহস্য সে ভাঙবে না। সত্যিই মালঞ্চর মতো দরিদ্রের গ্রাম থেকে এখন পাট বেরোয় না। তা ঐ নৃপেনবাবুর মতো দু-চারজন ছাড়া। পাছে এ মানুষ-গুলো সন্দেহ করে তলে-তলে অমেত্তোর পয়সা হচ্ছে। নইলে পাট জমিয়ে চড়া দর পাওয়া চাট্টিখানি কথা! জিরাত আছে কি জন্য?

জিরাতের প্রসঙ্গ উঠতে হেসে অমেত্তো বললো—'ঐ শালার ভাঙা বেড়া তো চেনাই আছে।...কিন্তু ভাই, গতরের খাটনি বাদই দেলাম, চাষের খরচাই ওঠে না এমন দর দেয়। আমাদের ঘর লুটে-পুটে ওনারা বাজার মান্দা করছেন। তুমি কলা চোষ!' চাষিরা সায় দিল। শুধু পাট নয়; ধান, আলু, আখ—মরশুমের প্রথমেই এমন মন্দা বাজারের কল তৈরি হয়ে যায়, চাষিদের ফাঁদে পড়া ছাড়া উপায় নেই। দোকানের এক চাষির কথাটা খুব পছন্দ হয়েছিল, উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে খোলা গলায় চেঁচাল,

'দেঁখলেঁ না অাঁমাদেঁর ঘঁরের অাঁলু বাঁর কঁরে নিঁলে অাঁট অাঁনা হয়। অাঁমরা ভুঁ ঠ্যাঁহায় কিঁনে খাঁই।'

দ্বিতীয় একজন যোগ করলো, 'ঝাল, নুন, সার তেল? রোজ দাম বাড়ছে? বাবুরা চাষিদের না শুঁতিয়ে শান্তি পায় না।'

অমেত্তো নাক কুঁচকে মোটা ভাঙা কাপে চুমুক দিচ্ছিল। যতীন পাটগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ব্লকের লোন পেয়েছিলে এবার?'

'তালে আর পাট বেচতে হত না।...গুরুপদর কাল চিঠি এসছে সদর থেকে, লোন নাকি সে পাবে।...ইদিকে পাট বেচে, ট্যাহা তার হজম। ...কোনটা নিয়মে চলে?' যতীন অন্য খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত হতেই, অমেত্তো পয়সা গুনে ধীরে ধীরে গাড়িটার দিকে চলে এল। বলদ দুটো জাবর কাটতে কাটতে কষায় ফেনা তুলে ফেলেছে। অমেত্তোর হাতের স্পর্শ পেতেই পেটটা থির থির করে কাঁপিয়ে গোবর মাখা লেজটুকু নাড়তে থাকে। অমেত্তো গাড়িতে উঠতে যাবে, ঠিক তখনই পিঠে কিল পড়ল।

'মাকাল ঠাকুর! বক্তিমে হচ্ছে!' মানদার ছোট বোন শুভদা হাসছে। কাচের নাকছাবিতে রোদের ঝিলিক, সাদা ঝকঝকে দাঁত, ফ্যাকাশে লাল সিঁদুর টিপ, ঘোমটা নেই। দেহে জৌলুস নেই বটে, হাসিতে চোখজোড়ায় যেন আলো ফুটছে। হলুদ শাঁড়ি এবং লাল ব্লাউজ পরেছে শুভদা। সঙ্গে দুটো ছেলে এবং মেয়ে। নাকের পোটা গড়াচ্ছে একটার।

'উঃ!' অমেত্তো ব্যথার ভান করতেই, শুভদা হাসতে হাসতে বলে, 'মিঠে লাগল না?' অমেত্তো একগাল হেসে বলে, 'তুই আমার ছোট গিন্নি, মিঠে লাগবে না!

শুভদা ছোট্ট মুঠি দেখিয়ে বলে, 'শুনলে আপনার দাঁত ভাঙবে।... এয়েছে সঙ্গে।'

'মনোরঞ্জন ? কোথায় ?'

'দিঘড়ার হাটে। আমরা বাসে নেমে এলাম। উনি হাট দেখে ফিরবেন। দিদি থানে গেছে ?'

'এত বেলা করলি যে ?'

'উড়ে আসা যায় ? কাল তো পুজোর চিঠি পেলাম।...আপনি ফিরবেন কখন ? ইশ, আবার দাড়ি রাখা হয়েছে। এমনিতে কি বলে চাষা-ভুষো !'

অমেত্তো আদরে দাড়িতে নিজের হাতটা বুলিয়ে গাড়িতে ওঠে। শুভদার বর মনোরঞ্জন পাট কলে কাজ করে, থাকে জগদ্দলে। অমেত্তো অনেকবার গেছে সেখানে। কারাপ্রাচীরের মতো মস্ত এলাকা ঘিরে, মোটা মোটা চিমনি। অনেকদিন পর এই থানের পুজোর উপলক্ষে শুভদাকে দেখতে পেয়ে অমেত্তোর বেশ ভালো লাগে। অমেত্তো রসিক মানুষ। শুভদাকে নিয়ে এমন করে মাঝে মাঝে মেয়েটা লজ্জা পেয়ে যায়। সে ভোগী মানুষ নয় কিন্তু শখ-আহ্লাদ তার মরে যায় নি। মানদা মাঝে মাঝে রাগ হলে বলে, 'যাও না জগদ্দলেই চিরকাল থেকো।'

'তোর লজ্জা করে না বলতে ?'

'আমার লজ্জা করবে ? মনোরঞ্জন তোমায় যদি ঝাঁটা না মারে !'

আবার দীর্ঘদিন দেখাসাক্ষাৎ না হলে এই মানদাই অনুযোগ তোলে, 'দশটা-পাঁচটা নয়, একটা বোন ! আদর-যত্ন আছে এ বাড়িতে ? কুটুম মানুষেরই থাকে ! কার হাতে পড়েছিলাম গো !'

অমেত্তোর আনন্দটুকুর মধ্যে দুশ্চিন্তাও উঁকি দেয়। অন্তত দিন চারেক না রাখতে পারলে লোকে বলবে কি ! একটু ভালো-মন্দ খাওয়া আছে ! চাষি বলে কি ভালো-মন্দ খেতে নেই। যাক, পাটটা তার সম্মান বাঁচিয়ে দেবে এ যাত্রা। আর দেনার গুঁতো ? আশ্বিনের শেষে চড়া দরটা পেলে চিন্তা কিসের ?

বলদের পেটে সস্নেহে খোঁচা দিয়ে সে টুং...টু...টক্ করে উঠল।

হাটে যখন সে পৌঁছল সূর্য খাড়া মাথার উপর উঠে গেছে। হাট জমজমাট। প্রাচীন শিমুল, মেহগনি ও বাবলার ছায়া চিরে যাওয়া ন্যাশনাল হাইওয়ের ঢাল বেয়ে স্থায়ী চালাগুলোর বহু দূর পর্যন্ত আম লিচুর তলে তলে পসার ও মানুষের চিৎকার হৈ-হট্টগোল ছড়িয়ে পড়েছে। মৌচাকের খোপে খোপে যেন হাজার হাজার মৌমাছি। গুঁতিয়ে ধাক্কিয়ে ছাড়া এক পা এগুবার উপায় নেই। রং বেরং-এর ছিট, প্লাস্টিক জুতো, বঁটি, কড়াই থেকে শুরু করে চাল, তামাক, তরকারির গ্রাম্য গন্ধ। টাটকা সজীব সৌন্দর্যে নেশা

ধরে যায়। আল না ভাঙা বর্ষা-কুমড়োর ঝুড়ি, ঘন কষ সহ কালচে সবুজ পুষ্ট পেঁপের গায়ে ঈষৎ সাদা কুড়ো, সদ্য ছিঁড়ে আনা কাঁচাকলার কাঁদি, তেজি পটোল আরও কত কি। স্পর্শ করলেই যেন মনটা পবিত্র হয়ে ওঠে ধরিত্রীর জটিল রহস্যের কথা ভেবে। এক-একজন এমন ভাবে কাপড়ের টুকরো ঝুড়ি বা বস্তার উপর ঢেলে রেখেছে যেন লোকচক্ষুর আড়ালে রোদ-জল-ঝড়ে উদয়াস্ত পরিশ্রমের স্বেদবিন্দুর স্ফটিকগুলো বহু যত্নে ও আদরে এই মাত্র তুলে এনে এনে হাজির করেছে হাটে। এ-ভাবনা অবশ্য অমেত্তোর নয়, যারা শহর থেকে হঠাৎ হাটে এসে পড়ে তাদের।

অমেত্তো সোজা হাইওয়ের উপর গাড়িটাকে দাঁড় করাল মস্ত এক মেহগনির ছায়ায়। এ-অঞ্চলটা পাটের। পাট কেনা-বেচার খদ্দের-ব্যাপারিরা এ অংশে হাজির হয়। বলদ দুটো খুলে গাড়ির সঙ্গে বাঁধতে দেখতে পেল সার সার পাটের গাড়ি মুখ থুবড়ে আছে। কচুরি-পানা ঢাকা কালভার্টের ওপাশ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত। এত পাট। সব শালা কি তলে তলে জমিয়ে রেখেছে। মনটা খচ্ করে ওঠে। এত মাল ঠেলে উঠলে শালা ফোড়েগুলোর যেন পোয়া বারো। দর দিতে চায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো ফোড়েকেই সে দেখতে পেল না। দু-চারজন চাষি পাটের গাদায় চিৎ হয়ে মুখে ছায়া-রোদের জাফরি নিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। অমেত্তো চোখ কুঁচকে দেখে নেয় একবার। অনেক কাজ আছে তার। দাড়িটা কামানো দরকার আগে। শুভদা খোঁটা দিয়েছে আজ। সোজা সে চলে এল মসলার চালাটার পিছনে, যেখানে সার সার নাপিত, ছোট ছোট বাক্স, ছিটোনো চুল, আধ-ছাঁটা ঘাড়, চুল-সাবানের ফ্যানা মাখা কবজি নিয়ে যন্ত্রের মতো কড়কড় শব্দে চাষা গালে খুর চালাচ্ছে। কুচুং কাচুং কাঁচির শব্দে জায়গাটা গুনগুন করছে। একটা ইট খালি হতেই সে বসে পড়ল। ছোট্ট আয়নাটা হাতে তুলে মুখটা দেখে। তেলতেলে ভাবটা হাতে ঘষে যতটা সম্ভব তুলে ফেলল। শ্যাওলা-ধরা বোতলের জল ছোট্ট বাটিটায় ঢালা পর্যন্ত সে আয়নায় খুটিয়ে খুটিয়ে নিজেকে দেখে নিল। তারপর ঘাড়টা ঈষৎ এগিয়ে দিয়ে গাল দুটো নাপিতের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে এমন ভাবলেশহীন হয়ে পড়ল যেন জগতে সে কিছুই জানে না। যতক্ষণ সাদা ফ্যানা মাখা দাড়ির সমস্ত বোঝাটা নাপিতের কবজিতে জমা হচ্ছে, সে মাথা নাড়াতে পারল না। কেবল বহু কষ্টে আড়-চোখে যতটা সম্ভব চলাফেরা মানুষের আদলগুলোর দিকে তাকাতে থাকে। শেষে, নির্দেশ দিয়ে গোঁফ ছাঁটাল, নখ কাটাল এমন-কি নাকের ফুটো দুটো

দেখিয়ে বলে, 'ছেঁটে দাও ভায়া, বড় বিশ্রী দেখায়।' বিরক্তিতে নাপিতটির কপালে ভাঁজ পড়ে। তিরিশটা পয়সার এত হুকুম।

পয়সা মিটিয়ে, মাথার অবশিষ্ট চুল ক-গাছা আঁচড়ে, মুখটা ফের আয়নায় যাচাই করে খুশি খুশি মনে সে যখন ফিরে আসছিল, মনোরঞ্জনের সঙ্গে দেখা।

'এই যে শহরের বাবু; হাট চরকির বাই চাপল?'

'চরকি দিলাম কৈ? ভাবলাম আপনার দেখা পাবো।'

'বউটা কখন বাড়ি পৌঁছে গেছে; বলছ চরকি দিলাম কৈ?'

মনোরঞ্জনের পায়ে বুট, ময়লা ফুলপ্যান্ট এবং হাওয়াই শার্ট। হাতে কটকটির একটা মস্ত ঠোঙা এবং খেলনা। লোহার কাঠিতে বাঁদর ছট্ করে ওঠে এবং কাঁপতে কাঁপতে নেমে আসে। কুটুম বাড়ি খালি হাতে যাবে? বহুঘুরে এর চেয়ে সস্তা খেলনা সে খুঁজে পায় নি। অমেত্তো বলে, 'দু-চারবার না এলে হাট দেখা যায়? এ মুখো মাড়াতেও চাও না।'

মনোরঞ্জন দুবার ঢোক গিলল। 'ডিউটি! শিপ্টের কাজ, সময় পাই না।'

'যত সময় আমাদের চাষা-ভুষোর! চলো ঘুরে আসি।'

মনোরঞ্জনকে নিয়ে সে ঠেলে-গুঁতিয়ে মাছের অংশে চলে আসে। আঁশটে গন্ধ এলাকাটায়। টাটকা মাছ দেখার লোভে মনোরঞ্জন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। শহরের বরফ-চাপা, ফ্যাকাশে মাছের চেহারা দেখে দেখে ক্লান্ত। মাথা চুলকোতে চুলকোতে অমেত্তো শেষে বিল থেকে ধরে আনা এক টুকরি কৈ মাছের কাছে এসে দাঁড়ায়। কালচে চওড়া মাছগুলোর পেট লালিয়ে উঠেছে। পিঠে কাঁটার সারি নিয়ে লেজ বাঁকিয়ে তেজে এমন কাতরাচ্ছিল, টকটকে লাল কানকোগুলো দেখা যায়। 'কুড়ি টাকা?'—দর শুনে মনোরঞ্জন ঘাবড়ায়। তা হলে শহরের সঙ্গে কি পার্থক্য? ঝোঁকের মাথায় কিনে ফেলে যদি অমেত্তো, তাদেরই জন্য? একটু লজ্জা লাগছিল তার। অমেত্তো চুপ করে থাকে। মাছের সঙ্গে তেল ঝাল-মশলার খরচাটাও আছে। কিন্তু শুভদা আর মনোরঞ্জন কি রোজ রোজ আসে? বছরে নিজের পাতে দু-চারবার তো মাছ জোটে। তা হোক, কুটুমের কাছে সম্মান আছে না তার। মনে মনে হিসেব কষে ছেলেটিকে বড় মাছ ক-টা আলাদা রাখতে বলে। দুজন ফিরে এল পাটের এখানে। আগে খালাস হয়ে, ফেরার পথে এসব কেনা যাবে।

অন্ধকার চায়ের দোকানের মধ্যে জিরাতের সঙ্গে দেখা'। অমেত্তোর বিস্ময় লাগে। জিরাত বসে আছে? রাস্তার দু-পাশে তেমনই পাটের গাড়ি গাদাগাদি হুমড়ি খেয়ে আছে। ব্যস্ত হাইওয়ে দিয়ে আর্তনাদে ছুটে চলেছে লরি, টেম্পো।

'মিঞা সাহেব, কি ব্যাপার?'

জিরাতের চোখ দুটো উদাস। খাড়া বড়শি-নাকটা আনন্দে, ক্রোধে, উত্তেজনায় ভাদ্দরের প্রথম দিকের মতো ফোলে না, সংকুচিত প্রসারিত হয় না। শুকনো ঠোঁট জোড়া পরস্পর চেপে বসে আছে। অমেত্তোর মনে হল এ এক নতুন জিরাত। ভাদ্রের প্রথমে যে মানুষটাকে সে দেখেছিল, এখন শুধু তার ছায়া।

জিরাত মাথা নাড়াল।

'দম শেষ মোদের! পাট নে বাড়ি যাও।'

'কেন?'

'আড়ৎদারের কলে আটকা গেছি। খালি হাতে ব্যবসা হয়?'

'কৈলাস, যাদবরা?'

'সব শালারই পেটে গামছা'—জিরাত যেন উঠে পালিয়ে যেতে চায়।

ভাদ্দরে যাদের সঙ্গে মেজাজে কথা বলেছে, তাদের সামনে গোপন সত্য ফাঁশ করবে ইচ্ছা করছিল না। ফোড়েরা হাটের পাট বাড়িতে জমায় না, আড়ৎদারের গুদোমে তোলে। আর এ-ব্যবসা কি নগদে চলে? চলতে দেয়। বাকি পড়তে পড়তে সমস্ত পুঁজি আড়ৎদারের কাছে আটকে যায়। চৈত্রের আগে দেনা শুধলে ফের ঐ বছরে আবার ফোড়েদের ব্যবসা। তেল মরেছে! বড্ড মুখ-চালাকি। অমেত্তো মনে মনে হেসে উঠে হঠাৎ ভাবল তার পাট? বেচা যাবে না?

আস্তে আস্তে সে এগিয়ে এল হুমড়ি খাওয়া গোরুর গাড়ির দিকে। ছোট ছোট দলে কেউ বাক্-বিতণ্ডায় ব্যস্ত, কেউ ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কেউ মনে মনে ফুঁশছে। এক চাষি অনিচ্ছায় বলে উঠল, 'যাই সরকারি গুদামে।'

'দশ কোশ গাড়ি ঠ্যাঙিয়ে?'—এক বৃদ্ধ চাষি হাতের ছাতাটা মাটিতে ঠুকে চেঁচিয়ে উঠল।

'বাবুদের ঘুষ দেয়ার জন্যি?'

'শালারা, শুকনো পাটেও পানি ছাড়া রা কাটে না।...এমন আমরা

ঢের ঢের দেখেছি।' চাষিদের চোখগুলো জ্বলছে। মনে হচ্ছে অনেক কথা বুকে জমে আছে, ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছে না। প্রথম চাষিটি চুপ করে গেল।

মনোরঞ্জনকে নিয়ে অমেত্তো নিজের গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। বড় ক্লান্ত লাগছে তার। উত্তেজনায় পেটে ব্যথা ওঠে। মনে হচ্ছে নাভিমূল থেকে যন্ত্রণাটা এখনই সাপের মতো মাথা তুলে ধীরে ধীরে সমস্ত দেহটা পাকিয়ে ধরবে। আস্তে পকেট থেকে খাবার সোডা বার করে খানিকটা মুখে ফেলে দিল।

হাটের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে উত্তেজনা স্থায়ী হয় না। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। এখানেও পাটের অংশে বাক্-বিতণ্ডার ছোট ছোট ঢেউগুলো মিলিয়ে যেতে অনিশ্চিত হতাশার ছায়া নেমে এল। ইতিমধ্যে বেলা ঢলতে শুরু করেছে, দুর-দুরান্তের মানুষরা ফিরতে শুরু করেছে। বিড়ি ধরাতেই একজন পাশ থেকে বলে গেল, 'মালিকরা পাটকল বন্ধ করেছে…কারা কিনবে এ মাল? বাড়ি নিয়ে ঝোল খা সব।'

অমেত্তো আচমকা ঘুরে মনোরঞ্জনের দিকে তাকায়। সে তখন কটকটির ঠোঙাটা বুকে জড়িয়ে করুণভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ধরা পড়ে গেছে যেন। ছায়ার মতো মাথা দোলালো, ঠোঁঠের কোণে ম্লান হাসির চাপা বেদনা ফুটে উঠলো এবং ক্লান্ত চোখজোড়া মনোরঞ্জন এমন ভাবে পিট পিট করতে লাগল যেন হেমন্তের শেষ বিকেলের হাওয়ায় শুষ্ক, শীর্ণ তেঁতুলের পাতা থির থির কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে ঘুরে মাটিতে পড়ছে।

অমেত্তোর কল্পনায় ভেসে উঠল সার সার উর্ধ্বমুখী চিমনিগুলো শূন্যে তাকিয়ে আছে, ধোঁয়া উঠছে না। 'মিষ্টি লাগল না?…'ইস আবার দাড়ি রাখা হয়েছে। এমনিতে কি বলে চাষা-ভুষো।' অমেত্তো শুভদার জন্য বেদনা অনুভব করে। জৌলুসহীন দেহে, শুভদার হাসি হাসি চোখ জোড়ার কথা ভেবে বুঝল কেন চিঠি পেয়েই দিন কয়েকের জন্য ছুটে এসেছে ওরা।

মনোরঞ্জনের হাতের ঠোঙাটা নিয়ে হেসে বললো, 'খাও তো, কেবল বয়ে বেড়াচ্ছ।' দু-জনেই দু দু-মুঠো কটকটি চিবিয়ে পেট ভরে জল খেয়ে, চায়ের জন্য দোকানে গিয়ে বসল। 'পাটগুলো পড়ে থাকবে!' মনোরঞ্জনের গলায় অনুশোচনা।

ঘণ্টাখানেক পর, হাট আরও হালকা হয়ে যেতে, কার্বাইডের আলোর মালা জ্বলে উঠবার আগেই ঘূর্ণির মতো পাটের মহল দুলে উঠলো। বাতাস

কাঁপিয়ে, হু হু আওয়াজ করে আড়ৎদারের দু-দুটো লরি উপস্থিত। হাটে হাটে পাট কুড়িয়ে শেষে দিঘড়ায় এসেছে। এমন ভাবে খাতা, টাকা এবং দাঁড়ি-কাঁটা নিয়ে লাফিয়ে পড়ল যেন সৈন্যদল ঢুকে পড়েছে কোনো অধিকৃত জনপদে। চাষিদের মধ্যে উত্তেজনা, ছোটাছুটি দেখা গেল। কে কার আগে পাট দেবে এই নিয়ে কাড়াকাড়ি। নিয়ম নাই, বাদ-বিচার নাই— ওজনের অভিনয় শেষ হতেই লরিতে তুলে দেয়। যেমন খুশি পানির ওজন বাদ, যেমন খুশি দর দেবে তারা। যেন লুঠ-পাঠ হচ্ছে সব। 'দেবেন না, দেবেন না পাট! ফিরে যাই চলুন!' মনোরঞ্জন চাপা উত্তেজনায় ফিসফিস করল। লরি থেকে নেমে আসা একজন মানুষ বুট ধুতি আর টেরিলিনের পাঞ্জাবি পরে যেমন নির্লিপ্তে সিগারেট টানছিল, সেই ভঙ্গিতেই মনোরঞ্জনকে ছোট্ট করে দেখল শুধু। একজন অমেত্তোর পাটের দিকে এগিয়ে যেতে, সিগারেট টানতে টানতে বাধা দিয়ে বলল, 'থাক! মাল যে যার টেনে আনবে।' হঠাৎ এই নিষ্ঠুর নিয়মে অমেত্তো অবাক হয়ে যায়। শেষে নিজেই বুক, পিঠ, মাথায় টেনে টেনে লরির কাছে ভিড়ে গুঁতোগুঁতি করতে লাগল।

সব কিছু চুকিয়ে দিতে লাগল মিনিট কুড়ি। অমেত্তো পেল তিরিশ করে দর, এগার সের পানির ওজন বাদ। দু-জনে ফিরে এসে দেখল বলদ দুটোর ক্লান্ত জাবর কাটা। গাড়িটার আনাচ-কানাচ দু-চারটে আঁশ আটকে আছে। মনোরঞ্জনকে দাঁড় করিয়ে অমেত্তো নিঃশব্দে হেঁটে গিয়ে থলিতে কিছু কৈ মাছ নিয়ে ফিরল। 'চলো, যেতে রাত হবে।'

সারা রাস্তা দুজনের বিশেষ কথা হল না। দু-মুঠো কটকটি চিবোল শুধু। অমেত্তো বলদ দুটোর উদ্দেশ্যে টাক টুক শব্দ করে যায়। গ্রাম-গাঁয়ের পথ, গাছ-গাছালিতে সন্ধ্যারাতেই আঁধার জমে উঠেছে। দীর্ঘ সময় পর, পেঁচো ঠাকুরের থানে নিসঙ্গ প্রদীপটি জ্বলতে দেখে অমেত্তো কপালে হাত তোলে। 'এই আমাদের থান গো কুটুম!' মনোরঞ্জন দেখল, জবাব দিল না।

বাড়িতে ঢুকে মনে হল অদ্ভুত খুশির আমেজ বইছে। শুভদা এসেছে। অনেক দিন পর। হাটের টানাপোড়েনে মধুর করে ভাবতেই পারে নি, যেন চাপা মেঘের আড়ালে দিন বয়ে গেছে। পেছন উঠোনে জাম গাছটার গোড়ায় গাড়িটা রেখে, বলদ দুটো ঢুকিয়ে দিল গোয়ালে। দু-গাছি পচাটে খড় মুখের সামনে ফেলে, দাওয়ার সামনে দাঁড়াতেই দেখে পা ধোয়ার জল। একটু বে-নিয়ম যেন আজ। খুশিতে ধুলো-কাদা মাখা কর্কশ, ফাটা

থ্যাবড়ানো পায়ের পাতা জোড়া দেখে মনে মনে লজ্জা পেল সে। শুভদার চোখ মুখে কাঁপা-কাঁপা লম্ফের আলো। মানদার সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। জলের বালতিটা দেখিয়ে হেসে বলে, 'হাটটা কি মাথায় করে ফিরলেন? নিন, ঘরে উঠুন। বাইরে গেলে আর ঘরের কথা মনে থাকে না। বুঝলি দিদি, আমার কপালেও তাই।' মানদা খ্যান খ্যান করে ওঠে—'তোমার আক্কেলখানা কি গো? মনোরঞ্জনকে নিয়ে দিনটা শেষ করে দিলে? ওর খিদে তেষ্টা নেই? এই না হলে কুটুম?' মনোরঞ্জনের হাত থেকে খেলনা আর কটকটি পেয়ে ছেলে-মেয়েরা তখন মহানন্দে হৈ চৈ করে বাঁদরটাকে ছুট করে তুলে কাঁপাতে কাঁপাতে নামিয়ে আনছে। তারকনাথের মনে হল সত্যিই বাড়িতে আজ উৎসব। অনেক রাত পর্যন্ত উঠোনে-দাওয়ায় আলো জ্বালা থাকলে তার এই ভাবনাটা আসে।

শুভদার হাতে মাছের থলিটি তুলে দিতেই ভেতরটা খলবল করে উঠল। কৈ মাছ সহজে মরে না। আলোতে দেখে বলে, 'ইস এক বিঘৎ করে! জামাইবাবু।' খুশি এবং তৃপ্তির হাসিতে অমেত্তোর দিকে তাকায় সে।

'হাটে কি আর হজি-গজি করতে যাই? আমরা হলেম গে চাষা, দশ মোন তেল না পোড়ালে রাধা নাচে না। ভালো দর না পেলে মাল বেচবো? যতই আমাদের তেল দাও না কেন। তারপর দেখেশুনে মাছ-টাছ কিনতে বেলা ঢলবে না? ভালো করে রাঁধ দিকিনি? সেই ক-বছর আগে তোর হাতে শোলের ঝাল খেয়েছিলাম।'

মানদা তখন মনোরঞ্জনের সামনে চা-মুড়ি আর কিছু তিলের নাড়ু এনে দিয়েছে।

অধিক রাতে রান্নাঘরে মানদার তত্ত্বাবধানে শুভদা দুজনকে খেতে দিলে, ফের এক দফা খাদ্যের আলোচনা উঠল। অমেত্তো ভোজনরসিক, গ্রামে খাইয়ে বলে তার সুনাম আছে। কোনো এক বিয়ে বাড়িতে সব কিছু খাওয়ার পর বাজি রেখে এক গামলা পাটালির পায়েস সাবাড় করেছিল বলে আজও আলোচনা হয়।

'হ্যাঁ, রেঁধেছিস বটে। এই কৈ-এর ঝালই ভালো। গাঁয়ের হরিপদ বউয়ের রান্না বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায়, ব্যাটা যদি এর এক ফোঁটা জিবে তুলত।'

মোটা মোটা আঙুলের মস্তগ্রাসে তেল ঝাল মাখা গরম ভাতগুলো হুসহাস মুখে চালান দিয়ে অমেত্তো ঈষৎ চোখ বুজে কৈ মাছের মাথা

চিবোতে থাকে। মনোরঞ্জন খায় ধীরে, ছোট ছোট গ্রাসে সাবধানে কাঁটা বেছে। এতটা রান্নার প্রশস্তি মানদার ভালো লাগে না। মনে ভাবে তার মিনসে বেশি আদিখ্যেতা করছে। আর বোনের ব্যাপারে ভাবল অত তেল-ঝাল ঢাললে কার হাতে না রান্না ভালো হয়। ইস্ সযত্নে রক্ষিত সারা মাসের তেল-ঝালটুকু বোধহয় শেষ করে দিল।

অমেত্তোকে ঠেস দিয়ে বলল—'শুভো আমাদের নিয়ে যেতে চায়। কিছুদিন ভালো-মন্দ খেয়ে জল হাওয়া পালটালে শরীর স্বাস্থ্য ফিরবে।'

শুভদা সামলে নেয়।

'তোরা কি গরিব বোনের বাড়ি যাবি? ইস্ কি চেহারা হয়েছে ছেলেটার? তোরা যদি না যাস আমরা আর আসব না।'

মানদা বলে—'আমার বাড়িতে কে ক-দিন থাকে? তোর ছেলে-মেয়েরা বুঝি ভালো আছে? এ যাত্রা যদি দিন দশ না থাকিস, কোনো সম্পর্ক রাখব না।'

অমেত্তো নীরবে মাছের মাথার ছিবড়ে থেকে রস চুষতে চুষতে জবাব দিতে গিয়েও চুপ করে রইল। হঠাৎ মনে হল বুদ্ধিমতী, শহরের শুভদার কাছে কিছু লুকোনো যায় নি। কেন তবে নিয়ে যাওয়ার জন্য এত পীড়াপীড়ি? আজকের হাটের ঘটনা মনে কাঁটা বিঁধোতে শুরু করল॥ মনোরঞ্জনও বোকার মতো তাকিয়ে দু-বোনের কথা চালাচালির মধ্যে ছোট্ট গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়ল।

শুভদা হেসে বলে—'কি থাকব দিদি, ভোর ছ-টায় ওর রোজ ডিউটি না? কাজের কি চাপ? নিজে তো রান্না-বান্না জানে না।'

মানদা বলে—'আমরা বুঝি হাই তুলে দিন কাটাই? ধান-পাটের হিসেব, চাষ-বাস, বীজ। ঘর থেকে মাল কেনার জন্য পা টানাটানি। আমাদের কি ফুরসৎ আছে? ওরই মধ্যে তোরা যদি পাঁচ দিন থাকিস, আমি গিয়ে না হয় দিন পনেরো থাকলাম।'

শুভদা গম্ভীর হয়ে বলে—'বেশ তোরা আগে তিনদিন থাকবি, আমি পনেরো কেন, একমাস থাকবো। জামাইবাবু কি বলেন।'

'বাঃ, মনোরঞ্জন চুপ করে থাকবে কেন? জামাইবাবু পরেই বলুক।'

নৈশব্দের আড়ালে ভাতের গ্রাস মুখে তোলা যখন এ দুজনের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠছিল, একটা গুরুত্বপূর্ণ জবাবের জন্য সমস্ত রান্নাঘরটা থমকে ছিল যখন এবং প্রসঙ্গটা কিছুতেই অন্তিম সিদ্ধান্তের সন্ধিক্ষণ এড়াতে

চাইছিল না, দরজার সামনে হাউ-মাউ চিৎকার অনুযোগে এরা সচকিত হয়ে ওঠে ?

'ভেঙে দিয়েছে। খেলনার বাঁদরটা ভেঙে দিয়েছে। মিথ্যে বলবি না, তুই, তুই ভেঙেছিস। আমি চাপ দিচ্ছিলাম, তুই টেনে ধরলি কেন ?'

দুই পরিবারের শিশু ভাইবোনেরা অবোধের মতো ভাঙা খেলনার জন্য কান্না জুড়ে দিতেই, অমেতো নিশ্চিন্তে চিৎকার দিয়ে মানদাকে বলল—এই জন্য বলি কোথায় থাকবে ! এরা দু-দণ্ড শান্তিতে থাকতে দেবে ?

মনোরঞ্জনেরও একই সমস্যা ! শুভদাকে সাক্ষী মেনে বলে—'এদের জালায় থাকবার জো আছে !'

সব কিছু প্রসঙ্গ মিলিয়ে যেতে নিঃশব্দে খাওয়া এবং বাসন গুছোনো চলতে থাকে শুধু ।

নীহাররঞ্জন রায়

কমলা মুখোপাধ্যায়

প্রয়াত অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের পাণ্ডিত্য ও শিল্পজ্ঞান বা শিল্পরসিক হিসাবে তাঁর খ্যাতির পরিচয় সুবিদিত, তার পরিমাপ করা আমার মতো একজন সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে আমি বিশেষ একটি দিকের কথা উল্লেখ করছি—তা হলে হয়তো তাঁর কর্ম-পরিধির ব্যাপকতা বোঝা যাবে।

বহুজনেই জানেন, রবীন্দ্র-ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য দ্বারা তিনি আবাল্য উদ্বুদ্ধ কিন্তু তৎকালীন বিদেশী শাসনকালে স্বদেশ প্রেমিক হিসেবেও তাঁর কিছু পরিচয় আছে। সে-পরিচয় প্রায়শই উল্লিখিত হয় না। সেদিনকার রাজনৈতিক চেতনা ও ভাবনা পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়েছিল, তার দ্বারাও তিনি কম প্রভাবিত হন নি। তবে তাঁর জীবনকার্যে সেটা ছিল হয়তো গৌণ। কিন্তু স্বাদেশিক চেতনা কখনও বিলুপ্ত হয়নি বরং আরও বিস্তৃত ভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন তিনি সারা জীবনে।

একই দেশের ও শহরের বাসিন্দা হওয়াতে আশৈশব তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, কিন্তু তাঁর প্রধান কর্মকাণ্ডের পরিধির মধ্যে পড়তাম না বলে কিছুটা দূরেই থেকেছি। ১৯৮০ সালে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও অন্য কয়েকটি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা গত ২০০ বছরের একটি বিদ্রোহ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করার সংকল্প গ্রহণ করি। তার মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসী ও কৃষক বিদ্রোহ থেকে সুরু করে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, বাংলা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের যে বিস্ফোরণ দেখা গেছে, সেগুলিরই একটা ইতিহাস নিয়ে ভারতের বিভিন্ন গবেষক ও অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা লেখাবার চেষ্টা করি। বাল্যকালের পরিচয়-সূত্র ধরে নীহাররঞ্জনকে যখন আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হতে অনুরোধ করি, তখন তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। এটি শুধু সাধারণ সম্মতি নয়— গত ১৯৮০ মে মাস থেকে মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তিনি আমাদের ঐ স্মারক গ্রন্থ সঙ্কলনে যে ধরনের সাহায্য করে গেছেন তার তুলনা নাই। সমস্ত প্রবন্ধের সংখ্যা ৩৫/৪০-এর কম হবে না। সেগুলি তো দেখেছেনই, কোনগুলি উপযুক্ত নয়, কোথায় ফাঁক আছে, কাকে আরও বলা দরকার—

সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ ও সক্রিয় সাহায্য করেছেন সর্বদাই। বোম্বেতে যখন যেতেন তখন ডঃ এ. আর দেশাইকে অনুরোধ করেছেন, এখানে নানাবিধ সমালোচনার উত্তর দিয়েছেন। সমগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার যথাযথ মূল্যায়ন হয় যাতে তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। অতীতে তিনি অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, সব ধরনের দল ও তাদের কাজ যাতে একটি সমগ্র বিচিত্র এই বিদ্রোহ স্মারক গ্রন্থে পরিস্ফুট হয় তাই ছিল তাঁর চেষ্টা। অসংখ্য কাজের মধ্যে এই কাজেও তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। সরকারি সাহায্য পেতে হয়তো দেরি হবে—সেজন্য গ্রন্থপঞ্জি তৈরির কাজ যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য কয়েক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে গেছেন—বলেছেন 'পরেই না হয় শোধ করে দিও।'

তাঁর মৃত্যুতে আমাদের দিক থেকে শোক প্রকাশ করার যথার্থ ভাষা নাই। তাঁর স্থানে দ্বিতীয় ব্যক্তি কে হতে পারেন—তার সন্ধান এখনও পাই নি। ঐ রকম উদার ও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি—রাজনৈতিক আন্দোলনের সব দলের ও সব মতের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান, অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্রকে আবিষ্কার, কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সর্বশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার স্তর আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মূল্যায়ন করা ও করানোর জন্য তিনি ছিলেন যথার্থভাবে অদ্বিতীয়। আমাদের এই কাজে তাঁর স্থান অপূরণীয়।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'—চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে

পূর্ণেন্দু পত্রী

চিত্রনাট্যটি শারদীয় ১৯৮১-তে বেরিয়েছিল স. প.

অজ পাড়াগাঁর আপাদমস্তক রোমান্টিক ছেলেটি ৫১।৫২-র কোনও একটা সময় থেকে লেখা-জোখায়, এমনকি জীবনযাপনে, হঠাৎ হয়ে উঠেছিল ভীষণ রাজনৈতিক। নিজেকে আটকে রাখার মতো কোনো সোনার খাঁচা না পেয়ে, সে তখন মাঝে মাঝেই ডানা ছড়াত মুখস্থ কলকাতার চৌহদ্দির বাইরে। তবে তাকে বিবাগী বাউল ভাবলে ভুল হবে। বরং অনিসন্ধিৎসু কোনো পরিব্রাজক ভেবে নিলে, খানিকটা সত্যি হতে পারে। কেননা তার মধ্যে তখন সত্যিই জেগে উঠেছিল, নিজেকে জানার গরজে, নিজের দেশকালের জ্বলুনি-পুড়ুনির কতটা ছাই আর কতটা ছাই-চাপা আগুন, তার হিসেব-নিকেশটাকে নিজের চোখের কষ্টিপাথরে ঘষে-মেজে

জেনে নেওয়া। যে-সব জায়গাকে তখন বলা যেতে পারতো কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের এক-একটা দুর্গ, সেই সব জায়গার দিকেই ছিল তার নাড়ীর টান। পার্টির কোনও না কোনও কর্মকর্তার কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া চিঠি বা অনুমতিপত্র পকেটে পুরেই সে ছুটতো হাওড়া-হুগলী-চব্বিশ পরগনার দূর-দূরান্তের গ্রামে-গঞ্জে। কখনো একটানা পনের দিন, বা মাসখানেকের পর কলকাতায় ফিরে এসেই উপুড় হয়ে বসে পড়তো টাটকা অভিজ্ঞতার মালমশলা নিয়ে ভ্রমণকাহিনীর মতো লিখতে। সেসব লেখা ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েও ছিল 'নতুন-সাহিত্য' পত্রিকায়, 'অন্যগ্রাম, অন্যপ্রাণ' নামে।

ইতিমধ্যে তার পড়া হয়ে গেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প, 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। এই আশ্চর্য গল্পে সে অভিভূত তখন। এ এমন এক গল্প যাতে প্রতিবাদ নেই, অথচ পড়া শেষ হলে মনে হয় দূরাগত কোনো প্রতিবাদের প্রতিধ্বনিতে রিন্ রিন্ করছে সারা শরীর। এ-গল্পে সরাসরি কৃষক বা তেভাগা আন্দোলনের ঘটনা নেই। অথচ যেন প্রত্যক্ষ করতে পারা যায় সে-আন্দোলনের উত্তেজক গতি-প্রকৃতি। এ-গল্পের নায়ক চরিত্র এমন নয় যে বলা যাবে—অপরাজেয় যোদ্ধা। যে সময়ের কাহিনী সে-সময়ের প্রতিরোধী সংগ্রামের চেয়ে গল্পে যেন সমকালীন সন্ত্রাসের রাক্ষুসে আকৃতিটাই প্রকট। এমনকি এ গল্পে দিনের আলোর চেয়ে জনমানবহীন রাত্রির ঘনান্ধকারটাই পরিমাণে অধিক। অথচ পড়া শেষ হলে মনে না হয়ে উপায় নেই যে, এটা হেরে-যাওয়া মানুষের কাহিনী নয়।

ছেলেটি মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করত, তাহলে কিসের দাপটে এ-গল্পের শিরদাঁড়াটা খাড়া? সেদিন উত্তর জোগাতে পারেনি নিজের প্রশ্নকে।

এ-গল্প পড়ার অনেক বছর পরে, ভ্রাম্যমাণ হিসাবে সে একদিন হাজির হল বড়া কমলাপুরে। দীর্ঘদিন সেখানে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করল সেখানকার দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের ইতিহাস, তার হাহাকারময় উৎস থেকে জয়ধ্বনিময় উপসংহার।

আর তখনি তার আলগোছে জানা হয়ে গেল, এই বড়া কমলাপুরই মানিকবাবুর গল্পে হয়েছে ছোট বকুলপুর। সে প্রশ্ন করল, তাহলে কী মানিকবাবু এখানে এসেছিলেন? উত্তর শুনল, না। তবে পার্টির উপর

মহল নির্দেশ দিয়েছিল যেতে। মানিকবাবু না গিয়ে, যাওয়ার হুকুমত-নামার বিরুদ্ধে মৌন প্রতিবাদ জানিয়েই, লিখেছিলেন এই অবিস্মরণীয় গল্প। এমন হওয়াটা আস্বাভাবিক নয়। কারণ মানিকবাবুর মতো আগ্নেয় প্রতিভার কাছে নিছক ফটোগ্রাফিক রিয়্যালিজমের দাম তো কানাকড়ি। আর বড়া কমলাপুরের গনগনে অভিজ্ঞতার আলোয় ছেলেটি বুঝে গেল, গাছ যে ভাবে অনেক উঁচুতে উঠেও জানে কী ভাবে তলার শিকড়কে মাটিতে নামিয়ে শুষে নিতে হয় জীবনধারনের উপাদান, মানিকবাবুর ঠিক সেইভাবেই বড়া কমলাপুরের আন্দোলনকে জানা।

আন্না তার অকপট সাহসেও কত সরল। দিবাকর তার নির্ভেজাল সরলতাতেও কত কঠিন। গগন ঘোষ নিজেকে লুকিয়ে-সরিয়ে, যেন তার চারপাশের অগ্নিময় পরিবেশ সম্পর্কে নিতান্তই উদাসীন, এক ভীতু গাড়োয়ানের মুখোশ পরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেও, তার আসল মুখ বা মনটাকে খোলা দরজার মতো বিস্তীর্ণ করে দিতে বাধ্য হয় যেন নিজেরই অন্তর্গত বেদনা-বিক্ষোভের দুঃসহ চাপে। সব মিলিয়ে এই তিনটি চরিত্রকে উদ্ভিদ-অরণ্য, জল-মাটি, আগুন-ফসফরাস, এবং আলো-বাতাসের মতো এমনই স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক ঠেকে যে, এদের অবিনাশী এবং অবশ্যম্ভাবী জয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থাকতে পারি যেন চোখ বুজিয়েই। আর তখনই বোঝা হয়ে হয়ে যায়, মানিকবাবু মানুষকে জানতেন তত্ত্বে নয়, রাজনীতিগত কোনো তাৎক্ষণিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে নয়, জানতেন আয়ত্তাধীন মনন এবং উপলব্ধির নিয়ত-সচেতন চর্চার মাধ্যমে জীবন এবং সময়ের যাবতীয় সমস্যাকে বিশ্লেষণ করার দক্ষতায়।

বড়া কমলাপুর থেকে ফিরে আসার পর এই বিশেষ গল্পটির উপর একটা গোপন দখলদারির অধিকার বর্তে যায় যেন তার ভিতরে। আরও বহু বছর পরে সে ঝাঁপ দেয় চলচ্চিত্রে। কিন্তু নিজের অক্ষমতাকে চেনে বলেই, রবীন্দ্রনাথের পর তার সবচেয়ে প্রিয় লেখকের এই কাহিনীকে চলচ্চিত্রের ক্যামেরার সামনে হাজির করতে সাহস পায়নি সে। আর এইভাবেই গল্পটিকে ক্রমশ ভুলতে থাকে। ১৯৮০-র গোড়ায় কিংবা ১৯৭৯-র শেষ দিকে ছেলেটি, তখন অবশ্য সে খানিকটা পরিণত যুবক, গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল একটা বই। পাবলো নেরুদার মেমোয়ার্স। পড়তে পড়তে এসে গেল সেই অধ্যায় যেখানে নেরুদা আসছেন ভারতবর্ষে, পকেটে বিশ্ব-শান্তি আন্দোলনের কর্মসূচী সংক্রান্ত একটা চিঠি, যা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর

উদ্দেশ্যে মাদাম কুরীর লেখা। নেরুদা দূত মাত্র। যথাসময়ে পালামে পৌঁছেছেন তিনি। আর এয়ার পোর্টে পা দিতে-না-দিতেই আক্রান্ত। আক্রান্ত মানে এই নয় যে শারীরিক ভাবে ক্ষতবিক্ষত। আক্রান্ত অর্থে কমিউনিস্ট অথবা সন্দেহভাজন কোনো গুপ্তচর হিসেবেই তাঁকে মুখোমুখি হতে হল কাস্টম অফিসারের:পোশাক-পরা সেই স্ফিংক্সের, যার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারলে আত্মসম্মানের মৃত্যু। যেহেতু সন্দেহভাজন, সুতরাং শুরু হয়ে গেল খানাতল্লাসী। স্যুটকেশে অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ছিল খবরের কাগজে জড়ানো জুতো। মন্ত্রনা তদন্তের পক্ষে জুতোর সঙ্গে জড়ানো সেই ছেঁড়া বাসী খবরের কাগজটাও হয়ে উঠল একান্ত জরুরী। এই ছেঁড়া খবরের কাগজের বিবরণের সামনে পৌঁছনো মাত্রই যুবকটির মনে দপ্ করে জ্বলে উঠল ছোট বকুলপুরের স্মৃতি। সেখানেও তো পানের খিলিতে জড়ানো একটা ইস্তেহারই ছিল অত্যাচারের এবং জবাবদিহির মূল উপলক্ষ।

যুবকটি আব.র সচেতন হয়ে উঠল ভুলে-যাওয়া প্রিয় গল্পটির প্রসঙ্গে। এরই মাত্র ক'মাস পরে কলকাতায় 'ক্যালকাটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল', উদ্বোধনের দিনেই যুবকটির বরাতে সুযোগ এসে গেল তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে নিভৃত এবং নিজস্ব কিছু কথোপকথনের। তখনই ছোট বকুলপুরের যাত্রী-র চলচ্চিত্রায়নের প্রসঙ্গ। মন্ত্রী উৎসাহ জোগালেন শোনা মাত্রই। যুবকটি চেয়েছিল পূর্ণাঙ্গ ছবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হল স্বল্প দৈর্ঘ্যের মাপ।

এবার চিত্রনাট্য লিখতে বসে যুবকটিকে মুখোমুখি হতে হল নানা সমস্যার। মূল কাহিনীতে গল্প শুরু হয়ে গেছে প্রধান দুটি চরিত্রের ছোট বকুলপুর অভিমুখে অভিযান থেকেই। চলচ্চিত্রও যদি এই অভিযান থেকে শুরু হয়, তাহলে গল্পের পিছনে টাঙানো তখনকার বিদ্রোহে-বিপ্লবে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে টগবগিয়ে ওঠা সময়টাকে, আঁচে-আভাসে হলেও ধরবে কোন্ উপায়ে? এর সবচেয়ে সহজ উপায় তার জানা ছিল। নানা সময়ে নানা মানুষের কথোপকথন। কিন্তু যুবকটি সেই সহজ রাস্তায় পা বাড়াতে গররাজি। বেশ কিছুদিন থেকে কথা-ভারাক্রান্ত চলচ্চিত্র সম্পর্কে সে বেশ বিরক্ত। নির্বাক চলচ্চিত্রের শুদ্ধতাই নয় শুধু, বোধ-বুদ্ধি-কল্পনাকে সজীব করে রাখার যে-সংযমী অনুশীলন, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠছে সে ক্রমে ক্রমে। যখন চিত্রনাট্য মাঝপথে, সেই সময়েই সে পেয়ে গেল এক

অবাধ সুযোগ, আইজেনস্টাইনের অসমাপ্ত 'কুয়ো ভিভা মেকসিকো'-র সেই সমাপ্ত সংস্করণটি দেখার, যা তাঁরই অন্তরঙ্গ সহকারী আলেকজান্দ্রভ-এর হাতে তৈরি। নির্বাক এই ছবির গড়ন, একই সঙ্গে জীবন মৃত্যুকে নিয়ে এর দুঃসাহসী কারুকাজ, আর আবহসঙ্গীত, এই তিনটি বিষয় তাকে বিস্মিত এবং বিহ্বল করে তুললো এমন ঝাঁকুনিতে, যেন এই প্রথম তার কোনো চলচ্চিত্র দেখা। প্রতিজ্ঞা-পালনের মতো একরোখা ভঙ্গিতে সে তার নিজের চিত্রনাট্যকে গড়তে লাগল যতখানি সম্ভব নির্বাক করে। এমন কি ছবির কাঠামোয় জুড়ে দিল সম্ভাব্য মৃত্যু-আশঙ্কারও একটি পর্ব। আর সেই সঙ্গে আইজেনস্টাইনের প্রতি তার প্রণাম নিবেদনের নিদর্শন হিসেবে সে ছবির শুরুতেই নিয়ে এল এক গুচ্ছ ক্যাকটাস। সে ক্যাকটাস হুবহু মেকসিকোর নয়, যার ভালবাসায় পড়েছিলেন আইজেনস্টাইন। এ ক্যাকটাস ভারতীয় এবং গ্রাম্য। তবে মেকসিকোর 'immoleile grey-green cactus—the magney—their speers as sharp as naked swords-এরই নিকটতম আত্মীয় এরা।

এর পরে এল আবহসঙ্গীতের সমস্যা। 'কুয়ো ভিভা মেকসিকো' থেকেই সে যেন পেয়ে যায়, অন্য এক প্রেরণা। সে লক্ষ্য করে, ঐ ছবিতে সঙ্গীতের ভূমিকা আক্ষরিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক। অর্থাৎ দৃশ্যত যা-ঘটছে সে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে না সুরে, যা এখন ঘটছে না, অথচ ঘটার নীরব প্রস্তুতি চলেছে আপাত-নিস্পৃহ দৃশ্যের অভ্যন্তরে, সে এগিয়ে এসে সেই সংবাদ শুনিয়ে যাচ্ছে আমাদের। তাই, পরে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে এমন সব চরিত্র যখন দাঁতে দাঁত চিপে বোবার ভঙ্গিতে বসে থাকে, আবহসঙ্গীত তখন অধৈর্য হয়ে ওঠে উত্তেজনায়, কেননা ঐ সব মূঢ় ম্লান মূক অবয়বের রক্তের ভিতরকার গোপন গর্জনের সংবাদ জেনে গেছে সে ইতিমধ্যেই।

এই সময়েই যুবকটির মনে পড়ে যায় নাইনথ্ সিম্ফনি-র কথা। মনে পড়ে যায় কোথায় যেন পড়েছিল ঐ সিমফনি সম্বন্ধে এই প্রশস্তি—

'It is as an expression of unbroken confidence in the future, not as celebration of an existing victory.'

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' শেষ হয়নি কোনও জয়ধ্বনিতে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি, গল্পের বিভিন্ন স্তবকে ছড়িয়ে দেওয়া লেখকের নানাবিধ তীব্র তিক্ত কটাক্ষ-বিদ্রূপকে ছুঁয়ে-ছুঁয়েই, এ-কাহিনীকে অনুসরণ করে আমরা যদি আরো হাঁটতে থাকি, পৌঁছে যাবো সুস্থির ভবিষ্যতের সিংহদ্বারেই।

অগত্যা, যুবকটি, প্রায় মরীয়া আবেগেই, তার এই চলচ্চিত্রের জন্যে আবহসঙ্গীত হিসেবে বেছে নিল একমাত্র 'নাইনথ্ সিমফনি'-কেই। কাহিনীর দিবাকর যখন উলঙ্গ হিংসার অত্যাচারে রক্তাক্ত এবং বিধ্বস্ত, সেই বিড়ম্বিত মুহূর্তেই সে দর্শকদের শোনাতে চাইল 'হিউম্যান ব্রাদারহুডের' অপরাজেয় জয়গান।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

'পরিচয়'-এর

২৩.৯.৩৮

হিরণ-এর ডাকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে পরিচয়-এর আড্ডা কামাই গেছে। ফিরে এসে হিউজেস রচিত 'ইনহাজার্ড' বইখানার সমালোচনা শেষ করে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। দেখি সুধীন্দ্র কিরণ মুকুজ্জে ও সুশোভন সরকার য়ুরোপের রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনায় মুখর। নীরব শ্রোতা যামিনী রায় শূন্য দৃষ্টিতে বসে আছেন। সুধীন্দ্র আমাকে দেখে, বোধ করি লেখা নিয়ে এসেছি লক্ষ্য করে, একটু করে হেসে মুখ ঘুরিয়ে কিরণকে বললেন, হিটলার-এর কথা কি বলছিলেন ?

কিরণ বললেন, হিটলার-এর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে এখন এক পর্যায় দাঁড়িয়েছে যে য়ুরোপে তাঁর আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

সুধীন্দ্র বললেন, সেজন্যে দায়ী ব্রিটিশ পলিসি। জার্মানির মধ্যে কোনো অন্তর্বিরোধ বেধে গিয়ে বলক্ষয় হয় ব্রিটেনের শাসকেরা তা চায় না। কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়ে নেপথ্য থেকে নাৎসিদের শক্তিশালী হতে দেওয়া হচ্ছে উদ্দেশ্য।

সুশোভন বললেন, আসল উদ্দেশ্য হল রাশিয়াকে কোণঠাসা করে রাখা।

কিরণ বললেন, ফ্রান্সকে এমন কাবু করে রাখা হয়েছে যে ফ্যাশিস্ট বিরোধী দলগুলো কোনো সাহায্যই পাচ্ছে না। ফ্রান্স এখন এমন দুর্বল যে উদ্যম দেখাতে গেলে মার খেয়ে মরবে !

সুধীন্দ্র হেসে বললেন, আমি কিন্তু ফ্রান্সকে দুর্বল মনে করি না—একটা জাতকে মেরে ঠাণ্ডা করা অত সহজ নয়। তা ছাড়া সকলেই জানে যে জার্মানির অস্ত্রশস্ত্র নিকৃষ্ট। শুনতে পাওয়া যায় যে সার অঞ্চলটি অধিকার করবার সময় হিটলার তাঁর জেনারেলদের বলেন যে ফ্রান্স আক্রমণ করলে তিনি আত্মহত্যা করবেন আর তখন তারা প্যারিসের সঙ্গে যা হোক রফা করতে পারে।

এর পর কয়েকজন সভ্য এসে পড়লে পি ই এন ক্লাবের অধিবেশনের কথা উঠল। তার পর যামিনী রায়ের ছবির প্রদর্শনীর আলোচনা শুরু হতে আমি উঠে পড়লাম।

৪.১১.৩৮.

কানপুর ও রাজপুর—মুসৌরিতে কয়েক সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে যখন বৈঠকে হাজির হই তখন শীতের মরসুম। সকলের পরিধানে গরম কাপড। হারীতকৃষ্ণ, নীরেন, প্রবোধ বাগচী ও আইয়ুবকে কখনো বিলিতি 'পোশাক' পরতে দেখিনি। তারতম্য দেখা যেত গায়ের চাদরে। নীরেন চাদর জড়াতেন না। তিনি ফতুয়ার ওপর একটা পশমের জামা অথবা পাঞ্জাবির ওপর জহর কোট পরতেন। আজ অবশ্য অনেকে আসেন নি। সাহেবি পোশাকে ছিলেন সুধীন্দ্র, কিরণ মুকুজ্জে, কে একজন রায় আর লিগুসে এমার্সান। সুধীন্দ্র ভ্রমণ কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। সবই ভারতবর্ষের মধ্যে কিন্তু কষ্টসাধ্য। আমি রাজপুর থেকে পাকদণ্ডি ধরে মুসৌরির ল্যাণ্ডোর বাজার থেকে হঠাৎ দেখা তুষার পর্বতমালার কথা বলতে সুধীন্দ্র তাঁর এক অভিযানের গল্প শোনালেন। পনের হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে বরফে প্রায় জমে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল সেখান থেকে তুষার শৃঙ্গগুলির সৌন্দর্য মনে হচ্ছিল অপার্থিব।

কিরণ মুকুজ্জেকে হিটলারে পেয়ে বসেছিল—আমাদের নৈসর্গিক স্বপ্ন ভঙ্গ করে বলে বসলেন। লোকটা তামাম দুনিয়াকে দাবড়ে রেখে নিজের অভীষ্ট মতো চাল চেলে যাচ্ছে।

২.১২.৩৮.

সুধীন্দ্রর অনুপস্থিতিতে সুমন্ত্র তাঁর বিশাল দেহ টেনেটুনে সোফাগহ্বর থেকে তুলে জানালেন গৃহকর্তা কোনো সভা-সমিতিতে আটকে পড়েছেন। এতক্ষণ যামিনী রায় ও হেমেন্দ্রলাল-এর সঙ্গে তিনি শিল্প সম্বন্ধে যে আলোচনা করছিলেন তার মধ্যে আমি প্রবেশ করবার আগেই আইয়ুব এসে গেলেন। তিনি নিঃশব্দে ঢুকে কিছু দূরে বসে পড়লেন। ধীর স্থির প্রকৃতির মানুষ। হাঁটা চলায় চাঞ্চল্য দেখি নি কোনোদিন। একটি কালো চাদর মুড়ে বসেছিলেন। বেড়-বর্জিত চশমার কাচের পিছনে চক্ষুযুগল বুদ্ধিদীপ্ত। দেওয়ালে টাঙানো আঁকা একটি ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে সুমন্ত্র শিল্পীকে প্রশ্ন করলেন, ঐ ছবি থেকে নাকটা বাদ দেওয়া কি তাঁর পূর্বকল্পিত ছিল? না, আঁকবার সময় মনে হয় অনাবশ্যক।

যামিনীবাবু বললেন, তিনি আগে থাকতে ভালো করে ভেবে চিন্তে পরিকল্পনা সম্পূর্ণ না করে কাজে হাত দেন না। নাকটাকে প্রথম থেকেই অনাবশ্যক ধরে নিয়েছিলেন।

আরও প্রশ্নের উত্তরে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা যখন কোনো মডেলকে দেখেন তখন তার নাক চোখের লাইন লক্ষ্য করেন না।

হেমেন্দ্রবাবু বললেন, ভালো করে খুঁটিয়ে দেখাই তো হলো আপনাদের শিক্ষার প্রথম ধাপ—লক্ষ্যবস্তুর অন্তরালেও কিছু থাকে নাকি? জানি না, তবে যা জানতে চাই সেটা হচ্ছে বাঙালি পটুয়াদের ছেলেমানুষি কাঁচা হাতে আঁকা ছবির মধ্যে কি পেয়েছেন? এত ভালোবাসা কিসের টানে?

যামিনীবাবু বললেন, শিল্পীদের মধ্যে একটি শাখা তৈরি হয়েছে যাদের আঁকার পদ্ধতিই হচ্ছে ঐ এক রকম—।

সুধীন্দ্র এসে পড়ায় আলোচনায় বাধা পড়ল। তিনি দরজার ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর বিলম্বের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানালেন যে অস্কেন কারো-কারাম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—শুনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। তার পর পোশাক বদলাবার জন্যে অন্দরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাহেদ ও মজিদ রহিম ঢুকলেন। তাঁরাও বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। বললেন, গাড়ি পার্ক করে এলেন।

সাহেদ বসেই বললেন, প্রদর্শনী কমিটি যামিনীদাকে ও তাঁকে ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা বিভাগের বিচারক নির্বাচিত করেছে কিন্তু তিনি দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে ছবির এতগুলো বিভাগ করার কোনো মানে হয় না। চিকিৎসক ডেনহাম হোয়াইট-এর স্ত্রীকে মহিলা বিভাগের উৎকর্ষ বিচারের ভার দেওয়া হয়েছে। উনি চিত্রশিল্পের কি বোঝেন?

যামিনী রায় খবর দিলেন তিনিও বিচারক হতে রাজি হন নি।

সুধীন্দ্র ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসে বসলে আইয়ুব আগের কোনো আলোচনার জের টেনে জানতে চাইলেন, একজন দক্ষ শিল্পী কি এমন সব কল্পনাকে তাঁর ধারণায় আওতায় আনতে পারেন যা অভিব্যক্তিরেখা বা রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

সুধীন্দ্র বললেন এবং তাঁর বক্তব্যকে সাহেদ সমর্থন করলেন, শিল্পবস্তু প্রকাশ পায় বিশেষ কোনো টেকনিকের মাধ্যমে। শিল্পী নিজে যতই ক্ষমতা-সম্পন্ন হোক না কেন সে তার প্রকাশশৈলীর বাইরে কিছু ভাবতেই পারে না।

যামিনীদা যখন ছবি আঁকেন তখন তাঁকে বার বার আঁকা ছবি বাতিল করে ফেলে দিতে দেখেছি—যতক্ষণ না মন থেকে সাড়া আসে আঁকা সার্থক হয়েছে ততক্ষণ চেষ্টা চলে।

আইয়ুব বললেন, ইজ ইট সো? উনি তো বলছিলেন বিষয় বস্তুকে ভালো করে স্থির করে নিয়ে তবে তুলিতে হাত দেন। সে যাই হোক, আমি ক্রোশের চিন্তাধারার সমর্থন করি—শিল্পী তার অন্তরের মধ্যেই শিল্পবস্তুর পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করতে পারে—

আইয়ুব-এর আরো কিছু বলবার ছিল বলে মনে হলো কিন্তু রহিম বেশিক্ষণ চুপ করে থাকবার পাত্র নয়—তিনি সাহেদকে বললেন, মাইকেল এঞ্জেলো কোনো কোনো ভাস্কর্য সৃষ্টি করবার সময় কল্পনায় দেখতেন মর্মরের মাথা থেকে অজস্র ধারায় জল নামছে এবং তিনি প্রতিটি ধারা আলাদা করে ধরে সেই মতো ছেনি চালাতেন—শেষ পর্যন্ত ফুটে বার হত সুষম ধ্যানমূর্তি।

সাহেদ বললেন, এ দৃষ্টান্তে আইয়ুব-এর বক্তব্য পরিষ্কার হবে না।

সুধীন্দ্র এবার এক দার্শনিক চিন্তাধারার অবতারণা করলেন ও সেই সঙ্গে চা ও খাবার এসে পড়ায় তাঁর বক্তব্য মুলতবি রইল।

চা পর্ব শেষ হলে তিনি সাহেদকে প্রশ্ন করলেন, মন্ত্রী মণ্ডলির পতনের কি সম্ভাবনা আছে? তার পর নিজেই বললেন, দল ছেড়ে যাওয়া-আসা তো আছেই কিন্তু যখনই সুভাষ বোসের মতো লোক মন্ত্রীসভা ভাঙবার হুমকি দেন তখনই মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে বিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সুভাষ যখন লাহোরের এক সভায় বলেন মন্ত্রীদের ঐক্যে ভাঙন ধরেছে তখনই মিনিস্টারদের মুখে হাসি দেখি।

সাহেদ চালাক লোক। প্রসঙ্গ অপ্রিয় হলে কথা ঘুরিয়ে দেন। একটু ঝুঁকে পড়ে হেসে বললেন, যখন অনাস্থার প্রস্তাব রচনা করা হচ্ছিল তখন স্থির হয় বক্তৃতাগুলিকে কোনো সাহিত্যিককে দিয়ে পালিশ করিয়ে নিতে হবে। তুলসী হাতের কাছে ছিল কিন্তু ওরকম লাজুক ও কুঁড়ে লোককে দিয়ে কোনো কাজ হয় না, কাজেই হুমায়ুন-এর সাহায্য নেওয়া হয়।

একজন বললেন, কবির তো কংগ্রেসের লোক নন। 'ফ্রেন্ট পলুলিয়ের, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড।' সাহেদ-এর এই ব্যঙ্গোক্তিতে তিক্ততা ছিল। তিনি বলে গেলেন কবির জানত না অথবা খেয়াল করে নি যে বক্তৃতায় দুর্বলতম অংশ ছিল কাশিমবাজার মহারাজার ওপর আক্রমণ। ভাবা হয়েছিল যে প্রথমে এমন একজনের নামে অনাস্থার প্রস্তাব আনা হবে যে কথা বলতে

জানে না। সেদিক থেকে ঢাকার নবাব ছিল প্রশস্ততর লক্ষ্য কিন্তু তিনি মুসলমান বলে তাঁকে ঘাঁটানো হয় নি। তার পর ওঠে প্রসন্নকুমার রায়কত-এর নাম কিন্তু তিনি ট্রাইবাল রাজবংশী লোক—তাঁকে অব্যাহতি দিতেই হয়, অতএব কাশিমবাজারকে আক্রমণ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

বক্তা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, যে মহারাজা নিজের জমিদারি চালাতে অক্ষম— এতই অক্ষম যে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস-এর পরিচালনাধীনে থাকতে হয়েছে—সে কেমন করে এত বড় প্রদেশ শাসন করতে পারে?

মহারাজা তাঁর উত্তরে বলেন, আমার বাবা যেভাবে জমিদারি চালিয়ে ছিলেন সেজন্যে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই। সকলেই জানেন যে বৃদ্ধ মহারাজা তাঁর সব কিছু সম্পদ জনসাধারণের কল্যাণে দানপত্র করে গেছেন।

এর পর হিন্দুদের মধ্যে যারা নিরপেক্ষ ছিল তারা তরুণ মহারাজার স্বপক্ষে ভোট না দিয়ে পারে নি।

সাহেদ-এর গল্প থামে না। একটার পরে আর একটা প্রসঙ্গ এসে যায়। এর পর বললেন, তিন-তিনটে মুসলিম ব্রাদারহুডের দৃষ্টান্ত দিতে পারি। প্রথমটি হচ্ছে কামাল পাশার মৃত্যুতে স্থানীয় খিলাফৎ কমিটির শোক সন্তাপের প্রস্তাব। আর-একটি অনুষ্ঠিত হয় আমারই ঘরে ঈদ উৎসবের দিন হুমায়ুন ও আমার ভাই সইদ-এর পরস্পর সাদর আলিঙ্গন বিনিময়ে—তৃতীয় দৃষ্টান্ত জানাতে না দিয়ে মজিদ বললেন, খিলাফৎ প্রস্তাবে কোনো মিথ্যা প্রতারণা ছিল না।

আমার যাবার তাড়া ছিল বলে তর্কযুদ্ধ শোনা হলনা।

৯.১২.৩৮.

বৈঠকে ঢুকেই শুনতে পেলাম সাহেদ সুধীন্দ্রকে বলছেন, তিনি সারা বিশ্বের পি. ই. এন. ক্লাবের সভ্যদের দিয়ে নাৎসি পীড়নের প্রতিবাদে ইস্তাহার প্রচারের বিরোধী। তখন গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে কেবলমাত্র মজিদ রহিম, যামিনী রায়, আইয়ুব ও ব্যারিস্টার অরুণ সেন উপস্থিত ছিলেন।

সুধীন্দ্র বললেন, তিনি পি. ই. এন. ক্লাবের মধ্যাহ্নভোজনে যাচ্ছেন না কিন্তু নাৎসি অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় আপত্তির কি থাকতে পারে জানেন না—তাতে ক্ষতি কি আছে?

সাহেদ বললেন, ইটালি ও জার্মানি ছাড়াও অনেক দেশ আছে যেখানে জনসাধারণের স্বাধীনতা বিপন্ন।

সেন সাহেব সুপ্তির মধ্যে থেকে সহসা জেগে উঠে প্রশ্ন করলেন পি. ই. এন বস্তুটা কি ?

এই প্রবীণ ব্যক্তিটির বিদ্যাবত্তার অনেক কথা নীরেন-এর কাছে শুনেছি। মনে হলো, এই অজ্ঞতার প্রকাশ হচ্ছে এক রকম বৈঠকি ভোল।

কেউ কোনো কথা বলবার আগেই হারীতকৃষ্ণ ঘরে ঢুকে সাহেদকে বললেন, মন্ত্রিসভার খবর দিন। তাঁকে নাকি কেউ বলেছে যে ফজলুল হক ও নলিনীরঞ্জন বেরিয়ে এসে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন।

সাহেদ সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, নলিনী সরকারের দলে ক-জন আছেন ? তিনি গেলে খায়ত্তানকে অনায়াসে আনা যাবে।

সুধীন্দ্র বললেন, সরকারকে ফেডারাল ক্যাবিনেটে ঢোকাবার প্রস্তাব হয়েছে কারণ সল্টার আসতে চান না—সরকারকে উপযুক্ত মনে হচ্ছে।

হারীতকৃষ্ণ বললেন, একটা কিছু হচ্ছে কারণ নলিনীবাবুকে শরৎ বোসের বাড়িতে খানা খেতে দেখা গেছে।

হারীতদাকে আর হালকা কথা বলার প্রশ্রয় দেবেন না বলেই বোধ করি সুধীন্দ্র একটি গ্রন্থের কথা তুললেন এবং সেই থেকে উঠল মানব সভ্যতার কোনো আদি যুগের কথা।

আলোচনায় আমি ছাড়া সকলেই অংশগ্রহণ করলেন। অরুণ সেন ততক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুধীন্দ্রর মত মিল হল, প্রবল মতানৈক্য দেখা গেল হারীতকৃষ্ণ ও আইয়ুব-এর মধ্যে।

১৬.১২.৩৮

আজও আড্ডা বসেছিল সুধীন্দ্রর হাতিবাগানের বাড়িতে। প্রবোধ বাগচী এসেছিলেন বেশ কিছুদিন পরে। যত শীতই পড়ুক তাঁর বেশ-ভূষায় কোনো পরিবর্তন দেখি না। ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর সরু করে ভাঁজ করা লম্বা চাদর। সুধীন্দ্রকে যে-কোনো সজ্জায় সুন্দর দেখায়। আজ তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে একটি গদি আঁটা টুলের ওপর বসে বাগচীর সঙ্গে একটি ফরাসী গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। দেখতে দেখতে সাহেদ, মজিদ, অরুণ সেন, লিণ্ডসে এমার্সান, মাথুর, আইস্যাকৃস, যামিনী রায়, সুরেন গোস্বামী, হীরেন মুকুজ্জে ও হারীতকৃষ্ণ দেব এসে গেলেন। নবাগত ইহুদী ভদ্রলোক আইস্যাকৃস কারো সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা না করে এক চোখে মোনোক্‌ল

লাগিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো যামিনী রায়ের ছবিগুলি দেখছিলেন। ছটফটে বেঁটেখাটো মানুষ। মাথার চুল পাতলা, কণ্ঠস্বর মোটা।

এমার্সান কথা বলছিলেন তাঁর হাতদুটি দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে ধরে। সেই অবস্থায় মাঝে মাঝে সোফা গহ্বরে হেলে পড়ছিলেন।

অরুণ সেনকে দেখাচ্ছিল অসুস্থ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-এর হেলান-চেয়ারে বসা শেষ ছবির মতো। তিনি আজ কথা বলছিলেন না বড় একটা। বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে নির্বাপিত পাইপ টানছিলেন। মজিদ রহিম ও এমার্সান-এর মধ্যে মৃদু কণ্ঠে কথা হচ্ছিল মজিদের ফর্সা মুখে, পাতলা ঠোঁটে ও চোখে হাসির ছটা। আজ তিনি ছটফট করছিলেন না।

এর মধ্যে অপূর্ব চন্দ এসে কিছুক্ষণ আমার সোফার হাতলের ওপর বসে আমার কেনা যামিনী রায়-এর ছবি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে সুধীন্দ্রর কাছে গিয়ে বসলেন।

সুরেন গোঁসাইকে দেখাচ্ছিল ভূতের মতো—আমাদের মধ্যে থেকেও যেন বহু দূরে। হীরেন মুকুজ্জের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মেঝের ওপর—পাখি মাটির মধ্যে পোকা থাকার সম্ভাবনা টের পেলে যেমন নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকে ভাবখানা তেমনি। মুখে কথা ফুটতে বুঝলাম শিকারের কথাই ভাবছিলেন। হঠাৎ তিনি চোস্ত অক্সফোর্ড ইংরেজি উচ্চারণে অরুণ সেনকে বললেন, এখন যখন চীনা ছায়াছবি দেখানো সম্ভব হয়েছে তখন আর বাধা কিসের? টাকা তুলে একটা প্রেক্ষাঘর ভাড়া করা যাক।

অরুণ সেন-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, যতই খরচ হোক ফিল্ম আনানো যাক।

আইস্যাক্স-এর কান খাড়া ছিল। ছবি থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার?

হীরেন মুকুজ্জে বুঝিয়ে দিয়ে তার পর বললেন এই সব ব্যাপারে বোম্বাই-এর সংগঠনগুলি ঢের বেশি উৎসাহী।

আমি দেখছিলাম যামিনীবাবু কোণঠাসা হয়ে অস্বচ্ছন্দবোধ করছেন। উঠে গিয়ে পাশে বসতে খুশি হয়ে বললেন, প্রদর্শনীর জন্যে ছবি আঁকতে খুব ব্যস্ত রয়েছেন।

শিল্পীর সঙ্গে কথা বলবার সময় মনে হচ্ছিল টাকা তোলবার তাগিদে আঁকা ছবি কেমন করে শক্তিমন্ত হতে পারে? সে সংশয় অবশ্য প্রকাশ করি নি। জেনে নিলাম আমার সম্প্রতি কেনা পাশ্চাত্য প্রথায় আঁকা যে

চক্ষুহীন বাঙালি মহিলার ছবি প্রদর্শনীতে দেওয়া হবে সেটা কোনো মডেল-এর প্রতিকৃতি নয়।

অপূর্ব চন্দের একটি প্রশ্নে সুরেন গোস্বামী খাড়া হয়ে উঠে বসলেন।

প্রশ্নটি ছিল, প্রগতি সাহিত্য বলতে কি বোঝায়? শিল্পীদেরও কি প্রগতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সৃষ্টি করতে হবে নাকি?

একজন বললেন, সৃষ্টির তাগিদ যেখান থেকেই আসুক না কেন শিল্পীকে নিজের মনকে সতেজ ও প্রগতিশীল রাখতে হবে—সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সত্যদ্রষ্টা হওয়া যায় না।

সুরেনবাবু বললেন, খোলাখুলি ভাবে সমাজচেতনা ব্যক্ত করতে গেলে শাসক রুষ্ট হয়,—গুপ্তভাবে সাম্যবাদ প্রচার হচ্ছে, এতএব চমকদার বহিরাবরণ দরকার হয়।

আমি জানতে চাইলাম তাঁর সাম্প্রতিক বাংলা প্রদেশ সফর কালে আশাপ্রদ নতুন কিছু দেখেছেন কি?

সুরেনবাবু বললেন, সেদিন রবীন্দ্রনাথ ঠিক একই প্রশ্ন করেছিলেন। তেমন উৎসাহজনক কিছু চোখে না পড়লেও আশাপ্রদ অনেক কিছুর ইঙ্গিত পেয়েছেন।

হীরেন মুকুজ্জে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন শ্যামলবাবুকে একটা টিকিট বিক্রি করুন।

সাহেদ-এর মেজাজ খারাপ ছিল। প্রথমে কমিউনিস্টদের কষে গালাগালি করলেন এক চোট তার পর হুমায়ুন কবির ও স্টেট্‌স্‌ম্যান সংবাদপত্রকে এক হাত নিলেন। শিগুসে এমার্সানকে শুনিয়ে বললেন, তাঁদের কাগজে ভাষা বিন্যাসের শিথিলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা ছাড়া ভুল ভ্রান্তি তো থাকেই।

এমার্সান বললেন, ভারতীয়দের ইংরেজি কাগজে ঢের বেশি ভুলচুক দেখা যায়।

সাহেদ তাঁর গলার স্বর এক পর্দা তুলে বললেন, সে তো জানা কথা—ঠেস দিয়ে বলার কি আছে? আমি বলছিলাম ইংরেজ পরিচালিত কাগজের কথা।

সুধীন্দ্র কোনো কথা বললেন না। একটু হেসে আমাকে এলিজাবেথ বাওয়েন-এর 'ডেথ ইন ভেনিস' বইখানি সমালোচনা করতে দিলেন।

কিরণবাবু এলেন সভাভঙ্গের সময় বরাবর। শুনেছিলাম তাঁর নাকি মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

২৩.১২ ৩৮

সুধীন্দ্র বলেছিলেন আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে যাবেন। আজকের আড্ডা দক্ষিণ কলকাতায়। কথা ছিল সেই সময় যামিনীবাবুর ছবিটিকেও পৌঁছে দেবেন। সুশোভনবাবু খবর দিলেন সুধীন্দ্র জানাতে বলেছেন যে তিনি প্রগতি লেখক সঙ্ঘের জন্যে বক্তৃতা লেখায় ব্যস্ত থাকায় বাড়ি থেকে বার হতে পাচ্ছেন না। ছবিটা পরে কোনো দিন দিয়ে যাবেন।

বালিগঞ্জ প্লেসের প্রথম মোড়ের বাড়ি পেরিয়ে এসেই সাহেদ এর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ঘরে ঢুকে দেখি অপূর্ব চন্দর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হচ্ছে—প্রসঙ্গ কোনো-এক ছাত্র সম্মেলন। শুনলাম সুশোভন সরকার-এর নাম দিয়ে ইস্তাহার বিলি করা হয়েছে কিন্তু তিনি তার কিছুই জানেন না।

চারু দত্ত মশায়কে দেখলাম অনেকদিন পরে। আমাকে দেখে হাসলেন। আমার সেজমামা তাঁর সহপাঠী ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে—মনোজমোহন বসু পুলিস কোর্টে ওকালতি করে প্রচুর পসার করে বহুমূত্র রোগে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মারা যান। একদিন আমার মামাতো দাদার কাছে শুনলাম যে তিনি পুরনো চিঠিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে চারুবাবুর লেখা এক গোছা চিঠি খুঁজে পেয়েছেন। সেগুলো সংগ্রহ করে পড়ে দেখি ঘনিষ্ঠতম সুহৃদকে হৃদয় উজাড় করে লেখা। একদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে চিঠিগুলি উপহার দিয়ে আসি। খুব খুশি হয়েছিলেন।

হারীতদার সামনে বসে অস্বস্তিবোধ করছিলাম, সামনের দাঁত তুলিয়ে অন্য রকম দেখাচ্ছিল। –

চারুবাবু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আগামী শুক্রবারের বৈঠক বসবে তাঁর বাড়িতে।

৩০.১২.৩৮

চারু দত্ত মশায়ের বাড়ির আড্ডা আকর্ষণীয় হয় নতুন ধরনের আর অপর্যাপ্ত খাবার আয়োজনের জন্যে। তা ছাড়া আমন্ত্রিতের মধ্যে বিস্ময় মজুদ থাকত। বেশ ভিড় হতো। আজ গিয়ে দেখি নিয়মিত সভ্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই হাজির আছেন আর নতুন মানুষ হচ্ছেন মাদ্রাজ প্রদেশের মন্ত্রী ও ক্রিকেট কন্ট্রোলবোর্ডের সভাপতি ডক্টর সুবারায়ন। তিনি বলছিলেন তাঁদের রাজ্যে মুসলিমদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র আজএর

সাম্প্রদায়িক অশান্তির সম্ভাবনা নাই। একজন মুসলমান মন্ত্রীসভায় আছেন কিন্তু তাঁর বিশেষ কোনো দায়িত্ব নাই। তাঁকে বলা হয় 'মিনিষ্টার অফ ইনফরমেশন'। চুয়াল্লিশ মিলিয়ন লোকের শাসন পরিচালনায় দশ জন মন্ত্রী এমন কিছু বেশি নয়—বিশেষ করে বেতনের হার যখন তিন হাজার থেকে কমিয়ে পাঁচশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সরকারি বাড়িতে থাকতে না দিয়ে আরো অসুবিধায় ফেলেছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলতে পারেন যে দেড়শ টাকা হাউস অ্যালাউন্স-এর চেয়ে একটা বাড়ি পেলে খুশি হতেন। তাঁদের অধীনস্থ সরকারি কর্মচারীরা অনেক বেশি ভালো বাড়িতে থাকেন।

চারুবাবু ডক্টর খের সম্বন্ধে কি একটা প্রশ্ন করলে সুবারায়ন বললেন, তাঁকে চিনি বই কি, চমৎকার মানুষ। তিনি মহারাষ্ট্রের ব্যাক-বেঞ্চ থেকে দাবি করেন যে তাঁরা হচ্ছেন মোট জন সংখ্যার চুয়াল্লিশ অংশ এতএব প্রধানমন্ত্রী হতে হবে তাঁদের মধ্যে থেকে।

এর পর কথায় কথায় বাগ্মিতায় কে কত পারদর্শী সেই আলোচনা শুরু হলো। সুবারায়ন বললেন, 'সত্যমূর্তি আর মুদালিয়ার কোনো নোট না নিয়েই অনর্গল বলে যেতে পারেন—আমি কিন্তু সে ভরসা করি না। সবচেয়ে আশ্চর্য হই রাজাগোপালাচারির ক্ষমতা দেখে। তিনি অর্থ দপ্তরের ভারও নিজের হাতে রেখেছেন—বাজেট পেশ করলেন কোনো নোট না নিয়ে। রাশি রাশি সংখ্যা কেমন করে মনে রাখলেন ভেবে পাই না। মনে হয় অদ্ভুত।

আলোচনা রাজনীতি ছেড়ে খেলাধুলায় এসে গেল। সুবারায়ন, বললেন, 'সি কে নাইডু লোক ভালো ও তার একটা গুণ হচ্ছে যে সে সঙ্কল্পে স্থির থাকতে পারে। অমরনাথ-এর এটা দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম স্ত্রীর দুটি সন্তান আছে। সে আমার কাছে একটি আবেদন পাঠিয়েছে—বলেছে, তুমি কন্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তোমার গৃহিণী একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে আইন জারি করবার প্রস্তাব এনেছেন অতএব তোমার কর্তব্য সুবিচারের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।'

ডক্টর সুবারায়ন অবশ্য একটানা কথা বলে যান নি। তিনি কথা বলেন ধীরে সুস্থে ও অন্যের বক্তব্য শোনবার জন্যে উৎসাহ দেখান।

মধ্যে অপূর্বচন্দ্র বলেন, অশোক নামে কে একজন সুবারায়ন-এর বড় আমলা, তাঁর এক কেরানিকে খদ্দর পরে দপ্তরে যাবার অপরাধে বরখাস্ত করে দেন।

শুনতে পান নি ভান করে সুব্রায়ম অন্য প্রসঙ্গ তুলেছিলেন কিন্তু সাহেদ জোর গলায় বলে বসলেন, প্রধানমন্ত্রীর উচিত ছিল অশোককে লাথি মেরে বিদায় করা। তিনি কিছু না করলে আমাদের কর্তব্য নিজেরা গিয়ে লাথি মেরে জানিয়ে দেওয়া যে অনরএবল্ ডক্টর সুব্রায়ম নিজে যে বেশ পরে থাকেন সেই পোশাকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ হচ্ছে ঘোরতর অপরাধ।

সাহেদ এর চাটুবাদে সুব্রায়ম অস্বস্তি বোধ করলেন মনে হল। বললেন না কিছু। এবার সাহেদ হুমায়ুন কবিরকে কটাক্ষ করে কি একটা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি সাহিত্য সভার উদ্যোক্তারা সদলবলে এসে আসরে যোগ দিলেন।

সাজ্জাদ জাহির-এর তরুণী পত্নী বান্নি পর্দা থেকে বেরিয়ে এসেছে সম্প্রতি—সহজ সরল ধরনধারন—চেহারায় সলজ্জ স্নিগ্ধ লাবণ্য ভাব আকর্ষণীয়। চারুবাবু উঠে গিয়ে তার পাশে বসে উর্দুভাষায় আলাপ শুরু করে দিলেন—তাঁদের কথা হচ্ছিল তায়াবজির কন্যা সম্বন্ধে।

এদিনে মুলক্‌রাজ আনান্দ ও সাহেদ-এর মধ্যে জোর তর্ক বেধে গেল। সাহেদকে বলতে শুনলাম, ব্রিটিশ ডেমোক্র্যাটিক শাসন পদ্ধতির হিপোক্রিসি তোমাদের মিস্টিসিজম্-এর চেয়ে ভালো।

প্রশস্ত ঘরের আর এক প্রান্ত থেকে শোনা গেল, চীনা খাবার হচ্ছে সব চেয়ে ভালো—

সাহেদ এবার মুলক্‌রাজকে চোখা উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে ভোজনবিলাসীদের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করতে বসলেন। গুরমা ও গুরমের মধ্যে গুণগত পার্থক্য নিয়ে তর্ক বেধে যেতে পৃথক পৃথক আলাপ বন্ধ হয়ে সেদিকে কেন্দ্রীভূত হল।

সাহেদ-এর বক্তব্য হল, খাঁটি গুরমে হতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে উপাদেয় ভোজ্যবস্তু শরীরের মধ্যে যথারীতি সংযত সুস্থিরভাবে গ্রহণ করে তার প্রভাব উপভোগ করতে হবে—শুধু দাঁতে কাটলে চলবে না।

সাজ্জাদ যে যথার্থ খাদ্যরসিক তার পরিচয় পেলাম তিনি যখন ফরাসী ভাষায় বললেন, আমি খেলাম টার্কি আর টার্কি খেলো আমাকে।

৩.২.৩৯

আমাদের মতিলাল নেহেরু রোড থেকে সুধীন্দ্রর বাড়ি দীর্ঘপথ যাই ট্রামে-বাসে। ভালো বই থাকলে কোন দিক দিয়ে সময় কেটে যায় টের

পাই না। আজ সঙ্গে ছিল এডগার স্নোর 'রেড স্টার ওভার চায়না।' নীরেন বলেছিলেন মলাটের ওপর একটা কাগজ মুড়ে নিন না হলে পিছনে গোয়েন্দা লাগতে পারে। তাঁর সে উপদেশ মনেও ছিল না। স্টার থিয়েটারের সামনে এসে চমক ভাঙল। মধ্যে তিন-চারটে আড্ডা কামাই গেছে। আজ দেখলাম সত্যেন বোস রয়েছেন কিন্তু তাঁকে কোনো কাজে চলে যেতে হল।

মজিদ রহিম, সুমন্ত্র মহালনবিশ, যামিনী রায় আর সুধীন্দ্র ঘরে ছিলেন। আমি বসবার সঙ্গে সঙ্গে গিরিজাপতি আর সুশোভন এলেন।

সুধীন্দ্র বললেন, প্রশান্ত মহালনবিশ যামিনীদার ছবির প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। একজন আলাপ করিয়ে দিলে যামিনীদাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জানতে চান মশাই আপনি এই সব ছবি আঁকেন কেন? তার পর যামিনীদার সব কথা মন দিয়ে শুনে কোনো মন্তব্য প্রকাশ না করে বলেন—আর একদিন আসব তখন কথা হবে।'

মজিদ প্রশ্ন করলেন, 'মহলানবিশ লোকটা কে?'

পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের কথা উঠলে মজিদ প্রশান্তবাবুর কথা ভুলে গিয়ে জার্মানি ও ইটালির জনবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে দিলেন।

মজিদ-এর মতে জার্মানির বিপুল হারে জনবৃদ্ধির মূল কারণ অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক নয়—আসল কারণ হচ্ছে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির জন্যে জনসাধারণের আগ্রহ ও সচেতন চেষ্টা।

সুধীন্দ্র একটু হেসে পেট্রলের অনটনের কথা তুললেন।

মজিদ বললেন, জার্মানীতে যে সিন্‌থেটিক দাহ্য পদার্থ চালু হয়েছে তার গুণ পেট্রলের চেয়ে অনেক বেশি—অবশ্য তিনি স্বীকার করলেন যে, উৎপাদন খরচ অত্যধিক কিন্তু আত্মনির্ভরের দরকারে সব কিছু করা যায়।

আর একজন বললেন, আমাদের দেশে পেট্রল দুর্মূল্য আমদানি শুল্কের জন্যে। সরকারের এমন সাহস নেই যে বার্মাশেল-এর মতো বিদেশী কোম্পানিকে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসেব দাখিল করতে বলে—অথচ প্রয়োজনীয় অনেক কিছুর ওপর আমদানি শুল্ক ধার্য করতে গেলে সব কিছু খতিয়ে দেখতে হয়।

প্রশ্ন উঠলে কৃত্রিম জ্বালানি বস্তুতে ইঞ্জিনের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কতখানি। এবার দেখা গেল এই সব ব্যাপারে মজিদ-এর জ্ঞান আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। মনে হল তিনি মেশিন ভালোবাসেন।

সুশোভন স্পষ্টাস্পষ্টি বললেন, তিনি যন্ত্রপাতির ধারপাশে যেতেও নারাজ।

গিরিজাপতি এসে যেতে আলোচনা শুরু হল ক্যামেরা কেন্দ্র করে। দেখলাম ছবি তোলার সরঞ্জাম ও প্রয়োগ বিদ্যা সম্বন্ধে সুধীন্দ্রর অনুশীলন অসাধারণ।

গিরিজাপতি আমার পাশেই বসেছিলেন। ইস্টারের ছুটিতে আমার সঙ্গে উড়িষ্যার জঙ্গলবাসের সঙ্কল্প পাকা করে নিলেন।

কেন্নো বুড়ি বাসুকী
পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

নড়ে কেন্নো
চড়ে কেন্নো
কেন্নোর আড়িমুড়ি।
কর্তাবুড়ি গুড়ুৎ গুড়ুৎ
টানেন গুড়গুড়ি ॥

ধুমসো ধোঁয়ায়
চিমসে রোদে
গোঙান ঝিমোন খালি
ঘাসবিচালি বিছিয়ে শোন
চোখে রগড়ান বালি ॥

বুড়ি বুড়োন
ধোঁয়ায় জুরোন
গুটোন শনের নুড়ি।
নাড়ী ভুড়ি উগরে আনে
কেন্নোর খুনসুরি ॥

খুনসুরি নয়
পেটের ভেতর
কেন্নো খোঁড়ে খাল।
ভিটে চাতাল ছেড়ে বুড়ি
দরবার দেন পাতাল ॥

পিঁড়ি পাতেন
সিঁড়ি সাজান
ডাকেন সকলকে।
পড়ে হড়কে কেউ বা ত্বরায়
কেউ পায় বা কলকে ॥

কেউ ফিসফিস
টিপ্পনী গায়
ইলশে-খলসের এক দর
আস্ত শহর ওঠে নামে
হালচালটাও ভদ্দর ॥
হাঁটতে চলতে
কাঁপে কলজে
দ্বিগুণ কাঁপে ধরা।
পাতাল জোড়া ফাঁদ বাসুকির
বুড়ির মশকরা ॥

রোক্‌কে ভাই
রক্ষে পাই
পাতাল নইলে হতো কী ?
বড্ড ঝক্কি ভিড়ভড়কায়
শরণ নিই বাসুকি ॥

কার কিসে ভয়

বাঁধন সেনগুপ্ত

মৃদু কিছু উত্তেজনা চুরি করে নিঃসঙ্গ সুনীল
চুপি চুপি বাজাল কি রাত্রির ঘুঙুর
হৃদয়ের ব্যথা ঘিরে কী বিরাট স্মৃতির মিছিল
ঘন হতে দেখে বুঝি হলো কেউ বিপন্ন-বিধুর

ভঙ্গিমার কত কাছে গেলে তবে হবে নতজানু
কে জানে বেদনার নগ্ন পায়ে কত প্রয়োচনা
প্রতিদিন নষ্ট হয় ঝরে যায় কল্পনার রেণু
ফলত আহত হয় রাত্রির জুঁই আর হেনা

সে সব কাহিনী জেনে কেউ কেউ মানুষের মতো
চেনা সুরে কেঁদে ওঠে রাত্রির বিছানা ছেড়ে
ঝল্‌সানো আঙুলের স্মৃতি নিয়ে অবিরত
মাঝ রাতে জেগে থাকে ছোটবড়ো নক্ষত্রের ভিড়ে
কল্পনার সেই ঘরে জানি সেই বিষণ্ণ আঙুল
অকস্মাৎ ছুঁয়ে যাবে অলৌকিক শব্দের সঞ্চয়
সুনীলের কাছে হবে অবশেষে সকলই প্রতুল
সারল্যও জেনে গেছে ফিরে ফিরে কার কিসে ভয় !

ভিখারি বালকের হাতে

নীরদ রায়

আমাদের ঘরের দেয়াল একটাই
মানুষের দুঃখ এবং ব্যথার দিকে যাওয়ার রাস্তাও একটাই—
কাঞ্চন দিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বুকখোলা মাঠ,
ভিখারি বালকের হাতে ঝিমোচ্ছে স্বদেশের হাড্ডিসার
মানচিত্র, সন্তানের দিকে জননীর কাঙাল হাত কুয়াশায়
ভিজেছে সারারাত—
ঘুমন্ত ফুটপাত কেঁপে ওঠে—সময়ের চিন্তামগ্ন চলাফেরা
গতকাল যৌবনে দিয়েছে পা— ;

আমাদের ঘরের দেয়াল একটাই—
সোজা উত্তরে কিংবা দক্ষিণে যাওয়ার রাস্তাও একটাই
মানুষের লোকালয়ে যে সব কথারা এতদিন চোখের
অসুখে ভুগছিল, যে-সব দরোজার মুখে শীতের রাত্রি

কুড়োল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো—
সে-সব কথারা এখন একশো মাইল জুড়ে আলো-হাওয়ার
খবর দিতে পারে—সে-সব দরোজার মুখে এখন
বসন্ত এসে সটান শুয়ে পড়েছে

ডুবে যায় দিবা

সিদ্ধেশ্বর সেন

বিশ্বব্যাপ্ত এই জয়-পরাজয় তোমাতেও অর্সে
'না' যায়ও না বলা, 'হ্যাঁ' বলতে অমোচনীয় দ্বিধা
তাই কী অনন্যোপায়, খুঁজি তবে ভূত ও ভবিষ্যে
কোথায় তোমাতে হবে এ যাত্রা ক্ষমনীয় বুঝিবা
মৃত্যুংতীর্ত্বা কোন্ অভিযানে কোন্ হিরন্ময় সত্যের আভাসে

অরিষ্টনেমিই জানে মকর ক্রান্তির পাড়ে, হিমাঙ্কের পৌষে
তোমার ও-স্বর্ণরথ বোঝাই করেছে দিনশেষের মুকুলে রাঙা বিভা

আদিত্য, গন্ধর্ব, নাগ, ঋষি ও অপ্সরা, ওরা রথী
দ্যুতিময় রথ, অশ্ব, গতি, সঙ্গে সে—কালের যক্ষ
প্রহর উজিয়ে গিয়ে সকলে কী থেমে পড়ে সমে,
সকলের প্রাপ্য যত চুকিয়েই,—যাপনের লক্ষ্য
দিন যেন পায়, যেন পাথেয়ও বাড়ে পরিণামে

রাশিচক্র ঘুরে যায়, দেহপট ঘোরে, ক্ষত জাগে শেষে—
আমাকে মাড়িয়ে যায় তোমার ও-অগ্নিরথ, রক্তমেঘে ডুবে গেল দিবা।

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ। সত্যেন্দ্রনাথ রায়। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৭৩। পঁচিশ টাকা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনের প্রথম সংস্করণ পড়ে রবীন্দ্রনাথ নাকি মন্তব্য করেছিলেন, এ-বই রবীন্দ্রনাথের জীবনী হয় নি, হয়েছে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র—কথা দুটির মধ্যে তিনি এমন একটি ভেদের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। একটিতে বোঝায় ঠাকুরবাড়ির কৃতী সন্তান হিসাবে তাঁর ব্যবহারিক জীবন আর একটিতে বোঝায় সেই রবীন্দ্রনাথকে, যিনি নিজস্ব চিন্তায় সৃষ্টিতে অনন্য, অনন্যপরতন্ত্র এবং স্বকীয়। এ-দুয়ের মধ্যে যোগ আছে, কিন্তু সে ঐতিহাসিক প্রত্নসন্ধানীর কাজ তার সন্ধান করা। প্রশ্ন এই যে, রবীন্দ্রজীবনীর মতো এমন সম্পূর্ণ জীবনীতেও যদি রবীন্দ্রনাথকে না পাওয়া যায় তবে তাঁকে পাব কোথায় ?

যিনি তরুণ যৌবন থেকে আশী বছর পর্যন্ত অবিরত রচনাকর্মে নিযুক্ত—রচনা বলতে শুধু কবিতা নয়, চিন্তায় মননে তাঁর যে একটা বিশ্বাসের (প্রত্যয়ও বলা যেতে পারে) অন্তর্জীবন ছিল, সেটা কোনো অনুমানের ব্যাপার নয়। এমন নয় যে তিনি কিছুকাল কবিতা ও তজ্জাতীয় শিল্পকর্ম করেই ক্ষান্ত হলেন। তাহলে তাঁর শুধু কবিতা থেকেই তাঁর প্রত্যয়টিকে উদ্ধার করতে পারতাম। কিন্তু তিনি জীবনের প্রায় সব দিক স্পর্শ করে তাঁর ভাবনাচিন্তাকে ছড়িয়ে গিয়েছেন, তাঁর আশী বছরের জীবনে কোথাও বিরতি ছিল না। এ-রকম ক্ষেত্রে তাঁর ধ্রুব প্রত্যয়টিকে পেতে হলে তাঁর সারাজীবনের গদ্য-পদ্য রচনাকেই ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধান করা দরকার। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক অন্তর্জীবনের স্থির ব্যক্তিস্বরূপকে জানা যাবে না। এইখানে বুদ্ধদেব বসুর একটি কথা মনে পড়ে—

'রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশি করে জানতে হলে আরো একবার রবীন্দ্রনাথ পড়াই সদুপায়। তাঁর রচনাবলি অন্তঃস্থ হলেই তাঁর জীবনের সঙ্গে পরিচয় হয়; শুধু তাই নয়, তাঁর চিন্তার সঙ্গে আমাদের উপলব্ধির সেতুনির্মাণ করে তাঁর নিজেরই পত্রাবলি, প্রবন্ধাবলি।'

রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়াই রবীন্দ্রনাথকে জানবার সদুপায় সত্য, কিন্তু তার বাধাও আছে। তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী বিভিন্ন প্রকৃতির রচনায় অজস্র চিন্তাকণিকা ছড়িয়ে আছে। এগুলিকে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করে ঋজু বক্তব্যে সাজিয়ে তোলা বড় সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রসদৃশ সাহিত্যে কোথায় কোন চিন্তা ছড়িয়ে আছে তাদের কুড়িয়ে এনে গুছিয়ে তোলাই একটি মস্ত কাজ। দ্বিতীয়ত, সব ভাবনাই যে যান্ত্রিক ভাবে একই চেহারা নিয়ে আসবে তাও নয়। এই বৈচিত্র্য, এমন কি স্ববিরোধিতাকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করে নেওয়া— সে-ও একটা কঠিন কাজ। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র যদি এলোমেলো অথবা স্ববিরোধী আচরণ করে তবে বিপুল মানবসমাজের কিছু যায় আসে না। তার তাৎপর্য তাৎক্ষণিক মাত্র। কিন্তু মানবসভ্যতার পরিণামচিন্তায় নিরত ভাবুক রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা তো শুধু তাৎক্ষণিক তাৎপর্যে বদ্ধ নয়। তার তাৎপর্য সুদূর-প্রসারী। অর্ধশতাব্দীরও অধিক বিস্তৃত কালক্ষেত্রে গদ্যে-পদ্যে ছড়িয়ে থাকা বিচিত্র চিন্তাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ সাদৃশ্যযুক্ত এবং বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ মানসমূর্তি গড়ে তোলার মতো দুঃসাধ্য কাজ করেছেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ' বইতে। এ রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র নয়।

এ-বইয়ের গুণ সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে ধরে দেওয়ায়, উপাদান উপকরণ আবিষ্কারে নয়। বস্তুত স্থানে স্থানে কিছু নতুন তথ্য বা ব্যাখ্যা থাকলেও এ-বইয়ের প্রধান গুণ তাতে নয়। এ-বই রবীন্দ্রনাথকে সমগ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি যেমন ভেবেছেন অনেক বিষয়েই, শিক্ষা সাহিত্য ধর্ম রাজনীতি ইতিহাস, তেমনি বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তাঁর ভাবনাকে রূপ দিয়ে করেছে বিশিষ্ট। জীবনের এক এক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাসূত্রকে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন। একটির সঙ্গে আর একটির যোগ দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন, প্রথম জীবনের চিন্তার বীজ পরবর্তীকালে কেমন করে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং ফলবান হয়েছে। এমনি করে রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের আলোচনার বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের আইডিয়াগুলিকে একই সঙ্গে উদ্ঘাটন করা এবং কালে ছড়িয়ে দেখা।

রবীন্দ্রনাথের সেই যে আক্ষেপ 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'— সেই আক্ষেপ ঘোচাবার প্রথম চেষ্টা ছিল অজিতকুমার চক্রবর্তীর সার্থকনামা

বইতে। রবীন্দ্রনাথকেই তিনি দেখিয়েছেন—সেই কবিব্যক্তিকে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে তিনি সৃষ্টি হিসাবে বিচার করে দেখেন নি। সেভাবে দেখতে গেলে সৃষ্টি হিসাবেই সৃষ্টির কিছু অপূর্ণতা তাঁর চোখে পড়ত, সে-অপূর্ণতা শুধু যে শিল্প হিসাবে তা নয়। যে-বস্তু মানব-সাধারণের কাছে উৎসর্গিত তাকে পাঠক তার সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা প্রয়োজন-অপ্রয়োজন দিয়ে বুঝতে চাইবে। কবি নিজে কিভাবে প্রকাশিত হলেন, তার চেয়েও আমার জীবনে তাঁর সৃষ্টিকে কিভাবে পেলাম, সেই দিক দিয়ে জানতে চাওয়ার বাসনাই স্বাভাবিক। অজিত চক্রবর্তী রবীন্দ্রকাব্যকে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশরূপ হিসাবেই মুক্ত বিচার করেছিলেন। এই বিচারের মর্মকে আমরা কিছুতেই তুচ্ছ করে দেখতে পারি না। শিল্পসৃষ্টিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রজাপতির সৃষ্টি বলে ভাবলে তখন আর সামাজিকের প্রয়োজনবোধ থাকে না। রসিক রসই আস্বাদন করেন, কবিব্যক্তির আত্মপ্রকাশের অফুরন্ত লীলায় আবিষ্ট থাকেন। কবি যা বলেন সবই তাঁর দিক থেকে সত্য, সুতরাং সমালোচনার অতীত। এভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখা, বলা বাহুল্য, সব দিক থেকে দেখা নয়। যখন রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠন বিষয়ক রচনায় নিয়োজিত, শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় মগ্ন অথবা বাউলের গানের মনের মানুষ থেকে তাঁর নিজের বঞ্চিত মানবধর্মের সূত্র রচনায় আত্মসমাহিত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের লীলাবাদ থেকে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের একটা স্বতন্ত্র ভক্তি-বাদ রচনায় গীতি মুখর, তখনও কি তাঁকে কবিমাত্র রূপে দেখে সামাজিকের জীবন থেকে দূরেই সরিয়ে রাখব? তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের জীবনের অভাবকে কতখানি পূর্ণ করতে পারল তার হিসাব কি নেব না? বাংলার ভক্তিবাদকে তিনি কতখানি রূপান্তরিত করলেন তার বিচার কি বৈষ্ণব সামাজিকেরা করবেন না? কোন্ ভাবসংঘাত থেকে রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব আইডিয়াগুলির জন্ম, তার সামাজিক-ঐতিহাসিক সূত্র-সন্ধান কি করা হবে না? আমাদের মনোভাব কি এই হবে যে, যদি কবির উক্তি আমাদের প্রয়োজনে লেগে যায়, সেটা উপরি পাওনা মাত্র। আসলে জীবনের প্রতি কবির কোনো দায়িত্ব-বন্ধন নেই? এই দায়িত্বের বিচার বিশ্লেষণের দ্বারাই কবির বিশ্বাসের জগতটিকে খুঁজে পাব।

অজিত চক্রবর্তী কবিতার ভিতর থেকে কবিকে খুঁজেছিলেন, এখন কবি-মনীষীকে খুঁজছি কবির সৃষ্টির সঙ্গে ইতিহাসের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ এই বইতে সেই চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টার গুরু অত্যন্ত

বিচ্ছিন্নভাবে হলেও মাত্র কিছুকাল পূর্ব থেকেই হয়েছে। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করা হতো ভারতীয় ঐতিহ্যের সূত্রে। তাঁর ঔপনিষদিক বিশ্বাস, তাঁর মানবব্রহ্মবাদ, তপোবনাদর্শ, বুদ্ধ, অশোকের ধর্ম কিংবা মধ্যযুগীয় সন্তদের সাধনা দিয়ে। বলা বাহুল্য, আজও আমরা এই ভাবসূত্রগুলিকে অলীক বলব না। রবীন্দ্রনাথ যে বারবার অসীম অনন্ত অখণ্ড সমগ্রের কথা বলেন তার থেকেই তাঁর খণ্ড জীবনের সমস্যাগুলিকে উত্তরণের প্রয়াস ছিল—সেখানেই তাঁর ভারতীয় অন্বয়দৃষ্টি, তাঁর কল্যাণবোধের উৎসকে আজও অস্বীকার করতে পারব না। তবু আজ রবীন্দ্রনাথকে বিচারের পদ্ধতি পালটেছি। সম্ভবত রবীন্দ্রশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের সময় থেকেই রবীন্দ্রবিচারে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিতে থাকে, আধুনিককালের মূল্যমান দিয়ে রবীন্দ্রচিন্তাকে যাচাই করা। আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কসীয় বিচারের প্রভাব যত ছড়াতে লাগল, রবীন্দ্র সাহিত্য বিচারের পদ্ধতিও তত বদলাতে লাগল। এ-বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যমূলক কাজ হয়েছে নেপাল মজুমদারের বইতে। কিন্তু সেই ব্যক্তিমন উদ্ধার করার প্রয়াসে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল। গোপাল হালদার সম্পাদিত শতবার্ষিক প্রবন্ধ সংকলন 'রবীন্দ্রনাথ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুশোভন সরকার, হীরেন মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রভৃতি কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বিদগ্ধ-লেখক একালের সমাজ-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিকায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-প্রকৃতির পর্যালোচনা করেছিলেন। এঁদের বৈশিষ্ট্য, ভাববাদী রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রেখেও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনা। তাতে রবীন্দ্র-প্রতিভার সীমাবদ্ধতা মেনেও তাঁর মহত্ত্ব অস্বীকৃত হয় নি। সত্যেন্দ্রনাথ রায় এই পথের পথিক। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ দ্বারা আধুনিক জীবনের প্রবলতম সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখে রবীন্দ্র-চিন্তার মূল্য যাচাই করতে করতে প্রায়শ থমকে দাঁড়ান। সাহস করে বলতে পারেন না, এইখানে রবীন্দ্রচিন্তা আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না; তিনি এক প্রাচীন জগতের মনীষী, এ-যুগ অনেক জটিল অনেক হিংস্র। রবীন্দ্রচিন্তা দিয়ে এই হিংস্রতার মীমাংসা হয় না। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে একটি অত্যন্ত বাস্তববাদী মডার্ন সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি সত্ত্বেও মহাকবির দুর্মর মানবতা-বোধ এবং জড়ত্বজয়ী অমৃত-প্রত্যয়কেও কিছুতেই অস্বীকারের দ্বারা ম্লান করতে পারেন না। এই বইতে বারবার দেখেছি লেখকের দ্বিধাকে। জড়বাদ ও ভাববাদের মধ্যে এই দোলাচলতা বোধ হয় আধুনিক মানুষেরই নিয়তি।

লেখক বিশ্লেষণ করে দেখেছেন ধারাবাহিকক্রমে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা—কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ভাষণ। এর মধ্যে থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন কয়েকটি মূল বিশ্বাসের সূত্র। প্রথমেই তিনি আলোচনার মান ও পরিধি নিপুণভাবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। বিশ্বাস বলতেই বা কী বুঝতে হবে, তার নির্ণয়ে কতখানি 'অবজেকটিভ' হওয়া সম্ভব। কবির দিক থেকেও কতখানি কনসিসটান্ট হওয়া সম্ভব সেটাও মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যথেষ্ট স্ববিরোধিতা এবং অসঙ্গতি ছিল, যা সজীব মানুষের মধ্যেই স্বাভাবিক—সে বিষয়েও লেখক অবহিত থেকেই একটি বিশ্বাসের সূত্র বের করতে চেয়েছেন। যেহেতু তিনি নিজে কোনো মত বা নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রতিষ্ঠা বা প্রমাণ করার অভিপ্রায় পোষণ করেন না, সেইজন্য তাঁর আলোচনার বিভাগগুলিও বস্তুত কোনো বক্তব্যদ্যোতক শিরোনামে চিহ্নিত নয়। চারটি খণ্ড আছে বইতে। প্রথম খণ্ডে একটিই অধ্যায়—প্রস্তাবনা। দ্বিতীয় খণ্ডটি পূর্বভাগ ও উত্তর ভাগে বিভক্ত। খণ্ডটির সাধারণ নাম ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত। এই খণ্ডের প্রারম্ভিক অধ্যায়টিকে বলেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়, স্পষ্টতই প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের অনুবৃত্তি। এর নাম দিয়েছেন উপক্রমণিকা। তারপর শুরু হচ্ছে পূর্বভাগ তৃতীয় অধ্যায় দিয়ে। এটির নাম আদিপর্ব। তারপর চতুর্থ অধ্যায় শিলাইদহ পর্ব, পঞ্চম অধ্যায় বঙ্গদর্শন পর্ব, ষষ্ঠ অধ্যায় গীতাঞ্জলি পর্ব। উত্তর ভাগ শুরু হচ্ছে সপ্তম অধ্যায় বলাকা পর্ব—এক দিয়ে। তারপর বলাকা পর্ব—দুই, অন্তিম পর্ব—এক থেকে পাঁচ। চতুর্দশ অধ্যায় ইতিবৃত্তের উপসংহার। উত্তর ভাগ শেষ হল। অতঃপর তৃতীয় খণ্ডে একটিই অধ্যায় দেশকালপাত্র। চতুর্থ খণ্ডেও একটি অধ্যায় একালের জিজ্ঞাসা।

এই সূচী থেকে বস্তুত লেখকের অভিপ্রেত বক্তব্যের কোনো ইঙ্গিত মেলে না। বিশ্বাসের কোনো পরিবর্তন অথবা পরিণতির অভিধাও সূচিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের পর্বগুলিই এক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছে। স্বীকার করব, খণ্ড ভাগ অধ্যায় পর্ব একটু বিভ্রান্তিকর। আমাদের ধারণা লেখক রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করছিলেন কোনো পরিকল্পনা মনে না রেখে। বইগুলি পর পর পড়তে পড়তে পড়তে তার ভাবসূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে চলেছিলেন। তাঁর এই পড়া অবশ্য শৌখীন পড়া নয়—শ্রমসাধ্য অধ্যয়ন। লেখকের বিদগ্ধ বহু পঠনসমৃদ্ধ কালসচেতন মনটি কোনো পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তে গিয়ে আত্মহারা হয় নি। তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি আগাগোড়াই অব্যাহত। আশ্চর্যভাবে তিনি নিজেকে উদ্দীপ্ত রেখেছেন, রবীন্দ্রনাথের

কবিতার রসসৌন্দর্যে বা বক্তব্যের মনোহারিতায় তিনি কখনোই অভিভূত হন নি। রবীন্দ্রনাথের অসঙ্গতি বা যুক্তিবল্লভতা দেখিয়ে দিতে ইতস্তত করেন নি, যদিচ সবিনয়ে কখনও মানব স্বভাবের দোহাই দিয়ে, কখনো পরিবেশের প্রভাবের কথা বলে। এই বইয়ের শেষ অধ্যায় 'একালের জিজ্ঞাসা' একটি উৎকৃষ্ট মূল্যাবধারণ। গভীর সতর্ক অথচ উদার যুক্তিবদ্ধ এই রবীন্দ্রপ্রতিভা বিচারটি করা হয়েছে দেশকালের পটভূমিতে থেকে ভবিষ্যতের দিগন্তে সন্ধানী আলো ফেলে। এই প্রবন্ধটির তুলনা পাওয়া শক্ত।

ভবতোষ দত্ত

মির্জা গালিব। সাধন দাশগুপ্ত। অমর ভারতী। কুড়ি টাকা

একজন কীর্তিমান প্রযুক্তিবিদ্ যখন জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই লেখেন তখন আমরা অবাক হই না। কারণ ব্যাপারটা তাঁর নিজস্ব এলাকারই অন্তর্গত। ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত সাধন দাশগুপ্ত আইনস্টাইনের জীবনী লিখে, পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে গুটি-দুই বই লিখে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। বস্তুত বাংলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখকদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম অগ্রগণ্য বলে জানি, যদিও ঐ বিষয়ে আমার কোনো অধিকার নেই। তাই হঠাৎ যখন তাঁকে মির্জা গালিব বিষয়ে গ্রন্থরচনা করতে দেখি, তখন অবাক হই। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬৯ সালের পরে মির্জা গালিব সম্বন্ধে নতুন করে কৌতূহল জেগে উঠেছিল, আর সেই কৌতূহল-জিজ্ঞাসার পরিণাম হিসেবে বাংলাতেও বেশ কয়টি বই লেখা হয়েছে গালিবকে নিয়ে। কিন্তু শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের বইটি নিতান্ত উপলক্ষ-ঘটিত নয়। গালিবের রচনাপাঠে তাঁর যে মুগ্ধতা, তারই অংশী তিনি করতে চেয়েছেন পাঠককে। ভূমিকা থেকে জানতে পাই, গালিবের রচনাকে ভালোভাবে আয়ত্ত করার তাগিদে তিনি উত্তর ভারতে হাইদ্রাবাদ-ভূপালে পরিব্রাজকের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনজন গালিব-বিশেষজ্ঞের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুকূল্য তাঁর গালিবচর্চার ভিত্তিকে দৃঢ়মূল করেছে, আর দুর্লভ গ্রন্থ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন নানা গালিব-প্রেমিক মানুষ।

অর্থকৃচ্ছ্রতা, সুরাসক্তি আর সাংসারিক অশান্তির মধ্যে তীব্র জীবনতৃষ্ণাময় যে মাদক কবিতাগুলি, কলিজার টুকরোগুলি গালিব রচনা করেছিলেন তার সুবাস আজও আমাদের মুগ্ধ করে। অলঙ্করণ-নির্ভর হওয়ার চেয়ে সত্যাশ্রয়ী

হওয়ায়, ভঙ্গিগতভাবে মুশকিল-পসন্দ বা দুরূহতাপ্রিয় হওয়ায় তিনি আধুনিক পাঠকের মন কাড়েন। আর আমাদের আকর্ষণ করে তাঁর বিদ্রোহী স্বভাব—ব্যক্তি হিসেবে এবং কবি হিসেবে; নমাজ পড়েন নি তিনি, রোজা পালন করেন নি আর ভেঙেছেন উর্দু-কাব্যের সনাতন রীতি ও প্রথা। বাঙালির পক্ষে গালিবের প্রতি টানের আর একটা কারণ তিনি জীবনের একটা মূল্যবান সময় কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। আর ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় বসেই তিনি বুঝেছিলেন ক্ষয়িষ্ণু মোগল সাম্রাজ্যের ভিৎকে নড়িয়ে দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক নতুন সভ্যতার আগমন ঘটতে চলেছে। ভারত-ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে মির্জা গালিবের আবির্ভাব—তাঁর রচনায় ও জীবনে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন ছাপ আছে। তাই লেখক খুব সুবিবেচনার সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা যোগ করেছেন—কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই পটভূমিকা অতি সংক্ষিপ্ত বলে অতৃপ্তি ঘটায়। এই অভাববোধ লেখক পূরণ করে দিয়েছেন উর্দু কবিতার আঙ্গিকের আলোচনায় এবং গালিবের কবিতার বির্বতন ইতিহাসের বিবরণে। উর্দু কবিতার ছন্দ ও পদবন্ধের পারিভাষিক শব্দগুলির অভার্থ ব্যাখ্যা করায় বেশ ভালো প্রাথমিক ধারণা জন্মায় বইটি থেকে। গালিবের কবি-জীবনের চার পর্ব: প্রারম্ভিক পর্ব ১৮১১-১৮২১, মধ্যকালিক পর্ব ১৮২২-১৮৩২, প্রৌঢ় যুগ ১৮৩৩-১৮৫৫, আর উত্তরকালিক পর্ব ১৮৫৬-১৮৬১। প্রথম পর্ব বাক্‌রীতির স্বাতন্ত্র্যে সুন্দর বটে, কিন্তু সে যেন পুতুলের সৌন্দর্য। দ্বিতীয় পর্বে, হয়তো প্রেমিকা জেমিনীর মৃত্যুর অভিঘাতে, এক তীব্র মানবিক আবেগের সংক্রাম তাঁর কবিতাকে সংরক্ত করে তুলল। তৃতীয় পর্বে ব্যক্তি-জীবনের অনিশ্চয়তা ও অপমানে তাঁর শেরগুলির মধ্যে এসেছে হাসির ঝলকের মধ্যে অশ্রুর সজলতা, বিরহবেদনার সুর। শেষ পর্বে, হয়ত সুফী কবি বাহাদুর শাহ্‌ জাফরের সংসর্গে মির্জা গলিব হয়ে উঠেছেন নিরলঙ্কার ও সরল অথচ জীবনদর্শনে রহস্যময়। এই বিবর্তনের আলোচনায় ঐতিহ্য ও সমকালীন কবিদের ভাবভঙ্গি গালিব কী ভাবে আত্মসাৎ করেছেন তার বিবরণে সাধন দাশগুপ্ত যেমন বিশ্লেষণী শক্তির তেমনি রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। গালিব সম্বন্ধে আলোচনায় অইয়ুব রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ এনে ফেলেন; আর এই লেখক রবীন্দ্রনাথের কথা তো আনেনই, সঙ্গে-সঙ্গে বলেন, গালিবের গজল যেন ত্রিশ-চল্লিশের দশকের আধুনিক বাংলা কবিতার কবি অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর রচনার

একটি সংকলন। এইভাবে লেখক প্রতিতুলনার সাহায্যে গালিব সম্বন্ধে আধুনিক পাঠকের উৎসুক্য জাগিয়ে দেন।

দুই শতাধিক পৃষ্ঠার এই বইয়ের অর্ধাংশ ভূমিকা আর অর্ধাংশ কবির রচনার অনুবাদ। গালিব উর্দু ভাষার দুরূহতম এবং সূক্ষ্মতম কবি বলেই তাঁর অনুবাদে সার্থকতা অর্জন করা খুব কঠিন কাজ। পাঠকের বোধগম্য করার দায়ে অনুবাদ হয়ে যেতে পারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা। গদ্য অনুবাদে হারিয়ে যায় রচনাশৈলীগত সৌন্দর্য। অনেক সময় লঘুত্ব-গভীরতার অপরূপ ভারসাম্য হারিয়ে গিয়ে গদ্য হয়ে যায় স্থূলভাবেই গদ্য। তর্জমা অংশে এই গ্রন্থে মূল কবিতা দেওয়া হয়েছে বাংলা হরফে, সঙ্গে আছে মূলের প্রধান শব্দগুলির শব্দার্থ, আর বাংলা অনুবাদ। তর্জমায় কখনো ছন্দের দোলা লাগে, এসে যায় মিলের আভাস—

> নিহিত ছিল, নিহত ছিল মোর হৃদয়ের বাসনাগুলি ;
> আজ বসন্তে আবার তারা মেলেছে দেখি নতুন কলি।

'মোর' সর্বনাম এড়াতে পারলে ভাল হতো। কারণ অনুবাদের ভাষা সব সময়েই হওয়া উচিত টার্গেট-ভাষার সমকালীন কবিতার ভাষা। সব ক্ষেত্রে অবশ্য ছন্দের দোলা বা মিলের ছোঁয়াচ আনতে চেষ্টা করেন নি লেখক—গদ্যেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন মূলের ভাববস্তু। সাফল্যের মাত্রা অবশ্য সর্বত্র সমান নয়। এই লেখকের এবং আইয়ুব সাহেবের তর্জমা পড়ে মনে হয় গালিবের কবিতা বাংলায় আসার জন্য মূলের প্রতি অনুগত এক আধুনিক কবির অপেক্ষায় রয়েছে।

তবু গ্রন্থকার অপরিসীম যত্ন ও দরদের সঙ্গে গালিবকে বাঙালি পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। প্রকাশকের তরফে অবশ্য আরো খানিকটা যত্ন প্রত্যাশিত ছিল। গজল কসিদা রুবাইগুলি একটু ফাঁক দিয়ে দিয়ে ছাপা হলে চোখ আরাম পেতো। ভূমিকা এবং নির্বাচিত রচনার অনুবাদকে পরিষ্কার পৃথক দুই অংশে বিভক্ত করে দেখালে ভালো হতো। মুদ্রণপ্রমাদও কম নয়। প্রকাশগত এই সব দুর্বলতা উপেক্ষার যোগ্য, যে সব বাঙালি উর্দু ভাষা জানেন না, অথচ সেই ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি গালিবকে জানতে চান, তাঁদের পক্ষে আলোচ্য গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য।

অশ্রুকুমার সিকদার

Recollections of my school-days by Lalbehari Day; edited with an introduction by Dr. Mahadevaprasad Saha. Editions India. Calcutta. 1981, Rs. 30·00.

লালবিহারী দে-র স্কুল-জীবনের স্মৃতিকথা সুলভ মূল্যে পুস্তকাকারে প্রচারের জন্য আমরা বইয়ের সম্পাদক ও প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞ। শতাধিক বছর আগে ইংরেজি মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। দুষ্প্রাপ্য জরাজীর্ণ পত্রিকার পাতা থেকে লেখাটি কপি করিয়ে তারপর ছাপা হয়েছে। বাইশ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা, লালবিহারী দে'র রচনার তালিকা ও দে-পরিবারের বংশলতিকা, বেঙ্গল ম্যাগাজিনের প্রস্‌পেক্‌টাস, এবং 'স্টেট অফ এম্পায়ার' নামে লালবিহারীর একটি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ গ্রন্থটির মূল্য বাড়িয়েছে। গ্রন্থের শেষে একটি 'নির্ঘণ্ট' বা শব্দ-সূচী থাকলে আরও ভালো হতো।

লালবিহারী দে-র জন্ম ১৮২৪ সালে। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে তাই আমরা গত শতকের প্রথমার্ধের পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও শহর সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি। বর্ধমান জেলার সোনাপলাসী (গ্রন্থে তালপুর নামে বর্ণিত) গ্রামে লালবিহারীর শৈশব কেটেছে। ছয় বছর বয়সে 'হাতেখড়ি' হলো, তারপর গোপীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পাঠশালায় মাটিতে লেখা থেকে শুরু করে তালপাতা, কলাপাতা ও কাগজে লেখার মধ্য দিয়ে শিক্ষার অগ্রগতি—চার বছরের মতো গ্রামেই পড়াশোনা। দশবছর বয়সে ১৮৩৪ সালে লালবিহারী কলকাতা এলেন ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে—ঠিক তার পরের বছর মেকলের সেই বিখ্যাত শিক্ষানীতি-ঘোষণা। বোঝা যায় লালবিহারীর পিতার মতো অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদের মনেও সন্তানকে ইংরেজি শেখানোর বাসনা এই সময়ে প্রবল হয়ে উঠেছে—মেকলে সমকালের বাঙালির এই আকাঙ্ক্ষা ঠিকই অনুভব করেছেন। ঠিক সময় বুঝে আলেকজাণ্ডার ডাফের মতো মিশনারির আবির্ভাবও (১৮৩০) যেন ইতিহাসের ইঙ্গিত সূচিত করে। ডাফ সাহেবের স্কুলেই লালবিহারী বারো বছর পড়াশোনা করেন। ফলে তাঁর স্মৃতিকথা এই বারো বছর কলকাতা-বাসের ইতিহাস—স্কুল ছুটি থাকলে গ্রামের বাড়ি যান, কিন্তু বছরের বেশি সময়টাই কলিকাতায় কাটে। ডাফ সাহেবের স্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি, সমকালের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাদীদের বিতর্ক, ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, কলকাতার 'বাসাবাড়ি'তে পিতার মৃত্যুর পর দূরসম্পর্কের ভাইয়ের কাছে আশ্রয়লাভ, ভাইয়ের স্ত্রী ও অকালমৃত

শিশু, পাচিকা কুঞ্জ'র মায়ের যত্ন, স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের স্মৃতিচারণ—সব কিছুই লালবিহারীর লেখার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মনে হয় 'দক্ষ ঔপন্যাসিকের' প্রতিভা তাঁর ছিল—বিশেষত কয়েকটি রেখায় চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে তিনি পটু। ফলে লালবিহারীর স্মৃতিকথা ঐতিহাসিকের কাছে যেমন মূল্যবান বিবেচিত হবে, তেমনি সাধারণ পাঠকের কাছেও কাহিনীরসের জন্য সমাদর লাভ করবে।

আমরা আশাকরি বইটির বর্তমান সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হবে এবং শীঘ্রই আবার পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন দেখা দেবে। সেই কথা ভেবে গ্রন্থের সম্পাদন ও মুদ্রণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। গ্রন্থে কোথাও বলা হয় নি, বেঙ্গল ম্যাগাজিনে কবে কতদিন ধরে রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। যতদূর জানি, লালবিহারীর স্মৃতিকথা পত্রিকায় ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৭৬ সালের মধ্যে আঠারোটি কিস্তিতে প্রথম প্রকাশিত হয়। (পত্রিকায় লেখকের নাম ছিল না—'by an old Bengali boy' স্বাক্ষরিত হতো)। অবশ্য অবসর না মেলায় লালবিহারী প্রত্যেক মাসে স্মৃতিকথা লিখে উঠতে পারেন নি, মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে লেখাটি বুঝি আর প্রকাশিত হবে না। পত্রিকার সঙ্গে গ্রন্থটি মেলাতে গিয়ে দেখছি, কপি খুব যত্ন করে তৈরি করা হয় নি। ছেদচিহ্ন ব্যবহারের কথা বাদ দিলেও অন্য ধরনের মারাত্মক মুদ্রণপ্রমাদ আছে। পুরনো লেখার ছাপার সময়ে আর একটু সতর্কতা প্রয়োজন। অন্য ধরনের সংশোধন বা বা উল্লেখেরও প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়, যেমন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের সময়ে অনেক ছাপার ভুল ছিল, ইংরেজি ব্যাকরণগত কিছু ভুলও দেখা যায়—যেগুলি লেখক নিজে পরে সংশোধন করেছেন। এই সংশোধনের কথা কোথাও বলা হয় নি। লালবিহারী বেঙ্গল ম্যাগাজিনে স্মৃতিকথা প্রকাশের কয়েক বছর পরে লেখাটি আমূল সংশোধন এবং অনেক পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করে একটি বই লেখেন—এক হিসাবে সেটি একটি নতুন বই,—অন্যদিকে মিলিয়ে দেখছি পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার একটা বড় অংশ আক্ষরিকভাবে (ভাষাগত ত্রুটি সংশোধনের পর) লালবিহারীর 'রিকালেকসনস অফ আলেকজাণ্ডার ডাফ' (১৮৭৯) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ প্রত্যাশিত ছিল। আসলে লালবিহারী পত্রিকায় যা লেখেন সেটিকে বলা যায় 'প্রথম পাঠ'—সেই জন্যই সেটি তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নি। তবে আলেকজাণ্ডার ডাফ গ্রন্থে লালবিহারীর শৈশব-

জীবনের বিবরণ এবং কলকাতায় তাঁর বারো বছরের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ঘটনা পরিত্যক্ত হয়েছে। সেদিক থেকে মনে হয় 'রিকালেকসনস অফ আলেকজাণ্ডার ডাফ' গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হলে আমরা বেশি উপকৃত হতুম, পরিত্যক্ত অংশগুলি পত্রিকা থেকে গ্রহণ করে পরিশিষ্টে ছাপা যেত।

শিক্ষক ও সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ধর্মোপদেষ্টা লালবিহারী দে'র কর্মকৃতিত্বের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখনো হয় নি। লালবিহারীর জীবনী রচনার কাজে এখনও পর্যন্ত মন্মথনাথ ঘোষ ও রাধারমণ মিত্রের প্রবন্ধ দুটি সবচেয়ে মূল্যবান বিবেচিত হয়, কিন্তু বাংলায় লেখা বলেই বোধহয় প্রবন্ধ দুটি অবহেলিত। লালবিহারী যে-লেখার জন্য সরকারি চাকরি তথা পুরস্কার পেলেন সেটি পুনর্মুদ্রণযোগ্য—এবং মনে রাখা ভালো লালবিহারীর রচনাবলীতে এটি কোনো ব্যতিক্রম নয়। তাঁর মাহাত্ম্যকীর্তনের সময়ে তা না হলে আমরা মাত্রাজ্ঞান হারাব। লালবিহারীর 'রচনাপঞ্জী' কেন অসম্পূর্ণ তা বুঝতে পারি, কিন্তু গ্রন্থতালিকায় অন্তত 'লিটারারি বিউটিস অফ দি বাইবেল', 'লাইফ অ্যাণ্ড লেবারস্ অফ ডঃ জে. উইলসন' এবং 'অন দি বেদান্তিজম্' বইয়ের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। সম্পাদকের ভূমিকা থেকে জানতে পারি, লালবিহারী নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের 'সম্ভবত' প্রথম সমালোচক। কিন্তু ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বিষবৃক্ষে'র সমালোচনার আগে কি বঙ্কিম আর কোনো উপন্যাস লেখেন নি? অবশ্য বাংলা ভাষায় সমালোচনা হয়তো উল্লেখের অযোগ্য, কিন্তু কাওয়েল সাহেব তো ইংরেজিতে 'দুর্গেশনন্দিনী'র দীর্ঘ সমালোচনা করেন—তা কি আমরা ভুলে যাবো?

অলোক রায়

A New kind of History and other essays by Lucien Febvre.; edited by Peter Burke; Horper Torch books, 1973.

আমাদের ভারতীয় ইতিহাসচর্চার পরম্পরায় ও বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কসীয় প্রজ্ঞার, প্র্যাক্সিসের বৈপ্লবিক ধাক্কা একান্ত প্রয়োজন। আর অ্যাকাডেমিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে, কেবল চেয়ার-বিহারী গবেষণার বাস্তব-সম্পর্করহিত অপ্রাসঙ্গিক পণ্ডিতিপনার বিরুদ্ধেই এই প্র্যাকসিসকে উদ্যত খড়্গ

হতে হবে। নব্য-সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চায় অনেকেই মুগ্ধ, কিন্তু লড়াইটা যে দরকার, এ বোধ লুপ্ত। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সংগ্রামহীন প্রগতিবাদের উৎকট দৃষ্টান্ত আমাদের মার্কসবাদী শিল্পচর্চা, ইতিহাসচর্চা। গ্রামশি ব্যাখ্যাত ইতালীয় রিসঅরজিমেন্টোর মতোই এখানেও বামমার্গীরা দক্ষিণ-পন্থীর হয়েই কাজটা করে দেয়. দক্ষিণপন্থীরা কেমন এক বা একাধিক শ্রেণীর মুখপাত্র হয় অঙ্গাঙ্গীভাবে, ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, বামপন্থীরা তা হয় না; শিকড়হীন চর্চায় ভিতহীন প্রগতিবাদে লুম্পেন-শাসকদের হয়েই নেবে পড়েন। অথচ ইতিহাসচর্চা যে একটা লড়াই, জীবনেরই স্বেদাক্ত বাস্তবের অনুধাবন, এ বোধ মার্কসবাদে প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক। এই বোধের সহযোগী যাত্রী যাঁরা তাঁদের মধ্যে আনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক ব্লক ও লুসিঅঁ ফেভ্‌র্‌-এর নাম সর্বদা স্মরণীয়। ব্লক ১৯৪৪-এ জার্মানদের গুলিতে নিহত হন। আর ফেভ্‌র্‌-এর মৃত্যু ১৯৫৬-য়, জন্ম ১৮৭৮-এ। আমাদের ইতিহাসচর্চার সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ফেভ্‌র্‌ এই কারণেই প্রাসঙ্গিক যে তিনি (এবং ব্লক) ইতিহাসকে যুদ্ধের হাতিয়ার ভেবেছিলেন, ব্যাপকতর ও আরো মানবিক ইতিহাসের জন্য যুদ্ধের। বিতর্কমূলক ম্যানিফেস্টোগুলি ফেভ্‌র্‌-ই লেখেন, ব্লকের প্রশান্ত প্রকাশের পাশে ফেভ্‌র্‌ ছিলেন যেন অগ্নিশিখা। প্রচালত গবেষণার তথ্য-নিষ্ঠার কোনো ঘাটতি ছল না তাঁর মধ্যে, কিন্তু তাঁর বড়াই ছিল, 'তথ্যের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে', যেমন করে ডাকটিকিট জমায়, দেশলাইয়ের খোল জমায় তেমন করে তথ্য আহরণের বিরুদ্ধে, কেবল অনুপুঙ্খর জন্যই অনুপুঙ্খে নিমগ্ন হওয়ার বিরুদ্ধে। তাঁদের স্লোগান, no problems, no history. যদি কেউ না-জানে সে কিসের অন্বেষণ করছে, তাহলে কী খুঁজে পেল তা সে বুঝতে পারবে না। ফেভ্‌র্‌ ছিলেন যাকে বিশেষীকরণের মানসিকতা বলে তার আপসহীন শত্রু। তিনি বিশ্বাস করতেন না, কূটনৈতিক ইতিহাস বা ধারণার ইতিহাস, এমন কি সামাজিক ইতিহাস বলে বিচ্ছিন্ন কোনো ইতিহাস আছে। পৃথক খোপে ইতিহাসকে ভাগ করা যায় না, ইতিহাস সমগ্র, সমগ্রেরই ইতিহাস। ভালো ঐতিহাসিককে তাই ভূগোলবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনোবিদ হতে হয়। তাঁর কাছে ধর্মের ইতিহাস চার্চ নামক এক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস নয়, ব্যাপকতরভাবে মানুষের ধর্মীয় ধারণা ও আবেগের ইতিহাস, যা আবার যুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে। ভূমিকায় পিটার বার্ক তাই বলেন, ফেভ্‌র্‌-এর কাছে, 'the Reformation was above all an attempt to provide for the new spiritual needs of a rising

social group, the bourgieosie. In his emphasis on historical psychology of religion Febore broke with tradition' আর এটা করতে গিয়ে তিনি ফরাসী শিল্প, ফরাসী সাহিত্যের পাঠকেও ব্যবহার করেন। সুধারের ক্ষেত্রেও অন্তর্বিকাশের ওপর তিনি জোর দেন না, জোর দেন ব্যক্তিগত প্রবর্তনা ও সামাজিক প্রয়োজনের সম্পর্কের ওপর। রাবেলের ধর্ম সংক্রান্ত বইটিতেও গুরুত্ব পায় ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয়র 'mental equipment' ফেভ্র্ বলেন ষোড়শ শতাব্দী ছিল কানের যুগ, চোখের যুগ তখনও আসে নি। ঐতিহাসিক মনস্তত্ত্বের এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই বইটি।

আলোচ্য প্রবন্ধ সংকলনে বারটি প্রবন্ধ আছে। প্রতিটি প্রবন্ধই নতুন ভাবনায়, প্রচলিত ধারণাকে খর্ব করায় উজ্জ্বল। এর মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে ফেভ্র্-এর কয়েকটি বক্তব্য আমরা হাজির করছি।

ইতিহাস ও মনোবিদ্যা সংক্রান্ত প্রথম প্রবন্ধটিতে প্রশ্ন করেন কারা সেই বিস্ময়কর হিস্টরিক্যাল ফিগার? তারা মহৎ ঐতিহাসিক কর্মের অধর। ঐতিহাসিক কর্ম কি? ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন, সাজান, একত্র করেন এমনভাবে যাতে একটা সূত্র, সংযোগ নির্মিত হয় 'in one of those great chairs of distinct, homogenous facts (political, economic, religious etc.) which we fasten more or less firmly round the historical past of mankind ফেভ্র্-এর কাছে একটি ঐতিহাসিক ওঅর্ক তাই যা আঞ্চলিক ও জাতীয়কে ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়, প্রকৃত মানবিককে স্পর্শ করে। হিস্টরিক্যাল ফিগার 'satisfies a fundamental need, the common reed that "every watch requires a watch maker, every historical work postulates an author'. Creation is conceived in terms of procreation, of father and sons' আর এই হিস্টরিক্যাল ফিগার স্বয়ম্ভূ নয়, তার যুগ ও পরিবেশ তাকে যা হতে অনুমোদন করে, সে তাই। এ প্রসঙ্গেই ভাষা আসে: language imples the existence of society, আর মনোবিদ্যায় মানুষের আবেগ, সিদ্ধান্ত ও যুক্তি সম্পর্কেই যখন বলা হয় তখন আসলে 'আমাদের' আবেগ-যুক্তিবোধ সম্পর্কেই বলা হয়ে থাকে, কিন্তু অতীতের মানুষকে বুঝতে মনোবিদ্যা কতটা সাহায্য করে? ১৯৩৮-এ লেখা এই প্রবন্ধে ফেভ্র্ বলেন, আমাদের সমসাময়িক মনোবিদ্‌দের বিজ্ঞানকে অতীতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়,

যেমন পূর্বপুরুষদের মনোবিদ্যা আজকে মানুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মনোবিদ্যা যে অনৈতিহাসিক হয়ে উঠতে চায়, বিমূর্ত সার্বজনীন হবার দিকে ঝোঁকে তার প্রতিবাদেই যেন ফেভ্‌র্ বলেন চমৎকার : বিংশ শতাব্দীতে দিন-রাত্রির বৈপরীত্যের কোন অর্থই প্রায় নেই। বাহুর সামান্য সঞ্চালনে একটি সুইচের ওঠানামায় আলো জ্বলে ওঠে। আমরা আলো-অন্ধকারের প্রভু। কিন্তু মধ্যযুগে বা ষোড়শ শতাব্দীতে? দিবস-রজনী ভেঙে যেত আলো ও অন্ধকারের পর্যায়ে। এই যুগের মানুষের মন-অভ্যাস কি এক হতে পারে বিশ শতকের মানুষের সঙ্গে? শীত-গ্রীষ্মের সূত্রেও একই কথা বলা যায়। নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও তাই। ফেভ্‌র্ প্রশ্ন করেন: How can the psychology of overfed populations......possibly be the same as that of populations which were perpetually under-nourished, constantly establishing precarious modes of existence verging on starvation and finally dying off in thousands either through lack of food or, even more tragically through the misguided goodwill of benefactors who turn to be murderers....' এই উক্তিতে দরিদ্র-শোষিত তৃতীয় বিশ্বেরই প্রবক্তা মনে হয় ফেভ্‌র্‌কে। মনোবিদ্যাকে তাই ইতিহাসে প্রয়োগ করাকে ফেভ্‌র্ বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবেই দেখেন। সেন্সিবিলিটি অ্যাণ্ড হিস্ট্রি নামক আর একটি প্রবন্ধেও মনোবিদ্যার প্রসঙ্গ আনেন ফেভ্‌র্। মানুষের আবেগ-জীবনকে ইতিহাসে আনার সমস্যাকে তুলে ধরেন। বলেন, যদি প্রতিবেশী মনোবিদদের সমালোচনামূলক ও সদর্থক কৃতিত্বগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি, তাহলে, এতদিন শুরু করা হয় নি, এমন কাজ আরম্ভ করা যায়, আর এ-কাজ না হলে, 'there will be no real history possible.' প্রেমের মৃত্যুর করুণার নিষ্ঠুরতার কোন ইতিহাস নেই—এর অর্থ সব যুগ, পর্যায়, সভ্যতায় প্রেমের, উল্লাসের ধারাবাহিক পর্ব নয়, অথবা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ইতিহাস নয়। 'I am asking for a vast collective investigation to be opened on the fundamental sentiments of man and forms they take.'

১৯৪৯-এ লিখিত 'এ নিউ কাইণ্ড অব্ হিস্ট্রি' নামক প্রবন্ধে ফেভ্‌র্ শুরু করেন: একটি নতুন বই সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে, একটি ছোট বই যার একের-চার, হতে পারে একের-তিন, অংশ পাওয়া যাচ্ছে না, বইটির

চমকপ্রদ একটি, বরং দুটি, নাম আছে : অ্যান আপলজি ফর হিস্ট্রি বা ঐতিহাসিকের কলাকৌশল। মার্ক ব্লকের বইটিকে কেন্দ্র করেই ফেভ্‌র্‌-এর প্রবন্ধ ফেভ্‌র্‌-এরভাষায় Marc Block, perhaps the cruellest and most inexplicable of Frech loss between the year 1940 and 1945. মার্ক ব্লকের বইটিকে কেন্দ্র করে ফেভ্‌র্‌ ঐতিহাসিকের সভ্যতায়, ঐতিহাসিক ধর্ম খ্রিস্টান জগতে ইতিহাস সম্পর্কে অবজ্ঞার প্রশ্ন তোলেন, তথ্য-সর্বস্বতার প্রতিবাদ করেন, ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেন, any defiration is a prison, মানুষের মতোই বিজ্ঞানের সব কিছুর ওপরে প্রয়োজন স্বাধীনতা। আবার তথ্যের প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্ভ্রমের সমালোচনা করেন। এই প্রবন্ধেই ফেরনাঁ ব্রদেলের 'ভূমধ্যসাগর...' গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন : 'Fernand Brandel's these gave us an entirely new dimension and one which in a sense, is revolutionary.' স্পেনীয় নীতিকে যথাস্থানে স্থাপন করতে গিয়ে ব্রদেল প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পট-প্রসঙ্গকে ব্যবহার করেন—প্রথমে স্থায়ী শক্তিগুলির মানবেচ্ছার ওপর প্রতিক্রিয়া দেখান, তারপর, he refers to particular forces animated by a certain common factor : এরা নৈর্ব্যক্তিক, সামূহিক, কিন্তু কার্যনির্দিষ্ট অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর ব্যাপার বলে বোঝা যায়। তৃতীয় অংশে আছে ঘটনাবলি, প্রায়ই প্রথমের স্থায়ী শক্তি ও দ্বিতীয়ত স্থির শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; এই ঘটনাবলি 'tumaltuous bubbling and confused'। বইটির সম্পর্কে ফেভ্‌র্‌ বলেন, 'it is a bold, simple outline, without fus or bother, without pompous statements or definite profession of faith—the book is a manifesto, a sign. And, I have no hesitation in saying so, it is a milestone. (পরিচয়ের পাতায় ব্রদেল সম্পর্কে লেখা হয়েছিল ডিসেম্বর ১৯৭৯-তে)। বিপুলাকৃতির বইটিকে ম্যানিফেস্টো হিসাবে দেখা থেকেই ফেভ্‌র্‌-এর দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। তার লড়াই ঐতিহাসিকের লড়াই, যে ঐতিহাসিকের অন্বিষ্ট মানুষ। সব রকম বিশেষীকরণকে ভেঙে সমগ্র ইতিহাসের বিশাল ব্যাপ্তিতেই এই মানুষকে ধরতে হবে।

বইটির এগারো সংখ্যক প্রবন্ধ কেমন করে মিশলে (Jules Michelet) রেনেসাঁসকে আবিষ্কার করেন? রেনেসাঁস ধারণাটির জীবনীধারা খুবই শক্তিশালী ও প্রভাবশালী। আজ থেকে একশ ত্রিশ বছর আগেও এই

ধারণাটি ফ্রান্স মধ্যযুগের বিরোধী হিসাবে শিকড় গাড়ে নি, অথচ তারপর দ্রুত অনিবার্য হয়ে উঠল : Words which history invents—but which inmediately escape from its control. They follow their destiny. They find out their fate. রেনেশাঁস ধারণাটির ফ্রান্সে জন্ম ১৮৪০-এ, মিশলের হাতে। মিশলের কাছে এটি কেবল শব্দ ছিল না, ছিল সামগ্রিক ধারণা। তাঁর ভাষায় 'বস্তুত্বপূর্ণ শব্দ রেনেশাঁস'। পরিবেশে, হাওয়ায় শিল্প-ইতিহাসে শব্দটি ছিল। তবে এভাবে সর্বগ্রাসী ব্যবহার মিশলের হাতেই ঘটল। মিশলে অন্য শব্দও ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু কেন করেন নি, তার কারণ নির্দেশে ফেভ্‌র্‌ বলেন, Michelet's inspiration was always personal জড়িয়ে আছে, মিশলের 'nostalgic and violent taste for death and the dead.' মৃত্যু তাঁর কাছে ছিল অন্য এক জীবনের দ্বার। অমরতার প্রতি ছিল তাঁর অবিচল বিশ্বাস। মৃত্যুর নিদারুণ শোক তাঁকে কাঁপিয়ে দেয়, তীব্র আবেগের সুর যা আবার জাগিয়ে তোলে। এই ভাবেই মিশলের ব্যক্তিত্বের গভীর থেকে রেনেশাঁস বা নবজাগরণের ধারণার জন্ম হল। ১৮৩৯-এর জুলাইয়ে মিশলের প্রথমা স্ত্রী মারা যান, হতাশায়-অস্থিরতায়, ছোটখাট প্রেমে, মর্যাদাহীন সম্পর্কের মধ্যে জীবন কাটে, তারপর অকস্মাৎ যেন নীলাম্বর থেকেই নেমে আসে আকস্মিক প্যাশন, দেখা হয় আরেক মহিলার সঙ্গে ; মৃত্যুর ভাবাবেগের পরই আসে নতুন জীবনের প্রস্ফুটন। মৃত্যু থেকে জীবন উঠে আসে, মৃত্যু খুলে দেয় জীবনের নতুন দ্বার। শুধু তাই নয়, মিশলের মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চার পটভূমিও মনে রাখতে হবে : it was precisely all that bourgeois in him (Louis XI) which revolted Michelet. বুর্জোয়া মরুভূমির মধ্যে চলতে চলতে মিশলে অবসন্ন হয়ে পড়েন। অকস্মাৎ আসেন অষ্টম চার্লস ও ইতালীয় যুদ্ধে। আর এখানেই, ইটালি ও তার সৌন্দর্য-উল্লাস, তার রঙিন জীবন মিশলেকে নবজীবন দেয় ; এ মুহূর্তেই লাফিয়ে আসে রেনেশাঁস শব্দটি। রেনেশাঁস এখানে সামগ্রিক পুনরুজ্জীবন—আশার দ্যোতক। মানুষ আর মধ্যযুগের অবক্ষয় ও মৃত্যুর নিষ্ঠুর যন্ত্রণার কুৎসিৎ চিন্তায় মাথা ঢাকে না। ভবিষ্যতের আলোর দিকে চেয়ে থাকে। ডোনাটেল্লোর সুন্দর শিশুগুলির হাসি জীবনের বিশ্বাস নিয়ে আসে। এইভাবেই রেনেশাঁসের জন্ম হল, সে দীক্ষিত হল। মিশলের আশাময়, বিদ্রোহী আবেগের মধ্যে, হৃদয়ে জন্ম নিল রেনেশাঁস।

'রেনেশাঁস হৃদয়ের পুনর্জাগরণ'। প্রায় শূন্য থেকে জন্ম এই রেনেশাঁস আসলে মধ্যযুগের 'the very negation' ছিল। ১৮৪০-এর দশকে মিশলেও নিজেকে মুক্ত করছেন চার্চ থেকে, যাজক, জেসুইটদের হাত থেকে, খ্রিস্টান ধর্ম তথা মধ্যযুগীয়তা থেকে। বিবেকের এক প্রচণ্ড নাটক থেকেই এ রেনেশাঁস বেরিয়ে এল। ফেভ্র্-এর এই বিশ্লেষণ, তাৎপর্যপূর্ণ শুধু নয়, দিগন্ত উন্মোচনকারীও বটে। ইতিহাস, ধারণা ও ঐতিহাসিক, ব্যক্তির দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের অসামান্য বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধ। শুধু একটি ধারণার ক্ষেত্রেই নয়, ঐতিহাসিকের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠাতেও এই ব্যক্তি ইতিহাসের সূত্র থাকতে পারে, থাকতে পারে তার ইতিহাস পাঠ ও চর্চার ইতিবৃত্ত। কেন অসাধারণ পণ্ডিতের কাছে বঙ্গীয় জাগরণ ইটালিয় জাগরণ থেকে ব্যাপকতর মনে হয়, কেন মুসলমান-বিদ্বেষ মাথা চাড়া দেয়, প্রথমে বঙ্গীয় নবজাগৃতিকে ইতালীয় জাগরণের সমতুল্য ভেবে পরে অতি বামপনায় সবটাই ফাঁকি মনে হয়—এ-সবের অনুধাবনে ফেভ্র্ নির্দেশিত পথ কাজে লাগে। প্রবন্ধ সংকলনের অন্য প্রবন্ধাবলিও—ফরাসী ধর্ম-সংস্কারান্দোলন, উইচক্র্যাফট বা সিভিলাইজেশন শব্দ ও ধারণাটির বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনাগুলি, এ-রকমই চিন্তোদ্দীপক। লুসিঁয় ফেভ্র্ ব্যাপকতর মানবিক ইতিহাসের যাথার্থ প্রমাণ করেন এভাবেই: গোটা মানুষের সন্ধানই যে ঐতিহাসিকের কাম্য হওয়া উচিত, একটি পরিসংখ্যানের সারনীরও যে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমাজে মানুষ-- সে-কথাই ফেভ্র্-এর লেখায় ধরা পড়ে। ঐতিহাসিক ও ইতিহাস, বিষয়ী ও বিষয়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপে ফেভ্র্ ভেঙে দেন অ্যাকাডেমিক জীবন-বিচ্ছিন্নতা--সুখ-দুঃখ-ক্রোধ-হতাশা-আনন্দময় মানুষের অঙ্গনেই ইতিহাসকে নিয়ে আসেন—যে অঙ্গন থেকে ভারতীয় ইতিহাসচর্চা, সে মার্কসবাদী বা অমার্কসবাদী, মার্কসবাদ বিরোধীই, যাই হোক কঠোরভাবে নির্বাসিত।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা দর্পণ। প্রথম পর্ব। রাধারমণ মিত্র। সুবর্ণরেখা। পঁয়ত্রিশ টাকা

গৌরবের তেমন মুহূর্তে মনে হয় আমাদের এই বাংলা যেন যৌবনবান বৃদ্ধেরই দেশ। যুবকের কীর্তির পরাক্রমে আমাদের একটু অস্বস্তিই হয়,

বুদ্ধের জয়যাত্রায় পেয়ে নিতে চাই ইতিহাসে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকার সমর্থন। আধুনিক মননচর্চার গত মাত্র শ-খানেক শ-দেড়েক বছরে বুদ্ধের চিন্তার মৌলিকতায় আমরা চমকেছি কতবার, যুবজনোচিত সাহসে তেমন খুব উত্তেজিত হই নি। সাহিত্য-রচনায় এর বিপরীত ঘটেছে—রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে। তাই, গল্প-কবিতা-নাটক পরিণত বার্ধক্যের চর্চায় যে-একধরনের পক্কতা পেতে পারত, তা জোটে নি।

এ-কথাগুলি বড় জোর অর্ধসত্য। কিন্তু এমন ত্বরিত অতিশয়োক্তিতেই তো আমরা মনের কথা জানিয়ে থাকি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না রাধারমণ মিত্র-র বয়স কত। ভয় হয়, বুঝি কম বলে ফেলব। এমন বয়সে তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই—'কলিকাতা দর্পণ'—সাহিত্য অকাদেমির বাৎসরিক পুরস্কার পাওয়ায় বৈজয়ন্ত বার্ধক্যের আরেক প্রমাণ পাওয়া গেল। সুলভ আত্মাভিমানে ভাবতে ইচ্ছে করে—এ আমাদের ব্যতিক্রম নয়, নিয়ম! রাধারমণ মিত্রের মতো মানুষকে আমাদের দৈনন্দিন সামাজিকের অন্তর্গত ভেবে নিলে অনুতাপ ও আত্মবিলাপের কারণ কিছু কমে আসে।

আর, তেমন ভাবার প্রশ্রয়ও রাধারমণ মিত্রই সারা জীবন দিয়ে গেছেন ও যাচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশের এতোয়ায় তাঁর গান্ধিবাদী রাজনৈতিক জীবন, ভারতবর্ষের অন্যতম প্রথম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর জেলখাটা, বাংলায় কংগ্রেসের ভিতর সুভাষচন্দ্রের বামপন্থার বিকল্প কার্যক্রমের প্রাক-প্রাথমিক যুগে শ্রমিকশ্রেণীর ভিতরে তাঁর সংগঠন, চল্লিশের দশকে মার্কসবাদভিত্তিক নতুন মনন-আন্দোলনে তাঁর কাজ—এই সবকিছু মিলে তিনি এই শতাব্দী জুড়ে যে-জীবন যাপছেন তা—'এলিটিজম'-এর—বিশিষ্টতাবাদের বিরুদ্ধে প্রকট প্রতিবাদ। তাঁর পেশা, পোশাক, বসবাস, কোথাওই কখনো তিনি সাধারণের বাইরে নন। এমন-কি সাধারণের অন্তর্গত হয়ে থাকাটা তাঁর বেলায় জীবনদর্শনও নয়, নিছকই জীবন। সেই জীবন নিয়েই তিনি চিরকাল বিশিষ্টতাবাদের বিরোধিতা করে আসছেন—ভারতের ব্যারিস্টারি কংগ্রেসি রাজনীতির বিরোধিতায় গান্ধিজীর জনসাধারণের আন্দোলনে, শ্রেণীসাম্যের গান্ধিবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে শ্রমিকের শ্রেণী-আন্দোলনে, বিদ্যাচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক আভিজাত্যের বিরুদ্ধে মার্কসবাদের মনন-আন্দোলনে।

দীর্ঘ জীবনের পরিণততম কালে কলকাতা সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলি প্রায় রূপকথায় পরিণত হয়েছে। দৈনিক কাগজের খবর হিসেবেই কখনো-কখনো দেখা যায় তাঁর সংগৃহীত তথ্যের পাতার সংখ্যা বা গবেষণার কোনো নতুন

উপায়। উপকথার টানে এমন আজগুবি কথাও দেখা যায়, তিনি নাকি লিখতে শুরু করেছেন আশি বছর বয়সে আর কলকাতা সম্পর্কে লেখাগুলিই নাকি তাঁর প্রথম লেখা। কর্মময়, জিজ্ঞাসামুখর, ক্লান্তিহীন ও বিরতিহীন জীবন তাঁর দীর্ঘ বলেই উপকথায়ই সহজ প্রশ্রয় জুটে যায়, আর তাতেই ইচ্ছে হয় তাঁর জীবন ও কাজের বিচিত্র গতি বোঝার দায় থেকে পরিত্রাণ পেতে। ফলে রাধারমণ মিত্রকে আমরা করে তুলতে চাই আমাদের সশ্রদ্ধ কৌতুকেরই বিষয়—কৌতূহলের নয়। এমন ইতিপূর্বেও ঘটেছে—খুব নিকট উদাহরণ মনে পড়ে, সত্যেন বোসকে। তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জটিল প্রক্রিয়াকেও আমরা লোককথার বিষয় করে তুলেছিলাম ভালোবাসারই এক গূঢ় টানে। রাধারমণ মিত্রের 'কলিকাতা দর্পণ'-ও যেন লোকধারণায় হয়ে উঠছে এক বিচিত্র পাণ্ডিত্যেরই ভাণ্ডারমাত্র, অনুসন্ধিৎসার একটু উদ্ভট নজির।

অথচ, এ-বইয়ের যে-কোনো পাতা ওল্টালেই বোঝা যায়, নিছক পাণ্ডিত্যের কোনো টানই তাঁর নেই। বরং, 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে' ও 'কলকাতা কি কলকাতায় ছিল' প্রথম ও শেষ এই রচনা দুটিতে পাণ্ডিত্যের বিপরীতে অভিজ্ঞতা, বাস্তব বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানকেই শাণিত ব্যবহার করেন তিনি। দুটি-একটি জায়গায়, যেমন, ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায়, বিদ্যাসাগরের বড়বাজারের আর মাইকেলের বেনেপুকুরের বাড়ি খোঁজার কাহিনীতেই একটু পরোক্ষে তিনি জানিয়ে দেন তাঁর জিজ্ঞাসার তাড়াটা কোথায়, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পরম ভক্ত... তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় বড়বাজারের কোন বাড়িতে থাকতেন তা দেখবার প্রবল ইচ্ছা জাগে...,' 'অনেকদিন আগে খোঁজ করতে করতে গৌরদাস বসাকের বাড়ি বার করি। কেননা গৌরদাস বসাক ও রাজনারায়ণ বসু ছিলেন মাইকেলের পরম বন্ধু। আর মাইকেল হচ্ছেন আমার আর একজন হিরো।'

যে-ব্যক্তিগত টানে আমরা মৃত আত্মীয় বা অদেখা পূর্বপুরুষের পরিচয় জানতে, ছবি দেখতে বা স্মারকচিহ্ন পেতে চাই, তেমন টানেই কলকাতার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, মানুষজনের ধারাবাহিকতা তিনি খুঁজে ফেরেন—কলকাতার বাঙালি হিসেবে রাধারমণ মিত্রের নিজের পরিচয় নিজের কাছেই এত বেশি স্পষ্ট ও প্রমাণিত। কোনো অজ্ঞাতপূর্ব দলিল বা কোনো অপরিচিতপূর্ব মানুষ এই ব্যক্তিগতের টানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এমন ঐতিহাসিক গবেষণা গ্রন্থে। মাইকেলের বন্ধু গৌরদাসের প্রপৌত্র বলেই

ানো গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসাকের অকাল মৃত্যুর সাম্প্রতিক খবরও আমাদের ানতে হয় বা বিদ্যাসাগরের আশ্রয়দাতা ভাগবত সিংহ বড়বাজারের বাড়ির ালিক ছিলেন না, ভাড়াটে ছিলেন—এই প্রাচীন তথ্যটিও।

এমন তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কারো মনে দ্বিধা দেখা দিতে পারে। থ্যে পৌঁছুনোর এমন ব্যক্তিগত টানে তথ্যটি শুধু তথ্যই থেকে যায়, কোনো তিহাসের উপাদান হয়ে ওঠে না বা এত সব তথ্য থেকে কোনো তত্ত্বও গড়ে ঠতে চায় না, এ-আপত্তিও উঠতে পারে কারো মনে। গোপন করে লাভ নই, তেমন পাঠক এ বই নিয়ে একটু অপ্রস্তুতই থাকবেন। কিন্তু কলকাতার ঙ্গে রাধারমণ মিত্রের ব্যক্তিগত সংযোগের এমন আততি যদি পাঠকের ভতরেও চারিয়ে দেয় কোনো অনুকম্পন তা হলে সে পাঠক স্পন্দিত হয়ে ঠবেন গত দু-শ আড়াই-শ বছরের কলকাতা জুড়ে এই হাঁটায়। সেই াটার শুরু সব সময়ই আজকের কোনো সূত্রে। অতীতের কোনো ঘটনার র্ণনা এসে শেষ হয় আজকের কলকাতারই কোনো জায়গায়। কলকাতা াছে—স্পন্দ্যমান এই অনুভবই ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার অতীতের এই থাপঞ্জিতে। অতীত থেকে বর্তমান কলকাতার বেড়ে ওঠা-বেঁচে থাকার াস্তিত্ব ও সেই অস্তিত্বের অনুভবই এই তথ্যগুলিকে প্রাণবান করে তোলে। াই এই তথ্যের ভিতর বয়ে থাকে জীবনেরই বাতাস। এ-বাতাসের য়োজন সবাই বোধ নাও করতে পারেন। কারো কাছে কলকাতা শুধুই তীত, কারো কাছে শুধুই বর্তমান। কিন্তু অনুভবে যে-পাঠক কলকাতাকে ংযুক্ত করে নেন তাঁর নিজের সঙ্গে, তাঁর পক্ষে এ প্রাণবায়ু বেঁচে থাকার ন্যেই অপরিহার্য। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক।

'শালিমার' নামটি কী করে এলো সে-নিয়ে সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে তিনি ক্ষিণ হাওড়ায়, বোট্যানিক্যাল গার্ডেনের উত্তরে শালিমার বাগানের কাহিনী থন বলেন, তখন তা শুধু বাগানেই শেষ হয় না, ঐ পুরো এলাকাটাই ালিমার রোপ ওয়ার্কস, শালিমার পেইন্টস, শালিমার পয়েন্ট ইত্যাদি নামে কন চিহ্নিত হল সে-কথা জানান। বা আমহার্স্ট স্ট্রিটের ৮৫ নম্বর বাড়ি ামমোহন তৈরি করিয়েছিলেন কি না বা ঐ বাড়িতে রামমোহন কখনো ছলেন কি না এই প্রশ্নের মীমাংসায় ঐ নম্বর চিহ্নিত প্লটটির গত প্রায় শ-খানেক ছরেরই ইতিহাস দিয়ে যান। ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ির মতো কলকাতার ক স্থায়ী স্থানচিহ্ন এখন আর নেই। 'তার জায়গায় এখন যে দোতলা াড়ি রয়েছে তার নাম হচ্ছে "মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান"।' এই না-থাকা বাড়িটিও

১৮১৭ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত প্রধান-প্রধান কী কী সামাজিক কাজে ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি তালিকাই তৈরি হয়ে যায়। পান্তীর মাঠ কোথায় তা নির্দিষ্ট করতে গিয়ে কলকাতার ঐ অঞ্চলের একটা বড় রাস্তা (কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট), একটা গলি (শিবনারায়ণ দাস লেন) ও একটা বড় বাড়ি (১৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট)—এই তিনের অবস্থান অপরিবর্তিত থেকেও সংস্থান কেমন বদলে গেছে তার উদাহরণ দিয়ে ফেলেন। 'এখন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট থেকে এ-বাড়িতে যাওয়া যায় না···শিবনারায়ণ দাসের গলি দিয়ে ঢুকতে হয়···এই বাড়ির সামনেই একটি বড় খোলা মাঠ ছিল··এখন বিদ্যাসাগর কলেজ হস্টেল হয়েছে।' ট্যাংরা পোস্ট অফিসের সামনের যে রাস্তাটি আগে ছিল ট্যাংরা রোড আর এখন হয়েছে 'রাধানাথ চৌধুরী রোড' ও ভবানীপুরের যে-বাজারটির নাম 'যদুবাবুর বাজার'—এই দুই চৌধুরীর পুরুষানুক্রমিক সম্পর্ক কলকাতার সমাজবিন্যাসের একটা আঁচ দিয়ে ফেলে। ফরস্টার সাহেবের নাম জানা ছিল এতদিন ইংরেজি-বাংলা অভিধানের সূত্রে, তিনিই যে ভবানীপুরের জলচুঙ্গির নির্মাণকর্তা ও মালিক এ তথ্য প্রায় বিস্ময়কর। 'কলিকাতা কর্পোরেশনের ২-নম্বর জেলা অফিস' আর 'বেলেঘাটায় কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিস' প্রায় যেন কোনো বালজাক উপন্যাসের শুরুর খসড়া—বিশেষত মতিলাল শীল আর কালীপ্রসাদ দত্তের রেখাচিত্র দুটি। ১৩ নম্বর, ২০৯ নম্বর ও ২১১ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িগুলির বিবরণে কখনো এক-একটি পরিবারের, কখনো এক-একটি প্রতিষ্ঠানের কথায় বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে দরকারি আরো নানা কথা এসে পড়ে। তেমন কথা আরো উঠেছে কলকাতার কয়েকটি জায়গা ও কয়েকজন ব্যক্তি নিয়ে কিছু প্রশ্নের জবাবেও অন্য পরিচ্ছেদে।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ থেকে সপ্তম—এই পাঁচটি পরিচ্ছেদকে এই বিশেষ ধারণাটির জন্যেই যেন চিনে নেওয়া যায়। একে বলা যায় 'কলকাতা সন্ধান', রাধারমণ মিত্র অনন্য ও অদ্বিতীয়। আরো যে তিনটি পরিচ্ছেদে (প্রথম, তৃতীয় ও ত্রয়োদশ) তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন-বিনয় ঘোষ ও সুকুমার সেনের সঙ্গে তর্কে নেমেছেন, সেগুলিতেও এই কলকাতা-সন্ধানে পরিচিত ব্যক্তিত্বেরই জোর খাটিয়েছেন বারবার, বিশেষত তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও অন্য প্রসঙ্গে'। সব মিলিয়ে এ যেন এক ভ্রাম্যমাণেরই সঙ্গ—কিছুটা দায়হীন, ভারমুক্ত, এক কথায় সাত কথা এসে

পড়ে, কখনো বা দশ কথা শুনিয়েও দেন, কোন কথায় কী এসে পড়বে তার কোনো নিশানা নাই, কখনো জানা কথাই আর-একবার শুনতে হয়, শুনতে-শুনতে হঠাৎ জানা যায় তার অনেকখানি অজানা ছিল, আবার কখনো এই প্রবীণ সঙ্গী নিজেই এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিজের অজ্ঞানতার কথা বলেন বা নিজের কোনো ভুল শোধরান। সেটাও হয়ে ওঠে একটা অভিজ্ঞতা, তাঁর সঙ্গের এমনই গুণ।

বোধ হয় সেই কারণেই, যেখানে তিনি ভ্রাম্যমাণ নন, সঙ্গী নন, বরং কোনো-এক নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় নিজের জানা আর আবিষ্কারগুলিকে সাজাতে চান, তাঁর গবেষণা তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত জানান 'কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা'-র চারটি পরিচ্ছেদ ও 'গঙ্গার ঘাট'-এ, সেখানে আমরা আহৃত তথ্যগুলিতেই খুশি না থেকে, তথ্যের ভিতরের সংযোগ ও বিবরণের পদ্ধতি বুঝে নিতে চাই। এমন সব গবেষণায় তথ্যের সংযোগ অনেক সময় তৈরি হয় বিবরণের পদ্ধতি দিয়েই তাই পদ্ধতিটি বুঝতে না পারলে তথ্যগুলোও আমাদের কাছে সংযুক্ত হতে পারে না। এই পাঁচটি পরিচ্ছেদে সেই বোঝাবুঝিতে আমাদের দিশেহারা হতে হয় প্রায়ই। অথবা হয়তো, পদ্ধতিটির কারণেই সেটা ঘটে।

যেমন, জলপথের বিবরণ লেখক ইয়োরোপীয়দের কলকাতা-আগমন দিয়ে শুরু করেন। ১৫৩০-৩৭-এ পর্তুগিজদের সপ্তগ্রাম বন্দরে আসা থেকে ১৬৯০-এ কলকাতায় ইংরেজদের বসবাস পর্যন্ত দেড়শ বছর সময় অতি সংক্ষিপ্ত সেরে একটু বিশদে জানান ইয়োরোপীয়দের ভারতে আসার জলপথ সন্ধান। এখানেই একটু সন্দেহ দেখা দেয়, কলকাতা শহরের তৈরিহয়ে ওঠার সম্পূর্ণতই ইংরেজ-নির্ভর ইতিহাসের টানে লেখক কি ধরে নিয়েছেন জলপথগুলিও ইংরেজদের থেকেই শুরু? সন্দেহটা পাকা হয় এর পরে। ১৮৪৮-এ 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা ও গৌহাটির মধ্যে প্রথম স্টিমার চালাবার ব্যবস্থা' থেকে ১৮৪৮-এর আগের কথায় বহির্নৌপথ (আউটার বোট রুট) ও অন্তর্নৌপথ (ইনার বোট রুট) এর কথা এসে যায়। আর সেই প্রসঙ্গ মিলে যায় সারা উনিশ শতক জোড়া খাল কাটা আর খাল বোজানোর কাহিনীতে। একবারের জন্যেও বলা হয় না যে কলকাতা শহর তৈরি হওয়ার বহু বহু আগে থেকে ও ইয়োরোপীয়দের আসারও আগে বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতে জলপথই ছিল অন্যতম প্রধান সরণি। বাংলার প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল হিসেবে রেনেল এই প্রাক্-ইয়োরোপীয় সনাতন জল ও স্থল পথের

নকশা করেছিলেন। সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে দুটি জলপথ অনুসরণ করা হত—বিদ্যাধরী-মাতলা-কালিন্দী এই সব বড় বড় নদীর মধ্যে দিয়ে একটি, অপরটি ছিল হাসানাবাদের পথে। অনুমান করা যায় যে হাসানাবাদের পথটি খুব চালু ছিল না—প্রধানত একটু হালকা নৌকাই চলত। কিন্তু সনাতন এই নদীপথগুলি কলকাতার সঙ্গে যুক্ত ছিল না বলেই টালির নালা কেটে দক্ষিণে আর বামনঘাটা-হাসনাবাদের ভিতর খাল কেটে পুবে দুটি জলপথ বানানো হয়। আর হয়তো এই শেষের পথটির তুলনাতেই আগের পথটিকে 'আউটার' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। খালপথে কলকাতাকে সনাতন জলপথের সংলগ্ন করা নিয়ে তখনকার কাগজেপত্রেও অনেক লেখালেখি হয়েছে। মাত্র একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ১৮১৮-র ১৪ নভেম্বর 'সমাচার দর্পণ' লিখছে :

> 'কুলপীর নীচে এক খাল সমুদ্র পর্যন্ত যায়। সেই খালের গোড়া অবধি কলিকাতা পর্যন্ত একটা নূতন খাল কাটিবার পরামর্শ হইতেছে। যদি এই মত খাল কাটা যায় তবে তাহাতে এই উপকার হইবে যে সমুদ্র হইতে যে সকল দ্রব্য কলিকাতাতে আমদানি-রপ্তানি হয় তাহা নির্ভয়ে অনায়াসে ঐ খাল দিয়া কলিকাতায় আসিতে ও যাইতে পারে।
>
> অন্য এক খালও কাটিবার কারণ কথা হইতেছে। অবর্ষ সময় উত্তর ও পশ্চিম হইতে যত দ্রব্য কলিকাতায় আইসে তাহারা ইছামতী নদী দিয়া শিবনিবাস পর্যন্ত আইসে ও সেখান হইতে হরধামের খাল দিয়া গঙ্গায় আইসে কিন্তু গঙ্গায় আসিবার নিমিত্ত নিত্য দক্ষিণে বাতাস পায়। এবং গঙ্গায় পহুঁছিলে জোয়ার ভাটা পায় ইহাতে অনেক গহরি হয় ও অনেক নৌকার ক্ষতি হয়। যদি হরধামের খাল অবধি কলিকাতার পূর্ব পর্যন্ত একটা খাল কাটা যায় তবে এতদ্দেশীয় বাণিজ্য অবিলম্বে নির্বিঘ্নে রাজধানীতে পঁহুছে।'

এর পর এই খালের সম্ভাব্য নির্মাণ কৌশল ও খরচের কথা বেশ বিশদে বলা হয়েছে। খাল কাটার পেছনে মূল তাড়াটা ছিল গঙ্গার বিকল্প, জোয়ার ভাঁটা নিরপেক্ষ একটা জলপথ দিয়ে সনাতন জলপথের সংযোগ। সাহেবরা তাই উঠে পড়ে কলকাতা থেকে খাল কাটতে লাগল। বাংলাদেশের নদীগুলো সাহেবদের আগেও ছিল।

এমন হতেই পারে না যে রাধারমণ মিত্র এই ব্যাপারটি নিয়ে একটু অসাবধান হয়েছেন। তিনি যদি বাংলাদেশের প্রধান ভূখণ্ড থেকে

কলকাতাকে দেখতেন তাহলে এই তথ্যগুলি থেকেই প্রাক-ইংরেজ জলপথের চেহারাটা ধরা পড়ত। কিন্তু তাঁর দেখার ভূমি কেবলই কলকাতা। তাই বৃহত্তর বাংলার প্রাক্ ইংরেজ কালে তিনি আর যান না। দুটি তথ্যের জিজ্ঞাসা এই প্রসঙ্গে তুলে রাখি। গঙ্গাপথে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে যাওয়ার অন্যতম বাহন 'নৌকো' প্রসঙ্গে রাধারমণ মিত্র বলছেন,

> "ছোট, বড়, যাত্রীবাহী, মালবাহী নানা রকমের নৌকো ছিল এবং এখনো আছে। অল্প লোকে কাছাকাছি যেতে হলে 'পান্‌সি' ব্যবহার করত। 'পান্‌সি' নামটি ইংরেজি Pinnace থেকে এসেছে। অল্প মালসহ বহু যাত্রীবাহী বড় নৌকার নাম ছিল 'বজরা'। এ নামটিও ইংরেজি Barge থেকে এসেছে। বড়লোকদের আরাম করে যাবার নৌকো ছিল 'ভাউলে'। ...শুধু মালপত্র বইবার জন্যে দু' রকমের বড় নৌকো ছিল—কিস্তি ও ভড়।" (পৃঃ ১৬১)

Pinnace ও Barge এ-দুটি ফরাসী শব্দ, ইংরেজি নয়। আমাদের নৌকো ও কৃষিঘটিত অনেক শব্দের উৎসই ফরাসী ও পর্তুগিজ। 'ভাউলে', 'কিস্তি' ও 'ভড়'-এর শব্দগত উৎস কি? আসলে কি এগুলো ইয়োরোপীয়রা আসার আগেই আমাদের নদীতে চালু ছিল? গঙ্গাপথে বাংলা থেকে পশ্চিমে নৌকার নাম মোটামুটি একই রকম কি?

গঙ্গা-নদীপথের ওপর ফ্র্যানসিস বুকাননের রিপোর্ট-এ (১৮১১-১২) আট রকমের নৌকোর নাম পাওয়া যাচ্ছে Pinnace, বজরা, ভাউলে, পানসি, উলাক, পাটেলা, ডিঙি, Canes। পিনাস ও পানসি এক ধরলে আর ডিঙির কথাও 'কলিকাতা দর্পণে' অন্যত্র আছে—একটা প্রশ্ন থেকে যায়—কিস্তি, ভড়, উলাক, পাটেলা আর Cane এগুলো কি একই ধরনের নৌকোর নামান্তর? না কি এদের গঠনগত ও ব্যবহারগত কোনো পার্থক্য ছিল? অর্থাৎ যে-নৌকোগুলোতে মালই বওয়া হত প্রধানত, সেগুলোর কি মাল বহনক্ষমতা অনুযায়ী আলাদা নাম দেওয়া হত? নাকি নৌকোর তলা চেপ্টা না কোণাচে, দাঁড় কটি, পাল কটি বা পাল আছে কি না, যে-জলপথে ব্যবহৃত হয় সেটা বরাবর গভীর না চরসঙ্কুল এইসব দিয়ে নৌকোর নাম হত? এগুলো জানতে ইচ্ছে করে, কারণ নদীবাহনের এইসব বিবরণে প্রাক-ইয়োরোপীয় বাংলার সমাজের ইতিহাস নিহিত থাকতে পারে।

তথ্য অনেক সময় বুঝে ওঠা যায় না প্রয়োজনীয় আর-একটি তথ্যের

অনুল্লেখের ফলেও। যেমন, 'জলপথ'-এর শেষাংশে লেখক কাটা খাল মজে যাওয়ার বিবরণ মাঝে মাঝেই দিয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কাটা খাল শেষার্ধ জুড়ে বুজে যাচ্ছে—খানিকটা যেন এমন একটা ছবি ফুটে উঠতে চায়। কারণ হিসেবে বারবারই পলি জমে যাওয়া, বা স্রোত কমে আসার কথা বলা হয়। অথচ উনিশ শতকের শেষ নাগাদ রেলপথে নানা দিকে ছড়িয়ে যাওয়ার সহজতর ও দ্রুততর বিকল্পের কারণেই যে নদীপথ খালপথ অব্যবহৃত হয়ে পড়ছিল, তা খাল ও রেলের তথ্যগুলোর পারস্পরিক সংযোগের অভাবে এ-বইয়ে পরিষ্কার হয় না।

মূল কারণটি উল্লিখিত না হওয়ায় তথ্য অনেক সময়ই পঞ্জিমাত্র হয়ে ওঠে। তথ্যের সংযোগ না থাকায় রেলপথের বিকাশের যে বিশদ বিবরণ এখানে আছে সেটা বুঝে উঠতে আমাদের একটু অসুবিধে হয়। শুরুতেই একটা তুমুল তর্ক বেধেছিল যে কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত রেলপথ সরাসরি যাবে, নাকি গঙ্গার তীর ধরে ধরে যাবে। ১৮৫০ থেকে ১৮৫২-র মধ্যে এই নিয়ে ছ-ছটি রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল। ১৮৫০-এ ভারত সরকারের পরামর্শ-দাতা এফ-ডবলু সিমস গঙ্গানদী দিয়ে কলকাতায় যে মাল আসে তার ভার কমাতেই রাজমহল থেকে হাওড়া পর্যন্ত রেল লাইন বসানোর সুপারিশ করেছিলেন।

১৮৫৪ থেকে রেল লাইন নদীপথ ধরেই পাতা হচ্ছিল ও ১৮৬৫-তে যমুনা ব্রিজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি-হাওড়া রেল সংযোগ সম্পূর্ণ হয়। তার পরে ১৮৬৬ থেকে কর্ড ও ১৯০১ থেকে গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন পাতার সুপারিশ অনুযায়ী কাজ শুরু হয়—দূরত্ব কমিয়ে আনতে। রেলপথ বিস্তারের প্রাথমিক পরিকল্পনার এই কারণটি যদি আমাদের জানা থাকে তা হলে একটির পর একটি লাইনের যে বিশদ বিবরণ লেখক দিয়েছেন সেটি একটা ছকে ধরা পড়ে যায়। কবে কোথায় কোন লাইন খোলা হল সে লিস্টি তো ভারতীয় রেল পথের ইতিহাসেই পাওয়া যেতে পারে।

একই ধরনের তথ্যের ভিতর নিহিত সংযোগটি স্পষ্ট না করায় সম্ভাব্য অন্য মাত্রা থেকে বিষয়টি বঞ্চিত হয়ে পড়ে। 'গঙ্গার ঘাট'-এর মতো এমন নতুন ইতিহাস-চেষ্টাতে শুধু ঘাটগুলির তালিকা থেকেই উনিশ শতকের গঙ্গামুখী কলকাতার নগরবিন্যাস স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। উত্তর থেকে দক্ষিণের গঙ্গার ঘাটের নামেই ধরা পড়ে যায়—১. নগর কলকাতার উপকণ্ঠ—বাগানবাড়ি-প্রধান কাশীপুর, ২ বাঙালি পল্লীর কিছু ব্যবসাপাতির

জায়গা হাটখোলা-কুমোরটুলি, ৩. তারপর বাঙালি বসতি-এলাকা, ৪. বড়বাজার এলাকা, ৫. সাহেব কলকাতা। এই বিন্যাস ঘাটগুলোর নাম থেকেই ধরা পড়তে পারে। তেমনি নিমতলা ঘাট নিয়ে তিনি কলকাতার শবদাহ ব্যবস্থার যে প্রায় গা-শিউরনো কাহিনী বলেন তাতে আমরা এতই মুগ্ধ হয়ে যাই যে মনে হতে পারে এত প্রসঙ্গ শুধু নিমতলা নিয়েই। কিন্তু কলকাতায় তিনটি শ্মশান তৈরির কাজে হাত দিয়ে প্রথমে নিমতলাই তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু আমাদের এই এত নিরপেক্ষ জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল উশকে উঠতে পারে কারণ আমাদেরই এক সহনাগরিক এই কলকাতা শহরটির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের এক গভীর টান বোধ করেছেন। তিনি তাঁর সেই সম্বন্ধেরই কাহিনী বলেছেন এই বিবরণে। নিজেকে গোপন করে তিনি এই বিবরণের নাম দিয়েছেন—'কলিকাতা দর্পণ'। আমরা এই বইয়ের নাম দিতে পারি 'রাধারমণ মিত্রের কলকাতা'।

চিরনিন্দিত কলকাতার এই এক নীরব অহঙ্কার—এমন ভালবাসাও তার জোটে।

দেবেশ রায়

প্রবাসে

সুমন গুণ

তারা তাঁর মাকে বলেছিল
'আসি'
ঘাড় নেড়ে হেসেছিল মা।

আমবনে রোদ এল
ফিরে গেল
পুকুরে মধ্যাহ্নশব্দ স্তব্ধ হল নির্জন ছায়ায়
দূর বনে পাতা ভেসে যায়
'যাই'
দুয়ারে সিঁদুর সিঁথি এঁকে রেখে দেখেছিল মা

করুণ গোধূলি গেল
উঠে এল
নগ্ন আঁধারে ফুটে ক্লান্ত মুখে বর্জিত আঁচিল
অবিনাশী অন্ধকারে একফোঁটা রক্ত ঝুলে ছিল
চেনা রক্ত পার হয়ে যায়
আত্মীয় পাঁচিল

রুদ্ধবুকে অনড় তারায়
চিবুকে অনন্তচিহ্নে কালো চুল এনে বুকে নিল
মা।

গল্পের পিঠে

নন্দদুলাল আচার্য

আমার আবার গল্পের পিঠে গল্প চলে আসে।
এই যে তুমি বললে,
চাঁদের পিঠে বটগাছ আর বুড়ির গল্প ?

বুড়ি বলতেই মনে পড়ে,
শীতরাত্রি সেই তিন দেহাতি বুড়ির গল্প ;
বেজডি খনি ধাওড়ার প্রান্তে,
কাঁচা কয়লার চাল্লাকে ঘিরে
তাদের ভাঁজপড়া ফোক্‌লা মুখের কথা···

মুখের কথা যদি বলো,
ছল্‌কে ওঠে মধুমাসের স্মৃতি।
বুকের ভেতর কে যেন নিংড়ে দেয় বুক।
আর মুখ বলতেই ভেসে ওঠে,
অসংখ্য মুখের মানচিত্র···

মরা নদীর দুঃখের রেখা,
রেল লাইনের আর্তনাদ,
ক্ষোভের জল স্তম্ভ আর
জটিল রেখার অসংখ্য অনুভব···
সেই যে গল্প : খনির গহীন থেকে উঠে আসা
'কেজ্‌',
'কেজ্‌' থেকে বেরিয়ে আসা মালকাটা ;
তার কালি-ঝুলি মাখা চোখে ডেরা'য় ফেরার আকুতি।
তপ্ত তাওয়ার রুটি সেঁকে
ঘেমে নাওয়া একটি মুখ।

মুখের কথা যদি বলো,
ছল্‌কে ওঠে মধুমাসের স্মৃতি।
আমার আবার গল্পের পিঠে গল্প চলে আসে।

শেকড়ে পাথর লেগে

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

শেকড়ে পাথর লেগে কেটেছে গাছের পরিবার,
পাথর, না পাথরের মতো তীক্ষ্ণ ঋজু তলোয়ার

কেটেছে গাছের মতো হাত, তার ভবিতব্য-ভয়
মানুষের হাত, কালো হাত ছাড়া মানুষের নয়।

গাছের মতন খাড়া পাহাড়ের মতন সাহস
মানুষের নেই, তার দিবসান্তে বাড়ছে বয়স—
শেকড়ে পাথর লেগে মানুষের গতির প্রবাহ
রুদ্ধ করে গেলে কে হে, শার্দূল-না-চতুর বরাহ!

আমার ছায়া

অলককুমার চৌধুরী

প্যারাফিন লণ্ঠনের আলো জ্বলে ঘাসরঙা ঘরে
বাইরে নিঃসঙ্গ রাত্রি
অগণন জুঁই ফুল ফুটে আছে আকাশ-উদ্যানে
চারণের মতো এক দমকা বাতাস এসে ঘোরে
ফুঁ দিয়ে নেভাতে চায় স্থবির এ রাত

আমার পিছনে এক ছায়া ঘোরে সে আমারি ছায়া
বুকের ভেতরে জাগে ঈষৎ কাঁপন
সে কি ভয় আমার মনের
অথবা ক্রোধের এক সমূহ প্রকাশ
ক্ষোভ দুঃখ লজ্জা ঘৃণা কী সে
বুঝি না বুঝি না
নির্বিকার শুধু রাত্রির প্রহর গুনি
গলে গলে পড়ে টুপটাপ টুপটাপ

এঘর ওঘর বারান্দার রেলিং ছুঁয়ে ঝুঁকে পড়ি
অভিকর্ষহীনতায় ফেটে যায় যেন
অলিন্দ নিলয় আর শিরাধমনীর রক্তাক্ত পাহারা
আমার পিছনে ঘোরে আমারি সে ছায়া
ভিতরে ঘুলিয়ে ওঠে নামহীন বোধ

অন্ধকার প্রান্তরের মাঝে দূরে দূরে জ্বলে গ্রাম
শ্মশানের ধুনির মতন   আমার স্বদেশ, এক
নিরাকার অষ্টাবক্র জড়পিণ্ড যেন

আমার পিছনে থেকে আমারি সে ছায়া
আমাকে দেখায় ভয়
নিরুপায় ন্যুব্জপৃষ্ঠ আমি কার প্রতিনিধি !

সময়

মলয় গোস্বামী

এখন এখানে অনিয়ম বড় বেশি ।
শিশুর মৃত্যু,
        কিন্তু কি নিস্পৃহ !
হাত আছে, হায়
নেই হাড়-প্রিয় পেশী ।
চোরা বালি খায় গৃহ !

মানুষ স্থাবির, অথচ ত্বরিৎ
        চলে যায় সাদা ভাত,
ক্ষিপ্ত গুলিতে ডিগবাজি খেয়ে
        নভচ্যুত হয় তারা,
দিনের বেলায় বেড়াতে আসছে রাত
দামামা বাজিয়ে ।   ভয়ে কেঁউ কেঁউ,
        লেজ গুটিয়েছে পাড়া !

পাখিরা স্তব্ধ পাথর, কিন্তু
    ধানে উদ্ভূত ডানা—
উড়ে যায় শুধু উড়ে যায়
    তারা ওড়ে……

কিছু খেতে গিয়ে
সোমনাথ খায়
তপ্ত শিসের দানা
শকুনের দিকে ছায়ার মানুষ
প্রসিত পুষ্প ছোঁড়ে !

এখন এখানে বেনিয়ম
খুব অনিয়ম, বড় চলে :
চড় খেয়ে হাসে বেবাক মানুষ
ক্রোধ ডুবে গেছে জলে !!

টেলিভিশন—১
নবারুণ ভট্টাচার্য

ঐ যে কামপা'র ফেনায় ভাসমান যুবতী
ঐ যে শিশ্নবান যুবক একজিকিউটিভ
তাকে ধরে দিচ্ছে
শিশুর হাসির নেকলেস
ওদের প্রাত্যহিক শরীরে

মেয়েটির বুকের দুখানি স্টিরিও স্পিকার থেকে
ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে উন্মত্ত ডিস্কো।
ছেলেটির মুখে স্ট্র
সে খাচ্ছে আশি'র দশকের এশীয় ডাব
ওদের স্বাস্থ্যপূর্ণ ঘর্ষণ, আড়ি, ভাব
ওদের মানসিক আয়তনে

ওদের যদি দুটো মরশুমী ফুল
বলে মেনে নেওয়া যায়
তাহলে সেই বাগানে

শেকড় ক্রমশ ছড়াচ্ছে মৃত্যুর অন্ধ এক গাছ
মৃত্যুর অন্ধ গাছ
চক্ষুহীন গাছ
ক্রমশ পাঠাচ্ছে শেকড়

অজ্ঞতা ক্ষমার যোগ্য নয়
আমি ওদের মৃত্যুকে সমর্থন করি।

গুপ্তঘাতক

গৌর দাশ

সজাগ সতর্ক চোখ রুদ্ধশ্বাসে পুষে সারাক্ষণ
অনীহার অভিনয়ে পাকা
সে প্রায়ই পৌঁছে যাচ্ছে নিজ লক্ষ্যে পৌঁছে যায়
তবু একদিন কি করে সেই সাবধানতা
সরে গেল চোখের আলোয় জেলে
ঘৃণ্য লোভ নৈতিক নীচতা
তখনি একজন নজর করে দেখে তার সমস্ত ভেতর
কিন্তু সে দেখল দ্রষ্টাকে আরো বেগে বিদ্যুতে
তাই বলি হায় রে দর্শক

যে রাতের শেষ মাসে চাঁদ অন্ধকার
যে সময় সকলেই ঘুমে অবসর
সে সময়ে কোনো এক সুযোগে সহজে
শেষ করে দেওয়া হবে ব্যবস্থা সার্থক
শৈল্পিক এ গোপনতা ইথারেও হয় না উচ্চার

রক্তে সে নিজের হাত ধোয় না কখনো
তার বাতাস আট প্রহর এসেন্সের গন্ধ ছড়ায়
সে জানে কোন্ পথ কোথা শেষ চাতুর্য চূড়ায়
অল্প ইঙ্গিতে তার মৃত্যুনীল কাত সমৃদ্ধ প্রসব।

পরাক্রম নষ্ট হয়

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়

পরাক্রম নষ্ট হয় জীবন যাপনে।

প্রেম, স্থিতি ক্ষয় হয়
সৌন্দর্য বিলাস।
বস্তুগত চৈতন্য বিস্তারে
নীলাকাশ, নদীমুখ ঝাপ্সা হয়ে আসে।
অতিপৃক্ত ভালোবাসা জল হয়।
এলোমেলো কুশল সংলাপে
পথরেখা দীর্ঘ হয়—দীর্ঘতর হয়!

নিশ্চল ইন্দ্রিয় জুড়ে অতৃপ্তির ঢেউ
নির্মাণের তুলি ফেলে নিরালম্ব সুখ
অকালপ্রসবে নষ্ট হয়।
রিপুদের বিপুল সংকট
ভারি হয়, ভারবাহী হয়।

নষ্ট হয় পরাক্রম, ভ্রষ্ট হয়
আক্রমণ বেড়ে বেড়ে যায়
আন্দোলিত শাখা প্রশাখায়।

পরাক্রম ভ্রষ্ট হয় জীবন সংগ্রামে।

ক্রীতদাস

পরিচয় বন্ধু

['তোমাদের হয়ে ভাবেন ফুয়েরার']

কে যেন দিয়েছে ঢেউ
নোনা জলে ভেসে এলো পরিচিত
শব

প্রবক্তা কেউ যেন নির্ঘোষে বলেছিল—
শুরু করো
স্তব

প্রশ্ন করেনি কেউ
নতজানু বসেছিল, ত্রাসে কাঁপে যান্ত্রিক স্বর—
ওকে দিও নম্র ছোঁয়া, হে ঈশ্বর, নিয়ে যেও স্বর্গে একবার—
বলেছিল প্রবক্তা, প্রশ্ন করেনি কেউ, তুলেছি প্রতিধ্বনি
আজ্ঞাবহ আমরা অনুগামী

কে যেন দিয়েছে ঢেউ
নোনা জলে দুলে যায় নিমগ্ন
কাশ
অন্তিম পিপাসা বড় ছুঁয়ে যাও বন্ধুদল
কেঁদে ওঠে নির্জন
লাশ।

দৃশ্য

উদয়ন ভট্টাচার্য

অবশ্য সে রাত্রি বোঝেনি
রাস্তার পাশে ঘুমন্ত শিশুর দুই চোখে
শুকিয়ে গেছে জলের রেখা,
প্রতিটি মানুষ জোয়ারের জলের মতো ফুলে
ক্রোধ ও বিচক্ষণ ভঙ্গিতে শিশুটিকে
অতিক্রম করে যায়

বহু দূরে

শহরের এই দৃশ্য ভালোবাসিনি বলে
কয়েকটি ভিখিরি সরিয়ে আমরা
গাছ বসালুম,

আহা ঐ শিশু শুয়ে আছে নিষ্পাপ
তিনদিনের উপবাসী শরীরের পাশে
ফুটে আছে কয়েকটি দীপ্য রজনীগন্ধা।

স্কেল / ১ ঃ ১২০০

অজিত সরকার

১. ২. ৩. খাদে নামবে মানুষ?
১. ২. ৩. মানুষ? নামুক।
ইঞ্জিনম্যান ঃ হেই......... ১. ২. ৩.
সুড়ঙ্গে নামছে ডুলিটা
পা
থ
রে
র
গা বেয়ে জল
এবং শ্যাওলা......... ঃ অন্ধকার.........।

স্টেশনের আলো। কয়লা বোঝাই টবগাড়ি......
খনির নিজস্ব গন্ধ। চালু হলেজ লাইন ধরে
তাদের বে-আইনী যাত্রা...... স্লীপারে
ছত্রাকের আলপনা...... মাঝে মাঝে
ম্যানহোল।

এখানে 'চাঁদনী' কাটা হচ্ছে......ধকাধক্ গাইতার শব্দ
শাল খুঁটা এবং 'কগ্'-এর জঙ্গল......হেই
সাবধান......।

১. ২. ৩. উপরে উঠবে মানুষ।
টুকরো টুকরো হাত...পা...শরীর
এবং কয়লা।

---

১. ২. ৩.—ভুলিতে, মানুষ নামার/উঠার ঘণ্টা সংকেত।
'চাঁদনী'—যেখানে সব কয়লাটাই পুরোপুরি কাটা হয়
'কগ্'—(Cog) কাঠের চৌকো Roof Support

অরডিন্যানস

স্বপন সরকার

মিনতিকরোজ্জ্বল এই আধোজাগরণ, স্বপ্নের প্রদাহ
এতদিনে চিনেছে সংঘাত!
দূরে নিভে যায় ছায়া, শিল্পসুষমা ছেড়ে যেন
নেমে এল রণকোলাহল
প্রতীক জব্দ হায়, মেঘেদের রোপণসংগীতে আর
মানুষের বুভুক্ষাবিজ্ঞানে, পরিহাস নয়
ছাখো—ওই আলোকস্তম্ভের গায়ে বিচ্ছুরিত
বিপদ-সংকেত
দেখে নাও কৌতুকপ্রবণ যতো ঢেউ-এর বিন্যাস
মানুষের ছদ্মবেশ, মানুষেরই অযথা কম্পাস
এই ভ্রান্ত বায়োস্কোপ, এইসব প্রাকৃতিক মেঘের কুহক·
এরও কী প্রতীক হয়, কার্যকারণবাদ?

সব রাতে

গৌতম ঘোষ

প্রতিদিন রাতে শব্দের তুমুল মন্ডপ দাপটে
আমি জেগে উঠি। এরকম প্রতিদিন হয়। সব
রাতে। শব্দের কানামাছি ভোঁ-ভোঁয়।

কিছু কিছু আমার ছাব্বিশের ভাস্কর্যে
উগরে ছায়—সেই সেলুকসের আমল
থেকে সমস্ত পাপ। কুঁতকুঁতে চোখে
বাদামঅলার ঘর। এরকম প্রতিদিন হয়। সব
রাতে।

তুচ্ছ

দীপক বল

খুব রুক্ষ বস্তুর প্রতি ক্রমশ সকলেই সম্ভবত একটা টান অনুভব করেন
যেমন বর্তমানে বোধ করছেন শ্রীযুক্ত অনিমেশ মুখোপাধ্যায়
অনিমেশবাবু যেমন দেওঘর থেকে ফিরে যাবার সময় বন্ধ দরজা
এবং মাটির কুঁজোটির কথা মনে রাখেন।

যেমন চমৎকার মনে আছে বৈঁচিগ্রাম স্টেশনের সেই ভাঙা
টিউকলটির কথা।

কাক

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

অশিষ্ট আর ভ্রষ্ট সবাই, শিষ্ট আমিই একা,
আমিই সবার মাংস খাবো, আমার খেলেই কা-কা।
আগুন ওড়ে শহর পোড়ে, আমি দূরেই থাকি—
অন্যে মরুক, আমি বাঁচি ; বাঁচতে পেলেই সুখী।

গন্ধ ওড়ে শূন্য ঘরে, মাংস পচা গন্ধ—
কার পচেনি মাংস বুকের ? চোখ কার নয় অন্ধ ?
ঠোঁটের-মুখের শব্দগুলি শ্যাওলাপচা কথা,
ঘর ছেড়ে সব পালাই দূরে ; কাক রে, তুই কোথা ?

১ কিছু ছবি, ও গুনের কটি

শীতকালেই তো উৎসব, অন্তত কলকাতায়। এই শীতে কলকাতার বাড়তি পাওনা ছিল ফিল্ম উৎসব। ফ্লেচারের দলের সাহেবরা ইডেন গার্ডেন-এ গাভাসকারের দলের ভারতীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে যখন ক্রিকেটকে পানসে করে তুলবেই ঠিক করেছে, তখন কলকাতার থিয়েটারে থিয়েটারে ফিল্মের উৎসব যেন বাঁচিয়ে দিল কলকাতার স্বভাবকে।

ফিল্মের এত বড় উৎসব কলকাতায় আর কবেই বা হয়েছে! আট-ত্রিশটি দেশ থেকে, আমাদের দেশ ছাড়া, এসেছে মোট একশ আটষট্টিটি ফিল্ম, নিরানব্বুইটি ফিচার (৩৫ মি.মি.) তিরিশটি শর্ট এবং ষোল মিলিমিটারের ষোলটি ফিল্ম। বিদেশী ফিল্মের রেট্রসপেকটিভ-এ দেখানো হয়েছে গডার্ড-এর তেরটি, জাঙ্কসোর ছ-টি এবং গুনের চারটি ফিল্ম। গডার্ড এবং জাঙ্কসোর কাজের সঙ্গে এদেশের কিছু দর্শকের পরিচয় থাকলেও গুনের কাজ দেখার অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন। এবং আশ্চর্য সে অভিজ্ঞতা। কোনো সন্দেহ নেই এবারের উৎসবের সবচেয়ে বড় বিস্ময় গুনে। ফিল্মের মানচিত্রে তুরস্ক কিছু উল্লেখ করার মতো নাম নয়, সেখান থেকে গুনের মতো পরিচালক, দ্য হার্ড কিংবা দ্য এনিমি-র মতো ছবি পেয়ে যাওয়া, বিস্ময়কর পাওয়া!

এর বাইরে ছিল এদেশের ফিল্ম; তার আয়োজনও কম নয়। ইণ্ডিয়ান প্যানোরামাতে ছিল একশটি সাম্প্রতিক ছবি। এখানে যেমন সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিকতম কাজ দেখানোর ব্যবস্থা ছিল, তেমনি ছিল গৌতম ঘোষের মতো একেবারে নবীন পরিচালকদের ফিল্মও। রেট্রসপেকটিভ-এ ছিল চোদ্দটি ফিল্ম—সবই পুরোনো যুগের—এ ভি এম, বম্বে টকিজ, নিউ-থিয়েটার্স, জেমিনি, রয়্যাল টকিজ ইত্যাদি কোম্পানির স্মৃতি। শর্ট ছিল সতেরোটি। আর ছিল বংশী চন্দ্রগুপ্তের স্মৃতিতে,. তিনি কাজ করেছেন

এমন, চারটি ফিচার ও চারটি শর্ট ফিল্ম দেখানোর আয়োজন। সব মেলালে পনেরো দিনে দু-শ আঠাশটি ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা। ব্যাপারটা বেশ বড় মাপেরই।

তবে সংখ্যার মাপই তো সব নয়। নানা জাতের নানা মানের ফিল্মই ছিল উৎসবে। ফিল্মগুলিকে কেউ হয়তো দেশ-মহাদেশ দিয়ে ভাগ করাই পছন্দ করবেন, কেউ সমাজ-ব্যবস্থার মাপকাঠিতে, কেউ সমান্তরাল অ-সমান্তরাল দিয়ে। ভাগটা যেভাবেই করা হোক, কিছু বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়েছে, না পড়ে পারে না।

এক 'জীবন' নিয়ে

এবারের উৎসবে বেশ কয়েকটি, শতকরা প্রায় দশ ভাগ, ছিল জীবনী-ভিত্তিক ফিল্ম, সবই ফিচার। এই ধারার ফিল্ম সবচেয়ে বেশি এসেছিল ব্রিটেন থেকে, তাঁদের মোট দশটি ছবির তিনটি। প্যারিস অলিম্পিকের সেরা দুই দৌড়বীরকে নিয়ে হুফ হাডসনের 'চ্যারিয়টস অফ ফায়ার', লরেন্স-এর শেষ দিনগুলিকে বিষয় করে ক্রিস্টোফার মাইলস-এর 'প্রিস্ট অফ লাভ' এবং জেমস জয়েসের জীবনের একেবারে গোড়ার কিছু সময় নিয়ে জোসেফ স্টিক-এর 'এ পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান'। চ্যারিয়টস-এর দুই তরুণের ধনুকভাঙা পণ, বিশ্বের দ্রুততম মানুষ হতেই হবে এবং এই পণরক্ষার পেছনের কারণ, দুজনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন, প্রায় বিপরীত। সহস্র মানুষের কোলাহলের মধ্যেও নির্জন নিঃসঙ্গতা স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই-এ এবং সমুদ্রের ধারে ধারে নির্মম এক ভালোবাসার সাধনা, যার সঙ্গে ঈশ্বর সাধনাও যুক্ত হয়েই যায়—আশ্চর্যভাবে দেখানো হয়েছে। 'পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট'-এর চিত্রনাট্যের ভিত্তি জেমস জয়েসের নিজের লেখা। নায়কের শৈশব এবং বাল্যের সময় ও চারপাশ যখন রাজনীতির টানাপোড়েন ধর্মের ডামাডোলের সঙ্গে জট পাকিয়ে গিয়ে প্রতিটি মানুষ ও পরিবারকেই নাড়া দিয়ে যাচ্ছে—চমৎকার এসে গেছে—ফিল্মে, নানা স্তরে। নারীর সঙ্গ ও স্পর্শ যেন উত্তরণের ধাপ। দুই বন্ধুর সংলাপ—দীর্ঘ—চার দেয়ালে বদ্ধ বা আকাশ ও সমুদ্রে ভেসে যাওয়া, এক আশ্চর্য গভীরতা ও ব্যাপ্তি আনে। জিজ্ঞাসা শুধু, সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলাই কি নির্মম, শিল্পী-জীবনারম্ভের অনিবার্য নিয়তি? নতুন কোনো টানের, অস্পষ্ট এক সৌন্দর্যের সংজ্ঞা

ছাড়া, অনুপস্থিতিও? আফশোষ, ফিল্মটি শেষও হয় যেন অকস্মাৎ, সাগর পেরোনোর প্রতীকে, একটি অক্ষর তখনও লেখেন নি নায়ক।

আমেরিকার মার্টিন কর্সেস-এর ফিল্ম 'রেজিং বুল'-এর ভিত্তি মিডল-ওয়েট বক্সিং-এর এক সময়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জেক লা-মোট্টা-র আত্মজীবনী। যুদ্ধের গোড়ার দিকের আমেরিকার এক বস্তির ধোঁয়াভরা জীবন থেকে লড়তে লড়তে খ্যাতির শীর্ষে উঠতে উঠতে এবং উঠেও শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই তাঁকে একসঙ্গে লড়তে হয়েছে অনেক লড়াই। শেষ জীবন তাঁর কাটে জেলখানার নরকে এবং সেখানেও আত্মসম্মান ও মর্যাদা-বোধটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তাঁর লড়াই চলতেই থাকে।

শুধু আত্মমর্যাদাটুকু নিয়ে বাঁচার জন্যে সংগ্রামের আর-একটি ফিল্ম চেকোস্লোভাকিয়ার 'দ্য ডিভাইন এমা', ও-দেশের বিখ্যাত অপেরা গায়িকা, একসময় যিনি ইয়োরোপ-আমেরিকার থিয়েটারগুলিতে ছিলেন রাণী, এমা দেস্তিনোভাকে নিয়ে ফিল্মটি নির্মাণ করেছেন জিরি ক্রেজিক।

পীড়ন আর তাড়নায় পলায়ন, আত্মগোপন আর দেশত্যাগ ছিল যাঁর জীবন এবং সে জীবনেও যাঁর কলম থামে নি কখনো, ইতিহাসের দুর্ভাগ্য, রুশ বিপ্লবের ঠিক পরেই ১৯১৮-র যাকে প্রতিবিপ্লবী রাইফেলের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল, ফিনল্যাণ্ডের বিপ্লবী সাহিত্যিক মাইজু ল্যাসিলার জীবন নিয়ে সে দেশের পিরজো হোং কাসালোর ফিলম 'ফ্লেম টপ।'

এই ধারার সম্ভবত শ্রেষ্ঠ ফিল্মটি এসেছিল ফ্রান্স থেকে, আরিয়ান মুওসকিনের 'মলিয়ের'। মলিয়েরের সময়ের ফরাসী দেশ সমাজ ও নাট্য জগৎ-এর সঙ্গে মিলেমিশে তাঁর জীবন ও কাজ নিয়ে নির্মিত হয়েছে ফিল্মটি। কলকাতার দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রসদনের ভাগ্যবান আমন্ত্রিতদের জন্যেই তুলে রাখা হয়েছিল মলিয়েরকে।

দুই রাজনীতি নিয়ে

সরাসরি রাজনীতি নিয়ে তৈরি ফিল্ম ছিল খুব কম। কম কিন্তু ভালো—অসম্ভব ভালো। যোল মিলিমিটারের ডকুমেন্টারি ছবি, কিউবার 'ব্যাটল অফ চিলি'-র মতো ফিল্ম যে তৈরি করা যায় ভাবাই যায় না। প্যাট্রিসিও গুজম্যান এর পরিচালক। সান্তিয়াগোর পথে মিলিটারি নামছে, ফুটপাথে বসানো ক্যামেরা, ফৌজি অফিসার পিস্তল তুলে খুন করছে, ক্যামেরা চলছে। খেয়াল হতেই খুনী পিস্তল তাক করে ক্যামেরাকে, ক্যামেরা তখনো চলতেই

থাকে। আগুন ইস্পাত বেরিয়ে আসে লোহার নল থেকে, বিদ্যুতের গতি, ক্যামেরা তবুও চলে। ক্যামেরা ছিটকে পড়ে রাস্তায়, ঝাঁকি খেয়ে পর্দা সাদা হয়ে যায়। ক্যামেরাম্যানকে প্রাণ দিতে হয় দৃশ্যটি তোলার জন্যে। দৃশ্যটি তবু তোলা হয়।

কাম্পুচিয়া নিয়ে জি.ডি.আর-এর ছবি 'কাম্পুচিয়া ডেথ এণ্ড রিবার্থ'। যুদ্ধ পরবর্তী নিকৃষ্টতম জেনোসাইড এবং হাতে-মুখে-গায়ে শ্মশানের ছাই নিয়ে নতুন করে নিজের দেশকে গডে তোলার প্রতিজ্ঞায় স্থির মানুষের কাহিনী। অশ্রু আর আগুনের এই তথ্যচিত্রটি পরিচালনা করেছেন দুজন, ওয়ালটার হেনৌসকি এবং গেরহার্ড শুমান। এটিও রবীন্দ্রসদনের বাইরে দেখানো হয় নি।

ইরানের রফিক পুইয়ার ফিল্ম 'ইন ডিফেন্স অফ পিপল' ইরানের বিপ্লব ও পরবর্তীকালের ঘটনাবলি নিয়ে তৈরি।

নাইজিরিয়ার ওলা বালোগুন-এর ফিল্ম 'ক্রাই ফ্রিডম' কাহিনীচিত্র হলেও সরাসরি রাজনীতিরই।

তিন সমকাল ও সমাজ

আরো কিছু ফিল্মে রাজনীতি এসেছে, কিন্তু অন্য ভঙ্গিতে। চরিত্র কিংবা প্লটের সঙ্গেই এসেছে তার সমাজ ও সময় এবং রাজনীতিও।

কোথাও প্রেমের, কোথাও হাসির, কোথাও বা ক্রোধের, কখনো নির্বিকার উদাসীনতার ক্রেমে আর কখনো বা শরীরের ভেতরের জ্বালা হয়ে।

উৎসবে এই ধারার ফিল্ম কম ছিল না এবং অসাধারণ কিছু ফিল্মও ছিল। ফ্রান্স ও ইটালির যৌথ প্রযোজনা, ইটালির পরিচালক ফ্রান্সেসকো রোসি-র 'ক্রাইস্ট স্টপড্ অ্যাট এবোলি' এমনি এক অসাধারণ ফিল্ম। সময়টা তখন ফ্যাসিবাদের। মুক্তি আর স্বাধীনতার কথা যাঁরা বলেন, এমন কি ভাবেন বলেও সন্দেহ, তাঁদের পোরা হচ্ছে খাঁচায়, পাঠানো হচ্ছে নির্বাসনে।...একটি হাত খাবার এগিয়ে দেয়, আর একটি হাত টেনে নেয়, মুখ দেখা যায় না। মুখটা কমিউনিস্টের। কেউ কেউ মুক্তি পেলেও সে পায় না। হাত আবার খাবার এগিয়ে দেয়, আর একটি হাত টেনে নেয়। হাতটি কমিউনিস্টের কিংবা যীশুর অথবা কে জানে ঐ গ্রামে হয়তো যীশুরাই বাস করেন। নইলে বুর্জোয়া পরিবেশে বেড়ে ওঠা একজন মানুষ নির্বাসনে এসে গরিব, অপাংক্তেয়

ঐ মানুষগুলোর মধ্যেই মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং বাঁচার ও কাজ করার যাথার্থ খুঁজে পান কেমন করে ?

সোভিয়েত ইউনিয়নের এস্তোনিয়ার ওলাভ নিউল্যাণ্ড-এর ফিল্ম 'নেস্ট ইন দ্য উইণ্ড' যুদ্ধের পটভূমিতে তৈরি। এস্তোনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে কমিউনিস্টদের লড়াই। অথচ লড়াইটা হয় এক মাঝারি চাষির পরিবারে।

ক্লাউস মান-এর উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হাঙ্গেরি ও পশ্চিম জার্মানির যৌথ প্রযোজনায় এক অসামান্য ফিল্ম 'মেফিস্টো' নির্মাণ করেছেন ইস্টভ্যান জ্যাবো। শিল্পীর বাসনা একটাই, সাফল্য। স্বপ্নও আছে একটা, গ্যয়টের ফাউস্ট-এর মেফিস্টোর রূপদান করা, নিজের মতো করে। জার্মানির তখন দুঃসময়, মানুষের সব স্বপ্ন দু-পায়ে দলে নাজিবাদ এগোচ্ছে। তার সঙ্গে আপোস করে শিল্পী যখন তার সাফল্যকে ছোঁন, তখন বড় নিঃসঙ্গ লাগে. মনে হয় হেরে যাওয়া গেল।

সেনেগালের 'সেড্ডো' উৎসবের এক উল্লেখযোগ্য ফিল্ম। সমাজ ও অর্থ· নীতির জটিল জালে পশ্চিম আফ্রিকার কৃষকের (সেড্ডো) বদ্ধ জীবন যখন দুঃসহ, তখন ইসলাম ও খ্রীস্ট ধর্মের টানাপোড়েনে দুর্বিষহ হয়ে ওঠার কাহিনী নিয়ে আশ্চর্য দক্ষ ফিল্ম তৈরি করেছেন পরিচালক আউসমানে সেমবানে। ক্যামেরা এমনভাবে চলে, গল্পটি এমনভাবে গাঁথা হয়, দেশ ও কালের ভেদ আর থাকে না কলকাতার দর্শকের কাছেও।

পোল্যাণ্ডের পরিচালক জানুসি-র 'দ্য কনস্ট্যান্ট' এই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিল্ম। কাহিনী বলতে তেমন কিছু প্লট নেই, এক যুবকের কিছু অভিজ্ঞতা যা সে সময়ের পোল্যাণ্ডে খুব সুখকর নয়।...উইটোল্ডের বাবা পর্বতারোহণে গিয়ে মারা যান। তাকে চাকরি নিতে হয়। তার স্বপ্ন একটাই। হিমালয় অভিযানে যাওয়া। তার মা মারা যান। উদাসীন ডাক্তার, প্রায় বিনা চিকিৎসায়। তাঁদের মনোযোগ কেনার সামর্থ এবং ইচ্ছা কোনোটাই তার ছিল না। চাকরিটিও তাকে হারাতে হয় দুর্নীতি ও অন্যায়ের খবর প্রকাশ করতে গিয়ে। অনেক কষ্টে হিমালয়ে পাড়ি জমানোর আয়োজনও ব্যর্থ হয়ে যায়। হিমালয়ের চূড়া স্পর্শ করার স্বপ্ন বুকে নিয়ে উইটোল্ড স্কাই-স্ক্র্যাপারের কাঁচ মোছে আর পুরনো বাড়ি ভাঙে। শেষ দৃশ্যে উইটোল্ড যে বাড়িটি ভাঙছে তারই একটা চাংড়ার নীচে চাপা পড়ে যায় একটি শিশু, পথে সে খেলছিল। শিশুটির মা ছুটে যান তার দিকে, আতঙ্কে নীল।যেন...

স্পষ্ট দেখা যায়, জানুসির এই শেষ দৃশ্য একটা রূপকের আধার হয়ে ওঠে মা আর শিশু উভয়তেই। অসামান্য সংযমে এবং আবেগে জানুসি যেন পোল্যাণ্ডের অন্তর ছুঁতে চান, শত ক্ষত সত্ত্বেও তাঁর ভালোবাসার পোল্যাণ্ড।

বিষয়ের গুরুত্ব ও সাহসিকতা ছাড়াও নিছক ফিল্মের ফর্ম ও টেকনিকের দিক থেকেও 'দ্য কনস্ট্যান্ট' এক উঁচু জাতের কাজ। ডিটেইলের কাজে, প্রতীকের আধুনিকতায়, ক্যামেরার আশ্চর্য ব্যবহারে, রঙে, এডিটিং-এ, অভিনয়ে (সৎ, অনুভূতিপ্রবণ, প্রায় দুর্বল, কম-কথা-বলা, গভীর ও রোম্যান্টিক স্বভাবের নিঃসঙ্গপ্রায় উইটোল্ডের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছেন তাদুশ ব্রাদেচকি), 'দ্য কনস্ট্যান্ট' পোলিশ সিনেমার ঐতিহ্য এবং জানুসির খ্যাতিকে এগিয়ে দিয়েছে। বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে এ কথা ভাবতেও ভালো লাগে যে পোলিশ সরকারি সংস্থাই ফিল্মটির প্রযোজক এবং কলকাতার উৎসবে পাঠাবার আগেও তাঁরা এটি ১৯৮১ সালে কান, নিউইয়র্ক এবং লণ্ডন উৎসবে পাঠিয়েছিলেন।

ব্রাজিলের ফিল্ম 'পিকসোট'-এ বেকার আর অসহায় তরুণরা যখন আণ্ডার ওয়ার্ল্ড-এ নিজেদের বাঁচার ও প্রতিষ্ঠার পথ খোঁজে তখন যেন গুনের 'এলিজি'-র মুখগুলো মনে পড়ে যায়, অথবা কলকাতারই অনেক তরুণ ও যুবকের। আণ্ডার ওয়ার্ল্ডই যাদের পৃথিবী, বারবণিতাই যাদের জীবনের প্রধান নারী, এবং নরম সরু সুতোয় পা ফেলে হাঁটে যাদের প্রতিটি দিন, তাদের অনেক জ্বালাই বন্দুকের নলে এবং শরীরের নগ্নতায় প্রকাশিত হয়—হবেই। পরিচালক হেক্টর ব্যাবেংকো নির্মম নগ্নতাতেই এঁকেছেন অসহায় এবং রুক্ষ এই জীবনের ছবি, যা আজকের ব্রাজিলের যৌবনের প্রাত্যহিকতা।

চার যৌন ও হিংসা

'পিকসোট' অনায়াসেই নিছক এক সেক্স ও ভায়োলেন্সের ফিল্ম হয়ে যেতে পারত, সামান্য অসতর্কতায় তার পেছনের ফ্রেমটা আবছা হয়ে সমাজ ও সময়ের সঙ্গে নাড়ীর যোগটা আলগা হয়ে গেলেই, যেমন ঘটেছে কিছু কিছু ফিল্মে। তাদের সংখ্যাও কম নয়, এবং এইসব ফিল্মের টিকিটই দারুণ চড়া দরে কালোবাজারে বিক্রি হয়েছে। টিকিট মেলে নি বলেই রবীন্দ্রসদন অভিযানও ঘটে এবং ভাঙচুরও হয় নামী লোকের নেতৃত্বে।

এই ধারায় ফিল্ম পাঠানোর ব্যাপারে সম্ভবত জাপানই প্রথম। শোহাই ইমামুরা তাঁর 'ভেনজেন্স ইন মাইন'-এ খুন, সঙ্গম, রহস্য, রেপ, ডাকাতি, জোচ্চুরি মিলিয়ে এক জমজমাট, পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। কানেতো শিনদো-র 'স্ট্র্যাঙ্গলিং'-এ সেক্স-এর বিকৃতি—সৎ বাবা ও মেয়ের মধ্যে মা-ছেলে-বাবা-র মধ্যে দেখতে-দেখতে ফাঁসটা যেন দর্শকের গলাতেই চেপে বসে।

কিংবা ধরা যাক মাসাকি কোবায়াশির 'গ্লোয়িং অটাম'-এর কথা। অসাধারণ রঙ, ক্যামেরার কাজ, এডিটিং, জাপান আর ইরানের আউটডোর দৃশ্যগুলি—ধূ ধূ মরুভূমি, রোম-এর প্রাচীনতা, তেহরানের জাঁকজমক, কিয়োটোর পথঘাট, টোকিওর বৃষ্টি দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়। নায়িকা কিয়োকো মায়া-র অপরূপ সৌন্দর্যের মুখোমুখি হওয়া যেন এক অভিজ্ঞতা। তবুও ফিল্মটি এক বৃদ্ধ, এক যুবতী এবং এক যুবকের নিতান্ত শারীরিক সম্পর্কের গণ্ডি পার হয়ে অন্য কিছু হয়ে উঠতে পারে না। নরওয়ের দুই পরিচালক মভেল্ড ওআম ও পেটার ভেনেরড তাদের ফিল্ম 'লাইফ এণ্ড ডেথ'—স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে একটি যুবককে এনে সমগামিতার উপাদান যোগ করে তিনজনের এক জগৎ রচনা করেছেন, উভয়গামিতা এবং যৌথ যৌনক্রিয়া যার প্রাণবিন্দু। সমাজ এসেছে শয়তান হিসাবে, যেহেতু তাদের এই জগতকে সে স্বীকৃতি দেয় না।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই; এমনি ছবি আরো ছিল—অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ডের মতো নানা দেশের।

'ফিল্মোৎসব'-এর মতো বড় ব্যাপারে যৌন সম্পর্কের ছবি আসবেই। এই ছবিগুলো নিয়ে মারামারি কাটাকাটি যাঁদের করার তাঁরা করবেনই। আমাদের দেশের ফিল্মে বিষয় হিসেবে যৌন সম্পর্ক অলিখিত ভাবে নিষিদ্ধ বলেই হয়তো কৌতূহল একটু মাত্রা ছাড়ায়। কিন্তু যৌন-সম্পর্ক এত বেশি দেশকালনির্ভর ও ব্যক্তি চরিত্র-আশ্রয়ী যে এই ছবিগুলিকে শিল্প হিসেবে গ্রহণেও অনিবার্য বাধা আসে। বিবাহিত পুরুষ ও নারীর যৌন সম্পর্কই এখনো আমাদের সমাজে সমস্যার কোটায় এলো না, যেন ধরেই নেয়া হয় এটা কোনো সামাজিক রীতি, ব্যক্তিক স্বভাব নয়। সেখানে সমকামিতা আর অসম যৌন সম্বন্ধ? ফলে অনেক সময়ই ব্যাপারটা দাঁড়ায় দৃশ্যমাত্র। আমাদের পক্ষে। কিন্তু যে-দেশে ছবিগুলো তৈরি হয় সেই দেশের শিল্পীদের যে আন্দাজ এতে মেলে তা কোনো কোনো সময় ভয়ের। বিশেষজ্ঞ

জাপানের বেলায়। যে-শীতল অনুত্তেজ ও নিপুণ কারুকর্মে ও নিষ্ঠায় যৌন ও হিংসাকে জাপানের চলচ্চিত্রকার সুন্দর দৃশ্য করে তোলেন তাতে কেমন মনের ফ্যাসিজিমের আভাস মেলে।

পাঁচ গুনে

গুনের কথায় আসা যাক।

কিন্তু তিনি এখন কোথায়? সরকারি নথিপত্রে গুনে এখনও তুরস্কেই বন্দী, যদিও সকলেই জানে কারারক্ষীরা তাঁকে আটকে রাখতে পারে নি। কারাগারে থাকতে হলে বাকি জীবনের প্রায় সবকটি দিনই তাঁকে কাটাতে হত সেখানেই। শেষবার তাঁর জুটেছিল উনিশ বছরের কারাদণ্ড।

গুনের দেশ তুরস্কের অবস্থাটা ঠিক কেমন জানা সহজ নয়। কথাটার মানে স্পষ্ট হবে সেখানকার সিনেমার জগৎ সম্পর্কে বি-বি-সি-র জন ওয়ারিংটন কলকাতাকে যেটুকু জানিয়েছেন তা থেকে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখেই। ১৯৭৯ সালে তিনি ইস্তামবুলে গিয়েছিলেন আলতালিয়া চলচ্চিত্র উৎসবে। উৎসবের বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন রথীমহারথী সমালোচক, পণ্ডিত আর চলচ্চিত্র নির্মাতা, সে দেশের এবং বিদেশীও। উৎসব আরম্ভের দিন হঠাৎ পুলিশ এল, তিনটি ফিল্ম বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে চলে গেল। অবশ্যই নৈতিক কারণে। মনে রাখতে হবে সেক্স এবং ভায়োলেন্সের জন্যেই তুরস্কের ফিল্মের খ্যাতি—তা-ও বম্বের কমার্শিয়াল প্রোডাকশনের অক্ষম, অদক্ষ অনুকরণ; গুনেই সেখানে ফিল্মে সামাজিক বাস্তবতা আনার ব্যাপারে পথিকৃৎ। বিচারকমণ্ডলীর মনে হল, স্বাভাবিক-ভাবেই, ওই ফিল্মগুলি ফেরত না এলে উৎসব চালানোর কোনো অর্থই হবে না। উৎসব বাতিল করে দেওয়া হবে কি না তা নিয়ে চলল দীর্ঘ বিতর্ক। বিচারকদের অনেকে চলে যেতে চাইলেও থাকতেই হল, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁদের রাজি করানো হল নিজের নিজের হোটেলে থাকতে। এইসব কাণ্ডকারখানার খবর লণ্ডনে পাঠাতে গিয়ে ওয়ারিংটন আবিষ্কার করলেন, তিনিও অসহায়। বিশ্বের যাবতীয় দেশের সঙ্গে তুরস্কের যোগাযোগের সমস্ত পন্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। —এই হল গুনের দেশ।

ইলমাজ গুনে এক কৃষক পরিবারের সন্তান। কষ্টেই বড় হয়েছেন। তবু পড়াশুনো চালিয়ে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিষয় ছিল অর্থনীতি। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন—বামপন্থী রাজনীতি।

প্রথম জেলে যান আঠারো বছর বয়সে, দেড় বছরের জন্যে, একটি গল্প লেখার অপরাধে। অভিযোগ গল্পটিতে তিনি কমিউনিজম প্রচার করেছেন। সেই শুরু। জেলে বসেই তিনি লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। জেলে বসেই তিনি রচনা করেন তাঁর একাধিক ফিল্মের চিত্রনাট্য। প্রতিটি শট তিনি এমনভাবে সাজিয়ে, বুঝিয়ে দিতেন যে তিনি জেলে থাকলেও তাঁর ফিল্মের শুটিং বন্ধ থাকত না। কলকাতার উৎসবে তাঁর যে চারটি ফিল্ম দেখানো হয়েছে তার দুটিতে পরিচালক হিসাবে তাঁর সহকর্মী জেকি ওকটেনের নামই আছে। কিন্তু সে ছবির আসল পরিচয় গুনের ছবি বলেই।

ফিল্মে জগতে তিনি আসেন অভিনেতা হিসাবে। এ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশটি স্বল্প বাজেটের ফিল্মে তিনি অভিনয় করেছেন। তুরস্কের দর্শকদের কাছে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয় এক অভিনেতা। তাঁর নিজের দুটি ফিল্মেও প্রধান চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। পরিচালক হিসাবে সে-দেশের ক-জন তাকে জানেন বলা কঠিন, তাঁর ফিল্ম সেখানে দেখানো হয় না। তিনি বিপজ্জনক। ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্রকার হিসাবে গুনে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য উৎসবেই তাঁর কাজ আদৃত হয়েছে। কয়েকটি পুরস্কারও পেয়েছে।

গুনের প্রথম ফিল্ম 'হোপ' (১৯৭০)-এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য তাঁর, তাঁর সব ছবিরই, এতে তিনি অভিনয়ও করেছেন। একজন গরিব মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কুসংস্কার এবং হতাশাই এর বিষয়। শিবঠাকুরের দেশের মতো মানুষটির চারপাশের ব্যবস্থা ও সমাজও আড়ালে থাকে নি।

কাব্বার এক ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান। গ্রামের মানুষ। কপাল ফেরাবার বাসনা তাকে তাড়িয়ে মারে। শহরেই তো বড় মানুষের বাস, শহরই মানুষকে বড়লোক করে। কাব্বার তার গাড়ি নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় শহরে। আদানা তো সত্যিই শহর, সেখানে মোটরগাড়ি চলে, তার গাড়ির কদর কেউ বোঝে না, ভাড়া জোটে না। পকেট খালি, দারিদ্র্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাথায়। কাব্বার তবু বাঁচে। তার বুকের ভেতর বাসনাও বেঁচে থাকে। ততদিনে সে বুঝে ফেলেছে রোজগার করে বড় লোক হওয়া যাবে না। তার আশা প্রবল, একদিন তার লটারির টিকিটের নম্বর লেগে যাবে। মাথার ওপর আল্লাহতাল্লা কি নেই। তিনি কিছু করার আগেই দুর্ঘটনা ঘটে যায়। মোটরগাড়ির ধাক্কায় তার একটি ঘোড়া

মারা যায়। দোষটা মোটরওয়ালারই, তবু মোটরগাড়ি যেহেতু মোটরগাড়ি এবং জীর্ণ ঘোড়ার মালিক যেহেতু খুব শীর্ণ, পুলিশ নির্বিকার ছেড়ে দেয় মোটরওয়ালাকে। কাব্বার তখন কি করে? ধারকর্জের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ে, ঘোড়া কিনতে হবে। সুবিধে হয় না। পাওনাদাররা ঘোড়াটা নিয়ে যায়, সঙ্গে গাড়িটাও। তার পর? শহরে তো কম দিন হল না। তার বন্ধু হাসানের সঙ্গে জুটে ডাকাতি করতে বেরোয় কাব্বার। ডাকাতিও তো সহজ কাজ নয়, তাদের মতো অ্যামেচারদের পক্ষে। সুবিধা হয় না একেবারেই। রোজগার করে হল না, লটারি লাগল না, ডাকাতি করা গেল না, ঘোড়ার গাড়িটাও চলে গেল…স্বপ্ন তখন হয় মুছে যাবে নয় বাড়তি ডানা মেলে উড়বে, অসহায়। গুপ্তধন হাতিয়েই বড়লোক হতে চায় কাব্বার তার বন্ধু হাসানের পাল্লায় পড়ে। কিন্তু গুপ্তধনের সন্ধান দেবে কে? দেওয়ার লোক আছে, দৈবী শক্তির অধিকারী এক সন্ত। কাব্বার তার কাছেই ছোটে এবং শেষ কপর্দকটিও হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়।

সাদাকালো এই ফিল্মটি ১৯৭১ সালে কান উৎসবে দেখানো হয়।

গুনের দ্বিতীয় ফিল্ম 'এলিজি' (১৯৭১) একেবারে অন্য ধরনের, একই জাতের যদিও। এটিরও কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও অভিনেতা তিনি।

কাব্বার যা হতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি কোবান তা-ই হয়েছে। কিন্তু তাতে কি তফাত হল দুজনের মধ্যে? কোবান ও তার চার বন্ধু স্মাগলিং করে। খুবই দক্ষ স্মাগলার তারা। দুর্গম এক পাহাড়ে তাদের আড্ডা। নিজামেত্তিন একদিন তার কিছু মাল পাচার করার কাজ দেয় কোবানকে। কিন্তু তার সাকরেদ বিশ্বাসঘাতকতা করে। কোবান পালায় বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করে কিন্তু পুলিশের মুখোমুখি পড়ে যায়। লড়াই হয়। মারাত্মক আঘাত পায় কোবান। তার সহকর্মীরা পাহাড়ের এক গুহায় লুকিয়ে রাখে তাকে, কিন্তু তার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। তাকে বাঁচাতে হবে। ধারে কাছের এক গ্রামে থাকেন এক ডাক্তার-তরুণী। একজন গিয়ে তাকে ধরে পড়ে। তিনি কোবানের চিকিৎসা করেন, চিকিৎসায় কাজও হয়। কোবান ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠতে থাকে। ততদিনে দুজনের মধ্যে একটা আকর্ষণ, প্রেমের মতো, গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোবান তো বাস্তববাদী। সে জানে সে কি এবং তার জীবন ও ভবিষ্যৎ কেমন। আইনের নাগালের বাইরে পলাতক জীবন যাপন করাই তার ভবিতব্য। কোবান তার আবেগকে প্রশ্রয় দেয় না। তরুণী ডাক্তারটিকে

ফিরে যেতে হয় তার গ্রামে। দিন কয়েক পরেই কোবানকে মরতে হয় বুকে গরম শিসে নিয়ে।

এই ফিল্মটিও সাদাকালো, ১৯৭২ সালে ভেনিস উৎসবে প্রদর্শিত হয়।

'দ্য এলিজি' (১৯৭৯) গুনের তৃতীয় ফিল্ম যা কলকাতায় দেখানো হয়। পরিচালক হিসাবে নাম আছে তাঁর বন্ধু জেকি ওকটেন-এর। শুটিং-এর অনেকটা সময়ই গুনে ছিলেন জেলে, ওকটেন তাঁর নির্দেশ ও পরিকল্পনানুযায়ী কাজ চালান। হয়তো সেই জন্যই গুনে এতে অভিনয় করতে পারেন নি। এ ফিল্মে পটভূমি হিসাবে সহরকে বেছে নিয়েছেন তিনি।

ইসমাইল বেকার। বাড়িতে খুব টেনশন। শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি পেয়ে যায় সে। বেওয়ারিশ কুকুর মেরে বেড়াতে হবে, বিষ দিয়ে। চাকরিটা নেয় ইসমাইল, কিন্তু রাখতে পারে না। কুকুরগুলো ছটফটিয়ে মরছে, এ দৃশ্য সইতে পারে না সে, তার মন আর শরীর অস্থির অবশ হয়ে যায় যেন। বাড়িতে বউ আছে, সে খিটিরমিটির করে। অনেকটা তার তাড়নাতেই ইসমাইল তার পরিবারে ফিরে যায়, পৈতৃক সম্পত্তির অংশের দাবি জানায়, সেখানে সুবিধা হয় না, প্রায় ভাগিয়ে দেওয়া হয় তাকে। তাকে দেখে, তার বিষণ্ণতা দেখে বউ তাকে বাড়িতে থাকতে বলে, অন্তত একটা দিনের বিশ্রামের জন্যে যেন। কিন্তু যাহোক একটা কাজ চাই-ই ইসমাইলের, সে বাড়িতে বসে থাকতে পারে না, সহরে চলে যায়। সেখানে এক প্রতিবেশীর ছেলের সঙ্গে দেখা। সে বুদ্ধি দেয়, ইসমাইল বরং ইস্তানবুলে চলে যাক, সেখানে কত লোকই তো করে-কম্মে খাচ্ছে। বউ-এর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে বাড়িতে ফিরে আসে ইসমাইল। না এলেই হত। এসে দেখে বউ পালিয়েছে বাড়ি ঘর ফেলে। বিষণ্ণতর ইসমাইল ইস্তামবুলেই চলে যায়। একটা চাকরিও জুটিয়ে নেয়। সব খোয়া গেলেও কিছু পেয়ে যায় সে, শ্রমিকদের ইউনিয়ন। ইউনিয়ন তাদের জন্যে লড়ে।

এই ফিল্মটি রঙিন, ১৯৮০ সালে বার্লিন উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল।

ইলমাজ গুনের সেরা ছবি, এখন পর্যন্ত, 'দ্য হার্ড' নির্মিত হয় ১৯৭৯ সালে। এটিতেও পরিচালক হিসেবে নাম আছে ওকটেন-এর। জেলে বসেই এ ফিল্মের প্রস্তুতি করেন গুনে। ১৯৭৯ সালেই রঙিন এই ফিল্মটি বার্লিন, মস্কো, মন্ট্রিল এবং লণ্ডন উৎসবে দেখানো হয়। লোকার্নো উৎসবে 'দ্য হার্ড' গ্রাঁ প্রি পুরস্কার পায়।

আঙ্কারা থেকে বড় একটা অর্ডার এসেছে, অনেক ভেড়া বিক্রি হবে।

কিন্তু অত ভেড়া নিয়ে হামো অত দূরে যাবে কেমন করে? তুরস্কের নানা উপজাতি গোষ্ঠীর একটির মানুষ হামো। গোষ্ঠী-অনুভূতি, সংকীর্ণ, তবে তীব্র। আঙ্কারার অর্ডার রাখতে হলে ছেলেদের সাহায্য দরকার। ভেড়ার পাল পাহারা দিতে হবে, যত্ন করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে পথযাত্রায়, দীর্ঘ এবং কষ্টকর, ছেলেদের কাউকে নিতে হবে সঙ্গে। বড় ছেলে সিরভান এক কেলেংকারি করে বসে আছে। হামোর বিরোধী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর একটি মেয়েকে, অসম্ভব সুন্দরী, বিয়ে করেছে। তা নিয়ে পরিবারে ঘোর অশান্তি। তার ওপর বউটি অসুস্থ, সন্তান ধারণ করতে পারে না। সিরভান রাজি হয় আঙ্কারায় যেতে। কিন্তু বউ-এর চিকিৎসার জন্যে টাকা দিতে হবে। বউকে শহরের বড় ডাক্তার দেখাতে চায় সে। দীর্ঘ যাত্রায়, প্রায় সমগ্র তুরস্ক ঘুরে, নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, যেন এখনকার তুরস্ককে উন্মোচিত করতে করতে, তারা শেষ পর্যন্ত আঙ্কারায় পৌঁছয়। কিন্তু ততদিনে বড় দেরি হয়ে গেছে, অর্ডার বাতিল। বিপদে এবং কষ্টে পড়ে তারা। সিরভানের বউ আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার চিকিৎসার জন্যে শত্রুগোষ্ঠীর একটি মেয়ের জন্যে, এক পয়সাও দিতে রাজি হয় না হামো। সিরভান ছুটে বেড়ায়, বৃথাই। বউটি মরে। বাপের কাছে আসে সিরভান। সেখানে একজন নির্বিকার তাচ্ছিল্যে বলে, মরছে তো একটা মেয়েমানুষ, তা নিয়ে অত হৈ চৈ করার কি আছে! প্রবল ক্রোধ আর ঘৃণায় রেখাটা পার হয়ে যায় সিরভান, লোকটাকে হত্যা করে।

ব্যারিংটন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, গুনের সঙ্গে তাঁর ফিল্মের অসম্ভব মিল। প্রায় প্রত্যেকটা ফিল্মেই গুনে যেন উপস্থিত, শারীরিক-ভাবে। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এমন ভাবে এসে যায় তাঁর কাজে যেন তার জীবনেরই অংশ হয়ে ওঠে। তাঁর প্রতিটি ফিল্ম তাঁর জীবনের কিছু না কিছু থাকে।

গুনের ফিলমের প্রতিটি গল্পই খুব সহজ সরল, চরিত্রগুলিও চেনাজানার প্রায় প্রামাণিক—গাড়োয়ান, শহরে স্মাগলার, কর্পোরেশনের ডগ স্কোয়াডের মজুর, মেষপালক। এদের সমাজ এমন ভাবে উপস্থিত যে. বিশ্বাসযোগ্যতা কোনো সমস্যাই নয়। পুরো ফিল্ম জুড়ে এরা ধীরে ধীরে ব্যক্তি হয়ে ওঠে। অথচ সমকালীনকে ধরার এই অনাড়ম্বর আয়োজনেই কি আশ্চর্য-ভাবে তিনি ধরে ফেলেন প্রাচীন একটা দেশ ও জাতির নানা বাস্তবতা

এবং কোনোরকম ফিল্মিক গিমিক ছাড়াই আধুনিকতার কত জটিলতা। তুরস্কের উপজাতীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভূগোল আর ইতিহাসজাত, কিংবা অমানবিকপ্রায় রূঢ়তা যেমন আসে (হার্ড) আধুনিক জীবনের জটিল বাতাসে, অসম মানুষের মধ্যে ভালোবাসার টানও গড়ে ওঠে (এলিজি) যেন অনায়াসেই। সহজ সরল এক আধারেই গুনে ধারণ করেন, করতে পারেন, শিল্পীর অসীম ক্ষমতায়, তার দেশ ও জাতির দুঃখময়, যন্ত্রণাদগ্ধ সত্তাকে। অথচ যে মানুষকে তিনি ভালোবাসেন, তাকেও তিনি শিল্পের সত্য আর বাস্তবতা দিয়েই আঁকেন, অহেতুক আর অবাস্তব গৌরবান্বিত করার লেশমাত্র চেষ্টাও করেন না। তাঁর ফিল্মে দারিদ্র্যের হাত ধরেই যেন আসে নীচতা, লোভ, কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা আর স্বার্থপরতা। মমতা থাকেই এবং সে কারণেই এ সব তিনি পার হযে যেতে চান তাঁর দেশকে সঙ্গে নিয়ে। প্রায় কোন ফিল্মই আশার ইঙ্গিতবাহী পতাকা উড়িয়ে শেষ হয় না। হয় না, কারণ ইচ্ছাপূরণের আহ্লাদী স্বেচ্ছাচার তিনি করতে পারেন না।

গুনের ফিল্মগুলি, একত্রে, যেন তুরস্কের মহাজীবনের ক্লাসিক এক আখ্যান আর সেই জন্যেই মানুষের বাঁচার আর ভালোবাসার আর কষ্ট পাওয়ার মহাকাব্য। অথচ ল্যাণ্ডস্কেপ আর পরিস্থিতির দৃশ্যতায় তাঁর ডকুমেন্টারি বিশ্বস্ততা ও চরিত্র-ঘটনার সম্ভাব্যতায় তাঁর প্রামাণিকতাই তাঁকে দেশের বাইরে সর্বজনীনে নিয়ে যায়।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

ব্যাটল অব চিলি

মনে হল, কোনো পাহাড় ফাটছে। শিলাপতনের শব্দ গিরিখাত ভেদ করে যেমন উঠে আসে অথবা মহাশূন্যে কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্রের বিস্ফোরণে যে অনন্ত দামামা বহুদূর বিস্তৃত প্রতিধ্বনিময়, সেই রকম এক কুণ্ডলী পাকানো শব্দের উচ্ছ্রিত জটলা ক্রমশ সারা স্ক্রিনে জলপ্রপাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ১৬ মিলিমিটারের তীক্ষ্ণ লেন্স বিদ্যুতের মতো ঝট ঝট করে গেঁথে তোলে দৃপ্ত পদক্ষেপ, চোয়ালের হাড় ফাটিয়ে শ্লোগান মুখর আকর্ণ বিস্তীর্ণ মুখ, অবয়ব, হাত। কিউবার পরিচালক প্যাট্রিসিও গুজম্যানের ছবি 'ব্যাটল অব

চিলি'-র সত্তর দশকে তোলা সাউণ্ড ট্র্যাক আর সেলুলয়েড ছাপিয়ে জনতার সেই 'আলেন্দে জিন্দাবাদ', 'আলেন্দে জনতা তোমার পাশে আছে' শ্লোগান আশির দশকে কলকাতার প্রায় জনশূন্য সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে আছড়ে পড়ে। ফিল্মোৎসবের প্রথম সপ্তাহে।

মাত্র ঐ ক-জন দর্শকের চোখের সামনে ১৬ মি.মি.-র প্রজেক্টর খুলে দিতে লাগল চিলির ইতিহাসের সত্তর দশকের প্রথম দিককার দিনগুলো।

১৯৭৮ সালের শরৎকালে একজন তরুণ স্কুবা ড্রাইভার স্যান্টিয়াগোর ৫০ কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে এক গণ-কবরখানা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে। তার সেই অভিজ্ঞতার কথা সে স্থলভাগে জানাতেই কিছুদিন বাদে তার মৃত্যু ঘটে রহস্যজনকভাবে। কারণ, তরুণটি জানত না, চিলিতে, পিনোচেটের চিলিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও দাক্ষিণ্য-লালিত চিলিতে ঐ গণহত্যার খবর প্রকাশ করা অপরাধ।

কিন্তু, সত্তর দশকের গোড়ায় কিউবার গুজম্যান ১৬ মি.মি-র ক্যামেরা ও কয়েকজন সহযোগী নিয়ে চিলির বুকের ওপর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সাহায্যে, সেখানকার দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া যে সামরিক অভ্যুত্থানের চক্রান্ত করছিল, সেই ঘৃণ্য চক্রের সমস্ত ইতিহাস, আলেন্দের অভিমন্যুর মতো সংগ্রাম, আর আবেগে, ভালোবাসায়, নেতার প্রতি শ্রদ্ধায়, মার্কিন অভিসন্ধির ব্যাপারে অনবহিত জনসাধারণের উদ্বেল আশা ও সমর্থনের দলিল তুলে রাখতে কোনো দ্বিধা করেন নি।' শিল্পীর সততায়, বিশ্বাসের দার্ঢ্যে 'ব্যাটল অব চিলি'-র প্রতিটি সেকেণ্ড জীবন্ত, রক্তপ্রবাহিত শিরা-ধমনীর মতো উষ্ণ, অপ্রত্যাশিতের মতো রোমাঞ্চকর।

চিলির সামরিক অভ্যুত্থানের পর বহু প্রশ্ন জেগেছিল। বলা হয়েছে, আলেন্দে, তাঁর পক্ষে বিপুল জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও, কেন জনসাধারণকে অস্ত্র দিলেন না। কেন, বারবার ক্রিশ্চিয়ান ডিমোক্র্যাটদের দিকে তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন বন্ধুত্বের হাত। কি দরকার ছিল তাঁর কেবিনেটে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নির্বাচিত করা। চিলিতে ইউনিদাদ পপুলার (পপুলার ইউনিটি) সরকারের পতনের পর মার্কসীয় বিপ্লবের দর্শন ও পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে—স্বভাবতই বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা।

প্যাট্রিসিও গুজম্যানের এই ছবি আমাদের বুঝতে সাহায্য করল, ১৯৭০ সাল থেকে '৭৩-এর সেপ্টেম্বর ১১ পর্যন্ত চিলির যে রাজনৈতিক, সামরিক, আর্থনীতিক টানাপোড়েন, বিভিন্ন মেরুর সামাজিক শক্তির সমন্বয়ে

তৈরি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অবস্থা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা, এবং কী স্বার্থে সেই ভূমিকা এই সব।

ছবিটা তিনটে ভাগে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে। প্রথম ভাগে আলেন্দের নির্বাচনে জয়লাভ থেকে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতালাভ, তার বিরুদ্ধে চিলির বুর্জোয়াসি, ক্রিশ্চিয়ান ডিমোক্র্যাট ও ন্যাশনাল পার্টির সমর্থকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চক্রান্ত। আলেন্দের নির্বাচনের পর জনসাধারণের মানসিকতা তুলে ধরতে গুজম্যান চলে গেছেন বাড়িতে বাড়িতে, রাস্তায়, অলিগলিতে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, আন্দজ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ ছোঁয়া তীর পর্যন্ত। শ্রমিকদের মুখ থেকে সোজা শোনা গিয়েছে আলেন্দের প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন। আলেন্দের সরকার যাতে কোনোভাবেই শাসনক্ষমতা চালাতে না পারে, তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকে তৈরি হচ্ছিল। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত আট মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করা হয়েছে চিলির ঘটনাপ্রবাহকে পপুলার ইউনিটির বিরুদ্ধে নিয়ে যাবার জন্য। নিক্সন সরকারের প্রধান সচিব হেনরি কিসিংগার গোটা পরিকল্পনাটা তৈরি করেন। এই আট মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পুরোটাই খরচা করা হয় ক্রিশ্চিয়ান ডিমোক্র্যাট ও ন্যাশনাল পার্টির সমর্থকদের পপুলার ইউনিটির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে।

চিলির মানুষদের মনে নিজেদের দেশ সম্পর্কে এমন একটা মিথিক্যাল ধারণা আছে যে, তাঁরা আশা করেন, তাঁদের সমস্ত সমস্যাই শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যাবে। এই আপাত স্থায়িত্বের যে মনোভাব, তার একটা কারণ নিহিত আছে চিলিতে বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটিক সরকারগুলোর দীর্ঘ শাসন-কালের যৌথ অভিজ্ঞতায়। ১৮৩১ থেকে ১৮৯১, ১৮৯১ থেকে ১৯২৪, আবার ১৯৩২ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত এই বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাট শাসনকালের একটা স্থায়ী ছাপ ১৮১৮ সালে স্বাধীনতা পাবার পর থেকে চিলির মানুষদের মনে একটা মিথ তৈরি করেছে। আর একটা বিশ্বাস ছিল, চিলির সৈন্যবাহিনীর নিরপেক্ষ, সংবিধানানুগ, আইনসঙ্গত চরিত্র নিয়ে। চিলির মানুষ কখনও সৈন্যবাহিনীকে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান শক্তি হিসেবে মনে করে নি। এ বিশ্বাসও নেহাতই অলীক। কারণ, চিলির প্রায় ১৫০ বছরের স্বাধীনতার ইতিহাসে শাসনক্ষমতা বদলাবার কাজে সামরিক বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকা দেখা গিয়েছে ১৮২৩, ১৮২৭, ১৮২৯, ১৮৫০, ১৮৫১, ১৮৫২, ১৮৫৯, ১৮৭৭,

১৮৯১, ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৭, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৮, ১৯৩৯ আর ১৯৬৯ সালে। চারটে গৃহযুদ্ধ, দশটি সামরিক অভ্যুত্থান, অসংখ্য অসফল অভ্যুত্থানে চিলির সামরিক বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার শতবর্ষব্যাপী অভ্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিশ্বাস নিতান্তই অমূলক।

এ কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝেছিল। তাই, ক্রিশ্চিয়ান ডিমোক্র্যাট ও ন্যাশনাল পার্টির সমর্থকরা 'as an outcome of election' বলে আলেন্দের নির্বাচনকে মেনে নিলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানত, যে, চিলির সামরিক বাহিনী কখনও মার্কসীয় দর্শনকে মেনে নেবে না। এবং সেই জন্যই নিজেকে সরাসরি যুক্ত না করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিলির সামরিক বাহিনীকে নিজেদের পরিকল্পনার খাঁচে তৈরি করতে দ্বিধা করে নি। চিলির ৭০ শতাংশ সামরিক অফিসার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত এবং মার্কিনি প্রশিক্ষকদের বেশ বড একটা অংশ চিলিতে বসে চিলির পুলিশ, প্যারা-মিলিটারি ও সামরিক বাহিনীকে তৈরি করে।

তাই গুজম্যানের ক্যামেরা যখন চিলির সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনের সচিত্র তথ্য আমাদের সামনে রাখে, ঠিক তখনই আলেন্দে সরকারের প্রথম দিকে পপুলার ইউনিটি আর কংগ্রেসের মধ্যে (যেখানে বুর্জোয়াসির প্রাধান্য সক্রিয়) দ্বন্দ্ব বেড়ে চলছে, আর সামরিক বাহিনীর একটা অংশ বিদ্রোহ করে। গুজম্যানের ক্যামেরা মনেদা (প্রেসিডেন্টের প্যালেস)-র কোনো একটা কোণ থেকে শট নিচ্ছে। একটা সেনাবাহিনীর ট্রাক এসে থামল। একজন সাংবাদিক ছুটে গিয়ে জানতে চায় কিছু। মিলিটারি অফিসার লাথি মেরে ফেলে দেয় তাকে। টালমাটাল পায়ে সে উঠে দাঁড়ায়। চলে যেতে শুরু করে। আর ব্যস্ততাবিহীন দুটো দক্ষ, মার্কিনি শিক্ষায় পটু হাত উঠে আসে রিভলবার নিয়ে। মিলিটারি অফিসার গুলি ছোঁড়ে। পর্দা জুড়ে স্লো মোশনে তার দেহ স্যান্টিয়াগোর রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে।

গুজম্যানের ক্যামেরার এই দৃশ্য এক মুহূর্তে চিলির সামরিক বাহিনীর প্রকৃত চরিত্র প্রতিষ্ঠা করে। সমস্ত রোমকূপে শিহরণ জাগে, কী দৃপ্ত প্রতীক্ষায় গুজম্যান সতীর্থ কর্মীর মৃত্যুযন্ত্রণার দিকে ধরে রেখেছিলেন তাঁর ক্যামেরা। আর, এক নিরাসক্ত নারীর কণ্ঠস্বর কমেন্টারির প্রেক্ষিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিল চিলির রাজনৈতিক-সামাজিক-সামরিক-মার্কিনী চক্রান্তের এই প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি। পর্দায় তাই এই চক্রান্ত আর প্রতিক্রিয়ার মাঝে মাঝেই জলোচ্ছ্বাসের মতো জেগে ওঠে মিছিল, 'আলেন্দে ভিভা, পিপলস্

পাওয়ার ভিভা"। কারখানায়, শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা প্রস্তুত। মিছিল করছে তারা।

আর মাঝে মাঝেই আলেন্দের চশমা-পরা শান্ত, গভীর চিন্তামগ্ন চেহারা। কখনও বক্তৃতা দিচ্ছেন স্যান্টিয়াগোর বিশাল জনসভাতে—'We are not under any circumstances going back down from Popular Unity programme that was the people's combat flag. I will not be just another President ; I will be the first President of the first truly democratic, popular and revolutionary government in Chilean history...' কখনও জানাচ্ছেন, পপুলার ই উনিটি সরকারের বিরুদ্ধে, চিলির নকশাল 'মুভমেণ্ট অব দ্য রেভল্যুশনারি লেফট' (MIR) যে পিপলস্ এ্যাসেম্বলি তৈরি করেছিল তার প্রতিবাদ 'The enemies of the UP (United Popular) are engaged in destroying the government's image. Notning better serves this enemy tactic than divisionism...People's power cannot spring from the divisionist monoéuvre of those who wish to set up a political mirage, which they call. a people's assembly.'

শোনা যায় আর্থনীতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আলেন্দের সাবধান বাণী, শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে, 'Tell the owners that we want all the factories to work, but warn them in my name that if they paralyse them artificially, you are going to take them over and you are going to make them produce.' আলেন্দের দৃঢ় চোয়াল পর্দা জোড়া, চক্রান্তকারীদের প্রতি তাঁর কড়া নির্দেশ, ১৯৭০-এর ১৩ সেপ্টেম্বরের বিশাল জনসমাবেশে, 'The people will know how to defend its victory.... If the conspirators in their madness provoke a situation that we do not want they should know that the whole country will come to a stop. that no enterprise, factory, workshop, school,hospital or farm will operate : This will be our first demonstretion of farce.'

ব্যাকব্রাশ করা চুল, গভীর ঢালের মতো নাকের ওপর কালো মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর, আলেন্দের দুটো চোখ দেখে নেয় তাঁরই সামনে হাজার

হাজার উল্লসিত জনতার স্লোগানময় জেদি একরোখা চেহারা।

কিন্তু, গুজম্যানের ছবিতে, একের পর এক শ্রমিক, সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার থেকে, আলেন্দের মতোই, আমরাও বুঝে যাই, চিলির জনসাধারণ কী ভাবে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আলেন্দে নির্বাচনে জেতেন ৩৬.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে। তার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশানাল পার্টির জর্জ আলেসান্দ্রি পান ৩৫.৩ শতাংশ ও ক্রিশ্চিয়ান ডিমোক্র্যাট দলের রাদোমিরো তোমিকের ২৮.১ শতাংশ ভোট জোটে। আলেন্দে জানতেন এই মাত্র শতকরা ৩৬ ভাগ লোক দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন চায়। কিন্তু ন্যাশনাল পার্টির ৩৫ শতাংশ কোনোরকম বিপ্লব, কমিউনিস্টি, মার্কসিজমের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। আর ৩০ শতাংশের কিছু কম ক্রিশ্চিয়ান ডিমোক্র্যাটরা মাঝামাঝি দোনোমনো, একটু সাধলেই ন্যাশনাল পার্টির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

গুজম্যান শুধু এই বিভাগই দেখান নি, তাঁর বিস্তৃত সাক্ষাৎকার থেকে এটাও বোঝা যায়, যে পপুলার ইউনিটির মধ্যে মুভমেণ্ট অব দ্য রেভল্যুশনারি লেফ্‌ট (MIR) কী ভাবে আলেন্দে সরকারের সমস্ত কার্যপদ্ধতিকে গোলমাল করে দিচ্ছিল।

কংগ্রেসে ন্যাশনাল পার্টি ও ক্রিশ্চিয়ান ডিমোক্র্যাটদের আধিপত্য। বিচার বিভাগের মাথারা আগেকার সরকারি নিয়মে নিযুক্ত। এবং আর্থনীতিক ব্যাপারে অন্যতম প্রধান কম্পট্রোলার জেনরেলস অফিসের কর্তাও আগের সরকারের লোক। তা ছাড়া, সেনাবাহিনীতেও তিনটে বিভাগ ছিল—প্রবল কমিউনিস্ট বিরোধী, কনস্টিটিউশনালিস্ট আর দোনোমনো একটা অংশ। এরা সকলেই আইনানুগ প্রথায় নির্বাচিত বলেই, আইনের প্রতি একটা পেশাগত আনুগত্য থেকে, আলেন্দেকে মেনেছিল। তাই এই লিগ্যালিটিকে লঙ্ঘন করা আলেন্দের পক্ষে প্রথমেই সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেই, কেবল নির্বাচনে জিতে একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছে সে কাজ করবার, আলেন্দেকে এই সামাজিক বাস্তবতা মেনেই কাজ করতে হচ্ছিল, কখনও ন্যাশনাল-ডিমোক্র্যাট জোটের দিকে হাত বাড়িয়ে, কখনও সামরিক বাহিনীকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার গ্যারান্টিতে ভুলিয়ে রেখে। আলেন্দে বারবার চাইছিলেন, চিলির জনসাধারণকে শান্ত রাখতে, তিনি জানতেন, জনসাধারণকে সশস্ত্র করবার সময় এটা নয়। তাহলে ১৯৭০ সালেই ক্যু হয়ে যেত, তাহলে, লিগ্যালিটির যে আশ্রয়ে আলেন্দে সরকার কাজ করছিলেন, তাও করা যেত না।

কিন্তু গুজম্যানের ক্যামেরা বারবার ফিরে গেছে আলেন্দের মুখ থেকে নিশীথ রাত্রে স্যান্টিয়াগোর পথে যুবকদের মিছিলে, 'আলেন্দে আমাদের অস্ত্র দাও, আলেন্দে আমাদের অস্ত্র দাও।' গুজম্যান অসাধারণ দক্ষতায় আলেন্দের বক্তৃতা, ন্যাশনাল-ডিমোক্র্যাট জোটের সঙ্গে তাঁর আলোচনা, আর অস্ত্র পাবার জন্যে জনসাধারণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। দেখতে দেখতে বহুলোকেরই মনে হয়েছে, পপুলার ইউনিটি তো বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, জনসাধারণের এই প্রবল সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে, ধ্বংস করতে পারে প্রতিবিপ্লবকে। কিন্তু মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস করতে গেলে সামরিক বাহিনীকে বদলে নিতে হয় বিপ্লবী সাজোয়া শক্তিতে, বুর্জোয়া পার্লামেন্ট আর বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হয়। যেহেতু, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবার আগে, কেবলমাত্র নির্বাচন জিতে সেই ব্যবস্থার একটা সামান্য কিন্তু শক্তিশালী অংশ দখল করা হয়েছিল মাত্র, আলেন্দে সরকারের সেই বদল করবার ক্ষমতা তখনও দানা বাঁধতে পারে নি।

নির্বাচনে জিতলেই, আর জনসাধারণ 'অস্ত্র অস্ত্র' করলেই যে অস্ত্র দেওয়া যায় না, রাষ্ট্রক্ষমতা পুরোপুরি দখল না করলে, গুজম্যানের ছবিতে সে তথ্য প্রমাণিত।

ছবিতে সাক্ষাৎকারে বহু শ্রমিক বলেছেন, 'The workers are ready. What is Allende waiting for? Why doesn't he suspend the Congress?' কিন্তু, সে তো কেবল ৩৬ শতাংশ। অনেকের মনে হতে পারে, সত্যিই শ্রমিকরা সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরি। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই ন্যাশনাল-ডিমোক্র্যাট জোটের ৬৪ শতাংশ সমর্থকদের কথা ভুলে যাব না। তারা আলেন্দের জন্য তৈরি ছিল না।

তাই 'ল ফর কনট্রোল অব আর্মস' যখন কংগ্রেসের সামনে এল, আলেন্দের সমর্থকরা তা আটকাতে পারল না। গুজম্যানের ছবিতে সেই নিরুপায় পরাজয় দেখা যায়। আইন হল—'Those who organize, belong to, finance, supply aid to, instruct, or incite to the creation of private militias or combat groups would be subject to imprisonment of one and a half to five years of exile.'

একদিকে কেবিনেটের অধিবেশনের তর্ক, অন্যদিকে বারবার মিছিলে

'অন্ন দাও' চিৎকার শুনিয়ে গুজম্যান আলেন্দের সরকারের এই সংকটকে যে দক্ষতায় তুলে ধরেছেন, তা অসাধারণ।

এই সংকটের মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে মার্কিন সংস্থাগুলো আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ধ্বংস করতে শুরু করে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই অবধি কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স বাড়ে ৩৩·২ শতাংশ। অগাস্টেই তা বাড়ে ২২·৭ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বরে ২২·২ শতাংশ। জিনিস-পত্রের দাম প্রায় রোজ বাড়তে থাকে—অগাস্ট ১—সিগারেট—১০০ শতাংশ ; অগাস্ট ১২—বিয়ার ও ঠাণ্ডা পানীয়—৮৫ থেকে ১০০ শতাংশ ; অগাস্ট ১৩ —গাড়ি—২২০ শতাংশ ; অগাস্ট ১৬—গরুর মাংস ২০০ শতাংশ ; অগাস্ট ২০ দুধ—৪০ শতাংশ এবং রুটি—৭৫ শতাংশ ; সেপ্টেম্বর ৯—জুতো—১০০ শতাংশ।

সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনি বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকা ছিল খুবই তৎপর। ১৯৭১ সালে মার্কিনী এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক চিলিকে কোনো ঋণ বা অর্থসাহায্য দেয় না। বিশ্বব্যাঙ্ক ও ইন্টার-আমেরিকান ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। ইণ্টারন্যাশনাল টেলিফোন অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ (আই. টি. টি.) নামে মার্কিনি সংস্থার সম্পত্তি ১৯৭১ সালে জাতীয়-করণ করা হলে আই. টি.টি. মার্কিনি সরকারকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজনের কথা বলতে থাকে। আলেন্দের সময় অন্যান্য তাঁবেদার মার্কিনি অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য কমে দাঁড়ায় মাত্র ১৬ মিলিয়ন ডলার। এই সাহায্যের পরিমাণ ১৯৬৭ সালে ছিল ১৩০ মিলিয়ন ডলার, ১৯৭০ সালে ছিল ১০০ মিলিয়ন ডলার। একদিকে মার্কিনি সাহায্যের পরিমাণ যখন কম তখন চিলির সামরিক বাহিনীর প্রতি মার্কিনি উদারতা বল্গাবিহীন—১৯৫০—১৯৭০ সাল অবধি চিলির সামরিক বাহিনীতে মার্কিনি সাহায্যের বাৎসরিক পরিমাণ ছিল ৮.৫ মিলিয়ন ডলার ; ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত তা বেড়ে দাঁড়ায় বাৎসরিক ২৩ মিলিয়ন ডলার।

এই আর্থনীতিক ব্যবস্থা নেবার ফলে একদিকে মূল্যমান যেমন বেড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে প্রবল মুদ্রাস্ফীতির চাপে পপুলার ইউনিটি সরকারের কোনো পরিকল্পনাই কার্যকর হয় নি। মূল্যমান বৃদ্ধির ফলে দরকার হল মজুরি ও মায়না ও নানা ভাতার পুনর্বিন্যাস। সে কাজ ন্যাশনাল-ডিমোক্র্যাট প্রভাবময় কংগ্রেস কিছুতেই করতে দেয় না।

এই অবস্থায় গুজম্যানের ক্যামেরা বারবার ধরে রাখে সামরিক অফিসার-

দের মুখ। তাদের দাবি, এখনই চিলিতে সামরিক শাসন জারি করা উচিত। দেখা গেল, সামরিক বাহিনী-নৌবাহিনীর 'গেট টুগেদারে' মার্কিনি এ্যাডমিরাল ই. জুমওয়াল্ট, মার্কিনি বিমান বাহিনীর প্রধান জেনারেল এফ. রিয়ান এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ মার্কিনি সামরিক কর্তাদের।

যখন সামরিক অফিসাররা বারবার বলে সামরিক শাসনের কথা, যখন মার্কিনি সাহায্যপুষ্ট চিলির বুর্জোয়াসি আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে, তখন শেষ আঘাত হিসেবে এল 'অক্টোবর স্টপেজ' পরিকল্পনা, শিল্পপতিরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ করে দেয়। এই অক্টোবর স্টপেজ শুরু করে কনফেডারেশন অব ট্রাক ওনারস্ ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর মধ্যরাত্রে। পরে কনফেডারেশন অব রিটেইল শপকিপারস্ এবং ন্যাশনাল-ক্রিশ্চিয়ান ডিমোক্র্যাটদের প্রভাবিত ইউনিয়ন যোগ দেয়।

গুজম্যানের ক্যামেরা চলে যায় স্যান্টিয়াগোর বাইরে। শ-এ শ-এ ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ক্যামেরা মাটি থেকে চলে যায় আকাশে—এরিয়াল শটে চোখে পড়ে মাছির মতো সারি সারি ট্রাক একটা টিলার চারদিকে মাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে—চাকা বন্ধ। ছবির সেই নিরাসক্ত নারীকণ্ঠ জানায়, ২৬ দিন এই স্ট্রাইক সরাসরি মার্কিন সাহায্যে চালানো হয়। ট্রাক মালিকদের তার আগে ১৮ মাস ধরে শ-শ ডলারের ভরতুকি দেওয়া চলছিল।

স্ট্রাইকের ফলে সমস্ত চিলির সরবরাহ অচল। কিন্তু শ্রমিকরা কৃষকরা রাস্তায় নেমে পড়ে। যার যা চলাচলের উপায় ছিল, ট্রাক্টর, টানা গাড়ি, সাইকেল—সমস্ত নিয়ে জনসাধারণের যাতায়াতের সাহায্যে এগিয়ে আসে। শ্রমিকরা নিজেদের কারখানা দখল করে নেয়। নিজেদের পরিচালনায় তারা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য উৎপাদন করে শহরে শহরে সরবরাহ করতে থাকে।

পর্দায় ভেসে ওঠে পূর্বতন প্রেসিডেন্ট ফ্রেই-এর মুখ। তার বক্তৃতায় শোনা যায়। 'The stoppage is not the result of a political machination. An econominc disaster has been produced in Chile, a situation that would not get better but worse'। ক্রিশ্চিয়ান ডিমোক্র্যাটরা সমস্ত শক্তি দিয়ে এই ধর্মঘটকে সমর্থন করতে থাকে।

এই ধর্মঘট অবিলম্বে মেটাবার প্রয়োজন অনুভব করে আলেন্দে বাধ্য হয়ে ১৯৭২-এর নভেম্বরের প্রথম দিকে তিনজন সামরিক অফিসারকে কেবিনেটে নিলেন। এবং তারপরই, জেনারেল কারলস প্র্যাটস হুকুম দিলেন,

৪৮ ঘন্টার মধ্যে ধর্মঘট তুলে নিতে। ধর্মঘট যেমন একদিকে জাতীয় অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করল, তেমনি আলেন্দের সামরিক অফিসার নিয়োগে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে পপুলার ইউনিটিতে। ঘটনাটা আপাতদৃষ্টিতে গোলমেলে—মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী সরকারে বুর্জোয়া মিলিটারি অফিসার! কিন্তু, এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

পর্দায় ভেসে ওঠে MIR নেতাদের বক্তৃতা—'The incorporation of some generals in the cabinet has in important measure changed the character which the government has till now had. The traditional people's parties cease being the political axis of the government. Now they have to cede an important part of this role to the armed forces.'

এই ধর্মঘটে শক্তিশালী ট্রাক মালিকরা বসে বসে মার্কিন ডলার পেল। কিন্তু জিনিসপত্রের অভাবে চিলির শহরে শহরে গোলমাল শুরু হয়। নানারকম অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অচল করে।

আবার এই ট্রাক মালিকরা ১৯৭৩ সালের ২৬ জুলাই থেকে দ্বিতীয়বার ট্রাক ধর্মঘট করে।

পিনোচেট ১৯৭২ সালে সামরিক বাহিনীর প্রধান হয়েছিল। তারপর থেকে সামরিক বাহিনীকে প্রধানত কমিউনিস্ট-বিরোধী ধাঁচে তৈরি করা হতে থাকে। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসের ২৯ তারিখে একবার সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা হয়। আলেন্দে বারবার বক্তৃতা দেন—'I call on the people to take over all factories...to be alert.... If the time comes, the people will have arme.'

কিন্তু সামরিক বাহিনীর এই প্রাথমিক ব্যর্থতায় তারা নিজেদের আরও গুছিয়ে নেবার সময় পায়।

আর তারপরই গুজম্যানের ক্যামেরা চলে যায় আকাশে। প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের ওপর বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে নেমে আসে বিমানবাহিনী—একের পর এক বোমা পড়তে থাকে। আলেন্দে তাঁর প্রতি জনসাধারণের প্রবল আস্থার প্রতিদানে, সেই ১১ সেপ্টেম্বরের আঘাতের উত্তর দিলেন, নিজের জীবন দিয়ে। প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ভগ্নস্তূপ। ক্যু শেষ।

ক্যামেরা চলে যায় পিনোচেটের মুখে। চারটি মাত্র বাক্যে ঘোষণা করে সামরিক শাসনের কথা বলা হয়—'the junta would extirpate the

cancer of Marxism. The Congress has been snspended until further notice. All the political parties are banned. And the country will be governed according to martial law. That's all'.

গুজম্যানের এই ছবি দেখতে কোনো মারামারি, কোনো ছুটোছুটি করতে হয় নি। সরলা রায় মেমোরিয়াল হলের সামনে দাঁড়াতেই, প্রতিদিন, কয়েকজন ঘিরে ধরেছেন টিকিট কিনবার জন্য। কারও হাতে তিনটে, কারও বা পাঁচটা। হলে ঢুকে কোনো দমবন্ধ করা আবহাওয়ায় অসুবিধে হয় নি। প্রায় খালি হলে ক-জন মাত্র দর্শক ছিলেন।

অথচ, আই. এফ. এম ঋণে জর্জর, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান-মুখর রাজনীতি সচেতন মানুষদেরই না কত প্রয়োজন ছিল বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জঘন্যতম সামরিক অভ্যুত্থানে মার্কিন চক্রান্তের নগ্ন, ঘৃণ্য, নৃশংস চেহারার এই তথ্যচিত্র দেখা।

ফিল্ম উৎসবের এই শ্রেষ্ঠ ছবিটিকে কাজ দর্শকই বা দেখলেন! এক লাইনও লেখা হল না কোনো পত্রিকার পাতায়। ফিল্ম সোসাইটি, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বা সরকারি প্রচার ব্যবস্থায় কি সম্ভব নয় এই ছবি পাড়ায় পাড়ায় দেখানো, বাংলা অনুবাদসহ। সেটা যে প্রকৃতই সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

সিদ্ধার্থ রায়

‘নবাব ক্লাইভ’

‘নবাব ক্লাইভ’ ১৯৮০-র শারদীয় সংখ্যায় বেরিয়েছিল। স. প

‘নবাব ক্লাইভ’ গল্পটি পড়ে খুব খুশি হয়েছিলাম। এতদিন পরে প্রকৃত ইতিহাস-নির্ভর একটি নবাবি আমলের কাহিনী লেখা হল। সঙ্গে সঙ্গে সেই আমলের ছবিটিকে কেন একটা উপন্যাসে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন না ভেবে দুঃখিত হয়েছিলাম। এখন দেখছি লেখক একটি উপন্যাসই লিখেছেন। আশাকরি শীঘ্রই বইটি প্রকাশিত হবে।

এই প্রসঙ্গে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে একটি তথ্য লেখকের গোচরে আনতে চাই। হয়ত তিনি ব্যাপারটা জানেন, তবু তাঁকে অবহিত করা বোধহয় ভাল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রচারকেরা বেশ সুপরিকল্পিত ভাবেই সিরাজের চরিত্রকে মসীলিপ্ত করেছেন। অক্ষয় মৈত্রেয়, কালিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা এই মসিক্ষালনের চেষ্টা করলেও আমাদের বহু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্রিটিশ প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এর ফলে নবাবি আমলের ইতিহাস বহুল বিকৃত হয়েছে। আজকের দিনের ঐতিহাসিকেরা নবাবি আমলের পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করছেন।

সিরাজউদ্দৌলা আর দশজন নবাবের মতোই ছিলেন। তিনি দেশপ্রেমিক বীরও ছিলেন না, আবার নররাক্ষস বা দানবও ছিলেন না। তাঁর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল রণনৈপুণ্যের অভাব। তিনি যদি রণনিপুণ যোদ্ধা হতেন তাহলে ক্লাইভকে পলাশী প্রান্তর থেকে ফিরে যেতে হত না।

সামাজিক জীবনে সিরাজ সাধারণ রাজনীতি মেনে চলতেন এবং হিন্দুদের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ করতেন। এ-সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে, যদিও এটা নেরেফ জনশ্রুতি নয় বলেই মনে হয়।

জনশ্রুতিটি এইরূপ: ‘বিবাদার্ণবসেতু’ নামক প্রথম হিন্দু আইনগ্রন্থের

ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কিছুকাল নবাব আলিবর্দির দরবারে সভাপতিও ছিলেন। নবাবের মৃত্যুর পর তিনি রাজা নবকৃষ্ণের নবরত্নসভায় যোগ দেন।

সিরাজউদ্দৌলা নবাব হয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁর পারলৌকিক কৃত্য উপলক্ষে বাংলার প্রধান পণ্ডিতদের কাছে যাবনিক সংস্কৃতে রচিত নিমন্ত্রণ পাঠান। পত্রটি লিখে দিয়েছিলেন পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

পত্রটি নিম্নরূপ :

'খোদাপাদারবিন্দদ্বয় ভজনোপর মাতৃতাত মদীয় / আলীবর্দী নবাবে—বিবিধগুণযুতেহল্লামুখ পশ্চিমাভে। মর্ত্যাং দেহং মহৌ স্বং মুনসর মুলকঃ সীরাজউদ্দৌলানামা। যা চেহহং মাং ভবন্তো গলধৃতবসনঃ শুদ্ধনাং সংনীয়ন্তাম।

উদ্ভট সাগরে পণ্ডিত বাণেশ্বর রচিত উদ্ভট শ্লোক হিসাবে লেখাটি মুদ্রিত হয়েছে।

এটা খুবই সম্ভব যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা পণ্ডিত বাণেশ্বরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর অনুরোধেই বাণেশ্বর শ্লোকটি রচনা করেন।

সুকুমার মিত্র

গ্রাহক সংক্রান্ত

ডাকখরচ বাদে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : কুড়ি টাকা
ডাকখরচ সহ বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা : তেইশ টাকা
ডাকখরচ সহ আজীবন গ্রাহকচাঁদা : দুইশ টাকা

বর্ধিত মূল্যে বছরে অন্তত তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়
গ্রাহকদের সেজন্য কোনো অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না
বছরের যে-কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়

এজেন্সি সংক্রান্ত

অন্তত ৫ কপি নিতে হয়
কমিশন শতকরা ২৫ টাকা
পত্রিকা ভি পি-তে পাঠানো হয়। ডাকব্যয় আমাদের।

কর্মাধ্যক্ষ 'পরিচয়'
বব্যস্থাপনা দপ্তর

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩